সম্মান সংখ্যা

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষাব্রতী ও প্রাবন্ধিক
ভূদেব চৌধুরী

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও প্রাবন্ধিক
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ
কল্পতরু সেনগুপ্ত

লোকসংস্কৃতিচর্চার বিরল ব্যক্তিত্ব
তারাপদ সাঁতরা

বিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক
অমর ভাদুড়ি

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

আই. সি. এ ২০০৬ (৩) ২০০৩

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে

গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুহূর্তের অসতর্কতা
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড

গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন।

- বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ত্রুটিমুক্ত রাখুন।
- অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না।
- তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন।
- আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর দিন।
- অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ২০০৬ (৩) ২০০৩

কামারহাটি পৌরাঞ্চলের উন্নয়নে নবদিগন্ত উন্মোচনের সারণী

১। বেলঘরিয়া স্টেশনের উপর উড়ালপুল।

২। ৩০ মিলিয়ন জল প্রকল্প স্থায়ী জল সমস্যা সমাধানে বিরাট পদক্ষেপ।

৩। নজরুল মঞ্চ, সমাজসদন ও পুরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পুরপথিক' প্রকাশ—সাংস্কৃতিক চর্চায় এনেছে অনবদ্য গতিবেগ।

৪। বেলঘরিয়া বাজার প্রকল্প নাগরিকদের গর্ব।

৫। আড়িয়াদহের 'সপ্তপর্ণা' আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

৬। দক্ষিণেশ্বর পৌরবাজার প্রকল্পটি এলাকার পরিবেশ পরিবর্তনে নিয়ে আসবে নতুন দিন।

৭। বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের অভিযান সকল মানুষের কর্মসূচীতে পরিণত।

আগামী দিনের আরও উজ্জ্বলতর পরিকল্পনা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিয়ে আসুক নতুন প্রাণ।

প্রবীর মিত্র
উপ-পৌরপ্রধান

গোবিন্দ গাঙ্গুলী
পৌরপ্রধান

পরিচয়

মাঘ ১৪০৯-আষাঢ় ১৪১০
ফেব্রুয়ারী-জুলাই '০৩
৭-১২ সংখ্যা ৭২ বর্ষ

এক : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

দুই : মূল্যায়ন

তিন : হীরেন্দ্রনাথ : সৃষ্টি

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

'আমি নিজে ১৯৩৫ নাগাদ সময়ে পরিচয়-এর সঙ্গে পরিচিত হই। আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আর বিষ্ণু দে-র মতো বন্ধু সমভিব্যাহারেই বোধ হয় প্রথম যাই। প্রধানত সুধীনবাবুর বাড়িতেই যেতাম। ডক্টর প্রবোধ বাগ্‌চী কিংবা গিরিজাবাবুর বাড়িতে যে বৈঠক হত, সেখানে খুব কমই গিয়েছি।...বেশ মনে আছে আমার প্রথম যে লেখা 'পরিচয়'-এ প্রকাশ পায় সেটা হল এঙ্গেলস্‌-এর Anti Duhring গ্রন্থটির সমালোচনা। প্রসঙ্গত, সমালোচনা-বিভাগের জন্যই 'পরিচয়'-এর খ্যাতি বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাই হোক, তখন থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পরিচয়-এ অজস্র লেখা (কয়েকটি অন্য নামে) লিখেছি। আজও রয়েছি বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর একজন 'উপদেশক' (শব্দটি নিয়ে আমার মনে খটকা আছে) হিসাবে।'

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়-এর আড্ডা' গ্রন্থের ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ এইভাবেই পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়েছিলেন। ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল ১৯৯০-এর ২৫ জানুয়ারি। আজ ২০০৩ সালেও সে ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত। তিনি এখনও পরিচয়-এর প্রধান উপদেশক এবং লেখকও। তবু ভূমিকাতেই তিনি পরিহাসসিক্ত মৃদু অনুযোগও জানিয়েছিলেন যে, 'উপদেশক' হলেও ''উপদেশ'' দেবার বা নেবার উদ্যোগ কোনো পক্ষে নেই।' এর প্রথমটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রুচি ও বিনয়। কারণ, উপদেশ বা পরামর্শ নিয়মিতই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়, অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভাবেও তাঁর স্নেহশীল নির্দেশ আসে। কিন্তু আমাদের অক্ষমতায় অনেক সময় তা পালিত হয় না। এই অক্ষমতার মার্জনাও তাঁর কাছে পাওয়া যায়।

তাঁরই হিসেবে দীর্ঘ আটষট্টি বছর ধরে পরিচয়-এর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ-এর সংযোগ। তিনি তখন থেকেই এর লেখক, পাঠক এবং দীর্ঘকালের নির্দেশক। তাই আমাদেরই দায়িত্ব ছিল তাঁর যথাযোগ্য একটি 'সম্মান-সংখ্যা' প্রকাশ করার। এই কাজে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেই অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বর্তমান সংখ্যাটি সেই আরব্ধ দায়িত্ব পালনের প্রয়াস। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ফারাক থাকেই, এখানেও তা আছে। সঙ্কলনটির অসম্পূর্ণতার জন্য স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেও এটুকু বলা যায় যে, এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি সেটুকু গ্রহণ করে নিলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করি।

শ্রীগৌতম নিয়োগী এবং শ্রীপ্রণব বিশ্বাস যুগ্মভাবে এই সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন। হীরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণেই তাঁরা স্বেচ্ছায় এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ

রণেন সেন

১

হীরেনবাবু সম্পর্কে কিছু লেখার অনুরোধে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও পাচ্ছি। ভীত হওয়ার কারণ হীরেনবাবুর মতো কমিউনিস্ট ভারতবর্ষে তো কমই পাওয়া যায়, এমনকী বিদেশেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যাঁরা ইংলন্ডে থেকেছেন, কিন্তু ইংলন্ডের কমিউনিস্ট পার্টির বা রজনীপাম দত্তের (আর-পি-ডি) সংস্পর্শে না এসেও নিজের চেষ্টায় মার্কসবাদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে নিজে কমিউনিস্ট হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হীরেন মুখার্জি। এই প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম করতে হয়—তিনি অধ্যাপক সুশোভন সরকার। তিনিও নিজের চেষ্টায় কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। এই দুজনই পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের দুই প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমার মুস্কিল, এসব কথা বলতে গেলে নিজেকে টেনে আনতে হয়। তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্র ছিল কলকাতাতে। কমরেড পি সি যোশি সাধারণ সম্পাদক আর ড. গঙ্গাধর অধিকারী পলিটব্যুরো সদস্য। ১৯৩৬ সালে দুজনই কলকাতায় আত্মগোপন করেছিলেন। তখন কলকাতায় পার্টির সদর দপ্তর ওঁরাই চালাতেন। আমার হাত দিয়েই সে সময় গোপন চিঠিপত্র যেত। এমন একটি চিঠিতে লেখা ছিল 'যোগেশ'। আমি যোশিকে জিজ্ঞেস করলাম—'এ কে রে বাবা!' যোশি জবাব দিলেন—'জালে বড় এক কাতলা পড়েছে।' [illegible]ও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। পার্টিতে প্রতিষ্ঠা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?' [illegible] বললেন, 'অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির প্রফেসার হীরেন মুখার্জি শিগ্‌গিরই কলকাতায় আসছেন। [illegible] সঙ্গে কাজে যোগ দিচ্ছেন।' অধ্যাপক সুশোভন সরকারও তখন ছাত্রদের নিয়ে [illegible]র কিছু ছেলেকে নিয়ে স্টাডি ক্লাস করতেন এবং বিভিন্ন নামে মার্কসবাদের ওপর [illegible]ংলায় বই লিখেছেন। যেমন—ইতিহাসের ধারা (অমিত সেনের নামে)।

[illegible]৯৩৭ সালে পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করতে আরম্ভ করল কারণ বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের [illegible] চুক্তিতে এলো যে তারা কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত ও তাদের অহেতুক বাধা দেবে [illegible] কংগ্রেস অলিখিতভাবে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে কাজ করার সুযোগ করে [illegible] এর ফলে পার্টির সদর দপ্তর মুম্বাইতে স্থানান্তরিত হল। পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশানাল [illegible] ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে মুম্বাই থেকে বের হল। এই সময় হীরেনবাবু কলকাতায় [illegible] আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

[illegible] দেখলাম হীরেন্দ্রনাথ অতি অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি যে শুধু মার্কসবাদে পণ্ডিত [illegible]ান বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে ছাত্রদের যে বক্তৃতা [illegible]পরে অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য একটা সভায় হীরেনবাবুর সামনে বলছিলেন,

'খুব সহজে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুঝিয়েছিলেন হীরেন মুখার্জিই।' বস্তুত অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন হীরেনবাবুকে নিয়ে সে সময় ভারতের নানান জায়গায় ক্লাস, মিটিং করেছেন। হীরেনবাবুর প্রভাবে বহু তরুণ পার্টিতে যোগদান করেন। হীরেনবাবু পরবর্তী যুগে একটি লেখায় বলেছিলেন, 'আমি যখন পাঞ্জাবে ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলাম, সেই ক্লাসে ছিলেন ইন্দ্রকুমার গুজরাল (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী)।' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান (বর্তমানে প্রয়াত) শিক্ষার ওপর পার্লামেন্টে একটি ভাষণ দেন। তাঁকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন হীরেন মুখার্জি। জবাবে অধ্যাপক হাসান একটু হেসে বললেন, 'আমার একটু দুর্বলতা আছে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি সম্পর্কে। ফলে আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি না।

২

হীরেনবাবু সম্পর্কে গৌতম নিয়োগী একবার লিখেছিলেন, হীরেনবাবু বাংলার মেধা। আমি বলি, তার ওপরেও যদি কিছু থাকে তাকে বলে মনীষা। আর যার সেই মনীষা থাকে সেই ব্যক্তিকে বলে মনীষী। হীরেনবাবু মনীষী।

ভারতে প্রথম প্রগেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স করেছিলেন হীরেনবাবুই—১৯৩৬ সালে। সেই সম্মেলনে বাংলার সে সময়কার বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবাইকে জড়ো করেছিলেন। যেমন কবি বিষ্ণু দে, হিরণ সান্যাল, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের শুধু জড়ো করেছিলেন তা নয়, প্রগতিশীল লেখক সংঘের কাজে তাঁদের লাগিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (Friends of the Soviet Union) গঠন করেন। কম-বেশি যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের সাফল্য কামনা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে সমবেত করেন এতে। প্রগতি লেখক সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির জন্য প্রচারে তিনি সারাভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আই পি টি এ-র জন্মের সময় প্রথম সম্মেলনে তিনি সংস্কৃতি জগতকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে যে বক্তৃতা দিয়ে[illegible] তা তুলে ধরছি—Writers, artists, actors and dramatists of the Country ! [illegible] Endeavour to bring out the best in yourselves and dedicate the s[illegible] the benefit of the country.

তাঁর পার্টিজীবনের কথা খুব কম লোকই জানেন। আমার দুর্ভাগ্য কী সৌভা[illegible] না—সি পি আইয়ের জন্মকাল থেকে বেঁচে আছি। কে কী করেছে, না করেছে তার[illegible] হিসাব আছে। ১৯৪৮ সালে সি পি আইয়ের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে (১৯৪[illegible] অক্টোবরে) অবিভক্ত বাংলার শেষ যুক্ত প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডেকার্স লেনে[illegible] দপ্তরের ছাদে ম্যারাপ বেঁধে। পূর্ব পাকিস্তানের মণি সিং, খোকা রায়, কৃষ্ণবিনোদ রায়, [illegible] নাগ প্রমুখ যোগ দেন। কিন্তু নতুন যে কমিটি হল তা থেকে তাঁদের বাদ রাখা হল [illegible] তখন ভারত ভাগ হয়েছে। নতুন কমিটিতে যাঁদের নেওয়া হল তাঁরা হচ্ছেন সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, নৃপেন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি, রণেন সেন, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, মুজাফ্‌ফর আহমদ, আব্দুল হালিম, আব্দুর রেজ্জাক খান, আব্দুল্লা রসুল, বঙ্কিম মুখার্জি, মণিকুন্তলা সেন, জলি কল, মনসুর হবিবুল্লাহ,

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ। সম্পাদক নির্বাচিত হই আমি।

হীরেনবাবু সেই প্রথম পার্টি নেতৃত্বে যুক্ত হলেন। তার আগে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তার আগে তিনি ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটে (লেনিন) একটা বাড়ি নিয়ে রীতিমতো একটা জমজমাট আড্ডা বসিয়েছিলেন। সেখানে ড. ভূপেন দত্ত থেকে শুরু করে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্প ও কলারসিকরা নিয়মিত আসতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দেশ আক্রান্ত হল বা আক্রমণের মুখে এসে দাঁড়াল তিনি anti-fascist writers Conference গড়লেন। তার সভাপতি করলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এই ছিল হীরেনবাবুর সাংগঠনিক কায়দা—যাকে দিয়ে যতটুকু করানো যায় তাকে সেভাবে কাজে লাগাতেন।

হীরেনবাবু সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা যায়। ১৯৪৮-এ যখন পার্টি বেআইনি হল, তখন গোপনে পার্টি কেন্দ্র ও প্রকাশ্যে পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতেন হীরেনবাবু ও চিন্মোহন সেহানবীশ। এরকম একজন মনীষী কমিউনিস্ট প্রকাশ্য পার্টিকর্মীদের খবরাখবর গোপন কেন্দ্রে পৌঁছে দিতেন এবং গোপন কেন্দ্রের নির্দেশ তিনি প্রকাশ্যে কর্মরত কর্মীদের কাছে নিয়ে আসতেন। প্রকাশ্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন গোপাল হালদার, অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত প্রমুখ। এই যোগসূত্র রক্ষা কত কঠিন কাজ ছিল তা এখনকার কমরেডদের বোঝা সম্ভব নয়। তবে ঐ কঠিন কাজ নিষ্ঠা সহকারে করেছেন হীরেনবাবু। আর এই কাজের জন্য হীরেনবাবু ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং এগারো মাস প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। তিনি হেবিয়াস কর্পাসে ছাড়া পান। ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের জজরা মন্তব্য করেন—এত বড় একটা পণ্ডিত লোক ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকবেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা ওকে মুক্ত করার আদেশ দিচ্ছি।

১৯৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী হলেন হীরেন মুখার্জি। হীরেনবাবু সে সময় প্রকাশ্য জনসভায় যে ভাষণ দিতেন তাও ছিল রীতিমতো আকর্ষক। আরও কয়েকটা কথা বলি। হীরেনবাবু যতদিন দিল্লি ছিলেন তিনি বহু ইংরেজি বই লিখেছেন। তাঁর বই ছাপবার জন্য পিপলস্ পাবলিশিং হাউস উন্মুখ হয়ে থাকত। হীরেনবাবুর আশি বছর বয়সে নিউ এজ পত্রিকা সংবর্ধনা জানিয়ে লিখেছিল—কমরেড হীরেন বাবু আরো দীর্ঘজীবী হোন। এতে নিউ এজ তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হবে। তার মাত্র একটি বই উল্লেখ করছি রবীন্দ্রজীবনী—'Himself a True Poem'। এই বইটি পড়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বি ডি কেশকার বলেছিলেন—হীরেন মুখার্জির বই পড়েই আমরা রবীন্দ্রনাথকে জানতে ও চিনতে পারলাম। ষাটের দশকে অমল হোম সম্পাদিত Golden book of Tagore উদ্বোধন করেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই সভায় পণ্ডিতজীর অনুরোধে হীরেনবাবু রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো কবিতার ইংরেজি করে শোনান। তাঁর রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি সমবেত সবাইকে চমকে দিয়েছিল।

১৯৪৮-এ সি পি আইয়ের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পার্টির সাধারণ সম্পাদক লরেন্স সার্কি। তিনি গ্রেট বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করে বলেন—They all behaving like imperialists. হীরেনবাবু একটু

আবেগপ্রবণ। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন—We are contemplating the posterior of a party, known as. the CPGB. হীরেনবাবু ওই কথার অর্থ তখন অনেকেই বুঝতে পারেননি। আমিও পারিনি। পরে হীরেনবাবুকে বলি, 'আপনি যা বললেন তার মানে তো বুঝলাম না।' হীরেনবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'আসলে আমি সি. পি. আইকে, সি পি জি বি-র লেজুড় বলেছিলাম।' আমি বললাম, 'আপনি রজনীপাম দত্তের অবদান ভুলে গেলেন।' হীরেনবাবু বললেন, 'উত্তেজনার মাথায় ওসব বলে ফেলেছি।'

কেউ কেউ অভিযোগ করেন হীরেনবাবুর মতের স্থিরতা নেই। তিনি মার্শাল টিটো, মাও-সে-তুঙয়েরও ভক্ত ছিলেন। আমার বক্তব্য, তখন তো তাঁরা কমিউনিস্ট দুনিয়ায় খুবই সমাদৃত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সে সময় কমিউনিস্ট ও মুক্তিকামী মানুষদের কাছে নায়ক। অতএব হীরেনবাবু কি তার চাইতে বেশি তাঁদের সমাদর করেছেন? হীরেনবাবু কি কোনোদিনও ট্রটস্কির ভক্ত ছিলেন? কখনোই না। তাঁর জীবন মার্কসবাদ ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিল। যেদিন ওয়ারশ্ প্যাক্ট বাহিনী ১৯৬৮-তে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নেমে পড়ে, তখন ভারতের বহু কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যে তার নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হীরেনবাবুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করে বলেছিলেন—'সোভিয়েত তার ট্যাংক না নামালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হীরেনবাবুর অবস্থান সর্বদাই স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন।

৩

আমি একটানা তিন তিনবার এম পি (লোকসভার সদস্য) ছিলাম। সেই সুবাদে পার্লামেন্টে হীরেনবাবুর বাগ্মিতা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে পারি। ১৯৭০ সাল। তখন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সেই সংগ্রামের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন সর্দার শরণ সিং ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি একটা বক্তৃতায় বললেন, 'ওরা বাঙলাদেশি। আমাদের সঙ্গে বাঙলাদেশিদের পার্থক্য আছে।' তখন হীরেন মুখার্জি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছিলেন, They belong to our flesh, they belong to our flesh, they belong to our heart. We are the same people we call Punjabis--not east Punjabi or West Punjabis. We do not call them East Bengalees, West Bengalees—we are Bengalees. সেই ভাষণ সারা দেশে ঢেউ তুলল। কাগজে কাগজে ফলাও প্রচার পেল। দিল্লিতে বাঙলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা আহ্বায়ক সমিতির মিটিং ডাকা হল। বক্তা হীরেন মুখার্জি। সেন্ট্রাল পার্কে থিক থিক করছে লোক। হীরেনবাবু বললেন, সেদিন লোকসভায় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার কোনো উত্তেজনা নেই। তবে এটা ঠিক আমরা দু বাঙলার মানুষই বাঙালি।'

প্রসঙ্গত আরেকটা কথা বলি—লোকসভায় যেদিন হীরেনবাবু বক্তৃতা দিতেন সেদিন প্রেস গ্যালারি, ভিসিটর্স গ্যালারি ভর্তি হয়ে উপচে পড়ত। ইংরেজিতে ও-রকম ভাষণ জওহরলাল নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছাড়া আর কেউ দিতে পারেতেন না। তখন ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। হীরেনবাবু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী জনগণের লড়াইয়ের বিবরণ দিচ্ছিলেন। স্তব্ধ হয়ে হাউস শুনছিল, 'তোমরা জান

কিনা জানি না—অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাটির তলায় চলে যায়। সেখানে চলে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ। অস্ত্রনির্মাণ। ওদের শত চেষ্টা করেও মার্কিনরা হারাতে পারবে না। দেখে নিও ওরা জয়ী হবেই।' হীরেনবাবুর সে প্রত্যয় অভ্রান্ত ছিল—১৯৭৫-এ ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়। পর্যুদস্ত হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

ষাটের দশকের আরেকটা ঘটনা উল্লেখ করছি। তখন সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য সাংসদ ছিলেন। তিনি ছিলেন নৈহাটি ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ। সংস্কৃতে জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর এক গরিমা ছিল। একবার অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে চপলাকান্ত ও হীরেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হীরেনবাবুর সুললিত সংস্কৃতে উচ্চারণ সভাকে চমকে দেয়। মহারাষ্ট্রের এক সাংসদ এসে হীরেনবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—'আমাদের পরিবারে সংস্কৃতের চল আছে। খাটি সংস্কৃত আপনিই জানেন।'

আমরা পার্লামেন্টে যখন একসঙ্গে ছিলাম তখন হীরেনবাবুর সঙ্গে অতটা খাতির ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হীরেনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে হীরেনবাবুকে লিখতাম। উনি 'বন্ধুপ্রতীম রণেনবাবু' বলে সম্বোধন করে জবাব দিতেন ও এখনও দেন। যে সব জায়গায় তিনি আর আমি মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে যেতাম তিনি পরিচয় করিয়ে দিতেন, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কমরেড সেন তাঁদেরই একজন। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল একবার সিনেমা কর্মীদের এক সম্মেলনে। আমি তখন ভবানীপুরে থাকি। তিনি বি এম পি ইউ-র সভাপতি (এখনও আছেন)। সিনেমা কর্মীরা হীরেনবাবুকে বলেন, আপনি রণেনবাবুকে বক্তৃতা দিতে বলুন। তাঁর কথায় আমি তাঁদের সভায় এসেছিলাম। হীরেনবাবু যেভাবে আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করালেন আমি একটু সংকুচিত বোধ করছিলাম।

আজ হীরেনবাবু পার্টির কাজে ততটা সক্রিয় নন শারীরিক কারণেই। আমারও একই দশা। কিন্তু দুর্বল হাতেও তিনি শক্তভাবে লালঝাণ্ডা কিন্তু আঁকড়ে আছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মার্কসবাদী চিন্তনকে একসূত্রে বাঁধতে পেরেছেন। এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। পূর্বতন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচভের ওপর আমাদের পার্টির বিশ্বাস ছিল। প্রথম দিকে আমারও কিছুটা দ্বিধা ছিল। কিন্তু হীরেনবাবুর একদিন এক মুহূর্তের জন্য গর্বাচভের প্রতি মোহ ছিল না। গর্বাচভের হাতেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সি পি এস ইউ-র পতন ঘটল। অনেকেরই মোহভঙ্গ হল। আমিও বুঝলাম কী সর্বনাশ হয়ে গেল। এটা চোখে আঙুল দিয়ে সবার আগে দেখিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কয়েকবছর আগে—১৯৯৫-এ—ন্যাশানাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয় একখানি বই 'The Stalin legacy : Ivory 'flawed but Ivory Still' আমাকে উপহার দেন। তাতে স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন—বহুদিন বহু বিচিত্র সহচর সহকর্মী সুহৃৎ পার্টি বিভাগের বেদনায় গর্ভবতী প্রতিবিপ্লবের যন্ত্রণায় সব্যসাচী কমরেড রণেন সেনকে।

আমি মাঝে মাঝে বইয়ের ওই পাতাটা উল্টে ওই কথাগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিই। এক কমরেড আরেক কমরেডকে এর চেয়ে বড় উপহার আর কী দিতে পারে।

(পবিত্রকুমার সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচনাটি তৈরি করা হয়েছে।)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : এক প্রত্যয়ী পথিকের জীবনবৃত্ত

গৌতম নিয়োগী

আগামী নভেম্বর মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার জন্মাবধি সুহৃদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছিয়ানব্বই বছর পূর্ণ হবে এবং এমন একজন দীর্ঘায়ু মানুষের জীবনবৃত্ত স্বাভাবিক কারণেই সুদীর্ঘ, অন্তত একটি প্রবন্ধের পরিসরে সেই জীবনবৃত্ত রচনা করার দায়িত্ব পালন কঠিন, তবু কঠিন জেনেও সেই কাজে হাত দিতে সম্মত হয়েছি দুটি কারণে। একদিকে 'পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর স্বজনদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং অন্যদিকে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, স্নেহ ও প্রশ্রয়। অকৃপণভাবে ও দরাজ মনে সব সময়েই যে-কোনও জিজ্ঞাসায় তাঁর উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আমার কাছে সম্পদ। মনে পড়ছে, আমরা যারা তাঁর অনুরাগী ও গুণগ্রাহী তারা এই সুদীর্ঘকালেও সন্তুষ্ট নই এবং সে কথা ভেবেই, বিগত ৯৫তম জন্মজয়ন্তীতে, 'কালান্তর' পত্রিকায়, ২০০২-এর ২৩ নভেম্বর লিখেছিলাম এক গদ্য, যার শিরোনাম : " 'অল্পে সুখ নেই', হীরেন্দ্রনাথ শতায়ু হোন।" কিঞ্চিৎ ভাবাবেগ থাকলেও হয়তো কিছু প্রয়োজনীয় কথাও ছিলো, যে-কারণে, ঐ 'কালান্তর' দৈনিকের পৃষ্ঠাতেই ৩০ নভেম্বর—১ ডিসেম্বর এক লেখায় হীরেন্দ্রনাথ নিজেই আমার লেখাটির উল্লেখ করেছিলেন, 'ভালোবাসার অত্যাচারের' নিদর্শন হিসেবে। আজও, এই জীবনী লিখতে গিয়েও চাইব তিনি শতায়ু হোন, কারণ এমন মননের মধ্যে বেঁচে থাকা সর্ব অর্থেই বিরল। নিজের আত্মকথা হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'তরী হতে তীর' বইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত, যদিচ এটিকে আত্মজীবনী বলতে তিনি নারাজ, এটি 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত,' তবু আমি তা বাড়িয়ে ২০০৩ পর্যন্ত আনলাম, পরে না হয় ২০০৭ পর্যন্ত করা যাবে।

মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)-এর কাছে তালতলা অঞ্চলে এক বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারে, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লনলিনী মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ সন্তান হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর। ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য তাঁর জন্মগত; পাণ্ডিত্য, রসবোধ আর বিশুদ্ধি তাঁর সহজাত; তবে জীবনপথে অনেক স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের পর্যায়কে অতিক্রম ক'রে, প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ-পথ পার হয়ে আজও এক প্রত্যয়ী পথিক তিনি। এই দৃঢ় প্রত্যয়ে অবিচল আস্থা রাখার কারণে জাগতিক দুর্দশা আর চিত্তের নৈরাশ্যকে অপরাজেয় আশাবাদের আলোকে দূরে সরিয়ে রাখার দৃষ্টান্তে, নতুন চিন্তা-ভাবনায় মনকে এখানেও তীক্ষ্ণ ও সঞ্চরমান রাখার দীপ্তিতে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আজও দেদীপ্যমান। তাঁর জীবনবৃত্ত আমাদের মতন অজস্র মানুষকে প্রাণিত করেছে, করছে করবে।

আদি বাড়ি ছিলো উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে, মাতুলালয় হুগলি জেলার উত্তর-

পাড়ায়। পিতামহ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং মাতামহ রাধিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ-প্রফুল্লনলিনীর দশ পুত্রকন্যা। যথাক্রমে সোমেন্দ্রনাথ, মল্লিনাথ, রেণুকা, হীরেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, অমিয়নাথ, নীলিমা, শান্তিনাথ এবং বলেন্দ্রনাথ। সাত ভাই তিনবোনের মধ্যে চতুর্থ হীরেন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন পিতামহ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনিই কর্মজীবনে হালিশহর ছেড়ে কলকাতায় বাড়ি করেন মট লেন-এ, যে রাস্তার পরে নাম হয় 'ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট'। এখানে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। তাঁর নিজের ভাষায় 'কলকাতায় জন্মেছি, মানুষ হয়েছি'।

হ্যাঁ, মানুষ তো বটেই। মানুষের মতো মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক মেধাবী ছাত্র, জমকালো তাঁর রেজাল্ট, যার ফলে সহজেই বিলেত যাত্রা, অথচ উচ্চ শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে মামুলি আইনজীবীর অর্থ ও খ্যাতিলাভের পথে না গিয়ে অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ, উত্তরকালে যশস্বী অধ্যাপক, ১৯৩৬-তেই বেআইনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান, ক্রমে বামপন্থী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী এবং নেতা হয়ে ওঠা, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় অসাধারণ বাগ্মিতা অর্জন, স্বাধীন ভারতে লোকসভায় নির্বাচনে পর পর পাঁচবার বিজয়ী হওয়া এবং সাংসদ হিসেবে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ, অজস্র প্রবন্ধ ও বহু সুলিখিত গ্রন্থ রচনা (বাংলা-ইরেংজিতে) মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল থাকায় হীরেন্দ্রনাথ অনন্য। মেধা ও মননে তাঁর বিশিষ্ট আসন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে। তবে তিনি আদ্যন্ত কলকাতার। সেই পুরোনো কলকাতার এক নিজস্ব মেজাজে আঁকা ছবি দেখতে দেখতে আমরা মুগ্ধ হই 'তরী হত তীর' পড়তে পড়তে।

মট লেন হল ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, যে পত্রিকার নামে, তা একদা বের করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা। কেশবচন্দ্রের এক ভাই নরেন্দ্রনাথ সেন দীর্ঘদিন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাঁদের বাড়ি ঐ পাড়ায়। ঐ পাড়ায় আর এক বিখ্যাত মানুষ পূরণচাঁদ নাহার, যাঁর পূর্বপুরুষরা সিরাজউদ্দৌলার আমল থেকেই যথেষ্ট ধনী ছিলেন মুর্শিদাবাদে, অথচ কলকাতায় এসে তালতলায় এই জৈন পরিবারের পূরণচাঁদ ছিলেন যথার্থ সংস্কৃতিমান, তাঁর পুত্র উত্তরকালের কংগ্রেস নেতা বিজয়সিং নাহার। হীরেন্দ্রনাথের পিতা শচীন্দ্রনাথ ছিলেন কৃতবিদ্য। অল্পকাল শিক্ষকতা করলেও, আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও আজীবন সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা করে কাটিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' কাগজে যুক্ত ছিলেন, পরে 'ইন্ডিয়ান মিরর' কাগজেও।

বাবা শচীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ হীরেন্দ্রনাথের। আর মা-কে তাঁরা সব ভাই-বোন মিলে ডাকতেন 'মামী' বলে। আসলে তিন পিসতুতো দাদা ও এক দিদি তাঁদের মামিমাকে মামী ডাকতেন একই বাড়িতে থেকে, হীরেন্দ্রনাথও তাই। বাড়ির কর্ত্রী ঠাকুমা। তাঁকে সবাই 'মা' বলে ডাকে। ঠাকুরদা তিনকড়ির বিদ্বান বলে খ্যাতি ছিল। পাড়ায় তাঁরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। তবে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন পরিবেশে ব্রাহ্মণত্বের অহংকার ছিলো না। ছিলো পড়াশুনোর পরিবেশ। সে কথা স্মরণ করে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি

আমাদের বাড়ি বোঝাই বই—এমন ঘর ছিল না যেখানে বই থাকত না, এমন ফাঁকা কোণ ছিল না যেখানে বই আর কাগজের ডাঁই মিলে তাকে ভরাট করে রাখত না। নানান রকম পত্রিকা, দৈনিক থেকে মাসিক বা অন্যকিছু থাকত চারিদিকে—কিছু কাগজ যত্ন করে 'ফাইলে' বেঁধে রাখা, আর অজস্র কাটিং। সাংবাদিকতায় আমাদের উর্ধ্বতন দুই পুরুষ বহু বৎসর ডুবে ছিলেন বলে শুধু নয়—বইকে আপদ না ভেবে তার সম্পর্কে একরকম মায়া আর লেখাপড়ার আমেজ যেন বাড়ির আলোবাতাসে মিলিয়ে থাকত।"

তবে এই তো সব নয় বাড়িতে বাস করতেন অনেকেই। উড়িষ্যাবাসী বংশী ঠাকুর থেকে সপরিবারে বিহারের রামধারী; পাড়াতেও বাস ছিল মালকাজান নামে এক বিখ্যাত বাঈজি আর কয়েকঘর ফিরিঙ্গীর। শৈশব আর কৈশোর কাটিয়ে দেবার স্মৃতি নিজেই লিখেছেন তিনি সুতরাং বাড়তি কথা বাগাড়ম্বর হবে। কিন্তু দু'একটি কথা বলতেই হবে। যেমন মামা-বাড়ি উত্তরপাড়ার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মায়ের মামা-বাড়িও উত্তরপাড়াতেই। বড়ো মামা উত্তরপাড়ার লোক, থাকতেন মেদিনীপুরের তমলুকে, ওকালতি করতেন। তাঁরই পুত্রদ্বয় পরে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নামে স্ব-নামখ্যাত হয়েছেন। সম্পর্কে আর এক মামা ছিলেন উত্তরপাড়ার আর এক জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হীরেন্দ্রনাথের পিসির বাড়ি ছিলো টালা অঞ্চলে।

হীরেন্দ্রনাথের বাবা উনষাট বছর পূর্ণ হবার আগে মারা যান (১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে) মাকে হারান আরো পঁচিশ বছর পর ১৯৬৩-তে। ছোটবেলায় ছিলেন ঠাকুরমা আর ঠাকুরদার প্রিয় পাত্র। বাড়ির আবহাওয়ায় ধর্ম ছিলো, গোঁড়ামি ছিলো না। তাঁর উপনয়নও হয়েছিল এবং তাঁকে এসে ব্রতভিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ। বারো বছর বয়স থেকেই চোখে চশমা। বাড়ির কাছাকাছি যে দুটো স্কুলের সঙ্গে মুখোপাধ্যায় পরিবারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিলো, তা হলো শাঁখারিতলা পাড়ায় নেবুতলা স্ট্রিটে (= শশিভূষণ দে স্ট্রিট) নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ক্যালকাটা হাইস্কুল, যে স্কুলে হীরেন্দ্রনাথের পিতা কিছুদিন হেডমাস্টারি করেছেন আর ছিলো ডাক্তার লেনে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের তালতলা হাইস্কুল, যে স্কুলে হীরেন্দ্রনাথ ভর্তি হন ১৯১৫-তে, তখনকার 'সেভ্হেন্থ ক্লাসে' (= এখনকার ক্লাস ফোর)। এই স্কুলের শিক্ষক হরিপদবাবু, নিরাপদবাবু, হেডপণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, জিতেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখকে তাঁর মনে পড়ে পরিণত জীবনেও।

তালতলা স্কুলে পড়েছিলেন ১৯১৫ থেকে ১৯২১ এবং ১৯২২-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন। পাঁচটি বিষয়ে লেটার পেয়ে প্রথম ডিভিশনে পাস করলেন, দশ টাকা 'স্কলারশিপ'ও পেলেন। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "স্কুলে কিন্তু আমার দুর্নাম ছিল অঙ্ক পারি না। অথচ ইতিহাসের ক্লাসেই পরদিনের পড়া মুখস্থ হয়ে যায়। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়েও বেশ সড়গড়।" বিদ্যালয় জীবন থেকে সাহিত্য সংগীত আর খেলাধুলায় তাঁর অনুরাগ। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর হাতে-খড়ি হয়নি ঠিকই কিন্তু দেশের পরিবেশটাই তো যে-কোনও সচেতন ছাত্রকে তখন দেশাভিমানী করে তুলত। স্কুলেই তাঁর দুজন মুসলমান সহপাঠী ছিলো বলেই নয়, তালতলার স্কুলজীবন থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে তিনি সহজ হয়ে উঠতে পেয়েছিলেন চেতনার গুণেই।

আর একটি লেখার অংশ : "আমার যখন দশ বছর বয়স, তখন আমাদের বাড়ির খুব কাছে ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেসের অধিবেশন হয় (ডিসেম্বর ১৯১৭)। সভানেত্রী ছিলেন অ্যানি বেসান্ত। মনে আছে, মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে আসতে তাঁর দেরি হয়েছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে আনা হয়েছিল যে মিছিলে তা আমি দেখেছিলাম, আর কংগ্রেসের গেটের সামনে ভিড় থেকে চাক্ষুষ প্রথম দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে, চারিদিকে রব উঠল 'রবি ঠাকুর। রবি ঠাকুর'।"

তাঁর নিজের সাক্ষ্য অনুসারে '১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে আলোড়নের কথা খুব স্পষ্ট দাগ মনে কেটেছিল কিনা জানি না'। তবে 'গান্ধীজীর কল্যাণে মনের দিক থেকে নতুন দিগন্ত খুলে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল ১৯২০ সালে।' তাঁর বাড়ির কাছেই আবার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, ১৯২০-র সেপ্টেম্বর মাসে। সভাপতি লালা লাজপত রায়। যখন নাইনে পড়েন তখন বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু। ১৯২১-এ বিলেত থেকে ফিরেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র বসু। তবে সর্বোপরি ছিল 'গান্ধী জাদু'। যেমন রাজনীতি নয়, সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়েই মনের জানালা খুলে নিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। তাঁর দাদুর হাত ধরে 'বসুমতী' অফিসে যেতে যেতেই, বিদ্যালয় পর্বেই।

অসহযোগ হলো, গান্ধীজী তা প্রত্যাহারও করলেন অথচ স্বরাজ এলো না। তারই মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশনের পালা সেরে হীরেন্দ্রনাথ ঢুকলেন কলকাতার সেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে। বছরটা ১৯২২। তিনি কলেজে ঢুকেছিলেন ৭০০-র মধ্যে ৫৮৫ নম্বর পেয়ে তবে আই. এ (=ইন্টার মিডিয়েট অফ আর্টস্) পড়তে গিয়ে তাঁর যার সঙ্গে খুব ভাব হলো সে পনেরো টাকার জলপানি পেয়ে এসেছে। পেয়েছে ৭০০-র মধ্যে ৬০১, তাঁর নাম হুমায়ুন জহীরউদ্দীন কবির। পরে আরও অনেকের সঙ্গে, যেমন ঢাকা থেকে থেকে আসা পঞ্চানন চক্রবর্তী বা অরুণকুমার সেনের সঙ্গে ভাব হয়। আড্ডা চলত শচীন বসু মল্লিক, রবি গুপ্ত, তুষারকুমার রায় প্রমুখের সঙ্গে। প্রিন্সিপাল জন ব্যারো যাঁর সম্পর্কে সকলের একটা সমীহ করার ভাব ছিলো। সাহেব অধ্যাপকদের মধ্যে ইংরিজি পড়িয়েছেন অধ্যাপক স্টার্লিং। তবে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "সাহেবদের চেয়ে স্বদেশী অধ্যাপকদেরই তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম ডাক ছিল বেশি। ইতিহাসে কুরুভিলা জ্যাকারিয়া, দর্শনে আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভুদত্ত শাস্ত্রী, ইংরিজীতে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থনীতিতে জাহাঙ্গীর কয়াজী ও পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান বিভাগে সুবোধচন্দ্র ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—আরো বহু কৃতবিদ্য যাঁদের তালিকা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই ১৯২৪ সনে আই. এ। ১৯২৬-এ হিস্ট্রি অনার্স সহ বি. এ এবং ১৯২৮-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে যুক্ত থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ (ইতিহাস) পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন হীরেন্দ্রনাথ। এ বার সেই ছাত্রজীবনের কাহিনি অল্প-কথায় বলি। হীরেন্দ্রনাথ যাঁদের কাছে আই. এ ক্লাসে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে অল্প দিন হলেও ছিলেন কুরুভিলা জ্যাকারিয়া (ইতিহাস) আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় (লজিক), নীলমণি শাস্ত্রী, হরিহর

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সংস্কৃত) বীরেন্দ্রবিনোদ রায় (ইংরিজি) প্রমুখ অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াও নিশীথ ঘোষ, নন্দ কুণ্ডু, মৃগাঙ্ক চৌধুরীর মতো স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গেও আড্ডা চলত।

ঐ সময় হীরেন্দ্রনাথ নিরামিষাশী হয়েছিলেন। বছর পাঁচেক খদ্দরের জামা-কাপড় পড়তেন। হয়তো গান্ধীর প্রভাব কিন্তু বিড়ম্বনাও বাড়িতে কম হত না। বন্ধুরা দল বেঁধে মোহনবাগানের ফুটবল খেলা দেখতে যেতেন, যে অভ্যাস বহু পরেও বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মনে গান্ধীজী কতখানি প্রভাব ফেলেছিল, তা বোঝা যায় আমেরিকান পাদরি John Haynes Holmes-এর উক্তি খাতায় টুকে রাখার মধ্যে। তখন, ১৯২৩ কী ২৪ হবে, তাঁদের কলেজে যেদিন এলেন 'বিদ্রোহী' কবি নজরুল, তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে আপ্লুত হয়ে গেলেন হীরেন্দ্রনাথ।

আই. এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হলেন প্রথম। ইংরিজিতে তিনশোর মধ্যে দুশো পঁচিশ পেয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন তিনজন, হুমায়ুন কবির, পঞ্চানন চক্রবর্তী আর হীরেন্দ্রনাথ; ইতিহাস ও লজিকে হীরেন্দ্রনাথই প্রথম, সংস্কৃতে কলেজ সর্বোচ্চ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়। হীরেন্দ্রনাথের আরও দুই সতীর্থ ছিলেন আতাউর রহমান এবং শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আই. এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যে প্রথম হওয়ায় হরিশচন্দ্র কবিরত্ন 'প্রাইজ' পান; সেই টাকায় কেনা বইয়ের মধ্যে ছিলো প্রায় সদ্য-প্রকাশিত ইতিহাসবিদ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের লেখা Hindu Polity আর ম্যাকডনেল-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। এছাড়া পেয়েছিলেন ডাফ পদক, অন্য স্বর্ণপদক।

বি.এ-তে অনার্স নিলেন ইতিহাসে। আমরা চারযুগ পরে ইতিহাস পড়েছি তবু তাঁর ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে খ্যাতি অপরিম্লান দেখেছি। তিনি অবশ্য স্বভাবসুলভ বিনয়ে 'এ-আর কি, দ্রুত কণ্ঠস্থ করতে পারতাম, জায়গা বুঝে মোক্ষম উদ্ধৃতি দিতাম আর ইংরিজি লেখার হাত ভালো ছিলো' বলে হাসেন কিন্তু আমরা জানি তাঁর কৃতিত্বের কথা।

'নিজের প্রতি অবিচার করব না বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলব যে ইতিহাস বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ যথাসাধ্য মনে জেগেছিল', স্বীকারোক্তি তাঁর। নইলে এত বিষয় থাকতে 'হিস্ট্রি' কেন বেছে নেবেন। বি.এ অনার্স ক্লাসে তাঁদের পড়াতেন কুরুভিলা জ্যাকারিয়া। কেরল দেশীয় যে সিরিয়ান খ্রিস্টান পণ্ডিতের কথা অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের মুখে আমরা অনেক শুনেছি। আরও ছিলেন বিনয়কুমার সেন, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। চরিত্র মাধুর্যে ও পাণ্ডিত্যে সকলেই শ্রুতকীর্তি। তবে জ্যাকারিয়ার 'ভক্ত' বনে গিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। ইতিহাস ছাড়া অন্য বিষয়ের মধ্যে অর্থনীতিতে দুর্গাপতি চট্টরাজ, ইংরিজিতে প্রবাদ-প্রতিম প্রফুল্ল ঘোষ ও বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। মন কেড়ে নিয়েছিলেন প্রফুল্লবাবু আর অবশ্যই জ্যাকারিয়া যাঁর সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথের নৈবেদ্য : "আমাদের এই মৃদুবাক্ ঋজুচিত্ত অধ্যাপকের সান্নিধ্য আমার জীবনে এক মহার্ঘ অভিজ্ঞতা। এত ভালো ইংরিজী বলতে এবং লিখতে অন্য কোনো ভারতীয়কে আমি দেখেছি মনে হয় না। অতি অল্প যে কজন ভারতীয় অক্সফোর্ডে ইতিহাসে 'ফার্স্ট ক্লাস্' পেয়েছেন, তিনি তাদের অন্যতম।"

ইতিহাস অনার্স পরীক্ষা দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সি কলেজের

ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে শুধু ইতিহাস নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে গণিত সমেত সবকটা বিষয়ে যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে বহু-ঈপ্সিত 'ঈশান স্কলারশিপ' পেলেন তিনি। ইতিহাসের মতো বিষয়ের পক্ষে গণিত বা সংস্কৃতকে টেক্কা দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। পরে অবশ্য শুধু অনার্স সাবজেক্টগুলির মধ্যে এই বৃত্তি পাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়েও প্রবাদ-প্রতিম বিদ্বান হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বা উত্তরকালে শিপ্রা সরকার বা অশীন দাশগুপ্ত এমন গৌরব অর্জন করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিলেন শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

বি. এ পরীক্ষায় শুধু ঈশান বৃত্তি নয়, বর্ধমান স্কলারশিপ, ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ (স্বর্ণপদকসহ) পান তিনি। ১৯২৬-এ বি. এ পাস করে ইতিহাসে এম. এ পড়া শুরু করলেন। এম. এ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (১৯২৮ খ্রি.)। বলার মতো হলো আটটি পেপারে প্রতিটি পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া। এম. এ ক্লাস হত ইউনিভার্সিটির দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে তবে 'টিউটোরিয়াল' হত কলেজে। বলতে ভুলে গেছি, ঈশান বৃত্তির টাকা পেয়েছিলেন চারশো আশি, তাতে অনেক বই কিনেও বেড়াবার টাকা ছিলো। বন্ধু হুমায়ুন কবিরকে সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যা ভ্রমণের অনেক গল্প তাঁর মুখে শুনেছি, তার মধ্যে নাম গোপন করে হুমায়ুন কবিরের পুরীর মন্দির দর্শনের গল্পও। পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপকদের মধ্যে পেলেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র রায়, আই জে এস তারপুরওয়ালা, কালিদাস নাগ, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খুব অল্প সময়ের জন্য সদ্য বিলেতফেরত সুশোভনচন্দ্র সরকারকে। এঁদের কথা বিস্তারিত লিখতে গেলে রচনার আয়তন বেড়ে যাবে তাই বিরত থাকলাম।

১৯২৭ সনেই প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিনিধিরূপে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পান। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচিত সেক্রেটারি (১৯২৬-২৭); কলেজ 'ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক (১৯২৭-২৮), যে পত্রিকায় তিনটি ইংরিজি ও একটি বাংলা অনুবাদ ছাড়া ম্যাগাজিন সম্পাদকরূপে তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ হলো হীরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা।

এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক, পুস্তক পারিতোষিক ইত্যাদি তো পেয়েছিলেন, পেলেন ১৯২৮-২৯-এ বাংলা সরকারের 'স্টেট স্কলারশিপ'। পড়তে যান ইংল্যান্ডে। হীরেন্দ্রনাথ রওনা হন ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, যাকে বলে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা। সেবার স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড যান তাঁর আরও এক সতীর্থ হুমায়ুন কবির। এখানে একটা কথা বলে নিই—এম. এ পাশ করার পর হাতে কিছুদিন সময় ছিলো। সেই ফাঁকে দু-জন অনার্স ছাত্রকে মাস তিনেক পড়িয়ে কিছু রোজগারও করে নিয়েছিলেন। এই দুজনের একজনকে সবাই চেনেন। উত্তরকালে মারাঠা ইতিহাসের একজন অগ্রণী গবেষক ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। এম. এ পাস করে বিদেশ যাওয়ার আগে মনে লেগেছে দেশাত্মবোধের ঢেউ আর মন জুড়ে বসেছেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি তাঁর কাছে 'নিত্যস্মরণীয়'। তাঁদের সময়কার পোস্ট গ্রাজুয়েট দর্শনের ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গেও তাঁর গভীর সখ্যতা জন্মায়। আবার বিলেত যাওয়ার আগেই তাঁর বাবা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে রওনা হবার আগেই দেখেছেন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন; আবার শুনেছেন বিলেতের কমিউনিস্ট নেতা সাপুরজী সাকলাতওয়ালার বক্তৃতা।

অক্সফোর্ডে হীরেন্দ্রনাথ পড়তেন সেন্ট ক্যাথারিন্স কলেজে; সেখানে Honour School of History পরীক্ষা দিলেন ১৯৩১-এর জুন মাসে। ফল বেরুতে দেখা গেল এই প্রথম জীবনে 'ফার্স্ট' ক্লাস অল্পের জন্য ফস্‌কে গেছে। Lincoln's Inn থেকে ব্যারিস্টারিও পাস করলেন। বৃত্তি থাকতে থাকতে খুব তাড়াতাড়ি D. Phil ডিগ্রি পাওয়ার আশায় কাজ শুরু করলেন গবেষণার। বিষয় ঠিক হলো : English Constitutional History and Political Ideas from the Death of Oliver Cromwell to the Fall of Clarendon (1659-1667)। তত্ত্বাবধায়ক G.N.Clark, তাছাড়া পরে থিসিস তদারকি করেন কীথ ফিলিং। আর হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন আর এক গবেষক মরিস অ্যাশলি। হীরেন্দ্রনাথ সাহায্য পেলেন ডেভিড অগ-এর। অক্সফোর্ডে নিউ কলেজে তখন ছিলেন ইউরোপের ইতিহাসের নামকরা লেখক হার্বার্ট ফিশার। গবেষণার থিসিস আশানুরূপ ভালো করতে গেলে যতটা সময় দেওয়া দরকার মেধাবী হীরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তা না পাওয়াতে, তাঁর থিসিস 'বি-লিট'-এর উপযুক্ত ঘোষিত হলো। ফলে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি আর জীবনে অর্জিত হলো না। দেশে ফিরে আসতে হলো। তাতে অবশ্য তাঁর উত্তরকালের খ্যাতির কোনও হেরফের হয়নি।

ইংল্যান্ড-প্রবাসের সুন্দর বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। লিখেছেন তাঁর নানা ভ্রমণের কথা, ইংল্যান্ডে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তাদের কথা। অক্সফোর্ড-এর মজলিস্, নানা পণ্ডিতজন ও বাগ্মীর কথা। তবে বিশেষভাবে মনে গেথে যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের কথা, যে গুণী মানুষের বন্ধুত্ব তিনি আজীবন স্মরণ রেখেছেন। কিংবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অক্সফোর্ড গিয়ে সুবিখ্যাত হিবার্ট লেকচর্ দেওয়ার কথা। দেশে তখন আইন-অমান্য আন্দোলন তুঙ্গে।

তাঁর মন জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষ, সেখানকার ঘটনা। আর সমাজসত্য অনুধাবনে এবং সমাজব্যবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তি পেলেন বামপন্থী সাহিত্য থেকে। প্রবাসেই তাঁর মার্ক্সবাদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমাদের তৎকালীন আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল এই যে তারা ভিন্ন সেদেশে আর কেউ ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অকুণ্ঠ সমর্থক ছিল না। অন্য কোনো গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ ঐ বর্ণচেতনার দেশে আমাদের মতো কৃষ্ণাঙ্গকে একেবারে সহজ ও স্বচ্ছ মনে সৌহার্দ্য দিতে প্রস্তুত ছিল বলেও মনে হয় না।" বিস্তারিত কথায় যাবো না শুধু জানাই বিলেত পর্বেই তাঁর যেমন বন্ধুত্ব হয় সজ্জাদ জহীর-এর মতন সজ্জনদের সঙ্গে, যাঁরা ছিলেন CPGB-র সঙ্গে যুক্ত। তেমনি লেখা পড়তেন রজনীপাম দত্তের Labour Monthly-তে। আর দেশে ফিরে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু বইপত্র।

শেষের দিকে সরকারি বৃত্তির টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। নিজের-পয়সায় খুবই কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে, তবে পান বিড়ি কেন বিখ্যাত বিলিতি হুইস্কি পর্যন্ত যিনি পান করেন না, তাঁর আর কষ্ট কীসের। শুধু বইয়ের দোকানেই যা অল্প-স্বল্প ধার। বিলিতি জামা-কাপড় জুতো কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তবু তিনি যে সব নিয়ে এসেছিলেন জাহাজে তার মধ্যে কয়েকটি মহামান্য ইংরেজ বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করে নেয়। বিলেত থাকতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দার্শনিকপ্রবর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের। তাঁরই আগ্রহে তখন প্রায় সদ্য-স্থাপিত ওয়ালটেয়ারের আন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকপদ গ্রহণে সম্মত হন হীরেন্দ্রনাথ।

আন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পড়াতেন ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি। তবে ওয়ালটেয়ারের জীবন খুব বেশিদিনের নয়। তিনি লিখেছেন 'ওয়ালটেয়ারে বসে চিঠি পেলাম ম্যাকিলন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির কাছ থেকে যে আমার গ্রন্থরাজি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তবে কিনা মহামান্য সরকারের হুকুমে চারখানা বই আটকানো হয়েছে। যেগুলি এই 'নেটিভ্' দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে। যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে ছিল *The Condition of India* বলে এক প্রামাণিক বামপন্থী সংকলন। লেনিনের একটা জীবনী (গ্রন্থকারের নাম মনে নেই), *Brusski : A Peasant Novel* (রুশ লেখকের নাম মনে পড়ছে না) আর সম্ভবত *India Under British terror* নামে কমুনিস্ট পার্টি সংগৃহীত কতকগুলো তথ্য।' যার মধ্যে ছিল ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর এবং পেশাওয়ারে মুক্তিসংগ্রাম দমন বিষয়ক বহু তথ্য। রুষ্ট হয়ে তিনি একটি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন বিলেতের *New Statesman and Nation*-এ। তা ছাপা হওয়াতে সরকারপক্ষের রোষ উদ্রেক চাকরিক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করলেও তখনকার উপাচার্য রাধাকৃষ্ণানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আর ব্যক্তিগত প্রভাব হীরেন্দ্রনাথকে সে যাত্রায় রক্ষা করে।

তবে, আগেই লিখেছি, দীর্ঘদিন সেখানে চাকরি না করে ১৯৩৫-এর শেষাশেষি ওয়ালটেয়ারের পাট চুকিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতায় চলে এলেন, জিনিসপত্র বলতে প্রধানত বই। ব্যারিস্টারের সনদটাকে ঝালিয়ে নেওয়াতে মন সায় দেয়নি। ফলে বার লাইব্রেরির সদস্য হলেও শেষপর্যন্ত রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। বিভাগীয় প্রধান কিন্তু মাইনে তেমন কিছু নয়। তবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলতেই যে তাঁর নামের আগে 'অধ্যাপক' শব্দটি সকলেই ব্যবহার করেন, সেই অভিধা তখন থেকেই। কলেজে পড়িয়েছিলেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত। এই পর্বের কথাই বলি আগে, তবে রাজনৈতিক জীবন যথাস্থানে আলাদাভাবে উল্লেখ করব।

রিপন কলেজে সহকর্মী হিসেবে পেলেন স্বনামখ্যাত বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অজিত দত্ত, হামফ্রে হাউস, ভবতোষ দত্ত ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে—তাঁর মনে পড়ে যায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর বিজ্ঞাপনে 'অষ্টবক্র সম্মেলন'-এর কথা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ঐ কলেজের কর্ণধার। হীরেন্দ্রনাথকে পছন্দ করতেন রাষ্ট্রগুরুর পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। লোকসভায় ক্রমাগত নির্বাচিত হওয়াতে তাঁর অধ্যাপনা জীবনে ছেদ পড়ে। এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজেই তাঁর

প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, উত্তরকালের মন্ত্রী ও হাইকোর্টের চিফ্ জাস্টিস। আর ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত পড়িয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও।

যাই হোক রাজনৈতিক ও অন্যান্য কর্মব্যাপৃতি সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ ভাষণ দেবার জন্য আহূত হয়েছেন, যেমন কলকাতা (একাধিকবার), পাটনা, কাশী হিন্দু বিদ্যাপীঠ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, কাশ্মীর, ওসমানিয়া, পুনে, ইন্দোর, মারাঠাওয়াড়া (আওরঙ্গাবাদ) কেরল, ব্যাঙ্গালোর রবীন্দ্রভারতী, নাগার্জুন প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বিদেশের বিদ্যায়তন থেকে আমন্ত্রিত হয়েও যেতে হয়েছে। যেমন, ১৯৬৬ সনে ক্যানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬৭-তে বার্লিনে, মস্কো ও লেনিনগ্রাদে (একাধিকবার)। বুলগেরিয়াতে, উজবেকিস্তানে (১৯৭৪) ইত্যাদি।

১৯৩৯-এর ৩ জুন ময়মনসিংহ জেলার হেমনগর নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কিরণবালা দেবীর কন্যা শ্রীমতী বিভা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। সেই সম্পর্ক অদ্যাপি বিদ্যমান। এই লেখা যখন তৈরি করছি তার কয়েকদিন পরেই তাঁর ৬৪তম বিবাহবার্ষিকী হবে। ১৯৪১-এ কন্যা রিণির জন্ম, ১৯৪৫-এ পুত্র অভিজিৎ (লামা)-এর জন্ম। স্থানাভাবের কথা চিন্তা করে কর্মজীবন বা ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশদ বলা না গেলেও বলতে হবে যে অধ্যাপনায় আসার পরেও বেশ কিছুদিন 'বার'-এর সদস্য হিসেবে আইনের জগতেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ১৯৫২-পরবর্তী জীবন আরও পরে। আগে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আনুষ্ঠানিক প্রবেশ এবং ১৯৫২ পর্যন্ত পার্টি-জীবন বলে নেওয়া দরকার।

স্বাধীনতা হীনতায় যেমন মানুষ বাঁচতে চায় না, তাই কামনা করে স্বাধীনতা, তেমনি সে চায় সমাজের সর্ববিধ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। কোন্ পথে? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। হীরেন্দ্রনাথ বেছে নিলেন বামপন্থা, সমাজতন্ত্র, মার্ক্সীয় আদর্শ; বিলেত প্রবাসেই অল্প অল্প, দেশে ফিরে প্রবলভাবে। তিনি অবশ্য দেশে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। তাঁর নিজের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি :

"পার্টিকে পুরোপুরি ওদেশে মানতে পারিনি; তার সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও রাখিনি—কিন্তু মনের মধ্যে গোপনে দানা বেঁধে উঠেছিল কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে প্রত্যয় এবং তারই অপরিহার্য আনুষঙ্গিকরূপে পার্টি আনুগত্যের ঔচিত্য। বেশ কিছুদিন অবশ্য মনে হয়েছে যে কম্যুনিস্টদের ধরন-ধারণে কেমন যেন একটা বেয়াড়াপনা—আশ্চর্য কী এতে যখন শোষক সমাজের রীতিনীতি ভেঙে চুরে দেওয়াই তাদের কামনা। যাই হোক বিদেশে বাসকালে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ যা ঘটেছিল, তারই ক্রমান্বিত প্রয়াস আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশে আমার চলতে থাকল। ছাত্রের মতো মার্ক্সবাদ নিয়ে পড়াশুনা তখন করে চলেছি, খাতার পর খাতা 'নোট'-এ ভরিয়েছি Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, Bukharin, Radek, Ryazanov, Lozovsky, Preobraözhensky, Luckas, R Palme Dutt প্রভৃতির রচনা থেকে।"

বিলেতে তাঁর বন্ধু সজ্জাদ জহীর (বন্নে)-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন CPGB-তে, তেমন কিছু

নয়। কলকাতায় বন্ধু অকালপ্রয়াত দর্শনশাস্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মনু ছেড়ে মার্ক্স ধরেছেন এবং তাঁর নিজের "চোখ ক্রমশ খুলছিল"।

হীরেন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছিলেন যে জওয়াহরলাল নেহরুর *Whither India?* শীর্ষক রচনা বোধহয় ১৯৩৩-এ প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজবাদ সম্পর্কে আগ্রহ শিক্ষিত মহলে ব্যাপকভাবে উদ্রিক্ত হতে থাকে। এটি আরও বেড়ে যায় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির (প্রতিষ্ঠা১৯৩৪) অন্যতম নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৩৫/৩৬ নাগাদ Why Socialism লেখার পর। আমাদের বাঙালি সমাজেও তখন মার্ক্সবাদ, রুশবিপ্লব বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেখা বই বেরুচ্ছে বাংলাভাষাতেও[১]

১৯৩৬-এর কথা স্মরণ করে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "কমুনিজম তখন আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, ভারতবর্ষে জন্মে যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই যে বিশ্ববীক্ষার তৃষ্ণা মনে জাগে তাকে তুষ্ট করবার শক্তি কমুনিজম্ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও নেই এই প্রত্যয় চিন্তায় তখন প্রোথিত, কিন্তু তখন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।" সেদিনের বেআইনি কমুনিস্ট পার্টি তাঁর সন্ধান জানত এবং যোগাযোগ স্থাপনেও বিলম্ব হলো না। ১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসে 'সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলন'-এ সভাপতিত্ব করার আহ্বান এলো; সভায় হাজির সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। ১৯৩৬-এ আলাপ হলো মুজফ্ফর আহমদ-এর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬-এর মাঝামাঝি প্রিয়বন্ধু সজ্জাদ জহীরই তাঁকে নিয়ে গেলেন কলকাতার টালিগঞ্জে এক এঁদোপুকুরের ধারে মেটে ঘরে, সেখানেই আলাপ হলো পার্টির সেক্রেটারি পূরণচাঁদ যোশীর সঙ্গে। তখনই মনস্থির পার্টিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে। এজন্য যোশীর ব্যক্তিত্ব যে একটি প্রধান কারণ তা তিনি নিজেই বলেছেন। প্রত্যয়ী পথিকের জীবন নতুন বাঁক্ নিলো।

পার্টি সদস্য হওয়ার পর ছাত্র আন্দোলন, সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে সংগঠন, কিছু পরিমাণে ট্রেড ইউনিয়ন। পার্টিনীতির প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন। আর বাংলা ও ইংরিজিতে নানা ধরনের পত্র পত্রিকায় অজস্র লেখা। পরে বই লেখা এবং দু'ভাষাতেই বহু স্থানে বহু বক্তৃতা তখন থেকে চলছে। ক্রমে যোগাযোগ সোমনাথ লাহিড়ী, আবদুল হালিম, কমল সরকার, বঙ্কিম মুখার্জী, বেরতী বর্মণ, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আবদুল মোমিন, ভবানী সেন, রণেন সেন, নৃপেন চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে। পার্টির পক্ষ থেকেই ও নির্দেশে তৎকালীন 'Popular Front' নীতি অনুসারে কংগ্রেসে যোগদান (১৯৩৬)। সেই সূত্রে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে সক্রিয় হওয়ার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বঙ্গীয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৩৭, নৃপেন চক্রবর্তী, শিবনাথ ব্যানার্জী, গুণদা মজুমদার সহ), ১৯৩৮-এ অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এ আই সি সি) সদস্যরূপে নির্বাচিত (হরিপুরা, ত্রিপুরী, ১৯৩৮, ১৯৩৯)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য (১৯৩৮-৩৯)।

১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সমসাময়িক ওই শহরে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, সভাপতি মুন্সি প্রেমচাঁদ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হীরেন্দ্রনাথ। ১৯৪০-এ নাগপুরে "All India Students' Conference"-এর সভাপতি। ১৯৪০ ও ১৯৪১ সনে গ্রেফ্তারবরণ ও পরে মুক্তিলাভ। পরে ১৯৪৮ ও ১৯৪৯-এ বিনা বিচারে সাতমাস কারাবন্দি। ছাত্র সম্মেলনে

ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন। তাঁর লেখকজীবন আলাদা আলোচনা করব। এখানে শুধু উল্লেখ করছি যে ১৯৪৩-এ তাঁর প্রথম বাংলা বই 'ভারতবর্ষ ও মার্কর্সবাদ' প্রকাশিত, ইংরেজিতে তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছিল *An Introduction to Sociolism* ১৯৩৮-এ।

কম্যুনিস্ট পার্টিতে ১৯৪৭-৫১ পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। পার্টির প্রথম কংগ্রেস (বোম্বাই ১৯৪৩) থেকে প্রায় প্রতিটি কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৪১-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘ বা 'Friends of the Soviet Union' (১৯৪১) বা চীন-ভারত মৈত্রী সংস্থার (১৯৪৯) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৩-এ বোম্বাইতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা (I.P.T.A) গঠিত হলো, সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ। শান্তি আন্দোলনে নিয়ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সর্বভারতীয় সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘের যুগ্ম সম্পাদক (১৯৪১, ১৯৪৪)। পার্টির উদ্যোগে এবং সমুচিত ক্ষেত্রে পার্টি বহির্ভূত প্রগতি প্রয়াসীদের মধ্যে সর্বভারতীয় পরিচিত ও সম্মাননার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৪০ থেকেই বন্ধুত্ব জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, ভূপেশ গুপ্ত এই ত্রয়ী আইনজ্ঞ কমরেডের সঙ্গে। ঘুরে বেড়াতেন বাংলা ও ভারতের নানা জেলায়, শহরে, গ্রামে—কতো যে গ্রুপ মিটিং থেকে বড়ো সভা করেছেন ইয়ত্তা নেই। ১৯৩৮-এ পিতা শচীন্দ্রনাথকে হারালেন,তবে তাঁর ভাষায় 'স্রোত চলে সূর্য জ্বলে'—জীবনের প্রবাহ আবার স্বাভাবিক খাতে বয়ে চলল।

সর্ববিধ প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও পার্টি-নির্দেশিত পথ তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তাঁর কথায় "কিন্তু জোর করে সঙ্গে সঙ্গে বলব যে কমুনিস্ট মতবাদ—না বলব জীবনদর্শন, বিশ্ববীক্ষা?—গ্রহণ ব্যাপারে আমার মনে কোথাও খাদ থাকেনি।" বক্তৃতা, আলোচনা এবং লেখা এই তিনটি হাতিয়ারই অবশ্য তাঁর হাতে মানিয়েছে বেশি। তবে তাঁর জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে আছে এক ঔদার্যবোধ, সহনশীলতা, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। এটা কি বিপ্লবী চরিত্রের দাঢ্য অর্জনে অসামর্থ্য? নিন্দুকরা বলবেন হ্যাঁ, আমরা বলব না। সমস্ত পরিচয়ের উর্ধ্বে আমরা কি মানুষ পরিচয়ে চিহ্নিত নই? এ কারণে গান্ধী বা জওয়াহরলালকে, সুভাষচন্দ্র বা বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন হীরেন্দ্রনাথের মতন কম সাম্যবাদীই পেরেছেন।

১৯৪০-এর রামগড় অধিবেশনের পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সি. পি. আই সদস্যদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হীরেন্দ্রনাথেরও। ১৯৪৫-এর শেষদিকে তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগও করেন। তবে কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিমুখিতা, বামপন্থীদের ভেদাভেদ, মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বার্থান্ধ নীতি সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই তীব্র হয়। জাতীয় ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামে দেশ উত্তাল হয়। যুদ্ধোত্তর গণজাগরণের পর ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়। এর মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের কাজ করে গেছেন। আর পি. সি. যোশীর যুগে পার্টি 'সুখী পরিবার' ছিলো। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোশীর উত্তরাধিকারী

বি. টি. রণদিভে এই 'সুখী পরিবার'-এর বদলে 'বিপ্লবী সংগঠন' গড়তে গিয়ে আবার এক বাঁকের মুখে সকলকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। 'পার্টি অফিসে রোজ একবার অন্তত হাজিরা না দিতে পারলে তখন যেন ভাত হজম হত না', জানান হীরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁর আত্মকথা 'তরী হতে তীর' ১৯৪৭-এর পরে এগোয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত জীবন সেখানে পাই।

কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন তো তার পরেও কম নয়, বরং এক অর্থে বেশি। সাংসদ হীরেন্দ্রনাথই তো সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তাই তাঁর অন্যবিধ জীবনকথা লেখার আগে এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গটি শেষ করে নেওয়া দরকার, পাঠক-পাঠিকাদের কথা মাথায় রেখে।

আমাদের আক্ষেপ কিছু থাকবেই যে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের কলমে 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত' হিসেবে 'তরী হতে তীর'-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখলেন না। তাই ঐ পর্বে আমাদেরই প্রবেশ করতে হবে কুণ্ঠা আর সংশয় নিয়ে। তবে সে-কাজ করার আগে অন্য কিছু কিছু বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রত্যয়ী পাঠকের জীবনবৃত্ত জানতে গেলে লেখক হীরেন্দ্রনাথ, সাংবাদিক হীরেন্দ্রনাথ, অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃতিকর্মী হীরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি কয়েকটি প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে হলেও বলে নিলে ভালো।

লেখক হীরেন্দ্রনাথ সব্যসাচী। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি লিখে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। লিখেছেন বেশ কিছু বই। প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ কেমন তার পরিচয় জীবনী লিখতে গিয়ে দেওয়া না গেলেও বলা দরকার যে বহু প্রবন্ধই উত্তরকালে গ্রন্থাকারে দুই মলাটের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর বাংলা বইয়ের সংখ্যা কুড়ি ('পরিচয়' পত্রিকায় বর্তমান সংখ্যায় স্বতন্ত্র গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য)। প্রথম বাংলা বই বেরিয়েছিল ১৯৪৩-এ কলকাতার সমবায় প্রকাশনী থেকে, নাম 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ'। শেষ বাংলা বই বেরিয়েছে এ বছর ২০০৩ সনে, নাম 'আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে', প্রকাশ করেছেন অনুষ্টুপ প্রকাশনী। বেশ কিছু বই হীরেন্দ্রনাথের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ও উপহার দেওয়া আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে সম্পদের মতো।

তাঁর প্রথম ইংরেজি বই *'An Introduction to Socialism'* প্রকাশ করে কলকাতা থেকে ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৩৮। সেই থেকে *'India's Ordeal'* (২০০১-এ প্রকাশিত) পর্যন্ত পঁচিশখানি ইংরেজি বই তাঁর বেরিয়েছে। ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কুতুব মহল, পিপলস্ পাবলিশিং হাউস, মনীষা গ্রন্থালয়, এলাইড পাবলিশার্স, স্টার্লিং পাবলিশার্স, বিকাশ পাবলিশিং, বসুমতী কর্পোরেশন, ভিশন বুকস্, জেইকো, মিত্র ও ঘোষ প্রমুখ প্রকাশকগণ তাঁর ইংরেজি বই প্রকাশ করেছেন।

শুধু বই নয়, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই অনেক পুস্তিকা লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ। বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁর বাগ্মিতা শুধু যে বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রবাদ-প্রতিম তাই নয়, তাঁর বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিদগ্ধ ভাষণ পুস্তিকার আকারে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। বহু বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন ওসমানিয়া পুনে ইত্যাদি) বা সারস্বত প্রতিষ্ঠান (যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি বা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার) এ-কাজে এগিয়ে এসেছেন। আর ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব পুস্তিকা বা পার্টি সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির (যেমন 'সোভিয়েত মৈত্রীসংঘ', ইসকাস ইত্যাদি) উল্লেখ তো বাহুল্যমাত্র।

সংসদে (১৯৫২-৭৭) বহুবিধ বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরকালে ও আলোচনায় অংশগ্রহণের বিবরণে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য বস্তু রয়েছে। আকাশবাণীতে প্রদত্ত বেশ কিছু ভাষণকে স্মরণীয় বলা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে নানা পত্র-পত্রিকায়, আর বহু গ্রন্থের বিশেষ মুখবন্ধে কিংবা প্রবন্ধসংগ্রহে দৃষ্টান্তস্বরূপ গান্ধী-বিষয়ক রাধাকৃষ্ণান-সম্পাদিত গ্রন্থে (১৯৪৯) যে সব মূল্যবান রচনা ছড়িয়ে রয়েছে, তার উদ্ধার করার কাজ এখনও শেষ হয়নি। লেখক স্বয়ং নিজের লেখা সুবিন্যস্ত করে রাখার তাগিদ অনুভব করেননি বা নানা ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ও অসুবিধায় এ কাজ হয়নি, ফলে তাঁর প্রবন্ধের সম্পূর্ণ তালিকা করার কাজও অসম্পূর্ণ।

বাংলা ও ইংরেজি বই, পুস্তিকা এবং অজস্র প্রবন্ধ ছাড়াও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও ইংরেজিতে সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছু বই। কখনও কখনও সুযোগ্য সুহৃদ্‌বর্গের সহযোগে। ১৯৩৭-এ এ ধরনের প্রথম সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, যিনি ছিলেন বাংলায় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক। প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে আমরা একটু পরেই দৃষ্টি দেব। যাই হোক ১৯৪৪-এ সুরেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু এক আশ্চর্য প্রতিভাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "কয়েক বৎসর নিত্য সাহচর্যের মধ্য দিয়ে জেনেছি তাঁর ক্ষুরধার মেধা, অসামান্য জ্ঞানান্বেষা, মার্কসবাদকে ভারতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল আগ্রহ, পরম সাহিত্যানুরাগ এবং সমাজ বিপ্লবকল্পে ক্লান্তিহীন বক্তৃতা ও রচনায় কৃতিত্বের কথা।" এই বইতে শুধু প্রগতি লেখক সংঘ নয়, হীরেন্দ্রনাথেরও সাহিত্য ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ভূমিকা ছাড়াও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আঁদ্রে জিদ্‌, ই. এম ফর্স্টার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কার্ল মার্কস, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিভা বসু, টি. এস. এলিয়ট, মানিক, বিভূতি বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, অরুণ মিত্র প্রমুখ দেশ-বিদেশের নানা ব্যক্তির লেখা ছিল। বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই শুধু উল্লেখ করব যে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, তিনি পড়ে মতামত দিয়েছিলেন। আর ১৯৪০-এ বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় বেরুলো 'আধুনিক বাংলা কবিতা', যে বইটি সম্পর্কে সংস্কৃতিমান বাঙালি পাঠকদের নতুন করে বলার নেই।

বলার কথা মাত্র দুটি। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র মতন সংকলন আগে হয়নি। এই বইটিও উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। দুটি আলাদা আলাদা ভূমিকা লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ এবং আইয়ুব। দ্বিতীয় কথা সুখের। সম্প্রতি বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন দে'জ পাবলিশিং। এছাড়া উল্লেখ করতে চাই যে বাংলা ও ইরেজি আরও বেশ কয়েকটি বই সম্পাদনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ। কখনও তাঁর সহযোগী গোপাল হালদার, কখনও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য।

যে সূত্রটির উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানব তা হলো শুধু বাংলা ও ইংরেজিতে বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা, সম্পাদনা করা এসব নয়। হীরেন্দ্রনাথ একজন সিরিয়াস পুস্তক সমালোচকও বটে, যিনি একাধারে রসজ্ঞ ও পণ্ডিত। জীবনবৃত্ত লিখতে গিয়ে তার বিস্তারিত আলোচনা

নিষ্প্রয়োজন। তবু স্বতন্ত্রভাবে বলতেই হবে অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথের কথা। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর অনুবাদক শুধু এটুকু তথ্য জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, কেন তিনি অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ বই বা বইয়ের অংশ, তাও বোঝা দরকার। এর মধ্যেও তাঁর সাহিত্যভাবনার পরিচয় পাই। একদিকে তাঁর অনুবাদে বাংলায় পেয়েছি মার্কস ও স্তালিনের লেখা, অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় উঠে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'-এর মতন উপনাস বা 'তারিণী মাঝি'র মতো গল্প, আর অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য। কী অনায়াস দক্ষতায় তিনি তর্জমা করেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'দুই পাখি', 'যেতে নাহি দিব', 'ব্রাহ্মণ', 'দুঃসময়' বা 'দেবতার গ্রাস' ভাবতে অবাক লাগে।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কের নিবিড়তা একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই ; এই পত্রিকাতেই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি এঙ্গেলস্-এর 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থের সমালোচনা লিখেই তাঁর প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার সূচনা। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক সেই থেকে অদ্যাবধি তেমনই ঘনিষ্ঠ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আগেই তাঁর পূর্ণ যৌবনে কতো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ তা ভাবলে অবাক হতে হয়—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, নীরেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যামিনী রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হিরণকুমার সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সজ্জাদ জহীর, হামফ্রে হাউস, সাহেদ সোহরাবর্দী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কে নয়? হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যত প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন তার মধ্যে সিংহভাগ জুড়ে আছে 'পরিচয়'।

'পরিচয়'-এর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের যোগ অত্যন্ত কাছের, তেমনি প্রগতি লেখক আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেরও কাছের মানুষ হীরেন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে অল্প কথায় কিছু বলা দরকার। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে একদিকে বিশ্বে-ধনতান্ত্রিক শিবিরে সঙ্কট ও অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব যেমন বিশ্বকে প্রভাবিত করছিল, তেমনি নানা দেশে চলছিল ঔপনিবেশিকতার ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। আর ছিল রুশ বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রের ভাবনার প্রসার। কবি-সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরাও ক্রমে জড়ো হচ্ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। বিশ্বে যেমন নেতৃত্ব দেন আঁরি বারবুস, রোম্যা রলাঁ, ম্যাকসিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স, আঁদ্রে জিদ্; তেমনি ইয়োরোপ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মনেও দোলা লাগলো। সময়ের দাবি অনুযায়ী মানবতাবাদী শিল্পী সাহিতিকরা গড়ে তোলেন প্রগতি লেখক সংঘ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মুলুকরাজ আনন্দ, জহীর, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, ভবানী ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। লন্ডনেই তাঁরা ভারতে এক প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতীয় ছাত্ররা দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৬-এ যুক্ত প্রদেশের লক্ষ্নৌ শহরে পণ্ডিত

জওয়াহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ১০ এপ্রিল প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা সমবেত হন। প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ', সভাপতি হন মুন্সি প্রেমচাঁদ। সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর। হীরেন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উদ্যোগে কলকাতায় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর বঙ্গীয় শাখার একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ বছরই ২৫ জুন কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে যে শোকসভা হয়, সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় 'নিখিলবঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ'। যার পৃষ্ঠপোষক হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিশেষ উদ্যোগী সদস্য হীরেন্দ্রনাথ। যেমন ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সর্বভারতীয় সংঘ যেমন Towards Progressive Literature নামে সংকলন বার করে যাতে লেখেন অনেকের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথও, তেমনি ১৯৩৭-এ ২০/১ হায়াৎ খাঁ লেন-এর বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের দপ্তর থেকে 'প্রগতি' নামে সংকলন গ্রন্থ বেরুলো, যুগ্ম সম্পাদনা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর।

১৯৩৮-এ কলকাতায় হলো প্রগতি লেখক সম্মেলন, তার আগেই ঢাকায় এক শাখা স্থাপিত হয়েছে। এরপর একদিকে ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদের প্রসার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পশ্চিমী গণতন্ত্রের সংকট অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল স্রোত, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই চলছে। এরই মধ্যে ১৯৪০-এর শেষে কলকাতায় গঠিত হলো 'সোভিয়েত মৈত্রী সংঘ' বা Friends of Soviet Union—যার উদ্যোক্তা হীরেন্দ্রনাথ, বিলেত প্রত্যাগত জ্যোতি বসু, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, গোপাল হালদার প্রমুখ। প্রগতি লেখক সংঘের নাম বদলে হলো 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। শেষে ১৯৪৫-এ আবার নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ নামই ফিরে আসে। এরই মধ্যে ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা Indian Peoples Theatre Association। সব কিছুতেই হীরেন্দ্রনাথ। বিস্তারিত লিখতে গেলে সাতকাহন হয়ে যাবে। তাছাড়া অনেকের লেখায় সে যুগের এক চমৎকার ছবিও পাওয়া যাবে। স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও কিছু কিছু লিখেছেন। আমরা বরং ১৯৪৭-পরবর্তী জীবনকথা বলে যাই। যে পর্ব বিস্তারিত কোথাও লেখা হয়নি, এমনকী সদ্য প্রকাশিত 'শঙ্কা সংকট প্রত্যয়' বইতেও নয়।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৮ ও ১৯৪৯-এ বিনা বিচারে সাত মাস কারাবন্দি ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সদস্য হন ১৯৪৭-এ। দেশভাগের মধ্য দিয়ে খণ্ডিত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হয় 'Milistones on Road to Freedom'। বেলেঘাটায় অনশনরত গান্ধীজির সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। ১৯৪৮-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বি টি রণদিভের নেতৃত্বে পার্টিনীতির

আমূল পরিবর্তন হয়, নেতৃত্বের বদল ঘটে এবং পার্টিও বেআইনি ঘোষিত হয়। সারা দেশে বহু পার্টি নেতা ও কর্মীর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথও গ্রেফতার হন। ১৯৪৯-এ কারামুক্তি। ওই বছর ১ অক্টোবর চীনে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ভারতে 'চীন-ভারত মৈত্রী সমিতি' গঠিত হয়, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হীরেন্দ্রনাথ। ১৯৫০-এ সি পি আই-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

অমৃতসর শহরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে (১৯৫৮) জাতীয় পরিষদ বা ন্যাশানাল কাউন্সিল-এর সদস্য নির্বাচিত এবং ছিলেন ১৯৬৮ পর্যন্ত। সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৫২-তে। কলকাতা উত্তর-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি পি আই প্রার্থী হিসেবে কাস্তে ধানের শিষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন হীরেন্দ্রনাথ। উপর্যুপরি পাঁচবার নির্বাচনে জিতেছেন (১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭২)। ছিলেন লোকসভায় পার্টির সহকারী নেতা (১৯৫২-৬৪) এবং নেতা (১৯৬৪-৬৭)। ইতোমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন হয় (১৯৬৪), হীরেন্দ্রনাথ সি পি আই-তে থেকে যান, যদিও নতুন গঠিত সি পি আই (এম)-এর সদস্যরা তাঁর প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। ১৯৭৭-এ সংসদীয় নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে তৎকালীন জনতা পার্টির প্রার্থী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের কাছে পরাজিত হন। তারপর থেকে পার্টিতে কোনও সাংগঠনিক পদাধিকারী না হয়েও দলের নানাবিধ কর্মে আজও ব্যাপৃত। সি পি আইতে পার্টি প্রবীণ ('Veteran') বলে স্বীকৃত, শ্রদ্ধেয় ও আমন্ত্রিত ; ১৯৮৭-এ মস্কোতে সোভিয়েট ইউনিয়নের ৭০তম বার্ষিকীতে পার্টি প্রতিনিধিরূপে যোগদান।

সাংসদ হিসেবে হীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন। সরকার পক্ষ তাঁর মত ও ভাষণ মন দিয়ে শুনতেন। লোকসভায় Privileges, Business Advisory House, Subordinate Legislation, Library, Office of profit, ভারতীয় ভাষান্তরীকরণ ইত্যাদি কমিটির সদস্য। ১৯৫৫-৫৭ সনে প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষা প্যানেল-সদস্য; উভয় কক্ষের Public Accounts Commitee-তে চারবার নির্বাচিত, ১৯৭৫-৭৭-এ সভাপতি। সংসদের প্রতিনিধিরূপে কাশ্মীর (১৯৫৭), নাগাল্যান্ড (১৯৬৫) ইত্যাদি সংকটাক্রান্ত অঞ্চলে গমন; সেইভাবে Emotional Integration Committee (সভাপতি সম্পূর্ণানন্দ), Small News Papers Committee (সভাপতি দিবাকর), Committee on the three Acadamies (সভাপতি খোসলা) ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে কাজ করা ও রিপোর্টে Minute of Dissent দেওয়া; প্রায় চৌদ্দ বছর সংসদের প্রতিনিধিরূপে All India Council of Sprots-এর সদস্য; ১৯৬২-তে National Integration Council-এর সদস্য; গান্ধী, জওয়াহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষা কমিটির কার্যকরী সদস্য; নেহেরু স্মারক নিধির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'ট্রাস্টি' বা অছি; পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে ক্যানবেরায় (অস্ট্রেলিয়া) Commonwealth Parliamentary Conference-এ প্রতিনিধি (১৯৫৮); International Parliamentary Union-এর সভায় সংসদের প্রতিনিধি; yaounde (Cameroons), West Africa (মে ১৯৭২); তেমনই IPU-এর অধিবেশন (Rome, September, 1972) ; বিশ্বভারতী সংসদে

লোকসভার প্রতিনিধি (১৯৬৭-৭৭) ; লোকসভার অধ্যক্ষ K.S. Hegde কর্তৃক ১৯৭৮-এ Bureau of Parliamentary Studies and Training এবং Parliament Library বিষয়ে Honarrary Advisor রূপে নিযুক্ত, ১৯৮২-তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রত্যেকটি দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনীত হওয়াতে সমস্ত সংসদীয় পদ ত্যাগ করেন হীরেন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

১৯৫৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট'-এর সদস্য হন হীরেন্দ্রনাথ, ছিলেন ১৯৬১ পর্যন্ত। ১৯৫২ থেকে আর্কিওলজিকাল সারভে অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন হীরেন্দ্রনাথ, ছিলেন ১৯৭৫ পর্যন্ত। ১৯৫৪-তে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি দলের প্রতিনিধি তথা সহকারী নেতা হয়ে প্রথমবার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করেন। এখানে বলা যেতে পারে যে ছাত্রাবস্থায় ইয়োরোপে পাঁচ বছর থাকলেও এবং সে বারে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং যাত্রাপথে মিশর ও মাল্টদ্বীপ দেখলেও, ১৯৪৩-এ সোভিয়েত দেশে আমন্ত্রণ পেয়েও যেতে পারেননি, ১৯৫১-তেও রাশিয়া ও চীনে আমন্ত্রণ পেয়েও পাশপোর্ট না থাকায় যাওয়া হয়নি। ১৯৫৪-র পর অবশ্য বহুবার সোভিয়েত দেশে গেছেন। '৫৪ সনে সোভিয়েত দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আফগানিস্তানে কয়েকদিন কাটান। পার্টির প্রতিনিধি হয়ে ১৯৬৫-এ মঙ্গোলিয়ার চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসবে সস্ত্রীক যোগদান। '৫৮ তে অস্ট্রেলিয়া গমনকালে ইন্দোনেশিয়া ও প্রত্যাবর্তনের সময় সিঙ্গাপুর। বিভিন্ন সময়ে নিমন্ত্রিত হয়ে জি ডি আর, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়াতে একাধিকবার যাওয়া। সাইবেরিয়া থেকে তাজিকিস্তান, লাটভিয়া থেকে জর্জিয়া ইত্যাদি সোভিয়েতের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। গেছেন লেবানন, ইতালি, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, লিবিয়া। শেষ বিদেশযাত্রা ১৯৮৭-তে সোভিয়েত রাশিয়াতে।

জীবনে অজস্র সম্মান পেয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, আন্ধ্র, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক D. Litt পেয়েছেন। আরও মনে পড়ে, কল্যাণী, বর্ধমান, যাদবপুর, ও কলকাতা বিশ্বি দ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণ দানের জন্য আহুত হন তিনি (১৯৮৫-১৯৯৫)। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পেয়েছেন পদ্মভূষণ (১৯৯০) এবং পদ্মবিভূষণ (১৯৯১)। পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৯২)। কলকাতার মুসলিম সংস্কৃতি সংঘের পক্ষ থেকে 'মওলানা আজাদ পুরস্কার' (১৯৯৪)। সোভিয়েত বিপ্লবের ষাটবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মস্কোস্থিত VOKS-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মৈত্রী পুরস্কার। ১৯৭৭-এ হীরেন্দ্রনাথ সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পান। এছাড়া পেয়েছেন Epic Victory বইয়ের জন্য ১৯৪১-৪৫-এর যুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে ভালো ইংরেজি বই হিসেবে সোভিয়েত পুরস্কার। বুলগেরিয়া থেকে দিমিত্রভ পুরস্কার।

১৯৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে গণমাধ্যম কেন্দ্রের সভাপতি পদে নিয়োগ করে। ১৯৯৫-তে পশ্চিমবাংলার বিধানসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক Bureau of Parliamentary Studies -এর Honarary Chairnan নিযুক্ত হন। সংবর্ধিত হয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাংলা আকাদেমি, শরৎ সমিতি, সাহিত্যতীর্থ, দক্ষিণদেশ, তালতলা লাইব্রেরি, রঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ

ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৯৫-এ নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর সভাপতি পদে পঞ্চাশ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকার সম্মানে সম্বর্ধিত (এপ্রিল ১৯৯৫)। ১৯৯৯-এ পেয়েছেন নজরুল পুরস্কার। ১৯৮৪-তে দিল্লির বাস তুলে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁকে আজও সক্রিয় দেখি 'সপ্তপর্ণী'র ফ্ল্যাটে। যতদূর জানি, অরুণ মিত্র, অশোক মিত্র, বিষ্ণু দে থেকে অমিতাভ দাশগুপ্ত, সত্যব্রত দত্ত পর্যন্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বই উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ভূমিকা সম্বলিত বই তো কতই। এই বছরে ২০০৩-এ অধ্যাপক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থেও তাঁর মূল্যবান সম্পাদনা রয়েছে। আসলে এক প্রত্যয়ী পথিক হিসেবে সাধারণ মানুষের বুকভরা ভালোবাসাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

HNM—আমি যতটুকু জেনেছি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রিপন কলেজে এচ্. এন্. এম্‌কে—অর্থাৎ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যখন প্রথম দেখি, তখন আমি তাঁর গভীরতর ব্যক্তিত্বের কোনো সংবাদই জানতাম না। তখন আমরা সবে কৈশোর পেরিয়ে যুবকত্বে পৌঁছতে চলেছি। এই সেই সময় যখন বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল বহু জিজ্ঞাসাচিহ্নের অনিবার্যতায় দীপ্র হয়ে ওঠে। সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, সরোজ আচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চারের দশকের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বাত্যা বিক্ষোভের দিনে তরুণ কিশলয়দের সংক্রান্তির গাজনবেলার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা নতুন প্রজন্ম তাঁদের কাছে থেকেই গ্রহণ করেছিল ইতিহাস বীক্ষণের ও দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতা ব্যাখ্যার প্রথম পাঠ। আমি হীরেন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ করেছিলাম রিপন কলেজের তৃতীয় বর্ষের পাঠকক্ষে। তিনি পাঠকক্ষে প্রবেশের সঙ্গে দণ্ডায়মান সমস্ত ছাত্রদের ইতিপূর্বের অনর্গল বাক্যস্রোত মুহূর্তে স্তব্ধ। আমি তাকিয়ে দেখলাম দীর্ঘ পরিশীলিত বৈদগ্ধ্য আর সমাসন্ন প্রৌঢ়িমার মিশ্রণে সে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাকিয়ে দেখলাম শ্রেণীকক্ষ সেদিন তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত ছাত্রকে জায়গা করে দিয়েছে সানন্দে—অন্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা এসেছে এচ্ এন্. এম-এর বক্তৃতা শুনতে। আমি বলেছি 'চাক্ষুষ করেছিলাম'—সত্যই তাই—হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হয়েছিল। তাঁর এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে হীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অন্যতম মাত্রার পরিচয় পেলাম। সকলেরই মনে আছে শ্রদ্ধেয় আইয়ুব ও শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় দুজনে দুটি পৃথক ভূমিকা লিখেছিলেন। দুজনের প্রেক্ষণ বিন্দুতে ব্যবধান ছিল প্রত্যাশিত, বাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু দুজনের পরোক্ষ মিলটুকুও লক্ষণীয়। আর, দেখা গেল মার্কসবাদী দৃষ্টিতেই তিনি আধুনিক কবিতার জটিলতারও চরিত্র নির্ণয় করেন চমৎকার। এই ব্যক্তিই তো তরী ও তীরের রূপকে জীবনকে দেখতে চাইছেন। চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিই জীবনকে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

স্মরণে আসবে শ্রীগোপাল হালদারের বইটিরও নাম অনুষঙ্গে ('রূপনারায়ণের কূলে') 'তরী হতে তীর'-এর মতো নদীস্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্মরণে আসবে দুটি গ্রন্থের নামকরণে রবীন্দ্রপ্রভাব প্রোজ্জ্বল। নদী চলিষ্ণুতার প্রতীক—চেতনার ক্রমরূপান্তরের সঙ্গে নদীর কোথায় একটা আত্মীয়তা আছে। তাই এই দু'জন পরিণতপ্রাজ্ঞ মনস্বী—যাঁদের কাছে বাংলাদেশের কয়েক প্রজন্মের যুবকেরা নতুন সমাজবোধে দীক্ষা নিয়েছে—তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ অতীতের কথা বলতে গিয়ে নদীকেই প্রতীক করলেন নামকরণে।

'তরী হতে তীরে' এই গ্রন্থটির নামকরণের আরেকটি তাৎপর্যও স্পষ্ট হয় বইটি পড়তে পড়তে। তীর তরী থেকে যে পার্সপেক্টিভ পায়, সেটা লেখকের বর্ণনীয় বিষয়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে যে দিনগুলি ছিল নানা প্রশ্নে—সংশয়ে—উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, তার এক প্রত্যক্ষ ছবি পাওয়া

যায় এ বইয়ের বহুলাংশে—সেই পরিবর্তমান বাংলাদেশেই লেখকের অভিযাত্রী তরণীর তটভূমি।' প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি দিনগুলিতে দাদুর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতার বুকে নানা রসের ভোজ্য আস্বাদনও এই বইয়ে নিছক স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হয়নি—সেও হয়ে উঠেছে বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী সুখস্বর্গের শেষ আলোকরশ্মির হিসাব নিকাশ। নিজের কথার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে কতটা আমি পালটে গেছি। পাঁচশত তিরিশ পাতার এই বড়ো বইটিতে তিন দশকের বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক আলেখ্য অঙ্কনই ছিল লেখকের লক্ষ্য—সে তাগিদেই বইটি লেখা। 'মহানগর' পত্রিকায় 'তরী হতে তীর'-এর আলোচনাকালে আমি যা লিখেছিলাম তা এবারে একটু আবার বলছি—পুনরাবৃত্তিদোষ মার্জনীয়।

তিনি দেদীপ্যমান বা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিলেন। আই. এ. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম হয়ে হরিশচন্দ্র কবিরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্তি, পরে ঈশান স্কলার হীরেন্দ্রনাথ এতকাল ছিলেন ছাত্রদের কাছে সারস্বত সাধনার মূর্ত পুরুষ। তিনি যখন তাঁর আচার্যদের কথা বলেন তখন তা তো শুধু তৎকালীন বাংলার বিদ্যাজগতের বুধমণ্ডলীর বিবরণই হয় না, তা হয়ে ওঠে একটি সংকল্পবান প্রতিশ্রুতিশীল যুবকের হয়ে ওঠারও বিবরণ। স্মৃতির বৈভবে তাঁর প্রজন্মটাই ধন্য। আজ আমাদেরও ভাবতে ভাল লাগে যখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন বেরুলো রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী', যা নিয়ে পরে বুদ্ধদেব বসু কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর স্নাতক পর্যায়ের স্মৃতিকথাটি এই বইয়ের মূল্যবান অংশ। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেনও এই অংশটা সানুপুঙ্খ বিশ্বস্ততায়। মনে হয় তিনিও যেন লিখতে লিখতে নতুন করে সেই জীবনটা আরেকবার যাপন করেছেন। সাংস্কৃতিক আকাশে তখনও রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব রংরেজিনীর বর্ণাঢ্য সমারোহ ছড়াচ্ছেন—ভাবনায়, চেতনায় জায়মান তখন আধুনিক বাঙালির একাল। হীরেন্দ্রনাথ অচিরে দ্রষ্টা থেকে উত্তীর্ণ হবেন অন্যতম কুশীলবদের একজনে। শান্ত বিনয়ে তিনি সে পর্ব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিলাত প্রবাস, ব্যারিস্টারি, অধ্যাপনার নানা অধ্যায় পড়তে পড়তে কিন্তু আমরা কখনই এক নস্টাল্‌জিয়াকোমল বৃদ্ধকে প্রত্যক্ষ করি না। বরঞ্চ পাই এক সপ্ততি অতিক্রান্ত যুবককে, যাঁরও 'জরা কেশাগ্রে স্তব্ধ', যিনি দূর থেকে দেখেছেন নিজেরই কর্মময় অতীতকে—সমালোচনা নিজেকে করতেও ছাড়েন নি। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবার আশঙ্কা নিয়ে পার্টিদরদী নারায়ণবাবুর ছবি বাঁধিয়ে রেখে দেবার মতো রসিকতায়ও তিনি হাসতেই জানেন। সুবোধ ঘোষ সংক্রান্ত উক্তির বিষয়ে তাঁর আত্মসমালোচনা স্মরণীয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘোঁট মণ্ডল, কংগ্রেস সোসালিস্টদের বিচিত্র বামপন্থা—ইতিবৃত্তের ভঙ্গিতে অম্লকটু ভাষ্য সমেত রীতিমতো উপভোগ্য—এমনকী সেই জয়প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরিত লেনিনীয় ব্যঙ্গের ঝালমেশানো টেলিগ্রামটিও।

একথা তো ঠিকই যে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা। এবং একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, গণনাট্য সংঘ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ ও পরে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগ পর্বে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছিলেন পুরোধাদের একজন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা

এবং বাংলার বাইরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সহযোগীর সান্নিধ্য গড়ে উঠেছে। সে তালিকায় সুরেন্দ্র গোস্বামী যেমন আছেন, সজ্জাদ জহীরও তেমনি আছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন আছেন, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও তেমনি আছেন। আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যাঁরা নেতা,—এমনকী সে কর্মকাণ্ডের নেপথ্যেও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কারো কথাই প্রায় বাদ যায়নি। এইসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে আমরা অনেক বৃহৎ ব্যক্তির লঘু মুহূর্তের দেখা পাই যাতে তাদের বৃহত্বের হানি ঘটে না কিন্তু মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণানের কথা এখানে উল্লেখ্য।

যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় সিডনি লী একবার বলেছিলেন যে, "ট্রুথফুল ট্রান্সমিশন অব পারসোন্যালিটি" জীবনী রচনার প্রধান কথা। সে বিচার এ গ্রন্থে অতুলনীয়। গভীর জীবনপ্রীতি, সকৌতুক দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের মত ও সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেও তিনি তাঁর সহৃদয় প্রীতি সকল দিকে বিস্তারিত করে দিতে পেরেছিলেন। তিরিশের দশকের উৎকণ্ঠা চঞ্চল বাংলাদেশের একটি দলিলগ্রন্থ হয়েও বইটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি মনোজ্ঞ সৃষ্টি। এ সূত্রে আলাদা করে উল্লেখযোগ্য তাঁর ভাষা। সে ভাষা পরিচ্ছন্ন, ভাবালুতাবিহীন, ঋজু অথচ তা বেদনায় গাঢ় হতে জানে। প্রসঙ্গত বিশেষ করে মনে পড়ছে, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার দিনগুলির কথা। গ্রন্থমধ্যে জওহরলাল নেহেরু, রাধাকৃষ্ণন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের স্মরণীয় নানা রাজনৈতিক নেতা, কবি, শিল্পীর যে লেখচিত্র রয়েছে তা একই সঙ্গে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য। এমনকী তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তখনও তিনি তাঁর ঋজু সৌজন্যকে পরিহার করেননি।

তাঁর সৌজন্য তাঁর পরিশীলিত বৈদগ্ধ্যের ও মানসিক আভিজাত্যের বিভা। দুটি শোনা গল্প এখানে বলছি। তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ চলছিল নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তু-সংলগ্ন জমিতে দাঁড়িয়ে। কথা প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের সূত্র ধরে বিষ্ণু দে ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা উঠল। স্মিত প্রসন্নমুখে তারাশঙ্কর এই দুজনের সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতির কথা বল..ন। হীরেন্দ্রনাথকে—সুভদ্র সুজন সম্ভব উদার রসগ্রাহিতার .ন্য তারাশঙ্কর যে একটা বিশেষ মূল্য দিতেন, তা তাঁর কথা থেকে উপলব্ধি করেছিলাম। দ্বিতীয় গল্পটি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম। বাবা ছিলেন রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের একজন অফিসার। তাঁর অব্যবহিত ওপরওয়ালা ছিলেন ইংলন্ড থেকে আগত এক আহেলা সাহেব। সেই সাহেব দিল্লি গিয়েছিলেন সম্ভবত রেলওয়ে বোর্ডের আহ্বানে। ফিরে এসে তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বি. কে. (বাবার নাম বিজয়কুমার) হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সম্বন্ধে কী জান? বাবা আমার কাছে থেকে স্যারের বিষয়ে যেটুকু শুনেছিলেন তা বলে দিলেন। শেষে এটুকুও বললেন, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় পার্লামেন্টে কম্যুনিস্ট ব্লকের নেতা। সাহেব একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে এক কম্পার্টমেন্টে ফিরলাম—এরকম পারফেক্ট জেন্টলম্যান সচরাচর দেখা যায় না।

অসামান্য তাঁর বাগ্মিতা। সে অনেকদিন আগে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অধ্যাপক কবির সাহেবের এক তর্কযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। বিষয়

ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও পরিণাম। সমন্বয় সাধক ছিলেন যতদূর মনে পড়ছে বিজ্ঞান বিভাগের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। আমরা ছাত্ররা শুনতে গিয়েছিলাম স্যারের ইংরাজি। দীর্ঘকাল হয়ে গেল সে বক্তৃতার কথা আমার আজও মনে আছে। বিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল সে ভাষণ। ক্ষুরধার যুক্তি, উপযুক্ত তথ্য, কখনো ঈষৎ ব্যঙ্গরস, কখনো তর্কের সুনিপুণ অসিচালনায় দীপ্ত—আর সর্বোপরি অনর্গলিত সুনির্বাচিত বাক্যবিন্যাস। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সেদিন যেন বাণীকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এর কিছুকাল পরে আটচল্লিশ সাল নাগাদ স্যারের সঙ্গে সন্নিহিত হবার আবার একটা সুযোগ পেলাম। 'আবার একটা' এই শব্দবন্ধের একটি তাৎপর্য আছে। রিপন কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র যখন আমি স্যারের কাছে অভিনন্দিত ও তিরস্কৃত হবার মতো দুটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলাম। 'পরিচয়'-এ গত সংখ্যায় 'ধূলির আখর'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে কথা আমি বলেছি। এখানে তা আবার বললে পুনরুক্তি দোষ হবে। কিন্তু একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়। ময়দানে আহূত হয়েছে পার্টির কেন্দ্রীয় সমাবেশ। নানা দিক থেকে মিছিলের পর মিছিল আসছে। আমি নৈহাটির ছাত্র মিছিলের সঙ্গে গেছি। সমাবেশে ঢোকবার মুখে দেখি একপাশে পূরণচাঁদ জোশি ও স্যার নিভৃত আলাপচারিতে মগ্ন। স্যারের চোখ আমার উপর পড়ামাত্র আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে স্যারকে লাল সেলাম জানালাম। স্যার সহাস্যে এক লহমাও দেরি না করে প্রত্যভিবাদন জানালেন। যে সৌজন্য প্রসঙ্গে এসব কথাগুলো বলছি—এ সেই অভিজাত সৌজন্য যা অকিঞ্চিৎকরকেও উপেক্ষা করে না। এখন আটচল্লিশ সালের অভিজ্ঞতার কথাটি বলছি—কংগ্রেস সরকার তাদের বর্বর গরিষ্ঠতার জোরে বিধানসভায় পাশ করাতে চাইছে 'কালা কানুন'—বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা চাইছে তারা। তার প্রতিবাদে দিকে দিকে ধিক্কার মিছিল, জনসভা সংগঠিত হচ্ছে। নৈহাটির জনসভায় প্রধান বক্তা স্যার। নৈহাটির গোপাল বসু সভাপতি। আমিও একজন বক্তা। গোপাল বসু বললেন—কংগ্রেস শ্রমিক-শ্রেণীকে বলছে, দাবিদাওয়ার আন্দোলন বন্ধ রাখো, আপাতত শুধু ঘাম ঝরাও, তোমাদের পাওনাগণ্ডার কথা আমরা সময়মতো ভাববো। গোপাল বসু সহসা রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, এ যেন আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মতো বাসিয়ো। এই আচমকা উদ্ধৃতির ধাক্কায় সুগম্ভীর স্যার সশব্দে হেসে উঠলেন। আমার মনে হল এই ব্যক্তির কাছে অসঙ্কোচে এগিয়ে যাওয়া যায়। গেলামও। স্যারকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে এলাম। নৈহাটি স্টেশনের একনম্বর প্লাটফর্মে নৈহাটি লোকাল ছাড়তে তখন দেরি আছে। ওই ট্রেনটি বেছেছিলাম এই কারণে যে সন্ধ্যার ট্রেন—ডাউন ট্রেন—নৈহাটি থেকেই ছাড়বে—স্যার স্বচ্ছন্দে বসে যেতে পারবেন। গাড়ির দেরি আছে। জনবিরল প্ল্যাটফর্মের একদিকে ঘাসজমির উপর একখানি বেঞ্চ। স্যারকে বসালাম। তিনি আমাকেও নির্দেশ দিলেন, তুমিও বোস। আমি তখন ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। আমার পড়াশোনা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। গল্পে গল্পে কথাপ্রসঙ্গে আমি জানালাম একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরি ক্রিস্টোফার কডওয়েলের ইল্যুশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটির কিছু অংশের উল্লেখ করে আমাদের বইটি পড়তে বললেন। এ সংবাদে স্যার খুব আনন্দিত হলেন। ওদিকে গাড়ি এসে গেল।

স্যারের সঙ্গে এরপর আর আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার হয়নি। কিন্তু স্যারকে জানাও

আমার ফুরোয়নি। বরং বলা যায় তাঁকে চেনা ও জানা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকল এরপর থেকেই। তিনি চলিষ্ণু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আজও মানসিক অবধানতায় তিনি সচল—বহতা নদীতে কখনো শ্যাওলা পড়ে না। আমি আমার সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু তাঁকে বুঝেছি—তিনি যেমন সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে তৎপর, তেমনি তাঁর হৃদয়ের দরজা খোলা আছে সব কিছুর জন্য। তাঁর মধ্যে যে চৈতন্যবিন্দুতে মিলিত হয়েছে মার্কস এঙ্গেলস্-এর তত্ত্বদীপ্ত, রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ এবং বিষ্ণু দের মহানদীকল্প প্রতিমুহূর্তের সমুদ্র অভীপ্সা—সে চৈতন্যবিন্দু অবিভাজ্য। অর্জিত বিদ্যা ও বিশ্ববোধের সমাহারে উপলব্ধ সে চৈতন্য মানবিক কোনো কিছুকেই অস্বীকার করে না। যে বিশ্ববীক্ষা তাঁর সেই চৈতন্যবিন্দুর দান সে বিশ্ববীক্ষা আমাদের জানায়—'বিশ্ববীক্ষা প্রকৃত কর্মীকে বিশ্ববিরাজী করবে না তার পা থাকবে শক্ত মাটির উপর, আর সেই মাটির নীচে গভীর খাতে বয়ে চলবে জীবনের জল, দেশবাসীর শত ত্রুটি সত্ত্বেও তার মনে হবে—We are members of one another, মানবঘৃণা জাতিবৈরী, আত্মম্ভরিতা থেকে সে দূরে থাকবে। যে পথবাসী, যে গৃহহারা, সে গতিহীন হতে বাধ্য'। পায়ের তলায় মাটি পেলে তবে তো মানুষের দৃষ্টি সম্মুখের দিগন্তের দিকে ধাবিত হবে। আজই এই বিকৃত বিশ্বায়নের হুজুগে একথা আমরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আবার শুনবো—'দেশের প্রতি মমতা এঁদের কাছে নিছক হাস্যকর কাণ্ড ; এঁদের একান্ত উপজীব্য হল আত্মশ্লাঘা—আর এঁদের রচনা ছড়িয়ে দেয় এঁদেরই বিকারগ্রস্ত মনের কদর্য বিষ, এঁদের তূণ থেকে নিক্ষিপ্ত শরের লক্ষ হল মানুষের আত্মসম্মান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, একযোগে নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়ার আগ্রহ। শিল্পজগতে এঁরাই হলেন প্রতিক্রিয়ার নির্লজ্জ সৈনিক, 'বিশ্ব' শব্দটি ব্যবহার করে নিজেদের মনের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য প্রকাশ করতে চান বটে, কিন্তু এঁদের মুখোশ ভেদ করে আসল চেহারা সহজেই সবার চোখে ধরা পড়ে যাবে।' আজ কথাগুলি আরো সত্য।

তিনি প্রকৃত অর্থে নৈতিক অবধানতাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানেন পুরাগত জ্ঞানের আলোয় সমাগত কালের জটিলতাকে চিনতে হয়—সমাগত কালের সংঘর্ষে পুরাগত জ্ঞান তাঁর কাছে আধুনিক দ্যোতনা পায়। তাঁর কাছে মার্কসবাদ আর জীবনাকৃতি তাই অচ্ছেদ্য। তিনি ভারতীয় মনীষার শাশ্বত বাণীকে ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে, 'আদিম স্তর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সমাজ জীবনের শ্রেণী শাসনের গ্লানি দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে গ্লানিকে কখনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা মেনে নিতে পারেনি। বৈদিক ঋষি কল্পনা করেছিলেন প্রশান্ত মধুময় পরিবেশ—'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ঋষি শম্বর বলেছেন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি বা পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে দারিদ্র্য আরো অসহনীয় দুঃখ, কারণ দারিদ্র পর্যায়মরণ নিয়ে আসে, তিলে তিলে পুড়িয়ে মারে। চিরজীবী বলে বর্ণিত বকঋষিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে তাঁর অতি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে সব চেয়ে বড়ো দুঃখ হল গর্বিত ধনীর হাতে দরিদ্রের লাঞ্ছনা।' হীরেন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ শুধুই প্রাচীন ভারতবিদ্যার চর্চা নয়। এ যুগের বাস্তব বিশ্লেষকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন যে দারিদ্র্যকে 'পর্যায়মরণ' বলে মহাভারতকার ধিকৃত করেছিলেন, সে দারিদ্র্য দূর হল না, সমাজ রয়ে গেল মুষ্টিমেয়ের কর্তৃত্বে, দেশের দৌলতে মেহনতি

মানুষ ভাগ পেল না। জগৎ জীবনের এই কুৎসিত অসামঞ্জস্যকে কেবল ব্যাখ্যা করার জন্যই নয়, সমাজকে পরিবর্তিত করার জন্য মার্কস এঙ্গেলস-এর তত্ত্ববিশ্ব শুধু ব্যাখ্যাসূত্র নয়, কর্মবেদও বটে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সমাজবীক্ষণ অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মননঋদ্ধ সে বীক্ষণ কখনো পাণ্ডিত্যের কচকচি হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, রাজনীতি সমাজনীতি আলোচনাকালে তাঁর চিন্তন পদ্ধতি, তাঁর সংবেদিতা ও প্রকাশ বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সহযোগী হয়ে গড়ে তুলেছে তাঁর শৈলী। এ শৈলী তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভা। মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ জীবনকে ভালবাসেন। সেই ভালবাসা তাঁর গদ্যকে দিয়েছে একটা শ্রী। এমনকী যখন তিনি প্রধান ব্যক্তিত্বের প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। তখনো তাঁর রচনা শ্রীভ্রষ্ট হয়নি। 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থের আলোচনায় নেহেরুজীর সম্বন্ধে সৌজন্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে লেখক পরিশেষে যা বললেন তা যেমন চোখা তেমনই রসদিগ্ধ। তিনি বললেন, নেহেরুজীকে 'সোশ্যালিস্ট বলতে যাওয়াই বাতুলতা। অবশ্য অনেক সময় মনে হয় মত স্থির করতে না পারাটাই হল নেহেরুজির বৈশিষ্ট্য। আর সঙ্কোচের এ বিহ্বলতা অনবদ্য ভাষায় তিনি প্রকাশ করতে পারেন বলেই তাঁর লেখা এত লোক আগ্রহ নিয়ে পড়ে।' ডাই হার্ড টোরি মহলে জলচল সোশ্যালিস্ট হিসাবে নেহেরুজি গণ্য হবার সংবাদে আজও আমরা কৌতুক অনুভব করি। বাক্‌শিল্পের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বৈদিক কবির প্রার্থনা—'ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি' ডক্টর সুকুমার সেনের গদ্যে তার অর্থ হল—তাদের (জ্ঞানীদের) বচনে ভদ্র লক্ষ্মী নিহিত। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ রজনীতে অভ্যাগত অভ্যর্থনায় এগিয়ে যান নিরভিমান সৌজন্যে স্নিগ্ধ অম্লান হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হীরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র সংস্রব ঘটে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, তখন। 'একবার যখন জন চার পাঁচ মাত্র ছিলাম তখন কবি কিছুক্ষণ গল্প করার পর কয়েকটি গান শুনিয়েছিলেন—সেই গানের মধ্যে ছিল তখনকার সদ্য রচিত "একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি"। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একবার কাছে থেকে দেখছিলাম মহাপুরুষের সহজ সরল মহানুভবত্তা। যাঁর সান্নিধ্যে বাক্‌স্ফুট হবে না বলেই আমরা শঙ্কিত ছিলাম, সেখানে একান্ত সদাশয় একটি মানুষকে আমরা দেখলাম।' আমার এই প্রসঙ্গ অবতারণার একটি কারণ আছে। আমি বোধহয় একথা ভেবে খুব ভুল করবো না যে হীরেন্দ্রনাথের চৈতন্য মার্কসীয় দীপনে আলোকিত হবার আগেই তা হয়েছিল রবিরশ্মিতে উদ্ভাসিত। উনিশশো একত্রিশ থেকে তেত্রিশ রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতা ও কমলা বক্তৃতার কাল—উনিশশো ষোলো-য় তিনি ছিলেন 'বলাকা'-র গতিরাগে দীপ্ত। এ সমস্ত কিছু থেকে সেদিনের মনস্বী যুবক সংগ্রহ করেছিলেন এগিয়ে চলার প্রেরণা। এখান থেকে সেদিনের মেধাবী জিজ্ঞাসু যুবকের মার্কস এঙ্গল্‌স-এর বিশ্বতত্ত্বে অভিমুখীতা অনাড়ষ্ট হবারই কথা। হলও তাই। তিনি দেখলেন 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বলে যে বিশ্বপ্রকৃতি (মানব সমাজ যার অন্তর্ভুক্ত) নিয়ত পরিবর্তনশীল, কখনো বিকাশ পাচ্ছে, কখনো বা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এঙ্গেল্‌স বলেছেন : বালুকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত, আদি জীবকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত, সব চেয়ে ছোটো থেকে সব চেয়ে বড়ো জিনিস পর্যন্ত বিশ্ব প্রকৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। 'মানুষের ধর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ বারে বারে যে গতির কথা, পরিবর্তনের কথা বলেছেন তার সঙ্গে অবশ্যই মার্কস্ এঙ্গেল্‌সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের

আত্মীয়তা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। কিন্তু একথা তো বলতেই পারি, রবীন্দ্রনাথ থেকেই তাঁর এ শিক্ষাগ্রহণ যে মানুষকে এগুতে হয়—ভিতরের দিকে এবং বাইরের দিকে—পরিবর্তনের স্রোতের টানকে স্বীকার করতে করতে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে হীরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় জেনে থাকবেন অবতত বিচরণ পরিহার করে মানুষ যেদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল সেদিন মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সে সকল বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নিয়ত সতত পরিবর্তমানতার পথে নেমে পড়েছে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কস-এঙ্গেলস একযোগে সত্য হয়ে ওঠেন হীরেন্দ্রনাথের জীবনে।

তাই সঠিকভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলতে পারেন—'রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তি হল এমন প্রকৃতির যে তাঁর কোনো পরিচ্ছেদকেই বোধহয় কক্ষচ্যুতি বলা চলে না। ক্রমান্বিত উত্তরণ মহিমা তাঁর বৈশিষ্ট্য—মহত্ত্বের অবিচল ভিত্তির উপর তিনি অবিরাম ইমারত বানিয়ে চলেছেন, তাদের শ্রী আর ছন্দে স্তরভেদ আছে, তারতম্য আছে, কোথাও বা বাঁধুনি ভেঙেছে তাল কেটে গেছে, কিন্তু মুহূর্তের নিষ্কৃতি তাঁর সহ্য হয়নি, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়া আসা না করে তাঁর স্বস্তি ছিল না—একদিকে একক অন্যদিকে বহুমুখী তাঁর প্রতিভা।' তিনি আরো বলেন, 'ব্যাপ্তির উত্তরণপর্বের এমন বিপুল ঐশ্বর্য জগতের আর কোনো কবিতে মেলে না, গ্যেটে এবং হ্যুগোতেও না। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও তুলনা দেখি না—নিঃসঙ্গ কবির অবিরাম অভিযান ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা'। এই উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যাংশে যে কথা কয়টি বলা হল, তা এমন করে এর আগে এবং পরে আর কেউ বলেননি। বাক্যাংশটির ব্যাখ্যাও তিনি একটু পরে করে দিয়েছেন। খণ্ডিত সমাজ, পরবশ ক্ষুদ্রাশয় গৌণ জীবনচর্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে তাঁকে 'নিজেরই ব্যক্তিস্বরূপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।' সে ব্যক্তিস্বরূপের মূল প্রেরণা ছিল সবরকম বন্ধন থেকে মুক্তির সাধনা। বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও, একাগ্র মহৎ সাধনা। উনিশশো সাতান্ন সালে হীরেন্দ্রনাথ যখন অটল প্রত্যয়ে বলেছিলেন 'আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি, তাহলে আমায় জবাব দিতে হবে "দুর্ভাগ্যক্রমে 'গোরা'।" আজ এতদিন বাদে শতাব্দী বদলের পরেও কথাটি নিয়ে আমি সে দিনের মতোই ভাবিত। সেদিনও যা মনে হয়েছিল আজও তাই মনে হয়—হীরেন্দ্রনাথের উত্তরটি সর্বতোগ্রাহ্য না হলেও অধিকাংশ গ্রাহ্য। আর যখন তিনি বলেন উপন্যাসই পারে বর্ষণের মধ্যে রামধনুর চিত্র অঙ্কন করতে, অথবা বলেন 'উপন্যাসকার যেন কীট্স্-এর ভাষায় বলতে পারেন 'Knowledge enormous makes a god of me' সর্বোচ্চস্তরের উপন্যাস হল গদ্যে মানুষজীবনের অন্তর্নিহিত কাহিনী, তখন বুঝি ইনি পেশাদার উপন্যাস তার্কিক নন—যথার্থ উপন্যাস রসজ্ঞ। আমি এই মুক্তমতি মহদাশয় আচার্যের কাছে শিখেছি, প্রকৃত ঔপন্যাসিক ব্যক্তি এবং সমাজের ভবিতব্য সম্বন্ধে অনীহাপরায়ণ হতে পারেন না। আমার স্যার যদি অনন্যমনা হয়ে শুধু উপন্যাস সমালোচনাই করতেন তাহলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর করে খেতে হত না। আজ 'তিন বাঁড়ুজ্জে' এই শব্দবন্ধে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর মানিক এই ত্রিরত্নকে আমরা যথেচ্ছ গ্রথিত করি, তার মধ্যে কজন আমরা স্মরণ করি যে সে শব্দবন্ধের স্রষ্টা হীরেন্দ্রনাথ। তিনি আশ্চর্য বিচার-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই তিনজনের মূল্যায়নে। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'চারিদিকে

যখন অন্ধকার তখন তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ এবং মাণিক এই তিন বাঁড়ুজ্জের লেখা থেকে যে যে আলো বেরোচ্ছে তার দাম দিতে হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য হলেন তারাশঙ্কর।' এই উক্তির পরে তিন তিনটি পৃথক অনুচ্ছেদে তিনি বাঁড়ুজ্জের শক্তি এবং দুর্বলতার পরিমাপ করেছেন। দেখিয়েছেন এই তিনজনের জীবন সম্বন্ধীয় অভিনিবেশের বৈশিষ্ট্য কোথায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী হিসেবেই মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কারণ তিনি সবচেয়ে বেশী চেয়েছিলেন যাতে অখণ্ড জীবন-বোধ তাঁর আয়ত্ত হয়, আর তা আয়ত্ত হলে প্রতিফলনে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।' তিনি বলেছেন মানিকের ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব ছিল। 'আর তাছাড়া লেখাই যাঁর জীবিকা, তাঁকে যে হাজার যন্ত্রণার শর প্রতিদিন সইতে হয়, তা তাঁর দেহমনকে পিষে ফেলল। বাঙালির লজ্জার কথা, যখন আমরা এ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলাম, তখন অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহাবসান হল, জীবনযাপনের যে যন্ত্রণা আমাদের দেশে শিল্পীর সৃষ্টিশক্তিকেও বিকৃত ও ক্ষীণ করে ফেলে তারই যূপকাষ্ঠে তিনি হলেন বলি।' যে লেখক প্রথম ভাবতে বসেছিলেন মানুষের নিজের সঙ্গে তাঁর সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক ও সংঘাতের কথা, তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা স্মরণ করেও কী করুণ এপিটাফ!

এই লেখাটিতেই তারাশঙ্কর অংশে তিনি যে কথাগুলি বললেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য পড়তে পড়তে মনে হয় এই অংশটি যেন বুদ্ধদেব বসুর অ্যান একর অফ গ্রীন গ্র্যাসের তারাশঙ্কর সম্বন্ধীয় ভ্রান্তিবিলাসের সুভদ্র প্রতিবাদ। আরো মনে হয় তারাশঙ্করের দুর্বলতার মধ্যে কোথায় ছিল শক্তির ভাণ্ডার, এই শক্তি ও দুর্বলতার অপ্রতিভ সহাবস্থান সম্বন্ধে তিনিই প্রথম আমাদের সচেতন করেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন বড়ো মাপের লেখক বলেই তারাশঙ্করের সংকটও বড়ো মাপের। বুদ্ধদেব বসু যে ভুলটা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ সে ভুলটা করলেন না। তিনি বললেন—'নিজের শিল্পীমানসকে পরিতুষ্ট করতে তাঁকে (তারাশঙ্করকে) সমাজের প্রত্যন্তে যেতে হয়েছে, যেখানে বাস করে বেদেনী আর কাহার আর সাপুড়ে—এদের বিষয় তিনি এম ; প্রাণভরা মমতা নিয়ে লিখেছেন যে শিল্পগত দোষও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।' হীরেন্দ্রনাথের কাছে তারাশঙ্করের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সততা আর নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি। হীরেন্দ্রনাথ নির্দ্বিধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যেদিক থেকে দেখি না কেন তিনিই আজ আমাদের সর্বাগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক।'

তিনি সহজাত রসবোধে সমৃদ্ধ। বিলিতি কেতাব থেকে আমদানি করা তত্ত্বে উচ্চকিত অনুবাদক সমালোচক তিনি নন। তাই তাঁর রস বিশ্লেষণ রসজ্ঞের দান। তাই তাঁর বিষ্ণু দে পাঠ আজও দিশারি হয়ে আছে। বর্তমান লেখক যখন মাত্র যুবক তখন সে বিষ্ণু দের কবিতার মন্ত্রকুহকে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে জটিলতা তার কাছে ততদিন ছিল দুশ্চর; যতদিন না তাকে হীরেন্দ্রনাথের লেখা আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম সম্পাদকীয় ভাষ্যে দেখিয়ে দেয়—'অর্থঘনত্বের প্রয়াস আর সংযমের আতিশয্য বিষ্ণু দের কবিতায় বিশেষ লক্ষ করা যায়। সে প্রয়াসে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভও করেছেন।' তখনই তিনি অনুধাবন করেছিলেন বিষ্ণু দের ক্রমপরিণামী গতির গূঢ়ার্থ—বলেছিলেন—'সম্প্রতি যে অবিকল্প ভঙ্গি ও প্রসঙ্গ

তাঁর লেখায় দেখা দিয়েছে তাতে ভরসা হয় যে মাত্র কয়েকজনের জন্য ইঙ্গিতবহুল ভাষা বর্জন করতে তাঁর কবি বিবেক আর বাধা দেবে না।' এর কয়েক দশক পরে হীরেন্দ্রনাথ লেখেন 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে'। তখন বিষ্ণু দে সম্বন্ধে তাঁর সর্বৈব অন্তরঙ্গতা গভীরে গিয়ে পৌঁছেচে। বর্তমান লেখকের সঙ্গে বিষ্ণু দে মহাশয়ের যে কয়েকবার আলাপচারি হয়েছে, কোনো না কোনো প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের কথা উঠেছে। বুঝেছিলাম একটা প্রীতি স্নিগ্ধ সৌহার্দ্য এঁদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্যার বললেন, 'মনের যে আপাত মধুর তরলতাকে আমরা সহজে অভ্যর্থনা করে এসেছি তার পরিবর্তে ভাবঘনত্ব কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি অনেকের কাছে দুর্নাম পেয়েও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আবেগকে প্রকাশ করতে হলে তাকে স্বচ্ছ প্রস্রবণ বা চকিত বিস্ফোরণের আকার দেওয়া কবি যশঃপ্রার্থীদের পক্ষে দুরূহ নয়। কিন্তু গভীর কথা বলতে গেলে যে গভীর সুরেরই প্রয়োজন আর সঙ্গীত তরঙ্গের মধ্যে শ্রুতের চেয়ে অশ্রুতের মহিমা ও মাধুর্য যে কম নয়, এই বোধ সহজ জনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করে বাংলা কবিতায় সঞ্চার করার কাজে রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষ্ণু দের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে বলতে বলতে উচ্চারিত হয় তাঁর অভ্রান্ত কাব্যভাষ্য—'বর্তমান যুগের জটিলতা দাবি করে—চিন্তার মুক্তি, অনুভূতির ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, যে ত্রিধারায় পুষ্ট না হলে কাব্য-মন্দাকিনীর লাবণ্যও ম্লান হয়ে যায়।' সেক্ষেত্রে বিষ্ণু দের শ্রদ্ধেয় ভূমিকা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তথাকথিত স্নিগ্ধতার অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ বিষ্ণুদের কবিতা বিচারে উঠত সে প্রসঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য আজও বরণীয়—'বাঙালি রচনায় স্নিগ্ধতা প্রায়ই কাল হয়েছে। বহুতর অভিযোগ আসবে যে তাঁর রচনাশৈলী স্বচ্ছ নয়, কিন্তু যে স্বচ্ছতা সুপ্রচুর আয়াসসাধ্য নয় তা অন্তত বাংলার কবিকুলের পক্ষে বর্জনীয়—অনায়াস কল্পনার রোমন্থনে আমাদের কাব্য কলঙ্কিত না হলেও ভারাক্রান্ত।' আমরা লক্ষ না করে পারি না হীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের বক্তব্যাংশের মধ্যে ব্যবধান কম। তিনি যেভাবে বিষ্ণু দের কবিকৃতিকে অবলোকন করলেন তা থেকে আমাদের মতো নতুন পড়ুয়ার কাছে স্পষ্ট হল বিষ্ণু দে-র দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার অনুধ্যান—হীরেন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেই বলছি :

স্বপ্ন আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি।

নানা নামরূপে বহুধাস্থিত স্যারের সত্তা। দীর্ঘ তাঁর অতীত। তাঁর স্মৃতির বৈভবে সমৃদ্ধ সত্তার যে বিচিত্র ইতিহাস তারই নাম 'তরী হতে তীর'। এ কোনো কম্যুনিস্ট নেতার সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নয়—স্বরূপত জীবন-সন্ধ মানবপ্রেমিক, দেশ এবং বিশ্বমনস্ক এক খাঁটি বাঙালির অস্তিত্বের সতত সচলতার প্রমাণ এই বইয়ের পাতায় পাতায়। উচ্চরক্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব—মহাকবির এই প্রার্থনা তাঁর প্রার্থনাতেও প্রতিধ্বনিত।

০

'নাল্পে সুখমস্তি', সদ্য-প্রগতিতে

সিদ্ধেশ্বর সেন

(অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু)

মনের-ই আশ্রয়, সে-উন্মেষের কাল,
ছিল সদ্য-প্রগতিতে,
জেনো, শুধু স্মৃতি নয়—

সে-যে বিরাটের সমীপে বিরাট,
অল্পে কিবা সুখ—
চতুর্ভিতে চার দেওয়াল—মনের জরীপ নয়

তাই, বিশ্ব নেমে আসে নীড়ে,
—যত্রং বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম—

আবিশ্বমানবে
মহাকবি-ও উৎসুক, ভূমৈব প্রেমে,
পরিব্রাজনে, আন্তর্জাতিকে

মনের-ই আশ্রয়, উন্মেষেরও কাল—
পা-ওঠানো পা-ফেলার
গতি-যতি ছন্দে

এত চলমান যাত্রার সৌন্দর্যে,
ধ'রে রেখে—
ঐতিহ্য ও সমকাল

এই স্মৃতিতে আকীর্ণ
উৎক্রমণের ইতিহাস,—বিস্ময়, সাহস
নয় ছিন্ন—

হৃদয়ে ধরোনি উত্তাল—সময়ের বিস্তার
তুমি প্রাণপণে—।
—দেশজ আধারে, কর্মে ও মননে মার্কসীয়—

সাহিত্যকৃতিতে, শিল্পিত রেখায়
দেখাওনি অর্জনে স্বকীয়—
প্রকাশের অভিব্যক্তি।

অতি-তারুণ্যে, সে-প্রগতির
পন্থ চিনে—
এই লেখক-ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী

—কবিতারও আধুনিকে, বিষয় ও বিষয়ীর নিরিখে
শিল্পের ফলিত মূল্যে—তুমি মানো শ্রেয়ে
বিবেকী ভূমিকা—

বলেছিও,—
অর্ধ-শতকও আগে কবির-ই 'সভ্যতার সংকটে',
চল্লিশের সে-প্রেরণা ঃ

কবির-শিল্পীর সততায়, এমন কি,
আত্মদানে—

মূল্যবোধ চিনে-জেনে
আঘাতে-সংঘাতে-স্ফুরণে

কলকাতায়ও অনন্য সুকান্ত, কবিবন্ধু,
সোমেন চন্দ ঢাকায়
প্রগতির ইতিহাস—এইসব, এমন ঔজ্জ্বল্যে
প্রাণবন্ত

জানি, 'নাল্পে সুখমস্তি'—তুমি বলো,

সেই তো, স্রষ্টার-শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়
দ্বান্দ্বিকের ঐক্যে পায়—
মানবিকে মুক্তি।

* আজ শতাব্দীস্পর্শী মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেই ১৯৪০-এর দশকের আমাদের প্রগতি লেখক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পুরোধা। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ আমার এই কবিতা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর "আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর" প্রবন্ধ-গ্রন্থটি সেই প্রগতি-যুগেরই লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী, শিল্পী সোমনাথ হোর ও আমাকে একত্রে উৎসর্গ করে ধন্য করেন। "নাম্নে সুখমস্তি" তাঁর একটি প্রিয় ঔপনিষদিক সূক্ত কবিতার নামে দিয়েছি।

আমার প্রণাম

রাম বসু

কিছু কিছু মানুষ আছেন
যাঁকে প্রণাম করলে
বুকটাই হয়ে যায় বোশেখী আকাশ।

কিছু কিছু মানুষ আছেন
যাঁকে প্রণাম করলে
চোখ দুটো হয়ে যায় মৌসুমী সাগর।

কিছু কিছু মানুষ আছেন
যাঁকে প্রণাম করলে
দুটো হাত হয়ে যায় ফুলের স্তবক।

হীরেন মুখোপাধ্যায় এমন মানুষ, তাঁকে
বিবেক-বিনীত প্রণাম।

মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম

নরহরি কবিরাজ

৩

মার্ক্সীয় দৃষ্টি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার, বোধ করি, এটিই প্রথম শীর্ষক প্রচেষ্টা। এই বই পড়লে জানা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস শুধু কংগ্রেসের ইতিহাস নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন স্রোতধারার মিলন ঘটেছিল। এই আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল মূলস্রোত। কিন্তু তার পাশাপাশি চলেছিল মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের অপর একটি ধারা—যার মুখে মুখে ফিরত the cult of the bomb. তাছাড়া, শ্রমিক, কৃষকের সংগঠিত আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে অপর একটি ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বইখানি মার্ক্সীয় বিচার পদ্ধতির সৃষ্টিশীল প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসের একটি নিজস্বতা একটি অনন্যতা, একটি মৌলিকত্ব থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অনন্যতায় ভরপুর। এই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বইখানির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে।

এই বইয়ে গান্ধীজী পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহের ধারাটিকে যেমন যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছে, তেমনি এই কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে স্বাধীনতা আন্দোলন যদি তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, তাহলে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের যোগাযোগের প্রশ্নটিও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক যোগদান সুনিশ্চিত করতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল দাবির সঙ্গে মেহনতী মানুষের জীবন জীবিকা সংক্রান্ত দাবিগুলি (যেমন লাঙল যার জমি তার, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রভৃতি), আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা আন্দোলন জনগণের চোখে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এক সময়ে বামপন্থীদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশেষ করে গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তি বিরাজ করত। গান্ধী আন্দোলন—বিপ্লবকে বানচাল করার আন্দোলন এই রকমের ধারণা পোষণ করা হত। এমন কী নেহেরু-সুভাষচন্দ্রকে শত্রুস্থানীয় বলে ভাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এই বইয়ে এই সব সংকীর্ণতাবাদী চিন্তাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয়নি। গান্ধীজী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যে একটি ইতিবাচক দিক আছে, এই আন্দোলনের যে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাৎপর্য আছে, তা লেখক দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। আবার, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দুর্বলতার দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন উত্তাল গণ-সংগ্রামের চেহারা নিয়ে ফেটে পড়ত, তখন আন্দোলন অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করছে—এই অজুহাতে গান্ধীজী

India's Struggle for freedom—Hiren Mukerjee

তাকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করতেন। গান্ধীজীর এই ধরনের কাজ এই বইয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজী কর্তৃক শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা জাতীয় আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের যোগদানের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল—এই উপলব্ধিও বইখানিতে খুবই স্পষ্ট।

আর একটি কথা। বামপন্থীদের পক্ষ থেকে এক সময়ে কংগ্রেস মঞ্চকে পরিত্যাগ করার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস মঞ্চকে পরিত্যাগ করা নয়, তার সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর লেখক জোর দিয়েছেন। কীভাবে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বামপন্থী চিন্তাকে তুলে ধরা সম্ভব ছিল, তার দৃষ্টান্তগুলি তিনি তুলে ধরেছেন—যেমন তিনি লিখেছেন—১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের মঞ্চেই 'সারা ভারত কিষাণ সভার' জন্ম হয়েছিল। কংগ্রেস মঞ্চকে গান্ধীবাদী, বামপন্থী—সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির মিলনক্ষেত্রে পরিণত করার আবশ্যকতার ওপর লেখক সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তবে নানা কারণে এই মিলিত উদ্যোগের চেষ্টা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন আপসহীন সংগ্রামের বদলে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ। এই বোঝাপড়ার পথেই ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল এবং তার মূল্যস্বরূপ ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তটি কংগ্রেস নেতৃত্বকে মেনে নিতে হয়েছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা নয়, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের ভূমিকাটিও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে এই বইয়ে বিচার করা হয়েছিল বলেই প্রকাশ হওয়া মাত্র বইখানি পাঠক মহলে বিশেষে আগ্রহ সৃষ্টি করে। তখনকার দিনে তরুণ মার্কসবাদী গবেষকদের কাছে এই বই হয়ে উঠেছিল প্রেরণার উৎস।

ভারতের প্রবীণ ও অগ্রগণ্য ঐতিহাসিকদের অন্যতম অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে জানাই আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা।

তরী হতে তীর

সত্যপ্রিয় ঘোষ

স্কুলের অনেক বাধ্যবাধকতাই কলেজে নেই টের পাওয়ার পরে মহানন্দে স্বাধীনতা ভোগের যে-স্বাদটি সবচেয়ে বেশি নিয়েছিলাম সে হচ্ছে অপছন্দের অধ্যাপকদের ক্লাস বর্জন এবং পছন্দের অধ্যাপকদের ক্লাসে ঢুকে তন্ময় হয়ে থাকা। বয়সটা ছিল ষোলো, ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেট হয়ে কলকাতার রিপন কলেজে, বিজ্ঞান শাখায়, অ্যাটেনডেন্সের পার্সেন্টেজ বেশি খোয়ালে বিপদ আছে জেনেও দু-তিনজন বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে আমিও যে হীরেন মুখার্জীর (এইচ. এন. এম. নয়, পরিষ্কার জানতাম সাদাসিধে ঐ মানুষটির নাম হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ক্লাসে ইতিহাসের কথা শোনার লোভে প্রথম প্রথম পেছনের বেঞ্চিতে ঘাপটি মেরে, শেষে ষাট-বাষট্টি জন ছাত্রের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ ধরার কোনও ব্যাপারই নেই বুঝে বেপরোয়া হয়ে এগিয়ে ওঁর কাছাকাছি বসে থাকতাম—সে যে কোন্ মোহে, কোন্ স্বপ্নে আমরা সেই প্রথম তারুণ্যে মেতেছিলাম তা এখনো আমার মনে এক সুখের অনুভূতি হয়ে আছে।

না, ঐ অধ্যাপক যে আই. এ. থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে কেবল ফার্স্ট হতেন, ইতিহাসের মতো কলাবিদ্যার একটি বিষয়ে অনার্স নিয়েও ঈশান স্কলার, বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেও আইনের ব্যবসায়ে টাকার পাহাড় না খুঁজে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আহ্বানে চলে গিয়েছিলেন ওয়াল্টেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি পড়াতে, বছর দেড়েক সেখানে থাকাকালীন সময়েই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের শরিক হয়ে, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন থেকে শুরু করেই তার সর্বোচ্চ নেতাদেরই একজন, ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি হয়েছিলেন, সেই বছরেই কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর সদস্যপদ প্রাপ্তি—যা তাঁর নিজস্ব বিচারে ছিল দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি, দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ; জানতাম না পারিবারিক চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ত্যাগ করে যদিও তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ব্যারিস্টারিতে পসার জমাতে উঠে-পড়ে লাগতে, কিন্তু হাইকোর্টে বার লাইব্রেরিতে নামটি নথিভুক্ত করেও তিনি হাতের-পাঁচ যে-চাকরিটি নিয়েছেন তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়—রিপন কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রধান রূপে, সেই পৈঠায় পা রেখে তিনি জানমান সঁপেই চলেছিলেন তৎকালীন বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির প্রসারণকর্মে; জানতাম না ১৯৪০ সালেই 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ' নামে ওঁর একটি প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হয়েছে; জানতাম না ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত সোভিয়েত সুহৃৎ সম্মেলনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বিশাল যে-সমাবেশটি হল তারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি; জানতাম না ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রগতি লেখক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদেরও অন্যতম তিনি; জানতাম না বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্রস্বরূপ 'প্রগতি' নামে যে-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ সালে, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে তার অন্যতর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ক'জন যে ওঁর ক্লাসে ওঁর পাঠন চুপিসারে ভোগ করে চলেছিলাম তার পশ্চাতে ওঁর সম্বন্ধে আমার অন্তত কোনও পূর্ব-ধারণা ছিল না। ওঁর দীপ্ত পশ্চাৎপট এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মতৎপরতায় আমি ওঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম এমন নয়, কলেজে ছাত্রমহলের গুঞ্জনেই বুঝে গিয়েছিলাম ওঁর বাগ্মিতা অসাধারণ, ওঁর সরল ও খোলা মনের আহ্বানই ওঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, তাই খুবই আপসোস হত কেন আর্টসে ভর্তি হইনি, তাহলে ইতিহাস তো নিতেই পারতাম এবং নিশ্চিন্ত মনেই ওঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেতাম। উনি যেমন মিশতেন ছাত্রদের সঙ্গেও তাতে আমার কত লোভ হয়েছে ওঁর কাছে যাই, কিন্তু ভয় ছিল তাহলে তো তিনি জেনে যাবেন আমি বিজ্ঞান শাখার ছাত্র, সেক্ষেত্রে যদি তাঁর ক্লাসে বসা আর না হয়।

১৯৪০ সালে আমরা যারা কলেজে প্রবিষ্ট তখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালির তাণ্ডবে ইউরোপ জুড়ে বিশ্বযুদ্ধ এক বছরের পুরানো, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারী-জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তির ফলে বামপন্থী ছাত্রসমাজও তখন হিটলারপ্রেমী, ভারত তথা বাংলার জনসাধারণ তো ইংরেজবিদ্বেষের ফলে সেই যুদ্ধে পুরোপুরি তখন অক্ষশক্তির পক্ষে। দেশবিদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতে কলেজে-কলেজে ছাত্র-ফেডারেশনের মাধ্যমে তখন বামপন্থী সংহতি দানা বেঁধে আছে, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একাধিক ছাত্র-ইউনিয়ন তৈরি হয়নি, তরুণ ছাত্রসমাজ তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের তাপ-উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও রক্ত চলাচলের ধমনীস্বরূপ। শেয়ালদা অঞ্চলের রিপন ও বঙ্গবাসী কলেজ তখন ভালো 'পড়াশুনার কলেজ' রূপেই স্বীকৃত ছিল, ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড-করা ছেলেরাও এই দুই কলেজেও তখন ভর্তি হত, অধ্যাপক-মণ্ডলীতে সেরা মস্তিষ্কের রত্নভাণ্ডার দুটি কলেজেই তখন ছিল বলে মর্যাদামণ্ডিত, তথাপি সঙ্কোচের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করতেই হয় সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে সে-সময় যাঁরা আমাদের মতো সাহিত্যমনস্ক ছাত্রদের কাছে স্বপ্নলোকের আরাধ্য ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই ক্লাস সে-সময়ে হট্টগোলে এবং ক্লাস-পালানোর মজায় বিপর্যস্ত ছিল, রোলকলিং-য়ে প্রক্সি, ক্লাসশুরুর আগে থেকেই হট্টমন্দির, রোলকলের পরেই বেঞ্চির তলাগুলো ছিল যেন সুড়ঙ্গপথ, ষাট-পঁয়ষট্টি জন বসতে পারে এমন-সব হলের মতো ক্লাসরুম অধ্যাপকের উপস্থিতিতেই ছাত্র কমতে কমতে যে কালে হতমান হত, এমনকি অধ্যাপককে হেনস্থাসূচক হরেক প্রকার আওয়াজে ও আচরণে ক্লাস ক্লাবের আড্ডাস্থলে পরিণত হত সে-সময়েই বিপরীত দৃশ্য রিপন কলেজে যাঁদের ক্লাসে দেখা যেত—ক্লাসে বেঞ্চিগুলো ছাত্রতে ঠাসা তেমনই ছিল হীরেন মুখার্জীর ক্লাস। চশমার মোটা লেন্সের নিচে প্রখর দৃষ্টির এই অধ্যাপকের ভাষণে তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররাও তন্ময় হয়ে থাকত। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ইতিহাস-ক্লাসে হীরেন্দ্রনাথের সেই জাদুমাখানো বাক্‌শৈলী, স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের তুলনামূলক ধরতাইগুলি আমার মতো মধ্যমানের ছাত্রদেরও উদ্দীপ্ত রাখতে যে পারত, তার এক ভাগ্যবান সাক্ষী ছিলাম আমি। প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে কথাটা মাঝেমধ্যেই যথার্থ বলে মনে হয় কেননা—যতই মাঝারি হই না কেন, ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমিও সাময়িকভাবে যেন বেশ সজীব উচ্চতায় উত্তীর্ণ হওয়ার স্বপ্নে

বিভোর হতে পারতাম। বাস্তবিকই, প্রকৃত বড়ো ক্ষুদ্রদেরও বড়োত্বের স্বাদ দেয়—ফলে এর উলটোটাও সত্য।

আমাদের সময়, ইন্টারমিডিয়েটের দুবছর, মজার কথা শুনে হাস্যমুখর হওয়ার আকর্ষণে ভরাট থাকত দুজন বাংলা-অধ্যাপকের ক্লাস, ইংরেজির এক অধ্যাপকের (সাহিত্যিক খ্যাতি যাঁর ছিল না) ক্লাসেও হট্টগোল হত না, বিজ্ঞানের ক্লাসগুলি তো পড়াশোনা, নোট নেওয়া, পরীক্ষামুখী অভিনিবেশে তৎপর থাকত—এ-সবের পরিপ্রেক্ষিতে হীরেন্দ্রনাথকে আমাদের মনে হত রিপন কলেজের মধ্যমণি।

এ-কথা স্বীকার করতেই হয় ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন সময়ে ছাত্ররাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে আমি ছিলাম এক ঋষ্যশৃঙ্গ, তথাপি 'তরী হতে তীর' গ্রন্থের লেখক হীরেন্দ্রনাথ আমার মতো ছাত্রদের জড়তামুক্তিতে সহায়ক হয়েছিলেন। এ-সব কথা লিখতে হল এইটে প্রতিপন্ন করতে যে এই গ্রন্থে তিনি রিপন কলেজে অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকদের তুলনায় নিজেকে সাধারণ পর্যায়ে স্থাপন করেছেন। আত্ম-অবলুপ্তির স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে গ্রন্থটির মুখপাতেই তিনি জানিয়েছেন এই বিশাল গ্রন্থটির কেন্দ্রবিন্দু তিনি নন, এ-গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য তাঁর সমকালীন দেশবিদেশের মূল ঘটনাবলীর আলোচনা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন এবং 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত'।

আত্মজীবনী বলতে সাধারণত লোকে যেমনটি বোঝে সে-অর্থে 'তরী হতে তীর' সত্যই আত্মকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু যে-মানুষটি কৈশোর থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত আত্মমুখী জীবনের সম্প্রসারণ ঘটাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন এবং আছেন তিনি যে নিজের বীক্ষণ দ্বারা আহ্নিক গতিতে সঙ্কীর্ণ আপন কক্ষপথেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না, তাঁর গতিপথ বিশ্বমুখীই হবে তাই 'তরী হতে তীর' গ্রন্থটি মামুলি কোনও আত্মজীবনী তো নয়ই, এ-গ্রন্থে আমরা পাই বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বের রাজনীতি-সমাজতত্ত্ব-সংস্কৃতি প্রবাহের বাংলাভাষায় লিখিত যুক্তিভিত্তিক এক ইতিবৃত্ত। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে, প্রকাশক কলকাতার মনীষা গ্রন্থালয়, প্রথম সংস্করণে মূল্য ছিল কুড়ি টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৬।

এই গ্রন্থে নিজের জীবনের নীতি বিষয়ে যা তিনি লিখেছেন এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত করি : 'মেহনতী মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিশিয়ে দিতে পারার গৌরব ছিটেফোঁটার বেশি দাবি করতে পারি না। সংসারী মনোবৃত্তি জীবনে কখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি; নিজের আখেরের কথা কখনো ভাবিনি; ব্যারিস্টারি পেশায় উন্নতির লোভে পড়িনি; মাস্টারি করি, সুতরাং সেই এলাকায় জমিয়ে বসি, পাঠ্যপুস্তক লিখে কিছু জমাই, হয়তো বা কোথাও জমি কিনে রাখি, আস্তে আস্তে একটা বাড়ি বানাই, এ-ধরনের চিন্তা কখনো মনে আমল পায়নি। এ সবই অবশ্য হল নেতিবাচক ব্যাপার, ইতিবাচক দিকটা তেমন উজ্জ্বল বলতে পারি না। মোটামুটি একটা পরিচিতি আমার হয়েছিল দেশে; তাই কম্যুনিস্ট পার্টিতে স্থান পেয়েছিলাম, তার অমর্যাদা সজ্ঞানে করিনি বলতে পারি—পার্টিতে যোগ দেওয়া এবং যথাসম্ভব কাজ করে যাওয়া, অন্য কোনো ক্ষেত্রে মনোনিবেশ না করে যথাশক্তি একাগ্রতা নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীভূত হয়ে কাজ করে যাওয়া, সমাজের যে স্তরে আমার

অবস্থান সেখানে থেকেই, প্রকাশ্যে, কিছুটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাওয়া, একে কৃতিত্ব বলি না, কিন্তু এটাই ছিল বছরের পর বছর আমার নিত্যকৃত্য।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ.-তে ইতিহাসে প্রথম স্থান পাওয়ার পর ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বিলেত যাত্রা করেন অক্সফোর্ডে অনার্স স্কুলে পড়তে এবং সেই সঙ্গে ব্যারিস্টারি অর্জন। সেখানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যাবীক্ষণে তাঁর মনোজগতে এতটাই বিপ্লব ঘটেছিল যে তা থেকে যে-চারিত্র, যে-মেজাজ, যে-ব্যক্তিত্ব তাঁর আরও পরিণতি পেয়েছে তার মূল লক্ষ্য হল মানবতাকে মর্যাদাদান, অমানবিকতাকে শুধু ঘৃণা নয়, তার বিরুদ্ধে জেহাদী হওয়া এবং অন্নবস্ত্রবাসস্থানে সাধারণ মানুষের সাথী রূপে সাধারণ মানুষদের নিহিত সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করতে সহায়তা প্রদানে সাধ্যমতো সজাগ থাকা। এই অর্থে হীরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই সাম্যবাদী।

জগৎসংসারে প্রকৃতি কিন্তু স্বভাবতই তা নয়, তা অতি নিষ্ঠুর, সেখানে যোগ্যতমের উদ্বর্তন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়। প্রকৃতি তো তা-ই হবে, তোমার করণীয় কী? তার বদল ঘটাতে মদদ দাও—যোগ্যতমের পোঁ ধোরো না, তাদের বগলস্থ হয়ে বগলানন্দে পরিণত হোয়ো না। হীরেন্দ্রনাথ শিক্ষাদীক্ষাসংস্কৃতিতে যোগ্যতমদের পর্যায়ে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গজদন্তমিনারবাসী হয়ে কোনোদিনই থাকলেন না, আমজনতার কাছে আত্মমহিমা স্বেচ্ছায় তিনি অনবরত ছেঁটেছেন সারাটা জীবন। আশ্চর্যই লাগে ভাবতে যে যিনি নিজেকে অনায়াসে বিগ্রহ রূপে অগণিত জনতার অন্ধবিশ্বাসে পূজিত হতে দিতে পারতেন, তিনি জীবন-আচরণের সাধারণত্বে নিজেকে কিছুতেই বিগ্রহ হতে দিলেন না। এই ৯৫ বছর বয়সেও।

ইতিহাস বিষয়ে কেন আকৃষ্ট হলেন এই প্রশ্নে তিনি লিখেছেন : 'ইতিহাস বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ যথাসাধ্য মনে জেগেছিল, মানুষের জীবনকথা সাহিত্যরস-সংস্পৃষ্ট এবং মোহময় রূপেই অন্তরকে আকর্ষণ করেছিল।'

'তরী হতে তীর' গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত কাল বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হলেও যেহেতু এটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৪ সালে, তাই স্বাধীনতার পরবর্তী অনেক কথাই এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবিষ্ট। এ-গ্রন্থে ওঁর আত্মচরিত্র-বিশ্লেষণও আছে বহুল পরিমাণে, সুতরাং এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করতে চাই যা ওর চরিত্র-পর্যালোচনায় অবান্তর হবে না।

প্রথমটি হল ১৯৫২ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলন, ছয়দিন ব্যাপী অত্যন্ত বর্ণাঢ্য এই সম্মেলন ঘটেছিল প্রথম পাঁচ দিন পার্ক সার্কাস ময়দানে, শেষ দিন পার্ক সার্কাস থেকে মনুমেন্ট পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা এবং মনুমেন্টের পাদদেশে সায়াহ্নে বিশাল প্রকাশ্য জনসমাবেশের অধিবেশনে তার পরিসমাপ্তি। যুদ্ধোদ্যমে গোটা বিশ্ব তখনও সন্ত্রস্ত, তার নিরসনে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি এসেছিলেন পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, নেপাল ইত্যাদি দেশ থেকেও। সেই সম্মেলনে তো বটেই, ঐ-উপলক্ষে ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সাতশো প্রতিনিধি প্রতিদিন সকাল ও দুপুরে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুদ্ধবিষয়ক সঙ্কটের প্রতিরোধে ছয়টি বিষয়ে আলোচনাচক্রে মিলিত হন; বিষয়গুলি ছিল ১) বর্তমান সংকটে

সংস্কৃতি কর্মীদের জীবনযাপনের মান, ২) ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবাদী প্রচারকার্য, ৩) ভারতীয় সংস্কৃতিতে শান্তি-নীতির ঐতিহ্য, ৪) বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সমাজ-জীবনে ও সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রভাব এবং ৬) শান্তি ও শিক্ষা জগৎ।

এইসব আলোচনাচক্রে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্যে হীরেন্দ্রনাথকে তো বটেই সেই সঙ্গে দেখেছি মুলুকরাজ আনন্দ, আলী সর্দার জাফরি, খাজা আহম্মদ আব্বাস, মকদুম মহীউদ্দীন, ভোগীলাল গান্ধী, পৃথ্বীরাজ কাপুর, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, সুধী প্রধান, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক প্রমুখ শিল্পীসাহিত্যিকদের। পার্ক সার্কাসের বিশাল প্যান্ডেলে হাজার দশেক মানুষের অবাক দৃষ্টির সামনে পয়লা এপ্রিল থেকে পর পর পাঁচদিন প্রকৃতই এক স্বপ্নলোক বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল—আমেরিকা থেকে হাওয়ার্ড ফাস্ট ছাড়পত্র না পাওয়ায় আসতে পারেননি, কিন্তু তুরস্ক থেকে এসেছেন নাজিম হিকমত; ভারতের নানা প্রান্ত থেকে একত্র হয়েছিলেন মালয়ালাম ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ভাল্লাথোল, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, উদয়শঙ্কর, সুমিত্রানন্দন পন্থ, কৃষণ চন্দর, যামিনী রায়, মামা ওয়াড়েকর, পারভেজ শাহিদি, শেখ গোমানি, রমেশ শীল প্রমুখ শিল্পী ও লেখকেরা। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক সেই সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটল ময়দানের খোলা হাওয়ায়—নবীন মারাঠী লোকসঙ্গীতশিল্পী অমর শেখের লক্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করানো গান 'নয়া তরানা গাওয়েঁ, আও জগ মেঁ ধুম মচায়েঁ'—আর তারপর সৈফুদ্দীন কিচলুর সুদীর্ঘ ভাষণ, ইংরেজি ভাষায়, সাহিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত বৃহৎ বৃহৎ বাক্যের সেই তাৎক্ষণিক ভাষণের অনুবাদ স্বচ্ছন্দে বাংলায় করে চলেছেন হীরেন্দ্রনাথ—বিদেশি একটি ভাষা থেকে মাতৃভাষায় সেই অনর্গল অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে জনসমুদ্রে যে জাগরণ সেদিন ঘটেছিল, সেই কৃত্যে হীরেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় এক স্মরণীয় ঘটনা।

অথচ ভাবতে মজা লাগে এই মানুষটিই নাকি একদিন বামপন্থীদের এক মিলনস্থল ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের ঘরটিতে কী একটা বিষয় বাংলায় বোঝাতে পারছিলেন না বলে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন : হীরেন, তুমি ইংরেজিতে বলো—কথাটা কবি রাম বসুর কাছে শোনা।

আপাত-বিচারে তুচ্ছ হলেও, ওঁর জ্ঞান ও কর্মের বিশাল পরিধি বোঝাতে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ম্যাকসিম গোর্কির জন্মশতবর্ষে, ১৯৬৮ সালে, রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক্রান্তি নামে এক বাংলা ত্রৈমাসিকপত্রে 'বাংলাসাহিত্যে গোর্কির প্রভাব' নামে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম; সেটি প্রকাশের কিছুদিন পরেই হীরেন্দ্রনাথ দিল্লি থেকে সম্পাদককে চিঠিতে জানালেন প্রবন্ধটি তিনি পড়েছেন, প্রশংসাসূচক কিছু কথার পর ওটির ইংরেজি অনুবাদ চেয়েছিলেন ইন্ডো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্র Amity-তে প্রকাশের জন্য, অনুবাদটি করে দিয়েছিল আমার ভ্রাতা নিত্যপ্রিয়, ১৯৬৮ সালেই তা প্রকাশিত হওয়ার পর হীরেন্দ্রনাথ ক্রান্তি-সম্পাদককে পুনরায় তাঁর ভালো লাগার কথা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন।

বৃহৎ ব্যক্তিত্বরা সকলেই যদি এমনটি হতে পারতেন তাহলে সাম্যবাদকে কার সাধ্যি বলতে পারত ইউটোপিয়ান?

'তরী হতে তীর'—এই মহাগ্রন্থ আমাদের দেশকালের শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির পর্যালোচনায় যেন এক উত্তুঙ্গ আকাশপ্রদীপ। হীরেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্বে অন্ধ ভক্তির কোনও স্থান নেই, প্রখর যুক্তিবাদীদের কাছে অলৌকিক কথাটাই হাস্যকর, কিন্তু এই উপলব্ধি আমাদের থাকা দরকার কেন তিনি বলেন : 'কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিনি, দর্শনযোগ্য কিছু আছে শুনিনি বলে, অথচ দশাশ্বমেধ ঘাট বা বিশ্বনাথের গলি আমায় মুগ্ধ করেছে। এ হল অবশ্য কিঞ্চিৎ বয়ঃপরিণতির পরবর্তী ঘটনা, কিন্তু একটা ব্যাপার ছেলেবেলায় মনকে কেমন অদ্ভুত নাড়া দিত এবং আজও দেয়—আকাশপ্রদীপ দেখে আমি আজীবন উতলা হয়েছি, আজও হঠাৎ তুচ্ছ এক গৃহশিখরে আকাশপ্রদীপ জ্বলছে দেখতে পেলে অদ্ভুত এক আনন্দের অবধি আমার থাকে না।'

হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই নব্বুই উত্তীর্ণ বয়সেও বঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য জগতের প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মূলত মার্কসবাদী রূপেই আত্মপরিচয় দিয়ে থাকেন। ইচ্ছা করেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করিনি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে অবিভক্ত বঙ্গ এবং সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল তাঁর বিশিষ্ট অবদান থাকলেও বর্তমানে তিনি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নন বলা যেতে পারে। তবু মার্কসবাদে তাঁর অনন্য নিষ্ঠা। সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপ অথবা চীন প্রমুখ দেশে একদা মার্কসবাদের ফলিত রূপ আশা ও উদ্দীপনার যে উজ্জ্বল প্লাবন সৃষ্টি করেছিল তা বর্তমানে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও হীরেন্দ্রনাথের মার্কসবাদে আস্থার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি সৎ মার্কসবাদী। নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী। তাই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও তিনি 'জগৎজোড়া কমিউনিস্ট প্রত্যয়' অবিচলিত চিত্তে ঘোষণা করে এর প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন 'যে বিপ্লবের পরাজয় নেই।'[১]

এমন একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদীর গান্ধী-ভাবনা তাই স্বভাবতই মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। ইচ্ছা করলে আরও অনেক মার্কসবাদীর মতো সোভিয়েট এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রথম সংস্করণ অনুসরণে গান্ধীর মূল্যায়ন তিনি করতে পারতেন। অথবা রজনীপাম দত্তের মতো ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির যে নেতার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্লেষণ একদা ভারতের মার্কসবাদীদের কাছে প্রায় বেদবাক্য ছিল তদনুসারে গান্ধীকে This Jonat of revolution this general of unmitigated distress, this mascot of bourgeoise রূপে চিহ্নিত করেও দায়মুক্ত হতে পারতেন। অনেক কমিউনিস্ট অতীতে এমন করেছিলেন, কেউ কেউ এখনও এই অভিমতের উচ্চারণকারী। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ তা করেননি। তাঁর মৌলিকতা তাঁকে ওভাবে পরের মুখের ঝালে তৃপ্ত হতে দেয়নি। তিনি নিজের মতো করে গান্ধীর মূল্যায়ন করছেন। কারণ তিনি সৎ মার্কসবাদী। বিবেকশীল মানুষ।

সেই বিবেকের প্রেরণাতেই তাঁর মনে হয়েছে যে গান্ধীরূপী 'phenomenon' (অনুবাদ স্বরূপ অপূর্ব বা অসাধারণ দৃশ্য শব্দবন্ধে তাঁর বক্তব্যের ব্যঞ্জনা যথাযথভাবে ধরা পড়ে না। বলেই মূল শব্দটিই রাখা হল) সম্বন্ধে তাঁর লেখা উচিত। গান্ধীর খুব কাছের মানুষ না হলেও তিনি ছিলেন গান্ধীযুগের মানুষ। আর তাঁর স্বীকারোক্তি অনুসারে[২] প্রথম যৌবনে তিনি 'প্রায় গান্ধী অনুরাগী ছিলেন।' অনেক দিনের দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে তাই তিনি ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিধিবদ্ধভাবে গান্ধীজীর সম্বন্ধে লিখলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে এটা কোনও ভাবাবেগের ব্যাপার নয়, এটা তাঁর একটা 'অবশ্য কর্তব্যও বটে।'[৩] তবে নিঃসন্দেহেই তাঁকে তলোয়ারের ধারের উপর চলার চেয়েও দুরূহ কৃত্য অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কারণ

গান্ধী সম্বন্ধে প্রথম বিধিবদ্ধভাবে লেখার কালে তিনি কেবল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতের মার্কসবাদী নন, লোকসভায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মসূচির প্রধান প্রবক্তাও বটেন। আর নেহেরুর নেতৃত্বাধীন শাসক কংগ্রেস দল গান্ধীনীতির অনুসারী না হলেও জনসমর্থনের জন্য তখনও গান্ধীর উত্তরাধিকারীরূপে নিজেদের প্রচার করতেন। কমিউনিস্ট বিশ্বাসের জন্য কংগ্রেসী শাসনের বিরূপ সমালোচনা হীরেন্দ্রনাথের নিত্যকর্ম ছিল। তাঁর দ্বিতীয় সমস্য ছিল গান্ধী অনুগামীদের দ্বারা তাঁর গান্ধী-অধ্যয়নকে মার্কসবাদী হবার কারণে নস্যাৎ করার চেষ্টা।

যে 'phenomenon' সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ না লিখে থাকতে পারেননি, তাঁর সম্বন্ধে লেখার জন্য তিনি অতীব সঙ্গত কারণেই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সমালোচক—তথাকথিত 'গান্ধীবাদীদের' সমালোচনা অগ্রাহ্য করেছিলেন। কারণ গান্ধী স্বয়ং কোনও 'গান্ধীবাদ' বা 'গান্ধীবাদীর' অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের উপযুক্ত স্থানে তার উল্লেখও করেছেন। গান্ধী ঐ প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলেন যে তিনি কেবল সত্য তাঁর কাছে যখন যে রকম প্রতিভাত হয়েছে তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি পৃথিবীকে কোনও নূতন সত্য দেননি বা কোনও পন্থেরও প্রবর্তন করেননি। এর ফলে এই মূর্তিপূজা ও গুরুবাদের দেশে গান্ধী পরিত্রাণ পেয়েছেন। গান্ধীর কোনও একাধিকার বা পেটেন্ট হবার সর্বনাশা সম্ভাবনা তিনি নিজেই বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে গান্ধী সবার। অর্থাৎ যতটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেহেরু-কৃপালিনী অথবা রাজনীতির বাইরের বিনোবা-জয়প্রকাশের, ঠিক ততটাই হীরেন্দ্রনাথ অথবা নাম্বুদ্রিপাদের। হীরেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে স্বাধিকারের প্রয়োগ করেছিলেন।

নিজেদের মার্কসবাদী সমাজের বিরূপ সমালোচনা পরিহার করার ব্যাপারে বোধহয় তিনি ভরসা পেয়েছিলেন ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছ থেকে। তখনও পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেসের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪২ খ্রি. 'ভারতছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন কমিউনিস্টরা দ্রুত ভূমিকা পরিবর্তনের পর। তবু গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও তখন বিদেশে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর এক দিগন্ত উন্মুক্ত করায় রত সুভাষচন্দ্রই প্রথম গান্ধীকে 'জাতির পিতা'-র স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ভারতের বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় কমিউনিস্টরাও গান্ধীর সেই ভূমিকা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কেবল সোমনাথ লাহিড়ীর মতো স্থিতধী রাজ্যস্তরের নেতাই নন, তাঁর মতো আরও অনেকের সঙ্গে পার্টির তদানীন্তন সম্পাদক পুরণচন্দ যোশীও গান্ধীকে জাতির জনকের স্বীকৃতি দিতেন ঐ কালপর্বে। কিন্তু স্বভাবতই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রকাশ্যে বাদ-বিবাদে অবতীর্ণ হতে অথবা গান্ধির মত ও পথের কঠোর সমালোচনা করায় বাধা ছিল না।

গান্ধী সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তন-মনন ও মূল্যায়ন পুষ্ট হয়েছিল ভিয়েতনামের সংগ্রামী নেতা হো-চি-মিন-এর মন্তব্যে। গান্ধীর মূল্যায়নের ইংরাজি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সেকালে (১৯৬৮ খ্রি. ৭ এপ্রিল) ভারতীয় সংবাদপত্রে বহুল প্রচারিত (হীরেন্দ্রনাথ দিল্লির Times of India থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন) সেই বিশ্ব কমিউনিস্ট অন্দোলনের অগ্রণী

নেতার মন্তব্য অন্যান্য ভারতবাসীর মতো স্বভাবতই হীরেন্দ্রনাথকে উদ্দীপিত করেছিল। ভারতে সফররত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐ অদ্বিতীয় নেতাকে কোনও সাংবাদিক প্রশ্নোত্তর পর্বে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ভূমিকার তুলনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। হো-চি-মিন ত্বরিৎ উত্তর দিয়েছিলেন যে ও এক 'ভুল প্রশ্ন' এবং মহাত্মার সঙ্গে তাঁর তুলনাটা 'বোকামি'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন যে, "আমি বা আরও অনেকে বিপ্লবী হতে পারি, তবে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য। এর বেশিও নয়, কমও নয়।"

তৃতীয় সংস্করণের ঐ সুদীর্ঘ ভূমিকাতে (১৯৭৯ খ্রি.) গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক ও সঙ্গে সঙ্গে সাহসী মূল্যায়নের আরও দুটি উদাহরণের বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। "গান্ধী কদাচ শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিভাষায় চিন্তা করেননি এবং বরাবরই তিনি শ্রেণী-বৈষম্যের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। তবে তিনি যেসব কাজকর্ম নিরন্তর করতেন ও সেই প্রক্রিয়ায় জনগণের কাছে যে বিশেষ আবেদন ও অনুরোধ তিনি জানাতেন তা নিঃসন্দেহে জনসাধারণের চেতনাকে অধিকতর বিকশিত করত। এর ফলে সামাজিক সমস্যাগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব পেত এবং জাতীয় আন্দোলনেও এক শক্তিশালী জনমুখী দিগন্তের সংযুক্তি ঘটত।" ভূমিকার উপসংহারপর্বে তিনি কার্ল মার্কসের সঙ্গে গান্ধীর সাযুজ্য আবিষ্কার করেছেন। তবে তার পরিচয় দেবার পূর্বে বর্তমান সমীক্ষকের একটি সীমাবদ্ধতার এজাহার করে নেওয়া প্রয়োজন। হীরেন্দ্রনাথের রচনা কেবল ভাব-গরিষ্ঠই নয়, তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলীও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্প-সুষমামণ্ডিত। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরাজি উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এই সব্যসাচী-সম অধিকার। সুতরাং তাঁর রস পেতে ইংরাজি রচনায় যথার্থ অনুবাদ দুরূহ। আর কোনও মতে একটা ভাষান্তর যদি বা খাড়া করা যায়, তাতে মূল লেখকের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা বজায় রাখা কঠিন বলে সে অনুবাদে মূল লেখকের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে না। তাই তাঁর ইংরাজি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেবার বদলে অনেক স্থলেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো ভাবানুবাদে তৃপ্ত থাকতে হবে।

অতঃপর তাঁর দৃষ্টিতে মার্কসের সঙ্গে গান্ধীর সাযুজ্য প্রসঙ্গ। মার্কস ব্যক্তির সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং পরিণামে সমাজের বিকলাঙ্গ পরিণতির কারণ নিয়ে বহু বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। অর্থের ভূমিকায় মার্কসকৃত বিস্তারিত চিত্রণ এবং মানুষে মানুষে 'যথার্থ মানবিক' সম্বন্ধাবলী সম্বন্ধে তাঁর জোরালো সওয়ালের কথা আমরা জানি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত দেশগুলিতে সাম্প্রতিককালে জীবনের মানবিকতার মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাদ-বিচার করার যে তীব্র অভীপ্সা লক্ষিত হয় তা দেখা মাত্র গান্ধীর কথা মনে আসে। কারণ একমাত্র এই মানবিকতা অশ্রিত জীবনই পারে সভ্যতা ও ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে দেবার উপভোক্তাবাদী মানসিকতার জোয়ারের গতিরোধ করতে।... অনাগত যে যুগের পটোন্মোচন পর্ব আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে যদি যথার্থ স্বাধীনতা প্রেমীদের এক সমাজের অবির্ভাব ঘটে, তাতে যদি মানুষে মানুষে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আশানুরূপ জনহিতৈষিতা বৃত্তির বিকাশ সম্ভব হয় এবং সেখানে যদি ভেদাভেদ ঈর্ষা-অসূয়া ও সর্ববিধ সংকীর্ণতা পরিহার করে চলা মোটামুটি

সম্ভবপর হয় তাহলে তাকে ভারতের সেই মহৎ ব্যক্তির আদর্শের পরিপূর্তিও আখ্যা দেওয়া যাবে যিনি তাঁর স্বদেশের জরাপীড়িত নর-নারীর জীবনের সঙ্গে একক অথচ গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যিনি তাঁর নিজস্ব দৃশ্যত অসম্ভব অথচ সত্য পদ্ধতিতে এমন এক যুগের সৃষ্টি করেছিলেন, আমরা যাতে বাস করছি।

॥ ২ ॥

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান্ধী-ভাবনার এই চালচিত্রের পটভূমিকায় তাঁর গান্ধীর মূল্যায়ন প্রয়াসকে স্থাপিত করা হবে। আর এ কার্য সাধিত হবে দুটি পর্যায়ে যার প্রথম চরণ হল গান্ধীজীর যেসব ভূমিকার জন্য হীরেন্দ্রনাথের মতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অদ্বিতীয়। "....ইতিহাসে কখনও এমনভাবে একজন ব্যক্তি এত বিপুল সংখ্যক মানুষের এত দীর্ঘকালীন সংগ্রামে এমন নিরন্তরভাবে এই পরিব্রজ্যি সেবা ও পথপ্রদর্শন করেননি। আর এ এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের জীবনে স্বাধীনতার আবির্ভাব তার প্রারম্ভিব ভার বা চাপ থেকে উত্তরিত হয়ে বিশ্বের নৈতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য।"[৪] গান্ধী সম্বন্ধে এ জাতীয় আরও দুটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর প্রথমটি হল, "মুক্তির সন্ধানে সংগ্রামরত ভারতের ইতিহাসে অপর কোন ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীর মত এমন বিপুল ভূমিকা পালন করেননি, আর তিনি একাকীও ছিলেন না।"[৫] একক ব্যক্তির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। পুনরপি "যে কোনো ও নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করার জন্য নাড়া দিয়েছিলেন বেশী। হিন্দু পুরাণের ভগীরথ যেমন তপস্যায় দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ধরাতলকে সজীব করতে গঙ্গাবতরণ ঘটিয়েছিলেন, গান্ধীও তেমনি তৃষিত-তাপিত ও বহু শতাব্দীর ধূলি-অবর্জনায় মলিন এক দেশে নিয়ে এসেছিলেন সঞ্জবনী-বারি। তাঁর সাধনায় আবির্ভূত এই প্রাণদায়ী জলধারা ছিল গঙ্গারই মত হিমালয়-জাত, সর্বতোভাবে ভারতীয়।"[৬]

যে-কোনও মহৎ সৃষ্টির বীজকে স্রষ্টা বহু দিন চিত্তের ক্ষেত্রে লালন-পালন বা ধারণ করে রাখার পরই লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হন। মায়ের গর্ভস্থ ভ্রূণকে সর্বতোভাবে পুষ্টি সরবরাহ করার মতোই ইতিমধ্যে তাঁকে তার পরিপোষণ করতে হয়। গান্ধী সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা মনে জাগলেও অবিলম্বে লিখতে না বসায় হীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্বে তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক পূর্ণাঙ্গ করেই পাঠকদের দরবারে হাজির করেছিলেন। গান্ধী জীবনীর রচনাকাল তাঁর রাজনৈতিক ও জনসেবামূলক জীবনের চরম ব্যস্ততার পর্ব। তারই মধ্যে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অতুলনীয় না হলে এ সম্ভব হত না। প্রতিটি সংস্করণেই তিনি এর কেবল পরিমার্জনাই করেননি, নূতন তথ্যের সংযোজনও করেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ২০০ পৃষ্ঠার কিঞ্চিৎ অধিক হলেও তা বহু অধ্যয়ন এবং চিন্তন-মননের স্বাক্ষরবাহী। আর এই কারণে যে-কোনও গান্ধী-গবেষকের কাছে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। গান্ধী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি উপস্থাপনের সঙ্গে তার পটভূমিকায় গান্ধী মত ও পথের উপর নিজস্ব মৌলিক বিচার বিশ্লেষণের আলোকসম্পাত করেছেন বলেই এ রচনার গুরুত্ব। এই একই কারণে গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে মার্কসবাদী আলোচনা সভায় উপস্থাপিত তাঁর গান্ধী-ভাবনার গুরুত্ব। উভয় রচনাতেই একাধিকবার তিনি স্বীকার করেছেন

যে গান্ধীর সঙ্গে মার্কসবাদী হবার কারণে তাঁদের মৌলিক বিরোধ সত্ত্বেও "তাঁর সম্বন্ধে আমরা অধ্যয়ন করে থাকি গুণ দোষ বিচারপূর্বক। তবে এ অধ্যয়ন একই সঙ্গে শ্রদ্ধাযুক্তও বটে। আর এই প্রক্রিয়ায় যেমন তাঁর এবং তাঁর কৃতি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যেসব ভক্তি-গদগদ চাটুবাক্য উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তার সঙ্গে আমরা সহমত নই তেমনি আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি এমন একজন মানুষ হিসাবে যিনি অপর যে কোন ব্যক্তির তুলনায় তাঁর স্বদেশের জনগণের জীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করেছিলেন এবং যিনি—যতটা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব—ভারতের রাজনীতির বায়ুমণ্ডলকেই পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন।"[৭]

স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাস ও ভারতের জনগণের পুনর্জীবনের প্রক্রিয়ায় হীরেন্দ্রনাথের মতে গান্ধির অন্যতম প্রধান অবদান হল দেশবাসীকে অভীঃ মন্ত্রের দীক্ষাদান। অর্থাৎ বহুযুগ যাবত যে ভারতবাসী কেবল শাসন-শোষণের শৃঙ্খলেই নয়, ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে সব নানা ধরনের নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রায় কুণ্ঠিত করে ফেলেছিল, তার অবসান ঘটানোর অগ্রনায়ক ছিলেন গান্ধী। গান্ধী-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা স্বদেশের পুঁজিপতি-জমিদার-মহাজনদের শোষণ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বা সরাসরি প্রতিবাদ করার বদলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বা প্রকারান্তরে মন্তব্য করা ও বড় বেশি হলে গোপনে আন্দোলন করাই প্রচলিত প্রথা ছিল। হীরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে 'শয়তানী' আখ্যা দিয়ে গান্ধীই সর্বাগ্রে জনগণকে স্পষ্টবক্তা হবার সাহস জুগিয়েছিলেন। আদালতে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড থেকে বাঁচার কোনও করার প্রয়াস না করে বিচারকের সামনে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন : "জানি যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। আমি ঝুঁকি নিয়েছি এবং আমি যদি মুক্তি পাই আবার এই কাজ করব।" হীরেন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ করেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে একদিকে অশিক্ষিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ এবং অপর দিকে সাধারণত সংঘর্ষবিমুখ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দমন পীড়ন ও কারাভয় থেকে তাদের মুক্ত করার প্রক্রিয়া ভারতেও গান্ধীযুগের রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। যে-কোনও প্রচলিত ক্ষমতার অবলুপ্তির পূর্বে তার প্রতিষ্ঠা বা ইজ্জত প্রথমে চলে যায়। ভারতেও ব্রিটিশ ক্ষমতার দৃশ্যরূপ পুলিশ, থানা, আদালত, হাকিম এবং কারাগার ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনের সম্ভ্রম সমীহ ও ভীতি দূর করে গান্ধী সাম্রাজ্যবাদের দুর্গে প্রথম প্রবল আঘাত হানেন।

একই ভূমিকা ছিল তাঁর চম্পারণে নীলচাষিদের নীলকর ইংরেজদের অথবা আহমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকদের স্বদেশি (এবং তাঁদের মধ্যে একজন উপকারী বন্ধুস্থানীয়) মিল মালিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে। চম্পারণে জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ তিনি অমান্য করলে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করলে এ যাবতকাল নীলকর বা যে-কোনও শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে অক্ষম চাষিরাই হাজারে হাজারে আদালতে সমবেত হয়ে আদালতের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে মুক্তি দিতে বাধ্য করে। একই ধরনের জনসংগঠন ও জনপ্রতিরোধের পরিচয় পাওয়া যায় 'এক টেক' শ্রমিকদের কাছ থেকে গান্ধী নেতৃত্বে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে।

গান্ধী-জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জনগণকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করার সংগঠন ও আন্দোলনের সমীক্ষা করার পর হীরেন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই তার উৎস খুঁজে পেয়েছেন গান্ধীর নিজের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায়। তেইশ বছরের এক যুবক অন্নসমস্যার সমাধানে স্বদেশ থেকে বহু দূরে দক্ষিণ আফ্রিকার পিটার মারিৎস্‌বার্গ রেলস্টেশনে (বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার ও প্রথম শ্রেণীর টিকিটধারী যাত্রীর প্রচ্ছন্ন অহংকার হজম করে) রেলগাড়ি থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে রেলওয়ের প্রতীক্ষালয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইতিকর্তব্য স্থির করছে। মহাত্মার জন্মের সেই সর্বজনবিদিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এর হীরেন্দ্রনাথকৃত ভাষ্যই আমাদের আলোচনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখছেন : সত্তার মূল ধরে নাড়িয়ে দেবার এই অভিজ্ঞতা গান্ধীকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে এবং তাঁকে ভয়বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমাদের অতীতকালের মনীষীরা যাকে অভয় আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত করে। এই অভয় কেবল দৈহিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এ হল মনোরাজ্য থেকে ভয়কে সদা নির্বাসন দেবার স্থিতি। নিজের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন বেগোচ্ছল পর্যায়ে গান্ধী যে কোন একক ব্যক্তির তুলনায় তাঁর স্বদেশবাসীদের নির্ভীকতায় উত্তরিত করতে সর্বাধিক সহায়তা দান করেছিলেন। প্রশাসনীয় দমননীতি ও সামাজিক নিন্দা-ভর্ৎসনার পটভূমিকায় নির্ভীকতা, কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের সহস্রবিধ দমন-পীড়নের সামনে নির্ভয় থাকা নয়, তাবৎ কায়েমী স্বার্থ এবং এমনকী অনশন ও শোক-দুঃখের মুখোমুখী হয়েও ভীতিহীন থাকা। একথা সত্য যে-কোনও একক ব্যক্তির উপদেশের যাদু-শক্তিতে ভয়ের কৃষ্ণচ্ছায়াকে নিমেষের মধ্যে দূর করা যায় না। তবুও পুনরুক্তি হলেও বলতে হবে যে অহিংসার তুলনায় অভয়ই ছিল তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি গান্ধীর শ্রেষ্ঠতম অবদান।[৮]

সমভাবে ভাবিত না হলে গান্ধীর যে অহিংসা নিষ্ঠা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুল বোঝার সম্ভাবনা, সেখানেও হীরেন্দ্রনাথ তন্নিষ্ঠ, বিষয়মুখ। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন : তাঁর অহিংসা ছিল সাহসীর আয়ুধ, ভীরু সম্মতি নয়। গান্ধী যদি কোন কিছু ঘৃণা করতেন তবে তাহলে হীনতার শ্বাস ও সাহসহীন নীচাশয়তার কানাকানি।[৯] গান্ধীর সমাজ-পরিবর্তনের উপায় কেবল ব্যক্তির নৈতিক উত্থান বা বিরোধীর হৃদয়-পরিবর্তন প্রক্রিয়া ছিল—এ জাতীয় বহুল প্রচারিত ভ্রান্তি দ্বারা হীরেন্দ্রনাথ প্রভাবিত হননি। তিনি তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : অতীব মহান ব্যক্তি হওয়ায় গান্ধী জানতেন যে কেবল নৈতিক প্রবর্তনা মূলগত সমাজ-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী উপাদান নয়। এর জন্য জনগণের সক্রিয় আন্দোলন আবশ্যক। একদা তিনি তাই লিখেছিলেন যে জনগণের যেদিকে আগ্রহ নেই, সেই খাতে তাদের উদ্যমকে প্রবাহিত করার প্রভাব আমার নেই। এই প্রায় মার্কসবাদের মতো শ্রুত প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পাল্লা দিতেই যেন ছিল নিজ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর এই জ্ঞান যে তার আন্দোলনের সব খুঁটি বা আশ্রয় কিন্তু পূর্বোক্ত ধারণার অনুরূপ নয়। তাই সেই ১৯২৮ খ্রি. ১ এপ্রিলেই তিনি জওহরলাল নেহেরুকে লিখেছিলেন, 'আমি তোমার এই অভিমতের পূর্ণ সমর্থক যে কোন না কোন দিন আমাদের এমন এক ব্যাপক জনআন্দোলনের সূত্রপাত করতে হবে যাতে ধনীবর্গ

ও মুখর শিক্ষিত সমাজের কোনো ভূমিকা থাকবে না।"[১০]

আলোচনা-সূত্রকে সংহত করার জন্য আমরা অতঃপর গান্ধী-জীবন ও কর্মের একাধারে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল এবং অন্ধকার পর্ব—রক্তস্নান ও ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে হীরেন্দ্রনাথকৃত গান্ধীর মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি দেব। এ প্রসঙ্গেও হীরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাতে হয় এইজন্য যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে কম্বু-কণ্ঠে তিনি এই সত্য ঘোষণা করেছেন যে, "গান্ধী কদাচ ভারতের এই জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়ার দায়ভাগী ছিলেন না। যতক্ষণ না তাঁর ভাষায় তাঁকে সেই তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হতে হয়, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগে লড়াই করেছিলেন।"[১১]

গান্ধী-জীবনের সেই কালপর্ব—তাঁর বিষাদ-সিন্ধুর মন্থন করেছেন হীরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক ইতিহাসের গভীর জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ড ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য ব্যর্থতার প্রধান নায়ক মহাত্মার প্রতি সংবেদী মনের মন্থন-রজ্জুর সাহায্যে। আর মন্থনের পর প্রাপ্ত সরল-অমৃতের পরিচয় হচ্ছে তাঁর গান্ধী-জীবনীর একাদশ অর্থাৎ The Last Phase অধ্যায়টি যা গান্ধী-সাহিত্যে হীরেন্দ্রনাথের অনবদ্য অবদান। স্বাধীনতার ঊষার সূচনায় ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণ আবিষ্কার প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ ঠিকই দেখেছেন যে : কেবল গান্ধী ও কংগ্রেসই নয়, কিন্তু আমাদের জনগণের আরও জঙ্গি অংশের সংগঠন ও নেতৃত্বকেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ার ফলে জাতির নৈতিকতার যে অপহ্নব ঘটেছিল, তার দায়িত্ব নিতেই হবে। আর গান্ধীর শাশ্বত সম্মানের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে তাঁর অস্তিত্বের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব আয়ুধের সহায়তায় সেই গরল-প্রবাহকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ আগস্টের আগে-পরে যখন দেশের উপর কৃষ্ণান্ধকারের ঘন যবনিকা নেমে এল এবং এক ধরনের উন্মত্ততা-প্রবাহ যখন আমাদের স্বদেশবাসীকে গ্রাস করল অনন্তকালের অবিনাশী প্রস্তরশিলার মতো গান্ধীই মানবতার প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখার নিদর্শন ছিলেন এবং সেই বিশ্বাস-শিখাকে চিরদেদীপ্যমান রাখার জন্য অবিরাম কাজ করে গেছেন।[১২]

সেই সুপরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে হীরেন্দ্রনাথকৃত গান্ধী-জীবনের ঐ পর্বের মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করা যেতে পারে। ইতিহাসের কোন্ নায়কই বা প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্তি করতে পেরেছেন? আর গান্ধীর কাছে থেকে আমরা এত বেশি পরিমাণে পেয়েছি যে আমাদের তাবৎ অনুযোগ-অভিযোগ সত্ত্বেও আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে অপর যে-কোনও মানুষের তুলনায় যাঁর নামে ভারত অধিক প্রতিধ্বনিত হয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে মেহনতি মানুষদের ভালবাসতেন, যদিচ কখনও তিনি তাঁদের সামাজিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার মতো সাবালক বিবেচনা করেননি।[১৩]

॥ ৩ ॥

অতঃপর হীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গান্ধীর ব্যর্থতার পশরার বিশ্লেষণ।

গান্ধীজীবনের মূল্যায়নের উপসংহার হীরেন্দ্রনাথ প্রশংসাচ্ছলে নাম্বুদ্রিপাদের (The

Mahatma and the Ism) একটি অভিমত দিয়ে করেছেন—জীবনের অন্তিমপর্বে একদা তিনি বলেছিলেন যে 'আমার জীবনই আমার বাণী' এবং সত্য সত্যই গান্ধী গান্ধীবাদের থেকে নিঃসন্দেহে অনেক বড়।[১৪] 'গান্ধীবাদ' শীর্ষক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি মহাত্মার মত ও পথ সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথের ধারণার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকগুলির খণ্ডনও বটে।

তবে সে প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর নিজেরও ধারণার সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হবে। 'গান্ধীবাদ' অর্থাৎ গান্ধীর মত ও পথ যদি অপক্ষোকৃত ন্যূন হয়, তবে তার পরিণতি—গান্ধীর জীবন লাঘনীয় হয় কী করে? গান্ধী-জীবন কি বীজাকার তাঁর মত ও পথের পুষ্পিত-পল্লবিত পরিণাম নয়! দুই প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদী নেতার চিন্তা-শৈলীর হেত্বাভাসের নিদর্শন না কি পূর্বোদ্ধৃত অভিমত?

প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা আপাত মুলতুবি রেখে আমরা হীরেন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য খতিয়ে দেখব। কিন্তু তার পূর্বে একটি কথা। সঙ্গত কারণেই হীরেন্দ্রনাথ 'গান্ধীবাদ' শব্দটিকে তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখেছেন। কারণ পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে যে গান্ধী কখনও 'গান্ধীবাদ' বা 'গান্ধীবাদী' শব্দগুলির স্বীকৃতি দেননি। সেই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেই তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, "পৃথিবীকে নূতন কিছু শেখাবার মত আমার কাছে নেই। সত্য ও অহিংসা পাহাড়-পর্বতের মতই প্রাচীন। আমি যা করেছি তা হল কেবল ঐ দুটি নিয়ে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর এই প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও আমার ভুল হয়েছে এবং সেই সব ভ্রান্তি থেকে আমি নূতন শিক্ষা পেয়েছি। সুতরাং জীবন ও তার সমস্যাবলী এইভাবে আমার কাছে সত্য ও অহিংসার আচরণে অনেকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে উঠেছে।"[১৫] গান্ধীজী যে তাই নিজ আত্মকথার নাম My Experiments with Truth বা সত্যের প্রয়োগ রাখবেন এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

কোনও বিধিবদ্ধ 'ইজম' বা শাস্ত্র প্রবর্তন করে তদনুযায়ী চলার বদলে বিজ্ঞানীরা যাকে trial and error অথবা 'প্রাগমাটিক' পদ্ধতি বলেন তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সমালোচকেরা কোনও কোনও সময়ে গান্ধীর জীবন ও বচনে অসঙ্গতিও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর নিবেদন : "আমার রচনার অভিনিবিষ্ট পাঠক ও এর প্রতি আগ্রহশীল ব্যক্তিদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমার বক্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ মনে হোক—এ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। সত্যের সন্ধানে আমার যাত্রাপথে আমি বহু ভাবধারা বর্জন করেছি এবং নূতন অনেক কিছু শিখেছি। আমি বয়োবৃদ্ধ হলেও আমার এমন মনে হয় না যে আমার আভ্যন্তরীণ বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা আমার এই দেহের বিনষ্টি হলেই বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমি যে বিষয়ে মাথা ঘামাই তা হল প্রতি মুহূর্তে সত্য—আমার ঈশ্বরের আদেশ পালনে আমার প্রস্তুতি। তাই আমার দুটি রচনায় কেউ যদি কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পান আর তারপরও যদি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় তাঁর আস্থা থাকে তাহলে তাঁর কর্তব্য হবে একই বিষয়ের দুটি রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিকটিকে বেছে নেওয়া।"[১৬]

গান্ধীর মত-পথ, জীবন-কর্মে মার্কসবাদী হিসাবে যে আপাত অসঙ্গতি হীরেন্দ্রনাথ বা

তাঁর মতো সমভাবে ভাবিতদের চোখে পড়ে তার মূলে রয়েছে বিধিবদ্ধ শাস্ত্রে পণ্ডিতদের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান-উদাসীন এক মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারের ভূমিকার পার্থক্য। কথাটাকে ভিন্নভাবেও বলা যায়। ইতিহাসের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের পক্ষে নূতন ইতিহাসস্রষ্টার কার্য-কলাপকে বোঝা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না।

এই উপক্রমণিকার পর হীরেন্দ্রনাথের অনুসারে গান্ধীর মূল ব্যর্থতাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে তার বিচার-বিবেচনা করা হবে। ব্যর্থতার মূল আবিষ্কার করেছেন হীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর পথের দর্শনে। স্পষ্টই বলেছেন : "এ জাতীয় আন্দোলনের বুনিয়াদী অপূর্ণতা ও (কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর গান্ধীবাদী গৌরবের নিদর্শন সত্ত্বেও) মৌলিক আধ্যাত্মিক দীনতা গান্ধির জীবনের অন্তিমপর্বের বিয়োগান্তক পরিস্থিতির মূলে।"[১৭] এই নিদানকে গান্ধী-জীবনের নানা পর্বের উত্থান-পতনের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন হীরেন্দ্রনাথ সময়োচিত ভাষায় ও ভাবে।

প্রধান ব্যর্থতাগুলি হল : মাত্রাতিরিক্ত সাধন বা উপায়ের শুদ্ধতার উপর জোর দেওয়া (means) যার পরিণামে বৈপ্লবিক লক্ষ্য (Ends) অলব্ধ রয়ে গেছে, ১৯২১-২২, ১৯৩০-৩১ ও ১৯৪৪-৪৬ খ্রিস্টাব্দের মতো বিপ্লবী মুহূর্ত সৃষ্টি হলেও তাকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তোলার অসামার্থ্য, ব্যক্তির আত্মশুদ্ধিকেই সমাজ পরিবর্তনের একমেব উপায় জ্ঞান করে চলা, গান্ধীর পদ্ধতি কিছু সীমিত ক্ষেত্রে আদর্শে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নমুনা তুলে ধরলেও তা "না শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমাধান করতে পেরেছে, না পেরেছে উৎপাদনের সমস্যা সমাধান করতে এবং না আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের জন্য জনগণ দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পেরেছে",[১৮] আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার কিছুটা সমস্যা থাকলেও জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে তার সহায়তা নেবার বদলে গান্ধীর প্রাচীন উৎপাদনপদ্ধতিই আঁকড়ে থাকা "ধনীদের ট্রাস্টিশিপ বা ন্যাসবাদ", জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করা ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি নিয়ে আরও আলোচনার পূর্বে সত্যের খাতিরে একথা পূর্বেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে হীরেন্দ্রনাথ কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গান্ধীর মত-পথ বা কৃতীর সঙ্গে যে অসহমতি ব্যক্ত করেছেন, তা absolute বা নিরঙ্কুশ নয়, গান্ধীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার জন্য তা Conditional অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষ। এই পূর্বস্বীকৃতির অভাবে এক পণ্ডিত মনীষীর দরদী গান্ধী-ভাবনার প্রতি অবিচার করার প্রত্যবায়ভাগীর সঙ্গত অভিযোগ উঠতে পারে।

যে দুটি বিষয়ে গান্ধীর বিবাদিত ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়াসে স্পষ্ট করা যাবে সেই জাতিভেদ প্রথা ও ট্রাস্টিশিপ সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা এ প্রসঙ্গের সূত্রপাত করা হবে।

অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য গান্ধী ও তাঁর নেতৃত্বের আন্দোলনের যথোচিত প্রশংসা করলেও হীরেন্দ্রনাথের মতে গান্ধী জাতিভেদপ্রথা সম্পূর্ণ দূর করতে চাননি। তাঁর এই ধারণার পিছনে সম্ভবত জীবনের প্রথমভাগে গান্ধীর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রকাশ্য সমর্থনের ঘটনা ক্রিয়াশীল। হিন্দু সমাজের বিকশিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, যাতে মানুষ পিতৃ-পিতামহের পেশার অনুসরণ করে বৃত্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তালাভের সঙ্গে সঙ্গে চার বর্ণের মধ্যে-থেকে সামাজিক সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে, তাকে গান্ধী একদা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ব্যবস্থা

বলেছেন—একথা ঠিক। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এই সত্য বুঝেছেন যে "শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমের আজ বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। বর্তমানের জাত-পাত বিচার বর্ণাশ্রমের একেবারে বিপরীত। জনমত যত শীঘ্র এর অবসান ঘটায় ততই মঙ্গল।" "জাতের বিচারের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। আধ্যাত্মিক ও জাতীয় বিকাশ—উভয়ের ক্ষেত্রেই এ ক্ষতিকারক।" পুনরপি "বর্ণাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ বা একত্র খাওয়া দাওয়ায় না নিষেধ ছিল, না থাকা উচিত। পারস্পরিক বিবাহ এবং সহভোজে নিষেধ না থাকলেও এ ক্ষেত্রে কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করা অনুচিত। জাতের বাইরে বিবাহ করবে কি করবে না অথবা খাবে কি খাবে না—এটা সংশ্লিষ্ট পুরুষ বা নারীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।"[১৮]

জীবনের শেষ ভাগে গান্ধীজী যে 'রোটি ঔর বেটি'-এর সম্বন্ধ ভারতের সংহতির জন্য অপরিহার্য বার বার এই কথা বলতেন, তার মূলেও কারণ ছিল এই। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর আশ্রমে তখনই কোনও বিবাহ অনুষ্ঠিত হত এবং তিনি স্বয়ং নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতেন যখন তাদের উভয়ের একজন অন্তত হত তথাকথিত নিম্নবর্ণের।

আসলে ভারতীয় সমাজের এই জাতিভেদ-প্রথা এমন দৃঢ়মূল যে কেবল হিন্দু অথবা অর্ধ-সহস্র বর্ষ পূর্বে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া শিখ সমাজেই নয়, ভারতীয় মুসলমান ও খ্রিস্টান সমাজের ভিতরও এই প্রথা অনুপ্রবেশ করেছে। গান্ধী তাঁর আন্দোলনসমূহের দ্বারা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে এ প্রথার প্রতি আঘাত হানলেও যেমন একে নির্মূল করতে পারেন নি, তাঁর পূর্বে-পরে জ্যোতিবা ফুলে অথবা ভীমরাও আম্বেদকরেরাও এই মানবতাবিরোধী প্রথার সম্পূর্ণ নিরাকরণে সমর্থ হননি। তবে অবশ্যই তাঁরা এ আন্দোলনকে এক এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ভারতীয় সংবিধানে একে দণ্ডার্হ অপরাধ ঘোষণা করা হলেও এবং ডান-বাম সব রকমের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেও নির্বাচন ও সংরক্ষণের রাজনীতির প্রসাদে তাঁরাই এই কুপ্রথার ভিত্তি ভারতীয় সমাজে সম্প্রসারিত করে চলেছেন। নিষ্ঠাবান সামাজিক কর্মীদের দ্বারা দীর্ঘকালীন নিরন্তর জনশিক্ষা (জন-আন্দোলনও এর অন্তর্ভুক্ত) এ সমস্যার সমাধানের কোনও ত্বরিৎ পন্থা নেই।

গান্ধীজী ধনীদের নিজ নিজ ধনসম্পত্তির ট্রাস্টি বা ন্যাসী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন, মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্ব অনুযায়ী সর্বহারার স্বার্থে ধনীর কাছে পুঞ্জিভূত পুঁজি (যা আসলে শ্রমের শোষণ দ্বারা সঞ্চিত উদ্বৃত্তমূল্য) সমাজের হিতে বাজেয়াপ্ত করার পক্ষধর ছিলেন না—হীরেন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় অনুযোগ। দুর্ভাগ্যক্রমে হীরেন্দ্রনাথ কর্তৃক উক্ত তথ্য আংশিক সত্য। কারণ গান্ধী কেবল ধনীকেই (যিনি পুঁজি সংগ্রহ করার ও তাকে আরও বাড়াবার কলায় কুশল) সামাজিক হিতে ধনের ন্যাসীতে রূপান্তরিত করার আগ্রহী ছিলেন না, জমিদার বা জমির মালিক, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, লেখক, চিত্রশিল্পী—এক কথায় যাঁদের ভিতর বিশেষ কোনও প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছে, তাদের সবার বিশিষ্ট প্রতিভার সামাজিক মালিকানায় বিশ্বাস করতেন। নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রতিভার আর্থিক প্রতিদান কেবল তাঁরা ভোগ কররেন না, সমাজের ন্যাসী বা ট্রাস্টিস্বরূপ তার ব্যবহার করে তার দ্বারা সমগ্র সমাজকে লাভান্বিত করবেন এবং নিজের জন্য নেবেন কেবল ততটুকুই যতটুকু প্রয়োজন—

এই মানসিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব গান্ধী তাঁর ন্যাসবাদের মাধ্যমে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

কারণ মার্কসীয় expropriating the expropriaters নীত একে তো ব্যবস্থাকুশলী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী ইত্যাদির ক্ষেত্রে অচল। কারণ তাঁদের expropriator বলা চলে না। দ্বিতীয়ত expropriation-এর পন্থায় তাঁদের নবরূপে পুনর্জন্ম ঘটে এই কারণে যে সমাজে তাঁদের বিশিষ্ট কার্যের প্রয়োজন থেকেই যায়। যুগোশ্লাভিয়ার সমাজবাদী বুদ্ধিজীবী মিথোভাল জিলাস তাঁর 'The New Class'-এর মাধ্যমে এই সত্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সেই নূতন শ্রেণীর প্রাসাদ ভেঙে পড়ার সময়ে কেবল ব্রেজনভের 'দাচা' ও রুমানিয়ার চেসেস্কুর প্রাসাদে ভোগ-বিলাসের যে রাজকীয় আয়োজনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে কবীরের একটি উক্তির সত্যতা নূতন করে প্রমাণিত হয়—মন না রাঙ্গায়ে কী ভুল করিয়ে কাপড় রাঙ্গালে যোগী। সমাজবাদী চীনেও মাও-এর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির নেতাকে শেষজীবনে শিখণ্ডীস্বরূপ ব্যবহার করে চক্রী-চতুষ্টয় বা 'গ্যাং অফ ফোর' যেসব ক্রিয়া-কলাপ করতে পেরেছিল, তা-ও এই সত্যের দ্যোতক।

গান্ধী সেই মন রাঙাবার পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ন্যাসবাদের মাধ্যমে। কারণ কেবল কাঠামো বদলে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় না যদি না সেই কাঠামোর সদস্য ও বিশেষ করে সঞ্চালকদের মনে নূতন মূল্যবোধ গভীরভাবে প্রোথিত না হয়। পুঁজিপতি ও জমিদার ইত্যাদিরা যে উৎপাদকবর্গকে শোষণ করে নিজেদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন এবং সেটা যে অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত এবং মানুষের বিশিষ্ট প্রতিভাকে সমাজ-হিতে বজায় রেখে আয়ের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যে তাঁর ন্যাসবাদের পরিকল্পনা এ সম্বন্ধে গান্ধীর অনেকের মধ্যে কোনও একটি লেখার উল্লেখ করতে হলে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ২৬ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রি. (পৃ. ৩৬৮) প্রকাশিত রচনাটির কথা বলা হবে।

অতঃপর হীরেন্দ্রনাথ কর্তৃক চিহ্নিত গান্ধীর মত ও পথের প্রধান ত্রুটিগুলির প্রসঙ্গ। এর মধ্যে মুখ্য হল ন্যায়শাস্ত্রের এক বহু প্রাচীন বিবাদ—উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবে তার প্রাপ্তির জন্য সাময়িকভাবে হলেও নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করা চলে কি না? এর নৈতিক দিক ও উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও আপাতত তা ছেড়ে দিয়ে একান্ত প্রায়োগিক বা বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ নিন্দনীয় উপায়ে আদৌ মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় কি না?

এ বিষয়ে গান্ধীর ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য হল : "ওঁরা বলেন, উপায় তো কেবল উপায়ই'। আমি বলব 'উপায়ই সব কিছু।' উপায় যেমন, লক্ষ্যও তদনুরূপ হবে। উপায়ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনও বিভেদের প্রাচীর নেই। বাস্তব পক্ষে স্রষ্টা আমাদের উপায়ের উপর (আর তা-ও খুব সীমিত) নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়েছেন, লক্ষ্যের উপর নয়। যেমন উপায় অবলম্বন করা হবে লক্ষ্যের পরিপূর্তিও ঘটবে ঠিক তদনুরূপ বা সেই মাত্রায়। এ নীতির কোনো ব্যতিক্রম নেই।" পুনরপি, "উপায় হচ্ছে বীজের মত এবং লক্ষ্য হল সেই বীজের সৃষ্টি বৃক্ষ। বীজ ও বৃক্ষের যে অপরিহার্য সম্পর্ক, উপায় ও লক্ষ্যেরও তাই।"[২০]

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের যে-কোনও লক্ষ্য জ্যামিতির বিন্দু বা রেখার মতো,

কোনও মানুষের পক্ষে যা নিখুঁতভাবে আঁকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে বিন্দু বা রেখার জ্যামিতিক পরিভাষার কোনও মূল্য নেই এমন কথা নয়। বাস্তবিজ্ঞান বা যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ঐ পরিভাষার উপরে। লক্ষ্য কোনওদিন পূর্ণতর উপলব্ধ হয় না। তার অনুকূল পথে যতটা চলা যায় মনুষ্যসমাজের ততটাই নগদ লাভ। অ-ধ্রুব লক্ষ্যের লোভে ধ্রুব উপায়কে উপেক্ষা করা কোনও মতেই বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমাজবাদী লক্ষ্যের আদর্শ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উপনীত হবার জন্য আপাতত জোর-জবরদস্তি ও হিংসা-ষড়যন্ত্রের পরিণামে কী হয় তার পরিণাম সোভিয়েট দেশ, পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী দেশসমূহ ও চীনের সমাজতন্ত্রের এত দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসে রয়েছে।[২১]

অতঃপর ঠিক বিপ্লবের সফলতার পূর্ব মুহূর্তে গান্ধীর হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ। প্রথমেই স্বীকার করে রাখা ভাল যে মার্কসবাদীরা যাকে শ্রমিক-কৃষকদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব বলেন, গান্ধীর অভীষ্ট তেমন কিছু ছিল না। এমনকী নিছক ভারতের স্বাধীনতা বা বিদেশি-শাসন মুক্তিও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বোদয় সমাজ স্থাপন। এর সূত্রপাত অন্ত্যোদয় অর্থাৎ সবার নীচে সবার পিছে সর্বহারাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হলেও সত্য ও অহিংসার স্থান সেই সমাজের চালকশক্তি একথা বলতে গান্ধী কখনও ক্লান্ত হননি। আর উপায় হিসাবে সত্য ও অহিংসার সঙ্গে সাময়িক ভাবে হলেও আপস করে যে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না তা আমরা একটু আগেই দেখেছি। এই কারণে গান্ধীর কাছে বিপ্লবের বিশেষ একটি মুহূর্তের কোনও মূল্য ছিল না। তাঁর পথ নিরন্তর এক পা এক পা করে এগোনোর। চরৈবেতি চরৈবেতি।

দ্বিতীয়ত গান্ধী যদি আন্দোলনের নেতা হন তবে কোন্ মুহূর্তে কোন্ পদক্ষেপ নিতে হবে তা তো তাঁকেই স্থির করতে হবে। অপর কারও সিদ্ধান্ত বা নিদান অনুসারে তো তাঁর কাজ করা সম্ভব নয়। অপর সব কৃষক-শ্রমিকশ্রেণী ও তাঁদের বিপ্লবের প্রবক্তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী বিপ্লবকে মূর্ত করার অধিকার অবশ্যই আছে। সফল হলে তাঁরা বাহবা পাবেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীর বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের যে বিপ্লবী মুহূর্তগুলির কথা হীরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সে সময়ে গান্ধী-নিরপেক্ষভাবে তাঁরা বিপ্লবকে সফল করে তুললেন না কেন? নিদান তাঁরা দেবেন আর যে-কোনও কারণেই হোক গান্ধীর আহ্বানে জনগণ সাড়া দেয় বলে সেই নিদান বা নির্দেশ অনুসারে গান্ধী কাজ করবেন—এটা নিশ্চয়ই হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য নয়। সর্বশেষে হীরেন্দ্রনাথ উল্লিখিত একটি বৈপ্লবিক মুহূর্তের উদাহরণ নেওয়া যাক। যখন গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতারা কারান্তরালে এবং মার্কসবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে একচ্ছত্র আধিপত্য। তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ কৃষকের মৃত্যু ও দীর্ঘকালীন দুর্দশায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কিছু খামতি ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের প্রবক্তাদের কেবল লঙ্গরখানা চালানো 'নিরন্নের অন্ন চাই' দেওয়াল লিখনে অথবা খুব বেশি হলে 'জনযুদ্ধের' রণকৌশল আলোচনাতেই আবদ্ধ থাকতে দেখা গেল কেন? বিপ্লবের আয়োজনে বাধা কোথায় ছিল? ১৯৪৫ খ্রি. আজাদ হিন্দ ফৌজের চমৎকারিত্বের সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে যে আপাত

উদ্বেল স্থিতি দেশে দেখা দিয়েছিল তার অন্তরালে যে ১৯৪৬ খ্রি. ১৬ আগস্টের ছিন্নমস্তাবৃত্তির গোপন প্রস্তুতি চলছিল, একথা না হয় না-ই বলা হল।

গান্ধীর সমাজ-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ। সর্বাগ্রে পরিবর্তনের হোতা বা অনুঘটক ব্যক্তির বিচার বা মানসিকতায় পরিবর্তন। অতঃপর সেই পরিবর্তিত মানসিকতার প্রতিফলন বা রূপায়ণ তাঁদের নিজ জীবনে। সমাজ-পরিবর্তন বা দই জমানোর সাজা হল বাঞ্ছিত পরিবর্তিত মূল্যবোধে জীবনকে দীক্ষিতকারী দই-এর সাজা বা পরিবর্তনের অগ্রদূতের দল। উপযুক্ত সংখ্যায় এবং সুসংগঠিত ভাবে অগ্রদূতদের ক্রিয়াশীলতা না থাকলে সমাজ-পরিবর্তন-প্রয়াস যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়, তার নিদর্শন ফলিত মার্কসবাদের বর্তমান পরিণতি। মূল কথা হল—পরিবর্তনের 'এজেন্টের' মধ্যে ফাঁকি বা অপূর্ণতা থাকলে পরিবর্তন-প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির উপর গান্ধী জোর দিতেন এইজন্য। তবে হীরেন্দ্রনাথের এ ধারণা যথার্থ নয় যে একেই গান্ধী সমাজ-পরিবর্তনের একমেব উপায় মনে করতেন। প্রস্তুতি হয়েছে বুঝলে তাঁর নিজের ধরনে ব্যাপক জনআন্দোলনও শুরু করতেন তিনি যাতে একলাফে অনেকটা এগোনো যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসহযোগ, আইন অমান্য, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২ খ্রি. আগস্ট আন্দোলনের ডাক (আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা বন্দি হন), সমাজ-পরিবর্তনের জন্য হরিজন যাত্রা, ভাইকম ও অন্যান্য মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহ ও সহভোজের কর্মসূচি, আর্থিক ক্ষেত্রে চম্পারণ, খেড়া ও বারদৌলি প্রমুখ এলাকায় তাঁর বা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত জননায়কদের নেতৃত্বে কৃষকদের সত্যাগ্রহ ইত্যাদি এই সত্যেরই দ্যোতক। জনগণের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল (বা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেওয়া) গান্ধীজিরও কাম্য ছিল। তাঁর পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচির অন্তিম লক্ষ্যই ছিল এ জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ বা স্বাবলম্বী স্বয়ম্ভর গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলা। তবে তা জনগণেরই প্রত্যক্ষ রাজত্ব হতে হবে, জনগণের পক্ষে জনপ্রতিনিধি বা তথাকথিত বিপ্লবী পার্টির মুষ্টিমেয় কয়েকজন বা 'কোটারির' নয়।

সর্বশেষে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি গান্ধীর অনীহা ও সনাতন উৎপাদন-পদ্ধতি আঁকড়ে থাকার বহু উচ্চারিত ভিত্তিহীন অভিযোগ। বিজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞান-সাধনায় কোনও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের অনীহা থাকতে পারে না। গান্ধীরও ছিল না। গান্ধীর মতপার্থক্য ছিল এর ফলিত রূপ—বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে। তাঁর স্পষ্ট ভূমিকা ছিল—কৃৎকৌশল মানুষের সর্বাঙ্গীন হিতের জন্য, মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার অধীন নয়। এ সম্বন্ধে গান্ধীর নিজের উক্তি ও ভূমিকা বিচার করা যেতে পারে :

"আমি যার বিরোধী তা হল যন্ত্র সম্বন্ধে উন্মত্ততা নিছক যন্ত্রটির নয়। উন্মত্ততা হল যাকে শ্রম-সাশ্রয়ের যন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়, তা-ই নিয়ে। মানুষ শ্রম-সাশ্রয় করে চলে যতদিন না হাজার হাজার লোককে বেকার করে দিয়ে পথে-ঘাটে উপবাসে মরার পরিস্থিতিতে ফেলা হয়। আমিও শ্রম এবং সময় বাঁচাতে চাই, তবে মানব-সমাজের একাংশের জন্য নয়, সবার জন্য। অল্প কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হোক, এ আমি চাই না—আমি চাই সবার হাতে তা যাক। যন্ত্র আজকে কিছু সংখ্যক মানুষকে কেবল লক্ষ লক্ষ নর-নারীর স্কন্ধোপরি

অধিরূঢ় হতে সাহায্য করে। এই পরিস্থিতির প্রেরণা কেবল শ্রমের সাশ্রয় করার জনহিত চিন্তা নয়, লোভ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমি সর্বশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করছি।" তথাকথিত বিশ্বায়ন বা বাজারের অর্থনীতি-উত্তর ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেও গান্ধীর পূর্বোক্ত ভূমিকা বিচারণীয়।

নিজের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার জন্য গান্ধী যোগ করেন : "...বিজ্ঞানের সত্য ও আবিষ্কারসমূহকে প্রথমত কেবল লোভের উপাদান হবার ভূমিকা ছাড়তে হবে। আর তাহলেই শ্রমিকদের উপর সাধ্যাতিরিক্ত শ্রমের চাপ পড়বে না ও যন্ত্রপাতি বাধক হবার বদলে সহায়ক হবে। আমি যন্ত্রপাতির সমাপ্তি নয়, তার সীমা নির্ধারণের জন্য কাজ করছি। ...একটি বিষয় আমি স্পষ্ট করতে চাই। আমার একমেব বিবেচ্য হল মানুষ। যন্ত্র যেন মানুষের হাত-পায়ে মরচে না ধরিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি বুদ্ধিযুক্ত ব্যতিক্রম করব। সিঙ্গার সেলাইকলের কথা ধরুন। এ যাবত যে কয়টি উপকারী যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এ একটি।" সঙ্গত প্রশ্ন উঠবে ঐ জাতীয় যন্ত্রপাতি তৈরির কী ব্যবস্থা হবে? গান্ধী মেনে নিয়েছিলেন যে তার জন্য বড় কল-কারখানা থাকবে। সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, "...তবে আমি যথেষ্ট পরিমাণে সমাজবাদী বলে বলব যে ঐ জাতীয় কল-কারখানার জাতীয়করণ হবে, বা সেগুলি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে। সেইসব কল-কারখানায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আদর্শ পরিবেশে কাজ হবে। লাভের জন্য নয়, মানব জাতির কল্যাণের প্রেরণায় সেখানে কাজ হবে। শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন আমার কাম্য। সম্পদের জন্য এই উন্মত্ত দৌড় বন্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকদের কেবল বেঁচে থাকার মতো (living) মজুরির নিশ্চয় তাই নয়, তাদের দৈনন্দিন কাজের পরিবেশেও এমন পরিবর্তন ঘটাতে হবে যাতে তা আর নিছক নীরস গতানুগতিকতা (drudgery) না থাকে।"

গান্ধী ভারতের শিল্পায়নও চাইতেন, তবে নিজ পরিভাষা অনুযায়ী : "গ্রামীণ-সমাজে পুনর্জীবন আনতে হবে। ভারতের গ্রামগুলি শহর-নগরের যাবতীয় প্রয়োজনের পরিপূর্তি করত। আমাদের শহরগুলি বিদেশী পণ্যের বাজারে রূপান্তরিত হয়ে বিদেশের সস্তা ও খেলো মাল নিয়ে গ্রামগুলিতে স্তূপীকৃত করে তাদের সম্পদ নিয়মিত বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করার পর ভারত নিঃস্ব হয়ে পড়ল।"

যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীর উক্তির পর সংক্ষেপে এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ ভারতে শহরে ভিড় বাড়িয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবার বদলে গ্রামেই থেকে কৃষির পর বাধ্যতামূলক অবসর সময়ে স্বল্প পুঁজিতে খাদি-গ্রামোদ্যোগের মতো নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনের মাধ্যমে আংশিক রোজগার পাবার ব্যাপক কর্মসূচি গান্ধী প্রবর্তন করেছিলেন—একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু যে কথাটি বহুল প্রচারিত নয় তাহলে চরকা-তাঁত এবং কুটিরশিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যায় ক্রমাগত উন্নতি সাধনের জন্য গান্ধী ও ঐ কর্মসূচিতে তাঁর সহায়কদের অক্লান্ত প্রয়াস। তারই ফলস্বরূপ ১৯০২-২১ খ্রি. গান্ধী চরকা-তাঁত এবং অন্যান্য কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্র দিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর জীবিতকালেই (ও তারপরও নিরন্তর গতিতে) সে সবের কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটেছিল। এর শর্ত ছিল কেবল একটাই

প্রযুক্তির উন্নতি বেকারত্ব বাড়াবে না এবং স্বনির্ভর শিল্পী-কারিগরের স্বাধীনতা খর্ব করবে না। আরও দুটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে গান্ধীর মানবীয় প্রযুক্তিনিষ্ঠা সম্বন্ধে। উন্নত ধরনের চরকা আবিষ্কার করার জন্য সেকালে গান্ধী এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রি. অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ স্থাপনার পর কুটিরশিল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের এক উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেছিলেন গান্ধী যার সদস্য ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, স্যার বিশ্বেশরাইয়ার মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিদ্যাবিশারদগণ।

গান্ধী ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপসংহার প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান—যার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী সহ মহামনীষী মার্কসের সমাজ ও তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাসমূহ গড়ে ওঠে—তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হবে। সে সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সত্যাবলীর মধ্যে একটি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মূল কথা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বিভিন্ন প্রজাতির (species) মধ্যে এবং একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে। এর ফলে প্রাণীদের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান এবং যার কথা ক্রপট্‌কিন Mutual Aid-এ বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেন, তার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও রাজনীতি-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েনি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকে পরিবেশ-বিজ্ঞানের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তাতে কেবল জীব বা প্রাণীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় টিকে থাকার তত্ত্ব ও তথ্যই প্রমাণিত হয়নি, বৃক্ষ-লতা-উদ্ভিদ তো বটেই, জল-বায়ু-সূর্যালোক প্রমুখ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয়ে এক সামগ্রিক বিজ্ঞানের (holistic science) প্রবর্তন হয়েছে। বিংবা শতাব্দীর শেষ পাদ ও একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান প্রমাণ করছে ধাতু-আকরিক (minerals) ও কয়লা, পেট্রোল ও ডিজেলের মতো জীবাশ্ম-জ্বালানী (fossil full) নির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থা খুব বাড়ানো কিংবা রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও ভূগর্ভস্থ জল মাত্রারিক্ত টেনে তুলে তার সাহায্যে কৃষির উৎপাদন বেশি বাড়ানোর চেষ্টা বা ঐসবের ভরসায় জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও সভ্যতা গড়ে তুলতে গেলে মানুষসহ সমস্ত প্রাণীরই অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হবে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাকে পরাভূত করে তার 'অফুরন্ত সম্পদের' (?) দ্বারা নূতন সভ্যতা-জীবনশৈলী গড়ে তোলার কল্পনা এ যুগে অচল। যা চলবে তা হল আধুনিকতম বিজ্ঞানের সত্যসমূহ উপলব্ধি করে প্রকৃতির পোষণ ও তার সহযোগিতার দ্বারা কেবল মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণীর বেঁচে থাকা ও বিকাশ। তাই গান্ধী যদি ভোগকে সীমার মধ্যে রাখার পরামর্শ দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার পথে চলার কথা বলে থাকেন, এবং এর জন্য তিনি যদি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উপর জোর দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি আধুনিকতম (পরিবেশ) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন দূরদ্রষ্টা—একথা মেনে নিতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

॥ ৪ ॥

বিশ্ববীক্ষা, জীবন-দর্শন ও মানসিকতায় গান্ধী ও তাঁর মত-পথ-কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মার্কসবাদী হীরেন্দ্রনাথের পার্থক্য দুস্তর। এছাড়া উভয়েই এমন যুগের সন্তান যখন সক্রিয় রাজনৈতিক

কর্মী হবার জন্য উভয়ের পথ কেবল ভিন্ন ছিল না, মাঝে মাঝেই তাদের একটি অপরটির উপর এসে পড়ায় সংঘাতেরও অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথের প্রথম বিধিবদ্ধ গান্ধীর মূল্যায়নের প্রয়াসের মধ্যে অপর একটি অসুবিধাও ছিল—রচনার পাত্র ও রচনাকারের মধ্যে সামীপ্য। কেবল নিজের সৃষ্টিশীল প্রতিভার বলেই নয়, বিষয়মুখীনতা তথ্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি গান্ধীর প্রতি উচ্চাঙ্গের সংবেদী শ্রদ্ধার বলে তাবৎ বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে হীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর যে মূল্যায়ন করেছেন, পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে—গান্ধী সাহিত্যে তা চিরস্থায়ী অবদান। ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে হীরেন্দ্রনাথের মৌলিক সততা ও যুক্তিবাদী মানসিকতা—যা অপর শিবিরের সত্যকে দেখার দৃষ্টি দেয়—তাঁর গান্ধী-ভাবনা বা গান্ধী-সমীক্ষাকে এমন মূল্য দিয়েছে। আর এই মৌলিক সততার জন্যই সমসাময়িক কাল ও রাজনীতির আপাত দ্বন্দ্ব-বিরোধের অন্তরালে একজন সৎ ও আদর্শবাদী মার্কসবাদী গান্ধীকে কতটা শ্রদ্ধাসহকারে বোঝার চেষ্টা করতে পারেন তার উজ্জ্বল নিদর্শন হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা। বর্তমান কালে আমরা ব্যক্তি গান্ধীর যুগকে বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে এসেছি। বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের গান্ধীর মত ও পথের একচেটিয়া উত্তরাধিকারের এক সময়ের দাবি সঙ্গত কারণেই আজ নীরব। দলের প্রভাবমুক্ত গান্ধী আজ সর্বজনের উত্তরাধিকার। ফলিত মার্কসবাদেও ১৯১৭ খ্রি. পর বহু বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটে গেছে, বিদেশে এবং এদেশেও। সুতরাং উভয় শিবিরের সৎ ও আদর্শবাদী সদস্যরাই ইচ্ছা করলে হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা থেকে ভবিষ্যতের দিশা-নির্দেশ পেতে পারেন। ভাল মানুষেরা এক হতে পারেন না—এই অনুযোগের তাহলে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। কারণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে রাত্রির তপস্যার সমাপ্তিলগ্ন এখনও উপনীত হয়নি।

সুতরাং মরমী মনীষী দ্রষ্টার গান্ধী-ভাবনা প্রসঙ্গের উপসংহার করা হবে বর্তমান প্রতিবেদকের অক্ষম অনুবাদে নয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপর ও যাঁর সব্যসাচী সদৃশ অধিকার সেই হীরেন্দ্রনাথের মূল বাংলায় রচিত গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বার্তালাপের অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে গান্ধী-ব্যক্তিত্বের উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে।

"...গান্ধীর সঙ্গে দুটো সাক্ষাৎকারেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছে অদ্ভুত শক্তি মানুষটির, তিনি বুঝি পারেন অপরের মনের ঝড়কে অন্তত স্তব্ধ করে দিতে—জীবনে অনন্ত কয়েকজনকে কাছে থেকে দেখেছি যারা প্রকৃতই মহৎ মাপের মানুষ, কিন্তু আর কারো সান্নিধ্যে ভাবিনি যে তিনি যে অন্য গ্রহবাসী, ভিন্ন পর্যায়ের একজন, মুখে সরল হাসি ও সহজ কথা কিন্তু কোথায় আত্মার অতলে তিনি স্বতন্ত্র।" ১৯৪৭ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতার পর কলকাতায় আবার খুনোখুনি শুরু হলে জ্যোতি বসু প্রমুখের সঙ্গে দাঙ্গাপীড়িত বেলেঘাটায় গান্ধীর সাময়িক নিবাসে তিনি গিয়েছিলেন। "সেবারও দেখেছি স্থিতপ্রাজ্ঞ আনন গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন, মন আহত কিন্তু একেবারে অপরাস্ত, বাক্যে জ্ঞানী অথচ সরস, সকলের চিন্তার গুমোট যেন কাটাবেন কিন্তু কোথায় যেন একক তাঁর সত্তা, যার গভীরে মগ্ন থেকেই তাঁর শক্তি।"[২৩]

পাদটীকা

১. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে; কলকাতা (২০০২)
২. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; A Unique Leader, *The Mahatma; A Marxist Seminar*; সম্পাদক এম. বি. রাও, নতুন দিল্লি (১৯৬৯) পৃ. ৭৩।
৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; *Gandhiji : A Study* ; নতুন দিল্লি; চতুর্থ সং (১৯৯৯); পৃ. ১।
৪. সমগ্রন্থ; পৃ. ২।
৫. সমগ্রন্থ; পৃ. ১৯৪।
৬. সমগ্রন্থ; পৃ. ১৯৮-৯৯।
৭. A Unique Leader, পৃ. ৭৪।
৮. সমগ্রন্থ; পৃ. ৮১। এছাড়া Ganghiji : A study গ্রন্থের পৃ. XII ও অন্যত্র দ্রষ্টব্য।
৯. সমগ্রন্থ; পৃ. ৮১।
১০. সমগ্রন্থ; পৃ. ৮৫।
১১. Gandhiji : A study; পৃ. VI এবং ১৭৮-৭৯।
১২. সমগ্রন্থ; পৃ. ১৭৬।
১৩. A Unique Leader, পৃ. ৮৬।
১৪. Gandhiji . A study, পৃ. ২০২।
১৫. Harijan; ২৮ মার্চ ১৯৩৬। প্রবন্ধে ব্যবহৃত গান্ধীজীর উক্তিগুলির সূত্র অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সম্পাদিত Selections form Gandhi।
১৬. Harijan; ২১ এপ্রিল, ১৯৩৩।
১৭. Gandhiji A study, পৃ IX।
১৮. সমগ্রন্থ; পৃ. ২০০
১৯. Harijan, ১৬. ১১. ১৯৩৫।
২০. যথাক্রমে Young India, ১৭.৭.১৯২৪, পৃ ২৩৬ ও Indian Home Rule, পৃ. ৩৯।
২১. এ প্রসঙ্গে আধুনিক মানসের উপযুক্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন অম্লান দত্ত তাঁর Ends and Means প্রবন্ধে। দ্র. In Defence of Freedom ; নতুন দিল্লি (২০০১)।
২২. যথাক্রমে Young India; ১৩. ১১. ১৯২৪, পৃ. ৩৭৮ ও Harijan, ২৭.২.১৯৩৭, পৃ. ১৮।
২৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায; তরী হতে তীর; কলকাতা (১৯৯৫); পৃ. ৩৮৭।

সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ

সত্যব্রত দত্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংসদ জীবনের ব্যাপ্তি পঁচিশ বছর, ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার উত্তর-পূর্ব কেন্দ্র থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ ১৯৫২ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্র থেকে আরও চারবার ১৯৫৭, '৬২, '৬৭ ও '৭১-এ তিনি হন এম পি। একই কেন্দ্র থেকে লোকসভার পাঁচ পাঁচবার নির্বাচিত হওয়ার নজির বিরল। লোকসভায় প্রথমদিকে কমিউনিস্ট দলের সহকারী নেতা এবং ১৯৬৪-৬৭-তে নেতার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সাংসদ হীরেন্দ্রনাথের কর্মধারা ছিল বহুধা বিস্তৃত। বিতর্কে অংশ নেওয়া তো ছিলই, লোকসভার এমন অধিবেশন খুব কমই হয়েছে যেখানে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপ্যাধায় চোস্ত সংসদীয় কায়দাকানুন প্রয়োগ করে, যুক্তিবিন্যাস ও শব্দবাণে সরকারি দলকে নাস্তানাবুদ না করেছেন, তা সে মোটা কাপড়ের ওপর ট্যাক্স বসানো হোক বা আণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের মতো গুরুগম্ভীর বিষয়েই হোক। তাছাড়া লোকসভার বিভিন্ন কমিটিতেও হীরেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় লোকসভার প্রকাশ্য অধিবেশন (যা আমরা আজকাল দূরদর্শনে দেখি এবং ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ দেখে) ছাড়াও বেশ কিছু ভাল কাজ হয় লোকসভা নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রিভিলেজ কমিটি, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি, সাব-অর্ডিনেট লেজিস্লেশন কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, পাবলিক একাউন্টস কমিটির মতো বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। কমিটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক একাউন্টস কমিটি। চারবার এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন তিনি এবং ১৯৭৫-৭৭-এ সভাপতি। কমিটির প্রতিবেদনে চোখ বুলালে বুঝতে পারা যায় কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। সাহিত্য 'অকাদেমি', সঙ্গীত নাটক এবং ললিতকলা অকাদেমির সংসদ-মনোনীত সদস্য ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। সংসদ থেকে মনোনীত হয়ে আরও বেশ কিছু সংস্থায় সদস্যরূপে তিনি সক্রিয় ছিলেন। সংসদীয় চর্চা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাম্মানিক উপদেষ্টা হিসাবে কিছু কর্মসূচির উদ্যোগ তাঁর নেতৃত্বে নেওয়া হয়। বিদেশে অনুষ্ঠিত ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন একাধিকবার।

পার্লামেন্ট ও সংসদ ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে অনেক লেখা-জোখা আছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইন্ডিয়া অ্যান্ড পার্লামেন্ট (১৯৫৯), পোরট্রেট অব্ পার্লামেন্ট (১৯৭৭, ১৯৯২)-এর মতো উচ্চমানের পুস্তক এবং কমিউনিস্ট নেতা এ. কে গোপালনের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত কমিউনিস্ট ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৭) নামক পুস্তিকা।

তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংসদীয় ব্যবস্থার অবমূল্যায়নের কারণ নির্দেশ করে তাঁর কিছু মূল্যবান লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

তবে সংসদে হীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনায় উপরে উল্লেখিত তথ্য সিকিভাগ সূত্রেরও নির্দেশ দিতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত লোকসভা ডিবেটের ২৯০ খণ্ডের (এর মধ্যে বেশ কিছু ঢাউশ আকারের) খুঁটিয়ে দেখা। লোকসভার এইসব কার্যবিবরণী ও অন্যান্য দলিলপত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের পঁচিশ বছরের সংসদ জীবনের বিবরণ। এর পর্যালোচনা। এক দুরূহ কাজ এবং একক প্রচেষ্টায় প্রায় অসম্ভব। আলোচ্য নিবন্ধকে সেজন্যই খণ্ডিত, আংশিক ও প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করা উচিত।

দুই

১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বে-আইনি সেই সময় থেকে এবং আজও হীরেন্দ্রনাথ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তিনি বলেছেন এবং লিখেছেনও। পার্লামেন্টে একজন কমিউনিস্ট হিসাবেই তিনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বভাবতই প্রয়োজন দেখা দেয়, পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পরিবেশে গঠিত আইনসভার (লোকসভা/রাজ্য বিধানসভা) প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বক্তব্যের খানিকটা আলোচনা। মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখায় 'পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজম' বা সংসদীয় স্থূলতা ও রুগ্নতার উল্লেখ পাওয়া যায়। লেনিন তাঁর বিভিন্ন লেখায় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের বক্তব্যের সমালোচনা করে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় গণতন্ত্র তথা সংসদের অসম্মতি ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মান নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ মনে করেন আইনসভা কর্তৃত্বকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি জানানোর রাবার স্ট্যাম্প মাত্র। আবার মার্কসবাদীদের মধ্যে যারা অতি বাম বলে পরিচিত তারা সংসদকে 'শুয়োরের খোয়াড়' বলে আখ্যায়িত করেন। সাম্প্রতিককালে রালফ মিলিব্যাণ্ড, প্যারি এণ্ডারসন, নিকোস পুলানৎজাস প্রমুখ পশ্চিমীদেশের বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা গণতান্ত্রিক সংসদ কাঠামোর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে এর নেতিবাচক দিকগুলো সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এদের কেউ কেউ মনে করেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ-কাঠামো মার্কসবাদীদের মানসিকতাকে আবিষ্ট করে রাখে, পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। লেনিনও মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য আইনসভা এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে হিতকর মৌলিক কোনো পরিবর্তন পার্লামেন্টের পক্ষে আনা সম্ভব হয় না। বরঞ্চ মিলিটারি, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের দমনমূলক কাজকর্মের বৈধতা এনে দিয়ে কর্তৃত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে পার্লামেন্ট।

তবে আইনসভার এবম্বিধ মূল্যায়ন সত্ত্বেও মার্কস থেকে শুরু করে কোনো কমিউনিস্ট নেতাই বুর্জোয়া আইনসভার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করেননি। লেনিন নিজেও বামপন্থী

সংকীর্ণতাবাদের সংসদ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতিসরলীকরণ বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। আইনসভায় অংশগ্রহণ নিয়ে ১৯১৮ সালে জার্মান কমিউনিস্টদের মধ্যে যখন খুব বিতর্ক দেখা দেয়, লেনিন তখন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই আইনসভায় অংশ নেওয়া কমিউনিস্টদের আবশ্যিক কর্তব্য। মার্কসবাদীরা অবশ্য সংসদীয় সংগ্রামকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধী। শ্রমিক আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতারা সংসদ ব্যবস্থার মোহে সংস্কারবাদের শিকার হয়েছেন, এ নজিরের তো অভাব নেই। তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদীরা সেজন্য সংসদ-সর্বস্বতায় বিশ্বাসী নন, সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামকেই তাঁরা গুরুত্ব দেন।

স্বভাবতই ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে এইসব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়, কর্মসূচি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭-৫১ পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি যেমন তেলেঙ্গনার সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে, কাকদ্বীপের কৃষক সংগ্রামে অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। তেমনি 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' নীতির জন্য রাজনৈতিক খেসারতও দিতে হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনী ইশতেহার প্রচার করে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর ব্যাপকতম ঐক্য গড়ার আহ্বান জানায়। ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ৩১ জন কমিউনিস্ট নির্বাচিত হন। লোকসভা আসনে সারা ভারতে সর্বাধিক ভোট পান নালগোন্ডা সংসদীয় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের নেতা কমিউনিস্ট রবিনারায়ণ রেড্ডি এবং ঐ একই কেন্দ্রের সংরক্ষিত আসন থেকে ভারতে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন হরিজন প্রার্থী সুন্‌কম আচালু। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন পাঁচজন— রেণু চক্রবর্তী, কমল বসু, নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, তুষার চ্যাটার্জি এবং হীরেন মুখার্জী। কমিউনিস্টরা লোকসভায় প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পান।

তিন

কেমন হবেন কমিউনিস্টরা সংসদে? কী হবে তাঁদের সংসদীয় আচরণ? একে তো পার্লামেন্ট সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের বে-ছক, বেয়াড়া ধারণা, তার ওপর সদ্য প্রত্যাহৃত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রলেপ ছিল তাঁদের মানসিকতায়, ছিল ওয়েস্টমিনস্টার বা ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। স্বভাবতই রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা ভীতিমিশ্রিত উদ্বেগ ও শঙ্কা ছিল কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে। তাছাড়া সদ্য নির্বাচিত পার্লামেন্টের অনেক সদ্যস্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঔপনিবেশিক আমলে আইনসভার সদস্য হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা, বেশ কয়েকজন ছিলেন সংবিধান রচনার জন্য গঠিত পরিষদের সদস্য। কিন্তু লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে একমাত্র আনন্দ নাম্বিয়ার (মাদ্রাজ থেকে নির্বাচিত) ছাড়া আর কারও সংসদ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই (মে-আগস্ট ১৯৫২) কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সংসদে যাদের প্রবেশ একটা প্রাথমিক অনীহা নিয়ে সেই কমিউনিস্টরা কী করে এমন দক্ষ সাংসদ হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করতে পারে,

এ নিয়ে অনেকের মতো ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রখ্যাত গবেষক এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক মরিস জোনসকেও বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়। আর অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের পরিশীলিত শব্দ প্রয়োগ, ঋজু-স্পষ্ট বক্তব্য, মার্জিত কায়দা কানুনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন একাধিক সংসদ বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশি লেখক। অবশ্য এর জন্য কমিউনিস্ট সদস্যদের প্রস্তুতি নিতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর। হীরেন্দ্রনাথ নিজে সেই আমলের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়েছেন। কমিউনিস্টরা তাড়াতাড়ি সংসদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন, এ প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। লোকসভার একাধিক স্পীকার এবং রাধাকৃষ্ণান ও জাকির হোসেনের মতো রাজ্যসভার সভাপতিরা কমিউনিস্টদের সংসদীয় দক্ষতার তারিফ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয়, ইদানীং একটা তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা হয় যে কমিউনিস্টরা সফল সাংসদ কারণ তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন হীরেন মুখার্জী, রেণু চক্রবর্তী, পার্বতী কৃষ্ণান, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিত গুপ্ত এবং বাংলায় জ্যোতি বসু—এঁরা সবাই 'বিলেত ফেরত' কমিউনিস্ট, প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, ভারতীয় বংশোদ্ভব রজনীপাম দত্তের কাছে বিলেতে এঁদের পাঠ নেওয়া। কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ লিবারেল সংস্কৃতি এঁদের পুষ্ট করেছে এবং সেজন্যই সংসদীয় কায়দাকানুন এত ভালভাবে এঁরা রপ্ত করে নিতে পেরেছেন; সংখ্যার দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও পার্লামেন্টে এরা অনেক বেশি গুরুত্ব আদায় করে নিয়েছেন, সমীহ পেয়েছেন। সমালোচকরা অবশ্য ভুলে যান যে "বিলেত ফেরত" কমিউনিস্ট এম-পি-দের সঙ্গে যুক্ত ছিল গণ আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ত্যাগ স্বীকার, কারাবাস এবং সর্বোপরি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। আর তাছাড়া কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা বিলেত যাননি, বিদেশে পড়াশুনা করেননি অথচ দক্ষ সাংসদ বা বিধায়ক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী প্রাক-স্বাধীনতা আমলে সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের মাত্র দুটি অধিবেশনে যোগ দিতে পেরেছিলেন (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর সদস্যপদ রীতি অনুযায়ী খারিজ হয়ে যায়) কিন্তু ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য অনেক কমিউনিস্ট বিরোধীদের বিস্মিত করেছিল। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। গুরুগম্ভীর গলায় কখনও উচ্চগ্রামে আবার মাত্রাবোধে স্বর নামিয়ে যখন তিনি বলতে উঠতেন সারা কক্ষের সমীহ তিনি পেতেন। মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস সহ সব রাজনৈতিক দলের সদস্যরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর বক্তব্য শুনতেন। বঙ্কিম মুখার্জী বিলেত ফেরত ছিলেন না। ১৯৪৫-এর নির্বাচনে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দার্জিলিংয়ের রতনলাল ব্রাহ্মণ ও তেভাগা আন্দোলনখ্যাত কৃষক নেতা রূপনারায়ণ রায় বিধানসভায় নির্বাচিত হন। সোজা-সাপটা বক্তব্য রাখতেন রূপনারায়ণ, বাক্যবাণে সরকারকে দংশন করতে তিনি ছিলেন দক্ষ। একবার তিনি বলেন, "এই সভায় মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষা আমি বুঝি না, বাইরে যে কোটি কোটি মানুষ আছেন তারাও বুঝেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সভার কত তফাৎ"। সুতরাং কমিউনিস্টরা আদর্শ ও নিষ্ঠার জন্যই সংসদ বা বিধানসভায়

নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিলেত থেকে খেতাব নিয়ে এসেছেন বলে নয়। আর এখন তো বিলেত ফেরত কমিউনিস্ট সাংসদদের সংখ্যা এক আঙুলেই গোনা যায়।

চার

লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব, প্রস্তাব পেশ, বাজেট আলোচনা, অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত বিতর্ক, রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নিজস্ব ঢং-এ বক্তব্য রাখার মধ্যে হীরেন্দ্রনাথের সংসদীয় পারঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে পঁচিশ বছর সাংসদ ছিলেন তার মধ্যে প্রথম দেড় দশক ভারতীয় পার্লামেন্ট স্বমহিমায় সক্রিয় ছিল। সাংসদদের গুণগত উৎকর্ষ ছিল উচ্চমানের, বাঘা বাঘা পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন সংসদে। ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সংসদের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত; জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উৎস ছিল পার্লামেন্ট। লোকসভার সিদ্ধান্তের ফলেই হিন্দু বিবাহ, হিন্দু উত্তরাধিকার, দশমিক মুদ্রা, ম্যাট্রিক মাপ ও ওজন, জীবনবিমা, ব্যাঙ্ক ও কয়লাশিল্পের জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ ইত্যাদি আইন প্রণীত হয়। লোকসভার আলোচনা সূত্র ধরেই অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৬৩ সালে সংসদের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে সরকারকে ভয়েস অব আমেরিকা চুক্তি বাতিল করতে হয়। সংসদে উত্থাপিত এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাতেই হীরেন্দ্রনাথের উদ্যোগ ছিল তবে তিনি বিশেষভাবে উজ্জ্বল ছিলেন পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের আলোচনায়। বলা যায়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আলোচিত হয়েছে এমন অধিবেশনের সংখ্যা খুবই কম যেখানে হীরেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেননি। অন্তত ভারতীয় লোকসভার প্রথম দিকে এটা প্রায় রেওয়াজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কেই বলতে দেওয়া হত। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত সব অধিবেশনের আলোচনা সম্ভব নয়, কয়েকটি মাত্র বিতর্কের মধ্যেই আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রথম লোকসভার (১৯৫২-১৯৫৭) শুরুর দিকে ভারতের আন্তর্জাতিক নীতির মধ্যে অস্পষ্টতা, বহুবিধ দুর্বলতা ও দোদুল্যমানতা ছিল। নির্জোট আন্দোলন তখনও সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেনি। আমেরিকার ছায়া ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী দেশগুলিকে সমর্থন করাই ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রবণতা। কোরিয়ার যুদ্ধে (১৯৫০-৫৩) উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘে যে প্রস্তাব আনে ভারত সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। মালয়ে মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য গোর্খা সৈন্যের ট্রেনিং দেওয়ার প্রধান কেন্দ্র ভারতে অবস্থিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশ থেকে ভারত যে আর্থিক সাহায্য পেত তার সঙ্গে যুক্ত ছিল অপমানজনক নানা শর্ত। ১৯৫৪ সালে কোরিয়া, ইন্দোচীন নিয়ে জেনেভায় যখন সম্মেলন চলছিল সেই সময় লোকসভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৫ মে পার্লামেন্টে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন (লোকসভা ডিবেট, ভল্যুম ৫ নং ১৬-৭৪)। জওহরলালের পরই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে বলতে দেন স্পীকার। শুরুতেই হীরেন্দ্রনাথ সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন ১৫

যে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শান্তির প্রতীক গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের যে প্রয়াস চলছে তার প্রধান অন্তরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ। জেনেভা সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেসের ভূমিকার প্রচণ্ড সমালোচনা করে আমেরিকা আগামী দিনে সারা বিশ্বের সর্বনাশ নিয়ে আসতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে এবং সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হীরেন্দ্রনাথ ভার্সাই সম্মেলনের (১৯১৯) একটি প্রসঙ্গ টেনে আনেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেষে ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে বিরাট ভূমিকা নেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। কিন্তু ফ্রান্স ছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রচণ্ড সমালোচক, উইলসনের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ক্ষুব্ধ ছিল। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমকোঁ ও ব্রিটিশ রাজদূত একদিন গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। প্যারিসে ঐদিনই এক রেল দুর্ঘটনা হয়। সংবাদপত্রের হেডিং-এর এক জায়গায় লেখা হয় রেল দুর্ঘটনা বা 'একসিডেন্ট' অন্যত্র লেখা হয় রেলে সর্বনাশ বা 'ডিসাস্টার'। ব্রিটিশ রাজদূত সবিনয়ে ক্লেমকোঁকে জিজ্ঞেস করেন, ফরাসিরা কি 'একসিডেন্ট ও ডিসাস্টার' একই অর্থে ব্যবহার করেন? ক্লেমকোঁ চটে গিয়ে জবাব দেন, না, এই দুই শব্দ সমার্থক নয় এবং ব্যাখ্যা করে বোঝান যদি রাষ্ট্রপতি উইলসন হঠাৎ করে কুয়োয় পড়ে যান তবে সেটা হবে একসিডেন্ট। আর কুয়ো থেকে তিনি যদি উঠে আসতে পারেন তবে সেটা হবে ভার্সাই চুক্তির পক্ষে ডিসাস্টার বা সর্বনাশ। জেনেভা সম্মেলনে ডালেসের ভূমিকাও সারা বিশ্বের সর্বনাশ নিয়ে আসতে পারে, এটাই ছিল হীরেন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য।

পররাষ্ট্রনীতি বিতর্কে নেহরুর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খটা-খটি হত হীরেন্দ্রনাথ ও কমিউনিস্ট সদস্যদের। তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ কিন্তু চোখাচোখা বক্তব্য রাখতেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। নেহরু আঘাত সহ্য করতেন কিন্তু মচকাতেন না, পরে অবশ্য অনেক সময়ই স্বীকার করতেন কমিউনিস্ট সদস্যদের সমালোচনার নায্যতা। হীরেন্দ্রনাথ প্রায়শই আফ্রো-এশীয় সংহতি, বিশ্বশান্তি রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশের প্রয়াস এবং জোট নিরপেক্ষ নীতিকে শক্তিশালী করার বিষয় উল্লেখ করতেন। বস্তুত ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতির সফল রূপায়ণের জন্য কমিউনিস্ট সদস্যরা যথার্থ কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ নিয়ে লোকসভায় যে বিতর্ক হয় তাতেও জওহরলাল নেহরু, ড. মেঘনাদ সাহা এবং অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের আলোচিত বিষয়ের ওপর দখল এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। (লোকসভা ডিবেট ভল্যুম ৫ পৃ. ৭০০১-৭০১৮) নেহরু তাঁর বক্তৃতায় আণবিক শক্তির সম্ভাবনা এবং এর শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তির নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর পর অধ্যক্ষ সাহা তাঁর আধঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায় বলেন, আগামী দিনে আণবিক শক্তি মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনধারাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে চলেছে। যদি সঠিকভাবে আণবিক শক্তির প্রয়োগ হয় তবে যে ভাবে অগ্নির আবিষ্কার মনুষ্য জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল ঠিক সেইভাবে শিল্পকলা বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে আণবিক শক্তি, এক উন্নত স্তরে পৌঁছবে মানব সভ্যতা। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ

সভায় (ভারতীয় প্রতিনিধি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন এই সভার সভানেত্রী) মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতার উল্লেখ করে ড. সাহা বলেন, এর ইতিবাচক দিক হল আণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে আমেরিকার নিশ্চয়তা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ড. সাহার অধিকাংশ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও জানান মার্কিন রাষ্ট্রপতির সদিচ্ছার যে উল্লেখ ড. সাহা করেছেন তার সঙ্গে তিনি একমত হতে পারছেন না। অধ্যাপক Blackett লিখিত Policitcal and Military consequence of Atomic Energy থেকে তিনি উদ্ধৃতি দেন এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা বাজেটের দিকে ড. সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আইজেনহাওয়ারের বক্তব্যের মধ্যে আন্তরিকতা নেই। উল্লেখ করতে হয় হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন ডক্টর সাহার স্নেহধন্য; তাঁর বহুব্যাপ্ত মনীষা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজ সচেতন ও জনসেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রয়াসে গুণমুগ্ধ কিন্তু লোকসভায় ড. সাহার রাজনৈতিক অস্পষ্টতার সমালোচনা করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।

উপসংহারে ভিশিনিস্কি, ম্যালেনকভ প্রমুখ নেতার উক্তির ভিত্তিতে আণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সদর্থক ভূমিকারও উল্লেখ করেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় পার্লামেন্টের যে অধিবেশনগুলি হয় তার সব ক'টিতেই হীরেন্দ্রনাথ ও কমিউনিস্ট সদস্যরা সোচ্চার ছিলেন। বস্তুত ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১), সেদিন ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান এ কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। এই কালপর্বে সংসদের অধিবেশনগুলিতে কমিউনিস্ট সদস্যরা ছাঁটাই প্রস্তাব ও অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে পররাষ্ট্র দপ্তর তথা সরকারের ঢিলেমির সমালোচনা করেন, মুক্তি সংগ্রামে আরও সদর্থক ও ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ১৯৭১ সালের কার্যবিবরণীর কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বাংলাদেশ নিয়ে সংসদের আলোচনা। কোনো কোনো সময় সংসদ ছিল উত্তাল, কোনো সময় বিক্ষুব্ধ কিন্তু সংযত, আবার ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন ঘোষণা করেন "Dacca is now the free capital of a free country" সারা সংসদ তখন হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে। কাঁথি থেকে নির্বাচিত ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য সমর গুহ ঘোষণা করেন, "The name of the Prime Minister will go down in history as the golden sword of liberation of Bangaladesh."

২৭ মার্চ ১৯৭১ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী নিয়ে সংসদে বিবৃতি দেন। মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল নিস্তেজ, ভাসাভাসা, কর্মসূচিহীন, দিশাহীন; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার কোনো নির্দেশ, এমনকী ইঙ্গিতও ছিল না। সদস্যরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তাঁদের ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পায় যখন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানতে চান, "If the Statement was the last word on the Subject."। সমগ্র লোকসভা হীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে

সায় দেয়। ফলে বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়তা দিতে হয় সরকার বিরোধীদের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে যোগাযোগ রেখে চলবেন, সক্রিয় সাহায্যের বিষয়েও বিবেচনা করা হবে।

এই পর্যায়ে হীরেন্দ্রনাথ সব অধিবেশনেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত ও দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন এবং কার্যবিবরণীতে তা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অনুবাদ নিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের একটা খুঁতখুঁতানি আছে, তিনি মনে করেন অনুবাদ যথার্থ না হলে ভাষার সৌন্দর্যের লাঘব ঘটে। সেজন্য তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মূল ইংরেজিতেই দেওয়া হল।

পাক বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ থেকে এককোটির মতো শরণার্থী যখন ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়, সেই সময় মে মাসে পার্লামেন্টের অধিবেশনে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, মূল সমস্যা রয়েই গিয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায়। স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সমন্বিত তাঁর বক্তৃতার একাংশ :

International law did not prevent France, monarchical France, Pre-revolutionary France, recognising the United Staes in 1778, When Britain Which was fighting its American colonies, did not recongnise them till 1783. The United States in 1837 did not hesitate to recognise Texas which was a part of Mexico. Mexico Jumped about it but nothing happened. The United States did not hesitate to recognise Panama straightway when Columbia used to be there on the scene and was very angry about it. The United States and so many other governments did not hesitate to recognise in 1943 De gaulle's Liberation Committee, even though they had no footing in France and they were operating from North Africa. So many instances could be given."

বক্তব্যের উপসংহারে হীরেন্দ্রনাথ বলেন, 'The recognition of Bangladesh is a must and it is the primary responsibility of the government of India to do that.

পাকসেনাদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করে তিনি বলেন, একটা নয়, অনেক অনেক 'মাই ল্যাই' ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে। Except for embattled Vietnam, I do not think there has been and other instance of an unequal and harrowing contest in history like the one that is going on in Bangla Desh. (Lok Sabha Debate vol II No 2 pp 228-235)

পরবর্তী অধিবেশনগুলিতেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য সাংসদদের ভাবিয়েছে, পার্লামেন্টের সমর্থন পেয়েছে এবং সরকারের সক্রিয় করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং একাধিকবার সংসদে তা স্বীকারও করেছেন।

পাঁচ

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন অনেকের মতো হীরেন্দ্রনাথকেও আহত করে। লোকসভায় তিনি হন সি পি আই-এর নেতা, এ কে গোপাল হন সি পি এম-এর নেতা। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সংসদে কমিউনিস্টদের ভূমিকা অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালে স্বতন্ত্র দল প্রধান বিরোধী গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পায়, সংসদে এই দলের সদস্যরাই সোচ্চার হন। বস্তুত বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট দলের মান্যতারও অবসান শুরু হয়।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন সারা ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর পার্লামেন্টকেও কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। তিরিশ জন এম পি গ্রেপ্তার হন। প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণী ইত্যাদি সংসদীয় পদ্ধতির প্রয়োগ বাতিল হয়। সংসদ সদস্যদের বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মন্ত্রীদের বক্তৃতা ছাড়া বিরোধী পক্ষের সদস্য এমনকী কংগ্রেস সদস্যদের বিরূপ মন্তব্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না সেন্সারের জন্য। ২১ জুলাই (১৯৭৫) সংসদের অধিবেশন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ধরনের সরকারি নিষেধাত্মক ফরমানের জন্য সংসদ কার্যত অকেজো হয়েই থাকবে এবং এর পরিণতিও ভাল হবে না। জরুরি অবস্থাকালীন পার্লামেন্টকে তিনি 'ক্যাপটিভ বডি' বা শৃঙ্খলিত সংস্থা বলে অভিহিত করেন।

১৯৭৫-৭৭ পর্বে হীরেন মুখার্জী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, চন্দ্রাপ্পন প্রমুখ সি পি আই সদস্য লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীরা জরুরি অবস্থার অপব্যবহার এবং সরকারের জনবিরোধী নীতির আলোচনায় মুখর ছিলেন। কয়েকবার সরকারকে পার্লামেন্টের জন্য হেনস্থাও হতে হয়। সি পি আই সদস্যরাই 'সংবিধান অতিরিক্ত' কেন্দ্র দ্বারা সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বাড়ছে ইত্যাদি অভিযোগ আনেন। কিন্তু জনসমক্ষে এইসব প্রচারের কোনো সুযোগ ছিল না নিষেধাজ্ঞার দরুন। বরঞ্চ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে কুৎসা প্রচারিত হতে থাকে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে সেজন্য আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, জরুরি অবস্থার সমর্থন ছিল সি পি আই-র আদি পাপ ('অরিজিনল সিন') যার রাজনৈতিক মূল্য সি পি আই-কে দিতে হয়েছে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে।

পঁচিশ বছরের সংসদ জীবনে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অনেক সময় লোকসভার রকম-সকম দেখে অস্বস্তি বোধ করেছেন, হাঁপিয়ে উঠেছেন এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাল্কা মেজাজে সংসদকে 'গ্যাস চেম্বার'-ও বলেছেন কিন্তু স্বীয় ভূমিকা পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হননি। এই দীর্ঘ সময়ে স্বীয় দলকে (কমিউনিস্ট হিসাবে তিনি কখনও অনুতপ্তবোধ করেননি), সমাজ ও দেশকে এবং নিঃস্ব নির্ধন মানুষকে যা দিয়েছেন তা তুলনাহীন। যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন সংসদকক্ষের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, মানুষের অধিকারের প্রশ্নে শাসকদের প্রতি রূঢ়, অতি রূঢ় ব্যবহার করেছেন (রেল ধর্মঘট নিয়ে ৯ মে ১৯৭৪ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ), আবার অজন্তা গুহার ফ্রেস্কোর লয়প্রাপ্তির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন দেওয়াল চিত্রগুলোর সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয় (ডিবেট, ভল্যুম XLIII পৃ. ১৩০৫৫-৫৬)। তাঁর প্রবাদ-প্রতিম বাগ্মিতা সংসদ ও সংসদের বাইরের অগণিত মানুষকে মুগ্ধ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর বাকচাতুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বৈদগ্ধ্য, সুভদ্র মার্জিত আচরণ ও বিভিন্ন সংসদীয় অস্ত্রের প্রায়োগিক পারদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলীর নজির ভারতের সংসদ ইতিহাসে বিরল।

ভারতের সংসদব্যবস্থা আজ এক পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত, এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এতে শঙ্কিত কিন্তু ৯৬ বছর বয়সে আজও তিনি সক্রিয়। ভারতের সংসদ কাঠামোর অবমূল্যায়নের কারণ নির্দেশ করে তাঁর ক্ষুরধার ও বিশ্লেষণাত্মক লেখনী আজও সচল। দেশবাসীর এ কম প্রাপ্তি নয়।

এ্যান্ড 'দিস ওয়াজ এ ম্যান' : জহরলাল

বাসব সরকার

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'The Gentle Colossus : a study of Jawaharlal Nehru' প্রকাশিত হয় নেহরু প্রয়াত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে, ১৪ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে, জহরলালের ৭৫তম বর্ষপূর্তির দিনে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের মূল্যায়নে তাঁর 'Gandhiji : a Study' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে মহাত্মার অপমৃত্যুর দশ বছর পরে। আর সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর গ্রন্থ 'Bow of Burning Gold' প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে, নেতাজীর অন্তর্ধানের বত্রিশ বছর পরে। তিনটি গ্রন্থই চরিত্র মূল্যায়ন। তথ্য হিসেবে একথাও উল্লেখ্য গ্রন্থ তিনটি রচনার কালগত ব্যবধান বিশ বছর। ভারত ইতিহাসে বিশ শতকের তিন প্রধান পুরুষের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল। তিনি গান্ধী আন্দোলনের Participant observer ছিলেন, আকৈশোর পরিচিত ছিলেন গান্ধীর পিতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। বঙ্গদেশের রাজনীতি ও মুক্তি আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে হীরেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ আর সেই ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়েছিল লেখকের সাংসদ জীবনের প্রথম বারো বছরে শরৎ বসুর সঙ্গে। আর জহরলালের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি, রাজনৈতিক মতামতের প্রভূত বৈপরীত্য সত্ত্বেও।

মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন হীরেন্দ্রনাথ করেছেন রাজনৈতিক দিক থেকে। তাঁদের পিতৃত্বের শক্তি ও দুর্বলতা, জনগণের সঙ্গে তাঁদের জটিল সম্পর্কের দিক থেকে। নিজের বক্তব্য, কর্মসূচি আর লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে অটল প্রত্যয় সেই লক্ষ্যপূরণে অবিচল থাকার মতো সংকল্পের দৃঢ়তা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের সবচেয়ে শক্তির দিক। সেখানে তাঁরা ছিলেন আপসহীন। তার জন্যে যে-কোনো মূল্য দিতেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাব যে অভূতপূর্ব গণরাজনীতির সূচনা করে তা গোড়া থেকেই প্রমাণ করে দেয় গান্ধীর সমতুল্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এদেশে তাঁর আগে আর আসেনি। নিজের রাজনৈতিক ভূমিকার অপরিহার্যতার ধারণা গান্ধীর মনে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। তাই নিজের শর্তে তিনি গড়ে তুলতে পারতেন রাজনৈতিক আন্দোলন। যেখানে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত দেশের রাজনীতির চালচিত্রে এর কোনো হেরফের ঘটেনি।

জহরলালের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ঘটেছে কার্যত গান্ধীর হাত ধরে। প্রাক্ গান্ধী যুগের ভারতীয় রাজনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। পিতা মোতিলালের প্রভাবে আইনজীবীর ভূমিকা কিম্বা কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে মাঝে মধ্যে যোগদান, জহরলালের জীবনে

কিম্বা মনে কোনো স্থায়ী ছাপ ফেলেনি। আত্মজীবনীর পাতায় সেকথার অকপট বিবৃতি দিয়েছেন নেহরু স্বয়ং। হীরেন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত উল্লেখও করেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে জহরলালের প্রবেশ যখন ও যেভাবে ঘটে যায় দেশে গান্ধীর ডাকে গণরাজনীতির বোধনপর্ব। জহরলালেরও ঘটে যায় দেশে গান্ধীর পরেই, অবশ্যই সুভাষ-উত্তরপর্বে, দ্বিতীয় জননেতার জীবনচরিতে প্রবেশপর্ব। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন গান্ধীর সম্মোহিনী শক্তি জহরলালকে তাঁর সমগ্র সত্ত্বা নিয়ে জাতীয় রাজনীতির বৃত্তে টেনে না আনলে "with his kind of gift and sensitivity, he might have gone his lovely way, with 'some unborn protest, some unformed idea', inconsequentially to society and in virtual oblivion" (পৃ. ২১৩)।

বিলাতে ছাত্রজীবনের যে অভিজ্ঞতার কথা আত্মজীবনীতে জহরলাল লিখেছেন সেখানে তাঁর দুটি আত্মসমীক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯০৯ সাল মদনলাল ধিঙ্গরা এক জনসভায় কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করে হত্যা করার পর যখন বিলাতের সংবাপত্রেও ধিঙ্গ্রার সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের সপ্রশংস উল্লেখ হতে থাকে, তখন জহরলালের প্রতিক্রিয়ার তার বিশেষ কোনো ছাপ পড়েনি। অথচ সেই সময়েই তিনি চিঠিপত্রে দেশে তিলকের চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণের উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় ঘটনা হলো কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বিশিষ্ট কিছু মানুষকে সাম্মানিক উপাধিদানের সভায় যখন সমস্ত অতিথির হাতে মানপত্র তুলে দেওয়ার সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবারেই, সেই তিনি ব্যতিক্রমী আচরণ করলেন আগা খান ও বিকানীরের মহারাজার ক্ষেত্রে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ জহরলাল বিষয়টি কখনো ভুলতে পারেননি। উপনিবেশের মানুষদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান প্রদান যে আমলে রাজনীতির খেলা, তাতে শাসক-শাসিতের সম্পর্কে সামান্য হেরফের ঘটে না, সেই উপলব্ধি অস্পষ্টভাবে হলেও তখনই হয়েছিল।

জহরলালের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে এই ঘটনার অভিঘাত কেমন হয়েছিল তার ব্যাখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ, এরিক এরিকসনের 'Young Man Luther' গ্রন্থ থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরিকসনের লেখায় ইতিহাস ও মানব মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ আছে। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষণে তার প্রযোজ্যতা খুব বেশি। লুথার প্রসঙ্গে এরিকসন যখন বলেন তাঁর চরিত্রে সাধারণভাবে তরুণ বয়সেই একটা "inarticulate stubornness, a secret furious inviolacy, a gathering of impressions for eventual use within some as yet dormant new configuration of thought" ছিল, জহরলাল প্রসঙ্গে লেখক মনে করেন সেই কথাটা খুবই সঠিক (পৃ. ১৫)। আরো পরে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণেও হীরেন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন (পৃ. ১১৫), যার থেকে বোঝা যায় ভারত ইতিহাসে বিশ শতকের তিন প্রধান পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্বে চেতনা বৃত্তে প্রায় একই ধরনের রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক মিথষ্ক্রিয়া চলেছিল। হয়তো সেই জন্যই গান্ধীর ডাক জহরলালকে ভিতর থেকে যেভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁর জীবনে তার সমতুল্য কোনো কিছু এর আগে আর ঘটেনি। পিতা মোতিলালের প্রতি গভীর স্নেহাসক্ত এবং অনুগত

জহরলাল রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীর 'পিতৃত্ব' (জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী, বয়ঃকনিষ্ঠ সমস্ত অনুগামীদের প্রায় সকলের কাছেই 'বাপু' ডাকে অভ্যস্ত ছিলেন) তাঁকে একইভাবে স্নেহাসক্ত ও অনুগত করেছিল। মোতিলালের রাজনৈতিক জীবনে মাঝে মাঝে পুত্র জহরলালের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে, যদিও শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা হয়েছে বোঝাপড়ায়। জহরলালের সঙ্গে গান্ধীর রাজনৈতিক মতবিরোধে শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা হয়েছে বোঝাপড়ায়। জহরলালের সঙ্গে গান্ধীর রাজনৈতিক মতবিরোধে শেষ পর্যন্ত যে জহরলাল বাপু'র প্রতি আনুগত্য থেকে সরে যেতে পারবে না, সেই বিশ্বাস গান্ধীরও ছিল। তাই জহরলালের র‍্যাডিকাল চিন্তাধারায় গান্ধীর আর্থ-সামাজিক মতাদর্শের প্রতি যাঁদের আনুগত্য ছিল একশো শতাংশ তাঁরা গভীরভাবে বিচলিত বোধ করলেও গান্ধী বলতে পেরেছিলেন তাঁর অবর্তমানে জহরলাল 'shall be speaking my language'. জহরলালকে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পিছনে এই গভীর বিশ্বাস কাজ করা ছাড়াও গান্ধী হয়তো এটাও বুঝেছিলেন যে বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী কিম্বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে এই বিরাট দেশের বহু বিচিত্র জনমানসের টানাপোড়েনে গোটা দেশকে সমভাবনায় ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না।

গান্ধীর রাজনৈতিক ডাকে জহরলাল শুনেছিলেন 'some kind of direct defiance fo anthority on a mass scale' (পৃ. ১৯) যা রাজনৈতিক গতানুগতিকতার অর্থহীনতার মধ্যে এমন এক সাড়া জাগায় যাকে জহরলাল স্বয়ং বলেছেন, tremendous relif', যখন তাঁর মতো অনেকেই 'afire with enthusiasm' হয়ে পড়ে 'gaol going'-কেই সেই সময়ের অবশ্য রাজনৈতিক কর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে জহরলাল তখন এবং পরে বহু সময়েই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছেন কিন্তু কোনো সময়েই খুব সাধারণভাবে ছাড়া সঠিক কোনো পরিবর্তন দরকার যে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেননি। জহরলাল জীবনের কোনো পর্বেই 'was not cast in a very positive political mould', যার জন্য যে-কোনো বিষয়ের নানা দিক ভেবে তাঁর মন সিদ্ধান্ত গ্রহণে 'could not overcome, hesitancies and scruples and take a downright stand.' জহরলাল সেই ধরনের বিপ্লবী ছিলেন না, হতেও পারেননি যেহেতু তিনি 'was not made of the stuff of revolutionaries who have to be determind and doubt-free, even at the cost of certain crudities and a readiness to be ruthless'. তাই জহরলাল তাঁর নেতা গান্ধীর পথ ধরেই চলেছেন মনে করে থাকলেও 'his foot-steps left very diffenent imprints'. এর থেকে হীরেন্দ্রনাথ যে সিদ্ধান্তে এসেছেন জহরলালের চরিত্র আলোচনায় সেটা একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে : 'Jawaharlal's distiuctive quality, in politics and in life, was his sensitivity, his quickand acute response to impressions, a peculiar delicacy of perceplion and an inhate fashidiousness, whichl, often in his public an private life, gave him a kind of anguish as well as ecstasy that others differently endowed were insensibly spard' (পৃ. ২৩)।

সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা গান্ধী ও তাঁর নেতৃত্বে প্রাণিত হয়ে জহরলাল যখন এলাহাবাদের বাইরে প্রতাপগড় জেলার কৃষকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে যাতায়াত শুরু করেন। যখন অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেন জনগণের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আর থাকছে না। সেই আত্ম আর ভারত আবিষ্কারের প্রাথমিক শিহরণের ঘোর জহরলালের সমগ্র জীবনে কখনোই কাটেনি। জনগণের সঙ্গে কেবল নয়, তাদের নিবিড় সান্নিধ্যে জহরলালের প্রাণশক্তি যেভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠতো। এদেশে অন্য কোনো জননেতার জীবনে তা আর দেখা যায়নি। পিতা মোতিলাল প্রতাপগড় জেলার কৃষকদের সঙ্গে জহরলালের মেলামেশাকে দেখেছিলেন নির্বাচনী রাজনীতির গণসংযোগের কর্মসূচি হিসেবে। তাঁর মনে আশা জেগেছিল। জহরের জনপ্রিয়তা ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী নির্বাচনে প্রতাপগড়ের রাজার পরাজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে।

গান্ধীর শিষ্য হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু হওয়ায় কারাবাস যখন প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়, তখনও জহরলাল বলেছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাশুল হিসেবে জেলে যেতে হলে অভ্যস্ত জীবনের যেটুকু পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে তার বেশি কিছু তিনি সচেতনভাবে ছাড়েননি। সন্ন্যাসীর মতো, ত্যাগীর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার প্রতি তাঁর কোনো নৈতিক আকর্ষণ ছিল না। সেই ধরনের মূল্যবোধ তিনি সমর্থন করেননি। তবে জীবনযাপন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বৃত্তে প্রবেশের সূত্রে যেহেতু অনিবার্যভাবেই বদলে যায়। নেহরুর জীবনে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। তার ফলেই ঘটেছিল মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন, যা পরিবেশ ও পরিস্থিতি তখন সব রাজনৈতিক কর্মীর কাছেই দাবি করেছিল। জনগণের সান্নিধ্য, জহরলাল নিজেই বলেছেন, তাঁর জীবনের এমন কিছু 'inner need' পূরণ করে, যার থেকে কর্তৃত্বের প্রাথমিক স্বাদ তাঁর 'will to power' কিছু পরিমাণে তৃপ্ত করে। নেহরুর নিজের কথায় তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল একটা সংগ্রামের ক্ষেত্র। যেখানে পরস্পরবিরোধী নানা শক্তি, প্রবণতা প্রাধান্য বিস্তরের চেষ্টা করে যেত অবিরাম। তাই নিরন্তর সক্রিয়তার মধ্যে তিনি খুঁজে পেতেন জীবনের সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য অবস্থা, যা তাঁর ব্যক্তিত্বে চরিত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে। ঘন ঘন এবং নানা দৈর্ঘ্যের কারাবাসের মধ্য দিয়েই জহরলাল সেই চরম উপলব্ধির স্তরে উপনীত হন যে পরাধীন দেশের মানুষদের রাজনৈতিক সংগ্রামে বোধহয় 'একলা চলো রে'-এর শিক্ষার চেয়ে বেশি মূল্যবান কিছু নেই।

জহরলালের এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার তৎকালীন উপলক্ষ গান্ধীর কিছু নীতি ও সিদ্ধান্ত হলেও, একটা গভীর যন্ত্রণাবোধ থেকে তিনি গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে বলে মনে করলেও, আত্মজীবনীতে একথাও না লিখে পারেননি যে সব রকমের অদ্ভুতত্বের সমাহার গান্ধীর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এই মানুষটির এমন এক 'amazing and almost irresistible charm and subtle power over people' রয়েছে যার জন্যে গান্ধী অপরিহার্য। ফলে মানুষ যদি আর জননেতা গান্ধীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জহরলালের গান্ধী বিচারের মাঝে মধ্যে গভীর ছাপ ফেললেও, জহরলাল শেষ পর্যন্ত গান্ধীর এই দুই সত্তার কাছেই আনুগত্য প্রকাশ্যে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে গান্ধীর উপরে তাঁর একটা বিশেষ ধরনের নির্ভরতার

সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেটা জহরলালের চরিত্রের একটা বিশেষ ঘাটতি পূরণ করে, যার সঙ্গে তুলনীয় আর কিছু জহরলালের সমগ্র কর্মজীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯২০-র দশকে গান্ধীর অনেক রাজনৈতিক কাজ ও সিদ্ধান্ত জহরলাল যেমন মনের দিক থেকে মানতে না পেরেও শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেছিলেন, তেমনই গান্ধীর আরেকটি কাজ, বিড়লা প্রমুখ শিল্পপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পিতা মোতিলালের মতো তিনিও না মেনে এই আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে, গান্ধীকে কংগ্রেসের কাছে অর্থ সাহায্য করার পাশাপাশি লাজপত্ রায় ও মদনমোহন মালব্যকে অর্থ দিয়ে বিড়লা কংগ্রেস সংগঠন দখল করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিড়লার অর্থে পুষ্ট হয়ে তখন হিন্দু মহাসভা এই দুই পিতাকে সামনে রেখে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে যেভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তার জন্যে দেশকে অবশ্যই একদিন মূল্য দিতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে গান্ধীর মতো জনজীবনের মাঝখান থেকে উঠে আসা নেতা না হয়েও মোতিলাল ও জহরলাল ধর্মীয় চেতনার প্রসার, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ সম্পর্কে যে সব আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, একই চেতনা গান্ধী-মানসে কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি কেন? হয়তো এই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তাঁদের বিচারের মাপকাঠিটাই আলাদা ছিল।

গান্ধী জহরলালের উপর যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাঁর চৈতন্যকে একটা বিশেষ খাতে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন, সেটা আগাগোড়া একইভাবে কাজ করেনি, এটাও যেমন সত্য, তেমনই এটাও ঠিক যে জহরলাল বিদ্রোহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও গান্ধীর সম্মোহনী প্রভাবের বাইরে কখনোই যেতে পারেননি। মানব চরিত্রের শক্তি ও দুর্বলতা গান্ধী তাঁর নিজের মতো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই জাতীয় আন্দোলনে, তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী, সমস্ত সংকটকালে জহরলালকে নানা কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। এই সূত্রেই বলা দরকার ভারতীয় রাজনীতির গান্ধী পর্বে মহাত্মার পক্ষে জহরলালকে নানাভাবে ব্যবহার করার যে বিশেষ তাগিদ অনুভূত হয়, তাঁর অনুগামী অন্য কোনো কংগ্রেস নেতাকে নিয়ে গান্ধী সেই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাগিদ কখনো অনুভব করেননি। এটা যেমন গান্ধী নেহরু সম্পর্কের একটা বিশেষ দিক তুলে ধরে তেমনই গান্ধীর উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা যে জহরলাল ছাড়া আর কারো নেই, ১৯২০ দশকের শেষ থেকে সেটাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তোলে। বস্তুত 'nation is safe in his hand' বলার মতো অবস্থায় গান্ধী এসেছিলেন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই। জহরলাল আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে তিনি সম্মানিত বোধ করার চেয়ে আহত বোধ করেছিলেন অনেক বেশি। এই সম্মান, এইভাবে নেতৃত্বে মনোনয়নে, জনগণের তাঁর প্রতি আস্থা আছে কিনা যাচাই হওয়ার বদলে, গান্ধীর প্রতি গভীর আস্থা থেকেই যে জনগণ গান্ধীর মনোনয়ন মেনে নিচ্ছে, এই চিন্তাটাই নেহরুর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। তৎসত্ত্বেও গান্ধীর সিদ্ধান্তই সর্ব সম্পতিতে অনুমোদিত হয়। জহরলাল নিজেই লিখেছেন, তাঁর নেতৃত্বের স্তরে পদোন্নতি ঘটলো। সামনের খোলা দরজা দিয়ে সকলের আলাপ আলোচনা ও সম্পত্তির ভিত্তিতে নয়। তিনি মঞ্চের মাঝখানে এসে হাজির হলেন 'trapdoor'

দিয়ে। কিন্তু গান্ধী এ কাজ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব বিচারের ভিত্তিতে, যেহেতু তিনি নিজেই বলেছেন, জহরলাল রাজনৈতিক চিন্তায় চরমপন্থী হয়েও তার মধ্যে সেই বিনয় ও বাস্তববুদ্ধি রয়েছে যার জন্য সে কখনো কোনো সম্পর্ককে ভাঙনের মুখে নিয়ে যাবে না। তাই খিড়কির দরজা দিয়ে নেতৃত্বের পদে উন্নীত হয়ে জহরলালের অহমিকায় যে আঘাতই লাগুক না কেন, সে এই মনোনয়ন কখনোই অস্বীকার করবে না, এই বিশ্বাস গান্ধীর ছিল। শুধু তাই নয় অন্যান্য সম্ভাব্য সমালোচকদের নিরস্ত করার জন্যে গান্ধী এটাও বলেছিলেন যে জহরলাল 'rash and impetuous' ঠিকই, কিন্তু দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই দুটোই জহরের নেতৃত্বের বাড়তি গুণ বলেই প্রমাণিত হবে।

এই সময় থেকে শুরু করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্ত পর্যন্ত গান্ধী নেহরু সম্পর্ক দু'জনের দিক থেকে মোটামুটি সহনশীলতার সেই পরিসরেই আবর্তিত হয়। যেখানে মতান্তর মাঝে মাঝে ঘটে থাকলেও মনান্তরের সম্ভবনা দেখা দেয়নি কখনো। এই সম্পর্কে অবশ্যই নিয়ামকের আসনে ছিলেন গান্ধী। জহরলালের ক্ষোভ, সমালোচনা বিদ্রোহের পর্যায়ে যায়নি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে গান্ধী যখন তাঁর ধারণা অনুযায়ী আন্দোলনের কর্মসূচিতে অটল, তখন জহরলালসহ কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে ছিলেন ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধে মতাদর্শগত অবস্থান নেওয়ার তাগিদে। গান্ধী তাঁদের জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, আন্দোলনের ডাক দেওয়া হলে জনগণকে সুনিশ্চিতভাবেই তিনি সঙ্গে পাবেন। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক যে কর্মসূচিতে গান্ধীর অনুমোদন আছে, অন্য কারা তার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে, সেই তথ্য নির্বিশেষে জনসমর্থন থাকবে গান্ধীর সঙ্গে। তাই ভারতছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচিতে হয়তো কিছু পরিমাণে অনিচ্ছুক জহরলালকে সামিল হতে হয়েছিল নিজের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে। বলা যায় রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে বিয়াল্লিশের আন্দোলন পর্যন্ত এই প্রায় আড়াই দশকে জহরলাল গান্ধীর ছায়াবৃত হয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের স্বতন্ত্র, স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের অবস্থায় কখনও আসতে পারেননি। এখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জহরলালের পার্থক্য। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গান্ধীর নেতৃত্ব, কর্মসূচি, পথ যতোদিন তাঁর বিচারে অনন্য মনে হয়েছে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর নেতৃত্বকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভিন্নপথ গ্রহণেও প্রয়োজনে ইতস্তত করেননি একদিনও। এই মানসিক দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় নেহরুর ছিল না। নেহরু বিবেকদংশনে জর্জর হয়েছেন, গান্ধীর কথায় মত পরিবর্তন করে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গেই থেকেছেন। এই আনুগত্যকে জহরলালের গান্ধীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হওয়ার কৌশল, একটা স্বার্থবুদ্ধি বলে মনে হতে পারে, তেমন সমালোচনাও আছে যথেষ্ট; কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ বিষয়টির ব্যাখ্যায় জহরলালের মনের গঠন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। জহরলাল গান্ধী প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন, মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মুহূর্তে গান্ধীর একটা সঠিক পদক্ষেপটি যথাসময়েই গ্রহণ করার ক্ষমতা। তখন কেবল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে নয়, জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর প্রেক্ষিতেও তার যুক্তিযুক্ততা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে (উদ্ধৃত পৃ. ৬৩)। ফলে জহরলালের মনে এই ধারণা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে

ওঠে যে গান্ধী কেবল জাতীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা নন, তিনি 'almost synonymous with the causl' (পৃ. ৬৫) হয়ে পড়েছেন, যা এদেশের অন্য কোনো নেতা বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নেহরু বলতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সূত্রেই হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, আন্দোলনে, সংগ্রামে জহরলাল উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন, তাঁর চিন্তাধারায় আসতো বিশেষ ধরনের ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখা যেত একটা সংশয়ী ধারা, যা তাঁকে ইতস্তত করতে, দৃঢ়পদক্ষেপে লক্ষ্যপূরণে অগ্রসর হতে বাধা দিত। হয়তো চরম সংগ্রামের জন্য যে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হবে, তার চিন্তাই তাঁর কর্মতৎপরতার, সংকল্পের রাশ টেনে ধরতো। ব্যক্তিগতভাবে নিজের যে-কোনো কাজের জন্যে চূড়ান্ত মূল্য দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু সমগ্র জনগণের কাছে ততোটা প্রত্যাশা করা সঙ্গত কিনা, উচিত হবে কিনা, এটা নিয়েই তিনি সংশয়ে দীর্ণ হতেন (পৃ. ৬৫)।

জাতীয় জীবনের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর্বে গান্ধীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি বিষয় যথা সম্ভব সুনিশ্চিত করা যে, জহরলাল আন্তরিকভাবেই তাঁর পাশে আছেন। কারণ মধ্য তিরিশের দশক থেকে জহরলাল বিশ্বপ্রেক্ষিতে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের কথা বলার সময় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি যে সমর্থন খোলাখুলি প্রকাশ করতে থাকেন, তার ফলে দেশের সচেতন জনমতের একাংশের মধ্যে তাঁর একটা স্বতন্ত্র সামাজিক ভিত্তি ধীরে হলেও গড়ে উঠতে শুরু করে। জনমানসের গতিপ্রকৃতি বোঝায় গান্ধীর যে দুর্লভ ক্ষমতা ছিল, তার ভিত্তিতেই তিনি বুঝেছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি দেশের একাংশের মানুষের এই আকর্ষণ যদি জহরলাল প্রমুখদের নেতৃত্বে ভিন্ন পথ ধরে, তাহলে গান্ধীর ধারণা অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনায় বাধা আসতে পারে। তিনি সেই ঝুঁকি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। মনে করা যেতে পারে গান্ধী সুভাষচন্দ্র কিম্বা অন্যদের বিরোধিতার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু জহরলালের ক্ষেত্রে, বিশেষত যদি দেশের তরুণ সমাজ নেহরু সুভাষের যৌথ নেতৃত্বে ভিন্ন পথ ধরে, সেই ঝুঁকি নিতে গান্ধী অরাজি ছিলেন আগাগোড়া। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, গান্ধী তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সচেতনভাবেই একের পর এক সেইসব পদক্ষেপ নিতে থাকেন, যাতে জনগণের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিয়ানা সংযত করা যাবে এবং তাঁর চিন্তা অনুসারে ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। অথচ জনগণের এই জঙ্গি চেতনায় জহরলাল উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন (পৃ. ৭৬)। জহরলালের ওপর নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব এই কাজে যথাসাধ্য ব্যবহার করতে গান্ধী কখনোই দ্বিধা করেননি। আর জহরলালের পক্ষে গান্ধীর সম্মোহনী ক্ষমতা এড়িয়ে চলা সাধ্য ছিল না। তাই নেহরু-সুভাষের যৌথ অবস্থান সমকালের পরিস্থিতিতে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারতো তা সম্ভবনাতেই বিনষ্ট হয়। হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন জহরলালের মনে, 'indecision and peculiar scruples and a sord of fixation about Gandhi's incontestable indispensibility, remains a major blemish on Jawaharlal's record' (পৃ. ৮০)। এই সূত্রেই হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন নেহরু ও সুভাষ এক জোট হয়ে দাঁড়াক, গান্ধী কোনোদিনই সেটা চাননি। তাদের মধ্যে দূরত্ব গান্ধীর রাজনীতির অনুকূল বলে মনে হতো।

জাতীয় আন্দোলনের যে-কোনো সংকটে যখনই সাম্প্রদায়িকতাবাদের কোনো ছায়াপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মোতিলাল ও জহরলাল, পিতা-পুত্র একযোগে তার বিরোধিতা করে সেকুলারত্বের ধারণাটি আগাগোড়া তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব ছিল আপসহীন। ফলে মুসলিম লীগ কিম্বা হিন্দু মহাসভা, কোনো সংগঠনকেই তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। আর তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে সমকক্ষতার ভিত্তিতে কোনো আলাপ আলোচনাতেও তাঁরা নারাজ ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন যখন ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি থেকে মাথাচাড়া দিতে থাকে তখন জহরলালের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল অসহিষ্ণু। অথচ দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠী যে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন থেকে ক্রমাগত: সরে গিয়ে একটা বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণের দিকে চলেছে, সেটা জহরলালের চেয়ে বেশি আর কেউ জানতেন না। কারণ তখনকার যুক্তপ্রদেশে, যার বর্তমান নাম উত্তরপ্রদেশ, মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নেহরুদের পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে ঘনিষ্ঠতার জন্যে এটা জানা খুবই সহজ ছিল যে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্ব ক্রমশ অ-সেতুসম্ভব হয়ে উঠছে। এহেন অবস্থায় মুসলিম লীগকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসই কেবল সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করা হতে থাকলে যে মুসলিম মনস্তত্বকে এক কথায় নাকচ করে দেওয়া হয়, জহরলাল সেই বিষয়টি আলাদা করে ভাবেননি, কিম্বা ভাবতে চানওনি। ঘটনাচক্র তার মাশুল দিতে হয়েছে দেশভাগে। সব রকমের সাম্প্রদায়িক সংস্থা সম্পর্কে নেহরুর মনে একটা 'insuperable psychological barriers' গড়ে উঠেছিল, যাকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯ জিন্নাকে একটি চিঠিতে নেহরু লিখেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কিছু করতে না পারার জন্য তিনি লজ্জিতবোধ করেন। কারণ মনের দিক থেকে এ বিষয়টির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে তিনি অপারগ। তাই 'though I have given much thought to the problem and understand most of its implications, I feel as if I was an outsider, an alien in spirit.' (উদ্ধৃত, পৃ. ১০২)

শুধু তখন নয়, লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে, যখন স্পষ্টতই বোঝা যেতে থাকে যে ইংরাজরা কংগ্রেস লীগ বিরোধকে হাতিয়ার করে এদেশে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইছে তখন নিজস্ব উদ্যোগে লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু, কিম্বা ১৯৪৫-৪৬ সালের সেই উত্তাল গণ আন্দোলনের পর্বে যখন হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত শক্তিকে মুক্তির সংগ্রামে ব্যবহার করার মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল তখনও কোনো উদ্যোগ নেহরু গ্রহণ করতে পারেননি কিম্বা চাননি। গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে এটা সম্ভব হতো না। নিজের অসাম্প্রদায়িকত্ব অটুট রাখার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে সরে থাকা সেকুলারত্বের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করা যায় না। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কাজ করতে দেওয়া গেলে দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারতো, কংগ্রেসের সভাপতিপদের সদ্য দায়িত্ব নিয়ে জহরলাল একটা মারাত্মক কৌশলগত ভুল করে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি বানচাল করে দেন। জহরলালের অকৃত্রিম সুহৃদ মৌলানা আজাদেরও মনে হয়েছিল কংগ্রেস সভাপতিপদের দায়িত্বটা ছেড়ে না দিলে ঘটনা

অন্যদিকে মোড় নিতে পারতো। হীরেন্দ্রনাথ পরে এই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যে ঠিক হয়নি, আজাদের সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ১০৬)। যে জিন্না মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এইজন্য, যে মিশন তাঁকে ম্যানুভার করার সুযোগ দিতে চায়নি, সেই জিন্নাই নেহেরু মন্তব্যে মিশনের কাছে দেওয়া তাঁর সম্মতি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিয়ে পাকিস্তান আদায়ের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করে দেন।

হীরেন্দ্রনাথ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের এই ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে জহরলালের চিন্তাধারায় জিন্না লীগ ও পকিস্তান দাবি সম্বর্কে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই গড়ে উঠেছিল সেখানে কূটকৌশলে লক্ষ্যপূরণের প্রতি একটা প্রবল অনীহা থেকেই নেহেরু তাঁর পছন্দ, অপছন্দ, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধান্বিত হননি বলেই মনে করেছেন। ভারতকে অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ রাখতে তখন বিকল্প ছিল আর একটাই, শেষ পর্যায়ের গণসংগ্রাম শুরু করে ক্ষমতা দখল করা। সাম্রাজ্যরক্ষায় ইংরেজদের ক্ষমতা যে প্রায় অবসিত। সেটা নেহেরু নেতাদের মধ্যে জহরলালের অজানা ছিল না। সেই সংগ্রাম ভয়াবহ কিম্বা দীর্ঘস্থায়ী কোনোটাই হওয়ার সম্ভাবনা তখন আর ছিল না। তবে সেই লড়াই যে-কোনো মূল্যে চালিয়ে যেতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কমিউনিস্ট কিছু নানা মতের বামপন্থী আর প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পন্ন মানুষ ছাড়া অন্যরা প্রস্তুত ছিল না। জহরলালের সরকারিভাবে অনুমোদিত জীবনীকার মাইকেল ব্রেচারও মনে করেন 'one positive indecement for acceptance of Pakistan was, even for where, the tempting prize of power' (পৃ. ১১১, উদ্ধৃত)। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে রণক্লান্ত জহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতারা শেষ জীবনে ক্ষমতার স্বাদ পেতে একটু বেশি মাত্রায় আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের বিশেষ কারণ নেই। বেদনার সঙ্গে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ার পেছনে তাঁদের যে রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক একটা পরাজয় ঘটে গিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই পরাজয়ের গ্লানিকে সহনীয় করে তোলার জন্যেই তাই এমন কিছু রাজনৈতিক ঘটনা কিম্বা পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল যা ঘটনা প্রবাহের এই কুটিল আবর্তকে কাজ চালনোর মতো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে বিশ্বাস্যতা ফিরে পেয়ে যাবে। তাই জওহরলালের মিশনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরেও ভেতর থেকে তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই এই মন্তব্য করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, "This suggests a peculiar variety of pragmatison, rather unlike Nehru, but there it is." (পৃ. ১১১)।

ক্ষমতা হস্তান্তর বিশেষত তার দিন ঘোষণার মধ্যে বিকাশমান পরিস্থিতিতে জনমানসে দেশভাগের ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক হানাহানির তীব্রতা বাড়িয়ে তোলার বদলে আশাপূরণের যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে সেই ধরনের হিসেবনিকেশ সচেতনভাবে করা হয়েছিল কিনা বলা যাবে না। হীরেন্দ্রনাথ মৌলানা আজাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, একটা 'charm' প্রায় জাদু প্রভাবের মতো মানুষের মনে জমে থাকা উত্তেজনা একটা প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের আকারে সেই ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ ফেটে বের হয়ে এসেছিল (পৃ. ১১৪)। অথচ চিন্তাশীল

মানুষদের অনেকেই তখন সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন "দেশের মানুষ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে ethically counterfeit মুদ্রায় কিনেছে, যার জন্যে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও তারা "feel sufficiently the glow of that freedom" অনুভব করতে পারে না। হীরেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের একমত না হয়ে পারা যায় না। (পৃ. ১১২)।

এরিক এরিক্সন 'তরুণ লুথার' সম্পর্কে আলোচনায় যখন লেখেন "the trauma of rear-defeat fallows a great man through life" হীরেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে একমত হয়েই ভারতে সেকুলার গণতন্ত্র কায়েম করার সমস্ত উদ্যোগ জওহরলালের ভূমিকার বিশ্লেষণেও সেকথা বলতে চেয়েছেন (পৃ. ১১৩)। ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে নেহেরুর ঐতিহাসক 'Trust with destiny' বক্তৃতায় 'redeeming our pledge' বলার সময় সম্ভবত সেই একই ধরনের আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল। যে বিপর্যয় ও রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বন্তর সৃষ্টি হয় সেখানে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলানো ছিল ভীষণ কঠিন কাজ। অথচ জনগণের উচ্ছ্বাস যে বাঁধভাঙা ছিল, এই সামান্য আলোকে তার প্রথম যৌবনের অসাধারণ অভিজ্ঞতা বলে আজো তা স্মরণ করতে পারে। মৌলানা তাঁর শেষ জীবনে বারবার বলেছেন ইংরাজ সরকার এবং তাঁর প্রতিনিধি বড়লাট মাউন্টব্যাটেন সেই সাম্প্রদায়িক রক্তস্নান কোনো মতে ঘটতে দেবেন না বলে প্রতিশ্রুত হয়েও দ্বিচারিতা করে গেছেন শেষ পর্যন্ত।

উত্তর উপনিবেশ পর্বে দেশে সেকুলারত্ব কায়েম করায় জওহরলালের নিরলস প্রচেষ্টার বিস্তারিত আলোচনা করে হীরেন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন বিদেশিরা যাকে জওহরলালের 'holier-than-thou' মনোভাব বলে অনেক তির্যক মন্তব্য করেছেন, আসলে সেটা ছিল তাদের একধরনের মনগড়া ধারণা। নেহেরু বারবার একটা কথা বলে এসেছেন, যতোদিন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আছেন, ততোদিন ভারত কোনো মতেই 'হিন্দুরাষ্ট্র' হবে না। (পৃ. ১১৬)। বস্তুত সাম্প্রদায়িক হানাহানির সেই দিনগুলিতে মহাত্মার শরীরী উপস্থিতি দেশের যে প্রান্তেই তিনি থাকুন কেন, আর পরস্পরের নেতৃত্বে জওহরলাল দেশের সংখ্যালঘুসহ সমস্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে একটা বড়ো আশ্বাস ছিল যে দেশটা কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না। সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসের মর্যাদা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল আজীবন রক্ষা করে এসেছেন প্রভূত প্ররোচনার মধ্যে এবং অত্যন্ত দক্ষ হাতে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যেখানে ঘোষিত নীতি ছিল ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের, অর্থাৎ দেশভাগের পর যারা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা চিন্তাও করেনি কোনোদিন, তাদের কেবল 'territorially Indians' বলে গণ্য করা, পাকিস্তানী রাষ্ট্রনেতা ও জঙ্গি দলগুলির একটানা ভারতবিরোধী প্রচার যা হিন্দুত্ব চেতনাকে পুষ্ট করতো, তাদের যৌথ চাপ যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে প্রতিফলন না হয় তার উপর জওহরলালের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। জীবনের শেষ বছরেও হজরতবাল প্রসঙ্গে যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়। তার মোকাবিলা করার সময়ও জওহরলাল এক মুহূর্তের জন্যে রাজনীতি ও ধর্মের গাঁটছড়া বাঁধার কোনো প্রলোভন, সমস্যা সমাধানের সহজ পথ নেওয়ার প্রতি কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। অলক্ষ্যণীয় বাস্তবতার দোহাই দিয়ে নেহেরুর রাজনৈতিক সহকর্মী কিম্বা সরকারি আমলারা নানা যুক্তি হাজির করার

চেষ্টা করলেও জওহরলাল-মাঝে মাঝে দোটানায় পড়ে হয়তো কিছুটা ইতস্তত করেছেন, কিন্তু সেকুলারত্বের প্রশ্নে কোনো আপস করেননি কখনও।

কিন্তু জনজীবনকে প্রকৃত সেকুলারত্বের পথে পরিচালিত করতে গেলে নিপীড়িত জাতপাতের ও সংখ্যালঘু নানা সাম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাপনে বাস্তব যে পরিবর্তনগুলি জরুরি, জওহরলালের নেতৃত্বকালে মৌলিকভাবে এইসব পদক্ষেপ নিয়ে কোনো পরিবর্তন করা যায়নি; কিম্বা হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই কেবল স্লোগানসর্বস্ব হতে পারে না। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাপনের মৌল প্রয়োজন মেটাতে সহযোগী হয়ে উঠতে পারলেই সমাজের সেকুলার বনিয়াদ গড়ে উঠতে পারে। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে মজবুত একটা বনিয়াদের উপর গড়তে পারলেই যে দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সমস্যার একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে, সেই বিশ্বাসে প্রাণিত হয়েও সমাজের বুনিয়াদ রূপান্তর ঘটাতে যে ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করা দরকার ছিল, জওহরলাল সেই কাজটি শুরু করতে পারেননি। দেশের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন নেহেরুকে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেও কাজের সময় তাদের অভ্যাস ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই কাজ করেছে। হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন 'Here is inability which, in a man so crucial to history, has cast a shadow on the steps of our advence and makes us farther rather show stride ahead.' (পৃ. ১৩৬)। লেখকের দ্বিধাহীন মন্তব্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ, যে প্রক্রিয়ায় দেশের এই দুর্গতি ঘটেছে, তার পরিবর্তনের জন্যে সমাজে এবং মানুষের মনে বিপ্লবের অপরিহার্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থাকলেও 'Jawaharlal Nehru had an almost incradicable allergy towards action that obviously was required if his goals were to be achieved" (পৃ. ১৩৭)।

দেশে প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ঘটাতে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের নৈরাজ্য থেকে সুচিন্তিত, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি দরকার প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বেই সেই ধারণা অন্তত দেশের দুজন প্রথম সারির নেতার চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল, সেকথা ইতিহাস স্বীকৃত। তাঁরা হলেন সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন সেটা ছিল জওহরলালের সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটা নীল নক্সা রচনার ব্যবস্থা করা। পরাধীন দেশে প্রাদেশিক সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে কাজ যতটা করা সম্ভব তার কথাই বলা হয়েছিল কমিটির সুপারিশে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নেহেরু কংগ্রেসের একটি অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম কমিটি গঠন করেন তাঁরই সভাপতিত্বে। কমিটিতে পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন অধ্যাপক কে. টি. শাহ। অধ্যাপক শাহ কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি পদে হস্তক্ষেপ ও আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে সদস্যপদে ইস্তফা দেন। দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করতে জওহরলালের উচিত হবে সরকার থেকে বেরিয়ে এসে দেশকে এই কাজে ব্রতী করার জন্যে আত্মনিয়োগ করা। এটাই ছিল তাঁর বিশেষ পরামর্শ। নেহেরু কেবল তখন নয়, পরেও প্রশাসনিক অকর্মণ্যতায় বহু কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না বলে খোলাখুলি

মত প্রকাশ করেও কেন সে কাজ করতে পারেননি, সেটাই মস্ত বড়ো একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের সুখ্যাত 'ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি'র বিশিষ্ট সম্পাদক শচীন চৌধুরীর মন্তব্য প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করে লিখেছেন "his love of good form, his weakness for outward show and lofty disregard of unpreasant necessities" ছিল তার প্রধান কারণ (পৃ. ১৪৪)।

হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও পরবর্তী বছরগুলিতে দেশে যে ধরনের অস্থিরতা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল, তার জন্য নেহেরুর মনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি কাজ বলে মনে হয়েছিল। তাই আর্থ-সামাজিক রূপান্তর কর্মসূচি দেশে বিরাট সামাজিক ওলটপালট ঘটাতে পারে ভেবে তিনি শংকিত হয়ে উঠতেন। পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিকোণ তাই মধ্যপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে যতোটা দ্রুত পরিবর্তন আনা যায়, সেটাই ছিল লক্ষ্য। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান ১৯৫৯ সালে ভারত সফরে এসে লিখেছিলেন তৃতীয় পরিকল্পনার বৈপ্লবিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে চীনে যে কাজ করা হয়েছে জোর জবরদস্তির ভিত্তিতে ভারত সেটাই করতে হবে দরকার হবে "organized pressure of a popular movement under government leadership so dynamic and so purposeful that it can inspire people to do voluntarily" যা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে (পৃ. ১৫৩)। জহরলাল সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন লিপম্যানের মন্তব্যে অনেক কিছুই আছে যা বিশেষ ভাবার কারণ আছে। ভারতে যে প্রশাসনিক যন্ত্র রয়েছে তার হালচাল ও কর্মপদ্ধতি ইংরাজ আমলের, সময়ের সমতালে চলার পক্ষে তা অনুপযুক্ত। লিপম্যানের মতো একজন প্রবীণ সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের মতামত খতিয়ে দেখার যোগ্য। এরই কয়েক বছর আগে সুইডিশ অর্থনীতিবিদ মিরডাল মন্তব্য করেছিলেন শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতে মাথা পিছু জাতীয় আয় তাদের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-পঞ্চমাংশ বলে এখানে অগ্রগতির হার দ্রুততর না হলে ব্যবধান আরো বাড়তে বাধ্য। জীবনের শেষ দিনগুলিতে ভারতে বিকাশ হার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য নেহরুর যে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল, বাস্তবে রূপায়িত করার মতো মানসিক দৃঢ়তা তিনি দেখাতে পারেননি। বরং হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যে 'তীব্র সংবেদনশীলতা হয়তো বা তাঁর ইচ্ছার দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল' (পৃ. ১৫৭)।

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি জহরলালের অনুরাগ ও আনুগত্যে কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ভারতের মতো দেশে বহু যুগের জমে থাকা জঞ্জাল সরিয়ে, জনগণের বিরাট অংশকে ভাগ্য পরিবর্তনে সামিল করতে যে ধরনের বলিষ্ঠ নীতি এবং সংকল্পের দৃঢ়তা দরকার ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সে কাজ তিনি করতে পারেননি। বস্তুত এদেশে জহরলাল ১৯২৭ থেকে সমাজতন্ত্রের প্রচারকই থেকে যান, তার রূপকার হতে পারেননি। হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন "whether it was Gandhi's spell or his own inner voice, Jawharlal remained himself, as it were, in the middle, 'between two fires...not unsure

about the side he had chosen but unsure about what exactly to do in regard to the choice." (পৃ. ১৬৬) তাঁর অবস্থান ছিল অনেকটা "Like a tortured Kafka in politics, he thought he could see the way but on looking again saw it was only woavering." (পৃ. ১৬৬) কোনো পর্যবেক্ষকের মনে হয়েছে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সোচ্চার ঘোষণা হয়তো জহরলাল করেছিলেন পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে উত্তর উপনিবেশ পর্বের রাজনৈতিক সম্পর্কের একটা যোগসূত্র বজায় রাখার তাগিদ থেকে এবং হয়তো এই ঘোষণার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াসহ বিকাশমান তৃতীয় দুনিয়ার রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভারতকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার প্রয়োজনে, যাতে পশ্চিম দুনিয়া ভারতের উপর যে চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছিল, তাকে প্রতিহত করা যায়।

কারণ যাই থাক্ না কেন শেষ পর্যন্ত সবটাই হয়ে দাঁড়ায় 'generous proliferation of socialist semantics.' (পৃ. ১৭৩), যা দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে গভীরতর কোনো ব্যঞ্জনা এবং গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার দায় শুধু জহরলালকে ইতিহাসের বিচারে বহন করতে হচ্ছে না, উত্তর উপনিবেশ ভারতে যে বিরাট আর্থ-সামাজিক সমস্যা অক্টোপাসের মতো জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে ধরে তাদের তিল তিল করে এগিয়ে দিচ্ছে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে, সেই দেশের মানুষদেরও সেই দায় গ্রহণ করতে হবে। যে গণআন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করার কথা লিপম্যান বলেছিলেন চীনের বিকল্প পথ হিসেবে, বামপন্থীরাও সেই ধরনের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি সমাজতন্ত্রের কথা বাগাড়ম্বর থেকে বাস্তবায়িত করার জন্যে। সমাজে যে একটা গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে সেকথা গান্ধী তাঁর আদর্শ অনুযায়ী বরাবরই বলে এসেছিলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা ঠিক কী চান এবং কীভাবে চান, সেই মত ও পথের দ্বন্দ্ব নেহরু-উত্তর ভারতে এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। জহরলালের সীমাবদ্ধতা আসলে ছিল ভারতের সামাজিক বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা, যা ভাঙার মতো গণউদ্যোগ এদেশে শুরু করা যায়নি।

ভারতের বিদেশনীতি যে জহরলালের উত্তর-উপনিবেশ পর্বে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, কিছু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ছাড়া সেকথা স্বীকারে কোথাও কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই। দেশের শাসনক্ষমতার ভার যে দলই গ্রহণ করুক না কেন, তাদের অবস্থানে রাতারাতি পরিবর্তন এসে যায় রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সারা দেশের সমর্থন বিগত পাঁচ দশক ধরে অটুট রয়েছে। কখনও কোনো সরকার তার সামান্যতম হেরফেরের ইঙ্গিত দিলে প্রতিবাদের যে ঝড় ওঠে, সেটাই প্রমাণ করে যে জাতীয় স্বার্থের যে দৃষ্টিকোণ নেহরুর এই নীতির মধ্যে প্রতিফলিত তার পিছনে জাতীয় সহমত নিয়ত সক্রিয় রয়েছে। জহরলাল জাতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্যে জোট নিরপেক্ষ নীতির যে নীতি রচনা করেছিলেন, এক মেরুকৃত বিশ্বে সেই জোটবদ্ধতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও পঞ্চশীলের মর্মবস্তু আদৌ বদলে যায়নি। যে সম্পর্কগুলিকে জহরলাল কালোত্তীর্ণ সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এক মেরুকৃত বিশ্বেও যে সেইসব সম্পর্কের গুরুত্ব সমানভাবে অনুভূত হয়, নেহরুর দূরদর্শিতার সেটাই এক বিশিষ্ট প্রমাণ।

জহরলাল প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যে কথা অশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে সেটা হলো 'This was a man.' মানুষ নেহরুকে লেখক সমস্ত মানবিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শেক্সপীয়র অন্য এক মানুষ সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ শেষ অধ্যায়ের সূচনায় তারই কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন :

"His life was gentle, and the elements
So mixi'd in him that Nature might stand up
And say to all the world 'this was a man'!"

হীরেন্দ্রনাথ এই অধ্যায়েই বলেছেন অশেষ মানবিক গুণের অধিকারী এই মানুষটি চার দশক ধরে ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে 'gentle colossus'-এর মতো তাঁর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ছিলেন, যেখানে তাঁর চরিত্রের অনন্যতার জন্যেই প্রভূত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তিনি জননায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। নেহরু চরিত্রের এই দিকটি যাঁদের নজরে পড়েছিল তাঁদের মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরম বিরোধী এবং নেহরু বিদ্বেষী চার্চিলের মতো মানুষও ছিলেন। সেই চার্চিল নেহরুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর বলতে পেরেছিলেন 'a man without malice and without fear' (উদ্ধৃত, পৃ. ২১৩)। প্রধানমন্ত্রী জহরলালকে খুব কাছের থেকে অন্তরঙ্গভাবে দেখার সুযোগে লেখকের নেহরু চরিত্রের যে দিকটি চোখে পড়েছিল, গান্ধী-উত্তর ভারতের প্রধানতম নেতা, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি 'was no maker of history, for he nad neither the strength not the crudity, that was needed, but in his own way he was peerless' (পৃ. ২১৩)। নিজে একজন রাজনীতিক হয়েও, সারা জীবন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেও 'had a vital part of himself utterly untainted by peculiar squator of political life.' (পৃ. ২১৪) হয়তো সেই জন্যেই জহরলালের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল সারা জীবন তিনি জনগণকে ভালোবেসে এসেছেন এবং তারাও সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে অপরিমেয়ভাবে, সারা জীবন ধরে।

জহরলালের জনসভায় ভাষণ ছিল আলাপচারিতার মতো। গুরুগম্ভীর বিষয়কে কঠিন ভাষার আবরণে অপরিসীম বাকপটুতায় উপস্থাপন করার ইচ্ছা কিম্বা ক্ষমতা কোনোটাই জহরলালের ছিল না। তাঁর বক্তৃতার ধরন ছিল অভিজ্ঞতা ও ভাব বিনিময় ধরনের, ডায়ালগের মতো। জনতা আর জননেতার মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাদের একজন হয়ে পড়া, যে- কোনো বয়সের মানুষদের জনসমাবেশে বিশেষত শিশু, কিশোর, ছাত্র ও যুব সমাবেশে জহরলাল কতো সহজে তাদের একজন হয়ে পড়তেন, যার মধ্যে কোনো অভিনয় থাকতো না, সেটা চোখে দেখার সুযোগ সীমিতভাবে হলেও এই আলোচকের হয়েছে ১৯৪৫ সাল থেকে।

হীরেন্দ্রনাথ তাঁর নেহরু সমীক্ষা রচনার সমসময়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : "modern India, proud of her past

but somewhat weighed down by its immensity, a little unsure about herself yet aware that she could not do without an acceptance of the spirit of science, was more truly represented by Jawaharlal than by Gandhi" (পৃ. ২১৯) তাই গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণকালে গান্ধী যখন "would justify himself only to himself, Jawaharlal would seek justification not only of himself to himself but to all others." (পৃ. ২২০) দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে শক্তিমান একজন নেতা, যাঁর লোকসভায় গরিষ্ঠতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না, তিনি যে তাঁর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে, তাদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করবেন, সেটা গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি গভীর অনুরাগ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। বিপুল জনসমর্থন জহরলালকে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী করেছিল, যা কেবল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকেই উৎসারিত হতে পারে। কিন্তু সেই শক্তিকে নিজের ইচ্ছার রূপায়ণে ব্যবহার করতে গেলে যে ধরনের একাগ্রতা, অনন্যমনা হওয়া দরকার, সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে যে-কোনো মূল্যে লক্ষ্যপূরণের দিকে অগ্রসর হওয়ার কঠিন সংকল্প থাকা দরকার, ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা জহরলালের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ জহরলাল প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন 'he was greater than his deeds and truer than his surroundings' (উদ্ধৃত, পৃ. ২২৩) সে কথাটাই বোধহয় নেহরু চরিত্রের সার্থক মূল্যায়ন।

হীরেন্দ্রনাথকে তাই বলতে হয়েছে যে, জহরলাল এদেশের মানুষকে পরিবর্তমান দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন, তাদের সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু জনগণ তাঁর কাছে যে প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর মতো অদম্য একাগ্রতা, সব কিছু উপেক্ষা করে [illegible]র মতো কঠিন পৌরুষ জহরলালের ছিল না। এই সিদ্ধান্তই তাই হীরেন্দ্রনাথের অনিবার্য [illegible]য় ওঠে : "He was our beautiful but ineffectual angel beating his luminous [illegible]ngs largely in vain." (পৃ. ২২৩)

[illegible]জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমকালের সমস্ত সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। কাশ্মীর, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, দল ও দেশের অসংখ্য জটিল আন্তর সম্পর্ক নিয়ে জহরলাল কাজ করতে করতেই passed into history, যা খুব কম নেতার জীবনচরিতে অপূর্ণতা সত্ত্বেও মহত্ত্বের একটা মাত্রা যোগ করেছিল। হয়তো তাঁর জীবনে অপূর্ণতা অনিবার্য ছিল। কারণ ক্ষমতাসীন খুব কম নেতাই তাঁর যুগের সমস্যা সম্পর্কে সদা সচেতন থেকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে উত্তরণের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস করে থাকেন। নেহরুর কৃতিত্ব হলো সেই কাজটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন একনিষ্ঠভাবে, যেখানে তাঁর প্রয়াসে কোনো ঘাটতি ছিল না। তিনি যে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, সমকালের ভারত তার প্রমাণ। কিন্তু দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন এখনও দেখে, ভোগবাদের সুবিপুল প্রাধান্যের মধ্যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার আতিশয্যের মধ্যে সমষ্টির জীবনযাপনের গ্লানি যে এখনও মানুষকে গণমুখী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, সেই

মানসিকতা সৃষ্টিতে নেহরুর আদান ছিল এবং হয়তো বা আজো আছে। সেকুলার গণতন্ত্রের প্রতি দেশের বেশির ভাগ মানুষের আনুগত্য, মৌলবাদ বিরোধিতা, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যে মানুষ এখনও সমর্থন করে, সেটাই জহরলালের অবদান। হীরেন্দ্রনাথের নেহরু চরিত তাই একটা মানুষের কাহিনী হয়ে উঠেছে, যে মানুষ সবাইকে নিয়ে চলা যায় না জেনে বুঝেও গণউদ্যোগে সকলকে সামিল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নেতা, রাজনীতিক, প্রধানমন্ত্রী, জহরলাল নয়, মানুষ জহরলালের জীবনচরিত রচনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ যাতে উত্তরকাল "cannot cease to cherish the memory of this gem of a man" (পৃ. ২৩২)।

॥৩॥

হৃদয়ের রক্ত

শঙ্খ ঘোষ

নেহরুকে নিয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *The Gentle Colossus* বইটি যখন বেরোল, প্রগতিশীলদের অনেকে প্রকাশ্যেই বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন তখন। একজন কম্যুনিস্টের কলম থেকে নেহরুকে নিয়ে এমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বই? বইপ্রকাশের সেই বছরে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগও হয়ে গেল, শোধনবাদী নাম দিয়ে এক পক্ষের অপর পক্ষকে আক্রমণ করা সহজ হয়ে গেল, এবং একজন শোধনবাদীর পক্ষেই যে ও-রকম বই লেখা সম্ভব সেটা বুঝতেও আর অসুবিধে রইল না কিছু। কয়েক বছরের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারেও ব্যবহার করা হবে এই বইকে, মার্ক্সিস্ট দলের পক্ষ থেকে বেশ ঘোষণা করেই বলা হবে যে নেহরু-ভজনাকারী এই ছদ্ম-কম্যুনিস্টকে যেন ভোট না দেন বামপন্থার কোনো সমর্থক। নির্বাচনে তবু অবশ্য জিতেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ।

নির্বাচনে জিতে যাওয়া ছাড়াও, আমাদের মতো কোনো কোনো মানুষের মনের মধ্যেও একটা জয় তখন পেয়ে গিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ এবং না-এর উগ্র সীমারেখা দিয়ে ভাগ-করা দৃষ্টির প্রয়োগে যে সাহিত্যবোধ জীবনবোধ এমনকী রাজনীতিরও বোধ একটা দমচাপা রুদ্ধতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, পৌঁছচ্ছে এক অন্ধ গলিতে, আমাদের কারো কারো তা মনে হচ্ছিল। সেই আমাদের পক্ষে গান্ধী বা নেহরু বিষয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথের বই অনেকখানি আশ্বাসের মতো এসে পৌঁছেছিল সেদিন। আশ্বাসটা এই যে, কম্যুনিস্ট হলেই একদেশদর্শী হয়ে-ওঠাটা সকলের পক্ষে অনিবার্য নয়। আশ্বাসটা এই যে, কম্যুনিজমে বিশ্বাস রেখেও একটা খোলা মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। আশ্বাসটা এই যে, হ্যাঁ এবং না দিয়ে পূর্ণ গ্রহণবর্জন ছাড়াও হ্যাঁ-না-এর দ্বন্দ্ব বুঝে নেবার মধ্যে স্বাস্থ্যকর একটা তৃতীয় বিকল্প কোথাও আছে।

অবস্থাটা যে জটিল ছিল (বা, আজও আছে) তা বোঝা যায় হীরেন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে সন্তর্পণ একটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গি থেকে। গান্ধী-শতবর্ষে লেখা তাঁর 'গান্ধীজি' নামের প্রবন্ধটিতে একটু জোর দিয়েই তাঁকে বলতে হয় যে 'অসংকোচে গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান আমাদের পক্ষে সমুচিত মনে করি'। সে-প্রবন্ধ শুরু হয়েছিল এই কথায় : 'স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, একটা সময় ছিল যখন গান্ধীজি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।' এ-বাক্যের প্রথম অংশটুকু বস্তুত তাঁর কুণ্ঠাটাকেই ধরিয়ে দেয়। প্রবন্ধ শুরু করতে হয় তাঁদের কথা ভেবে, যাঁরা গান্ধীজিতে এককালের আচ্ছন্নতাকে একটা চ্যুতি হিসেবেই গণ্য করবেন। শেষেও আবার বলতে হয় 'গান্ধীবাদে অবিশ্বাসী কারও পক্ষে যা লিখেছি তা লেখা অনুচিত ও অযৌক্তিক, এমন কথা যদি কেউ বলেন তো নাচার।' সেইখানেই অবশ্য থামেন না তিনি। 'নাচার' বলবার পরেও স্বপক্ষের অবলম্বন হিসেবে নিয়ে আসেন লেনিনকে, বলেন, 'ভারতবর্ষের মার্ক্সবাদীদের তো স্বয়ং লেনিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন

যে দুই যুধ্যমান জগতের মধ্যস্থলে অবস্থান করছিলেন "টলস্টয়-এর ভারতীয় শিষ্য"।' তাহলে তিনিই-বা কেন বলতে পারবেন না গান্ধীর কথা?

কম্যুনিজমে অটুট আস্থা রেখেও হীরেন্দ্রনাথ জানেন, 'জীবন কিন্তু এমন জটিল যে বাঁধা-ধরা কথা সব সময় চলে না।' এবং সেইজন্য তাঁকে-কথা বলতে হয় বাঁধা-ধরা-কথায় নির্ভরশীল মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে মুক্তমতির সম্পর্ক নিয়ে। সাম্যবাদীরা যে অনেকসময়ে তাঁদের তত্ত্ব আর কাজ নিয়ে 'যন্ত্রবৎ বিচার করে থাকেন', তাঁরা যে ভুলে যান 'ইতিহাস কোন অতিমানবিক প্রত্যয় নয়, ইতিহাস স্বয়ম্ভু নয়, তার স্রষ্টা হল মানুষ', এর সমালোচনাই করেন হীরেন্দ্রনাথ। এতটাই তিনি বলেন—'অত্যন্ত সবিনয়ে ও কথঞ্চিৎ কুণ্ঠা নিয়েই'—যে, 'সাম্যবাদের বিশ্ববীক্ষা নিয়ে কার্ল মার্কস তাঁর পূর্ণ বক্তব্য সাজিয়ে রেখে যেতে পারেননি' আর অবস্থার চাপে লেনিনকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংকীর্ণ পরিবেশে নিবদ্ধ থাকতে হয়েছে। ১৯৬০ সালে এই বিশ্বাস তাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে কম্যুনিস্টদের জগতে চিন্তার 'গুরুবাদী জড়তা পরিহার করে স্বচ্ছ, সুস্থ, মুক্ত চিন্তার যুগ আরম্ভ হতে চলেছে'। তখনও হয়তো তিনি ভাবেননি যে যাকে তিনি মুক্তচিন্তা বলছেন তাকে কখনো কখনো শোধনবাদ আর কখনো-বা প্রতিবিপ্লবী তকমা দিয়ে অচ্ছুত বানাবার চেষ্টা চলবে কম্যুনিস্ট সমাজ থেকেই। বা, একেবারে ভাবেননি তাও নিশ্চয় নয়। তেমন সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই হয়তো তিনি বলেছিলেন যে সে-যুগের সূচনা হবে না 'যদি আমাদের নিজস্ব ভূমিকায় নামতে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি।'

হীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেননি। সমকালের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক চিন্তাচর্চায় তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন একটা খোলা মনের আবহাওয়া। আর এটা যে পেরেছিলেন তার মস্ত একটা কারণ মনে হয় আকৈশোর রবীন্দ্রনাথে তাঁর নির্ভরতা, রবীন্দ্রনাথে তাঁর নিমজ্জন, রবীন্দ্রনাথের জীবন আর সৃষ্টি থেকে তাঁর প্রতিমুহূর্তের শক্তি খুঁজে পাওয়া।

২

যে-কুণ্ঠা বা যে-কৈফিয়তের কথা বলছিলাম আগে, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়েও কখনো কখনো সেটা বলে নিতে হয় তাঁকে। তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথ (বা গান্ধী) যে 'hero' অথবা 'পুরুষোত্তম', সেকথা বলবার জন্য তাঁকে জুড়ে দিতে হয় এই শব্দকটি : 'মার্কসবাদী হলেও আমার মতো ভারতবর্ষীয় মানুষের চোখে...' ইত্যাদি। 'হলেও' কেন? মার্ক্সবাদে বিশ্বাস রাখবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো কাউকে আদর্শ বলে ভাববার মধ্যে কোথাও একটা স্ববিরোধ আছে বলে নিশ্চয় ভাবছেন তিনি? তিনি ভাবছেন, না কি সাধারণভাবে মার্ক্সবাদীরা ও-রকম ভাবনার একটা পরিমণ্ডল গড়ে তুলছেন? আর, সেই পরিমণ্ডলে মার্ক্সবাদবিরোধীরাও ধরে নিচ্ছেন যে রবীন্দ্রানুরাগ আর মার্ক্সবাদে অনুরাগের কোনো সহাবস্থান সম্ভব নয়।

এই দুই পক্ষের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের কথা তুলতে হয় হীরেন্দ্রনাথকে। তিনি ভুলতে পারেন না—ভুলবার কথাও নয়—যে, উগ্র মার্ক্সবাদের দ্যোতক হিসেবে ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রধান এক বাঙালি কম্যুনিস্ট যে 'বল্গাছাড়া রবীন্দ্রনিন্দা করেছিলেন',

দলীয় সূত্রে তার কিছুটা দায় তাঁকেও নিতে হবে।

রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে বহুকথিত যে-রচনাটি তখন লিখেছিলেন ভবানী সেন, তাকে নিজেই অবশ্য তিনি মুছে নিয়েছিলেন বারো বছর পরের আরেকটি লেখায়। রবীন্দ্র শতবর্ষে 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' প্রবন্ধে ভবানী সেন প্রশস্তিভরা চোখেই দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে 'ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বহুলাংশে বাস্তবতাময়', বলতে চেয়েছিলেন 'জনশক্তিই যে ইতিহাসের চালনী শক্তি এ বিশ্বাস তাঁর ছিল' বা 'গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতিগঠনই ছিল তাঁর কামনা'।

কিন্তু, যে-লেখাটিকে অস্বীকার করবার আয়োজনে স্টালিনোত্তর পর্বে দ্বিতীয় এই প্রবন্ধটি লিখতে হলো ভবানী সেনকে, সেখানে কি নিছক 'রবীন্দ্রনিন্দা' বা 'রবীন্দ্রদূষণ'ই ছিল? দূষণ ছিল, না কি একটা দৃষ্টিই ছিল? কাকে আমরা প্রগতিসাহিত্য বলব, তার একটা মানপদ্ধতি স্থির করে নিতে হচ্ছিল স্বাধীন ভারতের কম্যুনিস্টদের, খুব স্বাধীনভাবে নয় যদিও। সেই স্থিরীকরণের তর্কেবিতর্কে যখন 'স্টালিনের এই বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে' কেউ কথা বলতে চান, তখন রবীন্দ্রনাথের এক স্বতন্ত্র চেহারা কারও চোখে পড়তেই পারে। তখন কথাটা এ নয় যে তিনি নিন্দে করছেন, কথাটা বরং এই যে কোনো এক মতান্ধতায় তিনি জীবনের বা শিল্পসাহিত্যের কোনো আংশিক বিচার করছেন। 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেয়ে লোকহিতকর কাজকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেছে' রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ, একথা বললে রবীন্দ্রনিন্দা হয় বলে তো মনে হয় না। কিন্তু ওই বিবেচনাকে কতখানি ক্ষতিকারক 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ঠেলে ফেলে দেব, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আগে অন্য আরো অনেক সংগঠনের কাজ করণীয় আছে ভাবলে তাকে পরিত্যাজ্য অন্যায় বলে ভাবব কি না, সেটা নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবিশ্বাসের উপর। এই মতবিশ্বাসের তীব্রতায় অনেকসময়ে বিচার্য বিষয়কে হয়তো আমরা খণ্ডিত করে দেখি। সেই আংশিক দেখায় প্রয়োজনমতো এমনকী এটাও বলে ফেলতে পারি যে ধর্মসম্প্রদায় প্রসঙ্গে 'হিন্দুমহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের' মতের কোনো পার্থক্য নেই।

নিন্দার জন্য নয়, কেবলমাত্র দৃষ্টিসংকীর্ণতার জন্য যখন এ-রকম একটা আদ্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে হয় ভবানী সেনের মতো কাউকে, তখন দৃষ্টিটাকেই আরও একবার যাচাই করা দরকার হয়ে পড়ে। এই যাচাই বোধটারই জন্য চাই মুক্তমতি। আর, দৃষ্টিসংকীর্ণতার ওই পটভূমি মনে থাকে বলেই হীরেন্দ্রনাথের ভাবনায় মুক্তমতির জন্য এত ব্যাকুলতা। অন্যদিকে, ওই পটভূমি মনে থাকে বলে আর নিজের কম্যুনিস্ট পরিচয়ের গর্ব কখনো ভুলতে পারেন না বলে একটা কৈফিয়ত দেবার সুরও থেকে যায় তাঁর স্বরে। 'রবীন্দ্রনাথ : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে' নামে তাঁর গোটা প্রবন্ধটাই (১৯৯১) আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর সেই কৈফিয়ত। তিনি বোঝেন যে 'মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা আজও আমাদের রীতিমতো দুর্বল, অপরিণত, লঘু', আর সেইজন্যেই হয়তো মার্ক্সবাদী কাঠামোর মধ্য থেকে সেই রবীন্দ্রনাথকে ঠিক-ঠিক বোঝানো সম্ভবই হলো না, যাঁর 'সাহসের কী স্পষ্টতা, কী সমাজচেতনার সাক্ষ্য, কী দেশাত্মবোধ আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববোধের মধুনিষ্যন্দ আভাস, কবিসুলভ "সুরভিত অবসর" সম্পর্কে কী

অনীহা, কর্মোদ্যোগের কী অপরাজিত অভীপ্সা'। সেটা বোঝাতে গেলে ওই কাঠামোটাকেই কীভাবে ভাঙতে হবে সে-বিষয়ে স্পষ্টত তিনি বলেন না অবশ্য কিছু, কিন্তু নিজে বারে বারে সেই কাঠামোর বাইরে চলে গেছেন ভেবেই বোধহয় কিছু কুণ্ঠা বা কৈফিয়ত কখনো কখনো থেকেই যায় তাঁর লেখায়।

৩

উপরে ব্যবহৃত ওই উদ্ধৃতিটি থেকে অনুমান করা যায় : সেই রবীন্দ্রনাথকেই হীরেন্দ্রনাথ তাঁর চেতনার সামনে রাখতে চান যিনি কর্মী, মানবসভ্যতার জন্য ভালোবাসা আর উৎকণ্ঠায় যাঁর মন ভরপুর, যে-কোনো মুহূর্তে যিনি হয়ে উঠতে পারেন বিশ্ববিবেক। তাঁর কথা উঠলেই হীরেন্দ্রনাথের মনে পাশাপাশি জেগে ওঠে রলাঁ আইনস্টাইন শোয়াইৎজার শ কিংবা রাসেলের মতো 'সংবেদনশীল বিশ্ববিরাজী মানুষ'দের নাম। এই 'বিশ্ববিরাজী' শব্দটির মধ্যেই হীরেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার পরিধিটাকে বুঝে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ১৯১১-১২ সাল থেকে শুরু করে শেষজীবন পর্যন্ত 'পশ্চিমি দৃষ্টির জয়যাত্রা' দেখা যায়, সুশোভন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ত্বরিত প্রতিবাদ একদিন জানিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। পশ্চিমি হাওয়াকে স্বীকার করে নেওয়া আর পশ্চিমি দৃষ্টির জয়যাত্রার মধ্যে যে অনেকখানি প্রভেদ আছে, সেকথা বুঝিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত ভারতবোধ বা প্রাচ্যাভিমানকে বেশ জোর দিয়েই সেখানে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথেরই দীক্ষা থেকে তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে এই প্রাচ্যাভিমানের সঙ্গে ওই বিশ্ববিরাজমানতার কোনো মৌলিক সংঘর্ষ নেই। বরং, হীরেন্দ্রনাথেরও এক প্রাচ্যাভিমান তখন জেগে উঠতে চায়, যখন তিনি দেখেন যে বিশ্ববিরাজী এক অস্তিত্ব নিয়ে প্রাচ্যেরই কোনো মানুষ তাঁর প্রাচ্যাশ্রিত প্রত্যয় বা ধিক্কারের ভাষা পৌঁছে দিতে পারেন গোটা পৃথিবী জুড়ে। রবীন্দ্রনাথ তা পেরেছিলেন বলে তাঁর এই প্রফেট বা লেজিস্লেটর মূর্তিই হীরেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে বেশি।

তার মানে কি শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা নেই তাঁর চেতনায়? সেকথা নিশ্চয় ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর ইংরেজি বইটিতে কবির সংক্ষিপ্ত এবং সর্বাত্মক একটি পরিচয় তিনি তৈরি করে তুলেছিলেন বলেই নয়, সে-বই না লিখলেও তাঁর ভিন্ন সব লেখা থেকেও বুঝে নেওয়া যেত কীভাবে তাঁর শ্বাসেপ্রশ্বাসে জড়িয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা। থাকে তা, এবং একসময়ের মার্ক্সবাদীদের বিচরণসীমা ভেঙে সে-গান বা সে-কবিতা তিনি তুলে আনতে পারেন 'কল্পনা' বা 'খেয়া' বা 'গীতাঞ্জলি' থেকেও, শুধুই 'এবার ফিরাও মোরে' বা 'ওরা কাজ করে' নয়। কিন্তু সেসব সময়েও, কেবলই তিনি মনে রাখেন—রাখতে চান—জীবন আর শিল্পের মধ্যে অবিরাম যাওয়া-আসার কথা। রচনার মধ্যে রচয়িতার ব্যক্তিজীবনকে খুঁজে বেড়ান না তিনি, খুঁজে বেড়ান না শিল্পকৌশলের অন্ধিসন্ধি, স্থির কোনো দার্শনিক বা নৈতিক প্রস্থান থেকে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছবার পথ খোঁজাতেও তাঁর আগ্রহ কম। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তিনি শুধু খুঁজে বেড়ান সেই শক্তি বা বিশ্বাস যা আমাদের সমবেত সমাজজীবনে কোনো একটা গতির সঞ্চার করতে পারে। 'জীবনচিন্তার সামগ্রিকতা, মানবচেতনা, প্রবাহের অখণ্ডতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংহতিভিত্তিতে বিশ্ববোধের সহজ সত্যতা

রবীন্দ্রনাথে সতত কীর্তিত এবং মার্কসবাদী চিন্তা ও প্রয়াসেও তার নিয়ত ঘোষণা'—এই বিশ্বাসে স্থির থাকেন তিনি। সেইজন্য, রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে তাঁর জীবনের যে যোগের কথা তিনি বলেন, সে-জীবন প্রধানত কর্মী রবীন্দ্রনাথেরই জীবন। জাতির দুঃসময়ে—১৯৩০ সালে—দেশ ছেড়ে কেন রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসেছেন, ভারতীয় এক প্রগতিশীল ছাত্রের এই তীব্র প্রশ্নের উত্তরে কবি যখন 'দুঃসময়' কবিতাটি পড়ে শোনান, তখন সে-কবিতাপাঠের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত আবেগ দেখেন না হীরেন্দ্রনাথ, দেখেন এক দেশাভিমান, দেখেন কীভাবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতের চারণ হয়ে ঘুরছেন এই কবি।

'উৎসর্গ' কবিতার বইতে ছোট একটি কবিতা আছে 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে/গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে'। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আলোচনায় এই কবিতাটির যে খুব বেশি ব্যবহার হয় তা নয়। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ, একটু গুরুত্ব দিয়েই, এই কবিতাটির কথা বলেন তাঁর রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক ইংরেজি বইটির শেষ অধ্যায়ে। বলেন, কেননা এরই মধ্যে তিনি খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে তাঁর শিল্পের সম্পর্কের ঠিক-ঠিক ছবি। ধূপ আর গন্ধ যেমন, ঠিক তেমনই 'Between his life and his work there seemed to have been a similar mutual adhesion; the one merged with the other as in the concord of notes in music'.

রবীন্দ্রজীবনের এই সংগীতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত অস্তিত্ব।

৪

এই লেখাটি যখন লিখতে বসেছিলাম, ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়েছিল দৈনিক পত্রিকায় ছাপানো এক খবর। শিল্পী সুনীল দাসের সাম্প্রতিক চিত্রকলা বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রতিবেদক জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে ওই শিল্পীর পুরোনো এক মন্তব্যের কথা, এই কথা যে তাঁর ছবিতে সবকিছুই আছে, শুধু রক্ত নেই।

থাকবার যোগ্য কতকিছুই যে রবীন্দ্রনাথে নেই, আজকের দিনের কবি চিত্রী গায়ক গীতিকার সকলেরই কাছে সেকথা শুনতে শুনতে আমরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এসব মন্তব্য তাই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভুলেও যেতে চাই আমরা, বিশেষ কোনো দাগ কাটে না মনে।

কিন্তু কেউ কেউ পারেন না ভুলতে। কারও কারও জীবন মনন স্মৃতি আর আশা এমনভাবে রবীন্দ্রনাথে জড়ানো আছে যে এসব মন্তব্য তাঁদের মনে কোনো-না-কোনো ঢেউ তোলেই। সুনীল দাসের ওই কথাটা যখন প্রচারিত হয়েছিল প্রথম, প্রায় চোদ্দ বছর আগে, সঙ্গে সঙ্গেই তখন তার এক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছিল হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর থেকে। 'সভ্যতার সংকট' বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন তিনি :

> এটা যেন লেখা এবং বলা হয়েছিল হৃদয়ের রক্ত দিয়ে—একটু অস্বস্তি হচ্ছে দেখে যে অনিচ্ছাতেই এমন 'রোমহর্ষণ' শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছি। করেছি, কারণ লিখতে লিখতে মনে এল সম্প্রতি এক অতি সৎ ও সন্মতিসম্পন্ন ও

সমাদৃত চিত্রশিল্পী (সুনীল দাস) রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে প্রচুর ও গভীর প্রশস্তি জানিয়েই বলেছেন যে কবির 'ছবিতে সবকিছু আছে, শুধু রক্ত নেই।' এ বিষয়ে শিল্পক্ষেত্রে অনধিকারী আমি কিছু বলতে চাই না, শুধু বলব যে ঔপনিষদিক সমাহিতি ('দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্') তাঁকে অশান্তির অন্তরে সুমহান শান্তির সন্ধান দিয়েছিল এবং তাঁর সর্ববিধ সৃষ্টিকে এক সৌম্য আবরণ দিতে সহায় হয়েছিল বটে কিন্তু আজীবন তাঁর অবিশ্রান্ত কীর্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে অন্তরস্থিত বহ্নিমান ও অতলস্পর্শ এক আবেগ বিষয়ে। বিদেশী শব্দ 'প্যাশন' (passion) এখানে ব্যবহার না করে পারছি না। শুনেছি ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে রয়েছে 'যন্ত্রণা'—এজন্যই বুঝি 'প্যাশন-ফ্লাওয়ার'-এর রং হল রক্তের মতো লাল। অন্তত আমার চোখে 'সভ্যতার সংকট' লিখেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ কবি যেন সেই রক্তাক্ষরে।

নিছক সাময়িক এক মন্তব্যের অভিমানময় প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এই-যে 'প্যাশন' শব্দটির ব্যবহার করলেন হীরেন্দ্রনাথ, তাঁর নিজের লেখারও চরিত্রলক্ষণ সেইটেই। দেশ সমাজ আর সভ্যতার ভাবনা তাঁকে সবসময়েই এক যন্ত্রণায়, এক আবেগে, ভরপুর রাখে। আর সেই যন্ত্রণায় সেই আবেগে সবসময়েই তিনি উচ্চারণ করেন রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো শব্দবন্ধ বা বাক্যবন্ধ, গদ্যের বা পদ্যের। সমকালে যা-কিছু বিপর্যয় ঘনিয়ে ওঠে, তা নিয়ে সভায় এসে তাঁকে কথা বলতে হয় বা ঘরে বসে প্রবন্ধ লিখতে হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা আফগানিস্থানে বুদ্ধমূর্তির বিনাশ নিয়ে, কিউবা নিয়ে বা ভিয়েতনাম নিয়ে, ভারতছাড়ো আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে বা দুঃসময়ের নববর্ষ নিয়ে, উপসাগরীয় যুদ্ধ নিয়ে বা সাম্প্রতিক ইরাক নিয়ে, যখনই তিনি কিছু বলেন বা লেখেন, তখনই প্রবল আবেগের এক দৃশ্যমান ছন্দ এসে পৌঁছতে থাকে তাঁর শরীরে বা ভাষায়, আর আতসবাজির মতো তার মধ্যে কেবলই স্ফুরিত হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের প্যাশন, রবীন্দ্রনাথের আবেগ আর যন্ত্রণার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় তাঁর নিজস্ব প্যাশন, তাঁর আবেগ আর যন্ত্রণা। আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কথা উঠলেই হীরেন্দ্রনাথ কথা বলতে থাকেন ওই 'হৃদয়ের রক্ত' দিয়ে, প্যাশনের ছন্দ দিয়ে। অধীর উত্তেজনায় তিনি ভাবতে থাকেন, সে-রক্ত, সে-ছন্দ কি সঞ্চারিত হবে না তাঁর চারপাশে কোথাও? স্বর্গ কি হবে না কেনা? রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন? স্নেহে-ভর্ৎসনায় তরুণতরদের কেবলই তিনি উদ্দীপিত করতে চান তাঁর স্বপ্ন আর প্রত্যয় দিয়ে, অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে-স্বপ্ন যে-প্রত্যয় তিনি অর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি থেকে, রবীন্দ্রনাথেরই জীবন থেকে। তাই, সমস্ত জীবন জুড়ে অনেক মনীষীর বিষয়ে অনেকরকম শ্রদ্ধা যদিও জানান তিনি, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এতটাই অধিকার করে থাকেন যে আত্মজীবনীর উৎসর্গপৃষ্ঠায় একথা লিখতে তিনি একটুও ইতস্তত করেন না যে 'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ/তুভ্যমেব সমর্পয়ে'। এই ত্বদীয়ং বস্তু তো শুধু তাঁর নিজেরই জীবনকথা শুধু নয়, তাঁর সমকালেরও জীবনকথা। রবীন্দ্রনাথেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর সমকালের জীবন, এতখানি কথা আর কেইবা বলতে পেরেছেন!

লিখেছেন অন্তরস্থিত মূলগত মার্কসবাদী প্রত্যয় নিয়ে

কুমার রায়

একবার পার্টি-জীবন বিষয়ে বিরক্ত এক কবিবন্ধুকে মার্কস লেখেন যে,—'নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি খুব ভালরকম জানেন, অজস্র ব্যক্তিগত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকের কথা, কিন্তু তিনি চান শুভবুদ্ধি, সব মানুষই যেন মিলতে পারে।' এখানে পার্টি বলতে তিনি গ্র্যাণ্ড হিস্টোরিক্যাল সেন্স অফ দ্য টার্মকেই বুঝিয়েছেন। এই মহতী ঐতিহাসিক বোধ এবং শুভবুদ্ধির ও মানুষের মিলনের কথাটাই যেন অগ্রাধিকার পেয়েছে আমাদের কাছে কিংবদন্তীতুল্য প্রাজ্ঞ, স্থিতধী, শান্ত, সৌম্য, সংযত কিন্তু বেদনার্ত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ সংকলনে। ভবিষ্যত বিষয়ে অপরাজেয় আশা ও আস্থার গরিমা যাঁর উচ্চারণে প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে আমরা দেখতে পাবো। সংকলনটির নাম 'আমার তুমি জন্মভূমি/কার বা রাখো ডর।'

বিগত শতাব্দীর শেষ দশবছরে দেশে এবং বিদেশে বিপর্যয়কারী কিছু ঘটনা তাঁকে বিচলিত করেছিল। গ্রন্থিত পনেরোটি নিবন্ধে তিনি—অসংখ্য বিষয় নয়,—সেই দশকে ঘটে যাওয়া, মর্মে ঘা-দেওয়া ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সূত্রেই আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রধান প্রবাহটি বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণসমূহে একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এইখানেই নিবন্ধগুলির মধ্যে অন্তর্গত মিল।

মার্কসবাদের মায়ায় মজে থেকে তিনি ভুলে যাননি, যে পরাধীন দেশে তাঁর জন্ম, স্বাদেশিকতা, স্বদেশের মুক্তিকামনার আবহাওয়াতেই তিনি বড় হয়েছেন, তাই দেশ তাঁর সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। তবু তিনি মার্কস্-এঙ্গেলসের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কথা The working man has no country-র প্রতিধ্বনিও মনে রেখেছেন। ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের গানে তিনি এই ধ্বনি শুনতেও পেয়েছেন—'তুমি পাও না একটি মুষ্টি/মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী/তাদের কেমন কান্তি-পুষ্টি, জগৎ ভরা জয়/তুমি কেবল চাষের মালিক/গ্রাসের মালিক নয়/স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়।' স্বভাবকবিদের যেমন তিনি মনে রেখেছেন তেমন রবীন্দ্রনাথকেও। কেবল যে রবীন্দ্রকাব্য তাঁর অধিগত তাই নয়—তাঁকে গভীর করে জানার সুবাদে অনায়াসে তিনি বলতে পারেন—'এই মহাকবি নির্জিত দুর্গত স্বদেশের সত্তার শুধু সমুজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নিদির্ধ্যাসন বলে সেই সত্তার সংরক্ষক, তার শোধক, তার বর্দ্ধক, তার সুষ্ঠু বিকাশে শ্রেষ্ঠ সহায়ক।' অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথের বাণী—গভীরতা ও গৌরব—কখনও পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট হতে পারে না। গান্ধী, জহরলাল বা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা খাঁটি আগমার্কা মার্কসবাদীদের নিরিখে নিন্দার্হ বিবেচিত হয়েছে। একটি মজার উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। উনিশশো চৌষট্টি সালে নেহরুর মৃত্যুর পর তিনি জহরলাল সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'যথেষ্ট ভাল মার্কসবাদী' হলে, বইটা হয়ত অন্যভাবে লেখা

হত। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কৌতুক করে লিখেছেন, 'আর যায় কোথায়—সাতষট্টি সালের লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে আমার এই স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে কিছু কটু-কাটব্য চলল। একে তখন শোধনবাদী অপরাধে অভিযুক্ত আমার মত অনেকে। তাই গোদের ওপর বিষফোড়ার মত এই আত্মনিন্দা ইলেকশনে আমার প্রায় হার ঘটাতে বসল। এতে অবশ্য আশ্চর্য হইনি—তবে আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইক্লির মতন বিশ্ব-জনপ্রিয় কাগজে একজন ইংরেজী নবীশ এবং উগ্র মার্কসবাদী আমার উক্তিটি উল্লেখ করলেন। যাই হোক, ভেবে একটু সান্ত্বনা, স্বয়ং মার্কস তো একবার ফরাসী অনুগামীদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন [এঙ্গেলসের বিবরণ অনুযায়ী]—'Thank God, I am no Marxist!'

অন্যত্র তাঁর বিশ্লেষণে দেখি, সে-দেশের বামপন্থার নাম নিয়ে বামপন্থী সংগ্রামের সর্বনাশ সংগঠনের সচেতন, অচেতন, অর্ধচেতন প্রয়াস দেখা দিয়েছে। বাম-বিদগ্ধজনের মধ্যেই জেগেছে যেন এক অদ্ভুত স্খলনের ছবি। হয়তো সেইজন্যেই উনিশশো আটষট্টি সালে প্যারিস শহরে অমন তুমুল যুব-অভ্যুত্থানের ফসল গোলায় উঠলোই না। বিপুল প্রতিশ্রুতি নস্যাৎ হয়ে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে সেখানেই জেগে উঠলো 'নিউ ফিলোজফার্স' নামে একদল বিদ্বান। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন—এঁরা সবাই মনস্বী আর এঁরা সবাই স্বঘোষিত কম্যুনিস্ট। এঁদেরই কল্যাণে পশ্চিম দুনিয়াতে রব উঠেছিল, যে, এশিয়ার নোংরা ছোঁয়াচ লাগায়, সোভিয়েত আর তারই প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত পূর্ব য়ুরোপে আসল আগমার্কা মার্কসবাদ সম্মত সোশিয়ালিজম্ গড়ে ওঠেনি—গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। 'পশ্চিম য়ুরোপের সর্বগুণসম্মত গণতন্ত্রবিভূষিত সমাজবাদ তাঁরাই গড়বেন।' হীরেন্দ্রনাথ এঁদের ভাবনাচিন্তাকে ভ্রান্তিবিলাস আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদেরই একজন Michel le Bris বই লিখলেন—'God is dead. Marx is dead and I am not feeling too well either'. ওই শতাব্দীর আশির দশকের একসময় থেকেই গর্বাচভ্ বলতে শুরু করলেন,—'আমাদের সকলের প্রিয় য়ুরোপীয় বাসভূমি [Our common dear European homeland.]'—সেইসঙ্গে সোশিয়ালিজম্‌কে ঢেলে সাজানোর [পেরেস্ত্রৈকা-গ্লাসনস্ত] কথাটাও ওঠালেন। এবং তারই ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই সোভিয়েত দেশের পতন ঘটলো।

সংকলিত পনেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে ন'টি ছাপা হয়েছে পাক্ষিক বসুমতী, একটি শারদীয়া বসুমতীতে। সে সময় সম্ভবত একটি নির্দিষ্ট কলাম তাঁর জন্যে বরাদ্দ ছিল। বাকি প্রবন্ধ ঐ একই সময়ে নন্দন কিংবা পরিচয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। দেশের এবং দুনিয়ার বর্তমান দুর্গতি নিয়ে তিনি যে বিচলিত বোধ করেছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে নিবন্ধগুলোতে। শুধু বিচলন নয়—তাঁর ব্যাকুলতাও প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যাকুল ও বিচলিত হয়েছেন ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২তে—অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায়। ঐ সময়েই তো সোভিয়েত দেশের পতন সেখানে লেনিন মূর্তির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন থেকেই যার সূত্রপাত তাঁর খেদোক্তি 'নিরবধিকাল চলছে ও চলবে।'—আমি দেখবো না। পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ভবিষ্যত কী আকার নেয়। আমাকে শুধু

একটু অতিরিক্ত যন্ত্রণার শিকার হতে হল দীর্ঘ আয়ু পেয়ে। তবু আশা তো হারাই না—আর বলি আমার প্রিয় হিন্দুস্থানী উদ্ধৃতি দিয়ে—"ম্যয় রহুঁ, ইয়া না রহুঁ/ইস্ চমন্ আবাদ্ রহে।" সংকোচ নিয়েই বলতে ইচ্ছে করছে এসব অনুভবের পর আরো দশবছর কেটে গেছে, অনেক কিছু বদলও ঘটে গেছে কিন্তু বাগানের ফুল ফোটার সম্ভাবনা এখনো দেখা যায়নি।'

ইতিহাসবিদ্ হিসেবে অনেক ঘটনা ও তথ্য যুক্ত করে দিয়ে বর্তমানকে বোঝাতে সচেষ্ট থেকেছেন তিনি—এইখানেই প্রবন্ধগুলি মূল্যবান হয়ে ওঠে এবং নানান তথ্যসূত্র খুঁজে নেবার সুযোগ ঘটায়। বাস্তবিক পরিস্থিতির পারস্পরিক অভিঘাতগুলিকে তিনি প্রার্থিত মূল্য দিয়ে পাঠক হিসেবে আমরা যাতে অতীতকে বুঝতে পারি—সে বিষয়ে আগ্রহী থেকেছেন। জটিল সব ঘটনাকে সাধারণীকরণের প্রশস্ত পথ তিনি আলোচনার মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করার এ এক আয়োজন। মনে মনে তর্ক তোলার উপকরণও আছে। যেমন অগাস্ট '৪২ আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগ না-দেওয়ার যুক্তিগুলি শোনার পরেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণে যুদ্ধের চরিত্র বদল—সেটা সত্যি। কিন্তু আমরা তো জানি হিটলারের মস্কো অভিযানকে পরাস্ত করেছিল লাল ফৌজের অমিতবিক্রম ও শৌর্য এবং স্ট্যালিনের রণকৌশল—সেখানে ইংরেজদের কোনও ভূমিকাই ছিল না। সুতরাং 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এবং 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—এমন লড়াকু আহ্বানে সাড়া না দেওয়াটায় খট্‌কা লাগতেই পারে। সোভিয়েত বা চীনকে সাহায্য করার কোনও ক্ষমতাই আমাদের ছিল না। তিনি আমাদের আরো একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন—জুলাই '৪১ সালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতে যখন স্বীকৃত হলেন রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন—'দেখো, তোমরা এই ইংরেজকে বিশ্বাস কোরো না। সোভিয়েতের সঙ্গে ওরা এখন জুটেছে বলছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস নেই ওদের।' স্বীয় প্রজ্ঞাবলেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য শ্রেণীচরিত্র বুঝেছিলেন। তবু বলবো ১৯৯৪ সালের শারদীয় নন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক নিবন্ধটি বিবিধ তথ্য ও সূত্রের জন্যে বিশেষ মূল্যবান, যেমন ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নাগপুর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং লেখক। সেখানে প্রকাশ্য মিছিলের আওয়াজ ছিল—'ন এক পাই ন এক ভাই'। এই যুদ্ধ অসহযোগ। ইতিমধ্যে অবশ্য ১৯৪১-এর জুন মাসে সোভিয়েত আক্রান্ত হল য়ুরোপ ভূখণ্ডে—চিন্তার মানচিত্রটা পাল্টে গেল। তিনি জানিয়েছেন জনযুদ্ধ এই ঘোষণা করবার আগে প্রায় ছ'মাস পার্টিতে বিতর্ক চলেছিল এবং জনযুদ্ধ নীতি ৪২ সালের জানুয়ারি মাসে সারা ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের মঞ্চ থেকে প্রথম প্রচারিত হয়। স্বয়ং গান্ধিজী যে হিটলারের আক্রমণের পর ড. বিশ্বনাথ পাণ্ডে সম্পাদিত পত্রিকায় লিখেছিলেন—'সোভিয়েত যুদ্ধে হেরে গেলে দুনিয়ার গরীবদের দেখবে কে?' প্রায় অজানা এই তথ্য তিনি দিয়েছেন। এ তথ্যও পাওয়া গেল যে ৪২-এর অগাস্টে ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্পষ্ট বলেছিল যে 'রুশ এবং চীনের স্বাধীনতা মহামূল্য এবং তাকে কিছুতেই খণ্ডিত হতে দেওয়া চলবে না।' এই নিবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন যে যান্ত্রিকভাবে জনযুদ্ধ নীতির অপপ্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে থাকতে পারে। এই বিভ্রান্তিকে

স্বীকার করে নিয়েই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'নিছক লজিক জীবনকে চালায় না, সর্বাবস্থায় যে বৈপরীত্য মানুষ ও সমাজের অবস্থানে থাকে তারই মোকাবিলা করতে শেখায় ডায়লেকটিক্।' আসলে এই নিবন্ধে সদিচ্ছা নিয়েই তিনি চেয়েছেন পাঠককে দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবের দিকে মুখ ফেরাতে।

কিউবা এবং ফিদেল্ কাস্ত্রোর নেতৃত্ব নিয়ে 'নাই নাই ভয়' শীর্ষক লেখাটি আমাদের উদ্বোধিত করে। সেখানে কালোপযোগী বিপ্লবীচিন্তা ও কর্মের আয়োজন আজও চলেছে। সেই জোরে এখনো তাঁরা বলতে পারেন—'Socialism or Death'! কাস্ত্রোর নেতৃত্ব এবং চে গুয়েভারার সাহচর্য কিউবাতে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার স্বকীয়তাকে তিনি বিশ্ববিমোহন বলেছেন। কাস্ত্রো-ইকা বলে চিহ্নিত করে গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকাকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিউবায় 'Poor but pure' ব্যবস্থা বহাল রাখতে পারা গেছে নানান বাধার সম্মুখীন হয়েও। গর্বাচভ প্রমুখের উদ্‌যোগিতায় এবং সোভিয়েতের নিজস্ব অধঃপতনের ফলে দুনিয়া জুড়ে কম্যুনিস্ট কার্যক্রম বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে সমাজ রূপান্তরের স্বপ্ন ভ্রষ্ট হতে থাকে। উনিশশো সাতাশিতে সোভিয়েত বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এদেশ থেকে সি. পি. আই ও সি. পি. এমের নেতৃস্থানীয় আমন্ত্রিতদের মধ্যে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছিলেন। সেখানেই তিনি ফিদেল কাস্ত্রোকে আগের তুলনায় অনেক গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখেছিলেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত কাগজপত্রে তখন কিউবা এবং কাস্ত্রো-দূষণ শুরু হয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্ব সেখানে খানিকটা অবহেলিত। গর্বাচভ-নেতৃত্বে Strip-tease-এর খেলা শুরু হয়ে গেছে—ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে সমাজবাদ-সাম্যবাদের নীতি থেকে বিচ্যুতির লক্ষণ। সুকৌশলে প্রতিবিপ্লবের বাহন হয়ে দাঁড়াবে—"more openness, more democracy, more socialising"—ইত্যাদি সুবচন, ফলে একদিন—my mission is fulfilled—এই কথা বলে গর্বাচভ মদ্যপ ইয়েলৎসিনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। ওদিকে আমেরিকায় গর্বাচভকে নিয়ে প্রবল মাতামাতি—নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে গেলেন—মার্কিন মহলে man of the decade বলে নন্দিত হলেন। ১৯৮৮-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান প্রার্থী ছিলেন বুশ (সিনিয়ার)। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—বুশের স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, Gorby (গর্বাচভের আদরের ডাক)-কে নিয়ে সে দেশে উচ্ছ্বাস এতই প্রবল যে তাঁর স্বামী বুশের বিপক্ষে তাঁকে দাঁড় করালে বুশ কোথাও ঠাঁই পাবেন না! হায় আজ কোথায় সেই গর্বাচভ!

স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচারবুদ্ধির প্রখরতায় হীরেন্দ্রনাথ এ-ও বলেছেন—সমাজবাদ সাম্যবাদের আপাত অধোগতির পেছনে রয়েছে অনেকবছর ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও অপকর্ম। সেইসঙ্গে অবশ্যই সমাজবাদের গৃহশত্রুদের বহুমুখী বৈরিতা। অল্পে তুষ্ট রাজনীতির কুফল—যাকে প্র্যাগ্‌মাটিজম্ নাম দিয়ে এদেশে এবং অন্যত্র আজও চালানো হচ্ছে। এ সবই চরিত্রস্খলন, আদর্শচ্যুতি ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার লক্ষণ।

এদেশেও তাঁর এ জাতীয় অভিজ্ঞতার কথা, নীতিরহিত শৈথিল্যের কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন—যা তাঁর যন্ত্রণার এক বিশিষ্ট কারণ। এদেশে Order

of Lenin সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনজন,—রাজেশ্বর রাও, ডাঙ্গে, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রধান রমেশচন্দ্র। কিন্তু মস্কোয় যখন লেনিন মূর্তির অসম্মান ঘটল তখন বাঙালি কম্যুনিস্টদের ভেঙে পড়তে দেখলেও Order of Lenin-ধারী দুই ভারতীয়ের প্রকাশ্য ধিক্কার শোনেননি। ডাঙ্গে তখন প্রয়াত,—অবশ্য জীবৎকালেই তাঁর রাজনৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি।

আন্তর্জাতিকতা তত্ত্বে গভীরতার প্রতি এইসব নয়া গণতান্ত্রিক বিধি বিধান তাঁর মর্মপীড়ার কারণ—এই সংকলনের শেষ নিবন্ধে—[নভেম্বর বিপ্লব : মনুষ্যত্বের পরাভব নেই'] এই প্রত্যয় তিনি ঘোষণা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ধৃত করেছেন—'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে, আমি অপরাধ বলে মনে করি।'

রবীন্দ্রকাব্যের এবং 'সভ্যতার সংকট' থেকে গদ্য-উদ্ধৃতি যেমন বারে বারে এসেছে তাঁর লেখায়—তেমনি লোককবির কবিতা থেকেও তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করতে—বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক আলোচনায়। 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' যে দেশের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব, তাকে যখন অনপনেয় মসীতে কলঙ্কিত করা হয়েছে বা হয় তখন দেশবাসীর জীবনে নেমে আসে এক মর্মন্তুদ যন্ত্রণা। বাবরি মসজিদ্ ধ্বংসসাধন যে হিন্দু মানসিকতারই বিকৃতি—তাও তাঁর বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে। রাজনীতির লোকেরা যখন ধর্মকে বাণিজ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে তখন রাজনীতির মূলে যে মানব-মমতার তত্ত্ব তাকে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়। কৌশলে ক্ষমতা-দখলের প্রয়াসটাই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই নোংরা টেক্কা-টেক্কি-টা এ দুর্ভাগা দেশে চলছেই।

হিন্দুত্বগর্বী আততায়ীর গুলিতে 'হে রাম' বলে গান্ধিজী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ১৯৪৮ সালে—তাঁর টাটকা অপরাধ ছিল—ভারত-পাকিস্তান মনোমালিন্য তুঙ্গে তখনই ভারত সরকারের কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে সম্মত করা। দেশবিভাগ তিনি নিবারণ করতে পারেননি কিন্তু তাঁর শেষ কামনা ছিল আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন দুটি দেশের ভবিষ্যতে মৈত্রী সম্ভাবনা। সেটা হল না। ১৯৬৪, সত্তরের দশকের শেষ, তারপরে আশির দশক থেকে, বারবার নরককুণ্ড তৈরি করা হল এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে। রাম জন্মভূমি নিয়ে সম্পূর্ণ এক অসাড় বিতর্ক চলতে থাকল। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মুসলমানরা এদেশে এসেছিল এবং গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া এখানকার জীবনস্রোতে মিশেও গিয়েছিল—অন্য বিজেতার মত শিকারী পাখি হয়ে তারা আসেনি—তাই উড়েও চলে যায়নি লুণ্ঠন ও শোষণের পর—এদেশেরই জীবনস্রোতে তারা মিশে গেছে।' সেই ইতিহাস আলোচনা করেছেন নানা উদাহরণ দিয়ে। বিজেতা রাজার ধর্ম তো এখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে মুসলমান রাজশক্তি প্রবল থাকা সত্ত্বেও ঐ সব অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি—আবার বাংলার মতো অঞ্চলে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি। এ সব তথ্যের সঙ্গে অনেক উদাহরণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হিন্দুরা আদিল্ শাহ্-কে জগৎগুরু আখ্যা দিয়েছিল। অযোধ্যাকাণ্ড বামপন্থাকে সীমাহীন লজ্জা দিয়ে মসজিদ ভেঙেছে। তখন সংসদের অধিবেশন চলছে কিন্তু সরকারি অপদার্থতার কথা উল্লেখ করা হলেও বামপন্থীসমেত বিরোধীপক্ষ ব্যস্ত

রইল পার্লামেন্টের 'নর্তন-কুর্দনে'র পারস্পরিক প্রতিযোগিতায়—হল্লা আর গলাবাজি চলতে থাকল, এমনকী ৭ ডিসেম্বর হট্টগোলের মধ্যে স্পীকারের উত্থাপিত প্রস্তাব পর্যন্ত গৃহীত হতে পারল না। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে এটা খুব জরুরি ছিল বিশ্বের দরবারে, বলেছেন—'আমাদের, বিশেষত কম্যুনিস্টদের বিবেক ও কর্মোদ্যমে শৈথিল্য এসেছে'। সেইসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন—হয়ত খানিকটা ঠাট্টার ছলে—'র‍্যলি করার গর্বে রেভোলিউশনের রাস্তা বানানোর কথা ভুলে গেছে কম্যুনিস্টরা।' মামুলি ধিক্কার-বিবৃতি নয়—তিনি চেয়েছেন 'মানবমমতা'র অকুণ্ঠ বিঘোষণ। আর এইসব সময়েই তিনি স্বভাবকবি গোবিন্দদাস ও লোককবি বাউল মদনকে উদ্ধৃত করেছেন বারে বারে। মারাঠী বাল থ্যাকারের জন্যে তিনি একটি ঐতিহাসিক সংবাদ উপস্থিত করেছেন—শিবাজীর দেশে যারা শিবসেনা তৈরি করে আস্ফালন দেখায় তাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে শিবাজীর পিতামহ শাহ্ শরির নামে মুসলিম সাধুর ভক্ত ছিলেন বলেই নিজের দুই ছেলের নাম দিয়েছিলেন—শাহ্জী ও শরিফজী। এটাই হল ভারতবর্ষে ইতিহাস-সম্মত ব্যবহার। বিবেক-বিবেচনাহীন, অনুতাপহীন বাল থ্যাকারের কাছে এ-সংবাদ মূল্যহীন।

তাঁর যে মন ভারতীয়ত্বের অন্তহীন গৌরবে গরিয়ান আর একই সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের নানাবিধ তুচ্ছতায় ব্যথিত তারও পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি রচনায় নানাভাবে।

বৈদগ্ধ্যের পরিচয়বাহী এবং মার্কসীয় ইতিহাস লিখনের বিচারে ঘটমান ইতিহাসের একটি অন্তর্মুখী ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল এই নিবন্ধগুচ্ছ। লেখক তাঁর অব্যর্থ ক্ষমতায় এই সময়ের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তবে ভাববাদী বিচ্যুতি খুঁজে ফেরেন যাঁরা তাঁদের কাছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 'good enough marxist' হতে পারলেন না।

আদর্শবাদের অতন্দ্র সৈনিক

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য

জীবন্ত কিংবদন্তী মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাকে আমি 'স্যার' বলে ডাকি। তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা করার মতনই ব্যাপার হয়। সম্প্রতি আমার প্রকাশিত 'এগারোর কৈফিয়ৎ' বইটির মুখবন্ধে আমার কলেজ জীবনের 'স্যার' যা তিনি আজীবন ধরেই পরম শ্রদ্ধায় রয়েছেন, যা লিখেছেন তা আজও তাঁর পঞ্চনবতি কর্মসূচীর পরেও জ্বলন্ত এক গভীর কমিউনিস্ট আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাঠকের মর্মে গেঁথে দেয়। তিনি লিখেছেন—

"আমেরিকার অহংকারী ছত্রছায়ায় আজকের 'বিশ্বায়নী' জগতের যে হাল তা দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। আফগানিস্তান নিয়ে যে কাণ্ড চলছে আর চলবে, তা থেকে শিক্ষা না নিতে পারলে আমাদের শুধু নয় সকলেরই বিপদ বাড়বে। কথা বাড়াবার দরকার নেই, তবে আজ একটা কথা অকাট্য যে, কম্যুনিজম-এর হিসাবমাফিক জগৎ জুড়ে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে, "দৌলত বাড়ছে আর মানুষের ক্ষয় হচ্ছে" (wealth accumulates and men decay) সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছুই বিপন্ন হচ্ছে, বিলাসব্যসন বাড়ছে আর দুর্নীতির দুর্দান্ত বিস্তারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও চরিত্রভ্রংশ নিশ্চিত হচ্ছে। বছরের পর বছর ইউনাইটেড নেশ্‌নস্‌-এর পক্ষ থেকে সরকারিভাবে প্রচারিত Human Development Report-এ এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। কে কবে কেমন করে কোটিপতি হবেন ('লাখপতি' শব্দটিই এখন হাসির খোরাক।) তাই নিয়ে 'ইঁদুর দৌড়' চিন্তায় সবাই মশগুল। "এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি"—কতদিনের পুরনো কবিবাক্য আজও সত্য হয়ে রয়েছে। সমৃদ্ধির পাহাড় উঁচু থেকে আরও উঁচু হতে চলেছে, আগে যাদের মধ্যবিত্ত বলে ধরা হতো তাদের একটা ক্ষুদ্রাংশ এখন ফুলে ফেঁপে উপরতলায় জায়গা করেও হয়ত নিচ্ছে, কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকার যেমন প্রায় তেমনই রয়েছে। শতকরা পঁচাশি জন মানুষকে থাকতে হচ্ছে সেই যন্ত্রণায়। এ দেশে কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় আশি বছর আগে (১৯২২) সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চেয়েছিলেন 'শতকরা আটানব্বইয়ের জন্য স্বরাজ'। একবারে ঘরোয়া ভাষায় বলতে হয়, আজ দু'হাজার দুই সালে বিশ্বায়নের রায় হলো : "সেগুড়ে বালি"। এটাই হল "ধনতন্ত্রের ক্লেদ, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতার" প্রথম ও শেষ নিদর্শন। "গণতন্ত্র"-এর কুহক ছড়িয়ে, সমাজবাদ-সাম্যবাদের দেদীপ্যমান ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্রেফ ভুলিয়ে দিয়ে যে পৈশাচিক প্রবঞ্চনা এখন প্রায় অপ্রতিহত গতিতে ধাবমান, তাকে রোধ করার প্রয়াসে কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের এই রচনা সহায়ক হবে।"

ধনতন্ত্রের প্রতি চরম ঘৃণা হীরেন্দ্রনাথের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। তিনি উল্লেখ

করেন কখনো মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে—"নছিত্বা পর মর্মানি, ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করং/ন হত্বা মৎস কাতীয়ং প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্", আমার কখনও মহান কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' থেকে বলেন—"যদি ফরাসী লেখক ওজিয়ের কথা ঠিক হয় যে টাকা যখন দেখা দেয় তখন তার গালে জন্মকালের রক্তচিহ্ন (জড়ুল) দেখা যায়, তাহলে বলতে পারি যে পুঁজির আবির্ভাবকালে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।"

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতীব যশস্বী হীরেন মুখার্জী, আমাদের হীরেনদা আমার স্যার নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাদেশিকতার ছোঁয়া না এনেই বলা যায় বাঙালির এক প্রিয় সম্পদশালী প্রতিষ্ঠান। হীরেনদা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। প্রতি বছর দূর অঞ্চলের একজন প্রায় নিরক্ষর একনিষ্ঠ পার্টি সভ্য যেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে নবীকরণ ফর্ম ভর্তি করে রাজ্যদপ্তরে পাঠান, হীরেনদাও তেমনি পরম নিষ্ঠাভরে প্রতিবছর নবীকরণ ফর্ম, লেভি ইত্যাদি নিয়ে যান। তাঁর এই কর্মপদ্ধতির মধ্যে এক সাবলীল শৃঙ্খলাবোধ এবং যেন এক পবিত্রতম কাজ করছেন এই মানসিকতা ফুটে ওঠে। কী বিশাল প্রতিভার মহীরুহ, কিন্তু শৃঙ্খলায় একজন কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়ানো কমিউনিস্ট সৈনিক। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কাছে অবশ্যই শিক্ষণীয় ঘটনা।

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক আদরণীয় শিরোমণিই নন, বাঙালিদের একজন বরিষ্ঠ সমাজপিতার মতন এবং ভারতের বরেণ্য মনীষীদের মধ্যেও একজন শীর্ষস্থানীয় ও সর্বাধুনিক মনস্বীতার এক গভীর সঞ্চালক। তিনি আমাদের পার্টির সম্পদ। সত্যকথা বলতে কী তিনি আমাদের পার্টির সভ্য ও সম্পদ হতে পারেন কিন্তু আসলে তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফসল যেমন আবার সম্পদও তেমন। তিনি আজ শুভবোধসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী জনগণের প্রত্যেকের। তাঁর মেধার শিকড় সর্বব্যাপক, গভীর এবং তা থেকে পরের প্রজন্মের সন্ততিরা রস আহরণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

১৯৫৯ সালে এক চিঠিতে জওহরলাল নেহেরুকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার জীবন এমন বাত্যাবিক্ষুব্ধ নয় যে পোতাশ্রয়ের শান্তি আমি দাবি করতে পারি। তবু জীবনের তরী থেকে দূরায়ত হলেও তীরের সাক্ষাৎ কথঞ্চিৎ পেয়েছি এবং সেজন্যই শুধু দিনযাপনের গ্লানি নয়, তার সার্থকতারও স্বল্পসন্ধান অন্তত পেয়েছি।'

দিনযাপনের সার্থকতার স্বল্প সন্ধানের শুরুর জন্য সেই ১৯৩৪ সালে, দেশে ফেরার আগেই, রাধাকৃষ্ণান স্থির করে রেখেছিলেন যে হুমায়ুন কবীর ও হীরেন মুখার্জীকে ওয়ালটেয়ারে নিয়ে যাবেন। হীরেনদা ব্যারিস্টার হোন বা না হোন সেদিন রাধাকৃষ্ণানের তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এখানেই শুরু। হুমায়ুন কবির ও হীরেন মুখার্জীর অতঃপর অধ্যাপনার হাতে-খড়ি ওয়ালটেয়ারে, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাড়ি থেকে ক্রমাগত ব্যারিস্টারী সনদটাকে একটু কাজে লাগাবার তাগিদ পেয়ে হীরেনবাবু ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি ওয়ালটেয়ারের পাট চুকিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। রাধাকৃষ্ণান অপ্রসন্ন হলেন কিন্তু বাধা দিলেন না।

কলকাতায় তাঁর অক্সফোর্ডের বন্ধু সজ্জাদ জহীর কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর কথা জানাতে পার্টির সম্পাদক পি সি যোশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। হীরেনবাবুর কথায়, 'ব্যবধান রেখে চললাম, ট্রাম বাস কয়েকবার বদলে টালিগঞ্জ এলাকার এঁদো পুকুরের ধারে মেটে ঘরে আলাপ হল যোশীর সঙ্গে। জানি না যোশী ছাড়া অন্য কেউ সেদিন পার্টি প্রধান থাকলে তার মতো আমাকে পার্টিতে টেনে নেওয়া ঘটত কি না—টালিগঞ্জের সেই দীনহীন কুটিরে যে আমার মনস্থির হয়ে গিয়েছিল, পার্টিতে যোগ দেওয়া জীবনব্যাপী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা জেনেও যে কুণ্ঠা বোধ করিনি, গৌণ হলেও যে তার একটা কারণ যোশীর ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই।'

ক্রমে মার্কসীয় রাজনীতি এমন প্রভাব বিস্তার করে যে হীরেন মুখার্জীর পক্ষে নিতান্তই ব্যক্তিস্বার্থে অর্থকরী প্রয়াসে লিপ্ত হওয়া সহজ হল না। ব্যারিস্টারীতে সময় নষ্ট না করে 'পিতৃপ্রভাবে এবং কতকটা ছাত্রখ্যাতির কল্যাণে' রিপন কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রধান হয়ে কাজ শুরু করলেন।

অল্পবয়স থেকেই হীরেনবাবু এত খ্যাতকীর্তি হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় না থাকাটাই আশ্চর্যজনক ছিল। আমি কার্যত তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লাম। ইতিহাসের এক শ্রুতিকীর্তি শিক্ষক তিনি বরাবরই ছিলেন। তাঁর অশ্রুতপূর্ব অধ্যাপনার রস আস্বাদনের জন্য অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কখনো কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে, কখনো বা সম্পূর্ণ লুকিয়ে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হত। সে এক ইতিহাস-পাগল ছাত্রছাত্রী-গবেষক ইত্যাদির আশ্চর্য মহামিলন তীর্থ। প্রেসিডেন্সী থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স—সব এক কলেজে ঢুকে পড়ত। কলেজের শিক্ষক এবং একজন অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে তিনি শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী সর্বমতের মানুষজনের একান্ত প্রিয় ছিলেন। যে ব্যক্তিই তাঁর সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতেন, আমি দেখেছি, এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি থেকে তা বলা হত। ছাত্র ভক্ত হিসাবে যে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম, তাতে সন্দেহ নেই।

পার্টির নেতা, লোকসভার নেতা হিসাবে হীরেন মুখার্জীকে দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। তার বাগ্মিতা কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছে। ইংরেজি বা বাংলায়, যে ভাষাতেই হোক তিনি যখন বলতেন, তখন প্রাচীন গ্রিক উপকথায় অরফিউসের কথা মনে পড়ে যায়। কণ্ঠে এক অনর্গল মোহময় সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠতো। যে মানুষ সেই বক্তৃতা শুনতেন তাঁর মনপ্রাণ তাতে সম্পূর্ণ আপ্লুত হয়ে পড়ত। এ এক অদ্ভুত আকর্ষণীয়, সম্মোহনী ক্ষমতা। পার্লামেন্টকক্ষে যখন হীরেন মুখার্জী বক্তৃতা করতেন তখন জওহরলাল নেহেরুও যেখানেই থাকুন না কেন সভাকক্ষে চলে আসতেন। দুজনের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। হাসি মস্করা, উতোর চাপান, প্যাঁচে খেলা উভয়ের মধ্যে চলত।

হীরেন মুখার্জী একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী, পার্টি-শৃঙ্খলার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই শৃঙ্খলাপরায়ণতা এককথায় অভূতপূর্ব এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য বিশেষ 'প্রতিষ্ঠা' বা জবরদস্ত এক 'কেরিয়ার' তৈরি করার কোনও চেষ্টা করেননি। তিনি চাইলে কী না করতে পারতেন। সম্পদ সংগ্রহ, অর্থ, নিজের নাম চতুর্দিকে ছড়ানো—

দীর্ঘদিন লোকসভার সদস্য হিসাবে থাকাকালীন ইচ্ছা করলেই তিনি করতে পারতেন। কিন্তু এসব তিনি ঘৃণা করতেন। গোলাপের সৌরভ যেমন স্বভাববৈশিষ্ট্যে আপনাআপনিই ছড়িয়ে পড়ে, তাঁরও গুণের সৌরভ দশদিকে নিজের শক্তিতেই ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অতি সাধারণ জীবনযাপন, সহজ আচার ব্যবহার, মূল্যবোধ সত্যিই অনুকরণযোগ্য। নির্বাচনযুদ্ধে বিশেষ দায়িত্ব নিতে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যখন থেকেছি তাঁকে কাছ থেকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার মতো নানান ঘটনা ঘটত। সে তো এখন ইতিহাস। তিনি মানুষের মনের নিষ্ঠা ও প্রত্যয় গেঁথে দিতে পারতেন।

হীরেন মুখার্জীর মতো এতবড় একজন বুদ্ধিজীবী, বাগ্মী হিসাবে যাঁর নাম অ-ভারত বিস্তৃত, একজন ঐতিহাসিক পার্লামেন্টারিয়ান, কখনও নিজেকে পার্টির ঊর্ধ্বে স্থাপন করার চিন্তাকে নিজের অগোচরে স্বপ্নেও স্থান দেননি। আশ্চর্য হতে হয় যে এতবড় উদাহরণ, এক নমস্য ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে থাকতেও তাঁর আদর্শ, ত্যাগ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে বর্তমানের কিছু জনপ্রতিনিধি পার্টির কোনও তোয়াক্কাই করেন না এবং নিজেদের মহান ভেবে পার্টির ঊর্ধ্বে নিজেকে সচেতনভাবে স্থাপন করেন। সেই স্থান থেকে ক্রমাগত পার্টির মতামত গ্রাহ্য না করে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে বিবৃতি প্রকাশ করে চলেন। আত্মনাম জাহির করার এইসব প্রয়াস পার্টিশৃঙ্খলাকে ক্রমাগত লঙ্ঘন ও ভঙ্গ করে চলে। অথচ কত দীর্ঘবছর ধরে কর্মীদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিতে ঘোরতর বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। সাম্রাজ্যবাদের মিত্রবাহিনী এই সুযোগে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় নানান গল্পকাহিনী ছাপছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। এরা ভুলে যাচ্ছেন হীরেন মুখার্জীর লড়াই।

স্যারের মহৎ একটি গুণ ছিল যা সর্বদাই দেদীপ্যমান এবং সর্বদাই অন্যকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমাকে চলার পথে পাথেয় জুগিয়েছে তা হল মূল্যবোধ সম্পর্কে স্যারের আপসহীন মনোভাব। মার্কসের ভাষায় ধনতন্ত্রের 'ক্লেদ, লজ্জা আর অমানবিকতা' যে-কোনও জঘন্য নিম্নপর্যায়ে 'বিদগ্ধ' মানুষকেও নামিয়েছে তা বিস্ময়কর। এই 'নামানো' অর্থাৎ অধঃপতনের বিরুদ্ধে হীরেন্দ্রনাথের জেহাদ কখনও থেমে থাকেনি। আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠে। বহু সময় তিনি কাস্ত্রোকে উল্লেখ করেছেন, প্রথম আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে মার্কসের ঘোষণা স্মরণ করেছেন।

কাস্ত্রো বলেছেন যে, অসম্ভব প্রতিকূলতাও কিউবার জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি কারণ কম্যুনিস্টরা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুত থেকে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আদর্শচ্যুত হয়নি। 'আমরা কাজ করে চলেছি অনেকটা যেন একটা Priesthood-এর মত'—এমন ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। কেউ যেন না ভেবে বলেন যে কম্যুনিস্টরা বুঝি আবার এক 'পুরোহিততন্ত্র' খাড়া করতে চলল। কাস্ত্রোর কম্যুনিস্ট চিন্তায় ধর্ম বিষয়ে ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিক বাস্তব বর্জিত কল্পনাশ্রয়ী সান্ত্বনার স্থান নেই কিন্তু আছে এই মাটির পৃথিবীতে বাস্তবতাভিত্তিক ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠার উপস্থিতি। আজ যখন জগৎ জুড়ে দুর্বৃত্তির প্রাধান্য আর জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে সুনীতির প্রায় অন্তর্ধান ঘটেছে, তখন

কম্যুনিস্টদের কাজ হল আবার সুনীতির প্রতিষ্ঠা ঘটানো, যে কথা ১৮৬০ এর দশকে প্রথম আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে স্বয়ং কার্ল মার্কস বার বার ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর দেশে আমরা সেই আহ্বানেই সাড়া দেব। সম্ভোগ সর্বস্ব জীবনের ব্যর্থ সন্ধানে 'ইঁদুর দৌড়ের' যে সমাজ আজ দেখা দিয়েছে, সে পথে মানুষের পরিত্রাণ নেই। এই পরিত্রাণের পন্থা সম্পর্কে স্যারের তীক্ষ্ণ বক্তব্য এই সঙ্কটে পথ দেখায়।

তিনি লিখেছেন, সোভিয়েত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লোভ বলে একটি রিপু 'মৃত্যু শেলের' মতো মানুষের সমাজ দেহের গভীরে বহু যুগ ধরে প্রোথিত রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রায় অসম্ভব প্রয়াসে সোভিয়েত দেশ নিরত রয়েছে—সেই প্রয়াসকে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে কবি তাদের জানান যে, একটি অত্যন্ত বন্ধুর, অত্যন্ত কঠিন বলেই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, বিচ্যুতি না ঘটে যায়, আদর্শ থেকে স্খলন না দেখা দেয়, এই সাবধানবাণী সব দেশের কম্যুনিস্টদেরই মনে রাখতে হবে। এই 'লোভ' নামে রিপুটির নানা রূপ সর্বত্র দেখছি। তারই ফলে এত দুর্নীতি, এত দুর্বৃত্তি, এত দুর্গতি। তারই ছোঁয়াচে কম্যুনিস্ট আন্দোলনেও বেড়ে চলেছে বহুবিধ ব্যত্যয়, কর্তব্যচ্যুতি অধঃপতনের। সচরাচর ধর্ম বলতে যা বুঝি তা নয়, কিন্তু কাস্ত্রোরই চিন্তার অনুকরণে উদ্ধৃত করি কবিবাক্য :

"ধর্ম যাবে নাম রবে করিবে আহ্বান/দুরূহ কাজে নিজেরে দিও কঠিন পরিচয়।"

প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয় কিন্তু কম্যুনিস্টদের সে ধর্ম তার নির্দোষ আবার দেশে দেশে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে বিপ্লব বিরোধীদের আপাত বিজয়ী দেশগুলিকে করুক।

আজকের কিছু ভাবনা আর দুর্ভাবনা প্রসঙ্গে স্যার যা লিখেছেন তা দিয়েই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সমাপন করছি। প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত সুনীতি, জনকল্যাণভিত্তিক রাজনীতি প্রকৃত মানবিকতামণ্ডিত সভ্যতাকে যদি বাঁচাতে হয়, বিকশিত করতে হয় তা হলে লোভলালায়িত শোষণমূলক, সংখ্যাল্প মানুষের সম্ভোগসর্বস্ব যে মানবিকতা ধনতন্ত্রের পক্ষে অকাট্য, তাকে দূর করে মানুষের যথার্থ গরিমা প্রতিষ্ঠাই হল কম্যুনিজমের অন্বিষ্ট আর কম্যুনিস্টদের সর্ব কর্মে মূল অনুপ্রেরণা। কথা বাড়াব না। কিন্তু সন্দেহ নাই যে প্রাক্তন সোভিয়েত আর মহাচীন সমেত সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে কম্যুনিস্ট চরিত্রে ও কর্মে চারিত্রিক স্খলন ঘটেছে। নইলে এমন বিপর্যয় ১৯৮৭ থেকে ঘটে যেতে পারত না। আমরা স্মরণ করব প্রথম আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে কার্ল মার্কসের ঘোষণা যে সুনীতির বিজয় আমাদের কাম্য। মেহনতী মানুষ দেশে দেশে শান্তি আনবে। সভ্যতাকে কলুষমুক্ত করবে—

'কুহেলিকা করি উদঘাটন/সূর্যের মতন' আসবে সমসুযোগের সর্বজন কল্যাণ ও মানব অভ্যুদয়ের যুগ।

হীরেন মুখার্জীর চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা যারা পরিচিত এবং প্রভাবিত, সেই হিসাবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, সমাজতন্ত্রই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ ও শেষ কথা বলবে—ধনতন্ত্র নয়।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় আমি যা অনুভব করেছি এবং স্যারের বিভিন্ন লেখায়ও তা প্রকাশিত হয়েছে যে মনস্বী হীরেন মুখার্জীর মধ্যে এক দুরন্ত যন্ত্রণা সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছে,

যেন মর্মে গাথা আর তা হল আজকের ভারতবর্ষে বিগত বছরগুলো ধরে চলে আসা কম্যুনিস্ট অনৈক্য। তিনি বার বার কম্যুনিস্ট ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, বক্তৃতা করছেন, লিখছেন, এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করছেন যে, এছাড়া এদেশের নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি, বামপন্থী দলগুলি ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করছে কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। এজেন্ডার এক নম্বরে রাখতে হবে কম্যুনিস্ট ঐক্য।

অবিসংবাদিত কমিউনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জী গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনী ধারণ করেছেন, ক্ষুরধার যুক্তিনিষ্ঠ বাগ্মিতার দ্বারা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, তার ঐক্যকে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী চরিত্রকে রক্ষা করার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন—সে সংগ্রাম ইতিহাসের পাতার স্বর্ণাক্ষরে স্থান করে নেবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্যভাবনা

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বিদ্যাপতির একটি পদের তিনটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যভাবনা প্রকাশ প্রসঙ্গে অনেকবারই ব্যবহারই করেছিলেন। পংক্তি তিনটি হল—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধার বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বস্তুত মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দেবন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা সংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।' (তথ্য ও সত্য/সাহিত্যের পথে) পংক্তি তিনটির কবিকৃত ব্যাখ্যার এখানেই শেষ নয়, ওই গ্রন্থেরই অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের 'ফুল্লরার বারমাস্যা'-র দারিদ্র্য বর্ণনার চিত্রের সঙ্গে আলোচ্য অংশের তুলনা করে বলেছিলেন, 'তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম—সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে উঠল।' পাশাপাশি ফুল্লরার—

দুঃখ করো অবধান
দুঃখ করো অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।—

'কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না।' (সাহিত্যরূপ)

হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা আলোচনা করতে বসে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত মতামত বিচার আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতায় নেমেছিলেন তখন এর তাৎপর্য বোঝা যায়। 'কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই বুঝলে, যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ যে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কর্মিষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে—

যব গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

—হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল মজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা, কবিক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়।'

রবীন্দ্রনাথের 'তথ্য ও সত্য' প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৩১), আর 'সাহিত্যরূপ'-এর প্রকাশ 'প্রবাসী'-তে (বৈশাখ ১৩৩৫)। হীরেন্দ্রনাথের উপরোক্ত ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে (জুলাই ১৯৪০)। কিন্তু কোনো বক্তব্যই প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে। 'তথ্য ও সত্য' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতার অন্যতম। আর জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে বিশ্বভারতী-সম্মিলনী আয়োজিত দুদিনের আলোচনাসভার একদিনের কবিপ্রদত্ত ভাষণ। এর আগে বিচিত্রা-য় (শ্রাবণ ১৩৩৪) 'সাহিত্যধর্ম' নামে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধটি সাহিত্যিক মহলে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই আলোড়নের কথা জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্যধর্ম বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে (১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)।' এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ সত্য' আরে 'সার্থক সত্যে'-র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই করা।' আধুনিক সাহিত্যের যে দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ 'লালসার অসংযম' আখ্যা দিয়েছিলেন তার প্রতি হীরেন্দ্রনাথেরও সমর্থন ছিল না। কিন্তু যাকে তিনি কেবল 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বলেছিলেন সেই সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। কারণ দারিদ্র্য-মোচনের রাজনীতিকে তিনি তখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তাই নাম না করে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় তাঁকে নামতে হয়েছিল। অথচ, 'তরী হতে তীর' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই তিনি তৈরি, তাই এই গ্রন্থ রচনা করে তাঁর জিনিস তাকেই তিনি সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, 'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।' একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সমালোচনার অধিকার কখনও পরিহার করা সঙ্গত নয়, সমুচিত নয়।

হীরেন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যভাবনার মধ্যেই এই দ্বৈততা রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই পারিবারিক প্রভাবে নানা সংস্কৃত শ্লোক বা দেবস্তোত্র তাঁর কণ্ঠস্থ, অনেক ক্ষেত্রেই শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ অথবা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি অনায়াসে শব্দ আহরণ করেন। পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক কাব্য তাঁর অনায়াস আয়ত্ত, ২১.১০.২০০০ তারিখে বর্তমান নিবন্ধকারকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি সাম্প্রতিক 'দুনিয়ার দুর্দশাবৃত্তিতে' তাঁর বিচলিত মানসিকতার কথা জানাতে গিয়ে অনায়াসে শেলীর উদ্ধৃতি দেন, 'Out of the day and night/a joy has taken flight', আবার আশাবাদের কথা শোনাতে গিয়ে Browning-এর সেই নায়কের কথা তাঁর মনে আসে, One who never turned his back but marched breast forward. অত্যন্ত পরিণত বয়সেও এইসব কবিরা যাঁর কণ্ঠস্থ থাকে, তিনি যে রোম্যান্টিকদের একেবারে উপেক্ষা করেন না তা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। প্রেসিডেন্সী কলেজে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াতেন Golden Treasury-র চতুর্থ খণ্ড। ইতিহাসের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ ইংরেজি পাস ক্লাসে তার কিছুটা স্বাদ পেয়েছিলেন, 'আর অমনোযোগী আমরা শ্রীকুমারবাবুর ব্যাখ্যা একটু আধটু শুনে নিজেরাই ডুবে যেতাম শেলী-কীটস-বায়রণ-ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তো মাথা কিছু পরিমাণে খেয়ে রেখেছিলেন : 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য

কোনোখানে'—আলোচনা হয় রবীন্দ্রনাথের কোন্ দুটো বই সবচেয়ে ভালো? চিত্রা আর ক্ষণিকা? বি. এ. যখন সাঙ্গ হয়নি, বেরলো পূরবী—রবীন্দ্রনাথ আমাদের কম ভোগান নি তখন।' (তরী হতে তীর)

রবীন্দ্রনাথ কতটা ভুগিয়েছিলেন তার প্রমাণ তো ছড়িয়ে আছে 'তরী হতে তীর'-এর পাতায় পাতায়। তাই 'নির্দেশিকা'-য় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জানাতে হয়, 'সারা বইতে উল্লিখিত'। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর বক্তৃতা বা লেখা কোনোটিই যেন সম্পূর্ণ হয় না। 'আমার মনের গহনে সূর্যের মতো বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ'—কথাটা তিনি অকারণে বলেন নি। মনে রাখা দরকার হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্যস্রষ্টা নন, সমালোচক কথাটিও বোধহয় তাঁর পছন্দ হবে না, তাঁকে সাহিত্যের রস-আস্বাদক বলাই ভালো। তাই তাঁর মুগ্ধতা যতটা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে বোধহয় তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে ততটা নয়। তাঁর ছাত্রজীবনে কল্লোল-কালিকলম-কেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের তিনি দ্রষ্টা ঠিকই তবে খুব একটা অনুরক্ত নন। তাছাড়া পারিবারিক ঐতিহ্য তো ছিলই। আবার সাহিত্যে আধুনিকতার যে হাওয়া এসেছিল তাকে উপেক্ষা করবারও কোনো কারণ ঘটেনি। 'আমাদের বাড়িতে 'কল্লোল' বা 'কালিকলম' অথবা কিছু পরে 'শনিবারের চিঠি' ধরনের পত্রিকা সম্বন্ধে একটা যেন অনীহা ছিল, কিন্তু স্বল্পপরিচয় সত্ত্বেও 'কল্লোল' যে হাওয়া এনেছিল তার স্পর্শ মনে না লেগে পারেনি।' জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে সাহিত্য-বিতর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মতামতের সঙ্গেও তিনি নিজেকে পরিচিত রেখেছিলেন। আধুনিকতা-বিরোধী সমালোচকদের বক্তব্যে তাঁর সায় ছিল না, আবার তথাকথিত আধুনিকতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত ছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে 'মনের পরিধি আর সাহিত্য রসাস্বাদের যে অভিজ্ঞান' স্থির করে দিলেন সেটাই তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে জীবনবোধের সত্যতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সাহিত্যে হাটের কল্যাণে হট্টগোল দেখা দিতেই পারে কিন্তু যে দেশে হাটই নেই সেখানে হট্টগোল কেন—রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের জবাব আধুনিকরা দেন নি, হীরেন্দ্রনাথও কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাননি। তখনো পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলনের দ্রষ্টা, কোনো শিবিরের লোক নন।

।। দুই ।।

বিদেশে পাড়ি দেবার পর থেকেই বোধহয় হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার অন্যতর পর্যায়ের সূচনা। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ এই পাঁচ বৎসর শুধু জাতীয়ই নয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিরও এক ঝোড়ো সময়। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। লন্ডন শহরের যে কজন ভারতীয় ছাত্র তখন প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। লন্ডনে একত্রে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে যে আলোচনা করেছিল তারই পরিণতি হলো এই সংস্থা। তারা সবাই যে লেখক তা নয়। প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম থেকেই (আশাকরি আজও) লেখক আর পাঠকের সমান স্থান রয়েছে বললে হয়তো ভুল হবে না। সজ্জাদ জহীর, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, মুলকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য এবং আরও

কয়েকজনের আলোচনার জের টেনে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করা হয়। এতে আমার স্বাক্ষরও আছে, যদিও ১৯৩৪ সালে আমি দেশে ফিরে আসি।' (প্রগতি লেখক আন্দোলন, 'অর্ধশতাব্দীর মন্থিত স্মৃতি')।

এই প্রগতি লেখক সংঘকে কেন্দ্র করেই হীরেন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যের পাঠক ছিলেন, এবার হলেন সাহিত্য-আন্দোলনের সংগঠক। তখনও পর্যন্ত সমকালীন সাহিত্যিকদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় নেই। কিন্তু সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে জড়ো করার রাজনৈতিক দায়িত্ব তাঁর ওপরেই এসে পড়ল। হীরেন্দ্রনাথকে সামনে রেখে একটি বৃহত্তর ও ব্যাপক মঞ্চ তৈরি করা শুরু হয়ে গেল। এটা ছিল তাঁর পার্টি-নির্ধারিত কাজ। পরিচয়-এর আসরে তাঁর যাতায়াতের কারণ নিছক আড্ডা দেওয়া ছিল না, তাও ছিল রাজনৈতিক দায়িত্বেরই অঙ্গ। নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ঠিক গোষ্ঠীভুক্ত হতে তিনি পারেন নি। 'আড্ডাধারী হবার মত স্বভাবও ছিল না। আর তখন (এখনও ভিন্নভাবে) যা আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল সেই কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হিসাবে লেখক-শিল্পীদের নিয়ে প্রগতি প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম বলে পরিচয়-এর মতো একটা পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ছিল কর্তব্যেরই মধ্যে। (ভূমিকা, পরিচয়-এর আড্ডা, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ)।'

কর্তব্য তিনি কতটা পালন করেছিলেন তা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সাক্ষ্যেই পাওয়া যাবে। ১৯৩৫ থেকেই আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর পরিচয়-এর আড্ডায় যাতায়াত শুরু। ১৯৩৬-এর শেষদিকে হীরেন্দ্রনাথের তৎকালীন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ। শ্যামলকৃষ্ণ জানিয়েছেন যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আড্ডায় যে সমস্ত আক্রমণ হত তা এতকাল একা প্রতিহত করে এসেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। হীরেন্দ্রনাথের আগমনের পর থেকে তিনি যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাই কখনও তাঁকে আড্ডায় ফ্যাসিস্টবিরোধী ইস্তাহারের খসড়া পড়তে দেখা যায়, উদ্দেশ্য সভ্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ। কোনোদিন দুটি বামপন্থী পত্রিকা সুধীন্দ্রনাথের হাতে দিতে দেখা যায়, কোনোদিন বা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে লেফট বুক ক্লাব-এর সদস্য করে নেন। এমনকি, বন্ধু সুধীন্দ্রনাথকে মৃদু অনুযোগ করতেও ছাড়েন না যে, তাঁর বিপুল গ্রন্থভাণ্ডারে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বইও নেই। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আড্ডায় প্রায় তাঁর নিত্য সঙ্গী। এই দুজন মিলে আড্ডা থেকে সরিয়ে নিয়ে হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন গোপন কোনো কাজের কথা সেরে নেন, তখন বোঝাই যায় যে, এটাও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ, নিছক আড্ডা নয়।

বস্তুত শ্যামলকৃষ্ণের প্রায় দুশো চুয়াল্লিশ পাতার বিবরণীতে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত প্রায় কোনো বিতর্কেই হীরেন্দ্রনাথকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। কিন্তু এই আসরের মাধ্যমেই সাহিত্যজগতে তাঁর গভীরতর অনুপ্রবেশ। ১৯৩৫ থেকেই রিপন কলেজে বিষ্ণু দে তাঁর সহকর্মী, পরিচয়ের আড্ডায় যাতায়াতে সেই ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। 'জীবনের প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই হীরেনবাবু ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন' প্রভৃতি দে-র এই মন্তব্য মূল্যবান (কোরক, হীরেন মুখার্জী সংখ্যা)। প্রধানত ব্যক্তিজীবন বা শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যার

ক্ষেত্রে এই ধরনের পরামর্শ জরুরি ছিল বলে মনে হয়। কারণ, পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে, মার্কসবাদী শিবিরের সাহিত্য-বিতর্কে হীরেন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে একই জায়গায়। অবশ্য বিষ্ণু দে যতটা সরব, তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ততটা নন। হয়তো দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্ন ছিল। তবে তাঁর সাহিত্যভাবনার নতুন একটা চেহারা যে পরিচয় পর্বেই গড়ে উঠছিল আত্মজীবনীর ফাঁকে ফাঁকে তার দু-একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে। পরিচয়-এর আড্ডায় Left review-র মতো পত্রিকার গ্রাহক খুঁজেছেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি তাঁর এমন কথাও মনে হয়েছিল যে, বিদেশী লেখকদের 'রক্ত পতাকাবিলাসে উল্লসিত হয়ে কিছু ব্যক্তি এদেশে একটা বিজাতীয় ধারা প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টায়' নেমেছে এমন অভিযোগ উঠতেও পারে, অভিযোগ উঠেও ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭-এই ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র মানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেয়, লাল টুপি পরে বা যে কোনো উগ্র সাজেই হোক তখন আমাদের দেশের ইস্কুল মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। (সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে)'

অসাধারণ সতর্কবাণী। রাশিয়া পরিভ্রমণের পরও কবির এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, রাশিয়া-ভ্রমণ তাঁর 'এ জন্মের তীর্থদর্শন'—এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল ছিলেন, কিন্তু, সেখানকার মতাদর্শ দিয়ে সাহিত্যবিচার-পদ্ধতি সমর্থন করেননি, 'আমি যখন মস্কো গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পঙ্‌ক্তি পেল না (সাহিত্য বিচার/সাহিত্যের স্বরূপ)। জীবনের একেবারে অন্তিমপর্বে (আষাঢ়, ১৩৪৮) মহাকবির এই স্মৃতিচারণ। তখনই বিভিন্ন সমালোচনায় তাঁর লেখার রঙ-নির্ধারণের সূচনা হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে তাঁর এই আশঙ্কা তিক্ত সত্য হয়ে উঠেছিল, 'জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তে আছে তাই ভয় হয় যে, এই আগাছাগুলিকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।' উপড়ে ফেলা যে একেবারেই যায়নি ১৯৪৮-৪৯-এর 'মার্কসবাদী' পত্রিকার ছটি সংকলনই তাঁর প্রমাণ। অবশ্য বাদ-বিসম্বাদ কেবল ওই সংকলন কটিতেই সীমিত ছিল না, এর শাখা-প্রশাখাও ছিল অনেক।

হীরেন্দ্রনাথ এই রাবীন্দ্রিক-দৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে দেখেননি। বাংলায় প্রগতি সাহিত্যের সূচনা এবং সাহিত্যে বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রয়োগকে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর মনে হয়েছিল 'হিমালয়ের উচ্চতাও যখন যুগের হাওয়াকে বাধা দিতে পারে না, তখন এদেশেও' যে সমসাময়িক জীবনসমস্যার স্পর্শ লাগবে তা তো স্বাভাবিক।' কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণের এক বৎসর পর (১৯৩৭) সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে 'প্রগতি' সংকলনটি বের করবার সময়ও হয়তো তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত এই সংকলনে ক্ষণিকা, চিত্রা বা পূরবী থেকে নয়, 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর অনশন, পুনা অ্যাক্ট এবং গান্ধীজীর গ্রেপ্তার—এই কবিতাটির প্রাথমিক উপলক্ষ। কিন্তু মনুষ্যত্বের সামগ্রিক নিপীড়নে কবির ক্ষোভ এবং

বেদনা কবিতাটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বলেই এর আবেদন ছিল চিরন্তন। তাই 'প্রগতি'-র মুখবন্ধে এটির অবস্থান স্বাভাবিক ছিল। মূল 'প্রগতি'র ভূমিকা লিখেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় (২৯.১.৯১) হীরেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, 'বহুজন সমাবেশের শক্তিতে 'সংগঠন' 'আন্দোলন' 'সংগ্রাম' ইত্যাকার ব্যাপার সচরাচর অন্তত সহজ সামাজিক পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে যে অস্বস্তিকর তাতে সন্দেহ নেই।' তখন তো সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো পরিস্থিতিই সহজ ছিল না। 'তখন ফ্যাসিস্ট পৈশাচিকতার হুঙ্কারকে পরাভূত করতে শিল্পসাহিত্য-জ্ঞানবিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সর্বজনের সংহত সঙ্কল্প ঘোষণার কাজ ছিল প্রগতি লেখক সংঘের। সেজন্যই বহুকাল আগে কার্ল মার্কস যে কথা বলেছিলেন, The party in the grand historical sense of the term (বিরাট ঐতিহাসিক অর্থে সংগঠিত পার্টি) সেই কথাই যেন অনুরণিত করেছিল।'

একটি বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে 'প্রগতি'-র সৃষ্টি এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে লেখাগুলোর সবই উঁচু মানের নয়, বিষয়বস্তুও কিছুটা এলোমেলো। মনে হয় বিভিন্ন শিবিরের লেখককে সংঘবদ্ধ করাটাই ছিল মূল লক্ষ্য, তাদের লেখার মান বিচারের আগ্রহ সম্পাদকদের ছিল না, সেটা তাদের উদ্দেশ্যও নয়। 'প্রগতি'র ভূমিকায় প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অকুন্ঠ স্বীকৃতি ছিল, 'দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি কবির এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সবসময় সুসাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই।' সভাপতির বক্তব্য যাই হোক না কেন এই সংঘের অন্তত কারো কারো দল বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা তো ছিলই। ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ-এ প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে শরৎচন্দ্রের কাছে বাণী নিতে যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই 'দল বাঁধা' নিয়ে কিছুটা হাসিঠাট্টাও করেছিলেন, 'একটা 'বাণী' অবশ্য দিলেন, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে নয়, কারণ ব্যাপারটা ঠিক মনঃপুত ছিল না।' দল বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই সংকলনের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। অন্যতর সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে লেখা চিঠিতে এই সমর্থন অত্যন্ত স্পষ্ট, 'বন্ধনমুক্তিকামী চিন্তার ও ভাবের, ধর্মনীতির ও কর্মনীতির ঝড়ো হাওয়া আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করে ছুটেছে এর ধাক্কা থেকে আমাদের মনও নিষ্কৃতি পায় না। তোমার প্রগতি বইখানিতে তুমি তারই পরিচয় একত্র সংগ্রহ করেছ। বিশ্বব্যাপী মানুষ এইযুগে তার জীর্ণ খোলসখানা ত্যাগ করতে উদ্যত। এর ভালোমন্দ পদ্ধতি এবং পরিণাম বিচার করবার সময় এখনো হয়নি—নির্দয় দ্বন্দ্ব এবং বিকৃতির মধ্য দিয়েও নতুন যুগ আবিষ্কারের সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। (৬.১০.৩৭)' বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে তখন রবীন্দ্রনাথও অন্যতম পুরোধা। তাই প্রগতির মতাদর্শের প্রতি তাঁর প্রবলতর সমর্থন। এই সমর্থনে অবশ্যই হীরেন্দ্রনাথরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। যুগ ও কাল তাঁদের পক্ষেই ছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সংস্করণের ভূমিকা যখন তিনি লেখেন তখন এই উৎসাহ হীরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার কাজ করে। তখন সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত মাপকাঠি প্রয়োগে তাঁর দ্বিধা নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার সমর্থনে তিনি নামেন, কিন্তু তাঁর সমর্থন

সেই অংশের প্রতি যার মধ্যে 'যুগাবর্তের উৎকণ্ঠিত লক্ষণ এবং কাব্যসিদ্ধির সম্ভাবনা' আছে। রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে 'রবীন্দ্রপ্রবাহ থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা যুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাদেরই লেখা নিয়ে এই সংকলন। সহযোগী সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই তাঁর সাহিত্যভাবনা থেকে তিনি আলাদা হয়ে যান, কিন্তু সুনিশ্চিত কোনো মতবাদের প্রয়োগও তিনি কাব্যবিচারে ঘটান না। এই ভূমিকাটি আসলে তাঁর নিজের মনের কথা, কোনো দুরূহ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়। War poet উইলফ্রেড ওয়েনের এই দুটি পংক্তিই যেন তাঁর কাছে যুগধর্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—

All the poet can do today is to warn
That is why the true poet must he truthful.

যে সত্যের কথা তিনি এখানে বলেন তা রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সাধারণ সত্য' মাত্র, 'সার্থক সত্য' নয়। আবার বাছবিচার বিহীন সাধারণ সত্যের নিরঙ্কুশ প্রকাশকেও তিনি সবসময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এলিঅটের ক্যাথলিক চার্চে আত্মসমর্পণে তাঁর সমর্থন নেই। বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রলয়ের কোলাহল ছাপিয়ে নতুন যুগের নবসৃষ্টির পদধ্বনির বদলে হতাশার এই বাণী শ্রবণে তিনি ব্যথিত— 'মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব, সখা/বেদনা শুধুই বেদনা সুচির সাথী।' আধুনিক কবিতাকে সমর্থন করলেও তার দুরূহতার কারণ নির্দেশ করেন', আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা।'

আবার কাব্য সমালোচনায় তাঁর নিরপেক্ষতাও এই ভূমিকায় বেরিয়ে আসে। বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রবলতম অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বলতে হয়, 'আত্মসমাহিত ক্লান্ত মন বিচলিত বলে তাঁর কবিতা যেন জীবনকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে দেখছে, তাঁর ব্যাজোক্তি পর্যন্ত যেন তিক্ততাকেও মোহনীয় করতে চায়, সমাজব্যাধি নির্মূল করা সম্বন্ধে মনস্থির করেন নি। এলিয়ট পাউন্ডের তিনি ভক্ত, কিন্তু তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে পাণ্ডিত্য কবিতাকে গুরুত্ব দেয়, মহত্ত্ব দিতে পারে কিনা সন্দেহ।' সাম্যবাদী কবিদের বিরুদ্ধে আইয়ুবের কটাক্ষের প্রবল বিরোধিতায় তিনি নামেন বটে, কিন্তু তাঁদের সবসময় সমর্থনও করতে পারেন না। তাঁদের কাছে তাঁর প্রত্যাশা যেন অনেক বেশি। 'সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার নানা গুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।' আবার 'মার্কসপন্থা যে কাব্যরাজ্যেরও পাসপোর্ট' এই আপ্তবাক্যও তিনি মেনে নিতে পারেন না। তবে তাঁর মতে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের যে আর আশা নেই— তা কবিরা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল। তবে শেষ পর্যন্ত কবির কাছে তাঁর চূড়ান্ত আহ্বান, 'আর্টকে ব্যবহার করতে অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত।' এ হচ্ছে সেই হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য যিনি প্রায় আশি বৎসর বয়সেও অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারেন, 'কম্যুনিস্ট মতবাদ—না বলব জীবনদর্শন, বিশ্ববীক্ষা? গ্রহণ ব্যাপারে আমার মনে কোথাও খাদ থাকে নি। স্বীকার না করে পারি না যে, কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের যুগ থেকে অদ্যাধিক আজ পর্যন্ত পার্টিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপিতা মাঝে মাঝে একটু যেন আতঙ্কিত করেছে।' আবার এই শৃঙ্খলা যে মাঝে মাঝে সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ভুলেরও জন্ম দেয় তাও তাঁর

জানা। সেক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সান্ত্বনা, 'কম্যুনিস্টরা কখনো বলে না তারা নিয়ত নির্ভুল পথে চলতে থাকে, আত্মসমালোচনা তাদের সতত কর্তব্য।'

এই উদার মানসিকতাই তাঁর সাহিত্যভাবনাকে স্বচ্ছ এবং গতিশীল রেখেছে। এক পরিশীলিত রুচিবোধের দ্বারাই তিনি সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাই মোহিতলাল বা বনফুল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে স্বাগত না জানালেও তাঁরা যে 'কৃতবিদ্য লেখক' এ স্বীকৃতিতে তাঁর দ্বিধা নেই। প্রগতি শিবিরে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার জন্য নিজের অক্ষমতাকেই দায়ী করেছেন। তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চিরকালেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রগতিশিবিরে সমালোচিত তারাশঙ্করেরও তাঁর প্রতি প্রবল আস্থা। দিল্লীতে তাঁকে স্বপ্ন দেখে আবেগে চিঠি লেখেন আর হীরেন্দ্রনাথ তাতে মুগ্ধ হন। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা আমাদের জানা, আবার জীবনানন্দের 'মায়াবী কবিতা' সম্পর্কে তাঁর অস্বস্তির কথা জানাতে তিনি কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেন, বোধহয় সঠিক মূল্যায়ন করা হল না। অমিয় চক্রবর্তী বা প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কেও তাঁর প্রত্যাশাভঙ্গের কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন আমাদের বিস্মিত করে। বিভূতিভূষণের সঙ্গে প্রগতিশিবিরের দূরত্বের দায়টি তিনি নিজেদের ওপরই চাপান, 'একটা হয় তো তার কারণ সহজ সাধারণ বাঙালী মনের আবেগাতিশয্য তাঁর লেখায় লক্ষ্য করে একটা অস্বস্তি আমাদের অনেককে অন্ধ করে রেখেছিল বিভূতিবাবুর পর্যবেক্ষণ আর অনুভূতির ঐশ্বর্যের দিকে।' সমকালীন সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-কেই তাঁর মনে হয়েছিল সমাজবোধ ও শিল্পায়নের অদ্বৈত সার্থকতায় তিনি শ্রেষ্ঠ। এই মতে যদি আমাদের সায়ও থাকে সমকালীন মার্কসবাদী শিবির তা কখনো মেনে নিত না।

এইসব নিয়েই হীরেনবাবুর সাহিত্যভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা ঘরানার হয়ে যায়। তাঁকে নিছক মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক না বলে একজন সম্পূর্ণ ভারতীয় সমালোচক বলা চলে। তার একদিকে রয়েছে ভারতের ইতিহাস, দর্শন ও ক্লাসিকাল সাহিত্যের ঐতিহ্য, অপরদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মার্কসবাদ এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে তাঁদের তুলনায় গোপাল হালদারেরই যে ভূমিকা ছিল তা স্বীকারেও তাঁর দ্বিধা নেই। কমিউনিস্ট বিরোধীদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে তিনি নিজের গুণ বলে মেনে নিতে চাননি, 'কারণ খুব সম্ভব এটা গুণ নয়, এটা একধরনের দুর্বলতা আর দোষ।' এটা দুর্বলতা বা দোষ কোনটিই নয়, এটা প্রকৃত কমিউনিস্টের আকর্ষণী ক্ষমতা। সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রেও হীরেন্দ্রনাথ তাই সমস্ত শিবিরের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন, কোনো মতবাদকেই সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলে তাঁর মনে হয় না। প্রথম বিদেশযাত্রার সময় স্বদেশভূমি ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্তে হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, 'আমার দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেই বুঝি ভালো ছিল।' মনের দিক থেকে তিনি চিরকালই দেশের মাটিকেই আঁকড়ে থেকেছেন, সাহিত্যভাবনাও তাই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিদেশ-নির্ভর থাকে না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-সাহিত্য

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির অনুবাদের ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অনুবাদের ভাষা নিয়ে বেশি আশা না করাই সঙ্গত, তিনি তো মায়ের কোলে বসে ইংরেজি শেখেন নি।

আমরাও মায়ের কোলে ইংরেজি শিখি নি। আমাদের পক্ষে হীরেনবাবুর অনুবাদের সাহিত্যমূল্য বিচার করা কঠিন, সেটা করতে পারবেন সেইসব ব্যক্তিরা যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি এবং সাহিত্যবোধ আছে। এই আলোচনায়, আমরা হীরেনবাবুর অনুবাদ-সাহিত্যের প্রেক্ষাপটটাই শুধু স্মরণ করব। তার সঙ্গে অনুবাদের তথ্যভিত্তিক প্রসঙ্গেও মধ্যে মধ্যে যাব।

তথ্যের প্রসঙ্গ আসায়, একটা কথা গোড়াতেই সেরে নেওয়া ভালো। হীরেনবাবুর জন্মদিন ২৩ নভেম্বর ২০০২-এ প্রকাশিত 'শঙ্কা সংকট প্রত্যয়' নামে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে, তার জীবনীপঞ্জি অনুসরণ করলে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

যে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই রচনায় আসবে, তার তালিকা :

ক. Your Tagore for Today। রবীন্দ্ররচনার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। সম্পাদক, হিরণকুমার সান্যাল। অনুবাদক, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।

খ. Epoch's End। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ (জুন ১৯৪৫)-এর অনুবাদ। অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশের সময় অনুবাদ-গ্রন্থে নির্দিষ্ট হয় নি। জীবনীপঞ্জিতে বলা হয়েছে, অনুবাদক 'মন্বন্তর' অনুবাদ করেন ১৯৪৪ সালে।

গ. Boatman of the Padma। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র অনুবাদ। অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৪৮। জীবনীপঞ্জিতে জানানো হয়েছে, অনুবাদক অনুবাদ করেন ১৯৪৫ সালে Boatman of Padma।

ঘ. One Hundred and One। রবীন্দ্র-কবিতার নির্বাচিত সংকলনের অনুবাদে, আটটি কবিতার অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, দুই পাখি, ব্রাহ্মণ, দুঃসময়, দেবতার গ্রাস, কৃতজ্ঞ, প্রশ্ন এবং ওরা কাজ করে। অনুবাদ-গ্রন্থটির সম্পাদক হুমায়ুন কবির। অন্য অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন অমলেন্দু বোস, জে সি ঘোষ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বোস, হুমায়ুন কবির, অমিয় চক্রবর্তী, সোমনাথ মৈত্র, সমর সেন, ভবানী ভট্টাচার্য, ডি এস শরবানে, ক্ষিতীশ রায়, লীলা রায়, মণিকা ভার্মা, আবু সয়ীদ আয়ুব, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, তারক সেন এবং শিশির কে ঘোষ। প্রকাশ ১৯৬৬। জীবনীপঞ্জিতে বলা হয়েছে হীরেন মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেন ১৯৬১ সালে।

One Hundred and One অনুবাদগ্রন্থের অনুবাদকদের নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে, সংকলনের সময়ে ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য অধ্যাপক ও কবিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত অনুবাদ নিয়ে যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদের পরে, আমাদের আগ্রহ থেকেই যায়, সম্পূর্ণতর এবং উন্নততর অনুবাদের চেহারাটা কী দাঁড়ায়। কবীর সাহেব এমন অনেক কবিতাও নিয়েছিলেন যার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ওই কবিতাগুলোর আবার অনুবাদের যাথার্থ্যও আমরা বিচার করতে পারি। এই রচনা যেহেতু হীরেনবাবুর অনুবাদে আবদ্ধ, আমরা হীরেনবাবুর আটটি কবিতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

'প্রশ্ন' কবিতাটি নিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এটি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আছে ম্যাকমিলানের Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore গ্রন্থে।

This Evil Day

Age after age, hast Thou, O Lord, sent thy messengers into this pitiless world, who have left their word : 'forgive all. Love all. Cleanse your hearts from the blood-red strains of hatred.'

Adovable are they, ever to be remembered; yet from the outer door have I turned them today—this evil day—with unmeaning solutation.

Have I not seen secret malignance strike down the helpless under the cover of hypocritical night?

Have I not heard the silenced voice of Justice weeping in solitude at might's defiant outrages?

Have I not seen in what agony reckless youth, running mad, has vainly shattered its life against insensitive rocks?

Choked is my voice, mute are my songs to-day and darkly my world lies imprisoned in a dismal dream; and I ask thee, O Lord, in tears : 'Hast thou Thyself forgiven, hast even Thou loved those who are poisoning thy air, and blotting out thy light?'

হীরেনবাবু কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন দুবার, একবার Your Tagore for Today-এর জন্য, আর একবার One Hundred and One-এর জন্য। প্রথমবার

A Question

God, time and again, you have sent your
  Evangels to this heartless world;
They exhorted us to pardon all, to love all,
  to pluck all poisonous roots of hatred
  out of our hearts;
Adovable they are, memorable they are,
  yet in these dark days, I turned
  them back from my door-step,
  with empty salutations.
Have I not myself seen how secret

violence strikes all helpless
innocence, under the deceitful cover of night;
Have I not seen the voice of Justice choke,
in lonely silence, at the aggression of the strong
that goes unchecked;
Have I not seen young enthusiasts, in a mad rush,
counting painful death, with futile knocks
against walls of stone!
My throat is strangled, my flute is dumb,
my world is cribbed and lost in a
nightmare of pitch-black darkness.
So I ask you, with tears, this urgent question,
Those that are poisoning your air, and
blotting out your light,
Can you forgive them, can you give them your love?

দুটো অনুবাদের নিম্নরেখ শব্দগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় হীরেনবাবুর পছন্দ ভারী শব্দে, এবং এটা বলা যাবে না তাঁর অনুবাদে মূল কবিতা বিদেশি পাঠকের কাছে বেশি গ্রাহ্য হবে। একমাত্র deceitful cover of night (Cover of hypocritical night) ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল না।

বছর কুড়ি পরে হীরেনবাবু 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবার অনুবাদ করলেন। এবার :

Question

From age to age, O God, you have sent your apostles to this pitiless world : And they preached their gospel : 'Forgive all trespasses, love all, and banish hate from all hearts.' They claim our homage, time will not forget them, and, yet, my regard unavailing, I must turn them back.

Have I not seen stealthy malice, in the night's deceitful shadow, hust death at the helpless? Have I not seen Justice mourn, worldless and desolate, when the strong flaunt their unchecked crimes? Have I not seen youth, in agony, rush madly to break their head against the baffling cruelty of stone?

Today I am throttled, my flute has lost its music. Amavasya's gloom has smothered my world in a nightmare. And so, in tears, I ask; 'Have you forgiven them who poison your air and blot out your light? Have you blessed them with your love?' [Amavasya : the moon's darkest phase]

দূত শব্দটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন messenger—তাতে কোনও ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছিল না। হীরেনবাবুর Evangel, apostles, gospel-এ ধর্মীয়, বিশেষ করে খৃস্টীয় ধর্মের, ব্যঞ্জনা কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। forgive all trespasses—এই নতুন ভাবের আবহও মূলে ছিল না। পরবর্তী অংশে হীরেনবাবু ভারী শব্দের আওতা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছেন। তবে, মনে হয় না, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের পর এই কবিতাটির নতুন অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। বাংলা কবিতার ছন্দ আর ইংরেজি কবিতার ছন্দে কোনওই মিল

নেই, অনুবাদে এক ছন্দ অন্য ছন্দে আনাও যায় না। তবু, মূল কবিতার ছন্দের ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আর হীরেনবাবুর প্রথম অনুবাদে কিছুটা ছিল; হীরেনবাবুর দ্বিতীয় অনুবাদে সেটা অন্তর্হিত। হীরেনবাবুর দ্বিতীয় অনুবাদে স্বাভাবিক ইংরেজি অনেকটা বজায় থেকেছে।

হুমায়ুন কবির তাঁর সংকলনের অনুবাদে বলেছিলেন, তাঁর অনুবাদকদের অনুবাদে দুটি ধরন ছিল—একটি আক্ষরিক, আর একটি মূলকে অবলম্বন করে নতুন সৃষ্টি। সম্পাদক সাধ্যমতো দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে চেয়েছেন। হীরেনবাবুর অনুবাদ, প্রথম ধরনের, আক্ষরিক। তাঁর সব কটি অনুবাদেই তিনি মূলানুগ থেকেছেন, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে। তবে, দু-একটি সংযোজন বা স্খলনের কথা বলতেই হয়।

'ব্রাহ্মণ' কবিতার অনুবাদে :

আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে;

To the silent ashram returned the children of the sages, on their heads <u>small</u> loads of sacrificial log collected in <u>nearby</u> woods. Called back from <u>daylong pasture,</u> the ashram cattle <u>browsed calmly,</u> tired, yet their eyes tranquil with content.

নিম্নরেখ শব্দগুলো হীরেনবাবুর সংযোজন। এতে অর্থের কোনও বিকৃতি না হলেও, প্রয়োজনও ছিল না। ঋষিপুত্রদের মাথায় হীরেনবাবু ভারী কাঠ চাপাতে চান নি, বেশি খাটানোরও তিনি পক্ষপাতী নন, তাই ঋষিপুত্রদের কাছাকাছি জঙ্গল থেকে কাঠ আনার কথা বলেছেন হয়তো। গোরুরা সারাদিনই মাঠে থাকার কথা এবং ফিরে এসে শান্ত হয়ে ঘাস চিবোনোরই কথা—তবু এসব মূলে ছিল না।

যেখানে অবশ্য হীরেনবাবু অন্যায় করেছেন, সেটা 'ক্ষীণ-স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী'কে the thin, opaque and restful Saraswati করা। স্বচ্ছতাকে opaque কেন করবেন, যেখানে কবিতাটির মর্মবস্তুই স্বচ্ছতা?

রবীন্দ্ররচনার যে সংকলন হিরণকুমার সান্যাল করেছিলেন আর হীরেনবাবু ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, সেই সংকলন প্রকাশের সময়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ থেকে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক ছিল। সাহিত্য-শিল্পে রাজনৈতিক দলের আজ্ঞা থাকবে কি থাকবে না, সাহিত্য-শিল্পের নিজস্ব নীতি থাকতে পারে কি পারে না, শ্রেণীসত্তা সাহিত্য-শিল্পকে প্রভাবিত করে কি করে না, এই তর্কে সব তাত্ত্বিকেরা যে নিজেরাই স্পষ্ট ছিলেন, তা নয়, নিজেরাই মত পালটাচ্ছেন, দল পালটাচ্ছেন, সব দল থেকে সরে আসছেন—

এমনই ছিল সময়টা। 'অগ্রণী', 'অরণি', 'পরিচয়' সব পত্রিকাই তখন নিজ নিজ সময়ে বামপন্থী, কিন্তু এক পত্রিকার মত অন্য পত্রিকার সঙ্গে মেলে না, পারস্পরিক বিরোধও প্রচ্ছন্ন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তো বটেই, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথও প্রতিক্রিয়াশীল লেখক বলে অভিযুক্ত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথও লক্ষ করেছিলেন এই তর্কের সূচনা এবং বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, বুর্জোয়া নামে অভিযুক্ত হয়ে।

এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে, যেটা চরমে উঠবে ১৯৪৮-৫০ 'মার্কসবাদী' সংকলনের মধ্যে, হিরণকুমার সান্যাল এবং হীরেনবাবু যে Your Tagore for Today সংকলনটা প্রকাশ করলেন, তার থেকে আভাস পাওয়া যায়, ওই তর্কে তাঁদের অবস্থান কোথায় ছিল। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে অগ্রাহ্য করেন নি। ১৯৬৫ সালে হুমায়ুন কবির যখন One Hundred and One প্রকাশ করেন, তখন অনুবাদকদের জন্য মার্কামারা কমিউনিস্ট হীরেনবাবুকে আমন্ত্রণ জানানো বিস্ময়কর নয়, কেননা তখন রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলে ত্যাগ করার ঝাঁঝ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে হিরণকুমার এবং হীরেনবাবু তাঁদের মত স্পষ্ট করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

ওই একই সময়ে হীরেনবাবু অনুবাদ করেছেন তারাশঙ্কর এবং মানিকের উপন্যাস। মানিকের উপন্যাস নিয়ে কোনও সংশয়ে পড়তে হয় নি হীরেনবাবুকে, কিন্তু তারাশঙ্করকে অনুবাদ করা তাৎপর্যপূর্ণ।

তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের অনুবাদের ভূমিকায় হীরেনবাবু লিখেছেন, It is, thus, in the fitness of things that Tarasankar is a leader of the Progressive Writer's movement in India। ঠিক কোন্ সময়ে অনুবাদটি বের হয়, গ্রন্থটিতে তা বলা না হলেও, জুন ১৯৪৫-এর পরে, কারণ 'মন্বন্তর'-এর জুন ১৯৪৫-এর সংস্করণের অনুবাদ তিনি করেন। ওই সময়ে তারাশঙ্কর প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে আছেন কিনা সন্দেহ।

সন্দেহের কারণ তারাশঙ্কর নিজেই। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তিনি যা বলেছেন বামপন্থী সাহিত্যিক-সমালোচকদের সম্পর্কে, তাতে স্বচ্ছতা নেই। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বেরিয়েছিল ১৯৪৬-এ আনন্দবাজারের পূজা সংখ্যায়। উপন্যাসটি বের হলে বামপন্থীরা 'আকাশস্পর্শী' প্রশংসা করেন। এঁদেরই কেউ নিশ্চয় চেকোশ্লোভাকিয়ায় গ্রন্থটি পাঠিয়েছিলেন চেক ভাষায় অনুবাদের জন্য, চেক প্রকাশকও তারাশঙ্করের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কিনা, তাহলে চেক অনুবাদে সাহায্য হতো। কিন্তু, এর পর আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। কারণ, তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, সহজবোধ্য—বামপন্থী পত্রিকায় 'হাঁসুলী বাকেঁর' তুমুল নিন্দামন্দ বেরিয়েছে। যে বামপন্থীরা একসময়ে প্রশংসা করতেন, এখন তাঁরাই নিন্দা করছেন।

এর আগেই তারাশঙ্করের মোহভঙ্গ হয়েছে। ১৯৪৫-এ গঙ্গাধর অধিকারীর পাকিস্তানের সমর্থনে পুস্তিকা পড়ে তিনি ক্ষুব্ধ। অন্যান্য কারণের সঙ্গে, যেগুলো তিনি নির্দিষ্ট করেন নি, এই পুস্তিকাও তাঁকে ১৯৪৫-এ মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনের প্রথম দিন যেতে নিরুৎসুক করেছিল। পরের দিন বা তৃতীয় দিনে

তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হলেও সভাতেই তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটল হীরেনবাবু এবং সুধী প্রধানের সঙ্গে। তারাশঙ্কর অবশ্য বলছেন, তখনও তিনি বামপন্থীদের সংস্রব ছিন্ন করেন নি, তাঁরাও 'ছাড়েন নি বা ছাড়তে চান নি'। এর পরে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৫১ সালেও যখন তিনি রাশিয়া থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, তখন তিনি বুঝলেন বামপন্থীরা তাঁকে ছাড়েন নি, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, কেননা কোনও দলের সুপারিশে তিনি কোথাও যাবেন না।

'মন্বন্তর' অনুবাদের জন্য নির্বাচন করলেও, হীরেনবাবু উপন্যাসটিকে তেমন সার্থক মনে করেন নি। তারাশঙ্করকে তিনি সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে 'সম্ভবত' শ্রেষ্ঠ মনে করলেও, তারাশঙ্করের আঙ্গিকের ঘাটতি তাঁর চোখ এড়ায় নি। কিন্তু সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে তারাশঙ্করের দৃষ্টির প্রসার এবং সহৃদয় উদ্ভাসন, তাঁর দেশপ্রেম, হীরেনবাবুর তারিফযোগ্য মনে হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশসেবা করে তারাশঙ্কর দুবার জেল খেটে এসেছেন, সমাজসংগ্রাম তিনি কোনও Ivory Tower থেকে দেখেন না। গ্রাম ছেড়ে তারাশঙ্কর এই প্রথম জাগরিক পরিবেশে উপন্যাস লিখলেন। উপন্যাসটি লেখার ধরন থেকে, হীরেনবাবুর মনে হয়েছে, তারাশঙ্কর নাটক লিখবেন মনে করেছিলেন। ঘটনার দ্রুত চাল, অস্বাভাবিক সব ঘটনা—বিমান আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নাগরিক জীবনে বিপর্যয়, পুরনো সমাজব্যবস্থায় ভাঙন এবং নতুন জীবনের ইশারা, হয়তো সিনেমা-সিনেমা মনে হবে পাঠকের।

ষাট বছরের ব্যবধানে আজ 'মন্বন্তর' অত্যন্ত কাঁচা মনে হলেও, সেই সময় 'মন্বন্তর' তুমুল তর্কের সৃষ্টি করেছিল। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী উভয় পথ থেকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছিল, 'বিজয়বাবু' চরিত্রটি নিয়ে—যে বিজয়বাবু গান্ধীবাদী-কমিউনিস্ট। চরিত্রটির আদ্যন্ত কৃত্রিমতা নিয়ে নয়, একজন কমিউনিস্ট গান্ধীভক্ত হন কী করে এই ছিল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। পরে তারাশঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি জানতেন ১৯৫৩-এর আগে পর্যন্ত রাশিয়ার বিশ্বকোষে লেখা হয়ে আসছিল, গান্ধী একজন প্রতিক্রিয়াশীল নেতা, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অন্তরায় বিশেষ। একজন কমিউনিস্ট গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করতেই পারে না। তবে, তাঁর কমিউনিস্ট আদর্শগত ভাবে কমিউনিস্ট, মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনে সংগ্রামী। তাঁর কমিউনিস্ট কোনও পার্টির অনুগামী কমরেড নন। তাঁর কাছে বিজয়বাবু বাস্তব চরিত্র, বানানো কোনও ব্যক্তি নন।

'মন্বন্তর'-এর ভাষা নিয়ে হীরেনবাবুকে কোনও সমস্যায় পড়তে হয় নি। গ্রামীণ পরিবেশে তারাশঙ্কর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন, কলকাতার ভদ্রলোকের কাহিনীতে সেই সমস্যা নেই। তারাশঙ্করের ভাষাও সাদামাটা, অলঙ্কার-বর্জিত, বাস্তবিক পক্ষে মার্জিত কানে কিছু অস্বস্তিকর ঠেকে তাঁর চেষ্টাকৃত সাহিত্যিকতায়। তবে অনুবাদের পক্ষে অত্যন্ত সরল-সহজ। হীরেনবাবুও নিষ্ঠার সঙ্গে মূলের কাছে অনুগত থেকেছেন এবং ইংরেজিতে কোনও আড়ষ্টতা না দেখিয়ে। দুর্গানাম জপ করো—Take the name of Goddes Durga জাতীয় বাক্য খুব কমই আছে অনুবাদে।

'মন্বন্তর' অনুবাদ করার সময় হীরেনবাবু জানিয়েছেন, সমসময়ে প্রকাশিত 'পঞ্চগ্রাম'

উপন্যাস হিসেবে সার্থক, এবং সেটারও অনুবাদ করার আয়োজন হচ্ছে। তিনি নিজেই করবেন কিনা, জানান নি, তবে তিনি করেন নি। পঞ্চগ্রামও গান্ধীবাদী উপন্যাস। যে গান্ধী তখন পর্যন্ত কমিউনিস্টদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল, সেই গান্ধীকে আদর্শ করা উপন্যাসের অনুবাদের দায়িত্ব হীরেনবাবু নিয়েছেন, এতে পার্টি লাইনের বাইরে তাঁর স্বাধীন বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও হীরেনবাবু এই স্বাধীন সত্তার পরিচয় দেবেন জওহরলাল নেহরু বিষয়ক রচনায়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর পার্টি-লাইনের বাইরে আলাপ-আলোচনায়।

ব্যক্তিগত চারিত্রে হীরেনবাবু উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং আবেগতাড়িত। তাঁর ভাষায়, ইংরেজিতে ও বাংলাতেও, সেটার স্পষ্ট প্রকাশ। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' অনুবাদে হীরেনবাবুর সমস্যা হওয়ার কথা নয়, তারাশঙ্করও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। কিন্তু 'মন্বন্তর' অনুবাদের পরেই হীরেনবাবু হাত দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে। ভাষা ও আবেগে মানিক তারাশঙ্করের বিপরীতধর্মী। তারাশঙ্করের ভাষা যদি হয় শিথিল, শ্লথ, ভঙ্গুর, মানিকের ভাষা সংহত, ঋজু, স্বল্পবাক। মানিকের ভাষার অনুবাদে কিন্তু হীরেনবাবু নিজেকে যথেষ্ট সংহত রেখেছেন, যে কথা এক শব্দে বলা যায় তার জন্য দুটো শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি, আর করলেও মাত্রা হারাননি। 'পদ্মানদীর' মূল সমস্যা হচ্ছে জেলেদের ভাষা। মার্জিত বাংলা গদ্যের মধ্যে জেলেদের ভাষার হ্রস্ব গ্রাম্য ভাষার সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির আবহাওয়া। কিন্তু জেলেদের গ্রাম্য ভাষার অনুবাদে গ্রাম্য ইংরেজি আনার কোনও চেষ্টা না করে হীরেনবাবু কবুল করেছেন তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, কারোর পক্ষেই সম্ভব কিনা তাঁর সন্দেহ আছে। মার্জিত বাংলা আর গ্রাম্য কথোপকথনের ভাষার দ্বৈরথে 'পদ্মানদীর মাঝি'র যে আবেদন, সেটা অনুবাদে অদৃশ্য হতে বাধ্য। হীরেনবাবুর সেই চল্লিশের দশকে করা অনুবাদটি ১৯৭৭ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট পুনঃপ্রকাশ করে। 'পদ্মানদীর মাঝি'-র অসংখ্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, হীরেনবাবুর অনুবাদ সেই অনুবাদগুলোর সাহায্যে এসেছে নিশ্চয়ই, যেমন চীনা ভাষায় অনুবাদে হীরেনবাবুর অনুবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

দলিত-সমস্যা ও হীরেন্দ্রনাথের ভাবনা

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

কাহিনীটি এইরকম।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে মহারাষ্ট্রের সাতারায় এক দরিদ্র পরিবারের মাতৃহীন সন্তান তার নিজের এবং পিতার আগ্রহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় শিক্ষালাভের আশায়। বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হতে পারলেও অন্য ছাত্রদের সঙ্গে বেঞ্চে বসতে পায় না। তাদের কাছ থেকে দূরে, ঘরের শেষ প্রান্তে, বাড়ি থেকে আনা চটের আসনে বসতে হয় তাকে। তার খাতা শিক্ষকরা দূর থেকেই দেখেন, হাত দিয়ে স্পর্শ করেন না, পাছে অপবিত্র হয়ে যান। ক্লাসে সেই বালককে কথা বলতে দেওয়া হয় না, পাছে তার মুখের বাতাসে ঘর অপবিত্র হয়ে যায়। খুব জরুরি পরিস্থিতি হলে তাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে হয় তার প্রয়োজন। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও জল চাইতে পারে না সে। চাতক পাখির মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে হাঁ করে বসে থাকতে হয়। কোনও ছাত্রের মনে দয়ার উদ্রেক হলে সে অনেক ওপর থেকে তার মুখে জল ঢেলে দেয়। তবে তার তৃষ্ণা মেটে।

তার এই অসম্মান ও হেনস্থার একটাই কারণ। 'অতি নীচ' এক জাতে, মহার সম্প্রদায়ে জন্ম তার। জন্ম ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল।

মনুস্মৃতি শাসিত হিন্দু সমাজের এই ধরনের যাবতীয় অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে, শাসন-শোষণ-অসম্মানের বিষনিঃশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে, দেশ ও বিদেশের নানা সম্মানীয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রাপ্তব্য সব সম্মানই একদিন সে অর্জন করবে। তারপর, তার বয়স যখন মাত্রই পঁয়ত্রিশ, মহারাষ্ট্রে যে 'পবিত্র সরোবরের' জল দলিতদের স্পর্শ করাও নিষেধ, দশহাজার সঙ্গীসহ সেই চাভাদর সরোবরের জল সে পান করবে, এবং সেই সরোবরের তীরে, হাজার হাজার দলিত, অ-দলিত মানুষের সামনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে মনুস্মৃতি। সেদিন বড়দিন, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৭। একদিন এমন 'অনাচার' যে ঘটাবে, সাতারার সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চটের আসনে বসা বালকটির নাম ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। একদিন স্বাধীন ভারতের ভিত্তি রচনায় এক বড় ভূমিকাও নেবে সে-ই!

বেদের বিধানে ছিল?

কিন্তু হিন্দুসমাজে মানুষে মানুষে এই ভেদ, এই ঘৃণা, এই জঘন্য আচরণ এল কোথা থেকে? জাতপাতের এই কঠোর বিভাগ কার সৃষ্টি? কতদিন ধরে চলে আসছে এই ব্যবস্থা?

হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কঠোর মনোভাবের খুবই শক্তিশালী ও বড় একটি অংশ মনে করে, যে বর্ণাশ্রম এই ব্যবস্থার ভিত্তি তার সৃষ্টি বহুকাল আগে, বৈদিক যুগে। নিজেদের সমর্থনে তাঁরা ঋগবেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সুক্তের ১২শ শ্লোকটি প্রায়শঃই উদ্ধৃত করেন,

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন,

'এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু'বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু'চরণ হতে শূদ্র হল।'

অর্থাৎ সর্বনিম্ন অঙ্গ হতে জন্ম শূদ্রের। সুতরাং তার স্থান তো সর্বনিম্নেই হবে।

কিন্তু শ্লোকটি কি সত্যিই ঋগবেদের? বৈদিক যুগে বর্ণভেদ আদৌ ছিল কি?

শ্লোকটির অনুবাদ করে পাদটিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন, 'ঋগবেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চার জাতির উল্লেখ নেই। ঋগবেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতিবিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে এ পুরুষ সুক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষা।'

তবে কি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নিতান্তই লোকাচার? প্রাচীন কোনও শাস্ত্রের সমর্থন ছাড়াই চলে আসছে এত কাল ধরে? বস্তুত প্রাচীনতম যে-শাস্ত্রে এই ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়, যে-শাস্ত্রে নানা বর্ণকে নির্দিষ্ট করে এবং দলিত তথা শূদ্রকে চিহ্নিত করে সমাজে তার স্থান স্থির করে দেওয়া হয় তা হলো 'মনুসংহিতা'।

মনুসংহিতা কী? মনু-ই বা কে? কী লিখেছেন তিনি? কোথায় স্থান দিয়েছেন দলিতকে?

ইতিহাসের পরিহাস, সাতারার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চটের আসনে বসা, তৃষ্ণায় কাতর, উপেক্ষায় অপমানিত, লাঞ্ছনায় ক্রুদ্ধ সেই বালকটি পরিণত বয়সে একদিন ভারতীয় সংবিধান রচনায় প্রধানতম ভূমিকা পালন করবে। তাকে বলা হবে দেশের সংবিধানের জনক। সেই সংবিধান নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র তথা সমাজকে। এবং কেউ কেউ তখন তাঁকে এই কীর্তির জন্যে 'আধুনিক যুগের মনু' আখ্যায় ভূষিত করবেন, হয়ত একেবারেই ভিন্ন অর্থে।

আচার্যপ্রতিম পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই আমরা এ-খবর পাই। 'মনু' আখ্যা যে আম্বেদকরের মতো বৈপ্লবিক চিন্তার মানুষের পক্ষে—যিনি সমাজের জাতপাত ব্যবস্থাটাই উড়িয়ে দিতে চান—তেমন শংসার বিষয় নয়, তা-ও জানাতে ভোলেন না তিনি, খুবই সূক্ষ্মভাবে, চিকণ ইঙ্গিতেই, যেমনভাবে বলতে পারেন (ইংরেজিতে, এবং বাংলাতেও) শুধু তিনিই। কারণ এর পরেই তিনি চলে যান 'মনু'-র আলোচনায় এবং তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর সেই মনোভাব কয়েক যুগ ধরে যা আমাদের অতি পরিচিত, প্রিয় ও প্রশংসার কারণ হয়ে উঠেছে এবং হয়ে আছে। সেই মনোভাবেরই তো প্রকাশ ঘটে তাঁর সেই বিখ্যাত বাকভঙ্গিতে যা মাঝে মাঝেই ফুঁসে ওঠে সই ও মহৎ রোষে, তাঁর অস্তিত্বের একেবারে অন্তর থেকে।

ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি মূল্যবান

নূতন দিল্লির 'ইনস্টিটিউট অফ কনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড পার্লামেন্টারি স্টাডিজ' তৃতীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মারক ভাষণ (১৯৮১) প্রদানের জন্য হীরেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান।

আমাদের সৌভাগ্য, ভাষণটি পরে পিপল্‌স্ পাবলিশিং হাউস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে (Gandhi, Ambedkar and the extirpation of untouchability)।

ক্ষুদ্রাকার এই গ্রন্থটি হয়ত তেমন পরিচিত বা প্রচলিত নয়। হীরেন্দ্রনাথের প্রখ্যাত গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্তও নয়। তথাপি, সন্দেহাতীতভাবে, অতি মূল্যবান। বহুকাল ধরে ভারতবর্ষে যে-বিষয়টি সমাজজীবনে ক্যান্সার হয়ে উঠেছে এবং আজও হয়ে রয়েছে, সেই দলিত-সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনার এক সুশৃংখল প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে এবং সেই প্রসঙ্গেই মনুস্মৃতি বিষয়েও।

হীরেন্দ্রনাথ বলছেন, গোঁড়ামির দৃষ্টিতে যত স্বর্গীয় বলেই বোধ হোক, 'মনু' কোনওভাবেই নিতান্ত কোনও ব্যক্তি নয়। এটি সমাজ-দর্শনের এক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব জীবনে প্রাত্যহিক আচরণের এক ব্যবস্থা। তাঁর মতে মনুবাদ হলো এক সুসংহত, বিশ্বের প্রাচীনতম এবং প্রায় অজেয় এক স্থিতাবস্থাপন্থী নির্দেশপঞ্জি।

তিনি বলছেন, জন্ম, নিবাস অথবা গাত্রবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানবকে 'জীবশিব' ভাবার যে-সাধনা ভারতবর্ষের একান্ত আপন, মনুর বিধান তাকে একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই সত্য অতি নির্ভুলভাবে এবং গভীর ক্ষোভ ও বেদনা নিয়ে অনুভব করেছিলেন আম্বেদকর।

মনুর বিধান মতো

কেন এমন তীব্র ছিল আম্বেদকরের অনুভূতি? মনুর বিধান সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথই বা কেন এমন কথা বলছেন? কী বলা হয়েছে সে বিধানে?

বস্তুতপক্ষে এই শাস্ত্রগ্রন্থটিই বর্ণভেদ এবং শূদ্র তথা দলিতদের যাবতীয় যন্ত্রণার মূল শাস্ত্রীয় উৎস। এই গ্রন্থের দশম মণ্ডলে একবার চোখ রাখলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সমাজে শূদ্রদের স্থান কী হবে, তারা কী করবে ও করবে না, কীসে তাদের পাপ, কীসে পুণ্য, এমনকী তারা কী খাবে, তাদের শয্যা কেমন হবে, সব বিধানই দেওয়া হয়েছে এই মণ্ডলে। সে বিধানের কয়েকটি এইরকম,

'বিপদ-আপদের অবস্থায় ছাড়া প্রত্যক্ষ শ্রমের দায়িত্ব দ্বিজদের নয়...সে দায় শুধু শূদ্রদের।'

'স্বর্গলাভ করার জন্য বা স্বর্গ ও নিজ জীবিকা এই উভয়ের জন্য (শূদ্র) ব্রাহ্মণের সেবা করবে।...ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রের প্রকৃত কাজ—এ ছাড়া শূদ্রের সব কাজই নিষ্ফল' (১০/১২২, ১২৩)।

'শূদ্রের ভক্ষণের জন্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানের জন্য জীর্ণ বস্ত্র, শোবার জন্য জীর্ণ শয্যা এবং ধানের পুলাক (তুষ) দ্বিজ শূদ্রকে দেবেন' (১০/১২৫)।

'ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না; কেন না ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করতে পারে' (১০/১২৯)।

'...ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই...বেদ অধ্যয়ন করবেন...কেবল ব্রাহ্মণই বেদ অধ্যাপনা করবেন...শূদ্রেরা কখনও বেদ অধ্যয়ন ও শ্রবণ পর্যন্ত করবে না' (১০/১)।

'জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল (বেজি), চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গাধা, পেচক ও কাক—তাদের একটিকে হত্যা করলে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করবে' (১১/১৩২)।

মনুর এই জাতীয় ও এর চেয়ে ভয়ংকর সব বিধানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এদেশের হিন্দু সমাজ। এইসব বিধানই অতীতে সমাজকে পরিচালনা করেছে, বর্তমানে করছে এবং আরও কতকাল করে যাবে কে জানে (শহুরে পাঠক, নিজের পাড়াকেই ভারতবর্ষ বলে ধরে নেবেন না)।

মনুসংহিতাই বর্ণাশ্রমের উৎস। বর্ণাশ্রমের কল্যাণেই জন্ম জাতপাত ভেদাভেদের। এবং তা থেকেই এসেছে অস্পৃশ্যতা। বর্ণাশ্রম, জাতপাত ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার শিকার তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষের চরম দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবোচিত আবেগে ফ্রানজ্ ফ্যাননের ভাষায় তাদের বর্ণনা করেছেন 'রেচেড অফ দ্য আর্থ' বলে।

একই আবেগ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা যখন পবিত্র পবিত্র ভাব করে রাষ্ট্রসংঘে ও অন্যান্য মঞ্চে বর্ণবিদ্বেষের নিন্দা করে বলি, এটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ তখন স্বাভাবিক মানবিক আঘাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের বিবেকের গায়ে গণ্ডারের চামড়া পরিয়ে নিতে হয়। কারণ বর্ণবিদ্বেষের পীঠস্থান দক্ষিণ আফ্রিকাতেও (তখনকার) কেউ তত্ত্ব হিসাবে বর্ণবিদ্বেষ সমর্থন করতে সাহস করে না, বলাই বাহুল্য, বাস্তব আচরণে যদিও করে ঠিক উলটোটা। কিন্তু এদেশে তো নানা শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে দর্শন হিসাবেই বর্ণাশ্রম, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা সমর্থন করা হয়।

সত্যিই অতীত হয়ে গেছে?

মনুর বিধান অতীতে, প্রাচীন ভারতে, কীভাবে শূদ্রকে পীড়ন করেছে, অসম্মান করেছে, হীনবল করেছে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শূদ্ররাজ শম্বুককে রামচন্দ্রের তরবারির নীচে মাথা পেতে প্রাণ দিতে হয়েছিল বেদ পাঠ করার 'অপরাধে'। গোপনে শস্ত্রবিদ্যা শিখে তাতে অর্জুনের চেয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠার 'পাপে' একলব্যকে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে তা গুরুদক্ষিণা হিসাবে সমর্পণ করতে হয়েছিল অর্জুনের শিক্ষক দ্রোণাচার্যের শ্রীচরণে।

কেউ কেউ বলবেন এসব যখন হতো তখন হতো। এখন সেকথা মনে করার প্রয়োজন কী। এখন তো আমরা অনেক 'সভ্য' হয়েছি। এখন কি আর ওসব হয়? হয় না? দলিত হওয়ার অপরাধে বর্ণহিন্দুর হাতে তাদের প্রাণ দিতে হয় না? দলিত নারীকে ধর্ষিত হতে হয় না? হীরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন পিপরি, বলচি ও গুআ-র ঘটনা। আরও কত ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

১৯৮১ থেকে ২০০০, বিশ বছরে শুধুমাত্র বিহারেই অন্তত ৪৫টি ঘটনায় বর্ণহিন্দুদের সংগঠিত ফৌজ 'রণবীর সেনা'র হাতে খুন হয়েছে অসংখ্য দলিত, ধর্ষিতা হয়েছে বহু দলিত নারী, তাদের অনেক বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিবরণের ভিত্তি পুলিশ-প্রশাসনের খাতা। এর বাইরেও ঘটে গেছে কত ঘটনা।

পুলিশের হিসাব থেকেই অল্প কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। জায়গার নামের

পাশে ঘটনার তারিখ ও নিহতের সংখ্যা দেওয়া হলো,

পারশবিঘা (১৯৮১)—১১
কানসারা (১৯৮৬)—১৪
নোনাহিনাগেওড়া (১৯৮৮)—১৯
দামুহা-খাগাড়ি (১৯৮৮)—১১
মেলুবার সিনহা (১৯৮৯)—৯
সাওনবিঘা (১৯৯১)—৭
মেলুবার সিনহা (১৯৯১/দুবছরে দ্বিতীয়বার, দলিতরা প্রতিবাদ করায়)—৭
সারথুয়া, ভোজপুর (১৯৯৫)—৬
নানাউর, ভোজপুর (১৯৯৬)—৫
বাথানিয়াটোলা, ভোজপুর (১৯৯৬)—২৮ (৮ জন শিশু)
খানেত, ভোজপুর (১৯৯৬)—৫
একোয়ারি, ভোজপুর (১৯৯৬)—৬
হাইবাসপুর, পাটনা (১৯৯৬)—১২
হাইবাসপুর, পাটনা (১৯৯৭/ পুলিশে নালিশ করায়, পরের বছরই দ্বিতীয়বার)—১০
লছমনপুরবাথে, জেহানাবাদ (১৯৯৭)—৬১
খাজাসিন, জেহানাবাদ (১৯৯৭)—৮
নাগরিবাজার, ভোজপুর (১৯৯৮)—১০
শংকরবিঘা, জেহানাবাদ (১৯৯৯)—২৩
নারায়ণপুর, জেহানাবাদ (১৯৯৯)—১১
সেন্দানি, গয়া (১৯৯৯)—১২
জাহিরিবিঘা, জেহানাবাদ (১৯৯৯)—১২
মিয়াপুর, ঔরঙ্গাবাদ (২০০০)—৩৪

সব ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভব নয় কারণ দেশময়, বিশেষত গোবলয়ে ও দক্ষিণভারতে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে একাধিক ঘটনা। তালিকা ছাপা হতে হতে আরও কিছু ঘটনা ঘটে যাবে।

শুধু মাঝে মাঝে হত্যা ধর্ষণ নয়, প্রতিদিনের জীবনের অসংখ্য অপমানের মুখোমুখি হতে হয় দলিতদের, এখনও। বর্ণভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আধুনিক যুগের প্রধান সেনাপতি আম্বেদকরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। আরও পরে, তিনি যখন খানিকটা বড়ই হয়েছেন, তখন এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। হাইস্কুলের শুরুতে আম্বেদকর, তাঁর দাদা ও ভাগ্নের সঙ্গে যাচ্ছিলেন গোরেগাঁও-এ বাবার কাছে। রেল স্টেশন থেকে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে রওনা হলেন তাঁরা। কিছু পথ যাওয়ার পর তাঁদের কথাবার্তা থেকে গাড়োয়ান ধরে ফেলে এরা অচ্ছুৎ। 'মহার' সম্প্রদায়ের মানুষ। ফলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ি থেকে তাদের নামিয়ে দেয়। তাদের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চিৎকার

করে বলতে থাকে তার গাড়িটাই অপবিত্র হয়ে গেল! অনেক সাধ্যসাধনার পর দ্বিগুণ ভাড়া কবুল করে তাকে রাজি করালেন তাঁরা। শর্ত হলো, তাঁরা নিজেরাই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবেন। গাড়োয়ান হেঁটে যাবে গাড়ির পাশে পাশে। এই অচ্ছুৎগুলোর সঙ্গে তো সে এক গাড়িতে বসতে পারে না।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে, জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা অবসানের জন্যে কোনও চেষ্টা এবং সে চেষ্টাকে ফলবতী করার জন্যে কোনও সংগ্রাম কি হয়নি? বহু ক্ষেত্রে বহুবার হয়েছে। আজও নানাভাবে চলেছে সে সংগ্রাম। পীড়ন থাকলে প্রতিরোধ তো থাকবেই।

সেইসব সংগ্রামে যাঁরা নানা যুগে সৈন্যাপত্য করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ। গৌতম বুদ্ধ থেকে রামমোহন, কবীর, রবিদাস, বিদ্যাসাগর, বীরেসালিঙ্গম, কুমারন আসান, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, জ্যোতিবা গোবিন্দ ফুলে থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর পর্যন্ত মহাজনদের উদ্যোগ ও কর্মের কথা বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন, এঁরা যে স্বাস্থ্যকর, অগ্রণী দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা যদি আরও অর্থবান করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত! এই প্রসঙ্গে তিনি এ. ভি. ঠাক্কার ও এম. সি. রাজা-র নামও বলেছেন, কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দু'জনের ভূমিকা, মহাত্মা গান্ধী ও বাবাসাহেব আম্বেদকর।

গান্ধীজির কথা

আম্বেদকর সম্পর্কে তিনি বলছেন, আম্বেদকরই হলেন সেই নায়ক যিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন দলিতদের পাশে, তাদের মনে আশা জুগিয়েছেন, নিজেদের প্রতি তাদের আস্থা গড়ে তুলেছেন, সর্বোপরি তাদের অন্তরে আত্মমর্যাদার এক গভীর বোধ সৃষ্টি করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা তিনি স্মরণ করেছেন বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে, যদিও এই প্রসঙ্গে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাও হীরেন্দ্রনাথ ভুলে যাননি। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩২ সালের পরেই শুধু নয়, তার ঢের আগে থেকেই তিনি অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটাতে আন্দোলন করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ ১৯২৪-২৫ সালে মহাত্মাজির আমরণ অনশনের কথা স্মরণ করেন। ভাইকমসত্যাগ্রহের কথা বলেন। তারও আগে সবরমতী আশ্রমে বাস করার সময় মহাত্মাজি এক অচ্ছুৎকন্যাকে দত্তক নিয়েছিলেন। ঠাকার বাপা-র মতো মানুষ ছিলেন তাঁর শিষ্য। অনেকবার অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আদায়ে তিনি সত্যাগ্রহ করেছেন। বহু মন্দিরের দ্বার তার ফলে খুলেও গেছে। অচ্ছুৎদের সামাজিক পুনর্বাসনদানের জন্যেই তিনি তাদের নাম দেন 'হরিজন'। কংগ্রেসেও তিনি অস্পৃশ্যতাবাদের বিরুদ্ধে মত গঠনে সদা সচেষ্ট ছিলেন। অস্পৃশ্যতাবাদের বিরুদ্ধে মহাত্মার সংগ্রামের 'রেকর্ড বেশ দীর্ঘ'।

বাবাসাহেবের সঙ্গে একাধিকবার মহাত্মা আলোচনায় বসেন। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারায় বাবাসাহেবকে টেনে নেওয়া ছিল তাঁর লক্ষ্য। বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিয়েও উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু কোনও আলোচনাই ফলপ্রসূ হয়নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

আলোচনা সুখকরও হয়নি। এ কারণে মহাত্মার অনুগামীদের অনেকেই বাবাসাহেবকে নানাভাবে আক্রমণ করে। তাঁকে 'ব্রিটিশের দালাল' হওয়ার অভিযোগও শুনতে হয়। বলা বাহুল্য এইসব আক্রমণকারীদের সকলেই, প্রায় অবধারিতভাবেই, ছিলেন বর্ণহিন্দু।

বস্তুতপক্ষে এই দুই মহাজনের সহমত হওয়ার কোনও বাস্তব ভিত্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে।

গান্ধীজি সততার সঙ্গেই অস্পৃশ্যতার অবসান চাইতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'গান্ধীজি, কোনও সন্দেহ নেই, তাঁর আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে 'অস্পৃশ্যতাকে' অভিশাপ দিতেন। তাঁর স্বচ্ছ আন্তরিকতা তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের মধ্যে দিয়ে' তা প্রকাশিত...। গান্ধীজি মনে করতেন, অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়। তাকে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা থেকে ছেঁটে ফেলাই কাম্য। শুধু কাম্য নয়, অবশ্য করণীয় মানবিক কর্তব্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে সমগ্র ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করে ফেলা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

এই কর্তব্য সাধনে তিনি বর্ণহিন্দুদের বুঝিয়ে তাদের ধ্যানধারণা ও হৃদয় পরিবর্তন করার কথা ভাবতেন। মনে করতেন জোরজবরদস্তি করে এ-কাজ হবার নয়।

কেরলে 'ভিয়া' সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন শ্রীনারায়ণ গুরু। সেখানে আজও তাঁকে ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ১৯২৪–২৫ সালে সত্যাগ্রহের সময় তিনি যখন স্বেচ্ছাসেবকদের সব ব্যারিকেড ভেঙে ফেলতে আদেশ দেন, গান্ধীজি শক্ত হাতে তার বিরোধিতা করেন। এভাবে সমগ্র 'ব্যবস্থার' সঙ্গে যুদ্ধে নামার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাঁর ভাষায় 'আপোষের সৌন্দর্য'ই ছিল তাঁর কাম্য।

কেরলের শ্রীনারায়ণ গুরু, তামিলনাড়ুর 'পেরিয়ার' রামস্বামী নায়কারের মতো সংগ্রামী মহাজনদের প্রভাবে গান্ধীজি তাঁর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে একসময় লিখে দেন, 'কাস্ট মাস্ট গো!' তাঁর পক্ষে এটি এক বিশাল পদক্ষেপ। কিন্তু এ পথে তিনি থাকতে পারেননি।

হীরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে তিনি দলের দোদুল্যমানতা ও সামাজিক সমস্যা থেকে দূরে থাকার মনোভাবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'অস্পৃশ্যতা স্বরাজের পথে আরেকটি বাধা'—এই বক্তব্য দলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করান। কিন্তু 'অস্পৃশ্যতা' পর্যন্তই, 'জাতপাত'কে স্পর্শ করতে পারেন না তিনি। হীরেন্দ্রনাথ বলছেন, 'বর্ণাশ্রম'-এর ধারণার প্রতি একধরনের আকর্ষণ থেকে গান্ধীজি তাঁর মনকে যুক্ত করতে পারেননি। ফলে জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা থেকেই গেছে। তিনি আন্তরিকভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জনের ডাক দিলেও জাতিভেদ প্রথা ত্যাগ করার আহ্বান জানাতে পারেনি।

হীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজির এই সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এমন সীমাবদ্ধতা আম্বেদকরেরও আছে। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা তিনি স্মরণে রাখতে চান, পাছে তাঁদের প্রতি অবিচার হয়ে যায়। সে দুটি কথার সারমর্ম এইরকম :

প্রথমত তাঁদের ভূমিকা বিচার করার সময় তাঁদের সময় ও পটভূমিকার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মানুষ প্রায়শঃই এই দুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ভার পড়েছিল গান্ধীজির কাঁধে। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে দেশ ও সমাজের সমস্ত অংশ ও সমস্ত স্বার্থগোষ্ঠীকে যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ মঞ্চ গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে মাঝে মাঝেই তাঁকে 'সোনালী আপোষের' পথ নিতে হয়েছে। এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়েছে যাতে পরের বার তিন পা এগোনো যায়।

আম্বেদকরের কথা

কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকরের অবস্থান ছিল একেবারে অন্যরকম। যেন দুই মহাজনের পরিবার, জন্ম, জীবন, অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসপ্রদত্ত দায়িত্বের গভীর পার্থক্যের মতোই ছিল তাঁদের ভূমিকার পার্থক্য।

জন্মাবধি বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার কাঁটাওয়ালা এক সামাজিক শৃংখলে বন্দী জীবন-যাপন করতে হয় আম্বেদকরকে। শৈশব-কৈশোরেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁকে বুঝতে হয়েছিল, হিন্দুসমাজ ও সে সমাজের জাতপাত ব্যবস্থার স্বরূপ। তিনি যে মানুষ, নিতান্ত এক অচ্ছুৎ মহার নন, একথা তিনি একবারই উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বরোদার মহারাজের সহায়তায় মার্কিন দেশে উচ্চশিক্ষার্থে গিয়ে। যদিও সেখানেও কালো মানুষের প্রতি বৈষম্য ও তাদের লাঞ্ছনার সত্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

একথা বুঝতেও তাঁর দেরি হয়নি যে দুর্ভাগ্যের এ জীবন শুধু তাঁর নয়, তাঁর পরিবারের নয়, শুধু মহার সম্প্রদায়ের নয়। যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্যের এই বোঝা ঘাড়ে নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে দেশের সমস্ত প্রান্তের কোটি কোটি দলিত মানুষকে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে-প্রতিজ্ঞা তাঁর মনে গড়ে ওঠে তা হলো, এই অবস্থা বদলে দিতে হবে। তার জন্যে শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতা বর্জন করলেই হবে না। অস্পৃশ্যতার জল যে উৎসে সেই জাতপাত ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে হবে। 'কাস্ট মাস্ট গো।'

দেশের বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষকে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে বিশাল এক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া পথ নেই, একথা তিনি বুঝতেন। তাই আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি এবং তাকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার কাজেও তিনি ব্রতী হন। বর্ণাশ্রমের উৎস ও স্বরূপ, হিন্দু সমাজের অন্ধকার দিক, দলিত জীবনের বাস্তব চিত্র, সে জীবনের জন্যে কে ও কারা দায়ী, মুক্তির পথ, বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিশাল সময়কাল জুড়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন তিনি। তাঁর গবেষণার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অতুলনীয়। যখন তাঁর বয়স মাত্রই পঁচিশ, তখন প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত আকর গ্রন্থ 'কাস্টস ইন ইণ্ডিয়া—দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যাণ্ড ডেভালাপমেন্ট' (১৯১৬)। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে আর যে-দু'খানি গ্রন্থের নাম না করলেই নয় সে দুটি হলো, (১) 'অ্যানিহিলেশন অফ কাস্টস্' (১৯৩৬) এবং (২) 'হু অয়্যার দ্য শূদ্রজ' (১৯৪৮)।

বাবাসাহেবের সব আন্দোলনেরই লক্ষ্য ছিল সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ন্যায় অর্জন। তিনি জানতেন, এই ন্যায় কারও দয়ায় পাওয়া যায় না, আদায় করে নিতে হয়, এবং আদায় করার জন্যে চাই যোগ্যতা। যোগ্যতার প্রথম মাপকাঠি আত্মমর্যাদাবোধ। যুগ যুগ ধরে বর্ণহিন্দুর দ্বারা দলিত হতে হতে যে আত্মমর্যাদাবোধ দলিতরা হারিয়ে ফেলেছে তা পুনরায় অর্জনের আহ্বান ছিল তাঁর প্রথম আহ্বান। বর্ণহিন্দুর ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করো না, বরং না খেয়ে মরো। ওই উচ্ছিষ্ট রুটিতে বিষ আছে।

এ কথাও আম্বেদকর জানতেন, শুধু প্রতিবাদে, সমাবেশে ও ভাষণে সমাজের কাছ থেকে মর্যাদা আদায় করা যায় না। অশিক্ষিত মানুষের শত চিৎকারও তাকে মর্যাদা এনে দিতে পারে না। তিনি তাই দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একের পর এক স্কুল, হস্টেল, কলেজ ইত্যাদি গড়ে তোলেন। এটাও ছিল তাঁর আন্দোলনের জরুরি অঙ্গ।

এই সঙ্গে তিনি জোর দেন নিজেদের কথা বলার ওপর। তিনি জানতেন এ জন্যে দলিত মানুষের কাছে যেমন তাদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তেমনি সমগ্র সমাজের সামনে তুলে ধরা দরকার তাদের দুর্দশার কাহিনী।

দলিত সাহিত্য ও সাহিত্যিক

এই উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে গড়া মিলিন্দ কলেজের ছাত্রশিক্ষকদের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা 'অস্মিতাদর্শ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত যেসব পত্রিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তার মধ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'সত্যকথা', 'আমহি', 'প্রতিষ্ঠান' 'মারাঠাওয়াড়া', 'মানোভা' ইত্যাদির কথা বলতেই হয়।

মিলিন্দ কলেজের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে 'সিদ্ধার্থ সাহিত্য সংঘ'। এঁদের সকলের মিলিত উদ্যোগে সৃষ্টি হয় ভারতীয় সাহিত্যের নূতন এক ধারা, 'দলিত সাহিত্য'। এই ধারার অনেক সাহিত্যিকই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁদের কয়েকজন শুধু মারাঠি ভাষা নয়, সমগ্র ভারতে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পৌষ্য'-র লেখক বাবুরাও বাগুল, আন্নাভাউ মাঠে, দয়া পাওয়ার প্রমুখ।

আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিত সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সম্মেলনের আগেই, ১৯৫৬ সালে তিনি গত হন। সম্মেলনটি পরে, ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম 'দলিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আম্বেদকর শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না, সংগঠকও ছিলেন। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তিনি যে-কাজ করে যান তা আজও তাঁকে দলিতদের মধ্যে তো বটেই, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ সমস্ত মানুষের কাছে বরণীয় করে রেখেছে।

তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের ব্যক্তিত্বে, তাঁর ভাবনায় ও কর্মে একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। সে বৈশিষ্ট্য হয়ত বিতর্কিত, কিন্তু তা মহিমাময়ও বটে। এই কারণেই তিনি জীবৎকালে যা পেয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি গৌরবের অধিকারী হয়েছেন মৃত্যুর পর। অনুরাগীদের ওপর তাঁর প্রভাব এমন, তারা যেন তাঁকে পুজো করেন।

ধর্ম নয়, মস্তিষ্কবিকার

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মনোভাব দিনে দিনে শুধু বিরাগে নয়, তীব্র রোষে ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

'যে-ধর্ম মানুষের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিকে পাপ বলে মনে করে তা ধর্ম নয়, নিতান্ত এক অসুস্থতা। যে-ধর্ম মানুষকে নোংরা পশুকেও স্পর্শ করার অনুমতি দেয় কিন্তু মানুষকে ছুঁতে দেয় না, তা ধর্ম নয়, মস্তিষ্কবিকার। যে-ধর্ম বলে, এক শ্রেণীর মানুষ ধন-সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না, অস্ত্র হাতে নিতে পারবে না, তা ধর্ম নয়, মানব-জীবনের ব্যঙ্গ। যে-ধর্ম শিক্ষা দেয়; অশিক্ষিতদের অশিক্ষিত থাকাই উচিত, দরিদ্রের দরিদ্র থাকাই উচিত, সে ধর্ম ধর্ম নয়, একটা শাস্তি।'

আম্বেদকরের এই কথাগুলি উল্লেখ করে (হীরেন্দ্রনাথের) মন্তব্য : 'এই কথার মধ্যে যে-আগুন আছে তা শুধু মহানবীরাই প্রজ্জ্বলিত করতে পারেন, নিজের ভেতরে এবং অন্যদের মধ্যে।'

হীরেন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি-র উল্লেখ করে যেন একই সঙ্গে আরও দুটি বিষয় বোঝাতে চান। (১) হিন্দু ধর্মের জরাজীর্ণ, কূপমণ্ডুক দশা এবং নিপীড়ক স্বভাব। (২) এই ধর্ম সম্পর্কে বাবাসাহেবের রোষ ও হতাশার সম্পূর্ণতা।

বস্তুতপক্ষে মনুবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো এবং দলিতদের মানুষের মর্যাদাদানে আজীবন সংগ্রাম করেও প্রায় কোনও ফলই দেখতে পাননি বাবাসাহেব। হতাশ হয়ে মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি হাজার হাজার অনুগামীকে নিয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

স্বভাবতই এই ধর্মান্তরে হীরেন্দ্রনাথের মত নেই। তিনি মনে করেন না এই পথে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ কারণে বাবাসাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমে না। তিনি তাঁর হতাশা উপলব্ধি করতে পারেন। হতাশার কারণও তাঁর জানা। ফলে, তাঁর বলতে বাধে না, 'আম্বেদকর এক দেশপ্রেমিক, শক্তিশালী এবং (আমাদের অবিস্মরণীয় ও বিখ্যাত, অপরিবর্তনশীল ভারতীয় পরিবেশে) গভীর এক মুক্তিমুখী ভূমিকা পালন করেন।'

হীরেন্দ্রনাথ আরও বলেন, আজীবন তিনি 'অবিচলভাবে একটি লক্ষ্যপূরণেই সচেষ্ট থেকেছেন, দলিত শ্রেণীর উন্নয়ন। এ-ই ছিল তাঁর বীজমন্ত্র, তাঁর রক্তের অন্তর্গত অঙ্গীকার।'

বাবাসাহেবের এই কর্মযজ্ঞের বর্ণ বর্ণনা করতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথের মতো লেখকও 'স্পিরিচুয়ার গ্র্যানজার' ছাড়া অন্য কোনও ভাষা খুঁজে পান না।

শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, যে-সংবিধান স্বাধীন ভারতবর্ষে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে, সেই সংবিধানের অন্যতম জনক বাবাসাহেবের শেষ পর্যন্ত আর লেশমাত্র মোহ ছিল না এদেশের গণতন্ত্র নিয়ে। 'ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এখনও এদেশের ভূমিতে ওপর ওপর সাজসজ্জার ব্যাপারই হয়ে রয়েছে, এ-ভূমির চরিত্রই অগণতান্ত্রিক।'

পার্লামেন্টে একথা বলার সময় বাবাসাহেবের চোখের সামনে নিশ্চয়ই সেই শত সহস্র

অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, ক্ষুধায় কাতর, অতিশ্রমে ক্লান্ত, কোনওক্রমে প্রাণটুকু নিয়ে টিকে থাকা দলিত মানুষের মুখগুলি ভাসছিল।

স্বাধীন, গণতান্ত্রিক এই ভারতবর্ষে তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষের ওপর পীড়নের কিছু তথ্য হীরেন্দ্রনাথ দিয়েছেন যা ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বাবাসাহেবের ক্রুদ্ধ ও মর্মান্তিক অভিযোগের যাথার্থ্যই প্রমাণ করে।

তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষের ওপর আক্রমণ ও উৎপীড়নের ঘটনার যে-তথ্য সরকারের কাছে আছে তা থেকেই এগুলি উল্লিখিত হয়েছে :

> ১৯৭৪ সালে ৮৮৬০টি ঘটনা ঘটে, ১৯৭৫ সালে ঘটে ৭৭৮১টি ঘটনা, ১৯৭৬ সলে ৫১৬০টি, ১৯৭৭ সালে ১০,৮৭৯টি, ১৯৭৮ সালে ১৫,০৫৯টি এবং ১৯৭৯ সালে ১৩,১৮৪টি।

'ঘটনা' বাড়ছেই, ক্রমাগতই বাড়ছে। এর পর থেকে বছরওয়ারি দলিত হত্যার (১৯৮১-২০০০) কিছু ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসবই সরকারি তথ্য। এর চেয়ে ঢের বেশি, অন্তত কয়েক গুণ ঘটনা যে ঘটেছে এবং তা পুলিশ পর্যন্ত আসেনি বা এলেও সরকারি খাতায় নথিভুক্ত করা হয়নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মার্কসবাদী ভাবনা, না-ভাবনা

এর কি কোনও প্রতিকার নেই? এই বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা কি থামানো যায় না? এতকিছু বদলে যাচ্ছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের এত অগ্রগতি ঘটছে, প্রায় অবিশ্বাস্য, ভারতবর্ষও সে অগ্রগতির অংশীদার। মানুষ চাঁদ জয় করেছে। মঙ্গল-জয়ের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। এখনও কি আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের মনুবাদী সমাজব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে দেওয়া যায় না? দীনের হতে দীন, সত্যিকারের সর্বহারা, 'রেচেড অফ দ্য আর্থ', এদেশের দলিতদের কি কোনওমতেই শৃংখলমুক্ত করা যায় না?

এ প্রশ্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ করে। কিন্তু বোবা ভারতবর্ষ, নির্মম মনুবাদী সমাজ এবং স্বার্থান্বেষী মহল নীরবই থাকে। হয়ত হাতের আড়ালে মুচকি হাসে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর মতো করে চেষ্টা করেছেন। অন্তত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার ভিত্তি নেই।

বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন, দলিতরা যাতে 'মানুষের মর্যাদাটুকু' পায়।

যাঁরা সত্যিকারের কিছু করতে পারতেন, দেশের বিপ্লবী পরিবর্তনই যাদের স্বপ্ন ও ব্রত (অন্তত দীর্ঘদিন ধরে, কয়েক প্রজন্ম ধরে তাই ছিল, হীরেন্দ্রনাথ নিজেও যাঁদের এক অগ্রণী আত্মীয়), তাঁরা, মার্কসবাদীরা কী ভেবেছেন? কী করেছেন?

কিছু কাজ হয়েছে, বিশেষ করে ভাবনা ও তত্ত্বের জগতে। এই সমস্যার উৎস সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেসব ঐতিহাসিক কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী, রামশরণ শর্মা প্রমুখ। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের যাঁরা

তত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামিয়েছেন, বিশেষ করে ভারতীয় প্রেক্ষাপটের চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় ডাঙ্গে, নাম্বুদিরিপাদ, সরদেশাই প্রমুখের নাম। বলা বাহুল্য এঁরা যে-পথ অনুসরণ করেছেন, যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন, তাতে মিল যেমন আছে, অমিলও আছে।

কিন্তু কাজ হয়নি। কমিউনিস্ট আন্দোলন 'জাতপাতে'র জালে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে এড়িয়ে গেছেন তাঁদের নিজের শ্রেণীকেই। দীনের হতে দীন, এদেশের প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে সেতুবন্ধনের সুযোগ ইতিহাস তাঁদের সামনে এনে দিয়েছে একাধিকবার। সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা। ফলে ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষকে নিয়ে রাজনীতির নানা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ক্ষমতার দাবা খেলছে—দলিতরা তাদের 'বড়ে' মাত্র—আর কমিউনিস্টরা 'জাতপাতের নোংরামি' থেকে দূরে, পবিত্র হয়ে, পড়ে আছে এক কোণে, ভারতের মানচিত্রে সামান্য হয়ে অতি সামান্য। দেশের ও জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও ট্র্যাজেডি বোধ করি আর কিছু হতে পারে না।

প্রতিকারের ভাবনায় হীরেন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দলিত সমস্যার স্বরূপ যেমন বোঝার চেষ্টা করেছেন, তেমনই সমাধানের পথও অন্বেষণ করেছেন। তিনি সাবেক আমল থেকে, বিগত প্রায় সাত দশক ধরে, আদ্যন্ত মার্কসবাদী। আপন আদর্শ থেকে সরে যাওয়া দূরের কথা, তাঁকে একটু টলতেও দেখেনি কেউ কোনওদিন। দলে-বেদলে-অদলে হয়ত নানা কটুকথা উচ্চারিত হয়েছে ইতিহাসের নানা মোড়ে, কিন্তু তিনি অবিচলিতই থেকেছেন তাঁর পথে। স্তালিনে স্থিত তাঁর মন, চিন্তা ও আবেগ, আজও বহু স্তালিনপন্থীর ঈর্ষার কারণ।

দলিত সমস্যা সমাধানের পথ কী? হীরেন্দ্রনাথের হাতে কোনও ম্যাজিক-ফর্মুলা নেই। তবু এ বিষয়ে তাঁর ভাবনা অত্যন্ত মূল্যবান।

তাঁর মতে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে হয় বৌদ্ধধর্ম, নয় মার্কসবাদের সাহায্যে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ তার নানা ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবে, এমন কথা ভাবা যেমন অবাস্তব তেমনই অনুচিত। অতএব মার্কসবাদই প্রকৃত পথ। কিন্তু সে পথও তো এদেশে যেমন সুদূর, তেমনই অস্পষ্ট।

তিনি মনে করেন, দলিতের শোষিত ও নিপীড়িত জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন এক বিশাল ও দীর্ঘ সংগ্রাম। হীরেন্দ্রনাথের মতে সে সংগ্রামে এক সঙ্গে মিলতে হবে সব শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে, দলিত অ-দলিত সকলকে।

হীরেন্দ্রনাথ জানেন কাজটা সহজ নয়। সংগ্রামের এমন একটি সংযুক্ত ও বৃহৎ মঞ্চ গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দলিত শ্রেণীর আস্থা অর্জন। তাঁর তো জানা আছে বাবাসাহেব কীভাবে সমাজের অন্যান্য অংশের ওপর থেকে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলেছিলেন আস্থা। তিনি এ-ও জানেন, 'ভারতীয় জনজীবনকে' সেই আস্থা পুনরায় অর্জন করতে হবে।

হীরেন্দ্রনাথের মতে 'ব্যাপক অর্থে এইটেই হলো ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাজ। সে আন্দোলনে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষকে এক হতে হবে।'

হীরেন্দ্রনাথ আদর্শবাদী, কিন্তু তিনি বাস্তববাদীও। তিনি জানেন, 'সে আন্দোলন এখন যেন কেমন গোলমালে পড়ে গেছে।' তবে তিনি মার্কসবাদী, তাই কখনওই আশা ছাড়েন না। 'আরও ভালো হওয়ার আগে হয়ত আরও খারাপ হতে হয়।'

তা যদি না হয়, এই আন্দোলন যদি গড়ে তোলা না যায়, তা হলে ভারতবর্ষের জন্যে এক সর্বনাশ অপেক্ষা করে থাকবে। হীরেন্দ্রনাথের স্পষ্ট মনে আছে, 'প্রথম লোকসভাতে (১৯৫২-৫৭) এক নিরীহদর্শন কবি, অস্পৃশ্য পরিবারে যাঁর জন্ম (কী অকথ্য ভাবনা!), হঠাৎ একদিন কেমন জ্বলে উঠলেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, যে-হারে সব ঘটছে, ভারতবর্ষে একদিন 'অচ্ছুৎস্থান' গড়ে তুলতে হবে।'

তারপরেই হীরেন্দ্র বলছেন, বাবাসাহেব 'চরিত্রগতভাবেই আগুনখেকো ছিলেন না। তপশীলী জাতি ও উপজাতি কমিশনারের তৃতীয় রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনা করতে করতে তাঁর মতো লোকও বলে ওঠেন,

"বাইরে আগুন জ্বলছে। সহজেই তা চলে আসতে পারে ভেতরে। তখন পতাকা থাকবে তপশীলী জাতির হাতে এবং আপনারা গোল্লায় যাবেন, চুলোয় যাবে আপনাদের সংবিধান। কিছুই আর থাকবে না।"

এইসব বাক্য পড়তে পড়তে কার না মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের কথা। কবেই তিনি লিখেছিলেন, 'রথের রশি।' সেখানে সবকিছুর পর কবি বলছেন,

'তারপরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।'

এসব কথা কবি লিখেছিলেন একাত্তর বছর আগে, ১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯)। বাবাসাহেব তখন 'যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে' তাদের সকলকে এক করে লড়তে নেমেছেন এক অচলায়তন ভাঙতে, যাতে 'তারা' দাঁড়াতে পারে 'একবার মাথা তুলে।'

হীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ববোধ : গঠনবিন্যাস ও স্তালিন

অজয় চট্টোপাধ্যায়

বিষয় বৈচিত্র্য নিবিড় পাঠ এবং মগ্ন অনুধ্যানে হীরেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক বিচরণভূমি অপার। বাছাই একটি দিককেও সম্যক ফুটিয়ে তোলা বর্তমান আলোচকের পক্ষে ধৃষ্ট প্রয়াস। তথাপি প্রগলভ উদ্যোগ-এর প্রেরণাস্থল হীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁর বোধে গড় অথবা বিশেষ নগণ্য কিংবা গণ্য নির্বিশেষে কোনও ব্যক্তির মতামতই ফ্যালনা নয়।

হীরেন্দ্রনাথ প্রথাগত কলমজীবী নন। বুদ্ধিচর্চা তাঁর জীবনযাপনের শ্রয়ণ। বুদ্ধিচর্চা তিনি পরিচর্যা করেন এক নির্দিষ্ট অভিস্রোতে। মানব মুক্তি। মানব মুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে তিনি কমিউনিস্ট সংগঠনের শরিক। সংগঠন মানেই শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়া। গঠন সংরক্ষণ এবং বিকাশের দাবিতে মণ্ডিত। এই দাবিকে মাল্যবান করতে যোগ্য নেতৃত্ব জরুরি। পাঠক সংকলনের আগ্রহ তুঙ্গে—আকৃতি প্রকৃতিতে আদর্শ নেতৃত্ব হিসেবে কোন ভাবকল্প হীরেন্দ্রনাথ পোষণ করেন। খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়। চকিত ঘটনার ধারাভাষ্য নয়—ধারাবাহিক অবলোকন বিশ্লেষণ এবং বিচার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব সম্পর্কে যে স্পষ্ট অবয়ব ফুটে ওঠে তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসংগত অবকাশ আছে যে তাঁর কাছে আদর্শ নেতৃত্বের ভাবমূর্তি হচ্ছে স্তালিন।

আড়াল নেই। এ ব্যাপারে কবি এবং পরিচয় সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন : অদ্যাবধি ৯৫ অতিক্রান্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে স্তালিনিস্ট ঘোষণা করেন। (২৫.১২.০২, সংবাদ প্রতিদিন)

আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চার কলমজীবীও হীরেন্দ্রনাথকে স্তালিনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (২, ১২, ০২, আনন্দবাজার পত্রিকা)

কোন বীক্ষণ এবং কী প্রকার যুক্তি প্রবাহে হীরেন্দ্রনাথ উপগত হয়েছেন স্তালিন নেতৃত্বে? হীরেন্দ্রনাথ স্তালিনিস্ট—এই অভিধায় বিতর্কের উসকানিও বিস্তর। দেখা যাক সংজ্ঞার গোড়ায় যুক্তির বিস্তার কতটুকু। বোঝার চেষ্টা করা যাক হীরেন্দ্রনাথের স্তালিনচর্চার প্রকরণ।

২

জীবনের শেষ কয়েক বছর লেনিন অসুস্থ ছিলেন। তখন তাঁর চারপাশে অগ্রজ এবং সমকালীন বিশিষ্ট নেতা অমনিবাস। কিন্তু একান্নবর্তীতায় বনিবনা হচ্ছিল না। ভাই ভাই এক ঠাঁই-এ ধস নামছে। নিয়ত খটাখটি। একদিকে বাঞ্ছিত নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে সোভিয়েত পুনর্গঠনের চাহিদা। সংকটের বিহ্বলতায় লেনিন আর্ত। হন্যে হয়ে উত্তরসূরী খোঁজ করছেন। খোঁজ মিলল। প্লেখানভ ট্রটস্কি বুখারিন জিনোভিয়েত প্রমুখ তাবড় তাবড় নেতা সমাবেশ টপকে লেনিনের নির্বাচন স্তালিন। যিনি গ্রন্থজীবী নন। পরিচিত সংগঠক

নন। অজ্ঞাত কুলশীল এক মুচি সন্তান।

লেনিনের নতুন কর্মসূচি N.E.P. গ্রন্থবাদী নেতারা এর মধ্যে মার্কসবাদী ধ্রুপদ ধারণার প্রতিফলন খুঁজে পাচ্ছেন না। অভ্যস্ত চর্চার বিপরীতে এর অবস্থান। কৃষককে ছাড় দিতে হবে। শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে। NEP. বা নয়া অর্থনীতির প্রথম উপলব্ধি লেনিনের। স্তালিন এই উপলব্ধির শরিক হয়ে যান। সামাজিক পুঁজির ওপর ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠা সাবেকি বিপ্লবী তত্ত্বের প্রকৃতিকে আহত করে। বহু তাত্ত্বিক ক্ষুব্ধ হন। আবার বিষয়টাকে একটু ঘুরিয়ে দেখলে তত্ত্বগত পবিত্রতার ভিন্ন এক রূপ ফুটে ওঠে। যেখানে স্তালিন ধরতাই এড়িয়ে কমিউনিস্ট ইসতেহারের অনেক কাছাকাছি। ইসতেহার ঘোষণা করছে, "—প্রচলিত মালিকানা. সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়।"

ফলিত শাস্ত্র হিসেবে NEP. সফল। সমাজজীবনে অবদান ইতিবাচক। ১৯৩০ অবধি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে। তত্ত্ব এবং বাস্তবে অমিল দেখা দিলে বদলাবার দায়িত্ব কার? তত্ত্বের বিশুদ্ধতা ছেড়ে স্তালিন বাস্তবকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। তা যদি না করতেন তা হলে যেমন চেয়েছিলেন ট্রথস্কি—গোটা বিশ্বব্যাপী শ্রমিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত আপন সন্তান বিপ্লবকে জঠরস্থ করতে সোভিয়েত রাষ্ট্র যন্ত্রের বিনাস, তাই হত। স্তালিনের জাতীয়তাবোধ সোভিয়েত অস্তিত্বের পক্ষে রক্ষাকবচ ছিল। এই বাস্তব চেতনাকে হীরেন্দ্রনাথ সায় দিয়েছেন।

অবশ্য তত্ত্ববাদী যান্ত্রিক বিপ্লববাদের চাপে NEP বেশি দিন টেকসই হয়নি। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি নয়া অর্থনীতির সমাপতন ঘটলো। NEP বর্জনের সময় স্তালিন নিঃসঙ্গ ছিলেন। NEP-এর চরিত্র ছিল সোভিয়েত সমাজের পক্ষে এক বিশেষ ধাঁচ। না সমাজতন্ত্র না ধনতন্ত্র। স্বপ্নবিধুর ট্রথস্কি এবং অন্যান্য রক্ষণশীল বলশেভিকরা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এড়িয়ে NEP পরিহার করতে চাপ দিতে থাকেন। লেনিন বাতাবরণ অপসৃত। নেতৃত্বে আধিপত্য বজায় রাখতে স্তালিন আপস করেন। শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে উদারনীতির যবনিকাপাত। উদার দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে অবস্থাটা বদলে যায়। উৎপাদন-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানচর্চার স্বাধীনতায় শাসন বলবৎ হয়। নেতা অভ্রান্ত এবং সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী এই চরম ধারণা সমগ্র জাতীয় চৈতন্য চারিয়ে দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্র ভূমিকা নিতে থাকে। ভীতিভিত্তিক এবং ভক্তি-বিহ্বলতার আবেশ বশ্যতায় পুরো জাতীয় মানস মুড়ে দেওয়া হয়। যাতে বহমান ইতিহাস ছন্দ টাল খায়। সমাজে মূল স্রোতই একমাত্র স্রোত নয়। বহু উপস্রোতের মণ্ডনে নৃত্যচটুল সূক্ষ্ম অণুসূক্ষ্ম বক্র বুননের বর্ণাঢ্য নকশিকাঁথা হচ্ছে সমাজ। সমাজের ওপর দল বা সরকার কোনও নির্দিষ্ট ছক চাপিয়ে দিলে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রতিষেধক হিসেবে প্রতিবাদী সংস্থাসমূহ লালন করা পুষ্ট করা জরুরি। যে 'স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অল্পবিস্তর বিদ্যমান। এই প্রকার গণতান্ত্রিক ধারা শীর্ণ হলে বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়।

এখানেই খটকা উথলায়। ব্যক্তি স্তালিনকে মাল্যবান করতে তৎকালীন সোভিয়েত

সমাজে দল এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা হীরেন্দ্রনাথের কাছে কোন তাৎপর্য পেয়েছিল। ভাষ্যে এবং লেখনীতে তাঁর যা মানসিক ঝোঁক ব্যাপ্ত তাতে যে-কোনও প্রকার হুকুমদারি শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের কোনও ছায়াপাত লক্ষ করা যায় না। তিনি সংগত মনে করেছেন ইতিহাসের যে পরিস্থিতিতে বলশেভিক শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঈষৎ জবরদস্তিমূলক হলেও মূলত ছিল সংখ্যাগুরুর স্বার্থে সংখ্যালঘুর ষড়যন্ত্রীয় প্রকল্প প্রতিরোধে অনিবার্য দাওয়াই। আক্রান্তের প্রতিক্রিয়া। আরো একটা দিক আছে। তা হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা, সাহস—সামরিক দক্ষতা—সংগঠন শক্তি ইত্যাদির সমাহার হচ্ছে নেতৃত্বের দ্যোতক। হীরেন্দ্রনাথ স্তালিন চরিতে গুণগুলির সন্ধান পেয়েছেন।

৩

১৯৮৪ সালে গর্বাচভ রাষ্ট্র এবং দলে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতিতে সোভিয়েত সমাজকে ব্যাপকভাবে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্রের চালু ছক ঘেঁটে দেয়। ১৯৫৬ সালে নব ধারার সূত্রপাত করেছিলেন ক্রুশ্চভ। সোভিয়েত বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ বিস্তর নথিপত্র সহযোগে তথ্য হাজির করেছিলেন এই মর্মে যে স্তালিন জমানা ছিল বিপুল ক্ষয় ভুল এবং অনগ্রসরতার প্রসূতি সদন। ব্যর্থতা হিসেবে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন, যথা : গণতান্ত্রিকতার অভাব। ব্যক্তি স্বাধীনতার সংকোচন। ভ্রান্ত অর্থনীতির আশ্রয় অর্থাৎ স্তালিন শাসনে ব্যক্তিত্ব বিকাশ থমকে গেছে। সমাজে সংহতি বিপন্ন হয়েছে। অর্থনীতি খঞ্জ হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রাক-ক্রুশ্চেভ পর্বেও স্তালিন বিরোধিতা ছিল। ট্রৎস্কি এবং অর্থনীতিবিদ লিভারম্যান প্রমুখরা স্তালিননীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভই প্রথম স্তালিন বিরোধিতাকে সংহত রূপ দেন বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে। এই ধারা ক্রুশ্চভ-কোসিগিন-ব্রেজনেভ-আন্দ্রপভ হয়ে গর্বাচভে পূর্ণতা পায়। (মাঝে অবশ্য ব্রেজনেভ স্তালিন বিরোধিতা বর্জন করেছিলেন)। এরা সকলেই পার্টি কাঠামো বজায় রেখে সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৯৯১-সালে সাবেকি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। শ্রেণীযুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ গৃহযুদ্ধ—এই ত্রয়ী যুদ্ধে বিপুল রক্তপাত ঘটিয়ে হয়েছিল নতুন সমাজের অভিষেক। নতুন সমাজকে সমীহ করতে ধনবাদী রাষ্ট্র বিমুখ। তাদের চোখ টাটাচ্ছে। পেটে মারার জন্য তারা গড়ে তুলল অর্থনৈতিক অবরোধ। যে নতুন সমাজব্যবস্থা নোঙর করেছিল ১৯১৭-র রাশিয়াতে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সামলে সহে ক্রমে এই সমাজব্যবস্থার বিস্তার হয়েছিল আরো অনেক দেশে। কিন্তু সত্তর বছর না ফুরতেই ঘনিয়ে এলো অন্ত্যেষ্টি। জাঁক করে বসতে না বসতেই বন্দরের কাল হল শেষ। পাততাড়ি গুটোতে গুটোতে খরচার খাতায় উঠে গেল। চমক আছে। আছে বিষণ্ণ বিয়োগের হতবিহ্বলতা। কিন্তু ভুঁইফোড় নয় অন্তর্জলী। বৃহৎ বিনাসের উপকরণে দীর্ঘদিন ধরে পুষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে ফাটল। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নে। সোভিয়েত ইউনিয়নের থাবা আলগা হতেই ক্রমে ক্রমে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও কমিউনিস্ট শাসনে ধস নামল। চিন অচিনের পথে পাড়ি দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছে। কিউবা এবং ভিয়েতনামের মতো ছোট ছোট দেশ পুরোনো ব্যবস্থা আঁকড়ে

নিবু নিবু টিকে আছে। এই অকাল বিলয় কৌতূহলের বিষয়। সমাজতন্ত্র কেন দিন দিন আয়ুহীন হীনবল হল; জানতে আগ্রহ জন্মে। ব্যক্তিগত ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতিগ্রস্ততা, ঢিলেঢালা সাংগঠনিক চরিত্র ইত্যাদি উপরি কাঠামোর অবক্ষয়ই কি পতনের রোগ, না-কি আদর্শের মধ্যেই ছিল ভূতের বাসা? জিজ্ঞাসা কুরে কুরে দংশায়।

ইতালি কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ভোগলিয়ত্তির মতে সাংগঠনিক ত্রুটি, ব্যক্তিগত দুরভিসন্ধি, উচ্চাশা, অহং-ইত্যাদির ভেতর পতনের ইতিহাস গবেষণা করলে ভুল হবে। বরং উৎপাদন, বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স, বায়োকেমিক্যাল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় পশ্চিম দুনিয়া এবং জাপান থেকে যে অনেক হঠে গেছে তার সন্ধান মিলবে ভ্রান্ত দর্শন এবং অর্থনীতির গর্ভে সহসা নয় ধীরে ধীরে পোক্ত হচ্ছিল ধসের পটভূমি। ক্রমে বিস্ফোরণ ঘটলো। বিস্ফোরণের অন্তর্গত কারণ ধরা পড়ে আর্থ-সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের আরোগ্যহীন রোগের প্রকৃতি নিয়ে নানান দৃষ্টিকোণ বিচার চলছে।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব নিয়ে লেনিন যে ধারণা পোষণ করতেন তা তিনি 'রাষ্ট্র এবং বিপ্লব' রচনায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিচারে একনায়কতন্ত্রের দুটি দিক বা শাখা আছে। রাষ্ট্র চরিত্রের একদিকে সংহার অন্যদিকে গঠনাত্মক ভূমিকা আছে। লয় এবং গঠনের দ্বৈত রূপ। বিপ্লবের অব্যবহিত পর পরাজিত শক্তির বিপুল অস্তিত্ব বেঁচে থাকে। বিপ্লবকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান শত্রু লাইনে। সমাজ থেকে তাদের শক্তি প্রভাব উৎখাত করতে বিপ্লবী সরকার শক্তিশালী ভূমিকা নেয়। শত্রুর শক্তি ক্ষয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সরকারের কাছে প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি। গঠনাত্মক মানবিক স্বার্থ স্ফুরণের মধ্য দিয়ে সূচিত হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক সাফল্য। রাষ্ট্রের সংহার রূপ ম্লান হতে হতে লোপ পাবে। লাভ করবে কোমল ভাবমূর্তি। এই ছিল লেনিনের সূত্র। মার্কসও রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের যন্ত্র দমনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সমাজ বিকাশের এক আদর্শ স্তরে তিনি কামনা করেছিলেন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। লেনিনও এই তত্ত্ব সমর্থন করতেন। এখন দেখা যাক কমিউনিস্ট শাসনে রাষ্ট্রে রুদ্র রূপ খসেছিল কি-না।

গৃহযুদ্ধ অবসিত। প্রকৃত শ্রেণীশত্রুর সক্রিয়তা ভোঁতা। নিরাপত্তা অটুট। এই অবস্থায় প্রত্যাশা ছিল যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক অধিকারে শ্রীমণ্ডিত হয়ে সমাজকে মানবমুখী করে তোলার দিকে পদক্ষেপ নেবে। নিল না। সেনাবাহিনী, পুলিশিব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রের সহবাসে নিটোল শাসনযন্ত্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এঁটে বসল। কার্যত কী দলের ভেতর কী দলের বাইরে কেউ দলীয় নীতি অনুমোদন না করলে বা ভিন্ন মত পোষণ করলে নিস্তার নেই। কপালে ভোগান্তি। মতভেদ মানেই শত্রুতা, শাসক শত্রু মানেই সমাজতন্ত্রের শত্রু—এই সরল মেরুকরণ ঘটিয়ে চরম দুর্ভোগে আক্রমণ করা হয়েছে নাগরিকদের। শাস্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সংগঠিত হয়েছে বহিষ্কার নির্বাসন হত্যা।

স্তালিনের যুক্তি ছিল বিরোধীরা বিপ্লবের অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। প্রমাণ

হিসেবে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি হাজির করে 'মস্কো বিচার' তুলে ধরা হয়। যদিও 'মস্কো বিচার' নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চিহ্ন হয়নি। সংশয়ের দুটি দিক আছে। এক, স্বীকারোক্তি বাধ্যতামূলক। দুই আত্মরক্ষার্থে ছলনা। কূটকৌশল। টিকে থাকার ফন্দি।

এরকম ঘটনা কমিউনিস্ট শাসনে ঘটে থাকে। যেমন ক্রুশ্চভ এলে 'মস্কো বিচার'-কে প্রহসন বলে উল্লেখ করে পাল্টা নথিপত্র হাজির করে ক্রুশ্চভ বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে স্তালিনের অনাক্রমণ চুক্তিতে ভয়ংকর এক শর্ত ছিল। শর্ত ছিল যে চোদ্দ হাজারের মতো কমিউনিস্টদের তুলে দিতে হবে জার্মানীর হাতে। কোতল করাই হচ্ছে যে সমর্পণের উদ্দেশ্য। যেমন স্তালিনে 'মস্কো বিচার' তেমনি 'অনাক্রমণ চুক্তি'র এই শর্ত যে খাঁটি এবং নির্ভেজাল তা নিয়ে সংশয় আছে। এ যেন সাজানো আর বানানোর লড়ালড়ি। কারণ এমন চুক্তি হলে তার নমুনা কপি স্বাক্ষরিত কপি দুই দেশের মধ্যে থাকত। কিন্তু পশ্চিমী দুনিয়ার কাছ থেকে অদ্যাবধি তেমন প্রমাণ আসেনি।

ধর্তব্য হচ্ছে ১৯৩০-এর পর থেকে সমাজের ওপর দল এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা পায়। দল এবং রাষ্ট্রের মুখ দিয়ে নিঃসরণ হয় চার্চীয় কণ্ঠস্বর। মার্কসের মতে যে খ্রিশ্চান ধারণা আঠারো শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে হার মেনেছিল তাই আবার চাগাড় দেয়। সর্বরোগ হরক মুশকিল আসান হিসেবে গুরুবাদী দর্শন ধর্মীয় ঝোলা থেকে রাজনৈতিক অবতারবাদে আশ্রয় নেয়। আমার কাছে আইস। আমি তোমাদিগকে সুখ দিব। সমৃদ্ধি দিব। বিশ্রাম দিব।

এটা খুবই উদ্বেগের। কোনও ধারণাকে অব্যর্থ নিশান হিসেবে জনমানসে গেঁথে দেওয়ার অর্থ ভয়ংকর ভ্রান্তির বীজ পুঁতে দেওয়া।

আবার উৎকৃষ্ট পন্থা হলেও গণতন্ত্রের অনেক বায়নাক্কা। অধ্যয়ন-তথ্যসঞ্চয়-মতান্তর-বিশ্লেষণ। অনেক ঝক্কি। গণতন্ত্রের পরিষেবা নিতে গ্রাহককে যোগ্য হতে হয়। সাবালকত্বর স্বাদ অনবদ্য হলেও পথ কঠিন। যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার অংশ। অনেকেই চায় চিন্তাহীন নিশ্চিতি। অভিভাবক বশ্যতার সুখশান্তিতলা। এই মনস্তত্ব মূলধন করে গড়ে ওঠে একনায়কবাদ। কর্তার সংসার। স্তালিন সোভিয়েতে গড়ে তুলেছিলেন কর্তার সংসার। তিনি ছিলেন ত্রাণকর্তা।

গণতন্ত্র অবরুদ্ধ হলে তার ছায়া পড়ে অর্থনীতির প্রাঙ্গণেও। দেখা যাক কেমন সে প্রাঙ্গণ।

৪

উৎপাদন এবং বন্টনব্যবস্থা অর্থনীতির মূলসূত্র। এই সূত্র হচ্ছে : 'বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ'। সমাজের ওপর এই সূত্রের প্রয়োগ লক্ষ করে মার্কস সিদ্ধান্তে আসেন যে সমাজের চেহারা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতের ফলে। একদিকে থাকে উৎপাদন-শক্তি অন্য দিকে থাকে বন্টন-কাঠামো। দুই শক্তির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হলে সংকট সৃষ্টি হয়।

তিরিশ দশকের পর সোভিয়েতে যে পরিবর্তন আসে তার মূলে উৎপাদন এবং বন্টন-

ব্যবস্থার মধ্যে বিনষ্ট সংহতিকে দায়ী করা হয়। বিপ্লবের প্রথম দশকে সোভিয়েতে বন্টন-ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। বরং যথাযথ সঙ্গত করতে পারেনি উৎপাদন-শক্তি। রাষ্ট্রের সার্বভৌম নজরদারি উৎপাদনশীলতা খঞ্জ করে দিয়েছে। কী উৎপাদন হবে কী পরিমাণ উৎপাদন হবে সব ঠিক করে দিচ্ছে সরকার। কারখানায় কোটা বেটে দিচ্ছে। কাঁচামাল জোগান দিচ্ছে।

ফলে কী ঘটছে? যে পণ্যের চাহিদা নেই উৎপাদিত হয়ে পড়ে থাকছে। আবার চাহিদা আছে দাম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে সেক্ষেত্রেও মাল গুদোম ঘরে ডাঁই হচ্ছে। কোটা সিস্টেমে সংখ্যা বিচার্য। গুণগত মান অবহেলিত। মুড়ি মুড়কির এক দাম। এটাও অপচয়ের কারণ। বহু ক্ষেত্রে উৎপন্ন মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যে কোনও সঙ্গতি নেই। ফলে ব্যাপক খয়রাতি। লোকসানের স্ফীতি। যে পণ্যের চাহিদা আছে মূল্য ক্রয়ক্ষমতার নাগালে অর্থাৎ বাজার রমরম—সে সব পণ্যের জোগানে টান আছে। অপ্রতুল উৎপাদন এবং প্রতুল চাহিদা। সৃষ্টি হচ্ছে বাটপাড়ি। জোগান এবং চাহিদার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কাড়াকাড়ি। সীমিত জোগান ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে। নেপো হয়ে দই মেরে দিচ্ছে দল এবং সরকারি আমরা জোট। আলুথালু বন্টনব্যবস্থায় ফসল তুলে নিচ্ছে সমর্থরা। কালের যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন : ফসলের খেতে বাসা করে উপবাস।

উৎপাদন এবং আমলা আমে দুধে মিশে যাচ্ছে। আঁটি হয়ে পড়ে থাকছে জনগণ। দুর্নীতির গুটি তৈরি হয়। নিজের বেলা আঁটিশুটি আমলাতন্ত্র বিকশিত হয়। যার জঠরে বঞ্চনা-ক্ষোভ-অবদমন-ক্রোধ-হিংসার গর্ভ সঞ্চার হতে থাকে। যেন তেন প্রকারেণ কোটা ভরাও। কোটা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে চাকরিতে বসে পড়া অথবা সাজা। জীবনের ওপর নেমে আসে অশনি সংকেত। উদ্ধারের একমাত্র রাস্তা কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ। অনুগ্রহ আদায়ে কারখানার ম্যানেজাররা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির চক্রে। অনিবার্য হচ্ছে হিসেব দাখিলে কারচুপি। ভুয়ো তথ্য সরবরাহ। জালি বিবৃতিতে প্রকৃত চিত্রের প্রবাস। ঘুষের চল। কর্তাভজা শাসনব্যবস্থার প্রচলনে দল এবং সরকার থেকে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারী শিল্পের প্রতি একমাত্রিক ঝোঁক—অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের প্রতি উদাসীনতা জনগণকে রাগী করে রাখলো। সরকারের দিকে পার্টির দিকে মানুষের মুখ অন্তর্হিত।

সরকারের দিক থেকেও দুঃসময়। উৎপাদনমূল্য বেশি বিক্রয়মূল্য কম হচ্ছে। ভারসাম্য বাগে আনতে ভরতুকির প্লাবন। লক্ষ্যমাত্রা যদি 'নীট' উৎপাদন হত, অর্থাৎ কাঁচামাল, জ্বালানি, শ্রম, সময় ইত্যাদি কেটে ধার্য হত তাহলে ম্যানেজারের গরজ থাকত খরচার রাস টানার দিকে। অর্থনীতির নিজস্ব স্বভাব রুখে দিয়ে হুকুমশাহী পন্থায় চালনার চেষ্টায় সরকার দেউলে বনে যায়। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিবহন-গবেষণা-নিরাপত্তা প্রভৃতি পরিষেবামূলক খাতে ভরতুকি অনিবার্য। এর ওপর উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রেই যদি দাতব্য অব্যাহত থাকে তো ফকির হতে সময় লাগে হ্রস্ব। দ্রুত কোষাগার হয়ে যায় ঝাঁঝরা, সরকার মাথা মোটা পা সরু রিকেটগ্রস্ত শিশু অর্থনীতিতে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে।

ফোঁপরা অর্থনৈতিক স্বরূপ ফস করে জাগ্রত তা নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে

স্বনির্ভরতার সূচক হিসেবে 'লাভ'-কে অর্থনৈতিক সংস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে স্থির করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ লিবারম্যান। প্রস্তাব বিবেচনা করতে স্তালিন নেতৃত্বকে তিনি দুবার চাপও দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ সালে। ২ বারই প্রস্তাব খারিজ হয়।

লক্ষ্মণ যা—প্রসঙ্গচ্যুত হবে না উল্লেখ করলে যে উৎপাদনের ওপর মালিকানা এবং পরিচালনার কর্তৃত্ব সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বর্তালেই তা সমাজতন্ত্র হয় না। হয় রাষ্ট্রতন্ত্র। পুঁজিবাদ সমাজে শ্রমিকরা হচ্ছে পুঁজির দাম। রাষ্ট্রতন্ত্রে শ্রমিকরা হয়ে পড়ে আমলাতন্ত্রের দাম।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে আস্থাশীল হীরেন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিয়েছেন স্তালিন নেতৃত্বে আমলাতন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান বলবৎ ছিল। তৎসত্ত্বেও বাধা বিপত্তি বিচ্যুতির বন্ধুর পথ বেয়ে শ্রমিক একনায়কত্বে সমাজ সমাজতন্ত্রের সরণিতে সাম্যবাদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। হীরেন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়ে অনেক বিতর্কের ইশারা আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের উত্থান সমর্থন করেও সোভিয়েত সমাজের হয়ে নির্বিচার সওয়ালে প্রবৃত্ত হননি। তাঁর কাছে অন্ধ শ্রেণী মমত্ব কোনও কাজের কথা নয়। এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ আছে। নমুনা হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরা যাক। 'কালের যাত্রা'-থেকে :

পুরোহিত : তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি : পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

মার্কস যেমন ভাবতেন শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনাশক্তি সমাজকে ঠেলে দেবে সাম্যবাদের দিকে। যে সাম্যবাদে ব্যক্তি তার স্বাধীনতার কিছু অংশ যা সে অর্পণ করেছিল সমাজকে, এক্ষণে ফিরে পাবে গচ্ছিত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার অনুষঙ্গ হিসেবে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সংস্থানে বরাদ্দ সময় ৩-৪ ঘণ্টা। বাকি সময় শিকার সাহিত্যচর্চা বিশ্রাম ইত্যাদি উপভোগ্য জীবনের আশ্বাস। হীরেন্দ্রনাথ মার্কস মাথায় রেখে স্তালিনে ভর করেছেন পারাপারে। রবীন্দ্রনাথের শঙ্কা সন্দেহজাত ঢেউ খেলান প্রশ্নের সবুরতায় বিদ্ধ হননি।

৫

বিপ্লবের তিরিশ বছর পরেও মানুষ ফিরে পেল না ব্যক্তি স্বাধীনতা। যে মানব মুক্তির প্রতিশ্রুতিতে নতুন সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয় তার এমন করুণ পরিণতি মানুষকে শোকাবহ করে তুলবে আশ্চর্য কি! মানব মুক্তির অস্ত্র হিসেবে যে দল এবং রাষ্ট্রের পত্তন অতিরিক্ত শ্রীবৃদ্ধির ফলে সে হয়ে উঠলো ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের প্রতিপক্ষ। দুধ কলা দিয়ে যাকে পোষ মানানোর কথা সে পোষ মানল না। দাদাগিরি করতে চেপে বসল মাথায় সৃষ্টি স্রষ্টাকে

গ্রাস করার ফলে এলো বিচ্ছিন্নতা। স্তালিন আমলে সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষের দীর্ণ সততা বহু মনীষীকে ব্যথিত করেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর আঘাত এবং নিষ্পেষণের চেহারা তিনি এইভাবে তুলে ধরেছেন : "—সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরোধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় এই রকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গর্ভমেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মত স্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল।" আক্ষেপপ্রসুত ব্যাখ্যা। আরো বিশদ করেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিতে। উদ্ধৃতির কিছু অংশ হচ্ছে : "—ইউরোপ যখন খৃশ্চান শাস্ত্র বাক্যে জবরদস্ত ছিল তখন মানুষের হাড় গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিধিয়ে, তাকে টিলিয়ে, ধর্মের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। আজ বলশেভিক সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিস এই যে, মানুষের মত স্বাতন্ত্রে অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানব প্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে।

আমার মনে পড়ছে আমাদের বাউলের গান—

নিঠুর গরজী,
তুমি কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটারি সবুর বিহুনে।
দেখনা আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দন্ত—
এর আছে কোন উপায়।
কয় সে মদন দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে
রে গরজী।"

উল্লেখ বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ শাসক সৌজন্যে রাজনীতিকদের কনডাক্টেড ট্যুর নয়। তাঁর সাবালকত্বের অভিজ্ঞান। পরিব্যাপ্ত তথ্য আহরণ বিশ্লেষণ এবং সংহতি প্রক্রিয়ায় গড়ে তোলা জ্ঞান ও উপলব্ধি। উপলব্ধির এই স্বরূপ কী কাব্যিক চরিত্রের অতিরঞ্জন, একপেশে?' না, সহজ ধারা যে বিপন্ন হয়েছিল কমিউনিস্ট হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকারেরও এক উপলব্ধি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই ভাবে, "—এক পার্টির শাসন কি সব অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী? স্তালিন এই-সব প্রশ্ন সরাসরি অগ্রাহ্য করে সাম্যবাদকে ব্যাহত করেছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবেই কিছুটা রক্তক্ষয় হয়ত অনিবার্য, কিন্তু স্তালিনে 'টেরর'? শুধু লেনিনের সহকর্মী 'প্রাচীন' বলশেভিকরা নন, হাজার হাজার কত

সাধারণ কর্মী যে নিষ্পেষিত, অমানুষিকভাবে উৎপীড়িত, নিহত, অজ্ঞাতরূপে অদৃশ্য, চিরজীবনের মতন পঙ্গু হয়েছিলেন তার হিসাব কে দেবে? বিপ্লবের ষাট বছর পরেও যদি মত-প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে তবে মার্ক্সের বহুঘোষিত মানবতাবাদের কি বাকি রইল?''—শারদীয় বারোমাস। ১৯৭৯। ঈদৃশ উপলব্ধির ভিত্তিমূলক উপাদান হীরেন্দ্রনাথের চোখে ধুলো দিয়েছে ভাবলে ভুল হবে। আসলে স্তালিন চরিত্রের সাংগঠনিক দক্ষতার ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্তালিন যে লাল ফৌজ এবং মজবুত পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সংগঠনের ইতিহাসে তা বিরল উদাহরণ। অন্তত সোভিয়েত মাটিতে এই টীকা যে সুপ্রযুক্ত ৩টি ঘটনার স্মরণ নিলে তা ফুটে ওঠে। হাঙ্গেরী-চেকোশ্লোভাকিয়া-আফগানিস্তানে যে ফৌজি অভিযান হয়েছিল তা সংগঠিত হয়েছিল স্তালিন পরবর্তী নেতৃত্বে। স্তালিন তখন ছাঁটাই। অথচ স্তালিনবাদের শেকড় কী গভীর!

স্তালিনীয় আনুগত্যের চাহিদায় মানুষের জীবনযাপনে নিজস্ব পদ্ধতির ওপরও আঘাত করা হয়েছে। স্বভাবধর্মে সোভিয়েত জনগণ ধর্মপ্রবণ। আত্মশুদ্ধি-স্বীকারোক্তিতে তারা চার্চের শরণ নেয়। স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর নির্মাণ করা হল বাঁধ। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির দ্যোতক হিসেবে সরকার গর্বভরে ঘোষণা করল মানুষ আর পাপ স্খলনে পুণ্যাতুর হয়ে চার্চে মসজিদে হাজিরা দেয় না। যদিও পরিষেবা দিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আয়োজন ব্যাপক। পরিষেবার আয়োজন আছে গ্রাহক নেই। ঘোষণায় প্রচ্ছন্ন চমকানি। সরকার যে সংকেত পাঠাতে চায় জনগণ তা আঁচ করে। কার এমন বুকের পাটা আর ধর্মস্থানে ঢুঁ মারে। অতএব ধর্মস্থান খাঁ-খাঁ। এইভাবে ঘটে যায় প্রবৃত্তি হননের অস্ত্রোপচার।

একই সঙ্গে জমতে থাকে ক্ষোভ। সামাজিক রীতিনীতির মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে গড়া ওঠা বহুদিনের পোক্ত লোকাচার মানস গঠন আধ্যাত্মিক ঝোঁক জোরাজুরি করে রুখে দিলে ফল ভাল হয় না। জনগণের এই অসন্তুষ্ট মানসভূমির হদিস পেল না দল এবং সরকার। তাই হয়। আত্মবিহ্বলতার ধর্ম হচ্ছে অপরের কাছ থেকে পাঠ না নেওয়া। অতুলপ্রসাদের সেই কলির মতো : নিচুর কাছে হতে নিচু শিখলি না রে মন। ফলে রাশিয়ার ভৌগলিক সত্তা রক্ষা পায় হেজে যায় আত্মা। বরিস পাস্তেরনাক তাঁর উপন্যাসে যেমন ফুটিয়েছেন সেই ছবি।

ঠিক যে অবস্থা সঙ্গীন। কিন্তু এই অবস্থা ব্যক্তি চরিত্রের অংশ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এটা রাজনীতিবিদের সমস্যা নয়। রাজনীতির অন্তর্গত সংকট। রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ বিজ্ঞ হীরেন্দ্রনাথ মানবিক বিপর্যয়কে কটূ চোখে দেখেছেন। কিন্তু দুর্দশাকে স্তালিন চরিত্রের অনুদান হিসেবে প্রতিপন্ন করে সামাজিক পটভূমির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেননি। স্তালিন ক্রূর কঠোর এবং সতীর্থদের প্রতি মমতাশূন্য—লেনিনের এই মন্তব্য আপ্তবাক্য হিসেবে মান্যতার দায় না থাকলে বলা যায় হীরেন্দ্রনাথের স্তালিনচর্চার সংগ্রহে এমন কোনও তথ্য সম্ভার নেই যার আশ্রয়ে স্তালিনকে অমানবিক আখ্যা দেওয়া যায়। এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে স্তালিনের এক সাক্ষাৎকারে আমরাও জেনেছি, স্তালিন কথোপকথনের এক পর্বে জানাচ্ছেন তাঁকে পরিস্থিতির চাপে এমন অনেক সিদ্ধান্ত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যা খুবই বেদনাদায়ক।

ধর্তব্য হচ্ছে 'বেদনাদায়ক'—শব্দ প্রক্ষেপের অন্তর্গতে প্রচ্ছন্ন অনুতাপ আফসোস এবং দুঃখ কাতরতার সুর উৎকীর্ণ। বিপর্যস্ত মানবতার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে সচরাচর কোনও স্বৈরশাসক 'বেদনাদায়ক'—শব্দ, যে শব্দের চরিত্রে কষ্টের অনুভব যুক্ত তা প্রয়োগ করে থাকেন না।

আবার এমনকী শত্রুশক্তিকে পরাস্ত করতে এক দফা কর্মসূচি হিসেবে হিংসার আয়োজন মার্কসীয় পাঠশালায় অনুমোদিত নয়। Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 হাতে আসার পর। কাজেই উদ্দেশ্য লঘু অথবা গুরু সে বিচার বড় কথা নয়। বড় কথা হল মার্কসবাদের দোহাই পেড়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করার যোগ্যতা আসে না। এমন হলে রবীন্দ্রনাথের সেই কলি স্মরণে আসে। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

আবার যত দোষ নন্দ ঘোষ বলে স্তালিনকে মুর্গি বানানোর মধ্যে বিস্তর কারচুপি আছে। নাবালক মনস্তত্ত্ব কাজ করে। ভুলে গেলে চলবে না নায়ক মাত্রই সমাজের এক অংশ বা সামগ্রিক অংশের প্রতিভূ। হতশ্রী দিশাহীন বিপন্ন মানবতার ধূসর সন্ধিক্ষণে ব্যক্তিবাদ বা অবতারবাদের উন্মেষ। গজিয়ে ওঠে নাবালক দর্শন। নায়ক আর নিছক ব্যক্তিসত্তা নয়। হয়ে ওঠে ইচ্ছাপূরণের প্রতিরূপ।

জনমানসের প্রকৃত চিত্রটা হীরেন্দ্রনাথ যথাযথ চিহ্নিত করেছেন। সেই সময় সোভিয়েত জনগণ তিনপ্রকার যুদ্ধে বিধ্বস্ত। বাতাস বহন করছে বারুদের গন্ধ। ধু ধু হাহাকারী অনুভবে ছেয়ে যাচ্ছে অন্তর। গৃহযুদ্ধের ঘা শুকোতে না শুকোতে আবার যুদ্ধ। যুদ্ধের বলি চার কোটি কথা ছিল কেউ বাঁচবে না। আশ্চর্যভাবে ঘরে ঘরে কেউ কেউ বাঁচল। সেই যে বলে না হরি যাকে রাখে। যারা বাঁচল তারা চিন্ময় স্মৃতিসৌধ। বিষণ্ণতায় স্তব্ধ। হতাশায় মুহ্যমান। এইসব মূক ম্লান অবসন্ন মুখে ভাষা জোগাতে হবে। আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। কঠিন কাজ। অনেক......অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। থাক পড়ে—এই বঙ্গীয়করণ স্তালিনের ধাতে নেই। স্তালিন অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। বিলাপ বিলাসীও ছিলেন না। কর্মচঞ্চলতা তাঁর অঙ্গলগ্ন। সোভিয়েত পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। তাঁর সামনে পড়ে আছে অনেক কাজ। পরিবেশ জটিল প্রতিকূল। ইউরোপ মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকা অর্থনীতি। ঘরে ঘরে প্রিয়জন বিয়োগ। সম্ভোগবাদের হাতছানি। পড়শি নাগরিকদের ক্রমাগত প্ররোচনা : জীবন দুদিনের জন্য বৈ তো নয়। এসো উপভোগ করি।

পরিস্থিতি এমন হলে ধৈর্য সহিষ্ণুতা গলে যায়। চটজলদি ত্রাণকার্যই মুখ্য হয়ে ওঠে। অর্থনীতিতে আনতে হয় হরিণী ছন্দ। এমন ক্ষণে তত্ত্ব নিয়ে বিশুদ্ধতার কচকচি লাটে ওঠে। সমস্যার নিরসনে স্তালিন জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করেন। দুটি কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেন। (ক) সোভিয়েত শত্রু হিসেবে ধনবাদী রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা। (খ) সোভিয়েত আক্রান্ত এই মনোবিকলনে গোটা দেশকে আবিষ্ট করে সোভিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করা। এটা প্রয়োজন হয়েছিল ত্যাগে এবং কৃচ্ছ্রসাধনে। চড়া দামের বিনিময়ে হলেও উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। বিশ্ব সমাজে সোভিয়েত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল, সম্ভ্রম আদায়ী রাষ্ট্র।

হীরেন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র মনস্কতা কেন্দ্রীভূত করেছেন সমাজ-সংস্থা আশা-নিরাশার পটভূমিতে। যে পটভূমিতে স্তালিন হয়ে মনস্কতা কেন্দ্রীভূত করেছেন সমাজ-সংস্থা আশা-নিরাশার পটভূমিতে। যে পটভূমিতে স্তালিন হয়ে উঠেছেন যোগ্য নায়ক। এই যোগ্যতার গায়ে গায়ে সমালোচনার অন্য ধারাও লেপটে ছিল। যে ধারার মধ্যে আছে স্তালিন চরিত্রের অগণতান্ত্রিক ঝোঁকে। শিল্প-কলা বিজ্ঞানসাধনায় তাঁর আমলে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। এর আগে অন্বেষণচর্চার প্রথম ঘাতক হিসেবে নিন্দাভাজন হয়েছেন ঈশ্বরের চর পাদ্রীসমাজ। বিজ্ঞানচর্চায় স্বাধীনতা না থাকার অর্থ অজ্ঞ যুগ টিকিয়ে রাখা। ইতিহাসে এমন অধ্যায় এলে বলা হয় অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে। এমন আঁধার নেমেছিল ৪৯৯ এবং ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় ঈশ্বর সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড ধারণার একমুখী চিন্তার বিপন্নতা সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিপন্ন প্রথার ঘাতক আর্যভট্ট এবং গ্যালিলেও। তাঁরা শৈশব সারল্যে শৃঙ্খোচিত কুঠারাঘাত করলেন। আর্যভট্ট পরীক্ষালব্ধজ্ঞানে জানালেন রাহু কেতুর ক্রোধানলে নয় গ্রহণ হয় সূর্য চন্দ্র এবং পৃথিবীর একই সরল রেখায় কাছাকাছি থাকার কারণে। গ্যালিলেও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আহৃত জ্ঞানে ঘোষণা করলেন, হ্যাঁ কোপারনিকাস তুমি সত্য। পৃথিবী ঘুরছে। দুজনকেই হেনস্থা এবং শাস্তির খপ্পরে পড়তে হয়েছিল। আর এ সংবাদও বিদিত যে জ্ঞান অর্জনের জীবনবিমা হচ্ছে গণতন্ত্র। চিন্তার স্বাধীনতা হননের অর্থ আবিষ্কার এবং সঙ্কট মোচনের পথ উদ্ভাবনের উৎস বন্ধ করা।

উল্লেখ্য যে হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন জ্ঞানেই মুক্তি। সেই সূত্রেই চিন্তার স্বাধীনতায় বিষম শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মতে "মানুষ কোথাও কোনকালে নিখুঁত হতে পারে না।" তিনি বলছেন, "তাই প্রবল কর্তৃপক্ষীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকায়তবাদ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের বঞ্চিত জনতার জীবনবোধকে প্রকাশের প্রয়াস করেছে।"—মার্কসবাদ ও মুক্তমতি।

অথচ স্তালিনের গণতন্ত্র বিমুখতা যে হীরেন্দ্রনাথের মৌল সমালোচনা থেকে যে রেহাই পায় বা একপ্রকার উদাসীনতায় পলকা গুরুত্ব পায় তার উৎস কী।

হীরেন্দ্রনাথের মনের হদিস দুর্লভ নয়। তাঁর মনোভূমির আদ্যপান্ত ছিল এক নির্দিষ্ট স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় ঘোর ঘোর অনুভব। শোষিত শ্রেণীকে রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনে শুধু আরোহণ নয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রূপকার হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে তাঁর ছিল ব্যাকুলতা। তাড়া একদিকে থরথর অপেক্ষা অন্যদিকে সোভিয়েত জনগণ—যাদের জীবনে চার কোটি জীবনের অবক্ষয়, ধূসর স্মৃতি। রিক্ত বর্তমান এবং শত্রুবেষ্টিত ভৌগোলিক সত্তা। করুণ মানচিত্র। পুরুষকারের প্রতি হীরেন্দ্রনাথ ভরসা রেখেছিলেন। তাঁর পৌরুষ সাধনা তৃপ্ত হয়েছিলো স্তালিন ব্যক্তিত্বে। যে স্তালিনের চোখে অর্জুনের একাগ্রতা। মাছবিদ্ধ চোখ উত্তরণমুখী। রাশিয়ার শ্রমিক সত্তা রাশিয়ার ভৌগলিক সত্তা যার একমাত্র আরাধ্য বিষয়। লক্ষ্যই কাম্য আর সব ব্রাত্য। উপায় নিয়ে কোনও সংস্কার নেই। যেন উক্তীয়র কণ্ঠস্বর : ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে, জানিনে —শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি।

নিঃসন্দেহ নিশ্চিতি লক্ষ করে স্তালিন গড়ে তুলেছিলেন নিচ্ছিদ্র প্রাকার। হীরেন্দ্রনাথ এই অমোঘ নিশ্চিতির সংকল্প স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে

ধর্মের দোহাই দিয়ে এই অপকর্মটি সংগঠিত হয়। তাঁর ভাষা ধার করে বলা যাক, "নিশ্চিতির কথা জোর গলায় বলতে না পারলে বোধ হয় বহুজনকে চরম উন্মাদনার আস্বাদ দিয়ে কাজে নামানো যায় না—সে নিশ্চিতি ভগবানের কিংবা ইতিহাসের নামেই ধর্ম এবং কমিউনিজম প্রচার করে এসেছে।"—মার্কসবাদ ও মুক্তমতি।

হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন 'জানাতেই মুক্তি'। আস্থা রাখেন গ্রিক বচনে 'জ্ঞানই শক্তি'। মুক্তমতি এবং মার্কসবাদ প্রবন্ধের এই হচ্ছে নির্যাস। এ থেকে স্পষ্ট হয় তাঁর স্তালিনপ্রীতিকে তিনি স্থান দিতে উৎসুক যুক্তিনির্ভরতার ওপর। স্তালিন সংখ্যাগুরু—লঘু মতামতের ধার ধারতেন না। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনে এই প্রথা মোটেই খাপছাড়া নয়। লেনিনও অন্তত দুবার, এক, NEP-প্রসঙ্গে এবং দুই, জার্মান শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে দলে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও নিজের মত দলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদ পূর্ণতা পায় প্রতিষ্ঠার কোলে। স্তালিনকে বুঝতে এটাই হচ্ছে তোরণপথ। হীরেন্দ্রনাথ এই সার সত্য বুঝেছিলেন। লক্ষ্যে স্থির থাকা বিপ্লবী ধর্ম। সেদিক দিয়েও স্তালিন ছিলেন সাচ্চা বিপ্লবী। এটা হীরেন্দ্রনাথের কাছে নেতৃত্বের আকর্ষণীয় দিক।

সংগঠনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি যেমন মনে করেন সংগঠনের চরিত্র হচ্ছে বহুত্ববাদী ব্যবস্থা উপেক্ষা করা। একই সঙ্গে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির স্বচ্ছতায় এও ধরা পড়েছিল যে উক্ত সত্যের ছায়ায় আরো এক গূঢ় ছায়া আছে। আছে অনির্ধারক অংশ। তা হল ভবিতব্যের আশায় হাত ধুয়ে বসে থাকার ধরতাই মানলে মানবমুক্তির কালসীমা একচুলও হ্রস্ব হবে না। তাই তাঁর একদিকে উষ্মা পাশাপাশি প্রত্যয়। উদ্ধৃতি আশ্রয় করে হীরন্দ্রেনাথ মজা করে বলছেন, "God has a Problem because his will must be implemented through human beings–।" সমাজতন্ত্রকেও সমস্যাটা ভোগ করতে হয়। নিজেকে ফোটাতে সমাজতন্ত্রেরও চাই মধ্যস্থতা। সংগঠন হচ্ছে সেই যোগসূত্র। বিকল্পহীন সহায়।

একদিকে দুঃখ জর্জরতা, বিধুর জীবন, অন্তহীন আশা—অন্যদিকে সাম্যবাদের হাতছানি। মাঝখানে যোজকের মতো সমাজতন্ত্রের জোড়। দিগন্তের নব দিকচিহ্ন। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা জোগাতে এই মন্ত্র ধন্বন্তরী। মন্ত্রটা ঠিকঠাক জনসমাজে চারিয়ে দিতে বিপুল আয়োজন জরুরি। সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আয়োজন পূর্ণতা পায়। কিন্তু সেই ভিড়ে বিশিষ্টতার জোরে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন পুরোহিত। প্রতিভূ। এই বিশিষ্টতা স্তালিনে প্রত্যক্ষ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

যে বাস্তবতায় ব্যক্তি স্তালিনের রূপান্তর হয়েছিল স্তালিনবাদে—কেমন সে বাস্তবতার স্বরূপ। নজর দেওয়া যাক সোভিয়েত সমাজে।

তছনছ সোভিয়েত সমাজ। শিল্পায়নের যে স্বল্প পরিকাঠামো ছিল তা বিনষ্ট। জমির কর্ষণযোগ্যতা অবক্ষয়ী। গৃহযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধর পরিণতিতে জমির ওপর পড়েছে অনুর্বরতার আস্তরণ। শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে খরার প্রার্দুভাব। স্তালিনের সামনে দুটো রাস্তা খোলা। প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করে উৎপাদনব্যবস্থা শুরু করায় হিসেব কষে দেখা গেছে

এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদনব্যবস্থা চালু করতে কমসে কম দশ বছর লেগে যাবে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সঙ্গীন। সৈন্যদের পায়ে বুট নেই। যুগোপযোগী অস্ত্র নেই। লাল ফৌজ গড়তে হবে। একদিকে উন্নত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পাশাপাশি আর্থিক উন্নয়ন—উভয় কাজই জরুরি হিসেবে যোগ্য হয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিকল্পনার যোগ নিবিড়। বিনিয়োগ-উৎপাদন-বাজার। শ্রম-মজুরি-উদ্বৃত্ত মূল্য-লাভ। দীর্ঘমেয়াদী জটিল প্রক্রিয়া। এদিকে জনসমাজ তেতে আছে। উপোস ভঙ্গের তাড়নায় ছটফট করছে। তর নেই। আপৎকালীন সময়। ক্রমে ক্রমে নয় লাফিয়ে লাফিয়ে গন্তব্যে নীত হতে চাইলেন স্তালিন। একই সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ এবং উৎপাদনব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগী হলেন। অধিক তৎপরতায় পোক্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গঠিত হল। মূলধন সংগ্রহের জন্য কৃষি সম্পদ আহরণ করে ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করলেন। এইভাবে স্তালিন বর্তমান চাহিদা ও বাস্তবতাকে মূল্য দিলেন। অর্থাৎ জনগণের মানসভূমি স্পর্শ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিলেন।

৬

সোভিয়েতের সামাজিক উপাদান, পার্টি সংগঠন এবং কর্মীসংকলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও কোনও মহল থেকে স্তালিনকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন স্তালিন এক 'ঐশী' মহাশক্তিমান বা শয়তানী ক্ষমতার অধিকারী। অনিষ্টের গোদা। স্তালিনকে সহজভাবে গ্রহণ না করার আড়ালে আরো এক নিভৃত কারণ আছে। যার অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক খুপরিতে। স্তালিন মুচি বংশোদ্ভূত। অ-ইউরোপীয়। আকৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কুলুজি—যা কিছু আভিজাত্যের দ্যোতক স্তালিন সে বিষয়ে প্রতিবন্ধী। এদিকে পার্টির আকাশে তখন ট্রৎস্কি বুখারিন প্লেখানভ মলোটভ জুকভ প্রমুখ তাবড় তাবড় নেতার আসর। প্রসিদ্ধ গ্রন্থবিদ এবং বিপ্লবের মহান সব কুশীলব। লেনিনের বাতাবরণ অপসৃত হলে কুলীন সংস্কৃতি জমি পায়। স্বদেশ এবং বিদেশে যার ঠেক বিস্তৃত।

এখানে হীরেন্দ্রনাথ অন্যথা। নিম্নবর্গের প্রতি টান শ্রদ্ধা তাঁকে দান করেছে নির্মোহ বিশ্লেষণের মনোবৃত্তি। যে মূল্যায়নের দাবিতে আভিজাত্য প্রথা আস্কারা ভোগে। স্তালিনকে তিনি খাড়া করেছেন ইতিহাসের কালপটে। ফলে সাব-অলটার্ন তাৎপর্য পেয়ে যায় তাঁর নিরীক্ষণ।

স্তালিনের সাংস্কৃতিক মনোভূমি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ। তিনি তুলনা করতে প্রসঙ্গ টেনেছেন মাও সে তুং। চীনের সভ্যতা ভারতবর্ষের মতোই প্রবীণ। উভয় সংস্কৃতিতে মিলে মিশে আছে ধৈর্য সহনশীলতা বহুমুখী চিন্তার প্রবাহ। অপেক্ষার আগ্রহ। মাও যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার স্তালিন তা থেকে বঞ্চিত। বহুমুখী জীবনচর্চার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রথা—যে কনফুসিয়াস ঐতিহ্য চীন এবং ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে লেপটে আছে, বিবিধের মাঝে মিলনের ঘরানা যা চীন এবং ভারতবর্ষের ঘরকন্না। স্তালিনের রাশিয়া সেই একান্নবর্তী ঘর গৃহস্থালীর সঙ্গে পরিচিত নয়। ঐতিহ্য-বিরহ স্তালিনের মানসিক গঠনকে গড়ে তুলেছিল নিষ্ঠুর, চটপটে, অস্থির। ব্যস্ত। এমনই ঐতিহাসিক পটভূমিকার ইশারা হীরেন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'চরৈবেতি চরৈবেতি' প্রবন্ধে।

স্তালিনের কিছু কাজে বিশ্বজনমত থতমত। যেমন ১৯৩৯ সালে জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি। সাম্যবাদী এবং সাম্যবাদীদের প্রতি প্রশ্রয়শীল শিবির হতবিহুল। গালে বিরাট থাপ্পড় পড়ল। নাৎসি নায়ক হিটলার হয়ে যাচ্ছে সখা। ভাবা যায়! ছি ছি। বিপ্লব আর ধোয়া তুলসি রইল না।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আরো এক প্রসঙ্গ। জার্মানী এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে সহযোদ্ধাদের তেমনভাবে স্তালিন নাকি সাহায্য করেননি। গুরু ভাই গুরু ভাইকে না দেখলে কোথায় আমার বাস। বলশেভিক প্রত্যাশা আলুথালু হয়ে যায়। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে চোখ সয়ে এলে অনুধাবন করা যায় এতে এমন কিছু চমক নেই। তথাকথিত তত্ত্বের বিশুদ্ধতায় পলি পড়েছে অনেক আগেই। বিপ্লবের পুরোধা লেনিনের আমলে। দুবার। একবার, NEP প্রচলনে। ট্রৎস্কি রেগে কাঁই। একী! সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত স্বত্ব? পুঁজিবাদের পুনর্বাসন হয়ে যাচ্ছে না! তত্ত্বের কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ট্রৎস্কির যুক্তি হয়ত প্রবল। কিন্তু বিপ্লবকে লোকান্তরে পাঠিয়ে বিপ্লবীতত্ত্বের কৌমার্য রক্ষা করা লেনিনের কাছে বাতুল গণ্য হল। ধ্বংস অলংকৃত বৃহত্তম সমাজ কৃষকের 'সোভিয়েত রাষ্ট্র'-কে রক্ষা করাই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পায়। দ্বিতীয় বার, বেস্টলিটোভসক চুক্তি। এ ব্যাপারেও ট্রৎস্কির আপত্তি। তাঁর কাছে এই চুক্তির অর্থ জার্মানীর কাছে টুপি খুলে দেওয়া। লেনিন আপত্তি পাত্তা না দিয়ে চুক্তি করেছিলেন। লেনিন চেয়েছিলেন যুদ্ধের আবহ থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে রাখতে।

স্তালিন লেনিনের এই ধারার উত্তরসূরী। তত্ত্ব পরিষেবা নয় লক্ষ্য পরিষেবার প্রতি অনুরক্ত। অনাক্রমণ চুক্তি করে স্তালিনও চেয়েছিলেন যুদ্ধের পরিমণ্ডল থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন রাখতে। স্তালিন সংবাদ পেয়েছিলেন পশ্চিমী দুনিয়া ষড়যন্ত্র করছে জার্মানীকে রাশিয়ার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত করে দিতে। অহরহ কূটাভাস চলছে নাৎসি নায়ক হিটলার যেন বলশেভিক নায়ক স্তালিনের অস্তিত্ব ও প্রকাশকে ভোগে পাঠিয়ে দেয়। একপ্রকার ভীতি-বিহ্বল মনস্তত্ত্ব স্তালিনকে প্ররোচিত করেছে হিটলারের সঙ্গে আপস করতে।

আসলে স্তালিনের কাছে সোভিয়েত ছিল বিশ্বমঞ্চ। "আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।"

সর্বজনীন মানবসমাজের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত জনসমাজকে সংস্থাপন করা গেল না বলে আক্ষেপ প্রসূত অভিযোগে স্তালিনকে অভিযুক্ত করার অর্থ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো। বিজ্ঞান সাধনা দেশকাল নিরপেক্ষ। কিন্তু সমাজ বিপ্লবীদের জাতীয়তাবোধ অমোঘ। তাছাড়া 'শ্রমজীবীদের দেশ নেই' বলে কমিউনিস্ট ইসতেহারে ঘোষিত তত্ত্ব অনেক বছর আগে থেকেই শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে। ১৯১৭ সালে জন্মলগ্ন থেকেই লেনিনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন'। এমনকী জাতীয় সংগীত হিসেবে সর্বহারার আন্তর্জাতির সংগীতও কল্কে পায়নি। স্থান পেয়েছে রুশী নায়কদের গৌরবগাথামূলক দেশজ সংগীত। বিশ্বজনীন শ্রমিক শাসনের আশাতুর ছলনে ট্রৎস্কি আপন সন্তান বিপ্লবকে জঠরস্থ করতে মহাকাব্যিক স্বপ্নাবিষ্ট ছিলেন।

ট্রৎস্কির ঠিক বিপ্রতীপ ধারায় অবস্থান ছিল স্তালিনের। সময়ের কাছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কাছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁর সমূহ মেধা কর্মদক্ষতা আকাঙ্ক্ষা উৎসর্গীকৃত। হীরেন্দ্রনাথের কাছে এটা কোনও বিচ্যুতি নয়। বরং পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের যে-কোনও বিপ্লবীর এ হচ্ছে সাধারণ পাঠক্রম। তাই হীরেন্দ্রনাথের কাছে স্তালিনের এই মনস্কাম ভ্রষ্টতা নয় বাস্তব চেতনার ধারক হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। কাজেই স্তালিন 'জাতীয়তাবাদী'—এই কারণে স্তালিন চরিত্রে ডাকিনী সন্ধান অমূলক। দ্বিজত্ব তত্ত্বের স্বভাব। ভাবরাজ্যে সে কাব্যিক। মাটিতে নামলে স্থূল বনে যায়।

সোচ্চার হতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আড়ি পাতলে শোনা যায় মানুষ যে হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। মানুষ চাইছে অবাধ গণতন্ত্র। উন্নত জীবনযাত্রা। চাহিদার উন্মেষ সহসা নয়। উর্বর পটভূমি আছে। যার ঐতিহ্যসূত্র ১৯২৮ সাল। পরিকল্পিত অর্থনীতির গতিপথে। ভারী শিল্পের অনুসৃতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল। তারই পথ ধরে নাগরিকরা ব্যাপক গণতন্ত্রের চাহিদা এবং উন্নত জীবনযাপনের আসক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই পর্বের সফলতাই পরবর্তী অভাববোধের প্রসবী।

এখানেই কিছু চিত্র উঁকি দেয় যা নিরতিশয় অস্বস্তির কাঁটা। বিকল্প পথের সন্ধান, ভিন্ন মতের প্রকাশ, জীবনচর্চা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর দলীয় অনুশাসন। পদে পদে বিধিনিষেধ—যেয়ো নাকো ঐখানে কোর নাকো ঐ কাজ। বিচরণভূমিতে খড়ির গণ্ডী। লক্ষ্মণ রেখা। ডিঙোলে কাঠোর শাস্তি। অনেকে দণ্ড ভোগ করেছেন। অনেকে শাস্তির আতঙ্কে হয়ে গেছেন শম্বুক। জ্ঞানীরা মেধা বুদ্ধির ডিপোয় ঝাঁপ ফেলে দিয়েছেন। বিপন্ন হয়েছে রাশিয়ান আত্মা। লাঞ্ছিত হয়েছে মানবাধিকার।

খুচরো অবক্ষয় টুকিটাকি বিচ্যুতিকে হীরেন্দ্রনাথ ছাড় দেননি। পড়া দেখা শোনা এবং অভিব্যক্তিতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। লেখনী বাচন আলাপচারিতা নানান আঙ্গিকে তিনি প্রকাশ করেছেন আপত্তি। তবে সত্যি বলতে কী বৃহৎ স্বার্থের আনুগত্যে তিনি তাঁর মননক্রিয়ায় স্তালিন বিচ্যুতিকে প্রধান স্থান দখল নিতে দেননি। বৌদ্ধিক অভিযানে উৎখাত করেছেন স্তালিন বিরূপতার ভগ্নস্তূপ।

৭

মানুষ হচ্ছে সামাজিক পটভূমির টানাপোড়েনে গড়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন জটিল সত্তা। নিখুঁত সত্তা বলে কিছু নেই। পূর্ণাঙ্গতার অন্বেষণ আছে। অবসান নেই। পরিমিত মানবতার আশ্রয়ে হীরেন্দ্রনাথ ব্যক্তির মূল্যায়নে উৎসুক। তাঁর ভাষা কর্জ করে বলা যায়, "—মানুষের মনে দেহে আছে আশ্চর্য শক্তি, আশ্চর্য প্রসন্নতা, আশ্চর্য নীচতা, আশ্চর্য সহনশীলতা, আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা, আশ্চর্য মহানুভবতা।" তিনি ব্যথিত হন লক্ষ করে যে একদা স্তালিনকে কোনও কোনও পক্ষ "অভ্রান্ত, সদাবিশুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ.......বলে চিহ্নিত করে মানবাধিকার এলাকা থেকেই বাইরে বসিয়ে মান্য করার রেওয়াজ চালিয়েছিল। ......বলে চিহ্নিত করে মানবাধিকার এলাকা থেকেই বাইরে বসিয়ে মান্য করার রেওয়াজ চালিয়েছিল।" —(অল্পে সুখ নেই) এখন তারাই আবার এক পক্ষের স্তালিনকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অপরিণামদর্শী দানবিক

বলে আখ্যাত করার দিকে প্রবল প্রবণতা। উভয় মনোভঙ্গী হীরেন্দ্রনাথের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে একটেরে। তাঁর প্রত্যয় সত্যানুসন্ধান নয় প্রসাদ ভিক্ষুতা ঈদৃশ মুমূর্ষু মনোবৃত্তির সৃজনকেন্দ্র। ব্যক্তিচর্চা প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের মতামতের ঝোঁক হচ্ছে : যে ঐতিহাসিক ভৌগলিক সমাজের মাটিতে ব্যক্তির পা প্রোথিত—সেই কালপট থেকে পদযুগল ছিন্ন করে ব্যক্তিসত্তার ঠিকুজিচর্চা হয়ে যায় নিরাকার। মনে রাখা দরকার স্তালিনের রাজত্বকাল যার সূচনাপর্ব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্ব। ব্যাপ্ত পাঁচ দশকের প্রথম পর্ব অবধি। অর্থাৎ বৃহদাংশ শিল্পযুগের অন্তর্ভুক্ত। শেষ ক্ষুদ্রাংশ প্রযুক্তি যুগের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। যদি বলা যায় স্তালিন নেতৃত্ব সোভিয়েত সমাজ থেকে উদ্ভূত 'প্রয়োজনাত্মক অভিব্যক্তি' এবং নতুন যুগের প্রয়োজনাত্মক তাড়াই গর্ভসঞ্চার করেছে স্তালিনবাদ অন্ত্যেষ্টির। এই ব্যাখ্যাই কি যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের ঘনিষ্ঠ শরিক হয়ে যায় না।

প্রশ্ন উঠে আসে কী সেই নবজাত দাবি—অনুভব?

ইতিপূর্বে দৃষ্টান্তমূলক হয়নি যে অবয়ব তা হচ্ছে সমাজ-সংস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভুত্ববাদের ঘরানায় অভ্যস্ত মানুষ রাজনৈতিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। অর্থনীতি-লোকাচার-রাজনীতির মিলিঝুলি সহবাস হচ্ছে সমাজ। যত প্রকার নীতির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বন্ধন তার মধ্যে আর্থিক বন্ধন সবচেয়ে নিবিড়। ধনবিদ্যার ভূমিকা নিয়ে উপক্রমণিকায় ব্যাপক গ্রাহ্যতা সুলভ। উপসংহার নিয়ে নানা মুনির নানা মত। রাজনীতির উপজীব্য বিষয় অর্থনীতি। রাজনীতির আঙিনায় এসে অর্থনৈতিক শাসন এবং অনটন বশ্যতামোচন করতে পারলেই মানব মুক্তি কূল পায় না। বৈভবী সমাজ তাক করলেই এর সত্যতা স্পষ্ট হয়। বৈভবী রাষ্ট্রেও এমন সমাজ হয়নি যে সমাজ 'বসুধারে রাখে নাই খণ্ড খণ্ড করি'। ভোগবাদ যত পুষ্ট হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রীতিনীতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পৌরসমাজ লোকাচার বিধৃত জনসমাজ ঝুরঝুর হয়ে যাচ্ছে! এ হচ্ছে প্রযুক্তির সংহার রূপ। প্রযুক্তির যুগে সমাজের স্থান দখল নিচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এই পটভূমিতে ইতিউতি নতুন চিন্তার ছায়া পড়ছে। খোঁজ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিকল্প সন্ধান। বিকল্প সন্ধানীদের ব্যাখ্যায় রাজনীতি কারবার করে ধনবিদ্যা নিয়ে। চায় শাসক হতে, শাসকের ধর্মই প্রভুত্ববাদ। ঠারে আড়ালে প্রকাশ্যে প্রকারভেদ যাইহোক। এই ধর্ম রক্ষার্থে যে তাণ্ডব চলে তার নিত্য বলি শত শত নিরীহ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডব নৃত্য।' কার স্বার্থে? জবাব খুঁজতে নব্যবাদীরা রাজনীতির দিকে আঙুল তুলছেন। ঠিক-বেঠিক প্রশ্ন অবান্তর। বাস্তব হচ্ছে এ যুগের আধারে বিগত যুগের উৎপাদন স্তালিন ভূমিকা কতটা খাপ খায়। কোনও রাজনীতিক যত শক্তিধরই হোন না কেন মৌল পরিকাঠামোর ঊর্ধ্বে নয়। স্তালিনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য তাঁকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উন্মূল করে ঊর্ধ্বে স্থাপন করার চেষ্টা অপচেষ্টা।

এই চেষ্টা থেকে নিরত থেকে হীরেন্দ্রনাথ স্তালিনকে স্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধের কালপটে। পরীক্ষকের দৃষ্টিতে স্তালিনকে যাচাই করেছেন। যাচাই-এর কষ্টিপাথর স্তালিন টায়েটুয়ে নয় উঁচু নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ। সফল চরিত্রের কেমন সে প্রকৃতি?

তালিকা দীর্ঘ। এককাট্টা করলে সার হচ্ছে স্তালিনের গঠন প্রক্রিয়া। আধুনিক সোভিয়েত নির্মাণ। গৃহযুদ্ধের সফল মোকাবিলায় যার নেতৃত্বে অভিষেক। রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে নাৎসি শক্তির হাত থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করেছিলেন। জার শাসিত সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধতা থেকে সমাজকে মুক্ত করলেন। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশে এই অগ্রসরতা সম্ভব হয়েছিল। জাপানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাত্র চার বছরের অবকাশে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হয়। মহাকাশ গবেষণায় পা রেখেছে প্রথম সারিতে। কৃষি উৎপাদনে সফলতা তুঙ্গে। কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ২০০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে। এককথায় ধনী দেশ হিসেবে আলোকিত ইউরোপের বিকল্প শক্তিকেন্দ্র হিসেবে সোভিয়েত আত্মপ্রকাশ করেছে। অনুন্নত অনেক রাষ্ট্রকে স্বনির্ভরতার আয়োজনে প্রভূত বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক সাহায্য জোগান দিয়েছে। এমনকী, চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যান্ড (যাদের জীবনযাত্রার মান সোভিয়েতের চেয়ে উন্নত), কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশকে ক্রমিক সাহায্য দান করে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পিতৃভূমির দায় বহন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহের কাছে ভরসা হিসেবে বিরাজ করত সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সাপটা হিসেব হচ্ছে একটা কোলকুঁজো সোভিয়েতের এই যে খাড়া কাঠামো—তার স্থপতি স্তালিন। আর একটা বিষয়েও হীরেন্দ্রনাথ স্তালিনের কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে যে মহাসংকট সংকটাকীর্ণ তা হচ্ছে ভোগবাদ। স্তালিন এই ভোগবাদকে ঠেকনা দিয়ে রেখেছিলেন। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যে অনায়াস জীবনের চাহিদা উপেক্ষা করে স্তালিন যেভাবে মরু অঞ্চলে বনাঞ্চলে সমভূমিতে শিল্পায়ন বিস্তার করেছেন তা ভয়ংকর আশ্চর্যজনক। চোখ ধাঁধানো সুন্দর। এই গঠন প্রক্রিয়া হীরেন্দ্রনাথের সমীহ অর্জন করেছে। পুনর্গঠনকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন সফল নেতৃত্বের ফসল হিসেবে।

কী কী যোগ্যতার সমাহার আদর্শ নেতা হয়ে ওঠার পক্ষে জরুরি! কঠোরতা, স্থির নিশানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, সাহস নির্মমতা, সংগঠন ক্ষমতা ঈদৃশ যোগ্যতার সমাবেশ কাম্য। যা স্তালিন চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। যে যোগ্যতার টান লাইনে দাঁড়ানো বহু নেতাকে টপকে লেনিনকে আকৃষ্ট করেছিল স্তালিন নির্বাচন। এখানে লেনিনের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের মতামতে পূর্ণ সাযুজ্য।

সফলতার ফর্দ এক কথা। এর বাইরে পড়ে থাকে অনেক...অনেক কিস্তু। অনির্ধারক অংশ। অস্বস্তির দিক। গণবিতর্কের আলোচ্য সূচি। যে সফলতায় সোভিয়েত নিপীড়িত বিশ্ব মানবের কাছে দৃষ্টান্তমূলক সেই বাতাবরণ সোভিয়েত জনগণের মনের আকাশ জুড়ে বিস্তারিত কামনার ঘনঘোর ছায়া। ফকিরের বন্ধন ছিন্ন করো আকুলতা। কোষে কোষে চাই চাই হাহাকার। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"

অথচ প্রাণঝর্ণা স্তালিনের এদিকে মনস্কতা নেই। রাষ্ট্রের শক্ত আঁটুনি শিথিল হচ্ছে না আবার আঁটুনি যত শক্ত হচ্ছে ফস্কা গেরো দিয়ে নতুন চাহিদার প্রকাশ ঘটছে। অবদমন

উপবাস ছিন্ন করতে ছটফট করছে প্রবৃত্তি। জীবনমুখী তাড়না তাদের পেয়ে বসেছে। লৌকিক চাহিদাকে হীরেন্দ্রনাথ নিন্দে বা খাটো করেননি। সোভিয়েতের পা তখন শক্ত জমিতে। শুভ সময় চলছে। স্থিতির যুগেও মানবিক সাধ—আহ্লাদের গতিপথ যে কমবেশি অবরুদ্ধ হয়েছিল স্তালিন জমানায় তার আবছা স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'বদ্ধ হাওয়া' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 'সোভিয়েত নব-প্রবোধন প্রয়াস প্রসঙ্গে'-র ছত্রে।

হীরেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক ভুবনে চিন্তন প্রক্রিয়ায় সংকীর্ণতা এবং রক্ষণশীলতা নির্বাস। অখণ্ড সারস্বত সবিনয়ে তাঁর বোধভূমি প্রতিক্ষণ হাট। বিবিধ প্রকার তথ্য ধ্যানধারণা স্বাগত। মার্কস এবং রবীন্দ্রচর্চার আশ্রয়ে তাঁর এই উদার দর্শন। যে প্রশস্ত দৃষ্টির অঙ্গনে স্তালিনীয় শাসনকে বিদ্ধ করার অবকাশ আছে।

নায়কোচিত শুদ্ধতার আবেশ সেঁচে ফেললে কিছু প্রশ্নের এলাকা পড়ে থাকে। গণতন্ত্র প্রসঙ্গ যার শীর্ষে। যৌথ নেতৃত্বে বলতে বোঝায় যুক্তি-তর্ক-আলাপচারিতার সফরি। যে নেতৃত্বের চরিত্রে লগ্ন হয়ে থাকে বিবিধ মতের লতাগুল্মময় প্রশ্রয়। এই নিরিখে স্তালিন আমলে যৌথ নেতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না বলে অনেকের অভিমত। স্তালিন নীতির সঙ্গে বনিবনা নেই এবং ব্যক্তি স্তালিনের সঙ্গে আড়ি এমন নেতারা নানান দণ্ডে অপসৃত। কার্যত সোভিয়েত সমাজ ছিল কর্তার সংসার। কর্তা স্তালিন ছিলেন আনুগত্যপ্রিয় খোলবাদক পরিবৃত। নতজানু মেধা ও শ্রমপ্রত্যাশী। প্রচ্ছন্ন চার্চীয় প্রভাব। ছাঁচের সমাজ নির্মাণ এবং একাত্মবাদ হচ্ছে স্তালিনবাদের মূল স্তম্ভ।

অন্যখাতের অভিযুক্ত প্রবাহ কি উপেক্ষা করা যায়। হীরেন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেননি। ধিক দিয়েছেন। উষ্মা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপত্তিতে বৃহৎ চিৎকৃত প্রতিবাদের আস্ফালন নেই। স্তালিন আমলে গণতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে তাঁর সে নিরীক্ষা—নিজস্ব স্বভাবধর্ম থেকে তা কি ঈষৎ দোলাচল নয়। তিনি কি হয়ে যাচ্ছেন না আত্মবিভাজনের অংশ।

এখানেই গড়ে ওঠে আবছা ছায়া অঞ্চল। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উঠে আসে যে সম্ভাব্য সূত্র তা হচ্ছে : সোভিয়েতের বিংশতম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। স্তালিন বর্জ্য। সোভিয়েত পার্টির এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে C.P.I পূর্ণ সহমত পোষণ করেনি। দ্বিধা জর্জরতায় তালগোল পাকানো ছিল সিদ্ধান্ত। সোভিয়েত পার্টির নতুন দিগদর্শন খারিজ না করেও স্তালিনবাদের প্রতি চোরা টান সিদ্ধান্তে ছায়া ফেলেছিল। CPSU-এর সমর্থনে CPI এক সুরে অবস্থান নেয়নি। এমন অবস্থান নিয়েছিল যা উভয় কোর্টে পা রেখে এক্কা দোক্কা খেলা। যেমন সোভিয়েত পার্টির মূল্যায়নকে স্বাগত জানানো হচ্ছে এইভাবে :—It is evident that Stalin was mainly for the destortions of Soviet democracy and for the violation of in her Party norms." পরক্ষণে পালটি খাচ্ছে অন্যসুরে, "While fully recongising the negative features and grave defects that developed in Stalin's methods of leadership the central committee of communist Party of India considers

that a one sided appraisal of his role during the twenty years of his life, years of mighty developments in the USSR and world communist movement, causes be widerment among the masses, and can be utilised by enemies of communism to confuse them. The central committee, therefore, is the opinion that an objective assesment of Stalin's great achievements and serious shortcomings is essentional for Suceessfully fighting that cult of individual and for effectively combating the Prevailing confusion." দ্বিধা রফা আপসের সুর। যেন প্রবাদ সত্যতার অংশ : রাজারও নহি, সাধুরও ঘাতক নহি।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মুক্তির যে তিনটি সমস্যার সঙ্গে গাঁটছড়া; এক, শোষণ থেকে মুক্তি; দুই, রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি; তিন, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি; এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবলোকন পদ্ধতি যে নাবালক দর্শনে অলংকৃত সে ঐতিহ্যের ছিন্নতা হয় না।

পার্টি সিদ্ধান্তের অবতারণা প্রাসঙ্গিক হয়েছে এই জন্যে যে মনে রাখা জরুরি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদ্যপান্ত পার্টিতে নিবেদিত সত্তা। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নয় ঘোষিত সেবক। নিয়মানুবর্তিতায় আবদ্ধ। জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর আবর্তে পার্টি নেতৃত্ব সর্বদা মতামতে ঐকবদ্ধ ছিল না। অনেক সময় সংখ্যালঘু মতামত পার্টি কাঠামো উপচে প্রকাশ্য হয়েছে। তার জন্য বহিষ্কার ভর্ৎসনা সাবধানী চিঠিতে দণ্ড দেওয়ার ঘটনা বার বার ঘটেছে। শৃঙ্খলার প্রশ্নে হীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সতর্ক। সাংসদ হিসেবে পার্টির সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে কখনও পড়তে হয়নি যাতে মৃদু দণ্ডও ভোগ করতে হয়। এই প্রেক্ষাপট খেয়াল রাখলে যে প্রশ্নটা খচখচ করে তা হচ্ছে : শৃঙ্খলার বন্ধনে তিনি কি ঈষৎ আড়ষ্ট, শম্বুক? পার্টির অন্তর্গত দ্বিধা-দ্বন্দ্বই যে তাঁর ভাবজগতে সঞ্চারিত হয়নি তাই কি হলপ করে বলা যায়। বাধ্যতা আসে ধর্তব্যে যে, হীরেন্দ্রনাথের মানসিক গঠন প্রকৃতির যা স্বরূপ যাতে মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার নৃত্যচটুল ছন্দ নন্দিত। লেখনী এবং বাগ্মী সূত্রে তিনি তার ছাপ রেখেছেন। কিন্তু স্তালিন আমলে সংগঠিত ব্যক্তিস্বাধীনতার অবক্ষয় জোরালো প্রতিবাদ যোগ্যতা পায় না। ইতিহাসে সাক্ষ্য আছে স্তালিন রাজত্বে বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক (যার মধ্যে শলোকভ, শাখারভ, পাস্টেরনাক, বুখারিন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আছেন) সৃজনশীলতার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন।

অনুমান হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন কোনও ব্যক্তি তা সে যত বড় শক্তিশালী ব্যক্তিত্বই হোন না কেন—সমাজের যে ঘটনাগুলো ঘটে তা ঘটতে থাকে সমাজের নিজস্ব নিয়মে। ব্যক্তির যোগ্যতা বিচ্যুতি—অভিলাষ ইত্যাদি সে জটিল ঘরকন্না থেকে বিযুক্ত। এই পরম্পরার ধারক স্তালিন। তাঁর আমলে গণতন্ত্রের লাঞ্ছনা এবং সমাজের ওপর রাষ্ট্রের বাড়াবাড়ি থাবা কটু হিসেবে গণ্য। সামগ্রিক বিচারে বিষণ্ণ অনুভবে সীমাবদ্ধ। একদিক দিয়ে হয়ত হীরেন্দ্রনাথ যথাযথ। কারণ ব্যক্তিগত চরিত্র খুঁড়ে খুঁড়ে সামাজিক বিফলতার উৎস আবিষ্কার করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে নিঃসঙ্গ

ঈশ্বর। অগত্যা ধর ব্যাটা ঈশ্বরকে। হে ঈশ্বর কেন তুমি নাটের গুরু লেনিনকে আরো ২০/২৫টা বছর জিয়ন্ত রাখলে না। অপরাধী খুঁজতে কুশীলব ধাওয়া করার দায় এড়ানো যেত।

তাহলে সমাজ কি স্বয়ংচালিত এমন এক সংস্থা যেখানে মেধা-বুদ্ধি-উদ্ভাবনীশক্তি-খাটনি-কৌশল-ঈপ্সা সব বেকার। সামাজিক পটভূমি সর্বস্ব নিরিখ একমাত্র নিরিখ হিসেবে ধরতাই হলে বিশ্লেষণে ফাঁকফোকর থেকে যাবে। যে ফাঁক দিয়ে মূল্যবান তথ্য পিছনে ধাওয়ার সুযোগ আছে। কারণ রাষ্ট্র সাধারণভাবে এক জনসমাজের প্রতিভূ। অথচ এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিচিত্র ধর্মীসমাজ বিদ্যমান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতি মূল্যবোধ বিনিময় প্রথার প্রকারভেদ আছে। এক রাষ্ট্রের অধীনে এক সমাজ—এমন অস্তিত্ব মরিচীকা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির যে-কোনও ভূমিকাকে সামাজিক পটভূমির উৎপন্ন ফসল হিসেবে দেখলে যাবতীয় কাজই পার পেয়ে যায়। যে-কোনও কাজকে সামাজিকতার দোহারই পেড়ে ছাড় দিলে ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণ একাকার হয়ে যায়। যে কার্যকরী মূল্যবোধ সমাজের ধারক তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিচিত্রতার সহবাস আলগা হয়।

মানুষ তা মানে না। সংবদ্ধ সমাজ গঠনে প্রচলিত হয় রীতিনীতি প্রথা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রকরণ। বহমান সমাজের নিজস্ব ছন্দে যে-কোনও প্রকার ঈশিত্ব সমাজ মান্য করে না। প্রতিক্রিয়া হয়। এখানেই উঠে আগে প্রশ্ন কে অধিক শক্তিশালী, ব্যক্তিত্ব না সমাজ না রাষ্ট্র? এর মীমাংসা অনির্ণায়ক অংশ অদ্যাবধি। কূটবিচার স্থগিত রেখে যেটা উল্লেখ তা হচ্ছে : শিক্ষা-রুচি-উদ্যম-লক্ষ্য-দক্ষতা সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্লেখানভও মনে করেন ইতিহাসের চক্রপথে এক নির্দিষ্ট স্তর অবধি ব্যক্তিসত্তার ভূমিকা মূল্যবান। মার্কসও Economic and Philosopic manuscripts 1844-এ ব্যক্তিসত্তাকে মর্যাদার শিখরে স্থান দিয়েছেন।

স্তালিনচর্চার নেপথ্য প্রস্তুতি হিসেবে এইসব বৈশিষ্ট্য প্রাপ্য মর্যাদা পেলে স্তালিন মূল্যায়নে সুবিধে হয়।

কী সেই বৈশিষ্ট্য? ঘোর তাৎক্ষণিকতা স্তালিন চরিত্রের ধর্ম। ধর তক্তা মার পেরেক হচ্ছে স্তালিনের মানসিক প্রবণতা। ভাবুকতা তাঁর ধাতে নেই। লেখাগুলির মধ্যেও অগভীর মনন এবং লজিক্যাল বিচ্যুতির ছাপ আছে। গ্রন্থবিদ ছিলেন না তিনি। অন্তত এই অর্থে যে তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছ লেখক হিসেবে তাঁকে প্রসিদ্ধ করেনি। আগাগোড়া তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। সমগ্র কর্মকাণ্ডের মূল আকর্ষণ ছিল রুশপ্রীতি। স্তালিনের উগ্র জাতীয়তাবাদ কর্মযজ্ঞের বাড়াবাড়ি বা উপছে পড়া অংশ নয়। তত্ত্বগত বনিয়াদ আছে। নেশন সম্পর্কে স্তালিন তাঁর 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' রচনায় নেশন সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিলেন তাতে গতিশীলতা নেই আছে স্থিতিশীলতা। নেশনকে স্থায়ী রূপ দেয়ার নির্দেশ আছে। কিন্তু লেনিনের দৃষ্টিতে ছিল অন্য ইশারা। তাঁর মতে একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নির্ভর করছে সেই শ্রমিক সমাজের স্বার্থ ও মঙ্গলের ওপর। এই অধিকার ধ্রুব নীতি হতে

পারে না। স্তালিনের চিন্তা যে খুবই বাস্তবঘেঁষা, পৃথিবীর মানচিত্র তার পরিচয় দিচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা বাড়ছে। ভবিষ্যতে জাতীয়তবাদ বা দেশের সংখ্যা হ্রাস পাবে কি-না; অবলুপ্ত হয়ে যাবে কি না 'দেশ'জনিত ভাবকল্প তার উত্তর জমা আছে সময়ের গর্ভগৃহে।

স্তালিন চরিত্রের আর এক দিক হচ্ছে লক্ষ্য সর্বস্বতা। পাঁড় আদর্শবাদী ছিলেন তিনি। অনেকে মনে করেন আত্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে সমুদায় উপাদান হচ্ছে প্রসূতিসদন। ঈদৃশ উপাদানের সমবায়ে এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে স্তালিন সমর্থ হয়েছিলেন লৌহরাষ্ট্র নির্মাণে। স্তালিন চরিত্রের এই নির্ণয় হয়তো অনর্থক নয় আবার বিতর্কও উসকে দেয়।

অভিজ্ঞতা হচ্ছে নেতা বা নেতৃত্বের ব্যর্থতা বা সফলতা বহু মানুষের সমর্থনের ফল। তাছাড়া যে-কোনও সমাজ বিপ্লব কী ফরাসি বিপ্লব কী লাটিন আমেরিকার বিপ্লব ভুল করতে কোনও ভুল করেনি। জটিল সংকটাকীর্ণ পরিস্থিতিতে ইহাও হয় উহাও হয় আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে বিধির বাঁধন ছিন্ন করার দায় এড়ানো নিষ্ক্রিয়তা প্রতিবন্ধী চেতনার দ্যোতক। যে কাজ করে তার ধর্ম নয়।

বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত পার্টির অঙ্গীকার ছিল সাতের দশকে সমাজতন্ত্র পূর্ণতা পাবে। হল অকাল প্রয়াণ। সত্তর বছর কাবার হতে না হতেই পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে গেল খরচায় খাতায়। কিন্তু ঘটনাটা ২০০১ সেপ্টেম্বর ১১-এ আচমকা বার শত্রুর বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত পেন্টাগণের অগ্রজ প্রতিরূপ নয় কোনও ক্রমেই। রুশী নবায়নে ভাসানের আয়োজন চলছিল নিঃশব্দ চরণে। দীর্ঘদিন ধরে। গর্ভসঞ্চার হচ্ছিল সমাজের অন্তর্গতে। কাঠামোর খাঁজে খাঁজে ঘাপটি মেরে বসতি গেড়েছিল অসুখ। অবহেলো অবজ্ঞা উপেক্ষার সমৃদ্ধ রসে সোমত্ত হয়ে ঝাঁঝরা করে দিল গঠন। অবশেষে বৃহৎ বিনষ্টি।

কোন পথে উঠে আসতে পারে সমস্যার স্বরূপ এবং যোগ্য নিরসন তার চর্চা এবং চর্চাজাত বিহিতের নৈতিকতা এসে যায়। প্রাসঙ্গিক হয় যে নিয়মের অপরিহার্য উল্লেখ তা হল কোনও সিদ্ধান্তই একশো ভাগ নির্ভুল হতে পারে না। ত্রুটি-বিচ্যুতি-সংশোধন-লয়-বৃদ্ধি নিয়েই প্রবাহ। কাজেই স্তালিন রাজত্বের অমানিশা নিয়ে চিরুনি তল্লাস চলছে। চলুক। এমনকী দীর্ঘ স্তালিন রাজত্ব কেন্দ্র করে এ প্রশ্নও আজ আলোচ্য বিষয় হিসেবে যোগ্য হয়ে উঠেছে যে বিপ্লবী রাজনীতির খোলে গণতন্ত্রের প্রশ্রয় কতটুকু।

আলোচনা চলছে। ধারা অব্যাহত থাকুক। সনাক্তকরণ হোক ভ্রষ্টাচার। উপসর্গ এড়িয়ে সর্গ-তে যেতে হবে। শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু স্তালিনকে খলনায়ক বানিয়ে চাঁদমারি করার যে-কোনও প্রকার উদ্যোগ পৃষ্ঠপোষকতা বিরহে যেন ক্ষান্ত হয়।

লেনিনের কীর্তি যদি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা স্তালিনের অমরত্ব সোভিয়েত নির্মাণে। হীরেন্দ্রনাথের মেধা ও বোধ সঞ্জাত উপলব্ধির এই হচ্ছে সার।

স্তালিন নেতৃত্বের জানুতে মাথা রেখে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যুগপৎ ক্ষীণ আশঙ্কা এবং মহতী আশার দ্বৈত প্রকৃতি ফুটিয়ে তুলতে উৎসুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 = Karl Marks.
২. The Development of the Monist View of History = G. Plekhanov.
৩. মার্কসীয় অর্থনীতির মূলসূত্র = কল্যাণ দত্ত।
৪. বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি = রাজশেখর বসু।
৫. শ্যামা = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬. নৈবেদ্য = ঐ
৭. রাশিয়ার চিঠি = ঐ
৮. সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পুর্নগঠন = কল্যাণ দত্ত।
৯. রাষ্ট্র ও বিপ্লব = লেনিন।
১০. কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার = মার্কস ও এঙ্গেলস।
১১. The Stalin Legacy. = Hiren Mukherjee
১২. নির্বাচিত প্রবন্ধ (১ম, ২য় খণ্ড) = হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৩. স্তালিন = আঁরি বারবুস।
১৪. Resolution adopted by the central committee, CPI-I-II, July 1956
১৫. চেতনা = প্রথম সংখ্যা ২০০২
১৬. যোসেফ স্টালিন শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে = সুশোভন সরকার।
১৭. ডাক্তার জিভাগো = বরিস পাস্টেরনাক।
১৮. শিল্প এবং সমাজজীবন = জি. ডি. প্লেখানভ।

সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ*

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও জননায়কদের নিয়ে জীবনীগ্রন্থ কম লেখা হয়নি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের রচনায় মূলত তথ্য ও লেখকের ভাবাবেগ যে ধরনের মিশেল প্রস্তুত করে সেটি অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। সত্যিকারের বিশ্লেষণধর্মী জীবনীগ্রন্থ যা মননশীল পাঠককে চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে খুব একটা লেখা হয়নি,—এ কথাটি বোধহয় মেনে নেওয়া ভাল। আবার এ কথাও ঠিক যে তথাকথিত জীবনীকারদের ভিড়ের মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজ করেন গুটিকয়েক বিরাট ব্যক্তিত্ব, যাঁদের হাতে পড়ে আপাতদৃষ্টিতে সেটিকে মনে হতে পারে নেহাতই আর পাঁচটা বই-এর মতো একটি জীবনীগ্রন্থ তা হয়ে দাঁড়ায় এক আবেগবর্জিত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ এক চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী রচনা। আলোচিত বইটি তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন, সেটি উসকে দেয় মননশীল পাঠকের চিন্তাকে, যা প্রবলভাবে আলোড়িত করে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ভাবনার জগতকে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুভাষ-ভাবনা সংক্রান্ত এই বইটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি করে অন্তত দুটি কারণে। প্রথমত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অপর দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব যথা, গান্ধীজি ও জহরলাল নেহরু-কে নিয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথের দু'টি বই Gandhiji : A Study এবং The Gentle Colossus : A study of Jawaharlal Nehru আমাদের কাছে যতটা পরিচিত এবং যেভাবে সমাদৃত, আলোচিত বইটির পরিচিত তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, এই বইটি হীরেন্দ্রনাথ লেখেন সত্তরের দশকের শেষে ১৯৭৭ সালে প্রথম দুটি বই প্রকাশিত হয়ে যাবার অনেক বছর পরে এবং স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে : হীরেন্দ্রনাথের নেহরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? এখানে বলে দেওয়া ভাল যে হীরেন্দ্রনাথ নিজেই এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, যার পরিচয় মেলে আলোচিত গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. vi)।

গোড়াতেই আরও একটি কথা লেখক বলে নিয়েছেন : বইটি তাঁকে লিখতে হয়েছে অতি অল্প সময়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে। এ সব ক্ষেত্রে সব সময়েই একটি আশংকা থেকে যায় যে হয়ত বাদ পড়ে যাবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিংবা পরিস্ফুট হবে না কোনও কোনও বক্তব্য। এ ক্ষেত্রে তার কোনওটাই হয়নি। বরং হীরেন্দ্রনাথের লেখার ঐশ্বর্যগুণে অনেক কম কথায় এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যা এককথায় পাঠকের

---

* Hiren Mukerjee, *Bour of Burning Gold. A Study of Subhas Chandra Bose* (New Delhi : People's Publishing House, 1977) 118 pages

বিস্ময় উদ্রেক করে। জীবনী রচনার স্টাইলকে আপাতদৃষ্টিতে অনুসরণ করেও লেখক এখানে মূলত প্রাবন্ধিক, আলোচক ও বিশ্লেষক। তথ্য ও ভাবনার এক বিরল মিশ্রণে জারিত হীরেন্দ্রনাথের সুভাষ-চিন্তা আমাদের গতানুগতিক সুভাষ-ভাবনার ক্ষেত্রেও এভাবেই যোগ করে এক নতুন মাত্রা।

১১৮টি পৃষ্ঠায় সীমিত দশটি অধ্যায় জুড়ে রচিত বইটিতে কিছুটা অবিন্যস্তভাবে ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে বিষয়গুলির আলোচনার খোঁজ আমরা পাই তা এরকম : দেশপ্রেমিক ও আদর্শবাদী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের ব্যাখ্যা; সুভাষের চিন্তায় মতাদর্শগত অস্পষ্টতা ও এই প্রশ্নে নেহরুর সঙ্গে পার্থক্য; সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজী; সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টরা; সুভাষ, নাৎসি জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন; নেহরু ও সুভাষচন্দ্র। এবার দেখা যেতে পারে প্রবন্ধকার হীরেন্দ্রনাথ কীভাবে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রে মধ্যে এক ধরনের মিশ্রণ ঘটেছিল জাতীয়তাবাদ ও বিবেকানন্দের আদর্শাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকতার এবং হীরেন্দ্রনাথের ভাষ্য অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর একরোখা, জেদী ও এক ধরনের আত্মভোলা মনোভাবকে অনেকটা এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। কৈশোরের বন্ধু সঙ্গীতাচার্য দিলীপকুমার রায়কে ব্রিটেনে থাকাকালীন মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের প্রবল কুণ্ঠা ও নির্লিপ্ততা বেশ ভালরকম ভাবিয়ে তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই উদ্যোগে সুভাষকে কিছুটা পরিমাণে এই ঘেরাটোপ থেকে বাইরে টেনে আনা সম্ভবপর হয়েছিল (পৃ. ১৪-১৫)। পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা, বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর অবস্থান অনেকটাই বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মানসিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দুর্বল ভারতবাসীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করার যে ভাবনা বিবেকানন্দকে বিশিষ্টায়িত করেছিল, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ, সামরিক শৃংখলা, সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির প্রতি সুভাষচন্দ্রের আজন্ম ভালবাসার সূত্রটি সম্ভবত সেখানেই নিহিত ছিল।

মতাদর্শগত চিন্তার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের অস্পষ্টতা ভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতাকে হীরেন্দ্রনাথ বিচার করেছেন এই প্রেক্ষাপটে। Indian Struggle বইতে ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যে বিচিত্র মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়, বহুলাংশেই তার অন্যতম কারণ ছিল সামরিক শক্তি, শৃংখলা ও বলদর্পিতার ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদের আদর্শের প্রতি সুভাষচন্দ্রের দুর্বলতা। তার অর্থ আবার অবশ্যই এই নয় যে ফ্যাসিবাদের মানবতাবাদবিরোধী চিন্তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও নৈকট্য ছিল। হীরেন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে নাৎসি জার্মানীর সমর্থন চাইবার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে পরিচালিত করেছিল একদিকে তাঁর নিখাদ দেশপ্রেম ও অপরদিকে মতাদর্শগত চিন্তার অস্পষ্টতা। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত এবং প্রবন্ধকারও স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তাঁর গড়ে তোলা সামরিক বাহিনীর প্রতি নাৎসি জার্মানীর নেতৃবর্গের কোনও ধরনের অসম্মানজনক আচরণ তিনি মেনে নেন নি এবং পরবর্তীকালে এও প্রমাণিত হয়েছে যে নাৎসি জার্মানীতে অবস্থানকালেই হিটলার

সম্পর্কে ধীরে ধীরে তাঁর মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করে। কিন্তু মতাদর্শ নিয়ে সুভাষচন্দ্র কোনও দিনই খুব একটা মাথা ঘামাননি; আর সে কারণেই ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর সুভাষ শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদী জার্মানী, ইতালি, জাপানের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধাবোধ করেননি। মতাদর্শের প্রশ্নে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে হলে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও ধৈর্যশীল মানসিকতার প্রয়োজন, সুভাষচন্দ্রের চিন্তার বৌদ্ধিক কাঠামো ছিল তা থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

আর এই জায়গাতেই নেহরুর সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত প্রশ্নে পার্থক্যের বিষয়টি জরুরি হয়ে দেখা দেয়। হীরেন্দ্রনাথ চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন (পৃ. ৩৮-৩৯) যে ফ্যাসিবাদের বিপদ ও সমাজতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে নেহরুর চিন্তায় যে স্বচ্ছতা ছিল, যে ইতিহাসচেতনা নেহরুকে নিবৃত্ত করেছিল সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদকে একত্রিত না করা থেকে, যে যুক্তিনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করে নেহরু সঠিক মতাদর্শগত অবস্থান নিতে দ্বিধাবোধ করেননি, সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ভাবাবেগ, জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রেই মতাদর্শগত স্তরে তাঁর ভাবনাকে সংকুচিত করেছে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লেখক নেহরুকে বড় ও সুভাষচন্দ্রকে খাটো করার চেষ্টা করেছেন। বারেবারেই যে কথাটি তিনি বলার চেষ্টা করেছেন তা হল এই : জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্ব যদি হাত মেলাতে পারতেন, তাহলে হয়ত ইতিহাস লেখা হত অন্যভাবে। একটা সময়ে অর্থাৎ, তিরিশের দশকের গোড়ায়, সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল হাতে হাত মিলিয়ে Indian Independence League গঠন করলেও পরবর্তীকালে উভয়ের বিরোধ ও বিচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। আর এই ভুল ব্যর্থতা, যাই বলি না কেন,—তার জন্য হীরেন্দ্রনাথ গান্ধী, নেহরু, সুভাষ কাউকেই ছেড়ে দেন নি। গান্ধীর সুভাষ বিদ্বেষ, নেহরুর দোদুল্যমানতা ও গান্ধীর প্রভাবে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা, সুভাষের একগুঁয়েমি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত নেবার প্রবণতা এই ত্রয়ীর সম্পর্ককে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিল (পৃ. ৪৬-৪৭, ৫৫-৫৮)।

বইটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই যে মার্কসবাদী হীরেন্দ্রনাথ একাধারে তথ্যনিষ্ঠ ও নির্মোহ এক বিশ্লেষকের ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই হীরেন্দ্রনাথের সুভাষ মূল্যায়ন এখানে শ্রদ্ধাপূর্ণ কিন্তু ভাবাবেগবর্জিত,—যা পাঠকের পক্ষে প্রকৃতই এক বড় প্রাপ্তি। আর সে কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও তার সংগঠক সুভাষচন্দ্রকে তিনি সেলাম জানান, অভিনন্দন জানান হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে আই. এন. এ-র মঞ্চে একত্রিত হবার ঐতিহাসিক ঘটনাকে এবং তার জন্য সাধুবাদ জানান আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাণপুরুষ সুভাষচন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি এই গভীর দায়বোধকে। আর ঠিক এই জায়গাতেই বোধহয় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আরও একটি কথা : জাতীয়তাবাদ, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির যে প্রভাবই সুভাষচন্দ্রের ওপর পড়ে থাকুক না কেন, ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতপাতের সংকীর্ণতা তাঁকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। অন্য অনেক প্রশ্নে মতপার্থক্য সত্ত্বেও আবার এই জায়গাতেই আমরা লক্ষ করি সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের আদর্শগত নৈকট্য।

পরিশেষে যে বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবি করে সেটি হল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক। মতাদর্শগত চিন্তার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকলেও সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহে কোনও ঘাটতি ছিল না। হীরেন্দ্রনাথের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৯৪১ সালের গোড়ায় তাঁর ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণের সময় পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুভাষের ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট গভীর (ষষ্ঠ অধ্যায়)। মিয়া আকবর শাহ, অচ্ছর সিং চীনা, ভগৎরাম তলোয়ার,—যাঁরা সুভাষচন্দ্রের ভারতত্যাগে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন,—তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত। শুধু তাই নয়, দেশ ছাড়ার পরে জার্মানীতে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে তাঁর হাতে গড়া বাহিনীর একটি সৈনিককেও যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৯ আগস্ট, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত রহস্যজনক মৃত্যুর আগেও তিনি পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে—এই ঘটনা ছিল যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

লেখকের এই আলোচনা যথাযথ। কিন্তু একটি দুটি প্রশ্ন থেকে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে অতিসরলীকৃত ও বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করেছিল, এবং যার পরিণামে সি. পি. আই-কে কম খেসারতও দিতে হয়নি, তার তেমন কোনও উল্লেখ পেলাম না। লেখক নিজে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার সুবাদে এই বিষয়টির উপরে আলোকপাত করলে আমরা উপকৃত হতাম। আরও একটি কথা। বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে সুভাষচন্দ্রের সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছবার গোপন প্রয়াস সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কি কোনও স্তরে অবহিত ছিলেন? এই বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য জানার আগ্রহ ছিল।

কিন্তু সব মিলিয়ে লেখকের সুভাষ মূল্যায়ন পাঠককে অনেক নতুন ভাবনা জোগায়। ভাষার প্রসাদগুণে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ মননশীল পাঠককে চমৎকৃত করে। বইটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অটুট ও অমলিন। এখানেই প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথের মহাসিদ্ধি।

মার্কসবাদ, হীরেন্দ্রনাথ ও মুক্তমতি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৯৫০-এর দশকের শেষ ভাগ, ১৯৬০-এর দশকের শুরু—সময়টা খুব সহজ ছিল না। বাইরের লোকে না জানলেও, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের অনেকেই জানতেন : বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্যে চিড় ধরেছে। যুগোশ্লাভিয়াকে 'শোধনবাদী' বলে মার্কা মারা হয়েছিল অনেক আগেই। হঠাৎ আবার তেড়েফুঁড়ে যুগোশ্লাভ পার্টিনেতৃত্বের বিরুদ্ধে কাগুজে কামান দাগতে শুরু করল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। তার পাশাপাশি, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পার্টি তার চাঁদমারি করল পূর্ব ইওরোপের ছোটো দেশ আলবানিয়ার পার্টিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানেও কায়েম হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

ভেতরের লোকরা বুঝলেন : এ হলো বকলমে লড়াই। আসল বিরোধ বেধেছে সোভিয়েত ও চীনের পার্টির মধ্যে : যুগোশ্লাভিয়ার জায়গায় পড়তে হবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আর আলবানিয়ার জায়গায় চীন।

বাইরের লোকে দেখছেন : বারোটি দেশ সমাজবাদের পথে চলেছে। ১৯৫৭-য় সেই সব দেশের পার্টিনেতারা মিলিত হয়ে একটি সংযুক্ত ঘোষণাপত্র বার করলেন। ১৯৬০-এ পৃথিবীর একাশিটি দেশের পার্টি একত্র হলো মস্কোয়। সেখান থেকে সকলে একমত হয়ে সই করলেন এক দলিলে।

ভেতরের লোকরা কিন্তু জানতেন : এ সবই লোক-ভুলোনো ব্যাপার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের (১৯৫৬) পর কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে নানা বিরোধ, নানা বিভ্রান্তি মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রচ্ছদপটে যতই ঐক্য থাক, ভেতরে ভেতরে চলছে পারস্পরিক দোষারোপ, আর অভিযোগ। এমনকি, কোন্ পার্টি কতটা বিপ্লবী, কতদূর বিশ্বাসযোগ্য—সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এর মধ্যে ১৯৬২-তে হলো ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। কোনো রাজ্যেই আর বিকল্প বামপন্থী সরকার গড়া গেল না (১৯৫৭-য় সেটা সম্ভব হয়েছিল কেরলে)। সীমান্ত নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ চলেছে ভারত আর চীনের মধ্যে। আর বকলম ছেড়ে প্রকাশ্য বিতর্কে নামল চীন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দুই পার্টি। 'খোলা চিঠি' আর পার্টি মুখপত্র-র সম্পাদকীয় মারফত চলল আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণ।

অন্য দিকে এই সময়েই পাওয়া গেল মার্কস-এর তরুণ বয়সে লেখা কয়েকটি নোট বই-এর ইংরিজি তর্জমা : *আর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি* নামে বইটি বেরল মস্কো থেকে। আগেও তার কিছু কিছু অংশ এখানে-ওখানে বেরিয়েছিল। কিন্তু একসঙ্গে পুরোটা পাওয়া যেত না। মার্কসবাদীদের পাশাপাশি নিজেদের জায়গা করে নিলেন মার্কস-তাত্ত্বিকরা। 'তরুণ

মার্ক্স' আর 'পরিণত মার্ক্স' কি দুটি আলাদা সত্তা? প্রশ্ন উঠল এই নিয়েও।

এই সময়েই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন : "মার্ক্সবাদ ও মুক্তমতি" (*শারদীয় পরিচয়* ১৯৬৩)। তার পরের বছর *পরিচয়*-এ বেরল "ভারতবর্ষ ও মানবিকতা", আর তার দু বছর বাদে "ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্ক্সবাদী সংগ্রাম" (*মূল্যায়ন*, ১৯৫৬)। এই তিনটি প্রবন্ধই পরে তাঁর *মার্ক্সবাদ* ও *মুক্তমতি* নামে রচনা সঙ্কলনে (১৯৭২) রয়েছে।[৮]

গোড়া থেকেই প্রথম লেখাটির সুর আত্মসমালোচনামূলক। "যারা সাম্যবাদী তাদেরই চিন্তায় এবং আচরণে বহু দৌর্বল্য, বহু বিকৃতি, বহু অসঙ্গতি, অন্যায় ও অপরাধ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে এবং আজও দিয়ে থাকে"—খোলাখুলি সে-কথা ঘোষণা করেন হীরেন্দ্রনাথ। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের "তূণে যে সবকটি শর আজ ব্যর্থ তা নয়"—একথাও তিনি স্বীকার করেন। তার ভিত্তিতেই তিনি চান : "সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, রুশদেশের রূপান্তর সংসাধনকালে, লেনিন-স্তালিন যুগে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্ব ও কর্মসম্বন্ধীয় কাঠিন্য ও কঠোরতা অবশ্য বোধগম্য, কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের সামাজিক ভারসাম্য যখন কমিউনিজমের অনুকূল না হওয়ার কোনো হেতু নেই, তখন প্রাক্তন এবং সম্ভবত অনিবার্য কঠোরতা ও কাঠিন্যকে বহুলাংশে বর্জন বোধ হয় করা যেতে পারে।" এই চিন্তা থেকেই ভারতের কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে মার্ক্সবাদকে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন হীরেন্দ্রনাথ। চীন ও সোভিয়েত পার্টির মহাবিতর্কে তিনি তখন বীতশ্রদ্ধ : "চীনের কমিউনিস্ট নায়কেরা মার্ক্সবাদের পবিত্রতা রক্ষার নামে তত্ত্ব ও কর্ম উভয়ক্ষেত্রেই যেন দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আর সোভিয়েত পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ব্যাপক ও মৌলিক পর্যালোচনা হচ্ছে না, সমসাময়িক কর্তব্যের দোহাই দিয়ে দুরূহ চিন্তার বালাই থেকে রেহাই পাওয়াই যেন তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।" হীরেন্দ্রনাথ তখন ভরসা করছিলেন পোল্যান্ড ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে। বিশেষ করে পোল্যান্ডের ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর সঙ্গে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি যে বোঝাপড়ায় এসেছে—তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি। তারই খেই ধরে তিনি প্রশ্ন তোলেন : "মানবিকতার যে সম্প্রসারণ কমিউনিস্টদের কাম্য তাকে সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত করতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগ হবে না কেন?"

"ভারতবর্ষ ও মানবিকতা" প্রবন্ধটিও একই সুরে বাঁধা। এর আগের প্রবন্ধে চার্বাক দর্শনের কথা তুলে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কোনো কোনো দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এই লোকায়তিকদেররই উত্তরাধিকার পেয়েছে।" তার পরের প্রবন্ধে বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ—সবকিছু থেকেই তিনি ভারতীয় চিন্তার ইহমুখিতা প্রমাণ করতে চান। তিনি স্বীকার করেন : অবশ্য "এতে মানবিকতা আমাদের চিন্তা ও কর্মধারায় উপস্থিত ছিল বলা আতিশয্য হবে।" তবে তাঁর আসল বক্তব্য এই : "কিন্তু সংসারবিমুখতা বাস্তবিকই কখনও ভারতবর্ষের জীবনকে চিহ্নিত করেনি।" তিনি চাইছেন রামানন্দ কবীর হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব সাধকের "সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা বাড়ুক, নচেৎ এ দেশের মর্মস্থলে প্রবেশ করার মতো ভাগ্য আমাদের হবে না।" তাঁর বিশ্বাস : 'চার্বাকের সূত্রে, বৌদ্ধ দোহায়, "বৈদিক ও অবৈদিক ধারার যুক্ত বেণীতে", ভারতে "হিন্দু-

মুসলমানের যুক্ত সাধনায়" যে সত্য কখনও অস্পষ্ট আবার কখনও উদ্ভাসিত হয়েছে, তারই প্রকাশ, চণ্ডীদাসের অতি পরিচিত পংক্তিতে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" একে শুধু দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণের একটি কাব্যিক বিন্যাস বলে উড়িয়ে দিলে কয়েক হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাকেই অগ্রাহ্য করা হয়।'[২]

এ বিষয়ে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধ, "ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম"-এ একই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। "আমাদের দেশে এমন দুর্দিন চলেছে যখন মার্কসীয় চিন্তা ও কর্মে যাঁদের ব্যাপৃত থাকার কথা তাঁরা যেন আত্মকলহের চাপে সর্বজনের সমক্ষে সতেজে মার্কসবাদের সৃজনশীল ভূমিকাকে তুলে ধরতে পারছেন না।" তাই "মার্কসবাদ ও ধর্ম" নিয়ে বিচারে নামলেন হীরেন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁর মতে : "আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম ও নীতির সঙ্গে বিরোধের পরিবর্তে মিলনের মাধ্যমে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে।" এর মধ্যেই তিনি দেখতে পান এক "দুঃসাহসী পরীক্ষা [যা] থেকে নিবৃত্ত হওয়া নীতিনিষ্ঠা হতে পারে কিন্তু সার্থক মার্কসবাদ সম্ভবত নয়।"

এখানেও এসেছে পোল্যান্ডের কথা। হীরেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন ফ্রান্সের খ্রিস্টান চিন্তাবিদ মুনিয়ে-র বক্তব্য : "খ্রিস্টান আর মার্কসবাদী একত্রে কাজ করুক, বিপ্লব শুধু সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ঘটুক।" এরই প্রতিধ্বনি হীরেন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছেন ভূদান আন্দোলনের উদ্যোক্তা, বিনোবা ভাবে-র একটি উক্তিতে : "বর্তমান জগতে প্রয়োজন হলো রাজনীতি আর ধর্মকে পরিহার করে বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা (spirituality)-কে বরণ করা।" হীরেন্দ্রনাথ নিজেও বোঝেন : "এরকম কথা বেশ খানিকটা ধোঁয়াটে নিশ্চয়"। তবু তাঁর মনে হয়, 'তাই বলে একে "নস্যাৎ" করতে চাইলেও হয়তো পারা যায় না।'

এই প্রবন্ধেও হীরেন্দ্রনাথ চাইছেন ধার্মিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের "প্রকৃত কথোপকথন, যুক্তি ও চিন্তার আদান প্রদান ; তাদের মধ্যে প্রয়োজন সেই দ্বন্দ্ব যা যথাসময়ে আনবে সংশ্লেষণ, সৎ ও স্বচ্ছ বিতর্কের পর হয়তো আসবে সম্বোধি, আর ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সম্ভব ও সহজ ও সৌষ্ঠবপূর্ণ হবে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সহযোগিতা।"

হীরেন্দ্রনাথের এই ধরণের বক্তব্য বাঙলার মার্কসবাদী মহলে সকলের কাছে গ্রাহ্য হয় নি। *মার্কসবাদ ও মুক্তমতি* বইটির সমালোচনায় প্রদ্যোৎ গুহ সবিনয়ে লিখেছেন :

> ....আপাতত অবশ্য ভয়ে ভয়ে একটা কথা না বলে পারছি না, মার্কসবাদের ভারতীয়করণের প্রস্তাবটা হীরেন্দ্রনাথ যেভাবে উত্থাপন করেন তাতে এই সমালোচকের মনে নানা সংশয় দেখা দেয়। কথায় আছে চুণ খেয়ে মুখ তাতলে দই দেখে ভয় হয়। মার্কসবাদের চীনাকরণের যে পরিণাম আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি তাতে এ ধরণের কথা শুনলেই জ্বর আসে। কিন্তু সংশয় শুধু সে কারণেই নয়। মার্কসবাদের প্রকরণ হিসেবে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণের যে প্রস্তাব তিনি করেন তাতে মন সায় দিতে অনিচ্ছুক হয়।"[৩]

মুক্তমতির ধারণাটি হীরেন্দ্রনাথের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বিশেষ একটি কারণে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস (১৯৫৬)-এর আগে অবধি মনে করা হতো : বিপ্লবের পরে শ্রেণী-সংগ্রাম আরও তীব্র হয়। ১৯৫৬-র পরে নতুন নেতৃত্ব মনে করলেন : "সোস্যালিজমের অগ্রগতির আনুসঙ্গিক ফল হল শ্রেণীসংঘর্ষ কঠোরতর না হয়ে ক্রমে হ্রাস পাওয়ারই সম্ভাবনা, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে, কোনো বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়াও অসম্ভব নয়।" এর ভরসাতেই হীরেন্দ্রনাথ বললেন : "এই [পরিবর্তিত] ধারণা যদি ঠিক হয় তো এর গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণীসংগ্রামের পূর্বতন অবস্থান ও চরিত্র যদি এমন পরিবর্তন বহু স্থলে এনে [এসে?] থাকে, তাহলে মার্কসবাদী আন্দোলনের সমরনীতি ও ব্যূহকৌশলে যথাযোগ্য রূপভেদ অবশ্য বিচার্য।"[৪]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এর পরেও কোনো কোনো রচনায় (যেমন, "ভারতচেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা", ১৯৭০) এই প্রসঙ্গে ফিরে এসেছে, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে নতুন নতুন সমরনীতি ও ব্যূহকৌশলের কথা আর বিশেষ আসে নি। তবে ভারতীয় চিন্তা মানেই যে ইহবিমুখিতা নয়—হীরেন্দ্রনাথ কখনোই এ কথা বলতে ভোলেন না, বরং বারেবারে সেটি মনে করিয়ে দেন।

ধর্ম, মার্কসবাদ, মানবিকতা ইত্যাদি নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ ১৯৬৭-র পরে আর খুব বেশি লেখেন নি। ১৯৭০-এ "ভারতচেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা"-য় ধর্মের কথা আসেনি, যদিও তাঁর দেশাভিমান (মালয়ালম ভাষার এই শব্দটি হীরেন্দ্রনাথের খুব প্রিয়) তখনও প্রবল। "সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু" (১৯৭৩)-তেও জীবনের ঐহিক দিকের ওপরেই জোর পড়েছে।

এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। ১৯৬৬-৬৭ থেকেই ভারতীয় রাজনীতির জগতে শূন্যতা কেটে যায়। ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেখা দেয় ভারতের দিকে দিকে। তারই পরিণতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান ঘটে। যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিই হয়ে ওঠে সংসদীয় রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত রূপ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও কম ওলটপালট হয় নি। দেশে দেশে ১৯৬৮-তে ফেটে পড়ল ছাত্রবিক্ষোভ। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তাল হয়ে উঠল ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙন অবশ্য রোখা গেল না। কিন্তু দিকে দিকে দেখা দিল র‍্যাডিকাল চিন্তার বিস্ফোরণ। ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর মধ্যে মাথা তুলল লিবারেশন থিওলজি। র‍্যাডিকাল ভাবধারার প্রসার ঘটল লাতিন আমেরিকায়। চে গ্যেভারা হয়ে উঠলেন দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন ধ্রুবতারা।

এই পটপরিবর্তনের ফলে, অনিবার্যভাবেই, মার্কসবাদ-ধর্ম-মানবিকতা নিয়ে আলোচনা আর প্রাসঙ্গিক রইল না। ভারতের ঐতিহ্য বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বহুগ্রাহী, এমনকি সর্বগ্রাহী বললেও ভুল হয় না। লোকায়ত-র পাশাপাশি সব ধর্মমত থেকেই তিনি ইতিবাচক উপাদান খুঁজে পেতেন। ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যে কোন্ ধারাটি তুলনায় ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনাময়, আর কোন্‌টি আপাত প্রবল হলেও আসলে প্রাণশক্তিহীন—এর মধ্যে কোনো বাছাই তিনি করেন নি। মুখ্য ধর্ম আর গৌণ ধর্মের মধ্যে কোনোদিনই তিনি তফাত করতেন না। বেদ-

উপনিষদ থেকে কবীর-দাদূ—যখন যেখানে 'মানবিকতা'র লক্ষণ তাঁর চোখে পড়েছে, তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন। "ধর্ম ও সমাজবিপ্লব" (১৯৬০) প্রবন্ধে অবশ্য জোরটা পড়েছে "ছোটো ঘরানা"-র ওপর।

কিন্তু অবস্থা তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। ধীরে ধীরে পূর্ব ইওরোপে ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে অন্তর্ঘাত আর প্রতিবিপ্লব। 'বরফ গলা'র নাম করে ঢোকানো হয়েছে দেদার বেনো জল। গোড়ায় বিভ্রান্ত হলেও ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি, কমিউনিস্ট ভেকধারী গরবাচভ, ইয়েলৎসিন প্রমুখ প্রতিবিপ্লবীদের শেষ পর্যন্ত চিনে নেন হীরেন্দ্রনাথ। "সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ" নিয়ে গরবাচভ-এর বাগাড়ম্বর যে কত ফাঁপা সেটাও তিনি বুঝলেন।[৫] ধর্মের নামে, ভারতচেতনার নামে বাবরি মসজিদ ভাঙা থেকে গুজরাতের গণহত্যা পর্যন্ত সব ঘটনাই তো তাঁর চোখের সামনে ঘটল। ধর্ম-র ইতিবাচক দিক বলে যদি কিছু থাকেও, তার নেতিবাচক দিক যে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর—সে অভিজ্ঞতাও তাঁর নতুন করে হলো।

আসলে ধার্মিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের খোলা মনে আলাপ চলে কখন? যখন দুপক্ষই শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি—দরকার পড়লে হাতিয়ার ধরতেও গররাজি নন। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে এইভাবেই গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টান কমিউনিস্ট ও এমন সব মানুষদের ব্যাপক ঐক্য, যাঁরা ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানও নন, আবার দায়বদ্ধ কমিউনিস্টও নন। এর থেকেই সূত্রপাত হয় লিবারেশন থিওলজি-র, ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বর ইতিহাসে যা সত্যিকারের বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল।[৬] কিউবা-র বিপ্লব অভিঘাতেই ঘটতে পেরেছিল এই বিশাল তাৎপর্যবাহী ঘটনা।

১৯৬০-এর দশকে ইওরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে, কমিউনিস্ট-খ্রিস্টান আলাপ ছিল এর তুলনায় নেহাতই শৌখিন বাক্যবিলাস। গ্রেট ব্রিটেন-এর কমিউনিস্ট পার্টির (অধুনালুপ্ত) তত্ত্ববিদ, ড. জন লেউইস এমন এক আলাপ-এর সূচনা করেছিলেন ১৯৬৬-তে। পার্টির পত্রিকা, *মার্কসইজম টুডে*-তে অক্টোবর ১৯৬৭ পর্যন্ত এই নিয়ে মোট বারোজন কমিউনিস্ট ও খ্রিস্টান তাঁদের মতামত জানান।[৭] সব ভেদ ভুলে, যাবতীয় ভক্ত খ্রিস্টান, এমনকি পাদ্রিদের পার্টির তরফে ডাক দেওয়া হয়েছিল দলের সদস্য হওয়ার জন্যে।[৮]

কী লাভ হয়েছিল তাতে? খ্রিস্টানরা যেমন ছিলেন তেমনই থেকেছেন, কেউ পার্টিতে যোগ দেন নি : পেছু হটেছেন সি পি জি বি-র কর্তারাই। আলাপের শেষে ড. লেউইস ঘোষণা করেন : মার্কসবাদীদের পক্ষে নিজেদের নিরীশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করা পুরোপুরি অ-মার্কসবাদী আর 'বস্তুবাদ' (মেটিরিয়ালিজম) শব্দটা বাতিল করতে পারলেই তিনি খুশি হন। 'আধুনিক মতবাদ' যাঁরা গ্রহণ করছেন, তাঁরা নাকি আর নিজেদের বস্তুবাদী বলেন না। "তাঁরা নিজেদের কিছুই বলেন না।" সুতরাং মার্কসবাদীরাই বা কেন নিজেদের বস্তুবাদী বলে বখেরা বাড়ায়।[৯]

এই সময়ে ব্রিটিশ পার্টির কর্তাদের চোখে ফরাসি কমিউনিস্ট দার্শনিক, রজের গারোদি

ছিলেন নতুন গুরুঠাকুর। গারোদি-র *নিষেধ থেকে আলাপ (ফ্রম অ্যানাথেমা টু ডায়ালগ)* বইটির খুব সুখ্যাতি করেছিলেন ব্রিটিশ পার্টির মুরুব্বিরা। পরে অবশ্য সোভিয়েত পার্টির তাত্ত্বিকরা গারোদি-কে 'দলদ্রোহী' (রেনিগেড) মার্কা মেরে দিলেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও তাঁকে বার করে দেওয়া হলো।

এই আলাপ চালিয়ে পূর্ব ইওরোপেও, বিশেষ করে পোল্যান্ডে, কোনো লাভই হয়নি। সেখানকার পার্টিনেতারা ছিলেন অপদার্থ, তার জন্যেই সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে পারল সলিডারিটি (সংহতি) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে কামান দাগার কাজে প্রধান গোলন্দাজ ছিলেন খোদ পোপ দ্বিতীয় পল। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভ্যাটিকান মুখ খুলেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে কি ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর কমিউনিস্ট-বিরোধী (বহুক্ষেত্রে মানব-বিরোধী) রেকর্ড ভুলে যেতে হবে?[১০]

আন্তর্জাতিকতার ঐতিহ্য ত্যাগ করে ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেন-এর শোধনবাদী পার্টিগুলি এক কিম্ভূত 'ইওরো কমিউনিজম'-এর তত্ত্ব বাজারে ছেড়েছিল। গদ্‌গদ হয়ে তারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন গর্বাচভ।[১১] লাভের মধ্যে সে-পার্টিগুলো এখন সাইনবোর্ড সমেত উঠে গেছে, অথবা ভাগ হয়ে গেছে একাধিক দলে।

ঘটনা হচ্ছে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙনের পরে, ১৯৬০-এর দশক থেকেই অনেক পোড়-খাওয়া মার্কসবাদীও দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। কোনো পথের নিশানা না পেয়ে কেউ কেউ শুরু করেছিলেন এই নিরিখে ভাবতে : ধর্মের সঙ্গে একটা আপস রফা করে একটু বল বাড়ানো যায় কি না। এর ফায়দা লুটেছে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব পুঁজিবাদ—ধর্মকে আশ্রয় করেই তারা সুকৌশলে গড়ে তুলেছে কমিউনিস্ট-বিরোধী জিগির—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে, পোল্যান্ডে, ইওরোপের সর্বত্র। আজ ইওরোপে সমাজবাদী ব্যবস্থার পতনের পর, লাতিন আমেরিকাতেও প্রতিক্রিয়ার শক্তি অনেক বেশি জোরদার। লিবারেশন থিওলজিও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।[১২]

পেছন ফিরে তাকালে ধর্ম-মার্কসবাদ আলাপের ঐ বিফল অধ্যায়টিকে শোধনবাদী ভাবনার অনিবার্য পরিণতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ঐক্য যদি গড়ার হয়, তা গড়া হবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে : কাউকে ডাকাডাকি করে আলোচনায় বসাতে হবে না। ধরুন, বাস্তিয়ান ভিলেঙ্গা বা ফাদার বাডাক্কান (Vadakkan)-এর মতো ক্যাথলিক ধর্মযাজক। মার্কসবাদকেই তাঁরা স্বীকার করেন যাবতীয় ঐহিক ক্ষেত্রে। সমাজ-বিশ্লেষণে তাঁরা মার্কসবাদী পথেরই অনুসারী। কিন্তু তাঁদের অন্তরে কিছু আধ্যাত্মিক আকুতিও আছে। তার জন্যেই তাঁরা খ্রিস্টকে ত্যাগ করতে রাজি নন।[১৩] এঁদের মতো খ্রিস্টানের সঙ্গে যে-কোনো মার্কসবাদী স্বচ্ছন্দে আলাপ চালাতে পারেন, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। একই কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে ধর্ম নিয়ে দিনের পর দিন সাক্ষাৎকার নিতে পারেন ফ্রেই বেত্তো।[১৪] সত্য সর্বদাই মূর্ত : বিমূর্তভাবে ধর্ম আর বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে কোনো আলোচনা হয় না।

যদি শুধু ভারতের কথাই বলেন, এখানকার কোন্ হিন্দু বা ইসলামি সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনগণের অধিকারের স্বার্থে, সংগ্রামের লক্ষ্যে আলাপ চালানো যায়? শুধু যে ১৯৮০-র দশক থেকেই ভারতে ধর্ম আর রাজনীতির গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে, এমন তো নয়। মাঝে মাঝেই গো-হত্যা নিবারণের নামে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে থাকে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী কিছু লোক। আর তাদের তালে তালে নাচেন নানান উপসম্প্রদায়ের হিন্দু ধর্মনেতা। শুধু ধর্মনেতাই নন, বিনোবা ভাবে-র মতন গান্ধীবাদী "ভূদান" প্রচারকও। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই এই নিয়ে তিনি হুমকি ছেড়েছিলেন।[১৫] আর এখানকার ইসলামি সম্প্রদায় ও তাদের উপসম্প্রদায়গুলির কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এঁদের বেশিরভাগ শুধু প্রতিক্রিয়াশীল নন, চূড়ান্ত অতীতমুখী। একুশ শতকে এঁরা অচল। তাই বা বলি কেন, উনিশ শতকের দুনিয়াতেও এঁরা অচল ছিলেন।

সব মিলিয়ে ঘটনা দাঁড়ায় এই : মুক্তমতির নমুনা হিসেবে ধর্ম-মার্কসবাদের আলাপ কোথাও পৌঁছতে পারে নি। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি তাত্ত্বিক স্তরেও তার মধ্যে স্ববিরোধ ও বিভ্রান্তি ছিল প্রচুর। তবে সুখের কথা, হীরেন্দ্রনাথের মুক্তমতি শুধু ঐ একটি ক্ষেত্রেই আটকে থাকে নি, অন্য ক্ষেত্রেও তাঁর মুক্তমতির প্রমাণ দেখা গেছে—যে মুক্তমতি একই সঙ্গে ব্যাবহারিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।

হীরেন্দ্রনাথের জীবনের যে-কোনো পর্বেই একটি স্থির কেন্দ্র দেখা যায়। পুণ্যে-পাপে, সুখে-দুঃখে, পতনে-উত্থানে কখনোই তিনি সোভিয়েত বিপ্লব ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারান নি। মার্কসবাদের সত্য যে ব্যাবহারিক সত্য, ১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লব থেকেই যে ইতিহাস এক নতুন পথে মোড় নিয়েছে—এই বিশ্বাস তাঁর কখনোই টলে নি। গর্বাচভ-ইয়েল্‌ৎসিন চক্র যখন সমাজবাদী ব্যবস্থার কুইসলিঙ হয়ে দাঁড়াল, হীরেন্দ্রনাথ তাঁদের কৃতঘ্নতায় 'ক্লিষ্ট' হয়েছিলেন।[১৬] তবু তাঁর আস্থা ছিল : নভেম্বর বিপ্লবের মহিমা এমনই যে উত্তরপুরুষের কৃতঘ্নতা সত্ত্বেও তা অটুট থাকে। গ্র্যায়াম গ্রীন-এর মতো তিনি তাই বারে বারে ঘোষণা করেন : ক্যালিফোর্নিআ-র চেয়ে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে শেষ জীবন কাটানো অনেক ভালো।[১৭]

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনের (১৯৮৯) আগে থেকেই হীরেন্দ্রনাথের মুক্তমতির চিন্তা অন্য এক দিকে বাঁক নিয়েছিল। পার্টির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন : পার্টিতে নাম লেখানো সদস্যদের বাইরে, মানবমুক্তির স্বার্থে নানা ক্ষেত্রে কর্মরত বহু মানুষ রয়েছেন। তাঁরা ধার্মিক নন, বরং অ-ধার্মিক, কিন্তু চিন্তা ও কর্ম-র জগতে সত্যিকারের মৌলিক পরিবর্তনে উৎসাহী। 'বৃহত্তর অর্থে পার্টি'-র কথা মোটামুটি এই সময় থেকেই তাঁর লেখায় দেখা দিতে থাকে। "প্রগতি সাহিত্য শিবির ম্লান, কুণ্ঠিত, স্তিমিত কেন?" (১৯৮৮) প্রবন্ধেই বোধহয় হীরেন্দ্রনাথ প্রথম মার্কস-এর চিঠি থেকে একটি শব্দগুচ্ছ উদ্ধৃত করেন। ফ্রাইলিগ্রাট নামে এক বন্ধুকে মার্কস লিখেছিলেন "The Party in the grand historical sense of the term"-এর কথা।[১৮] তার পরে বারে বারে হীরেন্দ্রনাথের লেখায় মার্কস-এর ঐ শব্দগুচ্ছটি এসেছে। "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (১৯৯২) প্রবন্ধটি শেষ হয় ঐ কথাগুলি দিয়ে।[১৯] তাঁর

সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলনেও দেখলুম "একুশের ভাবনা" (২০০০) প্রবন্ধে ঐ একই বাক্যাংশ/শব্দগুচ্ছ।[২০] "কেন লিখি?" (১৯৯৮)-তেও তিনি বলেছিলেন :

> আমার সর্বদা উদ্দেশ্যসর্বস্ব লেখার পিছনে থেকেছে স্বদেশের মুক্তি আর (সপ্তার [সত্তার?] কথঞ্চিৎ পরিণতিকালে) লোভ জটিল শোষণভিত্তিক স্বার্থসন্ধ অথচ তৎসত্ত্বেও বহুগুণখচিত এবং এখনও কথঞ্চিৎ মায়াময় বিশ্বব্যবস্থার বিলোপ। এই দ্বৈত অভিপ্রায় হয়তো উদ্ধত মনে হলেও আমার সকল প্রয়াসের মূলে, সকল রচনার উদ্দিষ্ট, তা আমি রাজনীতি বা ইতিহাস বা কাব্যচর্চা বা ক্রীড়াকৌতুক যে কোনো বিষয়েই লিখি না কেন। 'ফরমায়েসি' লেখা বলে ভ্রূকুটি আমায় বিচলিত করবে না, কারণ এটুকু বলতে পারি যে ফরমায়েসটা আমারই নিজস্ব না হলে লিখতে পারি না। এখন এই মুহূর্তেই 'অনিচ্ছা' কাটিয়ে যা লিখছি তার অভিপ্রায় হল যে হয়তো বা আমার চিত্তচরাচর ব্যাপ্ত যে অন্বিষ্ট, যা আমার বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সুগভীর অকিঞ্চিৎকরতার উপশম কিছু ঘটায়, সেই অন্বিষ্ট অল্প হলেও কিছু সহায়তা পাবে আর আমি এই অতি তুচ্ছ রচনার মধ্যে দিয়েও হয়তো কিছু সৎ শুচি সহজ মানুষকে টানতে পারব যাকে কার্ল মার্ক্স বহুকাল আগে বলেছিলেন 'the Party in the grand historical sense of the term,' তার পরিধির মধ্যে না হলেও অন্তত তার সমীপ্যে।[২১]

মার্ক্স-এর কথাগুলির প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

ফার্দিনান্দ ফ্রাইলিগ্রাট (১৮১০-১৮৭৬) ছিলেন একজন জার্মান কবি, কমিউনিস্ট লীগ-এর সদস্য *নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং* (১৮৪৮-৪৯) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। মার্ক্স-এর একটি লেখায় 'পার্টি' শব্দটির ব্যবহার দেখে ফ্রাইলিগ্রাট তাঁর কাছে জানতে চান : কোন্ পার্টির কথা তিনি বলছেন। উত্তরে মার্ক্স জানান : নভেম্বর ১৮৫২-য় নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কমিউনিস্ট লীগ নামক সংস্থাটি আমি ভেঙে দিয়েছিলুম। তারপর আমি আর কখনও কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলুম না, সে-সংগঠনটি গুপ্তই হোক আর প্রকাশ্যই হোক। তাই পুরোপুরি ক্ষণস্থায়ী অর্থে *পার্টি* ব্যাপারটা আট বছর আগেই চুকে গিয়েছিল। 'পার্টি' বলতে আমি বুঝিয়েছি 'ব্যাপক ঐতিহাসিক অর্থে পার্টি'-র কথা।[২২]

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্দোলনের এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা। কিন্তু তাই বলে তো খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার লড়াই আর ধর্মীয় উন্মাদনা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিজ্ঞান চেতনার অভিযান থেমে যায় নি। পার্টির নাম ও পতাকা ছেড়ে 'সোশালিস্ট ভদ্রলোক' সেজেছে ইওরোপের প্রাক্তন কমিউনিস্টরা। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় সংগ্রামী মানুষ সে-ভুল করছেন না। তাঁরা বোঝেন : মার্ক্স-এর এই কথাগুলিই আসল সত্য :

> ধর্মের সমালোচনা আনে মোহমুক্তি ; আর সেই মোহমুক্তির ফলে পূর্ণ সম্মতি পেয়ে মানুষ চিন্তা কর্ম এবং আত্মসত্তা গঠনে ব্যাপৃত হতে পারে। মানুষ

> তখন নিজেই নিজের সূর্য। স্বকীয় অক্ষপটে [অক্ষপথে?] তার গতিবিধি। ধর্ম হল সেই কপট সূর্য যা পূর্ণ আত্মচেতনা থেকে বঞ্চিত মানুষের চারপাশে পরিভ্রমণ করতে পারে।[২৩]

(হীরেন্দ্রনাথের নিজের-করা অনুবাদ থেকেই এই অংশটি উদ্ধৃত করলুম।)

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাগাভাগি নিয়ে এখানে যাঁরা শুধু চোখের জল ফেলেন, তাঁদের ঐতিহাসিক বোধের অভাব বড়ই প্রকট। পরিস্থিতির অনিবার্য বিকাশ ও পরিণতিতেই ঐক্য গড়ে ওঠে, বিভেদও দেখা দেয়। কিন্তু তার জন্যে গোটা আন্দোলন চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যায় না। খ্রিস্টধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস কমিউনিস্ট আন্দোলনের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি পুরনো (যদিও শোষিত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস তার চেয়েও ঢের পুরনো)। খ্রিস্টধর্মের যে কতশত সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় আছে তার তালিকা করা শক্ত। তাদের মধ্যে বিভেদ, বিরোধিতা ও পারস্পরিক চাপান-উতোরও কম হয় না। তার পাশাপাশি আবার বিভিন্ন ধরণের খ্রিস্টীয় ধর্মমণ্ডলী(চার্চ)-কে এক করার জন্যেও চেষ্টা চলে। একুমেনিকাল (আক্ষরিক অর্থে : বিশ্বজোড়া, বসত-গাড়া পৃথিবীময়) আন্দোলনের কথা অনেকেই জানেন।[২৪] ওয়ার্ল্ড্ কাউন্সিল অফ চার্চেস-এর আওতায় বহু ধর্মমণ্ডলী, আর্মেনিয়ান ধর্মমণ্ডলী ও আরও কয়েকটি ধর্মমণ্ডলী এসেছে। কিন্তু বিশ্ব-খ্রিস্টান ঐক্য এখনও সুদূরপরাহত।

এত ভাগাভাগি সত্ত্বেও, দেশে-দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে কিন্তু কখনোই বড় রকমের ছেদ পড়ে নি। ১৯৬০-এর দশকে গণ-আন্দোলনের চাপে একুমেনিকাল তত্ত্বের প্রবক্তারা তাঁদের প্রথম দিকের কমিউনিজম-বিরোধী অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন—যদিও ঠাণ্ডা লড়াই-এর একটি রণক্ষেত্র (ফ্রন্ট) হিসেবেই ঐ একুমেনিকাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই ছিল তার আদি উদ্দেশ্য।

সঙ্কীর্ণ অর্থে 'ধর্মমণ্ডলী'র সীমা ছাড়িয়ে খ্রিস্টধর্মের সব রকমের অনুগামীর এক অদৃশ্য, আল্‌গা জোট প্রায় দু হাজার বছর পৃথিবীতে বহাল রয়েছে। খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার পাল্‌টা জোট এখনও সমান সক্রিয়। 'বৃহত্তর অর্থে পার্টি'র ধারণাটি তাই সর্বদাই প্রাসঙ্গিক। 'ব্যাপক ঐতিহাসিক অর্থে' এই পাটি এখনও মরে নি, কখনও মরবে না, কারণ তার অনুগামীদের জানা আছে : কপট সূর্য আর প্রকৃত সূর্যর মধ্যে কোনো আপস চলে না। হীরেন্দ্রনাথও এই বোধেই নিজ বিশ্বাসে স্থির আছেন। এই তাঁর যথার্থ মুক্তমতির পরিচয়।

টীকা

১. তিনটি প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে হীরেন্দ্রনাথের *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, খণ্ড ২, প্রণব বিশ্বাস সম্পা., কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫-এ।

২. "সবার উপরে মানুষ সত্য" কথাটির মানবতাবাদী ব্যাখ্যায় বোধহয় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অশোক রুদ্র, *পরিচয়*-এই প্রকাশিত কোনো লেখায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় হীরেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

মার্কসবাদ ও মুক্তমতি-র সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রদ্যোৎ গুহ লিখেছিলেন : ".....পংক্তিটির

পরবর্তীকালের মনের মাধুরী মেশানো যে ব্যাখ্যা [হীরেন্দ্রনাথ] উপস্থিত করেন, তাও বৈজ্ঞানিক বিচারে টিকবে কিনা সন্দেহ।" (*নির্বাচিত প্রবন্ধ*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫০-এ উদ্ধৃত)।

প্রসঙ্গত বলা যায়, গোপাল হালদারও চণ্ডীদাসের ঐ চরণদুটির ঐ রকম অ-ধর্মীয় অর্থ করতেন। সে-ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন গোলাম কুদ্দুস (গোলাম কুদ্দুস, "আমার গোপালদা", *গণশক্তি*, ৩রা মার্চ ২০০২, রবিবারের পাতা, পৃ. ১০ দ্র.)।

৩. *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (পরে *নি. প্র.*), খণ্ড ২, পৃ. ৩০৪-এ উদ্ধৃত।

৪. *নি. প্র.* ২, পৃ. ৩৩-৩৪। পরে অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন : স্তালিন-এর ধারণাই ঠিক ছিল। ১৯৫৬-র পরে ক্রুশ্চভ প্রমুখের মত বাস্তবে মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (১৯৯২), *নি. প্র.* ২, পৃ. ৩৩৩-৩৪ দ্র.।

৫. ঐ, পৃ. ৩৩৪-৩৫ দ্র.।

৬. *Monthly Review*, Vol. 36 No. 3 July-August 1984-তে 'Religion and the Left' নাম দিয়ে অনেক ক'টি লেখা বেরিয়েছিল। লেখকদের মধ্যে ছিলেন নিকারাগুআ-র এর্নেস্তো কার্দেনাল, কোলোম্বিআ-র কামিলো তোর্‌রেস প্রমুখ বিপ্লবী পাদ্রি, যাঁরা অস্ত্র ধরেই লড়তেন। তিন মহাদেশে লিবারেশন থিওলজি ও খ্রিশ্চান বামপন্থীদের সম্পর্কে অনেক কথা এই লেখাগুলিতেই পাওয়া যায়।

৭. James Klugmann (ed.) *Dialogue of Christianity and Marxism*, London . Lawrence and Wishart, 1986 দ্র.।

৮. মার্চ ১৯৬৭-তে গ্রেট ব্রিটেন-এর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব সূত্র ৭, পৃ. ৮৮-তে উদ্বৃত।

৯. সূত্র ৭, পৃ. ১০৬-০৭ দ্র.।

১০. এই পোপ সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য খুবই যথাযথ : 'বিচক্ষণ, "বাক্‌পটু' অথচ গভীরভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী ধর্মনায়ক'। "ধর্ম ও সমাজবিপ্লব" (১৯৯০), *নি. প্র.* ২, পৃ. ২১৯। এ ছাড়া ঐ, পৃ. ১৭৯ দ্র.।

১১. গর্বাচভ অবশ্য বলতেন : "Our common European home' "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (১৯৯২), *নি. প্র.* ২, পৃ. ১৭৫, ৩৩৩ দ্র.।

১২. এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনার জন্যে জেমস পেত্রাস, 'উত্তর-মার্কসবাদ : একটি মার্কসবাদী সমালোচনা", *অন্যস্বর/Other Voice*, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৬৮-৮৬; বিশেষত পৃ. ৮৩-৮৫ দ্র.।

১৩. Bastiaan Wielenga, *Marxist Views on India in Historical Perspective*, Madras ·· The Christian Literature Society, 1976, pp. xiii–xvii দ্র.।

১৪. Frei Betto, *Fidel and the Religion*, New Delhi : People's Publishing House, 1987 দ্র.।

১৫. ঐ সময়ে একটি অসামান্য দেওয়াল-লিখন চোখে পড়েছিল : গরুর জন্যে বিনোবা ভাবে/মানুষের কথা কে ভাবে।

১৬. "ভূমিকা", *বিপ্লবের পরাজয় নেই* (১৯৯০), *নি.প্র.*২, পৃ. ৩৬৬।

১৭. "গণতন্ত্রের সার্থক পরিণতি সাম্যবাদে" (২০০১), *আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে*, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০০২, পৃ. ৫৩। হীরেন্দ্রনাথ আরও একাধিকবার গ্রীন-এর কথার

প্রতিধ্বনি করেছেন।

১৮. *নি. প্র.* ২, পৃ. ৩২৬-২৭ দ্র.।

১৯. ঐ, পৃ. ৩৪৪।

২০. *আকাশগঙ্গা* (সূত্র ১৭), পৃ. ৯৩।

২১. ঐ, পৃ. ১২২।

২২. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০-এর চিঠি। Marx-Engels, *Collected Works,* Vol. 41, Moscow . Progress Publishers, 1985, pp 81-87 দ্র.।

২৩. *নি. প্র.* ২, পৃ. ২১২-য় উদ্ধৃত।

২৪. Yuri Kryanev, *Christian Ecumenism*, Moscow Progress Publishers, 1983 বইটিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রদ্যুৎকুমার দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত, প্রভাসকুমার সিংহ, অমিতাভ ভট্টাচার্য, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্যের পবিত্রতা

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা মুক্তমনকে পঙ্গু করে দেয়। আপন বিলাস ও বৈভবের স্বপ্নটুকু কেড়ে নেয়। এটাই যথার্থ কমিউনিস্টদের প্রতি সাধারণের অভিযোগ। এ অভিযোগ কমিউনিস্টদের কাছে হতাশার এবং একই সঙ্গে গর্বের। একজন যথার্থ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কের মধ্যে বেঁচে থাকে আর একজন 'ব্যক্তি'। শ্রদ্ধাবত্তা, দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা ও শৃংখলার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে সেই লুকানো 'ব্যক্তি' তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। এই ব্যক্তি-বা ব্যক্তিত্ব যখন নিজেকে অতিক্রম করে মানুষের কথা বলে, তখনই ঘটে ব্যক্তিত্বের উত্তরণ। ব্যক্তি মানুষকে অবিকল একই রেখে মার্কসবাদী, রাজনীতিবিদ—ইত্যাদি কৃত্রিম 'বিশেষণে' আত্ম-প্রবঞ্চিত না হয়ে অবরুদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি-আন্দোলনে নিজস্ব রাজনৈতিক পথকে এক শক্তিশালী ও সফল পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণ করতে পারলেই 'মুক্তমন'-কে পঙ্গু করে দেওয়ার সাধারণের এই অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে লক্ষ্যের পবিত্রতা।

'চক্ষুষা কাণঃ' ও 'অল্পে সুখ নেই', হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর এই প্রবন্ধ সংকলন দুটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে ক্রমশ একজন হীরেন্দ্রনাথের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই পবিত্রতা, লক্ষ্য আর লক্ষ্যপূরণের পবিত্রতা।

অনেকের মনে হতে পারে সাহিত্যই ছিল তাঁর স্বভূমি। রাজনীতি তাঁকে সে ভূমি থেকে বিচ্যুত করেছে। বাগ্মী, সাংসদ, সুপণ্ডিত, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা পড়ে সে কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু 'রাজনীতিবিদ' পরিচয় তাঁর অন্য ব্যাপ্তিকে এমন ছোটো করে দিয়েছে যে অদ্যাবধি তাঁর সাহিত্য ও মননশীলতার ওপর তীক্ষ্ণধী কোনো আলোচনা গড়ে ওঠেনি। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে চক্ষুষা কাণঃ ও অল্পে সুখ নেই—এই সংকলন দুটির নিরিখে খণ্ডিত নয়, সমগ্র হীরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। এবং তা ধ্রুবনীতিপথ থেকে মুক্তমনা মার্ক্সবাদী হীরেন্দ্রনাথের লক্ষ্যে বিচ্যুত না-হওয়া শক্তিশালী ও সফল পদ্ধতি দিয়ে।

'ভারতবর্ষে জন্মেছি বলে আমার অভিমান বড় বেশি—মাঝে মাঝে ভয় হয় যে বুঝি এ অহংকার সমুচিত নয়, কিন্তু একে পরিহার করতে পারি না। হয়তো সেইজন্যই বারবার মনে ঘুরতে থাকে : 'ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই'। রাজনীতির আবর্তে ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করি প্রায়ই—শুধু সেখানে কেন, অপর বহু ক্ষেত্রেও, যাঁরা বিদ্বান্ ও নমস্য বলে খ্যাত তাঁদের মধ্যেও দেখি, আর দেখি নিজের দৌর্বল্য, ভ্রান্তি, ধ্রুবনীতিপথ অনুসরণে অপারগতা।'—'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ সংকলের মুখবন্ধে হীরেন্দ্রনাথের এই আত্মবিশ্লেষণ-ই পবিত্র লক্ষ্যের প্রেরণা।

বাংলা সাহিত্য আমাদের গর্ব। বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে আমাদের মহত্তম কৃষ্টি। এরই মধ্যে আছে, আমাদের দর্শন, আমাদের বিজ্ঞান। ভিন্নমুখী চিন্তার মহৎ পথ-পরিক্রমায় তা বিচরণ করে। আমাদের এই সৃষ্টির মন্দির গড়ে তুলেছি, জনগণের নীরব সমর্থন নিয়ে। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। অতএব ব্যক্তিপরিক্রমার উর্ধ্বে সৃষ্টি জগতে ব্যক্তিত্বের উত্তরণ ঘটেছে জনদুয়ারে। রবীন্দ্র সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইতিহাসে রবীন্দ্রসাহিত্য এক বিস্ময় কারণ সাহিত্যের অঙ্গনে আগে কোনো সৃষ্টি রবীন্দ্র সাহিত্যের মতো এত সবলতা ও দ্রুততা নিয়ে, প্রতিভার এমন বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠেনি।

"...কবির কাছে আহ্বান যাচ্ছে আর্টকে ব্যবহার করতে হবে অস্ত্র রূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত। কবি বুঝেছেন যে বিপ্লব যখন আগত বা আসন্ন তখন আর্টের চেহারা বদলাবে। সে চেহারা হয়তো মনোরম নয়। কিন্তু সামাজিক সমস্যার নির্বন্ধ লঘু না হওয়া পর্যন্ত কবিতার নতুন মূর্তি আমাদের কাছে প্রকট হবে না।'—

হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভাবনা এই ভাবেই লক্ষ্যের পবিত্রতাকে সামনে রেখে বিষয় পরম্পরা ব্যাতিরেকে লেখা হতে থাকে। নয়তো 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে যৌথ সম্পাদনাকালে দুটি পৃথক ভূমিকা এমনভাবে অনিবার্য হত না। এই দুই সম্পাদকের সাহিত্য বিচার ও রাজনীতিবোধ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। তাই স্বতন্ত্র দুটি ভূমিকা ব্যতিরেকে বইটি সম্পাদনায় দুই সত্তার মিলন একেবারেই সম্ভব ছিল না। যদিও তিনি দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা লেখার ব্যতিক্রমী এবং অনিবার্য প্রয়াসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য 'সুভাষিত রত্নকোষ' প্রকাশ কালে ইঙ্গল্স্ ও ডি কোশাম্বীর দুটি পৃথক ভূমিকার উদাহরণ অনেকে টেনেছেন তবুও এর অন্তর্নিহিত কারণ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা ভূমিকা দুটি পড়লেই বোঝা যায়।

আধুনিক বাংলা কবিতা কোনো ঋজু প্রবাহী নয়, তার মধ্যে আছে ভিন্ন প্রবাহ, ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন অভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সমর সেনের হাত ধরে প্রতিবাদী যে ভিন্ন ধারার প্রবেশ ঘটেছে তা আসলে আধুনিক কবিতারই উপধারা। তথাকথিত আধুনিকতা ও প্রগতিবাদী ধারা পাশাপাশি বিরাজমান। আইয়ুব যখন এই ধারাকে স্বতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেন তখন আর মার্ক্সবাদী হীরেন্দ্রনাথ-এর উপায় থাকে না, স্বতন্ত্র ভূমিকা অনিবার্য হয়ে আসে আইয়ুব-এর বক্তব্যের পাশাপাশি উপ-বক্তব্য রাখতে।

সাম্যবাদী কবিতা সম্পর্কে তৎকালীন বহু পাঠকের সংকীর্ণ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। আইয়ুবও এই ধারণাকে লালন করেছেন সযত্নে। তাই হীরেন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র ভূমিকায় মার্ক্সবাদী দর্শন বাধ্যতই প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। সাম্যবাদী কবিতার আবেগদীপ্ত সমর্থনে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'সাম্যবাদী কবিতা আজকাল বাংলাদেশে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন, কিন্তু তারা যদি সকলে কবি না হন, তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।...'কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই বুঝলে—যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং-ও প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কমিস্ট না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে—

যব্ গোধূলি সময় বেলি ধ্বনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিদুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।—হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকলমজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা, কবিক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়।'

হীরেন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনাই বস্তুতই লক্ষণীয়ভাবে ব্যক্তিগত। কিন্তু সমস্ত রচনাই একটি নির্দিষ্ট প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি রচনায় আছে নির্দিষ্ট 'ধ্রুবনীতিপথ'। এই পথ হল আমাদের স্বদেশের প্রতি অঙ্গীকার, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা, এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট বিশ্ব এই বিষয়ে কী ভূমিকা পালন করছে বা করবে, তা অনুমান, অনুভব ও অনুধাবন করার অন্বেষণ। পাশাপাশি প্রতিটি রচনায় ভাষার সম্পদ ও জ্ঞানের বিচ্ছুরণ দেখলে অবাক হতেই হয়। তিনি সমগ্র জীবন নিয়োজিত করছেন মার্ক্সবাদের প্রয়োগের অন্বেষণে ও আবেগপূর্ণ আহ্বানে। জীবনের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, শ্রমশ্রান্ত জনগণের প্রতি, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ ও গভীর ভালোর প্রত্যয়ে অবিচল আছেন তাই আজও একানব্বই-এ। তাঁর ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর লেখার দৃষ্টিকোণের মধ্যে, তাঁর অনুভূতি ও চিন্তনের মধ্যে। আর এই কারণেই 'চক্ষুষা কাণঃ' ও 'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ সংকলন দুটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ শিরোনামের সমান্তরালে একটি সংহতিও লক্ষ করা যায়। এতদ্‌ভিন্ন একই সূত্রে গ্রথিত করার অন্য কোনো কারণ দেখি না।

আলোচ্য গ্রন্থের বহু প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট। সংগত কারণেই তাই শঙ্খ ঘোষ 'কোরক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলতে গেলে হীরেন মুখার্জীর মত মানুষের গলায় এমন একটা স্বর এসে যায় কেবল বাগ্মিতায় নয়, রচনাতেও—যাতে মনে হতে পারে তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয়িতায়'...ইত্যাদি। 'হীরেন মুখার্জীর মত' শব্দ-বন্ধ ব্যবহার লক্ষণীয়। কারণ 'মার্ক্সবাদী' হীরেন্দ্রনাথের নিকট হয়তো এমন রবীন্দ্র-দুর্বলতা বেমানান। কিন্তু এই দুর্বলতা তাঁর সমস্ত আলোচনার 'ধ্রুবনীতিপথ'-এর বিপরীতে নতুন কোনো পথসন্ধান নয়। সার্দ্ধশতবর্ষের আলোকে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার স্মরণিকা'-র উদ্বোধনী ভাষণ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'মার্ক্সের চিন্তা আর কর্মে সম্ভোগসর্বস্বতার বিপক্ষে যে বিদ্রোহ...তার বিপক্ষে মার্ক্সবাদীরাই সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মত যুগন্ধর মহাত্মার চিন্তা থেকেও অনেক কিছু আহরণ করতে পারেন।'

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে 'অতি বামপন্থী' ঝোঁককে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বামপন্থী ঝোঁককে তিনি কখনও গোপন রাখেন নি। কবিতার ক্ষেত্রে 'সাম্যবাদীর প্রতিপাল্য অনুশাষণ' যে অচল নয় প্রমাণের তাগিদে তিনিই লেখেন, 'প্রকৃত সাহিত্যকে ব্রহ্মসহোদর মনে করার মত তুরীয় ভাব আধুনিক কবির পক্ষে সম্ভব নয়।' সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে নিছক আর্টিস্ট ভেবে কবিরা থাকতে পারে না। 'তারা যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদিঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনায় যে কবিতা লিখতে পারেন না এমন কথা কেউ জোর গলায়

বললে অন্যায় করবেন।'

তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে 'মার্ক্সবাদের মুক্তবোধি দিয়ে সমস্ত বিক্ষিপ্তির নিবারণ ও স্থিতি প্রজ্ঞার প্রচেষ্টা' করে গেছেন তা প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। প্রবন্ধগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণে তাঁর ধ্রুবনীতিপথ-ই প্রাধান্য পেয়েছে, হতে পারে তা কখনও আবেগে আবার কখনও যুক্তিতে তবুও চ্যুত হননি এই লক্ষ্যের পবিত্রতা থেকে।

"চক্ষুষা কাণঃ' প্রবন্ধসংকলন সূচিতে দৃষ্টি আবদ্ধ করলে দেখা যাবে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' ব্যতিরেকে কাব্য আলোচনায় এসেছে 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে'। অর্থাৎ সমকালীন প্রগতিবাদী কবি বিষ্ণু দে। 'আমাদের ইতিহাস' চেতনার ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানেও ইতিহাসের অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ যেন একটু ভিন্নমুখী। পুস্তক আলোচনায় তিনি বেছেছেন 'কয়েকটি সোভিয়েত বই' আর 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়া' জওহরলাল নেহেরুর বিখ্যাত বই-এর আলোচনা 'ভারত আবিষ্কার'। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে বিশ্বস্ত এই পণ্ডিত তাই অবলীলায় অন্য এক পণ্ডিতের লেখা প্রসঙ্গে বলেন, "বইটি প্রথম যখন হাতে পড়েছিল আশা, হয়েছিল যে নিশ্চয়ই দলিত ভারতবর্ষের কৃষক শ্রমিকদের সম্বন্ধে কয়েকটি দামি কথা লেখক বলেছেন, কিন্তু কৃষকদের উল্লেখ আছে মাত্র এক জায়গায়, সেখানে পণ্ডিতজি ভুল করে বাংলায় 'কৃষক প্রজা পার্টির নাম দিয়েছেন 'কৃষক সভা'। তিনি নিজে একবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেও কোথাও শ্রমিক সংগঠনের নামগন্ধই প্রায়ই নেই।" কিম্বা "আজাদ হিন্দ ফৌজের বিষয়ে একটি কথাও নেই। জয়হিন্দ শব্দটির অনুপস্থিতিও লক্ষ করার মত।" তিনি সোশালিস্ট নেহেরুকে ব্যাখ্যা করেছেন একটি তরল গল্প দিয়ে। "গল্পে আছে যে বিলাতে রক্ষণশীল দলের একজন শিরোমণি লেডি অ্যাস্টার নেহেরুজির সামনে সোশালিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি যখন আপত্তি করেন তখন জবাব আসে, 'মিস্টার নেহেরু, আমি আপনার মত সোশালিস্টদের কথা বলছি না।"

'বাঙালির ইতিহাস'—নীহাররঞ্জন রায়-এর পুস্তকটি আলোচনা প্রসঙ্গে স্বকীয় মার্ক্সবাদী সত্ত্বা এতটাই প্রখর ছিল যে এই সুলিখিত পুস্তকটিও তৃপ্ত করতে পারেনি হীরেন্দ্রনাথকে। ইতিহাসের বহুবিধ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ সহকারে নিজের পাণ্ডিত্যকে যথেষ্ট আলোকিত করে অপর একজনের ইতিহাস বিশ্লেষণকে যথার্থ সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু সবশেষে এই কথাটুকু লিখতে ভোলেননি যে, "নীহাররঞ্জনের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তথ্য বিচারে তাঁর সমাজ সচেতন মন যদি অস্পৃষ্টকল্পনা পাণ্ডিত্যের হিমজাল থেকে আরো বেশি মুক্ত হতে পারত, তো আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি থাকত না।' কিম্বা 'পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রখর সমাজ-চৈতন্য একীভূত হয়েছে বলে নীহাররঞ্জনের 'বাংলার ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে অনন্যপূর্ব রূপ দেখা দিয়েছে কিন্তু তাঁর সমাজ চৈতন্য সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে যেন উপনীত হতে পারে নি।"

এই একই কারণে, মার্ক্সবাদীর সত্ত্বার প্রখরতার কারণে, ধ্রুবনীতিপথে অবিচল থাকার কারণে সামান্য 'ফুটবল' প্রসঙ্গে আগাগোড়া ফুটবলপ্রেমী থেকে অবশেষে তিনি না লিখে পারেন না 'এর রহস্য ভেদকালে আজকে সমাজজীবনে যে কত গ্লানি কত দিকে ছড়িয়ে

রয়েছে তা খেলার দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে পারব।' খেলার দৃষ্টিকোণ থেকেও নির্দিষ্ট কিছু বুঝতে পারার তাগিদ, বোঝানোর তাগিদ কোন বাধ্যবাধ্যকতা থেকে অনুভব করেন তা আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না।

আর 'প্যারিস ১৯৪৪' তো ঐ নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণেরই কথা, এখানে তাঁর অননুকরণীয় ভাষার শৈলিতে আমাদের আরো আবেগঘন করে তোলে। আমাদের সেই আবেগ মথিত করে যখন লেখেন 'এই বছরের ২৩শে আগষ্ট তারিখটা তাই ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ব্যাপার। হিটলারী বুটের চাপে যে ফ্রান্স জীবন্মৃত হয়েছিল, দেশের মধ্যে বিভীষণ-বাহিনীর চক্রান্ত যে ফ্রান্সের স্বাধীন সত্তাকে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছিল, সেই ফ্রান্সই সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো জেগে উঠেছে, কেশর আন্দোলিত করেছে। আর পূর্বের মতেই ফ্রান্সের নবজাগরণে প্রথমে সতেজ দুন্দুভিনিনাদ করেছিল বিপ্লব-স্মৃতিপুত মহানগরী প্যারিস।'—তখন তাঁর মননের কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া আর আমাদের কোনো উপায়ই থাকে না।

উনিশ শতকের উদারচেতা মধ্যবিত্ত পরিবারের এক দেশপ্রেমিক বালক ক্রমশ কমিউনিস্ট বলয়ে অধিষ্ঠিত হল,—এতো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে না, উদারচেতা নাগরিকতার যে ধারা তৎকালীন সময়ে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে পুষ্ট করেছিল, তারই সূত্র ধরে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতো ব্যক্তি কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং 'এটা কোনো নাটকীয় মুহূর্তে নয়, সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনেই আমার দেশাভিমান পরিণতি পেয়েছিল মার্ক্সবাদে।' কখনও আত্মকথনের লজ্জায়, অতিকথনের তাড়নায়, কখনও অপ্রিয় কথার সংকচে কুণ্ঠিত হয়েছেন বাংরবার, কিন্তু আদর্শচ্যুত হননি।

আমি যে আপাত প্রভেদ সত্ত্বেও দুটি প্রবন্ধ সংকলনের যে ঐক্যসূত্রের কথা বলছিলাম, তার প্রেরণার উৎস এখানেই। লক্ষণীয় যে 'চক্ষুষা কাণঃ'-র ভূমিকাতেই লুকিয়ে ছিল 'অল্পে সুখ নেই'-এর প্রস্তুতি। 'মার্কস্‌বাদের মুক্ত বোধি দিয়ে সকল বিক্ষিপ্তির নিরসন ও স্থিতপ্রজ্ঞার প্রচেষ্টা স্বল্প শক্তি নিয়ে করেছিলাম। কিন্তু যে নিষ্ঠা, যে নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন ছিল, তা আয়ত্ত হয়নি। 'নাল্পে সুখমস্তি'—তাই সুখ আমার মেলেনি।' তাঁর আকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই সাহিত্য যশ ছিল না। দক্ষ সাংসদ হিসেবে তিনি একমাত্র পরিচিত হতে চাননি। সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতির ভাণ্ডার থেকে অকৃপণ চয়নে কৃতী বাগ্মী হয়েও খ্যাত হতেও চাননি কোনো দিন। একটা বোধ সর্বদা তাঁকে তাড়না করেছে। প্রকাশের তাগিদে কখনও তাঁকে প্রগতি লেখক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হতে হয়েছে, কখনও হতে হয়েছে সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দক্ষ পার্লামেন্টিরিয়ান, কখনও বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও সাযুজ্যের উত্তরণে রবীন্দ্রপ্রেমী।

কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তি-শৃংখলে আপাত ন্যায়-এর থেকে মার্ক্সবাদী ভূমিকা-ই প্রকট হয়েছে। সখ্যবন্ধনে নিজেকে কুণ্ঠিত করেও মত প্রকাশে সহমত হননি।

'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ সংকলনের মুখবন্ধে বাধ্যত লেখেন, "বর্তমান বিশ্ব বহু বিকট ও প্রায়-অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, কোনো বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক অনুধ্যানকে বক্র, জটিল, কঠোর ইতিহাসবর্ত্মের বর্তিকা মনে করা অনেকের মতে বাতুলতা

বলে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে মুক্তমন নিয়ে মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ আজকের পৃথিবীতে সংগঠিত হলে তমিস্রা অপসৃত হবে, মানব সভ্যতার পথচারণ সার্থক হবে।"

মুক্তমন নিয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তার বিকাশ সর্বক্ষণ তাঁকে পীড়িত করেছে। তিনি লিখতে বাধ্য হচ্ছেন '...রাজনীতির আবর্তে ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করি প্রায়ই শুধু সেখানে কেন অপর ক্ষেত্রেও, যাঁরা বিদ্বান ও নমস্য বলে খ্যাত তাঁদের মধ্যেও দেখি, আর দেখি নিজের দৌর্বল্য, ভ্রান্তি, ধ্রুবনীতি পথ অনুসরণে অপারগতা।'

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন। সেখানে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের অনুরোধে গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 'অল্পে সুখ নেই' গ্রন্থে সংকলিত হয়। মুক্তমন নিয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তার বিকাশ ও ধ্রুবনীতি পথে অবিচল থাকার দৃষ্টান্তে প্রবন্ধটির সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর দু-একটি লাইন উল্লেখ প্রয়োজন : 'আমার বক্তব্যে হয়তো বাহুল্য ছিল, একটু বুঝি বেয়াড়া ভাবও দেখিয়ে ফেলেছি। বেশ মনে আছে আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তির আবহাওয়া নেমে এসেছিল। বহুদিনের বন্ধু এবং প্রগতি লেখক আন্দোলনের নায়ক মুলকরাজ আনন্দ নিজের বলবার পালা চুকে গেলেও আবার অনুমতি চাইলেন আমার কথার বিরোধিতার জন্য। বেশ মনে পড়ে উপস্থিত অনেকেই যেন বিচলিত। হয়তো বা বিরক্ত ক্ষুব্ধ। মনোজ বসুর মত আমাদের কাছের লোকও অখুশি। শুধু তারাশঙ্করবাবু উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার সব কথা মানছেন না জানিয়ে দিয়েই। আর যেন নীহাররঞ্জন রায়-এর সকৌতুক দৃষ্টিতে একটু প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতার পরিচয় পেয়েছিলাম, যাকে অব্যক্ত অনুমোদন বলা যেতে পারে।'

লক্ষ্যের পবিত্রতা নিয়ে ধ্রুবনীতি পথে অবিচল থাকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? তবু 'আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইনই চূড়ান্ত'—রুশ তাত্ত্বিক জদানভ এবং ফরাসি তাত্ত্বিক লুই-আরাগঁ-র এই বক্তব্যের বিপরীতে আর্টের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিধিনিষেধ না থাকার পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁর সঠিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, পরিশুদ্ধ চৈতন্য ও সামাজিক ঔদার্যের কারণে।

সংসদ : প্রথম পঁচিশ বছর এবং তারও পর

অজেয়া সরকার

কিংবদন্তি-প্রতিম এক সাংসদের সিকি শতাব্দী ব্যাপ্ত সংসদ-জীবনের এক উজ্জ্বল লেখনীচিত্র এই নিবন্ধের আলোচ্য বস্তু। এক সুবিশাল দেশ ও বৈচিত্র্যময় জাতীয় জীবনের সার্বভৌম অস্তিত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হিসাবে ১৯৫২ সালে যে প্রথম পার্লামেন্ট গঠিত হলো সেখানে মননে ও কর্মোদ্যোগে প্রাণবন্ত হীরেন্দ্রনাথ ঘটমান ইতিহাসের শরিক। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং বহুদলীয় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে গঠিত প্রথম পার্লামেন্টে ভারতীয় গণতন্ত্রের যে মুখচ্ছবি প্রস্ফুটিত, পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে তার শক্তি ও দুর্বলতার স্থানগুলি, তার অগ্রগমন-সম্ভবনা ও পশ্চাদ্‌মুখিতা, তার আদর্শগত ও মূল্যবোধজাত সংঘাত ও সংকট সবই এক বিশিষ্ট বহমানতায় হীরেন্দ্রনাথের লেখনীধারায় সঞ্জীবিত হয়েছে। তবে শুধু তো রাজনৈতিক বহমানতাই নয়, হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিপট লেখায় উঠে এসেছে ব্যক্তিমানুষের কত একান্ত মুখ, চেনা মানুষের কত অচেনা ছবি, মতভেদ ও আনুষ্ঠানিকতার বেড়া ভেঙে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কত সম্মিলন, কত সৌহার্দ্য।

কমিউনিস্ট হীরেন্দ্রনাথ ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্র। সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টকে তিনি ভারত ইতিহাসে নবযুগের সূচনা বলেই মনে করেছেন। হ্যাঁ, তারপর ধারাবাহিক আশাভঙ্গের কাহিনী সত্ত্বেও এখনও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দীপনার অভাব তাঁকে পীড়া দেয়। সমসাময়িক অনেক কমিউনিস্টের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর তৎকালীন বৌদ্ধিক অবস্থানের ভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক পীড়নে ক্লান্ত একটি জাতির কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যও যে যথেষ্ট, এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করেছেন, এ-কথা মেনেও যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার অধীশ্বর জনগণ নয়, পুঁজি। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ও নীতিসমূহকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যেও যে কমিউনিস্টরা প্রথম লোকসভায় গিয়েছিলেন এমনটা নয়। এমনতর অভীপ্সাও তাঁদের ছিল না। লেনিন কথিত একটি স্মরণীয় পংক্তি উদ্ধৃত করে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন এক্ষেত্রে লোকসভা নামক প্রতিনিধি-সভাটিকে নিছক বাচালতার জায়গা থেকে কার্যকরী ও সক্রিয় এক প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ করাই হল কমিউনিস্ট সদস্যদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তথাপি, ধরা যাক ভিট্টল রাও-এর কথা। তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের এই অন্যতম শীর্ষ সংগঠক প্রথম লোকসভার সদস্য হিসেবে সম্মানিত বোধ করলেও, মনে করতেন সংগ্রামের কোনও এক চূড়ান্ত বিন্দুতে এই লোকসভাকেই কমিউনিস্টদের পরিত্যাগ করতে হবে। কিংবা, এ কে গোপালন। কেরালার এই প্রবাদ-প্রতিম নেতা স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন স্বাচ্ছন্দ্যে অনভ্যস্ত এবং প্রায়শই কঠিন অর্থসংকটে অভ্যস্ত কমিউনিস্টরা সংসদ-জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যে অস্বস্তিবোধ করতেন। সংসদের রীতি-করণ ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বরে অধিকাংশ কমিউনিস্ট সদস্যই একাত্ম হতে পারেননি,

বরং এসব যে জাতীয় জীবনের প্রকৃত প্রতিনিধিসভা হয়ে ওঠার পথে বাধাস্বরূপ, সেটাই মনে করতেন।

তবু বলাই যায়, স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদ 'ভারতীয় বিপ্লবের সন্তানদের' (নেহরু কথিত) বিশিষ্টতার বর্ণময়তায় সমুজ্জ্বল ছিল। প্রতিভাবান ও মধ্যমেধার এক বিচিত্র সহাবস্থান ছিল সেখানে। ছিল উৎসাহী কর্মদ্যোগী ও প্রত্যাশা-পূরণের ব্যর্থতায় হতাশ অথবা রক্ষণশীল ও র‍্যাডিকাল সদস্যবৃন্দের সহাবস্থান। ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন কুশলীশ্রেষ্ঠ সাংসদ। রাজ্যসভায় ছিলেন বি. আর. আম্বেদকর, হৃদয়নাথ কুনজ্রু এবং রামস্বামী মুদালিয়র-এর মতো পৃথিবীর যে-কোনও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-সভায় সম্মান ও সমাদর পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিত্ব। পরিণত বয়সে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত আম্বেদকর, ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে, সংবিধান-সংক্রান্ত প্রশ্নে অপ্রত্যাশিত শীতলতা প্রকাশ করলেও নিজের অবস্থান ও লক্ষ্যে কিন্তু কঠোরভাবে স্থিত ছিলেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের যে বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে আম্বেদকর আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে পেরেছিলেন, সংহতি ও সংগ্রামের প্রকৃত সদর্থক একটি আদর্শের অভাবে তা শেষপর্যন্ত কোনও প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠতে পারেনি। হৃদয়নাথ কুনজ্রু বৃটেনে জন্মালে হতে পারতেন একজন সেরা লিবারাল। রক্ষণশীল মুদালিয়র ছিলেন একজন অতি দক্ষ কমিটিম্যান, জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞ, যাঁর প্রতিভার সবটুকু প্রায় ব্যয়িত হয়ে যেত কোনও সামাজিক ভূমিকায় নয়, প্রশাসনিক খুঁটিনাটির তুচ্ছতায়।

প্রথম সংসদ অনেকাংশেই নক্ষত্রসভা। কংগ্রেস তরফে সি ডি দেশমুখ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভি ভি গিরি, রফি আহমেদ কিদোয়াই, টি টি কৃষ্ণমাচারি, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, হরেকৃষ্ণ মহতাব, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ। বাম-বিরোধী অ-কংগ্রেসি নক্ষত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থানটি অবশ্যই শ্যামাপ্রসাদের। ছিলেন আচার্য কৃপালনী, শিল্পপতি তুলসীদাস কিলাচাঁদ, অশোক মেহতা, হরিবিষ্ণু কামাথ, জয়পাল সিং, এন সি চ্যাটার্জী প্রমুখ।

বামপন্থীদের কাছে ১৯৫২-এর সাধারণ নির্বাচন ছিল মূলত নীতিবিষয়ক, দিগ্-নির্ণায়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রশ্নে লড়াই। অর্থ এবং পেশিশক্তির সহায়তা ছাড়াই প্রথম লোকসভায় কমিউনিস্ট সদস্যদের নির্বাচন এবং পরবর্তী দিনগুলিতে জাতীয় জীবনের সর্ব-বিষয়ে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সংসদ-প্রক্রিয়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার। একটি সদ্য-স্বাধীন, অনগ্রসর কৃষিভিত্তিক, শিল্পায়ন-উন্মুখ দেশ ও জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে প্রথম পার্লামেন্ট অনেকাংশেই সফল বলে হীরেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। এই প্রথম পার্লামেন্টে গুরুত্ব এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রভাবের নিরিখে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুই ছিলেন মধ্যমণি। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল জহরলাল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বও নিতেন গড়পরতার বেশি। সমস্ত জটিল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৫২ সালের মে মাসে সদ্যগঠিত সংসদের বস্তুত প্রথম উল্লেখযোগ্য বিতর্কে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর মন্তব্য করার সময়ে কমিউনিস্ট সাংসদদের নেতা এক গোপালন বলেছিলেন এটি হলো "ভারতীয় জনগণের উপরে সরাসরি যুদ্ধঘোষণার সামিল"। ক্ষিপ্ত জহরলাল জবাব দিয়েছিলেন যে এই মনোভাবের উত্তরে জানাতে হয় যে এটি হলো "ওদের (কমিউনিস্টদের) সঙ্গে আমাদের (কংগ্রেসের)

যুদ্ধ"। এই বিতর্ক চলাকালীনই সম্ভবত হীরেন্দ্রনাথই "প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিনিময়ে তিনি (নেহরু) ইতিহাসে নিজের স্থানকে হারিয়েছেন" বলে মন্তব্য করায় শান্ত কাঠিন্যে জহরলাল জবাব দিয়েছিলেন যে সাধ্যানুযায়ী দেশবাসীর সেবা করতে পারলে ইতিহাসে স্থান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আর বিচলিত নন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম পার্লামেন্ট বিতর্কে সরগরম ছিল। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের প্রশ্নে দিগ্‌নির্দেশক সিদ্ধান্তগ্রহণ ছিল জরুরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নয়া-ঔপনিবেশিক মার্কিনি রাজনীতির প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থান মজবুত করার প্রশ্নটিও ছিল জরুরি। এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরুর ভূমিকা যতটা না বেশি মহান আদর্শের ভাববাদী প্রচারকের ততটা ঠিক কার্যকরী জনমুখী নীতি প্রয়োগকর্তার নয় বলেও মনে হতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংসদে বহু আলোচনা ও বিতর্কের পর পাস হলেও অর্থনীতির ক্রমাবনতি আটকানো যায়নি। বস্তুত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংসদে তীব্র বিতর্ক ও আলোচনার পরে মৌলিক কিছু সিদ্ধান্ত ভারী শিল্পস্থাপনার উপরে গৃহীত হওয়ার পরে এবং পরস্পরযুক্ত ধারাবাহিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশীয় অর্থনীতির মজবুত বনিয়াদ গঠনের প্রারম্ভটি সূচিত হয় বলে হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। ধারাবাহিক ভাবে এরপর এস্টেট ডিউটি অ্যাক্ট, ইনডাসট্রিস (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, কোম্পানিস অ্যাক্ট এবং বিমান চলাচল, ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা জাতীয়করণের পরে দেশীয় অর্থনীতির একটি সুনির্দিষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহ আইন এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন গৃহীত হওয়ার ফলেও একটি নবপর্যায়ের সূচনা হয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত সংসদে গৃহীত হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা পালাবদলের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সুচিন্তিত পুনর্গঠনে, এই পর্ব ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনাপর্ব। এই ক্ষেত্রটিতে নেহরুর ভূমিকা অপরিসীম। নেহরু নিজেও মনে করতেন সুচিন্তিত স্বনির্ভর অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন ছাড়া পরাষ্ট্রনীতির সাফল্য সম্ভব নয়। এই সকল প্রশ্নেই সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যদের ভূমিকার যে প্রতিফলন জনমানসে ফুটে ওঠে সম্ভবত তারই জোরে ১৯৫৭-র দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কমিউনিস্ট পার্টি সংসদে সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের মর্যাদা পায়।

ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম বেসরকারি বিলটি এনেছিলেন কমিউনিস্টরাই। ১৯৫২ সালের ৭ জুলাই লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্য তুষার চ্যাটার্জী প্রথম ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন বিলটি সভায় পেশ করেন। সরকারি পক্ষের বিরোধিতায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যসভাতেও (১৬ জুলাই ১৯৫২) অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন সংক্রান্ত একই গোত্রের একটি বিল অগ্রাহ্য হয়। এছাড়াও ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচির যথাযথ রূপায়ণ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুনের বাড়াবাড়ি বন্ধ করা, বেকারিত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে প্রথম দুটি সংসদে কমিউনিস্টরা অক্লান্ত লড়াই চালিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলি বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য অ-বাম সদস্যদের অজ্ঞানতা অনেকসময় শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও কমিউনিস্ট সদস্যরা সরব হয়েছেন। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে কমিউনিস্ট সদস্য সুন্দরাইয়ার আনা একটি বেসরকারি বিল প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী দেশমুখ এবং তুলনায় অনেক অ-সংস্কৃত শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে ওইসব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের কায়দাকানুন তাঁরা জানেন না। শিল্পপতি লালচাঁদ হীরাচাঁদ রাজ্যসভায় এ-কথাও বলতে কসুর করেননি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে একজোড়া জুতো কেনার খরচও অপরিসীম।

বোম্বাইতে ১৯৫২-র জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদিত শিল্পপণ্যের এক বিশাল প্রদর্শনী এবং ওই বছরেরই গ্রীষ্মে মস্কোয় একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অধিবেশন হওয়ার পরেও সংসদের উভয় কক্ষেই এমনতর অজ্ঞান অর্থহীন বিরোধিতা কংগ্রেস সদস্যরা হামেশাই করতেন। ১৯৫৫ সালের পর থেকে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য আরও বিস্তৃত হওয়ার পরে তিন বছর আগে আনা সুন্দরাইয়ার বেসরকারি বিলটির প্রাসঙ্গিকতা জনসমক্ষে আরো গ্রাহ্য হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতারা অনেকেই বিভিন্ন সময়ে রাজ্যসভায় সদস্য ছিলেন। সুন্দরাইয়ার সমসাময়িক ভূপেশ গুপ্ত থেকে পরবর্তীতে অচ্যুত মেনন, এন কে কৃষ্ণন, যোগিন্দর শর্মা প্রমুখ। ১৯৫৫ সালে নব-নির্বাচিত অন্ধ্র বিধানসভায় দলের নেতৃত্ব দিতে সুন্দরাইয়া চলে গেলেও ভূপেশ গুপ্ত ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজ্যসভার স্তম্ভস্বরূপ। চকিত ধারালো প্রত্যুত্তর এবং তারপরেই শান্ত অমায়িকতায় ভূপেশের উপস্থিতি রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা ও গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়েছিল। বিরোধী সমালোচনাকে শাণিত যুক্তি ও মননশীলতায় ছিন্নভিন্ন করার ক্ষমতায় ভূপেশ গুপ্ত এতটাই দক্ষ ছিলেন যে রাধাকৃষ্ণন তাঁকে একবার হেলিকপ্টারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

প্রবীণদের সভা রাজ্যসভায় দীর্ঘদিন কংগ্রেসীদের নেতা ছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ। নেহরুর ডাকে কংগ্রেসী আক্রমণে নেতৃত্বদানের জন্য অনেকবারই তাঁকে ছুটে আসতে হতো লোকসভায়। অ-বাম নক্ষত্র হিসাবে রাজ্যসভায় কখনো বা লোকসভায় রয়ে গিয়েছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং শ্যামানন্দন মিশ্র। দুজনেই সুবক্তা, সংসদীয় আচরণে পারঙ্গম। ষাটের দশকের গোড়ায় রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে ডি এম কে নেতা আন্নাদুরাই ভাষাভিত্তিক রাজ্য বিষয়ে একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন যা আমাদের সংসদ-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে।

দ্বিতীয় লোকসভায় কমিউনিস্টরা আরো শক্তিশালী হয়েছেন। হীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং, রেণু চক্রবর্তী প্রভৃতি পুরোনো সদস্যরা তো আছেনই, এসে গিয়েছেন শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের মতো কিংবদন্তিসম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যাঙ্ক-কর্মচারী আন্দোলনের সংগঠক প্রভাত কর, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প শ্রমিকদের নেতা মহম্মদ ইলিয়াস, কানপুর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সংগঠক এস এম ব্যানার্জী, কলকাতা থেকে শ্যামাপ্রসাদের আসনে দাঁড়িয়ে জেতা

সাধন গুপ্ত। ১৯৫৮-তে উপ-নির্বাচনে জিতে লোকসভায় এলেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শাণিত যুক্তি, সুভদ্র আচরণ, কমিউনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতি একান্ত দায়বদ্ধতায় আমৃত্যু যিনি লোকসভার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। এলেন কেরালা থেকে পি কে বাসুদেবন নায়ার, পরবর্তীকালে যাঁর নাম চেয়ারম্যান প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

নেহরু-পর্বে সংসদ চিত্রণ আরো দুটি ঘটনার অনুল্লেখে অসমাপ্ত থাকবে। বান্দুং সম্মেলনে সদ্য-স্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশগুলির যে সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল, নেহরুই ছিলেন তার মধ্যমণি। ভারত-চীন সম্পর্কের একেবারে গোড়ার দিকে নেহরুর চীন-নীতি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যদিও ১৯৫৪ সালে নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার তিব্বত প্রসঙ্গে বিশেষ অধিকার ও সুযোগের নীতির প্রতি আবারও সমর্থন জ্ঞাপন করে। ক্রমশ যেন তারপর থেকে জে বি কৃপালনীর 'রেপ অফ টিবেট' জাতীয় মন্তব্যই ভারতের সরকারি নীতির প্রধান সুর হয়ে উঠতে থাকে। তিব্বত-কে নিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের যে আবহাওয়া ভারত-চীন সম্পর্ককেও একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করতে উদ্যোগী হয়, সেখানে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির পঞ্চশীল ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে ইন্দো-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অনুগমনকারীর ভূমিকা নেয়। এই প্রেক্ষিতে বলাই যায়, হীরেন্দ্রনাথও তা-ই মনে করেছেন, যে জোট-নিরপেক্ষ স্ব-নির্ভর জাতীয়স্বার্থ সচেতন পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের প্রশ্নে নেহরু তাঁর 'fastidious hesitancies'-এর জন্য ব্যর্থ হয়েছেন। বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ধারাবাহিক চীন বিরোধী অপপ্রচারকে সামগ্রিকভাবে ভারতের আপামর মানুষের মতামত বলে গ্রহণ করে নেহরুও ভুল করেছিলেন। বোঝা যায়, পঞ্চাশের দশকে শেষপর্ব থেকে জীবনের বাকি কটা বছরে নেহরু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের জটিল ও দ্বন্দ্বময় বিচরণক্ষেত্রে তাঁর পুরোনো নিয়ন্ত্রণ ও স্বকীয়তা হারাচ্ছিলেন। একথাও সত্য যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির পিছনে চীনের ভূমিকা কিছু কম নয়। কিন্তু ভারত সরকারই প্রথম চীন থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে। ১৯৫৪ সালের চুক্তির পুণর্নবীকরণের কথা চীন বললেও ভারত সরকার কর্ণপাত করেনি অথচ এই চুক্তিতে আমাদের তিব্বত-চীন সীমান্ত বরাবর রাজ্যগুলির তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় থাকার কথা বলা ছিল। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চীনের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি গ্রাহ্য করা না গেলেও আকসাই চীনের মতো একটি বরফ প্রান্তর নিয়ে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে আমাদের কোন লাভ হয়েছিল বোঝা মুস্কিল। অথচ চীন সরকারের পক্ষে আকসাই চীনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা জরুরি ছিল ভারত সীমান্তে খবরদারি করার জন্য নয় বরং তিব্বত ও সিন্‌কিয়াং প্রদেশের মতো দুটি রাজনৈতিক অস্থিরতাময় অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার জন্য। ১৯৬০ সালে চৌ এন লাই যখন ভারত সফরে এলেন প্রথম দফার সীমান্ত সংঘর্ষ হয়ে যাওয়ার পরেও, তখনও ভারতের তরফে কোনও প্রকৃত ইতিবাচক সমঝদারি নজরে আসেনি। একথা মনে করার কারণ যথেষ্ট আছে যে, নেহরু ব্যক্তিগতভাবে চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নেহরুর কিছু প্রবীণ ক্যাবিনেট সহকর্মী চীন বিরোধিতায় ছিলেন অনমনীয়। সংসদও ছিল বহু মিশ্র কণ্ঠের চীন-

সমালোচনায় মুখর। বিদেশ মন্ত্রকের কিছু আমলাও এই সময় ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নব উদ্যোগে ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করে যাওয়া তৎকালীন নেহরুর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

অপর বিষয়টি হলো কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকারের (1957-59) অন্যায় অপসারণ। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর পরিসরে থেকেও নির্বাচনকে হাতিয়ার করে একটি রাজ্যে কমিউনিস্টরা যে ক্ষমতায় চলে আসতে পারে কংগ্রেস-সহ কোনও অ-বাম রাজনৈতিক শক্তিই তা মেনে নিতে পারেনি। অথচ কমিউনিস্টদের আদর্শ ও সংহতির এমনই জোর ছিল যে বিধানসভায় মাত্র দু-জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, কোনও কমিউনিস্ট বিধায়ক ব্যক্তিগত লাভক্ষতির নিরিখে দলত্যাগ করেননি। করানোর চেষ্টার যদিও খামতি ছিল না। কংগ্রেস-সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে-কোনও মূল্যে কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে ভাঙার যে চেষ্টা শুরু হয় সংসদের অভ্যন্তরেও কংগ্রেস সাংসদরা তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাস্তবিক সোসালিস্ট সাংসদদেরও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে একই তীব্রতায় কেরালা সরকারকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরু, হীরেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে, বোধহয় ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে একটু লজ্জিতই ছিলেন। সংসদের অভ্যন্তরে কেরালা-কে কমিউনিস্ট-শাসন মুক্ত করার লক্ষ্যে চালিত কংগ্রেস-আক্রমণের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ। যদিও হীরেন্দ্রনাথ স্পষ্টই লিখেছেন, পন্থকে সামনে এগিয়ে দিলেও নেহরু কখনোই কেরালা সরকারকে হঠানোর কংগ্রেসী উদ্যোগ থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেননি। নেওয়ার কথাও তো নয়। হীরেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উপমাটি খুব খাঁটি— ১৭৭২ সালে প্রথম পোল্যান্ড বিভাজনের সময় অস্ট্রিয়ার মারিয়া থেরেসা কেঁদেছিলেন এই বলে যে এর ফলে এক মানুষই ভাগ হলো। শুনে প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক মন্তব্য করেছিলেন যে উনি কেঁদেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ভাগের পোল্যান্ড-টুকু নিয়েছেনও।

ভারতীয় জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মহিলা হলেও সংসদে মহিলা সদস্যদের অস্বাভাবিক কম সংখ্যা প্রসঙ্গে ১৯৭৫-এর পঞ্চম লোকসভায় আনা একটি বেসরকারি বিলে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিলেন—প্রথম লোকসভায় ছিলেন মাত্র তেইশ জন মহিলা সদস্য, আঠাশ জন ছিলেন দ্বিতীয় লোকসভায়, চৌত্রিশ জন মহিলা সদস্য ছিলেন তৃতীয় লোকসভায়, একত্রিশ জন চতুর্থ লোকসভায় এবং পঞ্চমবার মাত্র বাইশ জন। প্রথমাবধি এঁদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্যই ছিলেন যে-কোনও বিচারেই যাঁরা লোকসভার সেরা সাংসদ। আবার অনেকেই ছিলেন কিছুটা অন্তত লোকসভার সৌন্দর্যবর্ধনকারী। [হীরেন্দ্রনাথকে সবিনয়ে প্রশ্ন করা যাক্, এমনতর বিভাজন শুধু কি মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রেই করা সম্ভব? পুরুষ সদস্যদের ক্ষেত্রে নয়?] প্রথম ক্যাবিনেটে একমাত্র মহিলা সদস্য আজীবন গান্ধীবাদী রাজকুমারী অমৃত কাউর। কংগ্রেস তরফে প্রথম সভায় ছিলেন আম্মু স্বামীনাথন, সুষমা সেন, লক্ষ্মী মেনন, এম চন্দ্রশেখর। বিরোধী শিবিরে রেণু চক্রবর্তী, পার্বতী কৃষ্ণন এবং অবশ্যই সুচেতা কৃপালিনী। সুচেতা কৃপালনীকে হীরেন্দ্রনাথ লোকসভার অন্যতম সেরা বক্তা বলেছেন,

কৃষ্ণমাচারি যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন "She's hard as nuts"। লোকসভার সৌন্দর্যে কিছুটা হানি হলো বলে হীরেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যখন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর আন্তর্জাতিক দায়িত্বে সভাত্যাগ করলেন। বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে মাইমুলা সুলতান, শারদা মুখার্জী এবং গায়ত্রী দেবী ".......have contributed to parliament an element also as of decoration for which one may be greatful"।

তৃতীয় লোকসভা ছিল সর্বার্থেই সংকটময়। ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২), নেহরুর মৃত্যু (১৯৬৪), দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উত্থান, তারপরই ভারত-পাক যুদ্ধ (১৯৬৫), শাস্ত্রীজীর মৃত্যু (১৯৬৬) এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তৃতীয় লোকসভার উপরে অনিশ্চয়তার ছায়া ব্যাপ্ত হয়েছিল। প্রথম দুটি লোকসভায় নেহরুই ছিলেন ভরকেন্দ্র। তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হতো সিদ্ধান্ত এবং সমালোচনার ঝড়। একজন প্রকৃত ক্ল্যাসিকাল লিবারাল ডেমোক্র্যাটের মতোই দেশের সর্বোচ্চ জনপ্রতিনিধিসভার উপরে একান্ত শ্রদ্ধা তাঁর আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্ণ প্রকটিত ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আলোচনা—সংসদীয় গণতন্ত্রের এই মূল কথাটি তিনি সর্বদা মান্য করলেও মনস্থির করা নিয়ে তাঁর চিরকালীন দোদুল্যমানতায় তিনি প্রশাসনে কোনও সংহতি আনতে পারেননি। জনমোহিনী যে প্রতিভায় নেহরু হয়ে উঠেছিলেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা তা গড়ে তুলতে পারেনি কোনও জনমুখী প্রশাসন। যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও তিনি তৈরি করে উঠতে পারেননি কোনও অনুগামী সহকর্মীদল, কী প্রশাসনে, কী দলীয় সংগঠনে। তাঁর প্রতিভা যেন থমকে আছে এক অদ্ভুত মধ্যবিন্দুতে, হীরেন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "between the conception, and the creation, the emotion and response"।

দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্বভাবত স্বতন্ত্র। ব্যক্তিত্বে, আচরণে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতেও যদিও স্বয়ং নেহরুই তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা সম্ভবত ভেবেছিলেন। অগাস্ট ১৯৬৩-তে কামরাজ পরিকল্পনার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৬৪-র জানুয়ারিতে নেহরুই তাঁকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে আনেন শুধু তাই নয় পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কিছু দায়িত্ব দেবার কথাও ভেবেছেন। নেহরুর কাছে সেই মুহূর্তে অন্তত কোনও বিকল্প ছিল না। লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দক্ষতার প্রশ্নে প্রাথমিকভাবে কিছু সংশয় দ্বিধা থাকলেও এবং প্রধানমন্ত্রীত্বের শুরুতেই অনাস্থাপ্রস্তাব মোকাবিলায় তিনি কিছুটা অস্বস্তিতে থাকলেও অচিরেই তিনি স্ব-পদে বেশ পোক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৬৫-র ভারত-পাক সংঘর্ষে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যোগ্যতার পরীক্ষায় তিনি বেশ ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হন। হিন্দিভাষা প্রীতি থাকলেও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সংসদে অধিকাংশ সময় তিনি ইংরেজিতেই বলতেন এবং জনশ্রুতি অন্যরকম থাকলেও, বলতেন প্রাঞ্জল ও জোরালো ইংরেজিতেই। খুব সাধারণ পরিবার ও পরিবেশ থেকে উঠে এসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বলে লালবাহাদুরের জনজীবনে এক বিশেষ সমাদর থাকলেও ক্ষমতার রাজনীতির অলিগলি বিষয়ে তিনি যে মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে কংগ্রেসী-প্রচার অভিযানের মুখ্যচালকের দায়িত্ব তাঁকেই

দেওয়া হয়েছিল। এ-কথাও স্মরণে রাখা প্রাসঙ্গিক যে কেন্দ্রে রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারে পুলিশমন্ত্রী ছিলেন। বলাবাহুল্য নিছকই ভালোমানুষি দিয়ে পুলিশ দপ্তর সামলানো যায় না।

এরই সঙ্গে ১৯৬৪-র এপ্রিলে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হলো। অত্যন্ত সংকটময় ও জটিল এক কালপর্বে যখন সংসদের অভ্যন্তরে ও বাইরে বামপন্থী শক্তির সংহত ও সক্রিয় উপস্থিতি ছিল অত্যাবশ্যক তখনই এই দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন। চীন সরকারের যে সব প্ররোচনামূলক কাজগুলি পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে উত্তরোত্তর বাড়ছিল এবং যার প্রতিক্রিয়ায় ভারত সরকার ও অ-বাম রাজনৈতিক দলগুলির দূরদৃষ্টিহীন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তিক্ত থেকে তিক্ততর করে তুলছিল ক্রমশ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্দরে তাত্ত্বিক বিরোধ থেকে শেষ পর্যন্ত পার্টি ভাগ হয়ে যায়। সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যদের সংঘবদ্ধ রূপ ও কার্যকলাপ এতদিন তাদের বিরোধী সরকার পক্ষ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সতর্ক থাকতে বাধ্য হতো। পার্টি ভাগের পরে সংসদেও কমিউনিস্ট বিরোধিতা এতটাই লাগামহীন হয়ে যায় যে তা অনেক সময়ই যেন শালীনতা ও সংসদীয় আচরণবিধির প্রতিকূল হয়ে পড়ে। কী কংগ্রেস, কী সোসালিস্ট, কী স্বতন্ত্র পার্টি—কমিউনিস্ট বিরোধিতায়, অনেক সময় এমনকী স্পীকারের নির্দেশ অমান্য করেও, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলতেও পিছপা হননি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্য, এমনকী সাংসদ-ও আছেন সেই তালিকায়, গ্রেপ্তার হন। কোনও দল বেআইনি ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই দলের একজন সাংসদের পক্ষে সংসদের অভ্যন্তরে সক্রিয় থাকাই "Paramount to all other claims', হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন। কিন্তু সি পি আই এই নীতি রক্ষায় স্পিকারের কাছে বারংবার আর্জি জানালেও সরকারের অনমনীয় মনোভাবে এবং স্পিকার হুকুম সিং-এর দ্বিধাগ্রস্ততায় সুফল ফলেনি।

সংসদীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যে ধারায় এগিয়েছে স্পিকার পদাধিকারীদের ব্যক্তিত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে দিয়েও সম্ভবত তার একটি আভাস পাওয়া যায়। এমন স্পিকার জি ভি মভলঙ্কার। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আচরণে এ ব্যঞ্জনা স্পষ্ট ছিল যে লোকসভার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষায় তিনি সদা সতর্ক। কখনো এমনকী তাঁর কোনও রুলিং হাসির খোরাক্ জোগালেও, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সর্বদাই সদস্যদের সম্মান পেয়ে এসেছেন। হীরেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "Mavalankar was on any computation a great Speaker, a dignified if sometimes stodgy stickler for the rules and yet the kind of presiding officer whom the House, howsoever critical and exciting, could not fail to respect"। দ্বিতীয় স্পিকার অনন্ত সায়নম আয়েঙ্গার ছিলেন বুদ্ধিমান। কিছুটা প্রাচীনপন্থী, একধরনের 'Brahmanic independence of mind' নিয়ে বেশ আকর্ষণীয় চরিত্র। তৃতীয় স্পিকার সর্দার হুকুম সিং আলাদা গোত্রের মানুষ অনেকটাই এবং প্রথম স্পিকার যিনি বিচার বিভাগের অভিজ্ঞতা নিয়ে লোকসভা সামলাতে এলেন। প্রতিষ্ঠিত রীতি-পদ্ধতি মান্যতা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল বিচারকসুলভ। কিন্তু ১৯৬২-র ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় থেকেই যেন

লোকসভার আবহাওয়াটা বদলে গেল। বিশেষ করে পরপর কয়েকটি লোকসভা উপ-নির্বাচনে জিতে রামমনোহর লোহিয়া, জে বি কৃপালনী ও এম আর মাসানি লোকসভায় আসার পরে ভারত-চীন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এঁদের তীব্র নেহরু-বিরোধিতা লোকসভার পরিবেশকে যেন কিছুটা পালটে দিতে লাগল। সঙ্গে যুক্ত হল নতুন সদস্যদের একাংশ যাঁদের সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন, "...there was now a new crop—aggressive, unself-conscious, and in the case of a few, also hardworking and preternaturally tenacious in shouting away with whatever they had to say, which was not always sensible and sometimes a trifle vulgar in the manner in which it was said."

চতুর্থ স্পিকার এন সঞ্জীব রেড্ডি সম্পর্কে সেই কথাটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য যে, স্পিকার পদটি "...does not demand rare qualities but it demands common qualities in a rare degree"। সম্ভবত কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে ১৯৬৭-তে সঞ্জীব রেড্ডি ক্যাবিনেট থেকে বাদ পড়েন। তুষ্ট করতে স্পিকার পদে মনোনয়ন। যদিও এতে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। সঞ্জীব রেড্ডিকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ঘটনা কংগ্রেস দল ও ভারতীয় রাজনীতির পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ড. জাকির হুসেনের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রপতি পদে সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিভাজন। সঞ্জীব রেড্ডির বাম-বিরোধী দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট—১৯৬৮-র গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে লোকসভার বিভিন্ন দল ও মতের সোভিয়েত-বিরোধী সদস্যদের চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নোত্তরপর্ব অচল করে দেওয়ার পিছনে তিনি যে পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটি স্পিকার পদের মর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়। পরবর্তী স্পিকার ধীলন একসময় আবার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন। সংসদীয় প্রথা ও ঐতিহ্যে বোধকরি মন্ত্রীপদ থেকে স্পিকার হওয়া সঙ্গত হলেও, স্পিকার পদ থেকে ক্যাবিনেটে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এরপরের স্পিকার বলিরাম ভগতের কার্যকাল সংসদীয় প্রথার নিরিখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় আর জানুয়ারি ১৯৭৭-এ লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাতে ছেদ পড়ে যায়।

ঘটনাপ্রবাহের অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর অভিষেক যেমন চমৎকারিত্বে ভরা তেমনই সংঘাতময় তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম ক'টি বছর। কংগ্রেস নেতাদের যে গোষ্ঠীটি নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থে ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেছিল পরবর্তী ঘটনাক্রম তাদের শুধু নিরাশ করেনি, তাদের রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি ও বিন্যাসকেও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। শুরুটা ছিল ইন্দিরার বেশ নড়বড়ে। ১৯৬৬-র শরৎ-অধিবেশনে এলো অনাস্থা-প্রস্তাব। এস কে পাতিল, সি সুব্রমনিয়ম এবং অশোক মেহতা—এই মন্ত্রী-ত্রয়ীর কুখ্যাত কার্যকলাপে সংকট ঘনালো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অশোক মেহতার সেই কুখ্যাত বক্তৃতা 'Open India's Womb' যাতে বিদেশি বিশেষত মার্কিন পুঁজির অবাধ প্রবেশ সম্ভব হয়। অথচ সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা তাঁর শীতল আভিজাত্য আর উজ্জ্বল একাকিত্ব নিয়ে নীরব যেন কিছুটা, হীরেন্দ্রনাথ

বলছেন 'Uncomprehendingly'। হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন, এই পর্বে ইন্দিরা লোকসভায় মোটেই নজরকাড়া উপস্থিতি নয়, বরং কিছুটা আড়ষ্ট, প্রায়শই লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন, কখনো বা অনাবশ্যক নীরব, শুধু যেন সাম্প্রদায়িক কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ইন্দিরা জ্বলে ওঠেন দৃঢ়মূল কোনও তাগিদ থেকে। ১৯৬৭-র নির্বাচনে দল হিসাবে কংগ্রেস বড় ধাক্কা খেল। একাধিক রাজ্যে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে, প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার এলো। দেশ জোড়া একদলীয় শাসনের শেষের শুরু ১৯৬৭-তেই। তবু বলা দরকার কেন্দ্রে ভোট কমলেও ক্ষমতায় যে কংগ্রেস টিকে যেতে পেরেছিল তার অনেকখানি কৃতিত্ব প্রাপ্য ইন্দিরার অক্লান্ত প্রচারাভিযানের। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভুবনেশ্বরে এক নির্বাচনী জনসভায় তাঁকেই উদ্দেশ্য করে পাথর ছোঁড়া হলেও, ইন্দিরা সভা ত্যাগ করেননি। পাথরে ইন্দিরা গুরুতর আহত হন। নাকে প্লাসটিক সার্জারি করা হয় পরে। কিন্তু অপারেশন করে অতি দ্রুত তিনি আবার প্রচারাভিযানের নেতৃত্বে ফিরে আসেন। এই সাহস আর বিপদের মুখে নিজের অবস্থানে স্থির থাকতে পারার শক্তিই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার সাফল্যের চাবিকাঠি। দেশভাগের পরে ১৯৪৭-র অন্ধকার দিনগুলোয় দিল্লির পথে পথে তরুণী ইন্দিরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন তারই রকমফের দেখা গিয়েছে বারবার—১৯৬৭-তে জাকির হুসেনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সময়, ১৯৬৯-এ কংগ্রেসের ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে সিন্ডিকেট নেতাদের বিরুদ্ধে লড়ার প্রয়োজনে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর্বে কিংবা ১৯৭২-এর নির্বাচনে।

পিতার মতো কোনও আদর্শের' প্রতি ঝোঁক ইন্দিরার ছিল না। নেহরু সর্বদাই হতে চেয়েছেন, লেনিনীয় ধারণায় যাকে বলে, 'in step with history'। ইন্দিরা, তীব্র বাস্তবমুখিনতায় সর্বদাই চেয়েছেন সমস্যার কোনও গ্রাহ্য সমাধান, সমস্যার মৌলিক কার্য-কারণ সম্পর্ক সেখানে খুব একটা বিবেচ্য নয়, বরং প্রয়োগ-যোগ্যতাই সমাধানের একমাত্র পথ, অন্তত ইন্দিরার কাছে। ঘনিষ্ঠ দুজন সহকর্মী জগজীবন রাম এবং যশোবন্তরাও চ্যবন-কেও ইন্দিরা তেমন বিশ্বাস করতেন না। অথচ মোরারজী দেশাই-কে হঠাবার জন্য এই দুজনের সহায়তাকে তিনি ব্যবহার করতে পেরেছেন। পিতার মতোই, যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায়, ইন্দিরাও দলে ও সরকারে নিঃসঙ্গ ছিলেন।

চতুর্থ লোকসভা (1967—72) থেকে বস্তুত নেহরু ও তাঁর সমসাময়িকতার চিহ্নগুলি একেবারেই অপসৃত হয়ে যায়। বরং দেখা দেয় কিছু নতুন ধরনের সমস্যা, যেমন দলত্যাগের রাজনীতি। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একদলীয় প্রাধান্যের যুগ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 'আয়া রাম গয়া রামের' রাজনীতি গড়ে উঠতে থাকে কারণ অ-কংগ্রেসি রাজ্য সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এটাই ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পন্থা।

দল ও সরকারে তখন ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর নিকট ও দূর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন, ইন্দিরা একে একে তাঁদের নিরস্ত্র করে দিতে পেরেছেন। আর এই লক্ষ্যে ইন্দিরা ব্যবহার করেছেন এক আশ্চর্য অস্ত্র—জনমুখী এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি যা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ইন্দিরার অবস্থান তাঁর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেক বেশি মজবুত করে তোলে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা

বিলোপ, গরিবি হঠাও স্লোগান নিছক একজন রাজনৈতিক নেতা থেকে জনগণের নেতা হয়ে ওঠার পথে ইন্দিরাকে সাহায্য করেছে। তারপর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাকে হারাবার পরে ইন্দিরা 'ভারতমাতা'-র ভূমিকায়। বস্তুত সত্যের খাতিরে মানতে হয় যে, হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন, ১৯৭১ এবং ১৯৭২-র নির্বাচনে ভারতবর্ষে ক্যারিসম্যাটিক নেতা একজনই—তিনি ইন্দিরা গান্ধী।

পরিবর্তনের সূচক যে জনমুখী কর্মসূচি ও স্লোগান চতুর্থ লোকসভায় ঘোষণা করে ১৯৭১ ও ১৯৭২-র নির্বাচনে ইন্দিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেন, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও প্রকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিন্তু সূচিত হয়নি। কারণ প্রকৃত ইতিবাচক কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তার অভাবই প্রতীয়মান হয়।

সংসদের প্রতি আচরণেও জহরলাল ও ইন্দিরার প্রভেদ বিরাট। জহরলাল লোকসভায় ঢুকতেন স্পিকার-আসনের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে। অধিবেশন চলাকালীন আসতেন প্রত্যহ। নিয়মিত আলোচনায় অংশ নিতেন। বিরোধীদের সমালোচনার তীর যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ্য করেই বর্ষিত হতো, জবাব-ও দিতেন সেইমতো। কোনও সহকর্মী মন্ত্রী বিরোধী সমালোচনায় বিপদগ্রস্ত হলে তাঁকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু, এমন দৃশ্য হামেশাই দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ। ইন্দিরা হেঁটেছেন উল্টোপথে। ১৯৬০-৭০ পর্বে যখন লোকসভায় ইন্দিরা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিছুটা টালমাটাল, তিনি সংসদের আলাপ আলোচনায় তবু কিছুটা মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পঞ্চম লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসার পরে ইন্দিরা যেন সংসদের প্রতি আরো উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। এমনও বহুক্ষেত্রে হয়েছে যে অধিবেশন চলাকালীন সংসদ-ভবনে উপস্থিত থাকলেও ইন্দিরা সভায় আসেননি। বহুক্ষেত্রেই বিরোধী সমালোচনা সামলাবার দায়িত্ব অক্ষম স্কন্ধে বহন করতেন সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রী রঘুরামাইয়া। অথচ প্রধানমন্ত্রী সমগ্র লোকসভার নেতা বলেই সভার কাছে দায়বদ্ধতার প্রমাণ তারই সবচেয়ে বেশি দেওয়া উচিত।

পঞ্চম লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রিভবন ঘটে গেছে এমনভাবে যা ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি। সংসদ-কে পাশ কাটিয়ে তৈরি হয়েছে তোষামোদ প্রিয় এক কিচেন-ক্যাবিনেট। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বদল হচ্ছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে। চলছে কালোটাকার সমান্তরাল অর্থনীতি। জনগণের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব বাড়ছে। এরই মধ্যে ইন্দিরার সংসদীয় গণতন্ত্রের জায়গায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রতি পক্ষপাত বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় আশঙ্কা ও ক্ষোভ বাড়তে থাকে। সংসদের সঙ্গে সুসম্পর্কের অভাবে জনমানস সম্পর্কে ধারণাও তেমন স্বচ্ছ থাকে না। ১৯৬৯-৭১ পর্বে ইন্দিরা নবীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনমানসে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন পঞ্চম লোকসভায় তা সম্পূর্ণ অপসৃত।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এমন সুযোগ আগে কখনো পায়নি। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থীদের একটি হতাশ অংশ। আর্থিক মন্দা, দুর্নীতি, প্রশাসনিক

অব্যবস্থা-জনিত জনক্ষোভকে ব্যবহার করে এই অবস্থায় চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এক 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর ডাক দিল। যারা কোনওদিন আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থা ভেঙে পরিবর্তনের কথা বলেনি, তারাই আওয়াজ তুললো 'সর্বাত্মক বিপ্লব'।

সংসদ-কে এড়িয়ে যাওয়া যদি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার দোষ হয়, তবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাটা সংসদেরও ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার জন্য ভারতবর্ষের দুটি কমিউনিস্ট দল দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। পার্টি ভাগ থেকে এই পঞ্চম লোকসভা পর্যন্ত সময়কাল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে দুঃসময় পর্ব বলা যায়। বিভাজিত সাংগঠনিক শক্তি, কী সংসদের বাইরে, কী ভিতরে, সর্বভারতীয় স্তরে কোথাও পরিস্থিতির সামান্যতম নিয়ন্ত্রকও হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৭৪ সালে দেশজোড়া প্রায় সর্বাত্মক রেল ধর্মঘটের মোকাবিলায় সরকারি দমননীতি ক্রমশই যেন ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগল। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসরবরাহে বাধা সৃষ্টির অজুহাতে এই ধর্মঘটকে দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে সরকার কার্যত ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেই চূড়ান্ত ধাক্কা দিতে চেয়েছিল। বিরোধীপক্ষ সমবেতভাবে সংসদের অভ্যন্তরে এর মোকাবিলা করলেও সরকার অনমনীয় রইল। মধু লিমায়ে ও হীরেন মুখার্জীর সঙ্গে সংসদের অভ্যন্তরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার এই প্রসঙ্গে বাদানুবাদের যে চিত্র পার্লামেন্টারি প্রসেডিংস-এ পাওয়া যায় তার থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে বিরোধীপক্ষের সব সমালোচনাকেই সরকার অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। লোকসভায় হীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য পাই যে সরকার ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস ও এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটদের ধর্মঘট, বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট, মহারাষ্ট্রে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতিও সরকারি মনোভাব ছিল অত্যন্ত কড়া। শুধু বিরোধীপক্ষ নয়, কংগ্রেসের মধ্যেও যে কজন সাংসদ এই সরকারি মনোভাবের বিরোধিতা করলেন, ইন্দিরা তাঁদের সঙ্গেও কোনওরকম আলোচনার প্রয়োজন মনে করেননি। এই সংকটজনক মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি-তে সমস্তিপুরে এক বোমা বিস্ফোরণে রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র নিহত হলেন। দলহীন গণতন্ত্রের প্রচারক জয়প্রকাশ নারায়ণকে সামনে রেখে এবার ইন্দিরা-বিরোধী নানা মতের নানা দল ও ব্যক্তি চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হলো। এরই মধ্যে ১৯৭৫-র জুনে এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি ইলেকশন পিটিশনকে ভিত্তি করে ইন্দিরার সাংসদ পদে নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করল এবং ইন্দিরাকে ছয় বছরের জন্য লোকসভা থেকে নির্বাসিত করার কথা বলা হলো। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়কে আইনি পথে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে ইন্দিরা এবার ২৬ জুন ১৯৭৫ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। যুক্তি হলো আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা।

২১ জুলাই ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার মধ্যেই সংসদের যে অধিবেশন বসলো, সেখানে প্রায় ত্রিশ জন বিরোধী নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে অনুপস্থিত। সংসদের এ যাবৎ কালের প্রতিষ্ঠিত রীতি প্রকরণ সব প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো হীরেন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'capitve body'।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলেন। এমন একটা আশংকা থেকেই গিয়েছিল যে ভারতেও এমন কোনও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ঘটতে পারে। বিশেষ করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ করার ডাক দিয়ে জয়প্রকাশ এমন একটি সম্ভাবনার ধারণা তৈরিতে মদত দিয়েছিলেন। ফলত জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ি এমন একটা স্তরে পৌঁছলো যে সারা দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপরেই আঘাত নেমে এল নজিরবিহীন ভাবে। পরবর্তীকালে এ কথা প্রকাশিত হয়েছে যে, জরুরি অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বিশেষ কয়েকজন পরামর্শদাতার প্ররোচনায় মূলত একাই নিয়েছিলেন। মন্ত্রীসভায় তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ দুজন সহকর্মী, জগজ্জীবন রাম ও যশোবন্ত রাও চব্যনও এ বিষয়ে কোনও পূর্বাভাস পাননি। যদিও সংসদের অনুমোদন চেয়ে জরুরি অবস্থা জারির রেজলিউশন পেশ করেছিলেন জগজ্জীবন রাম-ই। ইন্দিরা গান্ধী এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন মাত্র।

এবার ১৯৭৭-র মার্চে যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ভারতবর্ষের মানুষে সেখানে জরুরি অবস্থা জারির বিরুদ্ধে, ইন্দিরা গান্ধীর একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

জরুরি অবস্থার সময় সি পি আই-এর ভূমিকা নিয়ে এ যাবত বহু তর্ক উঠেছে। সত্যের অপলাপ না করলে এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও দেশ-জোড়া গণ আন্দোলন কোনও রাজনৈতিক দলই গড়ে তোলেননি। বরং বিশ-দফা কর্মসূচির ঘোষণার মধ্য দিয়ে এমন একটি ধারণা সরকার প্রাথমিকভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন যে জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব ও প্রগতির একটি আবহাওয়া গড়ে উঠতে চলেছে। সেই কালপর্ব পার হয়ে এসে আজ বোঝা যায় তাৎক্ষণিক বড় ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না উঠলেও, জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিকগুলো সম্পর্কে মানুষ অচিরেই যে সচেতনতা অর্জন করে তারই প্রকাশ ১৯৭৭-র মার্চে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে। মধ্যবর্তী সময়ে সংসদ-অধিবেশন হয়েছে কয়েকটি, তবে সংখ্যায় ও মেজাজে সেগুলি সাধারণ সময়ের মতো বলাবাহুল্য নয়। সি পি আই প্রাথমিক অবস্থায় জরুরি অবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এই প্রত্যাশায় যে ১৯৭৫ নাগাদ দেশজুড়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল যেসব শক্তিসমূহ জয়প্রকাশের সর্বাত্মক বিপ্লবের ধ্বনির আড়ালে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এবং সেনাবাহিনীকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে আনার ডাকের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যে চক্রান্ত ভারতীয় গণতন্ত্রের বনিয়াদটিকেই ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল, জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতবর্ষের মাটিতে সেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত রূপায়ণের উদ্যোগটিকে প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু দেশের বিশেষ করে কংগ্রেসের সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাস সম্পর্কে একটি মৌলিক ভ্রান্তি এবং ইন্দিরার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধী অবস্থানের নিরিখে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও তাঁর উপরে অতিরিক্ত ভরসা করার সিদ্ধান্তের কারণে সি পি আইকেও বড় রকমের মাশুল দিতে হয়। কিন্তু বামপন্থী তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক নেতা ইন্দিরার ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশাধিকার না পেয়েও কখনো সখনো ভেবেছেন যে তাঁরা ইন্দিরার নীতি ও আচরণকে

প্রভাবিত করতে পারবেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন।

জরুরি অবস্থার মধ্যে heir-apparent হিসাবে ইন্দিরার কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়ের উত্থান ভারতীয় রাজনীতির একটি করুণ ঘটনা। ১৯৭৫-এর শেষার্ধ থেকেই যুব-কংগ্রেস সংগঠনের শীর্ষে চাপিয়ে দেওয়া নেতা হিসাবে সঞ্জয় সরকারের বিভিন্ন কাজে শুধু নয় মূল অর্থনৈতিক নীতিকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেন। বৃহৎ পুঁজির অনুগামী, রাষ্ট্রীয়-উদ্যোগ বিরোধী এবং তীব্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষে ভরপুর এই যুবক মায়ের ওয়াচ ডগ হিসাবে বাস্তবিক সমস্ত সরকারি বিভাগে খবরদারি শুরু করেন। দিল্লি শহরের সৌন্দর্যায়নের নামে গরিব মানুষের ঝুপড়ি উচ্ছেদ, তুর্কমেন গেটের ঘটনা কিংবা জবরদস্তি নাসবন্দিকরণের মধ্য দিয়ে সঞ্জয় জরুরি অবস্থার ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও পুত্রের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে শুধু বিশ-দফা কর্মসূচি নয়, দেশের পক্ষে সঞ্জয়-প্রচারিত পাঁচ-দফা কর্মসূচিও মানা জরুরি। অথচ যত চাপের মধ্যেই হোক্ না কেন বিশ-দফা কর্মসূচি সংসদে গৃহীত হয়েছিল কিন্তু পাঁচ-দফা কর্মসূচি এমনকী কংগ্রেস সংগঠনের দ্বারাও আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়নি।

সঞ্জয়ের রাজনৈতিক উত্থান প্রসঙ্গে কিন্তু সি পি আই-ই প্রথম 'সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার কেন্দ্র' বিশেষণটি ব্যবহার করেছিল। ১৯৭৭-র মার্চে ষষ্ঠ লোকসভার রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণে এই শব্দগুচ্ছ উল্লিখিত হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের যে প্রসঙ্গটি ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে হামেশা ব্যবহৃত হয়, মাতা-পুত্রের এই যৌথ অভিযানকে বেশ কিছুদিন ধরেই সহ্য করার প্রসঙ্গে সেই সমালোচনাটি থেকে বাম-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিও মুক্ত নয় বলে হীরেন্দ্রনাথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৭৭-র এপ্রিল মাসে সি পি আই নেতৃত্ব স্বীকার করেন যে জাতীয় বুর্জোয়া ও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাদের প্রতিনিধিদের নেতা হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল উপাদানের উপরে দল বেশি ভরসা করেছিল। একজন একনিষ্ঠ পার্টি সদস্য ও অনুপাতহীন কমিউনিস্ট হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে এই অতি-প্রত্যাশা আরো অনেক দ্রুত সদর্থক ও সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এদেশে একচেটিয়া পুঁজির অত্যন্ত সুসময়ে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের উদ্যোগেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র শব্দটি অনুপ্রবিষ্ট করেছিল (নভেম্বর ১৯৭৬)। সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন অন্তত এমনতর অভিমত বা আশঙ্কা প্রকাশ করেওছিলেন। সত্যের খাতিরে বলা উচিত, সংসদের ভিতরে ও বাইরে সি পি আই জরুরি অবস্থার জনবিরোধী দিকগুলি নিয়ে সাধ্যানুযায়ী প্রতিবাদ করেছিল, যেমন সংবিধানের বিয়াল্লিশতম সংশোধনের কয়েকটি ধারা প্রসঙ্গে। কিছুটা পরিস্থিতির চাপে অনিচ্ছুকভাবেই হয়ত কিন্তু জরুরি অবস্থার প্রতি সাধারণ সমর্থন, এমনকী প্রাথমিক প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার পরেও, সি পি আই-এর ভুল সিদ্ধান্ত বলেই ধরতে হবে, হীরেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। অন্যদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই এম) জরুরি অবস্থার সময় সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকলেও সি পি আই-এর মতো কংগ্রেসের ফাঁদে পা দেয়নি। এই সতর্কতার সুফল তাঁরা পেয়েছেন ৭৭-র নির্বাচনে। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "...'Marxist' rivals, largely passive during the emergency, had the advantage the least of

being clever enough not to get tarred with the Congress brush; nothing suceeds like success however, and their opportunism had paid." ।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নিদারুণ পরাজয় এবং মধ্য ও দক্ষিণপন্থী দলগুলির মিশ্র একটি শক্তি ক্ষমতা দখল করার পরে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ক্ষমতা অলিন্দে প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে—তা হলো, দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কেন্দ্রে বিরোধী আসনে বসেই কংগ্রেস ঘোষিতভাবেই রাষ্ট্রপতির ভাষণে উল্লিখিত দ্বি-দলীয় শাসনের ধারণাকে স্বাগত জানায়। ইতিহাসের এক নাটকীয় ভঙ্গিমায় ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থের একটি বিশেষ দিক এখানে উন্মোচিত। জাতীয় বুর্জোয়ার একচেটিয়া পুঁজির রক্ষক হিসাবে তাদের শ্রেণীস্বার্থেই কংগ্রেস যেমন একদিন 'সমাজতন্ত্র' শব্দটিকে প্রস্তাবনায় ঢুকিয়েছিল, ঠিক তেমনই কিছুটা পরিবর্তিত শ্রেণী-আঁতাতের প্রেক্ষিতে একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের যৌথ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের পরে দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ উপমা টেনেছেন চমৎকার—"...both the Janata and Congress carry baskets where the monopoly bourgeois-landlord interests in the country can safely deposit their eggs, not worrying over much which turns out to be the ruling party."

তাহলে পরিবর্তনের অর্থ কি এদেশে নিছকই শাসকশ্রেণীর গোষ্ঠী আঁতাতের রকমফের? এর বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণীসমূহের সমধর্মী আদর্শের ভিত্তিতে একটি ব্যাপকতর ঐক্য গড়ে তোলা কি একান্ত অসম্ভব? হীরেন্দ্রনাথ এরকমই একটি ঐক্যের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় শেষপর্বে, যেখানে ভারতের দুটি কমিউনিস্ট পার্টি শুধু নয়, সমস্ত বামপন্থী দল ও সংগঠন এমনকী 'ultras'-দেরও সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি এমনই এক প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যাঁর বিদগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ভারতের প্রথম পঁচিশ বছরের সংসদীয় রাজনীতি একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। যাঁর লেখনীতে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গভীর রসবোধ, আদর্শগত সততার সঙ্গে দূরদৃষ্টির এক আশ্চর্য সমাপতনে সংসদীয় রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তথাপি এই স্মৃতিচিত্রণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে আরো একটি নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসা—হীরেন্দ্রনাথও আভাসে তুলেছেন একথা—জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের যে অঙ্গীকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান রূপ তার পক্ষে কতটা প্রাসঙ্গিক?

"...When country's sovereighty and integrity is clouded over by 'surrogate colonialism'...the national forum hardly hears the voice of our collective reason and national self-respect." ।

ইতিহাস ও অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আজ একথা আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলকারী ভারতীয় শাসকশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যেই ছিল আঁতাতের রাজনীতি। প্রেক্ষিত ও আশু-প্রয়োজনের বিচারে সেই আঁতাতের সামান্য রকমফের ঘটেছে মাঝেমধ্যে। ভারী শিল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগভিত্তিক নেহরু-পরিকল্পিত স্বনির্ভর

অর্থনীতি থেকে 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ' স্লোগান তোলা স্থিতাবস্থা রক্ষায় সফল রাষ্ট্রশক্তি হয়ে রাজন্যভাতা বিলোপকারী ভূমিকা ছুঁয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ-দফা কর্মসূচি এবং জরুরি অবস্থা—এসবই মূলত একমাত্রিক শ্রেণীস্বার্থের গড়গড়িয়ে পথ চলা। জরুরি অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে আঁতাতের আভ্যন্তরীণ শক্তিবিন্যাসে কিছুটা অদলবদল হয়েছে বলেই দ্বিদলীয় শাসন কিংবা আরো সাম্প্রতিককালে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বদলে এমনকী রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও শোনা যাচ্ছে। পুঁজির বিশ্বায়নের পর্বে এই গোষ্ঠী আঁতাতের বিন্যাসে আরো কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই সাম্প্রদায়িকতার প্রবল উত্থান কিংবা স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ। ভারতে আর্থ-সামাজিক প্রকৃত পরিবর্তন, বৈপ্লবিক যদি না-ও বলি, তাই সংসদীয় রাজনীতির সাফল্য বা ব্যর্থতার উপরে নির্ভর করে না। বরং নির্ভর করে সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দির বাইরে ব্যাপকতম বিকল্প আঁতাত, বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসারিততম ঐক্য কবে এবং কীভাবে গড়ে উঠবে, তার-ই উপর। সংসদীয় কাঠামো একটি রাজনৈতিক প্রকরণ হিসাবে প্রাসঙ্গিকতা হয়তো এখনো হারায়নি। তবে প্রকৃত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংসদকে ব্যবহার করতে হলে, ক্ল্যাসিকাল উদারনৈতিক ভাবধারা পুষ্ট রীতি ও আচরণপদ্ধতির অনুশীলন ও প্রয়োগ কোনও পদ্ধতি নয়, এক্ষেত্রে পথ ও পদ্ধতি হতে পারে একমাত্র মেহনতি মানুষের ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা, শাসন ক্ষমতার বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণী-সমূহের ব্যাপকতম ঐক্য যা নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের পথ খণ্ডন করে নতুন রাস্তা নির্মাণ করতে সক্ষম। এ দায় ও দায়িত্ব বামপন্থীদের এবং বলা ভালো মূলত কমিউনিস্টদেরই।

আলোচ্য গ্রন্থ : Portrait of Parliament : Reflection and Recollection (1952–77)—Hiren Mukerjee

(Basumati Corporation Ltd) Rs 65.

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি

জ্যোতিভূষণ চাকী

প্রথমেই বলি সুন্দর সাবলীল যে রীতি সেটাই তাঁর রীতি। 'গদ্' মানে কথা বলা। গদ্ থেকেই গদ্য কথাটা। কথা বলার স্বাভাবিক ঢংটাই যদি একটা style হয় তাহলে হীরেনবাবুর গদ্যরীতিও তাই।

বহুদর্শী ও বহুস্পর্শী মানুষটি বহুকাল ধরে পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলায় লিখে এসেছেন। হতে পারে ইংরেজি প্রকাশের কোনো উক্তি বাংলায় এসে থাকবে। তবে আমার সেটা চোখে পড়েনি। বাংলার নিজস্ব প্রকাশধর্মই স্বচ্ছ ধারায় তাঁর গদ্যরীতিতে প্রকাশিত।

প্রথম পত্রের ভূমিকার একটি অংশ দেখুন—

"আর-একজন অবিস্মরণীয় অথচ কেমন যেন এই শিথিল স্বভাব বঙ্গদেশে প্রায় বিস্মৃত কমিউনিস্ট কবি গীতিকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা এই লেখার সময় মনে ঘুরছে। ভুলতে পারব না মধ্য কলকাতায় বেনেটোলা লেনে গুপ্ত প্রেসের পুরানো প্রায় ভেঙে পড়া বাড়ি। সেখানে ছাপা হত আমাদের সোভিয়েত সুহৃদসংঘের 'Indo-Soviet Journal' আর একদিন সেখানকার 'ঘুপচি' ঘরে আদ্যিকালের টেবিলে কাগজ পেতে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সভার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে লিখলেন, সুর দিলেন, আর সভায় স্বকীয় ঐশ্বরিক প্রতিভাবদ্ধ কণ্ঠে গাইলেন "এসো মুক্ত করো/মুক্ত করো/অন্ধকারের এই দ্বার'। গণনাট্য সংঘের স্বর্গযুগে যারা প্রধান, তাঁদেরই মর্মে অতিবিশিষ্ট স্থান নিয়েও যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো আত্মশ্লাঘা বর্জনের এক উদাহরণ হয়েছিলেন, তাঁর বিরল বিপুল কৃতিত্ব আজ কাউকে ম্লান করতে দেখি না। সমিতির সাম্যে ও "ঐক্যে" "জনতার মুখরিত সখ্যে" সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। সে-ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ্য বুঝি আমাদের নেই। শিশুপ্রতিম প্রতিভাধরের নাম এই মুখবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা তুষ্ট।"

অত্যন্ত খোলা মনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের উপর tribute রচনায় তাঁর গদ্যরীতি যদি আমার লক্ষ করি দেখব বড়ো বাক্য এতে আছে, সমাসবদ্ধ শব্দ এতে আছে। রচনাটি তৎসম শব্দবহুল। কিন্তু লেখকের হৃৎস্পন্দন রচনাটি ছন্দস্পন্দ হয়ে দেখা দিয়েছে। সব মিলে সহজ সাবলীল হয়েও দৃঢ়বদ্ধ।

সংস্কৃতের বাগ্‌বন্ধ বা প্রবচন তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃতের বিপুল বাঙ্ময়ে যে সব বচন আমাদের চিন্তাকে উদ্দীপিত করে সেগুলিকে তিনি তাঁর রচনায় এমন করে আপন করে নিয়েছেন যে সেগুলো মূল বাক্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছে। 'সর্বঃসর্বত্র নন্দতু' এই শিরোনামযুক্ত বচনটি মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলিকে পৃথকভাবে দেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু যখন তিনি বলেন শতায়ু হব, পশ্যেম শরদঃ শতম্। তখন দ্বিতীয়াংশের

পশ্যেন শব্দঃশতম্ বাক্যটির অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে, নিছক অনুবাদ বলে মনে হয় না। অথবা যখন বলেন উপনিষদের ঋষি ভেবেছেন সমাজের কথা—ঈশবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ—বলেছেন লোভ বর্জন করো। মা গৃধঃ, তখন তাঁর প্রকাশরীতির একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় তাঁর উপরি-স্তরের বাংলায় অধঃস্তরের সংস্কৃত-চিন্তন অনুসৃত হয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও সংস্কৃত বাক্ স্ফুলিঙ্গগুলি বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করেছেন, যেমন বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই (ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ) আর রামচন্দ্রের মুখ থেকে শোনানো হয়েছে, জীবন দিয়েছে কর্মভূমে, শুভ কর্মই সকলের কর্তব্য (—কর্মভূমিম্ ইমানং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্মযৎ শুভম্)।

অবশ্য এ ধরনের মিশ্রণের জন্য রচনাংশ আদৌ ভারী হয়ে ওঠে না। বরং একটি বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গি চিন্তার আধারগুলিকে মাধুর্যে ভরে দেয়। সংস্কৃতের বাঙ্‌মাধুর্য এসে বাংলাকে রমনীয় করে তোলে।

অনেক ক্ষেত্রে তিনি শিরোনামটিও সংস্কৃত রেখেছেন চরৈবেতি চরৈবেতি। মার্কসবাদ বিষয়ক রচনাতেও দেখি 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' রচনার মূল সুর ধরিয়ে দিতে এগুলো যেন মন্ত্রের মতো। ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেছিলেন মানুষের মঙ্গলচিন্তন করে। মার্কস লেনিন প্রমুখ মানুষেরা ছিলেন ঋষির মতোই তারা মানবমুক্তির মন্ত্র রচনা করেছেন। লেখকের অবচেতন মনে যখন আধুনিক ঋষিরা স্মরণে আসেন তখন ঋষিদের কণ্ঠ তাঁদের কণ্ঠে এক হয়ে বাজে। তাই তাঁর রচনায় যে সংস্কৃত বাক্-খণ্ডগুলি দেখা যায় তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁর রচনাশৈলীতে তাই এই সুমিশ্রণ।

'মোঙ্গলিয়ার জনগণ রাজ্যে' রচনায় দেখি হালকা শব্দের মেলা—'মোঙ্গলিয়ায় যাবার রাস্তা আমাদের হল—দিল্লী থেকে মস্কো, সেখানে দেড়দিন কাটিয়ে উলান বাটোর যাত্রা। এটাকে বেশ একটু ঘুর পথ বলা চলে।' এই সহজ চালে চলতে চলতেই তার সঙ্গে এসে গেল 'অভ্রংলিহ মহিমা', ছোট্ট অথচ গাঁটাগোঁট্টা সোভিয়েট প্লেন। তখলিফের খেশারৎ। 'যখন যে ধরনের শব্দ প্রয়োজন বিষয়ের অনুরোধে তখন তা-ই নিচ্ছেন। অনেক সময় পাশাপাশি ভারী তৎসম আর তৎসম মিতালিও তাঁর ভাষার লাবণ্য লাঘব করে নি। তাঁর রচনায় আছে সব ধরনের শব্দের আমন্ত্রণ। তবে খাঁটি বাংলায় অকারণ সংস্কৃতায়নকে তিনি এড়াতেই চেয়েছেন। 'ইতিপূর্বে'কেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন 'ইতঃপূর্বে' লেখায়, 'ইতিমধ্যেই' তাঁর রচনায় 'ইতোমধ্যে' নয়।

৭০-৭৫ বছর যিনি কলম চালিয়েছেন সব্যসাচীর মতো তাঁর পরিমিতি বোধ ও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নির্বাচন যে সুষ্ঠু হবে তা বলাই বাহুল্য। আর যিনি দেশ ও দশের জন্যে অনবরত লিখছেন, তিনি গৌড়ী রীতি বা বৈদর্ভী রীতির না লাটী রীতির এ তর্ক বৃথা, তিনি বচনে বাচনে যে খাত রচনা করেছেন তাতেই বঙ্গভাগীরথীর অবাধ সঞ্চলন।

লিখতে লিখতে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। এই সৌন্দর্য শুধু তার অঙ্গে নয় লিখন-আঙ্গিকেও।

হীরেন্দ্রনাথ : সৃষ্টি

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি

'দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট'-এর আমন্ত্রণে কমিউনিস্ট ইশতেহার (১৮৪৮) প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধীসমাবেশে আলোচনার সূচনা করতে পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

খুব স্বচ্ছন্দে মনে আসিনি, কারণ বেশ কিছুকাল ধরেই দেখছি যে খোদ্ কম্যুনিস্টদের অনেকেরই (সি. পি. আই. এম. কতকটা ব্যতিক্রম) কম্যুনিজম বিষয়ে যেন অপ্রতিভ তত্ত্বগত চিন্তা ও তদানুসারী কর্ম বিষয়ে অনীহা প্রায় সর্বত্র, আর 'পুরানা ঘরানা'-তে আটক রয়েছি বলে আমার মতো অকৃতীকেও কিছু বিদ্রূপের পাত্র হতে হয়েছে। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে খাস মস্কো 'ক্রেমলিনে' সোভিয়েট বিপ্লবের সপ্ততিতম বার্ষিকী উপলক্ষে মিখাইল গর্বাচভ্-এর বাক্ বিস্তার আর বিশেষ করে পশ্চিম দুনিয়ার কম্যুনিস্ট নেতাদের মুখে তা নিষ্প্রাণ প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম। সংক্ষিপ্ত হলেও আফগানিস্তানের তৎকালীন নেতা নজীবউল্লাহ-এর দৃপ্ত ব্যতিক্রমী ভাষণ শুনে তাকে আলিঙ্গন করেছিলাম তার কথা থেকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেয়ে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে লক্ষ করেছিলাম ফিদেল কাস্ত্রোর বিলম্বিত এবং স্বভাববিরুদ্ধ বিষণ্ণবদন উপস্থিতি ও কাজ সারা ছোট বক্তৃতা। মস্কোতেই মনের দুঃখ-জানাই দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বদন্তী নায়ক Oliver Tambo এবং এদেশে সুপরিচিত (বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদেশমন্ত্রী) Alfred Nzo- কে, আর তাম্বো বলেন : "কমরেড এ-সব আমাদের সয়ে যেতে হবে" ("We have to live with it")। নজরে পড়েছিল পার্টি নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের কেমন যেন অব্যক্ত অস্বাচ্ছন্দ্য (পার্টির বিবৃতি তিনি না পড়ে ভার দিয়েছিলেন কমরেড ফারুকী-কে)। অনুমান করি E.M.S. Namboodiripad মস্কোর নতুন আবহাওয়ায় যথেষ্ট বিচলিত। মস্কোতে তখন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার কম্যুনিস্টরা 'New Age' পত্রিকার সংবাদদাতা মসূদ আলী খান্-এর অফিসে জড়ো হয়ে দেড়ঘণ্টা আমার বিপন্নবোধ জানিয়ে বক্তৃতা আর প্রশ্নোত্তরের একটা 'টেপ-রেকর্ড' বানিয়েছিলেন, শুনেছি। তবে তার পাত্তা আর নেই। যাই হোক্, দেশে ফিরে সাধ্যমতো আমাদের কম্যুনিস্ট প্রত্যয়ের ধ্বজা তুলে ধরার অক্ষম চেষ্টা চালিয়েছি বলে যেন নিন্দিতই হয়েছি। উপহাস শুনেছি যে 'যত্র তত্র' মাথা কুটে মরছি আর বুঝছি না যে দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের বদলাতে হবে।

আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি যে, এত নির্বোধ নই যে সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে—যেখানে একই নদীর জলে কেউ একাধিকবার স্নান করতে পারে না—আমাদের এই 'বদ্‌লতী' দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইব না। মার্ক্স কথিত "সুসমাচার"-কে সনাতন, সর্বগ্রাহ্য, সর্বাবস্থায় অভ্রান্ত ও অবশ্য মান্য ঐশ্বরিক অনুশাসন মনে করলে শুধু মার্ক্স-চিন্তা নয় আমাদের মানবিক সত্তার অনন্তপার গৌরবেরই অপমান করা হয়। মার্ক্সবাদ কর্মপথের নিশানা দেয়, আপ্তবাক্যের অনুসরণ চায় না; 'domga' বস্তুটির মধ্যে বিপদের বিষ রয়েছে—তবে উল্‌টো পথে 'Pragma'-র প্রলোভন এড়িয়ে না গেলে নীতিভ্রংশ আর বহুবিধ অধঃপতন

যে অনিবার্য, তা ভুলে যাওয়া একটা বিকট ভ্রান্তি। তাই মার্কিন মনীষী Professor Sweezy যখন সতর্ক করে দেন যে কম্যুনিজম-এর 'বারোটা বেজে' গেছে আর মুনাফাখোর, পুঁজিশাহীর বিকল্প নেই ('There is No Alternative'—TINA) যে মানতে হবে এটা ভুল, তখন কম্যুনিস্ট মহলে (অবশ্য ব্যতিক্রম বাদে) যেমন সাড়া স্বাভাবিক ও সমুচিত ছিল তা দেখিনি। এবম্বিধ নানা কারণে এই বয়সে, ম্রিয়মান অবস্থাতেও যেখানে পেরেছি একটু বুঝি হল্লা করতেও চেয়েছি! কতকটা চাঙ্গা হলাম আপনাদের মতো বিদ্বজ্জন এই আলোচনার আয়োজনে আমার মতো 'বাতিল' একজনকে ডাকছেন দেখে।

এটাও দেখলাম যে "দেশ" পত্রিকার মতো প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রচার মাধ্যমে কম্যুনিস্ট ইশতেহারকে "মার্ক্সীয় ফতোয়া" আখ্যা দিয়ে কিছু পরিমাণে বিকৃত করেও সেই সংখ্যায় কয়েকটি দামী লেখা ছাপা হল যার একটি প্রধান রচনার শিরোনামা ছিল : "যদি আজ মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবু তাঁদের নিজস্ব বিশ্বদর্শন এবং যুগান্তরের স্বপ্ন কি কখনও ভোলা যায়?" তুষ্ট হতে পারি না এই "স্বল্প দাক্ষিণ্যে" ("ইংরিজিতে যাকে "small mercies" বলা যায়।), তবু এটা এরকম স্বীকৃতি তো বটে।

মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর "স্বপ্ন" ব্যর্থ জেনে যতই পুলকিত আজকের সমাজপতিরা হ'তে থাকুন, ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যায় নি। আর রাহুগ্রাস থেকে সাম্যবাদের রেহাই যতই সময় সাপেক্ষ হোক না কেন, লোভসর্বস্ব শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নিজেরই জমে ওঠা কলুষের চাপে ভেঙে পড়া তো মানুষেরই এ যাবৎ ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায়। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রভুদের জগৎজোড়া বাদশাহীর চিরস্থায়িত্ব ঘোষণা করে 'Time'-এর মতো পত্রিকায় ("America Rules : Thank God; ০৪/০৮/৯৭) দর্পিত প্রবন্ধ বেরোতে থাকুক; পুঁজিশাহী 'বিশ্বায়ন'-এর কৃপায় বিশ্বের অধিকাংশ বাসিন্দারই জীবন যন্ত্রণা বাড়তে থাকুক; তবু কি একেই ভবিতব্য বলে সবাই মানতে থাকব? সমসুযোগের সমাজ দুনিয়ার সর্বত্র আবাহন, সমাজরূপান্তরের 'স্বপ্ন'কে বাস্তবায়নের ইতিহাসসঞ্জাত পথনির্দেশ, জ্ঞানকে শক্তিরূপে ("Knowledge is power") ব্যবহার করে, মেহনতী অর্থাৎ নির্বিত্ত দলিত মানুষের অপরাজেয় সংগঠন ও সংকল্পকে প্রকরণকে পরিণত করে যুগান্তরী বিপ্লব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষের নতুন জগদ্ব্যাপী অভ্যুদয়ের দুন্দুভিনিনাদ ঘটেছিল ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। যখন মার্ক্স-এঙ্গেলস্ কর্তৃক রচিত এবং প্রথমোক্তের গহন গভীর সমাজচিন্তা ও মানবিক আবেগ থেকে প্রসূত এক বিস্ময়কর বিমোহন লিখনশৈলীর জাদু নিয়ে ঘোষিত হল কম্যুনিস্ট ইশতেহার, "গলিত সুবর্ণের প্রস্রবণ" ("a srteam of molten gold") যার এক অবিস্মরণীয় ভূষণ। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ নিজেরাই বলে গেছেন এতে ভ্রান্তি আছে, ফাঁক আছে তৎকালীন সংকীর্ণতা ও অপূর্ণতা আছে, কিন্তু ইতিহাসে এর সগৌরব অধিষ্ঠান নিঃসংশয়। উচ্ছ্বাসপ্রকাশে স্বভাবত বিরূপ জোসেফ স্টালিন এই ইশ্‌তেহারকে বলেছিলেন "The Song of Songs of Marxism"—ছেলেবেলায় খ্রিস্টান পাদরীদের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে বুঝি স্টালিনের আবেগ এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পেয়েছিল।

২

আপনাদের সংগঠনের মুখপত্র "তত্ত্ব ও প্রয়োগ" নামকরণটি ভারি ভালো লেগেছে। তত্ত্ব সন্ধানের বিমল আনন্দ সকলের কাছে সহজপ্রাপ্য হতে পারে না, কিন্তু জীবন বহির্ভূত কোনো কর্ম নেই। আমাদের ভারত চিন্তায় 'জগৎ ও জীবনকে নস্যাৎ' (world-and-life negation') করার প্রবণতা নিয়ে মহামনীষী Schweitzer-এর সমালোচনার প্রত্যুত্তর রাধাকৃষ্ণনের রচনায় পড়েছি আর "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ/ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা/জীবো ব্রহ্মৈতি নাপরঃ" উচ্চারণের সহজ অথচ কদর্থ করে আমাদের বহুযুগব্যাপী দর্শনচিন্তার গভীরতা সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তির অবমাননা করার মতো নিরক্ষর নই। একটা দুঃখ অবশ্য লুকোতে পারছি না। 'বিচার স্বতন্ত্র' আর 'আচার'-এর নিগড়ে বিদ্বজ্জন সহ সকলকে বেঁধে রাখার সনাতন বর্ণাশ্রমী এবং কার্যত অমানবিক সমাজরীতি জীবনের স্বাভাবিক স্পন্দন ও বিকাশকে আবহমানকাল থেকে রুদ্ধ করে রেখেছে, ভারত চিন্তার বিভূতিকে কলুষিত করেছে। মার্জনা করবেন কিন্তু বড্ড গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ছি বলে হঠাৎ মনে পড়ল অস্ট্রিয়ান্ 'সাধু' অগেহানন্দ ভারতীয় কথা মনে এলে যে যাজ্ঞবল্ক্য থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে পরম্পরা তাতে আছে উদ্দীপনার অস্বাস্থ্যকর বাহুল্য। অবশ্য সবাই জানি কর্মযোগী বিবেকানন্দের সর্ব জীবে শিব-দর্শী মহনুভবতা। আর আমার মনে পড়ছে ফরাসী ভারতবিদ্বান্ Louis Renou-র মজাদার আবিষ্কার যে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য একবার বুঝি মাংস ভক্ষণ বিহিত কি না জানতে চাওয়ায় জবাব দেন : "হাঁ, বিহিত বই কি, তবে একটু নরম হওয়া চাই ("it must be tender")!"

কোথা থেকে কোথা আপনাদের টেনে এনে বসেছি, তাই রাশ-টেনে বলি যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে দর্শনকে মার্কস-এঙ্গেলস্-এর মতো বিরাট মর্যাদা আর কেউ দিয়েছেন মনে হয় না। নির্বিত্ত শ্রেণীর মুক্তি সাধনে দর্শনকে আত্মস্থ না করতে পারলে চলে না আর নির্জিত শোষিত দলিত মানবের মুক্তি বিনা দর্শনেরও সার্থকতা নেই, এমন নির্ঘোষ অন্যত্র কোথায় মিলবে? দ্বিধাহীনভাবে ১৮৪৩-৪৪ সালে মার্কস-এর ঘোষণা : "তত্ত্ব যখন জনমানসে সন্নিহিত হয় (অর্থাৎ তাদের চিত্ত জয় করে) তখন তা হয়ে দাঁড়ায় এক বাস্তব শক্তি" ("Theory becomes a material force when it grips the masses")। ১৮৪৫ সালে ফয়েরবাখ-এর (Feuerbach) সমালোচনায় আকাশবাণীর মতো মার্কস্-এর উচ্চারণ শুনি : "দর্শনশাস্ত্রীরা বিশ্বের বিশ্লেষণ করেছেন নানাভাবে, কিন্তু যেটা চাই তা হল দুনিয়াকে বদলে দেওয়া।" সেখানেই দেখি "The human essence"-এর সংজ্ঞা : "মানবত্বের সারাৎসার প্রতিটি ব্যক্তিত্বের অন্তর্গূঢ় কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; প্রকৃতপক্ষে সামাজিক পরস্পর সম্পর্কের সাযুজ্যেই তার অবস্থান।" মার্কস্-এর জন্ম ১৮১৮ সালে আর এঙ্গেলস জন্মান ১৮২০ সালে। কী বিপুল প্রতিভাধর এই 'দ্বয়ী' ('duo') যারা তরুণ বয়সেই সমাজসত্যসন্ধানে এমন অনন্যার পরিচয় দিলেন। বহু বৎসর ধরে অমুদ্রিত ছিল যে "Economic and Philosophical Muanuscripts of 1844". তাতে কত রত্ন ছড়িয়ে রয়েছে, অনুকূল পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিজম আর মানবিকবাদ যে অভিন্ন তা ঘোষিত হয়েছে। তার কম্যুনিস্ট ইশতেহারের মূলে রয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা—In the beginning was not the

Word but the Deed বাক্য নয়, কর্ম, বহুজনের সম্মিলিত কর্মের ভিত্তিতে মানুষেরই সৃষ্ট সভ্যতার বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটেছে। বাস্তব জাগতিক সত্তার ('Being') ভিত্তিতে তারই আনুষঙ্গিক ও অনুবর্তী চেতনা (Consciousness) আদিযুগ থেকে জীবন ও কর্মের রূপভেদ ঘটিয়ে এসেছে। যেভাবে মানুষ জীবনযাপন করেছে তারই ভিত্তিতে চিন্তাধারা নির্ধারিত হয়েছে। ইতিহাসে যুগ থেকে যুগান্তর, এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে উত্তরণ এভাবেই বাস্তব জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করেছে। শোষণ রহিত সমাজ, সমসুযোগের সমাজ, সর্বজনের সুখসাধনে প্রবৃত্ত সমাজ মানুষের চিন্তায় কল্পনায় নানারূপে নানাভাবে এসেছে বহুযুগ ধরে, কিন্তু মানুষেরই গ্রাসাচ্ছদন ও জীবনধারণের চাহিদার চাপে আর তাদেরই কর্ম শক্তির ক্রমোন্নতির সহায়তায় প্রাচীন যুগের দাসপ্রথা থেকে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে যন্ত্রোৎপাদনভিত্তিক বুর্জোয়া যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। বাস্তব জীবনেরই তাগিদে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য খণ্ডনপ্রয়াসে, স্তর থেকে স্তরান্তরে মানুষের যাত্রা থেকে এভাবেই বুর্জোয়া কর্তৃত্বের যুগে অনিবার্যভাবেই জন্ম নিয়েছে তারই সংহারক সর্বহারা মেহনতী মানুষের শক্তি—ইশতেহারের ভাষায় "যারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কবর খুঁড়বে সেই প্রোলেটারিয়েট"। এমন নয় যে সবাই বসে আছি ইতিহাসের শকটে যা অকাট্য গতিতে যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে, নতুন সমাজ পর্যায়ে পৌঁছে দেবে। বাস্তব কারণেই পথ 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর' না হয়ে পারে না, তাই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষকেই যথাযথ সমাজ চেতনা আর সংগঠন ও সংহতিকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে অন্বিষ্ট সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এরই আহ্বান ১৮৪৮-এর কম্যুনিস্ট ইশতেহারে বিঘোষিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সাফল্য দূরে থাক, সম্ভাবনা পর্যন্ত নিয়েও আজ বহু প্রশ্ন, বহু সংশয়, বহু দ্বিধা। মনে রাখতে চাই যে, মার্কসীয় নিরিখে এই বিপ্লব এমনই সুদূরপ্রসারী ও গভীরতাস্পর্শী যে এর সাফল্য শুধু ইতিহাসে কতকটা নতুন এক অধ্যায় আনবে তা নয়—সেই সাফল্য প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম দেবে, নিঃশেষ করে দেবে- 'প্রাক্-ইতিহাস'কে ("pre-history")। বারবার বহু সমাজ রূপান্তরের মধ্য দিয়েও মানুষের বহুলাংশকে সমাজপতিদের কবলে শোষিত, বঞ্চিত, দলিত, অপমানিত হবার মানবিক লাঞ্ছনা থেকে নিস্তার দিতে পারে নি, তার অবসান ঘটাবে আর (সোভিয়েত দেশে ১৯৩০ সালে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী) মানুষের সমাজসত্তায় প্রোথিত 'লোভ' নামক 'মৃত্যুশেল' উৎপাটিত করতে পারবে। এমন যে "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ", তার সাফল্য সহজ নয়, সস্তা নয়। বিপ্লবী চেতনা সংকল্প ও সংগঠনের সঙ্গে বহুজনের শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতার অপরিসীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দীর্ঘায়ত প্রয়াসে লিপ্ত হতে না পারলে সার্থকতা মিলবে কেমন করে? কম্যুনিস্ট ইশতেহারে সাড়া দিয়ে এ যাবৎ দুনিয়ায় যে বিপ্লব ঘটতে পেরেছে, তার মূল্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেই বুঝতে হবে যে এখনও বহু "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" লংঘন করে যেতে হবে।

৩

মার্ক্স-এর *Capital* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "The Genesis of the Industrial Capitalist" অধ্যায়ের শেষে দেখা যায় যে যদি এক ফরাসী লেখকের ভাষায় বলা যায় যে টাকার যখন

প্রথম আবির্ভাব ঘটে তখন যদি তার গায়ে লেগে থাকে "জন্ম চিহ্ন এক রক্তাক্ত জড়ুল" তো পুঁজি যখন নিজেকে জাহির করে তখন "তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।" বুর্জোয়া শ্রেণীর সুবিপুল ঐতিহাসিক কৃতিত্বের যে বর্ণনা কম্যুনিস্ট ইশতেহার আছে তার তুলনা বুর্জোয়া সাহিত্যে নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক নির্মম অমানুষিক যন্ত্রণা জগৎ জুড়ে অসংখ্য মানুষের জীবনে ঘটিয়ে বুর্জোয়াদের এই কীর্তি সম্ভব হয়েছে—অচিন্তনীয় অত্যাচারের সেই কাহিনী এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মানুষের মন থেকে মুছে দেবার প্রযত্ন বহুকাল ধরে চলেছে কিন্তু সপ্ত সমুদ্রের জল দিয়ে ধুলেও সেই কলঙ্ক কালিমা লুপ্ত হবে না। আরবের সকল কুসুমসৌরভ সেই কলুষের দুর্গন্ধ কাটাতে পারবে না। যাই হোক্, ইশতেহারের ছত্রে ছত্রে বুর্জোয়া দুর্বৃত্তি ও পৈশাচিকতার প্রতি যে অন্তহীন ঘৃণা ছড়িয়ে রয়েছে, তারই সন্ধান এখানে পাই। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম সমবেত সবাইকে বলেছিলেন : "ন ছিত্বা পরমর্মানি/ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করম্/ন হত্বা মৎসঘাতীয়ম্/প্রাপ্নোতি মহতীম্ শ্রিয়ম্।" "পরের মর্ম ছিন্ন না করে, অনেক দুষ্কর কর্ম না করে, জেলে যেমনভাবে মাছকে মারে তেমনই হত্যা না করতে পারলে, মহতী শ্রী ('Big Money') অর্জন করা যায় না।" কম্যুনিস্ট ইশতেহার প্রসঙ্গে এই সুপ্রাচীন অনুভূতি আর মার্কস্ চিন্তার সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্য আমরা এদেশে অন্তত স্মরণ করব।

রবীন্দ্রনাথ "লোভ" নামক "মৃত্যুশেল" সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করা যে কত দুরূহ তা জানিয়ে সোভিয়েত জনগণকে সতর্ক করে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও জানিয়ে আসেন (যা মতলব করে সবার মন থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু কাল ধরে) তিনি Zvestia পত্রিকাকে বলেছিলেন : 'তোমাদের কাজে কতকগুলো গলদের কথা বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, দেখাতে চেয়েছি 'চাঁদের কলঙ্ক'.('the shadow side of the moon')—তোমাদের কাজ যেন কলঙ্কশূন্য হয়।"

সমাজবাদ-সাম্যবাদের অগ্রগতি বিষয়ে, আত্মতুষ্ট থেকে কিম্বা শৈথিল্যবশে কিম্বা অন্য বহু হেতু সমাবেশে আমাদের হিসাবের ভুল ধরা পড়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য মানুষকে নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই—"man, proud man" বলে আনন্দ পেতেন মার্কস, "Man is the measure of everything" ছিল তাঁর এক প্রিয় উদ্ধৃতি। আমরা তো মহাভারতেই দেখি : "ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরো হি কিঞ্চিৎ" ("মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই")। কে না জানি চণ্ডীদাসের উক্তি : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"? সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবি দৌলত কাজীর পংক্তি : "নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর"। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নানাদিক থেকে আজও মানুষ অনেকটা অসহায়, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে আরও সামঞ্জস্য যথাযথ হয়নি—'Original sin'-এর তত্ত্ব মানার দরকার নেই কিন্তু মহাশক্তিধর হয়েও মানুষ এখনও খর্ব, হ্রস্ব, ব্যর্থ, নীতির বিচারে এখনও প্রায় নিঃস্ব, এমনই বৈপরীত্যের জালে জড়িত যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গরিমা লুপ্ত হয়ে যায় 'অ্যাটম' বোমা ব্যবহরের মতো কুৎসিত বীভৎসতায় (আর স্বয়ং আইনস্টাইন মনস্তাপে বলে ওঠেন আবার জন্মালে বৈজ্ঞানিক না হয়ে যেন জলনিকাশী যন্ত্রপাতি বানাবার

কাজে নামেন, যা শুনে "American Plumbers' Union তাঁকে সাম্মানিক সদস্যপদ দিতে চান।) তবুও দোষে গুণে মোড়া এই মানুষকে দিয়েই মানুষের জগৎকে নতুন করে গড়তে হবে। তাই আনাতোল ফ্রাঁস্ অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে, ভগবানের সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হল যে দুনিয়ার সব কাজ করাতে হয় মানুষকে দিয়েই। সেই মানুষেরই অধঃপতন আর চারিত্রিক দৈন্য বিনা কি সোভিয়েত ও অন্যান্য সোসালিস্ট দেশের নিঃসন্দিগ্ধ সমাজ নির্মাণ কীর্তির সৌধ অল্পকালের মধ্যেই (১৯৮৬-৮৯) ভেঙে পড়তে পারত? শত্রুপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত বহুরূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে চলেছিল বটে, কিন্তু তাকে প্রতিহত করা সম্ভব হল না কেন? কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ১৫০তম বার্ষিকীতে এ সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা যথাযোগ্যভাবে ঘটবে ভরসা করি।

ইতিমধ্যে একটু আশ্বাস খুঁজি বছর চোদ্দ-পনেরো আগে হাঙ্গেরির কম্যুনিস্ট তো Janos Kadar-এর পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা রিপোর্ট থেকে। তখনও গর্বাচভী প্রতিবিপ্লবের প্রারম্ভিক লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করেনি, তাই সুস্থ পরিহাসের সুরেই কাদার সমবেত পার্টি প্রতিনিধিদের তৎকালীন হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসাফল্যের উল্লেখ করে বলেন যে, মানুষের ইতিবৃত্তে হয়তো প্রথম তুলনীয় ম্যানিফেস্টো হল তিন হাজার বছর আগে হজরত মুসা-র (Moses) "দশ নির্দেশ" ("Ten commandments"), আর এত কাল পরেও তা যখন সার্থক হতে পারেনি তখন ১৮৪৮ সালের ইশতেহার অনুসরণে কাজ অপূর্ণ থাকলে সেটা ক্ষমার্হ নয় কি? পরিহাসের সুরে বলা হলেও কথাটির গুরুত্ব প্রচুর। ইতিহাস তো আমাদের ইচ্ছাপূরণের ("wish-fulfilment") দায়িত্ব বহন করে না। ইতিহাস নিজের ছন্দে চলে আর মানুষ তার ভূমিকা পালনে শৈথিল্য দেখালে গতি ব্যাহত হয়, বিলম্বিত হয়—ইতিহাস গড়ে মানুষ, কিন্তু যথেচ্ছভাবে মানুষ তো তা পারে না। তার নিজের স্বভাব, তার পারিপার্শ্বিক তার সমসাময়িক জীবনসংস্থানের চেহারা ইত্যাদি বহু উৎপাদন জড়িয়ে থাকে। ("Man makes history, but not just as he pleases")। মানুষ তার পরিস্থিতিকে নির্মাণ করে আবার পরিস্থিতিও মানুষকে বানায় ("Man make circumstance but circumstances also make men")। মার্কস ১৮৫০-এর দশকেই সতর্ক করে দেন যে বিপ্লব যারা চায়, তাদের তৈরি করতে হবে নিজেদেরই, পনেরো কিম্বা কুড়ি কিম্বা পঞ্চাশ বছর লড়াই করে নিজেদেরই বদলাতে হবে আর তারই জোরে গোটা সমাজ বদলাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। সমাজবাদ সাম্যবাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিলম্ব ঘটছে বলে হাল ছেড়ে দেবার মতো ক্ষুদ্রচেতা হৃদয় দৌর্বল্য যেন আন্দোলনকে আচ্ছন্ন না করে।

কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। ১৭৭২ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় ("Declaration of Independence") দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয় যে "সকল মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীনতার অধিকারী," অথচ কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব বিধি বহুকাল অব্যাহত ছিল আর আজও তার অজস্র ছাপ রয়েছে সমাজ জীবনে। ফরাসী বিপ্লবকালে (১৭৮৯-৯৪) "মানবাধিকার" ("Rights of Man") অপরূপ মনোগ্রাহী ভাষায় বিশ্বজনসমক্ষে প্রচারিত হয়ে অভূতপূর্ব চমক সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী বিপ্লবই ছিল ইতিহাসে

শিরোমণি-স্বরূপ এক ঘটনা। "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" বাণী মানুষের জীবনে নবযুগের আস্বাদ এনে দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল দুশো বছর বাদে 'বাস্তিলের দুর্গপতন' দিবসে (১৪ জুলাই) অহঙ্কারী বলে খ্যাত রাষ্ট্রপতি মিত্তেরকে যেন বিদ্রূপ করে ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার স্পর্ধিত উক্তি করলেন যে ১২১৫ সালে ইংলন্ডের 'ম্যাগ্‌নাকার্টা' হল ঐতিহাসিক বিচারে আরও গৌরবান্বিত। অনেকে জানি যে ১৭৮৯ সালে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে বাস্তিল-এর পতন বিষয়ে বলা হয়েছিল যে তা হল জগতের ইতিহাসে "সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম" ঘটনা। এখনও জগতের পরিস্থিতি এমন নয় যে ফরাসী বিপ্লবের যুগান্তকারী চরিত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭), চীন বিপ্লব (১৯৪৯), আর সাম্যবাদী সংগ্রামজাত অন্যান্য বিপ্লব তো তুলনায় সাম্প্রতিক ঘটনা। কম্যুনিস্ট তত্ত্ব ও কর্ম গতানুগতিক রাজনীতির আয়তনে সীমিত নয়; এত কালের ইতিহাসপুষ্ট মানবসমাজের মূলোৎপাটন করে, শোষণের সর্বত্র অবসান ঘটিয়ে, মানুষের লোভ জটিল মানসিকতার বন্ধন মোচন করে, সর্বার্থে নবজীবনের ভিত্তিস্থাপন কম্যুনিজম-এর অন্বিষ্ট। যারা মামুলি রাজনীতির অভ্যস্ত, তাদের কাছ এর দাম না থাকতে পারে, কিন্তু এক অতি কঠিন সাধনার এই আহ্বান—যা কঠিন হলেও জনগণের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি স্বচ্ছ, অতি সহজ, অতি নির্মল (এ-বিষয়ে Bertold Brecht স্মর্তব্য)-হল কম্যুনিস্ট ইশতেহারের প্রাণবস্তু।

৪

কম্যুনিস্ট ইশতেহারের ছত্রে ছত্রে মেহনতী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র ফুটে রয়েছে। প্রকৃত দেশপ্রেমের সঙ্গে এর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য মার্ক্স-চিন্তার গৌরব। তবু দেখি কোনো কোনো মহল থেকে অনুযোগ এসেছে "The working men have no country We cannot take form them what they have not got" এই বাক্যটি সম্পর্কে। বেশি কথার দরকার বুঝি না। "স্বভাব-কবি" বলে বর্ণিত (এবং অবজ্ঞাত), "আমরা হরিহর" প্রভৃতি বহু মধুর অথচ তেজস্বী 'স্বদেশী' গানের রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৪৫-১৯১৮) চমৎকারভাবে এই মার্ক্স উক্তির ব্যাখ্যা করেছেন : "স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা/এদেশ তোদের নয়/তুমি কেবল ত্রাসের মালিক/গ্রাসের মালিক নয়/চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়/যে দেশ যাদের অধিকারে/তারাই তাদের বলতে পারে/কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়? তোরাই কুলি/তাদের/কুলি তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি/তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি, ক্ষুধায় মৃত্যু হয়/তারাই মালিক তারাই সমুদয়/স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়!"

অত্যন্ত অসৎ এক অভিসন্ধিমূলকভাবে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিনকেও ইয়োরোপকেন্দ্রিক ('Euro-centric') মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলে অভিযোগও উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রথম অধ্যায়ে মার্ক্সের দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির দিকে, ইংলন্ডের মতো সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বিনা সংগ্রামে, মোটামুটি সংসদীয় 'গণতন্ত্র'-এর জোরে বিপ্লব এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাও কিছুকাল মনে এসেছিল। কিন্তু দেরি হয়নি তা ভেঙে যেতে আর বুঝতে যে ইংলন্ড হল একেবারে নিরেট 'বুর্জোয়া' ("the most bourgeois of all nations") আর সংসদীয় কুহকে শ্রমজীবী মানুষকে "ধনিকশ্রেণীর সহায়ক" ("labour

lieutenants of the capitalist class") বানানো যায়, পার্লামেন্ট গিয়ে তাদের অধঃপতন কতটা ঘটে তা জানতে ত্রুটি হয় নি।

শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে তাই মার্কসচিন্তা অটল (তুলনীয় সম্প্রতিকালে মাওৎসেতুংয়ের বিখ্যাত বচন : "Never forget the class struggle"), আর ইশতেহারে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'গণতন্ত্র'-এর নামাবলী পরলেও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র হল যে "তা ধনিকশ্রেণীর কর্ম নির্বাহক সমিতি" ("executive committee of the captialist class")। বস্তুবাদী দর্শনের বিচারে মার্কসবাদ পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, 'গণতন্ত্র'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সেটা হয় বুর্জোয়া নয় প্রোলেটেরিয়ন গণতন্ত্র। আর ঠিক যেমন প্রথমোক্ত মেহনতী মানুষের অধিকার নিতান্ত নাম-কে-ওয়াস্তে, তেমনই দ্বিতীয়োক্ত ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের অধিকার হবে সংকুচিত। কিন্তু তাতে অপ্রতিভ হবার কিছু নেই কারণ চিরবঞ্চিত নিঃস্ব মানুষই সমাজের অধিকাংশ আর তাদের হাতে হাল থাকলে আসল গণতন্ত্রেরই জয় আর সমসুযোগের সমাজ স্থাপনের পথ সুগম হবার সম্ভাবনা। 'Dictatorship' শব্দটি ম্যানিফেস্টোতে নেই কিন্তু এর সদর্থ সেখানেই বিজ্ঞাপিত। 'পবিত্র' 'গণতন্ত্র'-এর 'গঙ্গাজল' ছিটিয়ে বুর্জোয়া কর্তৃত্বকে (ও অত্যাচার) 'পরিশুদ্ধ' করার প্রক্রিয়া কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আদি থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, সমাজবাদ-সাম্যবাদ বস্তুটিকেই অন্তঃসারশূন্য করার জন্য (কে যেন বলেছিলেন "the dreary drip of democratic drivel")। এ নিয়ে আলোচনার সময় আমার নেই। কিন্তু 'Social Democracy'-র ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে যথাযথ আলোচনা (বিশেষত আমাদের মতো একটা পরপদানত দেশের অভিজ্ঞতাসূত্রে) হয়েছে বলে মনে হয় না। একটু কৌতুক আর কৌতূহলের সঙ্গে দেখি যে ভারতবর্ষে 'সোসালিস্ট ইন্টরন্যাশনাল'-এর (যা আজও বর্তমান) অদ্বিতীয় ও অকৃত্রিম মুখপাত্র জর্জ ফার্নান্ডেজ-এর সংকোচ হয় নি ভারতীয় জনতা পার্টির মতো দলের সঙ্গে 'দোস্তি' বানাতে। ফার্নান্ডেজ-এর অনেক গুণ আছে জানি, কিন্তু ভুলতে পারি না যে ১৯৮৩ সালে মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনি "The Other Way" নামক তার নিজস্ব পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন রামমনোহর লোহিয়া লিখিত এক প্রবন্ধ যার প্রতিপাদ্য ছিল যে কম্যুনিজম হল "এশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের এক চক্রান্ত মাত্র"!

আবার বলি প্রথম দিকে মার্ক্স-এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশা ভরসা গড়ে তুলেছিলেন পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলিতে মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থানের দিকে তাকিয়ে। কিন্ত একেবারে প্রথম থেকেই তাদের বিশ্ববোধ ছিল অগাধ ও অটুট। আয়র্লন্ড থেকে চীন, ভারতবর্ষ থেকে আলজিরিয়া, রুশ দেশ থেকে আমেরিকা, সর্বত্র বিস্তারী ছিল তাদের দৃষ্টি আর সেদিনের সাম্রাজ্যলাঞ্ছিত দেশের মানুষের প্রতি আস্থা আর অনুরাগ। ১৮৫৩ সালে ভারত বিষয়ক মার্ক্স-এর রচনা অমূল্য হয়ে রয়েছে; ১৮৫৭ সালে ইংরেজ যাকে "সাময়িক মিউটিনি" বলে প্রচার করছিল সেই সিপাহীদের অভ্যুত্থানকে "জাতীয় বিদ্রোহ" বলতে মার্ক্সের আটকায়নি; আমাদের ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায়ের তীব্র সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা আর সংবেদনশীলতা; ১৮৭২ সালে কলকাতায় মার্ক্স প্রতিষ্ঠিত প্রথম

ইন্টারন্যাশনালে কলকাতা থেকে শাখা স্থাপন প্রস্তাবে মার্কস সাড়া দিয়ে জানান যে স্থানীয় মানুষদের নিয়েই যেন আন্দোলন গড়ে ওঠে; ১৮৮২ সালে যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সিভিলিয়ান হিউম সাহেব সারা দেশ থেকে পাঠানো ত্রিশ হাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়ে ইংরেজ শাসনের বিপদে আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন তখনই মার্কস-এঙ্গেলস-এর পত্রালাপে দেখি ভারতবর্ষে "বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা" নিয়ে তাদের আনন্দ। এ সবের পিছনে ছিল এক ধারণা যা ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে মার্কস-এঙ্গেলস-এর পত্রাবলীতে প্রকাশ হয়েছিল। বিপ্লব যদি শুধু আসে পৃথিবীর "এই ছোট্ট প্রান্তে, যা হল ইউরোপ" ("This little corner")) আর বাকি দুনিয়ায় পুঁজিশাহী পরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে সে বিপ্লব সহজেই "চূর্ণ" হতে পারে—এই ছিল দুই মহারথীর দুশ্চিন্তা। এরই প্রতিধ্বনি বারবার মিলবে লেনিনের চিন্তা আর কর্মে—পূর্ব জগৎকে বিপ্লবের আসরে টেনে আনার একান্ত দায়িত্ব তাদের আন্তর্জাতিকতাকে ভাস্বর করে রেখেছিল। মার্কস তো সর্বদাই বলতেন যে পুঁজিশাহী একটা দুনিয়া জোড়া শক্তি আর তাকে পরাস্ত করতে হলে গোটা জগতের নির্জিত মানুষকে গর্জন করে উঠতে হবে। সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫

সম্প্রতি আজীবন দেশব্রতী শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্ত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনায় জানিয়েছেন যে গ্রামের মানুষ আর কৃষকদের ভূমিকার ব্যাপারে মার্কস অনীহাগ্রস্ত ছিলেন। সন্দেহ নেই যে বুর্জোয়া বিধানে শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে মার্কস চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে কারখানার মজদুরদের উপর আস্থা অনেক বেশি রেখেছিলেন। পল্লীজীবনে নিয়তির উপর ভরসা মানুষের মনকে সহজে দখল করে। কৃষিকর্মে তুলনামূলকভাবে একাকিত্ব এবং প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর ভরসার অনুভূতিও প্রবল হয়। মনে হয় এজন্যই মার্কস-এর বিবেচনায় 'urban proletariat'-কে বিপ্লবপ্রহরণে 'ব্রহ্মাস্ত্র' ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এটাও নিঃসন্দেহ যে গ্রামের গরীবদের ভূমিকা মার্ক্স-এর চোখে একটুও কম ছিল না। ১৮৭০ দশকের রচনায় দেখি তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্রমিক যদি কৃষকদের সঙ্গে একত্র না হয়ে 'একা' গান ('solo') ধরে আর কৃষকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'দ্বৈত' সঙ্গীত ('duet') না করে, তাহলে সেটাই হবে শেষ গান, জীবন থেকে বিদায় নেবার গান ("swan song")! বহুস্থলে মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনায়, "The Peasant Question" প্রধান স্থান পেয়েছে। নিজস্ব ভঙ্গিতে মার্কস বলেছেন জার্মানীতে 'বিপ্লব' সফল হবে না যদি তার সঙ্গে "কৃষক বিদ্রোহের এক নতুন সংস্করণ" যুক্ত না হয়। পান্নাবাবু 'বিপ্লবী' কম্যুনিস্ট পার্টিতে ছিলেন, নীতিনিষ্ঠার গুণে তিনি প্রণম্য; হয়তো একটু ভুল করলেন মার্কসবাদ বিষয়ে এই আপত্তি জানিয়ে।

একান্ত শুভবুদ্ধি নিয়েই পান্নাবাবু আমাদের মতো দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদী প্রয়াসকে সম্মিলিত করার কথা উত্থাপন করেছেন। অনেকে বিচলিত ও বিরক্ত হলেও আমার মনেও এই প্রসঙ্গ প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। মহাত্মা গান্ধীকে 'বিপ্লবী' বলা নির্বুদ্ধিতা; "বিপ্লবী আর রক্তাক্ত সর্বনাশ"-এর ("revolution and red ruin") নিন্দা তাঁর কাছ থেকে এসেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জওহরলাল নেহেরুকে লেখা (১ এপ্রিল

১৯২৮) চিঠিতে স্বীকারোক্তি; "আমি তোমার সঙ্গে একমত যে একদিন না একদিন আমাদের আন্দোলন করতে হবে ধনীদের সরিয়ে রেখে আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিতদের বাদ দিয়ে।" সে সময় অবশ্য গান্ধীজীর বিচারে আসে নি, ১৯২১-এ, ১৯৩০-৩২-এ, ১৯৪৫-৪৬এ। সর্বদাই তিনি রাশ টেনে রেখেছেন; অহিংসা নীতির অনুসরণে তাঁরই দেশবাসীকে দেওয়া "অভয়" মন্ত্রকে লুকিয়ে রেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন "মিটমাটের সৌন্দর্যে" ("the beauty of compromise")। কিন্তু তিনিই ১৯২২ সালে আদালতে বিবৃতি দিয়ে যে কথা বলেন তা আজও স্মরণ করলে শিহরিত হয়ে হয় : "The miserable little comforts of the town dwellers in India represent the borkerage they get for the work they do for the foreign exploiter, the profits and the brokerage being sucked form the masses"। অনুবাদ না হয় না-ই করলাম, কিন্তু আজ আবার বিশ্ব সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে "Subsidiary Alliance" ("জো হুকুম বন্ধুতা") করেছে আমাদের দেশ, যাতে নতুন-'অর্থনীতির' কল্যাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তার ঘটেছে, বিলাসিতা বেড়েছে, সমাজবাদ-সাম্যবাদের আশংকাকে প্রায় হঠিয়ে ফেলার আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এখনও ধনীর ধন বাড়ছে, গরীবদের দুঃখও বাড়ছে—কিন্তু রাজনীতি শুধু কেন জীবনেরই মোড় যেন ঘুরে গেছে। "Affluence" সবাই বুঝি চাই, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন পর্যন্ত মিলিয়ে যাবার উপক্রম। "এ জীবনে হায়/সেই বেশি চায়/আছে যার ভূরি ভূরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত/গরীবের ধন চুরি।" রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সরল কথার সত্যতা বুঝতে তো কসরত করতে হয় না।

মার্ক্স-এর চিন্তা আর কর্মে সম্ভোসর্বস্বতার বিপক্ষে যে বিদ্রোহ জাজ্জ্বল্যমান তার সঙ্গে সাদৃশ্য পুরোপুরি রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর ভারত-চিন্তায়। এদেশের ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" একমাত্র কথা অবশ্য নয়; কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধন এখনও আমাদের মন টানে। এজন্যই শুধু একটু আভাস দিতে চাই যে মার্ক্স কঠোর সমালোচনা করেছেন ধনতন্ত্রকে সমাজ জীবনে মানুষের "প্রয়োজন" ("needs") তুচ্ছ করে "লোভ" ("greed")-এর ওপর প্রাধান্য দিয়ে। "অস্বাভাবিক, আতিশয্য দুষ্ট, জীবনযাপনে অপ্রয়োজন, একেবারে অতিরিক্ত আর কৃত্রিম" আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে মানুষের পক্ষে হানিকর বিলাপপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে পুঁজির রাজত্বে—এমন কথা মার্ক্স-এর কাছ থেকে অনেক পাওয়া গেছে। বর্তমানে এদেশে নতুন অর্থনৈতিক অদলবদলের পরিবেশে যে সম্ভোগসর্বস্বতা আজকের ব্যাপক আর প্রায় যেন অনিবার্য নীতিভ্রংশ ও সর্ববিধ মানব কল্যাণ প্রয়াসে দেশব্যাপী অনীহার সৃষ্টি করেছে, তার বিপক্ষে মার্ক্সবাদীরাই সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মতো যুগন্ধর মহাত্মার চিন্তা থেকেও অনেক কিছু আহরণ করতে পারেন। এ কথাটাকে যেন যান্ত্রিকভাবে না নেওয়া হয়। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও মার্ক্স চিন্তার সাযুজ্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। তা থেকে বেশ কিছু ধারণা এভাবের প্রয়াসে সহায়ক হ'য়ে ভারতভূমিতে মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষার আত্মীয়তাকে সুদৃঢ় করে তুলতে পারে।

৬

অনেক বাগাড়ম্বর ঘটিয়ে ফেলেছি। উপসংহারে স্মরণ করি কবি রাম বসুর একটি লাইন : "আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র।" দেশ আর দুনিয়ার দুর্গতি যে আজ কোন্ পর্যায়ে হাজির হয়েছে তা সবাই জানি। সমাজবাদ-সাম্যবাদের আপাত ব্যর্থতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন চলছে দুনিয়া জুড়ে দুর্নীতির বাদশাহী—আমেরিকা, জাপান, ইতালী থেকে আমাদের মতো প্রাচ্য দেশসহ গোটা পৃথিবীতে ঘটছে 'কেলেঙ্কারির' পর 'কেলেঙ্কারি ('Scam'), নীতি বলে বস্তুটিই যেন উধাও। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে একটা নোংরা মহাভারত ফাঁদতে হয়। কে আজ বলবে : "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে"? সর্ববিধ দুর্বৃত্তি সয়ে যাওয়াই যেন বর্তমানের রেওয়াজ—কিন্তু এমন দুর্দশা মানুষ সইবে কেমন করে? তাই ভাবি যে এই জঘন্য কলুষিত দুর্বৃত্ত পরিস্থিতিকে মানুষ বেশিদিন মাথা পেতে নিতে পারে না, "তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়" আসবেই।

এই বলে নিশ্চিন্ত অবশ্য হওয়া অসম্ভব। কে বা কারা এবং কবে এগিয়ে এসে হাল ধরবে? তবু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাব না। স্মরণ করব মার্কস-এর উচ্চারণ : "এক এক সময় বিশ বৎসর কেটে যায় আর মনে হয় যেন মাত্র একদিন, আর আবার এমন সময়ও আসে যখন কয়েক দিনে বিশ বছরের নির্যাস (essence) লুকিয়ে থাকে।" জনশক্তির অভ্যুদয় ঘটাবার উপাদান তো নির্মিত হয়ে চলেছে, শুধু যথাকালে যথাযথ কর্মের উদ্যোগেই দেখা যাচ্ছে না "এই পতনের দায়ভাগে/আমরা সবাই সমান অংশীদার'—রাজনীতিক্ষেত্রে বহুকাল বিরাজ করেছি বলে আমারও উত্তরদায়িত্ব একেবারে হয়তো অকিঞ্চিৎকর নয়। তাই দুঃখ হয়, যন্ত্রণাবোধ করি আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দ্বিধা ত্রিধা বহুধা বিভক্তির ফলে যে ব্যর্থতা এসেছে তার কামড়ে।

এখনও আদি কম্যুনিস্ট পার্টিতে আমার অবস্থান, যদিও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি সমর্থন আমরা মনের দিক থেকে বেশি। 'নকশালবাদী' নামে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতার সুফল থেকে দেশ যে আজও বঞ্চিত হয়ে রইল সেজন্য প্রধান কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির দায়িত্ব মানতেই হবে। "মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ/ন চ ধূমায়িতং চিরং" ভেবে যারা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জীবন্মৃত দেশে সাহস সংগঠন ও শৌর্যের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে আনার উন্মাদনা এনেছিল, তাদের কোল দেবার জন্য কেন যে ছুটে আসার মতো দরাজ রাজনীতির স্পর্শ দেশবাসী পেল না, তা বোঝা সহজ নয়। সন্দেহ নেই যে, তত্ত্ব বিষয়ে অনীহা, শ্রেণীসংগ্রামের অকাট্য উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাবার মনোবৃত্তি, বিপ্লবী আবেগের অন্তর্ধান, প্রশাসন দখলের প্রলোভন, সংসদীয় মায়ায় জড়িয়ে পড়া, পঞ্চায়েৎ থেকে পার্লামেন্ট হরেকরকম নির্বাচন নিয়ে মেতে থেকে "জনতার মুখরিত সখ্য"-কে বিপ্লবী প্রস্তুতির পথে না নিয়ে "প্র্যাগম্যাটিক' কায়দায় আশু কয়েকটি সমস্যা নিয়ে বাগাড়ম্বর এবং প্রায় অনিবার্য ফলস্বরূপ 'rally' অনুষ্ঠানে অদ্ভুত সাফল্য আর সঙ্গে সঙ্গে 'revolution'-এর প্রস্তুতিতে জনসংগঠন ও সংগ্রাম মানসিকতা হারিয়ে ফেলা—এবম্বিধ বহু দুর্ঘটনারই সবাই সাক্ষী। কথাটা কটুভাবে বল ফেললাম কিন্তু উপায়ান্তর নেই।

তবু জানি কালচক্র ঘুরবেই। মার্কস যাকে বলেছিলেন "ইতিহাসের চাতুরী" ("History's cunning), তাও কিছু হয়তো লুকিয়ে রয়েছে। ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে প্রবাসকালে লেনিন "The Lessons of 1905" শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন : "পুরোনো প্রজন্মের আমরা হয়তো আসন্ন বিপ্লবের চরম লড়াইগুলো দেখতে পাব না।" অথচ বস্তুত এপ্রিলে জারশাসনের পতন ঘটল আর নভেম্বরে সোভিয়েত বিপ্লব। ১৯৮৭ থেকে ২০০৭, এই কুড়ি বছরের দুঃসময় শেষ হলে কে জানে মার্কস কথিত "একই দিনে কুড়ি বছরের সঞ্চিত নির্যাস"-রূপে নতুন বিপ্লব হয়তো ঘটবে জগৎ জুড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিশ্বায়নী অর্থনীতির চণ্ডমূর্তি আর সমুন্নত দেশগুলির সমস্যাকণ্টকিত চেহারা ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। জনশক্তির নবজাগৃতির প্রস্তুতি সে অনুপাতে তেমন দেখছি না বলেই কষ্ট। বার্লিন থেকে উলানবাটর, লেনিনগ্রাদ থেকে লিবিয়া, বহুদেশে দোষে গুণে জায়মান সমাজতন্ত্র দেখে মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলেও শেলীর ভাষায় চাইব : "To hope till Hope creates/ From its own wreck the thing it contemplates"। কিন্তু ইতিহাস তো কারও ইচ্ছাপূরণের (wish-fulfilment) দায়িত্ব রাখে না। দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরই জনশক্তির ওপর। আপনারা বিদ্বজ্জন, যে যেভাবে পারেন শোষণমুক্ত জীবন-আবাহনে লিপ্ত থাকুন।

দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট আয়োজিত কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার-এর উদ্বোধনী ভাষণ।

"হিন্দু-মুসলমান-কী জয়!"

দেশের নানা অঞ্চলে যখন বেশ কিছুকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আগুন জ্বলছে, কাশ্মীরের মতো এলাকা যখন বিস্ফোরক অবস্থায় রয়েছে, 'রামজন্মভূমি'-বাব্‌রি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে বিষময় বিপদের আশঙ্কা দূর হবার লক্ষণ যখন নেই, বাক্‌স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যখন দাপটের সঙ্গে উগ্র হিন্দু ঘোষণা চলছে যে, অযোধ্যার মতো মথুরা এবং বারাণসীতেও বিধর্মীদের হটিয়ে মন্দির বানানো হবে, ভারতীয় জনতা পার্টির মতো অধুনা শক্তিশালী সংগঠন যখন অবলীলাক্রমে বলে চলেছে যে মুসলমান এদেশে বহিরাগত বলে হিন্দু পরম্পরার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে না পারলে তার নাগরিক অধিকার ভারতরাষ্ট্রে স্বীকৃত হবে না, যখন ভাগলপুরের মতো অঞ্চলে একেবারে অভাবনীয় ধরনের সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা শুধু নয়, অন্য বহু স্থানে বার-বার সংখ্যাল্প মুসলমান আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে, এমনকী খাস রাজধানী দিল্লীতেই হজরত নিজামউদ্দীন দরগার মতো সকল ধর্মাবলম্বীরই আদৃত তীর্থস্থান পর্যন্ত এই কলুষ থেকে নিস্তার পায় নি। "হিন্দু-মুসলমান-কী জয়" উচ্চারণ কি বিদ্রূপ না পরিহাস না নিছক ভাবাবেগী নির্বুদ্ধিতা?

সন্দেহ নেই যে, সম্প্রতি জগৎ জুড়ে এমন অনেক বিচিত্র আর আপাতদৃষ্টিতে বিকট বিপর্যয়কর ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে আর সমাজশৃঙ্খলার জন্য প্রশংসিত সোশালিস্ট দুনিয়াতেও মারাত্মক ওলটপালটের লক্ষণ প্রকট হয়েছে যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোকে মহাপাপ বলে জীবনান্তের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ঋষিকণ্ঠোক্ত সতর্কবাণীর আশ্রয় ছাড়া যেন উপায়ান্তর নেই। আজকের পরিস্থিতি মাঝে-মাঝে এমন কটু আর কুৎসিত বীভৎসার আকার নিয়ে চলেছে যে নৈরাশ্য দেখা দিলে আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মনের গভীরে প্রচণ্ড প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে শুভবুদ্ধির যে বিপুল সঞ্চয় আছে তা স্মরণে রাখলে নৈরাশ্য পরাভূত হতে বাধ্য।

হয়তো ভাববাদী বিভ্রমের অভিযোগ শুনতে হবে কিন্তু মনে পড়ছে 'The Indian Musalmans'-শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের রচয়িতা মনস্বী মুহম্মদ মুজীব-এর একটি কথা। পাটনার নিকটবর্তী একটি ছোটো শহরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মর্মান্তিক মালিন্য তাঁর মন থেকে মুছে গিয়েছিল যখন তিনি দেখেন কয়েকজন হিন্দু মেয়েকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জলের কলসি নিয়ে গঙ্গাকূলে অবস্থিত 'সূফী' ধর্মস্থান প্রদক্ষিণ করতে। মনে পড়ে যাচ্ছে সত্তর বৎসরেরও বেশি আগের খবর সংবাদপত্রমাধ্যমে জেনে সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে হতাহতদের মধ্যে পড়ে থাকা মুসলিম কিশোর তৃষ্ণায় জর্জর হয়েও বলে উঠেছিল : 'একটু জল। না, দাও আমার পার্শ্ববর্তীকে, আমি চলি, হিন্দু-মুসলমান কী জয়!'

পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছি বলে উন্নাসিক ভর্ৎসনাকে না হয় উপেক্ষা করে গান্ধীজীর অবিস্মরণীয় সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইনডিয়া' (৮ সেপ্টেম্বরের ১৯২০) থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া

য্যক। মাদ্রাজ সফরের সময় বিজয়ওয়াড়াতে সভায় শ্রোতাদের বলেছিলেন যে, ব্যক্তির বদলে আদর্শের জয়গান সমুচিত আর তাই "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়", "মহম্মদ আলী-শৌকৎ আলী কী জয়"-এর বদলে ধ্বনি উঠুক "হিন্দু-মুসলমান কী জয়।" আমার পর বলতে উঠে ভাই শৌকৎ আলী একেবারে সোজাসুজি বললেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সত্ত্বেও তিনি লক্ষ করেছেন যে হিন্দুরা 'বন্দেমাতরম্' বললেই পাল্লা দিয়ে মুসলমানরা বলে উঠেন 'আল্লা- হো-আকবর' কিংবা এর উলটোটা ঘটে, যা কানে খারাপ লাগে আর ভয় হয় যে দেশের মানুষ ঠিক এক হতে পারে নি। এজন্যই তাঁর সুপারিশ হল যে সর্বত্র স্বীকৃত হোক তিনটি "আওয়া"— প্রথমে 'আল্লাহ্-হো-আকবর' যা হিন্দু-মুসলমান সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করবেন, 'ঈশ্বর মহান' বলতে কারও আপত্তি যখন নেই; দ্বিতীয় ধ্বনি হবে 'বন্দেমাতরম্' কিংবা 'ভারতমাতা' কী জয়'; আর তৃতীয়টি হবে 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' (যা বিনা লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয়)। আমি [গান্ধীজী] মওলানা সাহেবের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিচ্ছি। ...শুধু 'ভারতমাতা কী জয়'-এর বদলে পছন্দ করি 'বন্দেমাতরম্', কারণ তা হবে গোটা দেশের পক্ষে বাঙলার বিদ্যাবুদ্ধি ও আবেগগত উৎকর্ষের মনোরম স্বীকৃতি। ...হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য বিনা সবই অসার্থক আর তাই "হিন্দু-মুসলমান কী জয়" এমন ধ্বনি যা আমরা যেন কখনও না ভুলি।'

বিদগ্ধ বিচারে গান্ধীজীর এই বিবৃতিতে হয়তো অনেক গলদ ধরা পড়বে। মজা করে বলা যেতে পারে যে, মহাত্মা হলেও রাজনীতি ব্যাপারে চাতুর্যেরও অধিকারী গান্ধীজী বাঙলাকে একটু তুষ্ট করারও চেষ্টা করেছিলেন। শুধু আওয়াজ তুলে, আবেগের কুহেলিকা তৈরি করে বাস্তব সমস্যার সমাধান অবশ্য ঘটে নি, কিন্তু সেদিনের উন্মাদনা যাদের স্মরণে আছে, অন্তত কিছুকাল স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব ঐক্যের মনমাতানো সেই আস্বাদ যারা কখনও ভুলবে না, তারা জানে যে বাস্তবিকই তখন এমন এক সুযোগ এসেছিল যা (গান্ধীজীরই ভাষায়) আগামী একশো বছরে আসবে কিনা সন্দেহ। এখানে সম্ভব নয় সংক্ষেপে সেই ইতিহাস বিবৃত করা যা চোখে আঙুল খুঁচিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদেরই নিজস্ব বহু প্রজন্মপুষ্ট দুর্বলতা যা কিছুতেই ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কুটিল দুর্বৃত্ত ভেদনীতির প্রবল প্রয়োগকে পরাজিত করতে পারল না, আর শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের মতো মারাত্মক মূল্য দিয়ে কিনতে হল খণ্ডিত স্বাধীনতা, যে-মূল্য আজও সুদে-আসলে পরিশোধ সম্পূর্ণ হয়নি, যেজন্যই কাশ্মীর জ্বলতে থাকে, পঞ্জাবে বিকট অশান্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে, আর দেশ জুড়ে সংহতিভঙ্গের নোংরা আবহাওয়া কাটানো যায় না। ১৯৩০ সালে মওলানা মুহম্মদ আলী লন্ডনে গোলটেবিল সম্মেলনে পরম দুঃখেই বলেন : 'আমরা নিজেরা ভাগাভাগি করছি আর তোমার শাসন করছ' ('We divide and you rule')। এ যে কত মর্মন্তুদ উক্তি তা এযুগের অনেকেই হয়তো বুঝবেন না।

হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীপ্তি এখনও দেখা যায়। যেখানে জনশক্তি একটু জাগ্রত সেখানেই 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে' প্রস্তুতিও রয়েছে। রামজন্মভূমি নিয়ে উত্তেজনা যে এলাকায় চরমে উঠেছিল সেই অযোধ্যারই ফৈজাবাদ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস দলের অশুভ সংযোগ

সত্ত্বেও বিপুল ভোটে লোকসভায় নির্বাচিত হলেন সি. পি. আই. প্রার্থী মিত্রসেন যাদব। কানপুরের মতো যেখানে হিন্দু-সংকীর্ণতার ঢেউ ছিল প্রবল, সেখানেও সি. পি. আই. (এম) -এর পক্ষ থেকে লোকসভায় গেলেন সুভাষিণী আলি। বিহারে যখন রাজনীতিওয়ালাদের অবিশ্বাস্য দায়িত্বহীন আর দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে ভাগলপুরে নৃশংস অচিন্তনীয় পৈশাচিকতার তাণ্ডব চলেছিল, তখনই ধানবাদের মতো দুর্বৃত্ত-শাসিত বলে কুখ্যাত এলাকা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন কমিউনিস্টমতাবলম্বী এ. কে. রায়ের মতো নির্বিত্ত অথচ জনপ্রিয় কর্মী। অতিবর্ষণের মধ্যে রামধনুর স্বর্ণ আবির্ভাবের মতো হল এ-ধরনের ঘটনা। মনে পড়ছে কিছুকাল আগে মীরাট-মালিয়ানার বীভৎস দাঙ্গার মধ্যে ছোট্টো একটা খবর যাকে খবরের কাগজ স্থান দেবার যোগ্য মনে করে নি' (দেখেছিলাম স্বেচ্ছায় রক্তদান-সমিতির এক বিবরণে)—সাংঘাতিক জখম এক হিন্দুর প্রাণ বেঁচেছিল মুসলমান চিকিৎসকের নিজের (এক বিরল শ্রেণীর) রক্তদানের ফলে। আজ যার "হিন্দুত্ব"-র দর্প নিয়ে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে আর ভ্রূক্ষেপ না করে দেশের শান্তি শুধু নয়,—তার সত্তা তার মর্যাদা আর স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেবার মতো মূঢ়তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে, তারা হয়তো জানে না বা জানতে চায় না যে স্বাধীন ভারতে প্রথম "মহাবীরচক্র" পেয়েছিলেন বিগ্রেডিয়র মুহম্মদ উসমান (যাঁর ভাই প্রয়াত সাংবাদিক সুভান ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু)—তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে। ক-জনই বা জানেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংঘর্ষকালে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দেন হাবিলদার আবদুল হামিদ খান, মরণোত্তর সম্মান দেশ জানিয়েছিল তাঁর স্মৃতিতে "পরমবীরচক্র" উৎসর্গ করে। আমাদের এদেশে যে একইভাবে হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি-পুণ্যভূমি—বলেন নি কি মওলানা আবুল কালাম আজাদ যে দেশ ভাগ হয়েছে ভূগোলে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তো নয়? বলেন নি ১৯৪০ সালের সভায় পাকিস্তান-বিষয়ক বিতর্কে কলকাতার তৎকালীন মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দীকি (যাঁর কথা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্বকর্ণে শুনেছিলাম বলে আজও যেন শুনতে পাই) যে রাষ্ট্রের সীমানার অদলবদল ঘটলেও এদেশ তো হিন্দু-মুসলমান সকলের, আর এটাকেই ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে বলেছিলেন যে মৃত্যুর পর হিন্দুর শবদেহ ভস্ম হয়ে নদীর জল বেয়ে কোথায় যায় কে জানে, কিন্তু মুসলীম তার মৃত্যুর পরও চায় এদেশেরই জমিতে একটু স্থান, শুধু জীবনে নয় মরণেও মুসলিমের দেশ হল এই ভারতবর্ষ।

এর পিছনে যদি কেউ শুধু আবেগ আর উচ্ছ্বাস আর বাক্সর্বস্বতা খুঁজে খুশি হন তো নাচার। কিন্তু ভাবি শান্তিনিকেতন-খ্যাত প্রয়াত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা" ও অন্যান্য রচনা তথ্যসম্ভার-সুরভিত হয়ে কত জ্ঞান আর অফুরন্ত আনন্দ বিতরণ করার ক্ষমতা রাখে! একেবারে সদ্য-প্রকাশিত "মানবতা ও গণমুক্তি"-র মতো গ্রন্থে এবং অন্যত্র বাঙালির সাহিত্যে ও জীবনে বিবর্তনধারার গভীর বিশ্লেষক, বাংলাদেশের প্রমুখ মনস্বী আহমদ শরীফ সমাজসৃষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের সহজ সুস্থ স্বাভাবিক সাযুজ্য বিষয়ে মহার্ঘ অন্তরদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুসলমান তো এদেশে বহিরাগত নয়।

তারা তো প্রায় সবাই এদেশেরই প্রাচীন সমাজশাসনে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ যারা ধর্মভাষাজাতি-নির্বিশেষে যুগ-যুগ ধরে নির্জিত হয়ে এসেছে। এজন্যই তো দেখি পৈশাচিক অত্যাচার শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, হিন্দু সমাজের একেবারে নীচের তলায় যারা পিষ্ট রিক্ত অমানবিক জীবনযাপনে বংশানুক্রমে বাধ্য হয়েছে তাদেরও সইতে হচ্ছে শক্তিমান গোষ্ঠীগুলির দৌরাত্ম্য। জাতিধর্মভাষা-নির্বিশেষে 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' বাক্যটি কবে যে সর্বদেশে সত্য হয়ে উঠতে শুরু করবে তা জানি না কেউ, কিন্তু এজন্য যে লড়াই তার চেয়ে সার্থক প্রয়াস তো নেই। এই প্রয়াসেরই অংশীভূত হওয়ার চেয়ে সুকর্ম আর কী আছে?

বাঙালি আমরা বিশেষ করে এখনও সবাই পারি নি অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করতে যে আমাদের জীবনে আর ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান একত্র থেকেই সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ করতে পেরেছি। স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মাতৃভাষার প্রতি বহুগুণ বিপুল ভার গভীর মমতা দেখি না কি বাঙালি মুসলমানের মনে? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল স্মৃতিশাস্ত্র চর্চায় ব্যস্ত থেকে যখন বিধান দেয় যে দেবভাষা সংস্কৃত ছেড়ে অপোগণ্ড বাঙালির মাতৃভাষায় রচনায় প্রবৃত্তস্থলে রৌরব-নরকপ্রাপ্তি অনিবার্য তখন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খানের মতো মুসলিম শাসকের সুবুদ্ধি ও উৎসাহ বিনা মধ্যযুগীয় বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য বলতে কিছু থাকত মনে হয় না। এ নিয়ে কথা বাড়ানোর দরকার নেই, কিন্তু কজন আমরা জানি যে চণ্ডীদাস যেমন লেখেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,' তেমনই পরবর্তী যুগে কাজী দৌলতের মুখে শুনি; 'নর সে পরম দেব/নর সে ঈশ্বর/নর বিনা ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর'? কজনের মনে আসে 'রামচরিতমানস'-এর স্রষ্টা মহাত্মা তুলসীদাসেরই সমসাময়িক বিরাট লেখক মালিক মুহম্মদ জৈসি-কৃত "পদ্মবত"-এর কথা যাকে অবলম্বন করে বাঙালি মহাকবি আলাওল লেখেন "পদ্মাবতী" (সঙ্গে-সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-সমেত অন্যান্য বহু বিষয়ে আলাওলের আটকায় নি)?

রাজসভাকবি এবং সর্ব অর্থে বিদেশাগত বলে অভিজাত জীবনে আশ্রয় নেওয়া যাঁর পক্ষে সহজ ও সঙ্গত হত, সেই আমির খসরু-র মতো বিস্ময়কর সর্ববিদ্যাপারঙ্গত প্রতিভা সাতশো বছরেরও বেশি আগে এদেশের মানুষ যেভাবে বনে গিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর নিশ্চয়ই কিন্তু ভারত-ইতিহাসের 'যজ্ঞশালায়" এ ঘটনা জাজ্জ্বল্যমান নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই সুসমঞ্জস। হজরত নিজামউদ্দীন আইলিয়ার শিষ্য ছিলেন এই মহাকবি-সাংগীতিক-রূপস্রষ্টা। নিজামউদ্দীন-প্রতিষ্ঠিত দরগার এক প্রধান বুঝি বলতে সংকোচ করেন নি যে 'হিন্দোস্তানকো দো পয়গম্বর, রাম আওর কৃষ্ণ'। আমির খসরু তো সানন্দে বলতেন তিনি 'তুর্ক' নন, তিনি 'হিন্দিভি'। 'ভারতীয় তুর্ক' তাই বলতেন যে এদেশ গরম নিশ্চয়ই, কিন্তু কারণটা কি কেউ জানে? সূর্য যে ভালোবাসে এই দেশকে। আর এখানকার ফুল! যেমন তার রঙ তেমনই তার গন্ধ, আরবের ফুল তার ধারে-কাছে আসে না। সাহিত্য-সংগীত-শিল্পকলার সর্ব বিভাগে বিপুল গুণধর এই মানুষটিকে হিন্দি ভাষার একজন স্রষ্টা বললে ভুল হয় না। আর খিলজি রাজবংশের সভাকবি হয়েও তাঁর লিখতে আটকায় নি যে, 'বঞ্চিত দরিদ্রের অশ্রুজল জমাট হয়ে তৈরী হয়েচে মুক্তা যা কিন্তু শোভা পায় ধনীর কণ্ঠে।' আজও হয়তো পান-খেকো বাঙালি

খুশি হবে এই বিরাট প্রতিভার মুখে খাওয়ার পর পানের মতো অপরূপ বস্তু চিবানোর মহিমা কীর্তিত হতে শুনে?

মুসলমান এদেশে রাজ্যজয়ে আসার বহু পূর্বে মুসলমান সাধকেরা আসেন, দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে তাঁরা পীঠ স্থাপন করেন যা আজ রয়েছে। হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে ভক্তের দল সেখানে প্রণতি জানায়। যেমন নানকদের ("হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকা পীর"), তেমনই বাবা ফরীদ-এর মতো মুসলমান সাধুকে বলা যায় পঞ্জাবি (এবং সিন্ধি) ভাষার জনক। ওই দুই ভাষায় আর-এক স্রষ্টা ছিলেন শাহ আবদুল লতীফ। ভাষাভেদবুদ্ধি যখন প্রকট হয় নি তখন লেখা হয় আলী হায়দর এবং তার চেয়েও বিখ্যাত ওয়ারিস শাহ্-র 'হীর-রঞ্ঝা"-র মতো প্রেমগাথা যা সারা উত্তর ভারতের হৃদয় জয় করে রেখেছে আজও। কাশ্মীরে (বর্তমানে সংকট সত্ত্বেও) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে যে সৌহার্দ্য যুগ-যুগ ধরে দেখা দিয়েছে তাতে সহায় হয়েছিলেন "কাশ্মীরের আকবর" নামে খ্যাত নরপতি জৈনুল আবেদিন। আকবর বাদশাহ শুধু যে 'দীন ইলাহী' প্রবর্তনচেষ্টার দুঃসাহসে নেমেছিলেন তা নয়, তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে তৎকালীন জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের রামায়ণ-মহাভারতের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে ডেকেছিলেন, যা "আকবরনামা"-র অন্তর্ভুক্ত হয়তো হয়েছিল, কিন্তু যতদূর জানি তার সন্ধান পাওয়া যাবে ব্রিটেনে (অন্ধ্রপ্রদেশের জয়পুর-মহারাজের প্রাসাদে বুঝি এককালে সেগুলি ছিল)। অনেকেই অবশ্য জানি কিন্তু তাৎপর্য বুঝি না যে, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শিকোহ এদেশের সর্বশাস্ত্রমন্থনের ব্রত নিয়েছিলেন, "সত্যস্য সত্যং" বলে বলে যার বানা সেই পাকিস্তান, বাংলাদেশে, নেপাল, ভুটান, বার্মা (তার নতুন নাম যাই হোক) সিংহল প্রভৃতি নিয়ে একটা মৈত্রীক্ষেত্র সৃষ্টি এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয় আদত তো নয়-ই? আজ ও আগামী কালের হিসাব নয় কিন্তু কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি (এবং হ্যাঁ, কল্পনাও) নিয়ে এই সহমর্মী সহযোগী সাহচর্য-ক্ষেত্র নির্মাণে ভারতবর্ষ সক্রিয় ভূমিকায় নামতে পারে না, অবিলম্বে সার্থকতার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেই?

'চতুরঙ্গ' মাসিক পত্রিকা, জুন ১৯৯০

"প্রাণের ভুবন করো পূর্ণ"

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মরণে)

সমাজবাদ-সাম্যবাদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে আর সোভিয়েট বিপ্লবের (১৯১৭) স্মৃতিকে পর্যন্ত মুছে ফেলে 'মুক্ত' দুনিয়াজোড়া পুঁজিবাদ জগৎ জয় করেছে বলে চতুর চকমপ্রদ প্রচার, প্রায় বছর দশেক ধরে চলেছে। আমাদের দেশ সমতে সর্বত্র সম্প্রতি সেই ধনতন্ত্রের ফাটল ফুটে উঠতে থাকা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট মহলে কেমন যেন 'অপ্রতিভ' ভাব আর তাই কেবলই শুনতে হয় একটু বাড়াবাড়ি ধরনের 'ভুল করেছি' 'ভুল করেছি' বলে চলার রেওয়াজ। বিপ্লবের মূলনীতিতে বিশ্বাস যেন শিথিল হয়েছে। কম্যুনিস্ট তত্ত্বের ওপর আস্থায় রীতিমতো ঘাটতির লক্ষণও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠছে। আমাদের এবং অন্যান্য সব দেশেরই জনতার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তাই কতকটা যেন হাল ছেড়ে দেওয়ার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। কিন্তু এটাই আজকের মূল বাস্তব নয়। দেশে দেশে, পূর্বে ও পশ্চিমে, মানুষের জয়যাত্রা সম্প্রতি কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হলেও যে অপ্রতিরোধ্য তার প্রমাণ মিলছে। সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্র যে কত বিরাট আর বিকট প্রবঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আর্থিক বিপর্যয়ে। যাকে বলা হয় 'crony capitalism' তার নোংরামিতে, ভারতের মতো দেশেও শেয়ার বাজারে ক্রমান্বিত কেলেঙ্কারির ঘৃণ্য চেহারা হাসিল হবার মধ্য দিয়ে। তাই নভেম্বর-এর এই পুণ্য মাসে, আপাত বিচারে পরাস্ত সোভিয়েট বিপ্লবের ৮১-তম বার্ষিকীতেই স্মরণ করতে হবে যে বিপ্লবের পরাজয় নেই, শোষণের কারাগার থেকে গোটা দুনিয়ার মানুষের মুক্তিপথে কোনো বাধাই টিক্‌তে পারে না।

পশ্চিমবাংলার শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে যখন বিপ্লব বার্ষিকী বিষয়ে লেখার অনুরোধ এল তখন নানা বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও সাড়া না দিয়ে পারছি না। আজই (৪ নভেম্বর) কাগজে পড়ে ভাল লাগল যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা একজোট হয়ে পালন করছে এই বার্ষিকী। আবার বলি : 'বিপ্লবের পরাজয় নেই'। ইতালিতে, বিশের দশকে, মুসোলিনির ফ্যাসিজম-এর যখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তখন দার্শনিকপ্রবর বেনেদেত্তো ক্রোচে-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে 'গণতন্ত্র' বস্তুটির কি আর ভবিষ্যৎ আছে? মনীষী ক্রোচে-র অবিস্মরণীয় উত্তর এসেছিল : "গণতন্ত্র-এর শুধু 'ভবিষ্যৎ' নেই, তার জন্য পড়ে রয়েছে 'অনন্তকাল' (eternity)"। আমরাও প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি যে প্রকৃত জনগণের নবজীবনের সূচক যে সমাজবাদ-সাম্যবাদে গণতন্ত্রের সুপরিণতি, সেই কম্যুনিজম-এর জন্য শুধু ভবিষ্যৎ নয়, অনন্তকাল পড়ে রয়েছে। এখানেই তাৎপর্য মেহনতী মানুষের জগদ্ব্যাপী জয়ধ্বনির : 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'।

* * * *

রাশিয়ার জার-এর শাসন যখন অপ্রতিহত, তখন ১৯০৬ সালে সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে 'ইয়োরোপীয় রাশিয়া' অঞ্চলে (যা তুলনায় উন্নত) সকলের শিক্ষালাভের সম্ভাবনা পূর্ণ হতে লাগবে একশো কুড়ি বছর, 'ককেশস্' পার্বত্য অঞ্চল আর সাইবিরিয়াতে লাগবে চারশো ত্রিশ বছর আর যাকে বলা হত তুর্কিস্থান (অর্থাৎ মধ্য এশিয়া) সেখানে লাগবে চার হাজার ছয়শত বছর। সরকারি বিবরণেই একটু রং দেবার জন্য লেখা হয় যে তাজিকিস্তানে (যা হল আফগানিস্তানের লাগোয়া) সকলে সাক্ষরতা অর্জন করবে ৬৫০০ খ্রিস্টাব্দে, যদি অবশ্য তাজিকরা ততকাল 'বেঁচে বর্তে' থাকে। এই যে প্রকাণ্ড এক দেশের হাল ছিল নভেম্বর বিপ্লবের আগে, সেখানে যে কী বিপুল পরিবর্তন এসেছে তা প্রায় কল্পনাতীত। আমরা এদেশে স্বাধীন হয়েও অশিক্ষার অভিশাপ মোচন করতে পারিনি, আর সোভিয়েট বিপ্লবের কল্যাণে অতি দ্রুত যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে তার কথা কারও অজানা নয় (যদিও সে কথাটাই সবাইকে ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত সর্বদা সর্বত্র চলছে)। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাই ১৯৩০ সালে সোভিয়েট ভ্রমণে গিয়ে বলেছিলেন 'ইতিহাসের মহাযজ্ঞ' সেখানে চলেছে, যে ছিল পঙ্গু সে যেন কোন্ এক বিস্ময়কর প্রভাবে চলৎশক্তি ফিরে পেয়েছে। শিক্ষা—যা হল সুস্থ সভ্য সৎপথী জীবনের ভিত্তি—সেখানে সকলের কাছে সহজলভ্য, দুনিয়াটাকে নতুন করে লড়বার অসমসাহস প্রয়াসে সে দেশ নেমেছে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছিলেন সোভিয়েটকে এই বলে "মানুষের মর্মে মর্মে ঢুকে রয়েছে 'লোভ' নামক যে 'মৃত্যুশেল', তাই উৎপাটিত করার একান্ত দুরূহ সংকল্প তোমাদের—তোমরা যেন জয়ী হতে পারো।"

সোভিয়েট আমলের তাকিজিস্তানে আমি নিজে দু'বার গিয়েছি—১৯৪৫ সালে, আবার ১৯৬৯ সালে। সেখানকার রাজধানী স্তালিনবাদে জাতীয় গ্রন্থাগার হল মহাকবি ফির্দৌসির নামাঙ্কিত। দেখা হয়েছিল প্রধান গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে—একজন মহিলা যার নাম এখনই মনে আসছে না, যাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তাজিকদের মধ্যে রুশ ভাষার বিরুদ্ধে মনোভাব আছে কিনা। তিনি বলেন যে তার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু বিপ্লবকালে এবং তার অব্যবহিত পরের সংকটময় সময়ে রাশিয়ান্ মেয়ে কম্যুনিস্টরা তাজিক পরিবারের অন্তঃপুরে বাস করে, মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে, সবাইকে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল আর তাই রুশ জাতির প্রতি তাদের আক্রোশ আর থাকে না, পরস্পর মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই হল বিপ্লবের অমোঘ মহিমা।

ত্রিশের দশকে আইরিশ লেখক Scan O'Casey একবার বলেন যে তিনি দুটো কারণে সোভিয়েটের অনুরাগী : এক হল এই যে সোভিয়েট দেশে আধুনিক ফরাসি ছবির সবচেয়ে সরেস সংগ্রহ আছে, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে জগতের সকল দেশের তুলনায় মেয়েদের এবং শিশুদের কল্যাণব্যবস্থা সোভিয়েটে সবচেয়ে ভালো। আমি বহুবার সেভিয়েটে গিয়েছি; কিরঘিজিস্তান ছাড়া আর সাতটি এশিয়ন্ সোভিয়েট রিপাব্লিকে গিয়েছে। O'Casey-র মন্তব্য যে কত নির্ভুল তার অজস্র প্রমাণ পেয়েছি।

উজ্বেকিস্তানে বহু বৎসর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (পেশায় চিকিৎসক) ইয়াদ্গার নাসিরুদ্দীনোভা, যার সঙ্গে একাধিবার আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। সেখানকারই লেখিকা (এদেশে সুপরিচিত)

জুল্‌ফিয়ার সঙ্গে পরিচয়র সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি নৃত্যপটীয়সী তামারা খানুম আর গালিয়া ইস্‌মাইলোভাকে (এই দ্বিতীয়োক্তা পরিবারের অমতে পালিয়ে গিয়ে নাচতে শিখে দেশজোড়া খ্যাতিলাভ করেছিল)। বেশ মনে পড়ছে একবার আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এক উজবেক মহিলা মন্ত্রী, যিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন যে 'ভাগ্যিস' বিপ্লব হয়েছিল। নইলে তাঁকে হয়তো কোনো জমিদারের তৃতীয়া পত্নী ("third wife of a Bey") হয়ে জীবন কাটাতে হত। কথা বাড়াব না, কিন্তু প্রকৃতই যারা বঞ্চিত, বিপ্লবই তাদের সাম্‌নে মুক্ত জীবনের সম্ভাবনা আনতে পারে।

তুর্কমেনিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বিবি পালমালোভার সঙ্গে একাধিবার দেখা হয়েছে। সদাহাস্যময়ী এই সুন্দরীর জন্মকথা জেনেছি অপরের বর্ণনা থেকে। চোদ্দজন ভাইবোনের পরিবারে জন্মেছিলেন। কিন্তু এক তিনি ছাড়া আর কেউ বাঁচে নি। কম্যুনিজম্‌-এর জীবনদায়ী শক্তি তাঁর মতো একজনকে বাঁচিয়েছিল, 'মানুষ' করেছিল, নেতৃপদে বসিয়েছিল। আর এক তুর্কমানী মন্ত্রী ছিলেন Dzheren Mamedova, যার এগারোটি ভাইবোনের মধ্যে নয়জনের মৃত্যু হয় শিশুকালে আর একজনকে (বিপ্লবপূর্ব যুগের দুর্দশার জ্বালায়) পিতামাতা পাহাড়ের মাথায় রেখে দিয়ে এসেছিল, মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিয়েছিল।

শুধু যে জার শাসনে একান্ত অত্যাচারিত অঞ্চলে এমন হত, তা নয়। নাম করব না কিন্তু আমি ঘনিষ্ঠভাবে বহু বৎসর জেনেছি একজন রাশিয়ানকে, যে দিল্লিতে সোভিয়েট দূতাবাসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। অথচ তার জীবনে (১৯১৩ সালে জন্ম) প্রায় আঠারো বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত, সে কখনও চামড়ার জুতো পরতে পারেনি। বিপ্লব ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই যে সব মুশকিল আসান হয়নি, তার অনেক কারণ, প্রধানত গোটা পুঁজিদারী দুনিয়ার দুর্দান্ত দুষ্‌মনী, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক অবরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও যেমন "পঙ্গুঃ লংঘয়তি গিরিম" তেমনই সোভিয়েট গড়েছিল তার ইমারত, যা এমনই মজবুত যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণে (১৯৪১-৪৫) তার মাথা নত করেনি। অ্যাটম বোমার হুমকিকেও হটিয়ে দিয়েছিল। Glasgow University থেকে প্রকাশ হত 'Soviet Studies' যাতে অনবরত সোভিয়েটের গালমন্দ থাকত, আর তাতেই দেখেছি ১৯৮৩/৮৪ নাগাদ সময়ে স্বীকারোক্তি যে সোভিয়েটের অগ্রগতিকে বাতিল করা চলে না, তবে কিনা তারা (পাশ্চাত্যের তুলনায়) সবাই দশ ফুট লম্বা না হলেও 'আট ফুট'-এ পৌঁছে গিয়েছে। হয়তো ঠাট্টা শুন্‌ব যে এসব কথা শিকেয় তুলে রাখা হোক্‌, এখন তো তাদের 'বারোটা বেজে গেছে', দুনিয়া এখন পুঁজিবাদের হুকুমে চলবে। জানি আজ এ ধারণাটাই প্রবল আর তারই সুযোগ নিচ্ছে কম্যুনিজম-এর শত্রুরা। কিন্তু 'এক মাঘে শীত শেষ হয়না'—অন্তত ইতিহাস, মাঝে মাঝে পিছু ঠেলা খেলেও এগিয়ে চলে। মানুষ জানে বাঁচতে হলে এগোতে হয় : 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'।

* * * *

এ লেখাটা আমার অবিস্মরণীয় সুহৃৎ সহমর্মী সহকর্মী কবি-শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নামে উৎসর্গ করতে চাই। মনে পড়ছে কলকাতায় সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির একটা বড়ো সভা

হবে আর সেজন্য জ্যোতিরিন্দ্র একটা গান লিখবেন। সেটা তিনি লিখলেন আমার উপস্থিতিতে বেনিয়াটোলা লেনে গুপ্ত প্রেসের ভাঙা বাড়ির এককোণে বসে। প্রতিভাধর সঙ্গীতকারের হাত থেকে বেরিয়ে এল প্রাণ মাতানো গান, যা তিনি নিজে তখনই সুর দিলেন ও সন্ধ্যার পর গাইলেন—"এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার"। এখনও মনে বাজছে : "উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী/মৃত্যু সাগর মন্থনে/নূতন জীবন চায় শিল্পীর বরাভয়/নবসৃষ্টির শুভক্ষণে।" "এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে/এসো জনতার মুখরিত সখ্যে" কী অপূর্ব সেই আহ্বান। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে যে বিপ্লব যথাসময়ে আসে ভগীরথের মতো ঊষর ভূমিতে ভাগীরথীর পুণ্যবারি নিয়ে—বিপ্লবের পরাজয় নেই। মনে পড়ছে ১৯৩৬/৩৭ সালে শিলচরে মস্ত ছাত্রসভা, সেখানে যমজ দুই ভাই গাইল নজরুলের গান : "বলো ভাই মাভৈ মাভৈ/নবযুগ অই এলো ঐ/এলো আজ রক্ত যুগান্তর।" অধৈর্য হয়ে, আশাহত হয়ে, পরাজয় স্বীকার করবে না জনাশক্তি, করবে না মানুষের মন। জ্যোতিরিন্দ্র যেমন চেয়েছিলেন তেমনই দিন আসবে : "প্রাণের ভুবন করো পূর্ণ।"

তরী হতে তীর গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ

বেশ কিছুকাল ধরে 'তরী হতে তীর'-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় কিছু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তৃতীয় মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য স্বভাবতই প্রসন্ন বোধ করতে পারা যায়। বস্তুত প্রথম থেকে 'তরী হতে তীর' অপ্রত্যাশিতভাবেই যে পাঠক-সমাদর পেয়েছে, ভিন্ন রুচির বহু সুধীর মনেও যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হয়।

দ্বিতীয় মুদ্রণকালে প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি ভুলক্রমে বাদ পড়ে গিয়েছিল। এতে কিছু ক্ষতি ঘটে। কারণ সংক্ষিপ্ত হলেও সেই ভূমিকার সঙ্গে মূল গ্রন্থের চরিত্র ও উদ্দেশ্যের এক বিশেষ অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল। এবার সেটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি কেউ সংস্করণগুলি-মিলিয়ে দেখার কষ্ট স্বীকার করতে পারেন তো এর তাৎপর্য স্পষ্ট হবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তারিখে দেশবিভাগের মূল্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মূল রচনায় লেখকের "পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত" শেষ হয়েছিল। বহু সজ্জনের কাছ থেকে অনুরোধ আসে তৎপরবর্তী কাল নিয়ে প্রয়োজন হলে একাধিক খণ্ড যেন লেখা ও প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের এই একান্ত সঙ্গত ও সদাশয় ইচ্ছা পূরণে অসামর্থ্য জানাবার জন্যই দ্বিতীয় মুদ্রণে একটি নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ সংযোজিত হয়েছিল। সেটি এই গ্রন্থেও রয়েছে, যদিও আগ্রহী পাঠকদের তুষ্ট করা হয়তো যাবে না। তৃতীয় মুদ্রণের আবার একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ দেওয়া হবারও কয়েকটি বাড়তি কারণ রয়েছে। এটা শুধু নতুন কিছু ঢুকিয়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির অজুহাত নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ৪৭ বছর কেটে গেছে; লেখকের এখনও পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্তন যখন ঘটেনি এবং কিছু পরিমাণে সক্রিয়ভাবেই যখন তার অবস্থান, তখন অন্তত গ্রন্থের নামকরণের দিক থেকে রচনাটিকে কতকটা প্রাসঙ্গিক করার দায়িত্ব থেকে যায়। এজন্যই এই গৌরচন্দ্রিকা।

বার্ধক্যের এক অভিশাপ এই যে বহু প্রিয়জনকে হারাতে হয়, পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেককে চলে যেতে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে যা এক্ষেত্রে ঘটেছে, অর্থাৎ স্বদেশে ও সমকালীন বিশ্বে ইতিহাসগত কারণেই সংঘটিত অশুভ, অশুচি, আসুরিক, অবিবেকী দুর্জনপ্রাধান্যের প্রায়-নিঃসঙ্গ ও সহায়হীন দর্শক যদি হতে হয় তো ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয়বিধ যে যন্ত্রণা তার পরিমাপ নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো বাড়িয়ে বলে ফেলছি, কিঞ্চিৎ নাটুকেপনাও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অন্তত সাত-আট বছর ধরে দেশে বিদেশে মানুষের সভ্যতার এক বাস্তবিকই বিকট সংকট ইতিহাসের দেহে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে অথচ কবিকল্পনায় ভুবন জুড়ে কল্যাণ শক্তির যে তেজ তা স্তিমিত বলে বিপর্যয় রোধকল্পে যথাবিহিত চেতনা ও প্রয়াসের লক্ষণও ক্ষীণ। একটু অপ্রতিভ বোধ করলেও স্বীকার না করে পারছি না যে অধুনা প্রায়ই মনে ঘুরছে বহুকাল আগে পড়া শেলীর কবিতা : "Out of the day

and night/A joy has taken flight/Fresh spring and summer and winter hoar/ Move my faint heart with grief/But with delight?No more, oh, never more!" সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনের দায়েই অবশ্য বলব যে সম্প্রতি সাতাশি বছর অতিক্রম করেও শারীরিক অপটুতাকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে কর্মব্যস্ত রেখেছি। প্রকৃত মার্কসবাদী চরিত্রবলের অধিকারী না হয়েও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত সাম্যবাদী প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হবার কোনো যুক্তি দেখিনি। মনে ঘুরেছে আর এক ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর কথা আর ভেবেছি দুর্দিনেই আমাদের সবাইকে হতে হবে : "One who never turned his back/But marched breast forward/Never doubted clouds would break/ Never felt though night were worsted, wrong would triumph/Held, we fall, to rise/Are baffled, to fight bètter/Sleep, to wake." "পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা" তো কল্পনা নয়, এ হল ইতিহাসেরই বাস্তব। অধুনা জগতের যে দুর্দশা, স্বার্থমগ্ন নীতিহীনতার প্রাবল্যে জনজীবনে সামগ্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের যে চেহারা, আমাদের মতো দেশে বিত্তবান সংখ্যাল্পদের স্বার্থে ছদ্ম-স্বাধীনতার স্বর্ণশৃংখল পরিধানের যে কুটিল প্রস্তুতি এবং তার ফলাফল, এ-সবই মূলগতভাবে সম্ভব হয়েছে সমাজবাদী সোভিয়েট ও অন্যত্র 'পবিত্র গণতন্ত্র'-এর মুখোশ-পরা প্রতিবিপ্লবী বিপর্যয়ের আনুষঙ্গিকরূপে। আমার কোনো সংশয় নেই যে এই বিপর্যয় সুচতুর শত্রুশক্তির নিরবচ্ছিন্ন ও বহুরূপী আক্রমণ সোশালিস্ট দেশগুলিরই আভ্যন্তরীণ শৈথিল্যপ্রসূত দোষদুর্বলতার সুযোগ নিতে পেরেছিল বলে।

ফিদেল কাস্ত্রো বলতে কুণ্ঠিত হননি যে সোভিয়েট দেশকে "annihilate" ("সংহার") করা হয়েছে। ১৯৮৭ নভেম্বরে ক্রেমলিন প্রাসাদে বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গর্বাচভ্-প্রমুখের কথা শুনে আর তারপর থেকে ১৯৮৮-৮৯-এর বিপ্লববৈরিতার বিচিত্র বাহাদুরীর 'খেল্' দেখে কাস্ত্রোর বিচারকে পুরোপুরি ঠিক বলে আমি অনেকদিন ধরে, অনেক চিন্তা ও কর্ম-সহচরের বিরূপতা ও বিদ্রূপ-সত্ত্বেও, মনে করে এসেছি। বড়াই করার জন্য নয়, শুধু 'তরী হতে তীর'-এ উল্লেখযোগ্য হিসাবে স্মরণ করছি যে ১৯৮৮ সালে "দেশ" পত্রিকায় গর্বাচভ্-দের অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি (তখনও মতলবের চেহারা সুনিপুণ বাক্যজালে লুক্কায়িত বলে ঠিক জাহির হয়নি) আর ১৯৮৯ সালের শেষদিকে কলকাতা ময়দানে 'সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্'-এর ('CITU') সমাবেশে অকুণ্ঠে গর্বাচভকে বর্ণনা করি 'প্রতিবিপ্লব'-এর নায়করূপে আর আশঙ্কা প্রকাশ করি যে এই দুষ্কর্মের ফলে ইতিহাস হয়তো পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাবে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আবহে অল্প কিছু সুলক্ষণের সাক্ষাৎ মিলছে, কিন্তু মনের ভার কাটার মতো পরিস্থিতি দেশেবিদেশে দেখছি না আজও।-

ইতিহাস অবশ্য চলবে নিজের গতিতে আর অবিরাম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কর্মধারার অসাফল্যের শাস্তি দেবে। কোনো ব্যক্তির বা দলের বা আন্দোলনের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখা ইতিহাসের কাজ নয়। তাছাড়া ইতিহাস নামে তো কেউ নেই, রক্তমাংসের মানুষই ইতিহাস গড়ে আর মানুষকেই ইতিহাসের দায় বইতে হয়। সন্দেহ নেই যে সমাজবাদ সাম্যবাদী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যারাই নানা দেশে নানাভাবে থেকেছি তাদের সবাইকে দায়ভাগ নিতে হবে।

সোভিয়েট ও অন্যান্য যেসব দেশে প্রতিবিপ্লব প্রাধান্য পেয়ে আপাতত সমাজবিবর্তনের 'আরোহী' ('ascendant') স্তর থেকে 'অবরোহী' ('descendant') স্তরে নামিয়েছে, সেসব দেশের দায়িত্ব বেশি হতে পারে, কিন্তু জগৎ জুড়ে মেহনতী মানুষের যে লড়াই আমাদের গর্ব, আমাদের আশাভরসার মূল, সে-লড়াইয়ে অল্পবিস্তর যারাই রয়েছি তাদেরও দায়িত্ব কম নয়। 'Eternal vigilance is the price of liberty' এ-কথা তো আবাল্য সবাই শুনে এসেছি; সমাজবাদ-সাম্যবাদ বিষয়ে সেই 'vigilance', সেই বিরামহীন সতর্কতা, সঙ্গে সঙ্গে নীতিনিষ্ঠা ও কর্মক্ষেত্রে তার রূপায়ণে সততা প্রভৃতি গুণ প্রায় সব দেশে কম্যুনিস্টদের মধ্যে বেশ কিছুকাল ধরেই হ্রাস পেয়ে এসেছে। এজন্যই ফিদের কাস্ত্রোর মতো অতি অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে 'পেরেস্ত্রৈকা' ('পুনর্বিন্যাস') আর 'গ্লাসনস্ত্' ('খোলামেলা রাজনীতি') ধ্বনি শুনে এবং "More Openness, More Democracy, More Sociallism" ইত্যাকার বচনে অনেকেই মুগ্ধ হয়ে প্রতিবিপ্লবের প্রতিরোধ চাননি, আজও চান না। তাই পুলকিত হয়ে Zbicgniew Brzezinski মস্ত কেতাব লিখে ফেললেন "বিংশ শতকে কম্যুনিজম্-এর জন্ম ও মৃত্যু" বিষয়ে (১৯৮৯) আর জাপ-মার্কিন বিদ্বান Fukuyama ১৯৯০-৯১-তে ঘোষণা করলেন শুধু যে "The End of Ideology" তা নয় "The End of History", ধনপতিদের বিশ্বকর্তৃত্ব চিরতরে স্থাপিত হয়েছে বলে। মতটা অবশ্য তাঁকে বদলাতে হয়েছে কিন্তু তা হল গৌণ। আপাতত মহানন্দে আছেন দুনিয়ার দৌলতশাহীরা, আর 'চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না' জেনেও সাম্যবাদী মহলে নীতির দিকে নজর কম, কৌশল নিয়ে ব্যগ্রতা বেশি আবার বিপ্লবের দিকে মানুষকে মাতাবার আয়োজন প্রায় নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লালফৌজের বিক্রম ফ্যাশিজম্-এর পরাজয় ফলে দুনিয়া অনেকটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে একধরনের আত্মতুষ্টি আর শ্লথভাব এসেছিল। এজন্যই বোধহয় সোভিয়েট ও অন্যত্র সমাজবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষ আরও প্রবল ও প্রখর হবে বলে স্টালিনের সতর্কবাণী উপেক্ষিত হয়। তাই ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে দলের নেতা খ্রুশ্চভ্-এর রিপোর্টে স্টালিনযুগের অবমূল্যায়ন এবং কিছু কুৎসিত কুৎসা বুর্জোয়া জগৎকে উল্লসিত করল, কম্যুনিস্ট প্রত্যয়ের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে দিয়ে আবহমান দীর্ঘায়ত শোধনবাদকে পরিপুষ্ট করল, হয়তো বা কতকটা অচেতনভাবেই বিপ্লবের বৈরিতা করে বসল। প্রায় অকল্পনীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সোভিয়েট ব্যবস্থার কীর্তি অবশ্য ছিল এমনই অকাট্য (মহাশূন্যে মানুষের প্রথম প্রবেশ যার এক প্রতীক বলা যায়) যে খ্রুশ্চভ-এর মতো ব্যক্তি বড়াই করতে ছাড়ল না যে মার্কিন শক্তির সঙ্গে টেক্কা দিতে সোভিয়েটের বছর পনেরোর বেশি লাগবে না। ("We will bury you" বলে জাঁক দেখালেন খ্রুশ্চভ্ যদিও "Foundations of Leninism" বক্তৃতাবলীতে বহুদিন আগেই স্টালিন চেয়েছিলেন "কম্যুনিস্ট বিশ্বাসের উদ্দীপনা ও আমেরিকান কর্মকুশলতার সমন্বয়"।)। কেল্লা মোটামুটি 'ফতে' হয়ে গিয়েছে, এমনই একটা ভাব দেখা দিল, যা সবার কাছে তখন ধরা পড়েনি, কিন্তু এই চিন্তারহিত অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ করতে হয়েছে

গোটা দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে। এভাবে একপ্রকার নিস্তেজ স্থবিরতা (পরে যাকে "stagnation" বলা হয়েছে) ক্রমশ সর্বনাশের রাস্তা বানাতে সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষের মতো দেশে আমরা খ্রুশ্চভ-এর কাণ্ডকারখানা পছন্দ করিনি কিন্তু কম বেশি প্রায় সবাই ভাবতে শুরু করেছি যে মোটামুটি ধীরে-সুস্থে ধনবাদ-সমাজবাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়েই পার্লামেন্টারী এবং নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির জোরে সর্বনাশী যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখে বিপ্লবের বিপুল ওলটপালট বিনাই সমসুযোগের জীবনকে কাছাকাছি টানতে পারব। স্টালিনের সতর্কবাণীকে শিকেয় তুলে রেখে প্রায় সর্বত্র কম্যুনিস্ট মহলে যে Plekhanov-এর বর্ণনামতো কল্পনা করা হল যে "ইতিহাসের শকটে" ("locomotive of history") সবাই বসে পড়েছি আর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো নিয়ে ভাবনা নেই। "শকট" যে আপনা থেকে চলে না, তাকে চালাতে হয় আর সেজন্য দীর্ঘ পথযাত্রার উপযোগী সরঞ্জামের আয়োজন করতে হয় তা ভুলে গিয়ে ভাবা হল যে প্রায় নিয়তির মতোই যেন সমসুযোগের সমাজে মানুষ সহজে জাহির হতে পারে। কেমন যেন ভুলে যাওয়া হল যে সোশালিজ্‌ম্ সমাজবিবর্তনে অনিবার্য বলেই মানুষ সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয় না, মানুষ আকৃষ্ট হয় শ্রেণীসমাজের অন্যায় আর যন্ত্রণা আর অমানবিকতা দূর করে প্রকৃত স্বাধীন, সুস্থ, সুখী জীবন জয় করার আদর্শ আর উদ্দীপনায়।

১৯৬৩ সালে "লেবর মন্থলি" পত্রিকার বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক রজনী পাল্‌মে দত্ত-এর মতো স্থিতধী কম্যুনিস্ট মনস্বী কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে ১৮১৮ সাল (মার্ক্‌স্‌-এর জন্ম) থেকে একশো বছর বাদে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ ধনতন্ত্রের আওতা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর যেভাবে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে তাতে ভাবা একেবারে ভুল হবে না যে হয়তো ১৯৮৩ (মার্ক্‌স্‌-এর মৃত্যু থেকে শতবর্ষ পূর্তি) নাগাদ সময়ে দুনিয়ার অনেকটাই সেই পথে এগোতে পারবে। মনে পড়ছে ১৯৭৯ সালে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় খ্যাতিমান 'লিবারল' সাংবাদিক Russell Warren Howe মন্তব্য করেন যে মধ্যপ্রাচ্যে এমন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে জগতের তিন-চতুর্থাংশে সোশালিস্ট ধাঁচের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে দেখা যেতে পারে। এ ধরনের কথার বৈজ্ঞানিক মূল্য কম, কিন্তু তা হল তৎকালীন মেজাজের একটা চিহ্ন। সব দিক থেকে মার্কিন দেশকে দশ পনেরো বছরে হারিয়ে দেব বলে খ্রুশ্চভ্‌-এর বড়াইয়ের মতো সেদিনের একটা লক্ষণ। আশ্চর্য নয় যে পৃথিবীব্যাপী সোশালিজ্‌ম্‌-এর জয় যে সহজসাধ্য নয়, তা অনেকেই, সম্ভবত সবাই, কমবেশি ভুলতে বসেছিলাম। সংসদীয় ব্যবস্থার মায়ায় জড়িয়ে পড়ে মেহনতী মানুষের লড়াই বিষয়ে অনীহা, মূলগতভাবে এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে সঠিক হলেও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মতো ব্যাপারে কম্যুনিস্টদের অতিরিক্ত ব্যস্ততা আর অনুরূপ বহু উপসর্গ তাই দেখা দিয়েছিল। "I am impatient for the Revolution. I shall be jolly happy if the Revolution happens tomorrow. Is it being an overage coward I want you to make the revolution in as gentlemanly a manner as posible."—বার্নার্ড শ'-র এই মনোরম উক্তিটির (১৯৩৪) প্রকৃত অর্থ না বুঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জগৎ বিষয়ে আত্মসন্তুষ্টির সঞ্চার হয়েছিল কম্যুনিস্ট

মহলেও। দেরিতে বুঝলে তার দাম দিতেই হয়; তবে অভিজ্ঞতা বিনা তো জ্ঞান আসে না আর অভিজ্ঞতার অর্থই হল ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করে শিক্ষা নেওয়া।

এবিষয়ে মহাচীনের নায়ক মাওৎসেতুং-এর বিচিত্র অথচ গভীরতাব্যঞ্জক কথা স্মরণ করলে উপকৃত হব। চটপট্ সোশালিস্ট সমাজ বানাবার স্বপ্ন দেখার বদলে তিনি সাবধান করতেন বলে যে আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সিদ্ধি হতে কয়েকশো বছর কিম্বা কয়েক হাজার বছরও লাগতে পারে। এটা শুনে একটু ভড়কে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সস্তায় কিস্তিমাতের কল্পনা থেকে নিবৃত্ত করাই ছিল মাওয়ের উদ্দেশ্য। স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় এ-নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেশ মজাও করতেন। চীন-সোভিয়েট বিসম্বাদ যখন প্রবল তখন মিটমাটের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ফিরে যাবার সময় মাও বুঝি বলে ওঠেন যে দশহাজার বছর এই ঝগড়া চলবে। শুনে কোসিগিনের মুখে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হতে দেখে মাও হেসে উঠলেন : "তবে কিনা, কমরেড কোসিগিন এমন চমৎকারভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে আমি দশহাজার থেকে এক হাজার ছেঁটে ফেলছি।" ঘরের আবহাওয়া বদলাল, আর সবাই বুঝল যে মাওয়ের কথার পিছনে শুধু আলোচ্য সমস্যার গুরুত্বই সূচিত হচ্ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা যা কম্যুনিস্ট লক্ষ্যসাধনে ধৈর্য ও প্রত্যয়নিষ্ঠার অপরিহার্যতাকেই স্মরণ করিয়ে ছিল।

'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' বলে যে শাদা-মাটা কথাটি আমাদের সাধারণ জীবনে প্রচলিত, তাই মনে পড়ে যায় যখন ভাবি যে সোভিয়েট পার্টির বিংশ কংগ্রেস-এর (১৯৫৬) পর চীনের পক্ষ থেকে 'Long Live Lininism' আখ্যা দিয়ে এবং স্টালিনের বিপ্লবী ভূমিকাকে ইতিহাসে "indelible" (অর্থাৎ যাকে কখনও মুছে দেওয়া যাবে না) বলে যে ঘোষণা তা নিয়ে বিতর্কের সুষ্ঠু সাফল্যের দিকে নজর না দিয়ে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে একটা জোড়াতালি দিয়ে মেরামতের চেষ্টা হল, যার ফলে অধিকাংশ পার্টি নানা কারণে সোভিয়েটের পক্ষ অবলম্বন না করে পারল না আর তার বিপুল সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক সাফল্যের সঙ্গত অহঙ্কার নিয়ে নিজের বাছাই রাস্তায় চলতে চাইল। মূলধনের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য যখন জগৎজোড়া, তখন তার সঙ্গে লড়াইয়ে অপরিহার্য আন্তর্জাতিক সংহতি বিনা যে মেহনতী দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি দুর্বল হতে বাধ্য তা জেনে-বুঝেই কম্যুনিস্ট দুনিয়ার অন্তর্ঘাতী ভেদাভেদ আমরা সবাই নানা দেশে যেন মেনে নিতে বাধ্য হলাম। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে চৌ এন লাই-য়ের মতো নেতার মুখে চীন ও সোভিয়েটের অক্ষয় ঐক্যের ধ্বনি শোনা গেলেও বাস্তব অবস্থার যে অবনতি হল তা বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজম্-এর ভবিষ্যৎকেই বিপন্ন করে তুলল। ১৯৫৮ সালে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম সম্মেলন পর্যন্ত বন্ধুতাসম্পর্ক প্রায় অটুট থাকলেও খ্রুশ্চভ্-নেতৃত্বে চীনবিরোধী বহু ব্যবস্থা যে কত বড়ো অপরাধ ছিল তা তখন অনেকেরই নজরে আসেনি। পরস্পর সম্পর্কে যে ফাটল তা মেরামত করার মনোবৃত্তি ও মনোবল হারিয়ে ফেলার মূল্য যে কত, তা তখন বোঝা যায়নি। এরই দূরায়ত পরিণাম যে সমাজবাদ-সাম্যবাদের সাম্প্রতিক বিপর্যয়কে টেনে এনেছে তা কতদূর সবাই বুঝেছি জানি না। বুর্জোয়া প্রাধান্য

যখন চলছে তখন সমাজবাদী সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তার বিপদও যে বাড়ছে বই কমছে না, স্টালিনের এই সতর্কবাণী ভুলে যাবার মাশুল সবাইকে দিতে হল, আজও হচ্ছে।

স্টালিনের জীবৎকালে মাঝে মাঝে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যে সোভিয়েট নেতৃত্বের গরমিল হয়নি তা নয়। বুর্জোয়া প্রচারবিদরা তো স্টালিন-মাও 'রেষারেষি' নিয়ে বহু কাহিনী রটাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আশ্চর্য নয় যে উভয়েই যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন তাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয় নিয়ে মতান্তর ঘটেছে, হয়তো বা কিছু পরিমাণে কিঞ্চিৎ পারস্পরিক ঈর্ষারও সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু চীনে বিপ্লবের বিজয়-পরবর্তীকালে মাও প্রায় দু'মাস সোভিয়েটে থাকার সময় ১৯৪৯-এর বিপ্লবের অতুলন ও সর্বাগ্রগণ্য নেতারূপে বিশ্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত একজন বিপ্লবীশ্রেষ্ঠের উল্লসিত স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। খুঁটিনাটি খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে মনে পড়ছে যে একবার মস্কোতে নৈশাহারের পর 'toast'-পান উপলক্ষে চীনা পার্টির প্রধান প্রতিনিধি যখন বলেন যে চীন হল সোভিয়েটের 'শিষ্য', 'গুরু'-র কাছে তার অশেষ ঋণ, তখন স্টালিন বুঝি বলেন : "ওটা বাজে কথা ('nonsense')! যদি গুরুকে হারাতে পারে, তবেই তো সে আসল শিষ্য!" হাসির রোল উঠে সবাইকে যেন তখন তুষ্ট করেছিল। স্টালিনের জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর পর বছর পাঁচ-ছয় না কাটা পর্যন্ত খ্রুশ্চভ্-মার্কা রাজনীতি কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় বিতর্ক-বিসম্বাদ ছাপিয়ে সরাসরি সংঘাত ঘটাতে পারেনি।

সঙ্গে সঙ্গে না বলে পারছি না যে চীনও যেন তার প্রকৃত বিপ্লবী গরিমা বিস্মৃত হয়ে আর অতিরিক্ত বিরক্তি ও রোষ বোধ করে আন্তর্জাতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সরিয়ে রেখে নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে কেমন যেন আত্মম্ভরী ভূমিকায় নামল। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের আয়তন ও সুবিপুল জনসংখ্যা ইত্যাদির জোরে সহজ হয়েছিল একপ্রকার গর্বিত স্বাবলম্বিতা। "গোটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব আমাদের কম্যুনিস্ট কৃতিত্ব আর তখন সবাই আমাদের মানবে, কথা শুনবে"—এমন চিন্তা হয়তো এসেছিল, অস্বাভাবিকও ছিল না। ফলে গোটা জগৎ দেখল চীনের বিরাট অসমসাহস অগ্রগতি, অতিরিক্ত মূল্যের তোয়াক্কা না রেখে বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার অকল্পনীয়, প্রায় অসাধ্যসাধক কর্মযজ্ঞ। মাও-য়ের অনুপ্রেরণা, অবিরাম নির্দেশ ও অবিচল পরিচালনায় মহাচীনের সূর্য-সম আবির্ভাব বর্তমান জগতের সমুজ্জ্বল ঘটনা। আজও চীন বিষয়ে কিছু সংশয় ও বহু জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও সন্দেহ নেই যে পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিপ্লব-পথে চলার তুলনাহীন কৃতিত্ব চীনে দেখা গিয়েছে। তবে এর জন্য গোটা কম্যুনিস্ট দুনিয়াকেও একটা দুঃসহ মূল্য দিতে হয়েছে যা ভুললে চলবে না।

ইতিহাসের বৈপরীত্য-কন্টকিত এই অধ্যায়ে চীন যখন প্রায় যেন বাকি দুনিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজস্ব বিপ্লবী কর্তব্য পালনে লিপ্ত তখন ভিয়েতনাম-এর মতো নমস্য দেশ আক্রমণ করার মতো ঘটনা দেখা গিয়েছে। কাস্ত্রো-র মতো শুদ্ধচেতা কম্যুনিস্ট প্রকাশ্যে চীনের স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য পশ্চিমি শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে অত্যন্ত কুশলী কর্মকাণ্ডের প্রখর নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হননি। মনে পড়ছে একবার বলেছিলেন যে 'NATO' (North Atlantic Treaty Organization)-তে আছে পনেরোটি পুঁজিদারী রাষ্ট্র। কিন্তু চীন যেন তার অনুল্লিখিত

ষোড়শতম সদস্য! এছাড়া আমার মনে যেটা বহুকাল খচ্‌খচ্ করে চলেছে তা হল যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই চীন আমাদের এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সমাজবাদী আলোড়নের যে জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ার-কে স্তিমিত করে দিতে সংকুচিত হয়নি। বেশ মনে আছে ১৯৫২ সালে যখন প্রথম লোকসভায় আমরা কম্যুনিস্টরা নির্বাচিত হয়ে যাই তখন প্রায়ই বার্মা (এখন 'মিয়ানার'), সিঙ্গাপুর, সিংহল ('শ্রীলঙ্কা'), মালয়, ইন্দোনীশিয়া প্রভৃতি দেশে কম্যুনিস্টদের ব্যাপক সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে লোকসভাতেও আলোচনা হত। গোটা অঞ্চল জুড়ে চীনা কম্যুনিস্টদের বিপুল ভূমিকা ছিল, আর ইন্দোনীশিয়ার নিজস্ব কম্যুনিস্ট পার্টির (যা ছিল এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কম্যুনিস্ট সংগঠন) প্রভাব ও ক্ষমতা (তৎকালীন জাতীয় নেতা সুকর্ণের সঙ্গে থেকে) প্রায় সাফল্যের শিখরে উঠেছিল। এরা সবাই ছিল মহাচীনের মুখাপেক্ষী। সোভিয়েট আর পশ্চিম জগতের কম্যুনিস্ট দেশ তখন চলছে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" নীতি নিয়ে—আমাদের এশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে বিপ্লবপ্রচেষ্টা বিষয়ে তাদের যেন অনীহা দেখা দিয়েছিল। চীন-সোভিয়েট মতানৈক্য সে-অনীহাকে পুষ্ট করেছিল আর একই সময়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের সাফল্য ছিনিয়ে আনার প্রচণ্ড সংগ্রামের ভারে ক্লিষ্ট হয়েই বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জায়মান সমাজবাদী অভ্যুত্থান চীনের কাছ থেকে সম্যক্ সাহায্য পেল না। ১৯৬৬ সালে পাঁচ লক্ষাধিক কম্যুনিস্টকে নির্মমভাবে হত্যা করে 'গণতন্ত্র' সুস্থির হয়ে বসল, আর সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনীশিয়া প্রভৃতি একেবারে পড়ল নয়া-সাম্রাজ্যবাদী খপ্পরে। কেউ যদি ভাবেন ঐ-সব দেশ এখন তোফা রয়েছে, তাইওয়ান-দক্ষিণ কোরিয়া-থাইল্যান্ড প্রভৃতির সঙ্গে মিলে দারুণ সমৃদ্ধির এলাকা তৈরি করেছে তো নাচার। শোষণমুক্ত সমাজ, সমসুযোগের সমাজ, লোভলোলুপ ভোগসর্বস্ব জীবনধারার অবলোপ সাধন করার সংকল্পে আগুয়ান প্রকৃত মনুষ্যোচিত সমাজ যাদের অন্বিষ্ট, তারা এই 'Asian Tigers'-দের ফাঁদে পা দেবে না।

কিছু অবান্তর কথা এসে গেল, তবে যেটা বলতে চাই তা হল যে কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় নীতিগত বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধানের বদলে বিক্ষিপ্ততার উদ্ভব হল—১৯১৭ থেকে জগতের এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে আর ১৯৪৯ থেকে বিশ্বজনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ নিয়ে দুই যুগান্তকারী বিপ্লবের মিলিত অগ্রগতি ঘটল না, চীন থেকে আহৃত উদ্দীপনা দেশে দেশে ছড়িয়ে রচনা করল বহু বীর কাহিনী, কিন্তু কোথায় যেন ভিতরকার গলদ রয়ে গেল।

কেন লিখি?

বেশ একটু বিরস মনে "কেন লিখি?" প্রশ্নের একটা জবাব দিতে বসেছি। স্থির করেছিলাম যে এ-বয়সে আর 'উপরোধে ঢেঁকি গিলতে' রাজি হব না। তবু নিজেরই দুর্বলতা মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু না লিখে দিয়ে পার পাচ্ছি না।

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে মূল আপত্তি আমার এই যে কেবল প্রকৃতপক্ষে 'খাস্' লেখক, যাদের বলা যায় 'জাত' লেখক, যাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে সৃষ্টিশীল রচনা, যাদের ভাবনাচিন্তায় বিভিন্ন পরিসরে ও প্রকরণে থাকে মৌলিকতা আর সংবেদনী প্রতিভার স্বকীয় ব্যঞ্জনার মহিমা, তারাই যদি বলতে পারেন কেন তারা লেখেন আর চান সে-লেখা অপরে অনেকে পড়েন ও তাই নিয়ে ভাবেন ('সহিত' থেকে 'সাহিত্য'), তাহলেই শুধু এই 'প্রশ্নোত্তর' ব্যবহারের কিছু সার্থকতা থাকতে পারে।

সাহিত্য জগতের একান্ত এক 'অন্তেবাসী' ছাড়া আমি কিছু নই। এটা বিনয়ের কথা নয়, এটা তথ্য। সম্প্রতি, কতকটা আকস্মিকভাবে আমার বহু বছর ধরে ছড়ানো লেখালেখি নিয়ে কয়েকজনের আগ্রহ দেখে অল্প একটু তুষ্টি হয়তো পেয়েছি, কিন্তু এ তো তুচ্ছ ঘটনা। সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা বহুজনের চিত্ত জয় করার সৌভাগ্য পেয়েছেন আর বাস্তবিকই সৃজনী প্রতিভার যারা অধিকারী, তারাই যদি খোলামনে 'কেন লিখি' প্রশ্নের উত্তরে স্বদেশ স্বকাল স্বসমাজ আর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব সর্ববিশ্ব বিষয়ে কিছু বলেন তো তার মূল্য অনেক। এই আলোচনায় আমার অনিচ্ছুক উপস্থিতির অবান্তর বলতে কুণ্ঠিত নই।

কার্ল মার্কস তার মহাগ্রন্থ 'মূলধন' লেখার সময় একবার বলেন যে তিনি "ইঁদুরের দাঁত-কড়মড়ানি সমালোচনার" খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছেন ("gnawing criticism of mice")! এটা মনে পড়ে গেল যখন এই লেখাটা ফাঁদছি, আর ইতিহাসের এক কালজয়ী মহর্ষির রহস্যবোধ লিখতে বসার অপ্রসন্নতাকে একটু কাটিয়ে দিল। আমাদের এই "দুর্ভাগা" (অথচ কেমন যেন কিসের জোরে অপরাস্ত) দেশে জন্মে দুটো ভাষায় (বাংলা আর ইংরিজি) অর্থাৎ কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিকতার পরিবেশে, পঁচাত্তর বছরেরও বেশি কাল ধরে লিখে চলেছি, যার বেশ কিছু উদ্ধার করা যাবে না (আর তা উদ্ধারেরও যোগ্য নয়), তা হল মার্কস-কথিত "ইঁদুরের দাঁত কড়মড়ানি সমালোচনারই" সমুচিত খোরাক। তাই জবাব দিচ্ছি কেন "মরতে" এতকাল লিখছি আর আজও লিখে চলেছি। এইসব লেখার জন্য কত কাগজ লেগেছে আর কত গাছের মরণ ঘটেছে! (সেদিন দেখলাম এক পরিবেশ বিজ্ঞানীর মন্তব্য যে আমাদের দেশের সবাই যদি 'সাহেব' দেশগুলির অনুকরণে দৈনন্দিন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার জন্য 'টয়লেট পেপার' ব্যবহার শুরু করে তো গাছ আর কোথাও থাকবে না।) মনে এল হঠাৎ যে একবার মস্কোর সাজানো-গোছানো হোটেলে চিঠি লেখার সরঞ্জাম নিরেশ কেন জানতে চাওয়ায় শুনেছিলাম যে তাদের 'পরিকল্পিত' ('planned') অর্থনীতি অনুযায়ী

কাগজের ব্যবহারে সাবধান হওয়া অনিবার্য, কারণ সব চেয়ে বেশি দরকার হল অত বৃহৎ দেশে শিক্ষাব্যবস্থা, সাম্যবাদ বিষয়ক প্রচার, সঙ্গে সঙ্গে শুধু বহুজাতিক সোভিয়েট দেশ নয়, সারা দুনিয়ার সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় (রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর প্রকাশ তো কোটিকে ছাড়িয়েছে, সত্তরের দশকে আমাদের সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর একটি কবিতাসংগ্রহ ছাপা হয় একলক্ষের সংস্করণে) আর অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনে কাগজের চাহিদা যে কী বিপুল তা ভাবলে হয়তো কিছুকালের জন্য হোটেলের খরিদ্দারদের প্রয়োজনকে একটু নামিয়ে রাখাই দরকার। জবাবটা মনে আছে, বিশেষ করে এজন্য যে আমি এখনও প্রায়ই ভাবি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনেক ঘাটতি আর ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও একটা ব্যবহারে তার অনন্যতা একটু ভাবলেই মানতে হবে—ইতিহাসে এ যাবৎ কোথাও দেখা যায়নি গোটা দুনিয়ার (আর বিশেষ করে আমাদের মতো দুর্ভাগা সাম্রাজ্যশৃংখলিত আর সৃষ্টিশীলতার বিচারে উপেক্ষিত দেশের) সাহিত্য ও শিল্পবৈভব বিষয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে তুলনীয় আগ্রহ ও কর্মপ্রয়াস। কথা বেড়ে যাচ্ছে জেনেও বলছি যে ইংলন্ডের কাগজেই দেখেছি যে শেক্স্‌পীয়রের জন্ম থেকে চারশো বছর পূর্তিকালে কাজাকস্তানে ইংলন্ডের চেয়ে অনেক বেশি অনুষ্ঠান হয়েছিল। আর এও তো জানি (যদি অতি ক্বচিৎ কদাচ এর স্বীকৃতি এখন শুনি) যে পশ্চিমী দুনিয়াতে আমাদের বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিদ্বৎমহলে বিশেষজ্ঞ কিছু থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে তার অস্তিত্বই নেই, অথচ (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি) সোভিয়েটে 'কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতার' কল্যাণে বহুজনের আগ্রহ প্রশ্নাতীত। সমর সেন, অশোকবিজয় রাহা, শুভময় ঘোষ, ননী ভৌমিক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সোভিয়েটের অনেক কিছু অপছন্দ করলেও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারতেন আর কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তো রয়েছেনই আমাদের মধ্যে (তিনি শতজীবী হোন্।) এ-ব্যাপারে মনের জিজ্ঞাসাকে তুষ্ট করতে পারেন।

হয়তো বোকার মতো এই সোভিয়েট প্রসঙ্গ টেনে এনে ফেলেছি, প্রায় অযাচিতভাবে। কিন্তু 'কেন লিখি?' প্রশ্নোত্তরে এই বোকামিরও একটা 'প্রাসঙ্গিকতা' আছে। যে পরিবারে জন্মেছি এবং যে পরিবেশে 'মানুষ' হয়েছি, সেখানে 'লেখাপড়া' একটা স্বাভাবিক ও প্রায় অপরিহার্য কর্ম বলেই ভাবতে পেরেছি। আমার পিতা ও পিতামহের উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন নিজের অগোচরেই লেখা এসেছে আর ছাত্রাবস্থা থেকেই তার অল্প কিছু ছাপার সুযোগ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটনের কথাও না উল্লেখ করে পারছি না। আমার প্রথম যে লেখা কলেজ পত্রিকায় ছাপা হয় তা ইংরিজিতে; আমার প্রথম যে বাংলা লেখা ঐ পত্রিকাতেই বেরোয় তা হল প্রাচীন ভারতবর্ষের অবদান বিষয়ে আচার্য ভিন্তর্‌নিৎস্‌-এর (Winternitz) ভাষণের অনুবাদ। সাম্রাজ্যশাসিত ('colonial') দেশে জন্মানোর মূল্য এভাবেই দিতে হয়েছে। মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য মাধ্যমে প্রথম মুদ্রণযোগ্য লেখা কলম থেকে বেরোনোর মতো অঘটনের কলঙ্ক কেমন করে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলি? কিন্তু এটা শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর বেশ কয়েক প্রজন্মের এই কলঙ্ক বহনের দায় থেকে গিয়েছে। গভীর প্রশ্নে প্রবেশ করি কেমন করে। কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়বে কেন আমাদের মতো 'কলোনিয়াল'

চিন্তাবহে অকাট্য থেকে রয়েছে প্রায় এক অনিবার্য অনুকরণ স্পৃহা, মৌলিক স্বকীয় জীবন্ত স্বভাবস্বচ্ছন্দ সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী প্রভাব—কেন প্রচুর যাথার্থ্য রয়েছে 'The Legacy of India' (Oxford 1936) গ্রন্থে সংকলন-সম্পাদক G. T. Garratt-এর মন্তব্যে : "ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রতিভার দিক থেকে সবচেয়ে অনুর্বর যুগ হল ইংরেজ শাসনের কাল" (এই Garratt-ই রবীন্দ্রজীবনীকার Edward Thompson-এর সঙ্গে 'Rise and Fulfilment of British Rule in India'-এর রচয়িতা)। 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' নিয়ে যতই বড়াই করি না কেন, তার 'মূলে হাভাত' ('original sin') এই সাম্রাজ্যশাসনের আনুষঙ্গিক বিকলতা। সাধ্য নেই নিজের ভাবনাকে ঠিকমতো সাজিয়ে বলার, তাই শুধু এখানে বলে নিই যে পরাধীনতার চাপেই নিজের অজান্তে যেন আমার লেখা শুরু বিদেশী ভাষায়।

ইস্কুলে বাধ্য হয়ে পড়তে হত সরকারি হুকুমে বাঙালি বিদ্বান নগেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর "England's Work in India" (ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য)। পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা (১৮৫৮), জানতে হয়েছিল ইংরেজ শাসনের 'সদুদ্দেশ্য', যা নাকি 'সংরক্ষণ' ('conservation') আর 'অগ্রগতি'কে ('progress') মিলিয়ে আমাদের মঙ্গলসাধন। জানি না পড়ার সময় কিশোর মন কতটা বিদ্রোহ করতে চাইত। শুধু মনে আছে যে তখনই, ১৯২০–২২ সালে (কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়) "কোন্ পাগল পথিক ছুটে এল/বন্দিনী মা'র আঙিনায়/ত্রিশ কোটি লোক সকল ভুলে/গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়" সেদিনের জনগণমন অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব তখন ঘটেছিল। পরাধীনতার শৃখলমোচনের যে প্রয়াস আমাদের এই বাংলায় পূর্বেই তেজস্বী রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল তার এক নতুন বিরাট জনমুখী অকল্পিতপূর্ব চেহারা দেখা দিতে লাগল। একটু 'নাটক' করে, অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করেই বলি আমাদের কবিকুলকে একটু পুলকিত করার জন্য : 'Bliss was it in that down to be alive/And to be young was very heaven!"

ঠিক 'অবস্থাপন্ন' না হলেও মোটামুটি সচ্ছল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মানোর সুবাদে আর কিছু পরিমাণে সাংবাদিকতার পরিবেশের প্রভাবে স্রোতে সহজে গা না ভাসানোর একটা প্রবণতার কল্যাণেই হয়তো সেদিনের 'স্বদেশী করা'-র টানে কিশোর বয়সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস দেখাতে পারিনি, কিন্তু তখনকার অভিজ্ঞতার ছাপ আজীবন বয়ে চলেছি। আজ এই জীবনান্তের প্রাক্কালে আমার দীর্ঘায়ুর অভিশাপ দেশের স্বাধীনতা ও সমাজবাদ বিষয়ে আশাভঙ্গ না হলেও বেদনার্ত দুর্ভাবনার এই দ্বিবিধ ব্যর্থতার জ্বালা এনে দিয়েছে।

এত কাল ধরে এত যে লিখেছি, তা নিষ্কাম কর্ম বলে করিনি। কে কবে কোথায় সার্থক কর্মে লিপ্ত হয়েছে নিজস্ব উদ্দেশ্য বিনা? সে উদ্দেশ্য যদি শুধু স্বার্থসাধন ও সংসারধর্ম পালন হয় তো তা হল প্রত্যবায়। কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র মনস্কামনাপূর্তিকে বহু দূর অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক (অথচ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে একান্ত জড়িত) অম্বিষ্টের অন্বেষণ মানব অস্তিত্বের সার্থকতা। মহাভারত যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বারবার লক্ষ্যসাধনের জন্য পাণ্ডবপক্ষকে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর দুর্যোধনের মতো অপরাজেয় মহারথীদের পরাস্ত করার জন্য প্রজ্বলন্ত প্রবঞ্চনার

উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হননি, অথচ তিনিই নাকি নিষ্কাম, সম্পূর্ণ "ফলাকাংখাহীন" কর্মনীতির প্রবক্তা। এখানে খেই হারিয়ে ফেলছি বলে ভয় হচ্ছে, তাই সুবিনীতভাবেই বলি বিচিত্র জটিল সংকটসংকুল বিভ্রমসঞ্চারী পরিস্থিতিতেও যথাসাধ্য বাস্তব বিচারে যথাসম্ভব নীতিনিষ্ঠ কার্যক্রমের সন্ধান ও তদনুযায়ী প্রয়াস চাই কিন্তু অবশ্যই অন্বিষ্ট নিয়ে, যা হল "জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জনগণ ঐক্যবিধায়ক, জনগণ পথপরিচায়ক, জনগণদুঃখত্রায়ক", শোষণমুক্ত সর্বজনের সমসুযোগের সহায়ক সমাজের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বাক্যজাল বুনে চলছি যেন বলে বিরক্তি লাগছে, তবু নিজের মনের কথা স্পষ্ট করার জন্য সহায় নিচ্ছি মাওৎসেতুং-এর একটি কাব্যাংশের অমিতাভ দাশগুপ্তকৃত অনুবাদ : "বাতাস, আমাদের এমন ভালোবাসা দাও/যাতে শত্রুদমনের পর আমরা/প্রত্যেকে, একে-ওকে/তোমার মতো জড়িয়ে ধরতে পারি।"

আমার সর্বদা উদ্দেশ্যসর্বস্ব লেখার পিছনে ঠেকেছে স্বদেশের মুক্তি আর (সত্তার কথঞ্চিৎ পরিণতিকালে) লোভ জটিল শোষণভিত্তিক স্বার্থসন্ধ অথচ তৎসত্ত্বেও বহুগুণখচিত এবং এখনও কথঞ্চিৎ মায়াময় বিশ্বব্যবস্থার বিলোপ। এই দ্বৈত অভিপ্রায় হয়তো উদ্ধত মনে হলেও আমার সকল প্রয়াসের মূলে, সকল রচনার উদ্দিষ্ট, তা আমি রাজনীতি বা ইতিহাস বা কাব্যচর্চা বা ক্রীড়াকৌতুক যে-কোনো বিষয়েই লিখি না কেন। 'ফরমায়েসি' লেখা বলে ভ্রূকুটি আমায় বিচলিত করবে না, কারণ এটুকু বলতে পারি যে ফরমায়েসটা আমারই নিজস্ব না হলে লিখতে পারি না। এখন এই মুহূর্তেই 'অনিচ্ছা' কাটিয়ে যা লিখছি তারও অভিপ্রায় হল যে হয়তো বা আমার চিত্ত চরাচর ব্যাপ্ত যে অন্বিষ্ট যা আমার বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সুগভীর অকিঞ্চিৎকর উপশম কিছু ঘটায়, সেই অন্বিষ্ট অল্প হলেও কিছু সহায়তা পাবে আর আমি এই অতি তুচ্ছ রচনার মধ্য দিয়েও হয়তো কিছু সৎ শুচি শুদ্ধ সহজ মানুষকে টানতে পারব যাকে কার্ল মার্ক্স বহুকাল আগে বলেছিলেন "The party in the grand historical sense of the term", তার পরিধির মধ্যে না হলেও অন্তত তার সামীপ্যে।

যথাসম্ভব কম কথায় বলতে চেষ্টা করি কিভাবে আমার এই চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ হল। মূলে অবশ্যই রয়েছে আমার জীবৎকালের অভিজ্ঞতা। আর পরাধীনতার শৃংখল মোচনের সঙ্গে সঙ্গে "সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু" চিন্তার মিশ্রণ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আমার জীবনে ঘটেছে। এদেশে ছাত্রাবস্থায় সমাজবাদ-সাম্যবাদের 'পাঠ' নিতে পারিনি, বরঞ্চ কলেজী কেতাবে পড়েছি "socialism is a bit of all right but not to be expected this side of the golden gates of Paradise." কিন্তু আমার যখন চোদ্দ বছর পাঁচমাস বয়স (মার্চ, ১৯২২), তখনই মহাত্মা গান্ধী রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে আদালতে যে বিবৃতি দেন তা আজও কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে : "The government established by law in British India is carried on for the exploitation of the masses. No sophistry, no jugglery in figures can explain away the evidence presented to the naked eye by skeletons in our native villages. The miserable little comforts of the town-dwellers in India represent the brokerage they get for the work they

do for the foreign exploiters and the profits and the brokerage are sucked from the masses. I have no doubt whatsoever that both England and the town-dwellers in India will have to answer, if there is a God above, for this crime against humanity which is perhaps unperalleled in history."

তরজমার চেষ্টা করছি না। গান্ধীজীর মতো সরেস ইংরিজি খুব কম লোকেরই কলম থেকে বেরিয়েছে। তাছাড়া বাঙালি বিদ্বানদের কাছে ইংরিজি তো 'জলভাত'।

স্বদেশমুক্তি আর "বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ" (এ-ধরনের শিরোনাম হল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত সোভিয়েত বিষয়ক বিস্মৃত অথচ মহার্ঘ গ্রন্থের)—এই দুই বিষয়ের সম্পর্ক ও অঙ্গাঙ্গিযোগও তারই অন্বেষণে বিপ্লবের উপযোগিতা ও বাস্তব সম্ভাবনা বিষয়ে আমার 'চক্ষুরুন্মীলন' ঘটেছে প্রায় পাঁচবছর ইয়োরোপ বাসকালে (১৯২৯-৩৪)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতে গেলেন, গান্ধীজী ইংলন্ডে এলেন, উভয়ের কথা শুনলাম, যদিও তখন আমার গান্ধীবাদী ঝোঁক মার্কসচিন্তার কল্যাণে প্রায় কেটে গেছে। দেশে ফিরে অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সাদর আনুকূল্যে যেতে হল আন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকর্মে, আর হল-তো-হল তখনই বিলাত থেকে আনা আমার কিছু বই ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তৎকালের নামজাদা বিলাতী সাপ্তাহিক 'New statesman and Nation'-এ প্রতিবাদ লিখে পাঠালাম যা ছাপা হবার ফলে আমার সদ্যলব্ধ চাকরি বাতিল হবার উপক্রম ঘটল। সে-চিঠির একাংশ হল : "I have lived some of the happiest years of my life in England. I count English men and women among my best friends. I love England, her sights and sounds, more than I care to tell. But I cannot help hating, with all the hate of which I am capable, the abominable relationship beytween our two countries today." আবার বলি, তরজমা না হয় না-ই করলাম, পাঠকেরা তো সবাই বিদগ্ধ মানুষ, নিজগুণে দোষত্রুটি মার্জনা করবেন।

যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিন্ডিকেট'-এ প্রবলপ্রতাপ সদস্য ছিলেন বিশাখাপত্তনম্ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টর উড (Wood)। তিনি প্রশ্ন তুললেন আমার মতো স্বয়ংস্বীকৃত 'রাজদ্রোহী'কে (যা বুঝি চিঠির বয়ান থেকে স্পষ্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা যায় কেমন করে। নিতান্ত রাধাকৃষ্ণন-এর তখনই বিশ্বব্যাপী খ্যাতির কল্যাণে আমার চাকরিটা রইল আর গোটা আন্ধ্র এলাকায় ঘুরে ঘুরে সভাসমিতিতে বক্তৃতায় 'বরাত' আমার জুটল (যারই পরিণতি তদানীন্তন বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টিতে ১৯৩৬ সালে আমার প্রবেশ!)। সেই সুদূর ত্রিশের দশক থেকে চলেছে (আর আজও স্তব্ধ হয়নি) স্বদেশমুক্তি ও সমাজবাদ নিয়ে এই অধমের প্রব্রজ্যা—ভীরু কণ্ঠে (তার চেয়ে বেশি ভীরু স্বভাবগতি কারণে) কুণ্ঠা হয়তো এসেছে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রণী হতে সংকোচ দেখা দিয়েছে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত কারণে, তেমন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যাবার ভাগ্যও হয়নি। তবু আমার মতো ব্যক্তির যে-অবস্থান, সেখান থেকে যথাসাধ্য দুনিয়াজোড়া এক মনমাতানো প্রাণজাগানো লড়াইয়ের একপ্রান্তে ছোট্ট একটু জায়গা নিয়ে থেকেছি, আজও এই ব্যাপৃতির বিরাম নেই। নইলে 'লিখ্‌ব না লিখ্‌ব না' করেও লিখছি—আগে যা বলেছি "একটুকু আশা" যদি কোনোক্রমে আজীবন অন্বিষ্ট একটু

দ্রুতায়িত হতে পারে।

এখনও তাই দেশেবিদেশে রাজনীতি শুধু নয় সর্ববিধ নীতির 'জবাই' দেখে প্রায়ই মনে আসে কতকাল আগে রবীন্দ্রনাথের খেদ : "একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা শুধু মিছে কথা ছলনা", আর তার ডাক : "কে জাগিবে আজ? কে করিবে কাজ? কে ঘোচাবে বলে জননীর লাজ?"—না, ক্ষান্ত হই, বুড়ো বয়সে 'ভীমরতি' ধরল নাকি? একটু বাঁচোয়া যে আমায় যারা লিখতে বলেছেন তারা আমার মেজাজও কতকটা চেনেন। .

বাংলা ইংরিজি মিলিয়ে লিখে লিখে 'হদ্দ' হয়েছি বলে পার পাব না জানি, তাই আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে চলে না। একটা নালিশ প্রায়ই শুনি যে সোভিয়েট আর সাম্যবাদ নিয়ে বড্ড বেশি আবেগ আর আকুলতা দেখিয়ে চলেছি বহুকাল ধরে আর দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির হিসাব রাখতে পারিনি। হয়তো তাই—বিশেষত যখন 'Nothing fails like failure', আর সমাজবাদ-সাম্যবাদের রাহুমুক্তি কতকাল নেবে (যদি প্রাকৃতিক রাহুগ্রাসের মতো এই ঐতিহাসিক রাহুগ্রাসও সাময়িক হয়) তা কেউ জানে না, তার কিছু লক্ষণ দেখা দিলেও এখনও তা উৎসাহব্যঞ্জক ভাবতে পারছি না (বিশেষ করে নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে)। কিন্তু স্বীকার করছি যে সোভিয়েট ব্যবস্থা নিয়ে Sidney & Beatrice Webb-এর মহাগ্রন্থ কিম্বা The Vasy Rev. Hewlett Johnson, Dean of Canterbury-র "The Socialist Sixth of the Earth"-এর মতো বই ও অন্যান্য অজস্র রচনার (ও ঘটনার) সাক্ষ্য এবং বহুবার সোভিয়েট দেশে (বিশেষ এশিয়ার রাজ্যগুলিতে) নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই। সেখানকার দোষত্রুটি কিছুই কি দেখিনি, তা নয়—কিন্তু গোটা দুনিয়ার ধনশক্তি আর তার 'গণতন্ত্রপ্রেমী সহায়কদের অবিরাম কুৎসা শুধু নয়, সক্রিয় সর্ববিধ জিঘাংসু বৈরিতার সম্মুখীন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ কথিত (১৯৩০) "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ"-এর গরিমা কীর্তনে ক্লান্ত হইনি। দুনিয়া বদলাবার জন্য যে বিপ্লব তার সাফল্য সোভিয়েটের আকারে সমাজবাদের প্রথম প্রকৃত পথপ্রদর্শক ("pilot project") রাষ্ট্রের যে ইতিবাচক ভূমিকা শত্রুও অস্বীকার করতে পারেনি। সেই ভূমিকার পরিচিতি যথাসম্ভব ছড়িয়ে দেবার প্রযত্নে অবসাদবোধ করিনি। আজও এই ঐতিহাসিক দুর্দিনে সেই প্রযত্নের ঔচিত্য বোধ করি বলেই হয়তো 'ফাটা ঢাকে' 'বাদ্যি' বাজাবার প্রায়-উন্মাদ প্রয়াসে লিপ্ত বলে প্রশ্রয় মিশ্রিত কিঞ্চিৎ কৌতুকেরও পাত্র হয়ে বসেছি। এতে ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ আমার নেই, নিজের বিশ্বাস, অর্থাৎ সর্বদেশের জনগণের মুক্তি ও তারই পরিণতিরূপে শোষণ রহিত সমসুযোগের সমাজগঠনের আবশ্যিকতা বিষয়ে মতিস্থির রাখতে আমার চিন্তার, আমার মর্মের, আমার নিত্যকর্মে, আমার কল্পনায় যে-অবস্থান তা সজ্ঞানে পরিহার আমার কর্ম নয়। হতে পারে না।

খানিকটা ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত 'confession'-এর ধরনে স্মরণ করছি ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার টাউনহলে একটি জনসভায় আমার মনে যা হঠাৎ ভেসে উঠেছিল তা আমি লিখি এবং ছাপাই। আর এখানে তার একটু উদ্ধৃত করি :

"সোভিয়েট আমারও দেশ। হাঁ, আবার বলি একথা, যদিও সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি

যে মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমি ভারতীয়। ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি, আমার দেশের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে আমি ভালোবাসি। ভারতবর্ষের মুক্তির চেয়ে বড়ো কোনো কামনা আমার নেই। তবুও বলি যে সোভিয়েটও আমার দেশ, বিশ্বমানবের কল্যাণ ও প্রগতি সোভিয়েট বিপ্লবের অম্বিষ্ট, ভারতবর্ষ ও অপর পরাধীন দেশের শৃংখল মোচনে সোভিয়েতই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত সহায়ক"। অনুরূপ কিছু কথা শুনেছি অন্যের মুখে, কিন্তু ভালো লেগেছিল ১৯৬৪ সালে সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসে ভিয়েৎনাম-এর অবিস্মরণীয় নেতা হো চি মিন্-এর শুভেচ্ছা পাঠের পর সে দেশের পার্টিনেতা Le Duan বলেন : "আমাদের কাছে মাতৃভূমি যেন দুটি—প্রথমত ভিয়েৎনাম, আর দ্বিতীয়ত, যে দেশে সমাজবাদ প্রথম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেই সোভিয়েট ভূমি, যে দেশ ভিয়েৎনামের কৃচ্ছ্রসাধনে ভাগ নিয়েছে, আমরা পান্তাভাত ভাগাভাগি করেছি ("shared our rice and water") আর আমাদের সর্ববিধ সাহায্য তারা করেছে"। আনুষ্ঠানিক ভাষণের অবিকল অর্থ নিয়ে ঝগড়ার দরকার নেই, তবে এবম্বিধ চিন্তাই একদা সাম্যবাদী মহলে প্রচলিত ছিল। হয়তো বা কিছু পরিমাণে সঙ্গত কারণেই সেই মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু সে হল স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। আমার মনে পড়ছে স্টালিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তার দোষকীর্তন যখন চলছে তখন ভারতে বসবাসকারী বিজ্ঞানী J. B. S. Haldane-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দেন যে স্টালিনের জীবৎকালেই সুসঙ্গত কারণে প্রচুর প্রশংসা তিনি করেছেন আর তার মৃত্যুর পরে এই ছিদ্রান্বেষণে তাঁর রুচি নেই।

সোভিয়েটকেও আমার দেশ বলাটাতে জ্যোতি বসুর মতো সুহৃৎ ও সতীর্থেরও মনে বোধহয় প্রশ্ন ওঠে আর তাই পার্টিবিভাগের (১৯৬৪) পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ঐ কথা কি আমি বলে যেতে পারি। জবাব দিই যে নিশ্চয়ই, এ তো মূল নীতির কথা, সেটা বদলাই কেমন করে। আমার এটা আনুষ্ঠানিক পার্টিকর্তব্যগত জবাব ছিল না, এটাই আমার মনের কথা, অন্তরের কথা, হৃদয়ের কথা। সেই সোভিয়েত আর নেই, তার নিজেরই 'কলুষ কল্মষ'-এর ফলে আর দেশবিদেশে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি বদলাবার চাপে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদ-সাম্যবাদের শত্রুশক্তির সুচতুর সুকৌশলী সুসংবদ্ধ দীর্ঘকালীন চক্রান্তও সক্রিয় বৈরিতার ঠেলায় গর্বাচভ-ইয়েলৎসিন ধরনের নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছে, বিশ্বব্যাপী নীতিভ্রংশ ও চীনের মতো বিপ্লবী পরম্পরাসমৃদ্ধ দেশেও 'কুবের-এর কাছে মার্কস-এর হার' ("Marx vs. Mammon") আর জগৎজোড়া অনুরূপ বহু দুর্ঘটনা বিংশ শতকের অবসানকালে ইতিহাসকে বিকৃত, কলুষিত, বিপথগামী করার উপক্রম ঘটেছে। তবুও আমার মতো জীবনান্তে অবস্থিত একজন লিখে চলেছে, মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে "আর লিখব না" সংকল্প করেও স্বেচ্ছায় আবার লিখছি। কেন, তার জবাবে এই অক্ষম রচনায় আমার দুই আজীবন পোষিত অম্বিষ্টের কথা প্রথমেই জানাবার চেষ্টা করেছি। অজুহাত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কথাই উচ্চারণ করব :"মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই"। এটাই হল এই অধম অনুবর্তীরও জবাবদিহি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত কেন লিখি গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বঙ্কিম-গরিমার উত্তরাধিকার

(মুক্তমতি জনদরদী আচার্য আহ্‌মদ শরীফ স্মরণে)

> "Men make their own history but do not make it just as they please, they do not make it under circumstances chosen by themselves but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past. The tradition of all the dead generations weighs like a nightmare on the brain of the living..."(Karl Marx, 'The Eighteenth Brumare of Louis Bonaparte. 1851-52)

একাধিক বাঙালি প্রজন্মের কাছে 'সাহিত্যসম্রাট' বলে বন্দিত, সমসাময়িক বাধ্যবাধকতায় শীর্ণ হলেও বিশাল গভীর দিগন্তব্যাপী প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, বহু বিতর্ক সত্ত্বেও কীর্তির সামগ্রিকতায় শুধু স্বভূমি বাংলা নয়, বহু যুগ ধরে বঞ্চিত দুঃখদীর্ণ অথচ অপরাস্ত 'মহাভারতবর্ষ'-এর প্রতীক রূপে হিন্দু মানসে 'ঋষি' আর মূলগতভাবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যুগন্ধর বলে সমাদৃত, সেই দেশ-গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, আর মনে জিজ্ঞাসা ('জানবার ইচ্ছা') ও হৃদয়ের আবেগকে সংহত, সঙ্গত, তথ্যসিদ্ধ, শোভন, মনোগ্রাহীরূপে বহুজনের মধ্যে সঞ্চারের প্রযত্নে তিনি নেমেছিলেন। কালিক কণ্টকে ও 'জীবন-ধনদীন' স্বদেশবাসীর দুর্দশা ও চিত্তদৈন্যের চাপে বিঘ্নিত হলেও *বঙ্গদর্শন*-এর গরিমা হল অক্ষুণ্ণ। প্রথম প্রকাশকালে অনুপ্রেরিত কিশোর রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরীর সেই পুণ্যকীর্তির সাযুজ্যে রত হতে পেরেছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি আড়াই জন 'ঋষি'-কে—এক, বঙ্কিম; দুই, রবীন্দ্রনাথ; আধ, মাইকেল। এখানে 'ঋষি'-র অর্থ ত্রিনয়নসম্পন্ন কোবিদ, সত্যদ্রষ্টা, পথপরিচায়ক। এমন যে *বঙ্গদর্শন*, বঙ্কিমস্মৃতিকে প্রণতি জানাবার জন্য তার পুনঃপ্রকাশ প্রয়াসে কিছু দর্প, কিছু ঔদ্ধত্য, বর্তমানের বহু বিড়ম্বনা সত্ত্বেও অবশ্য আছে। হরধনুতে শর প্রয়োগের সাহস ও শক্তি তো একান্ত বিরল হতে বাধ্য। তবু একেবারে নির্ভয় না হলেও এই প্রযত্নকে অভ্যর্থনা করছি।

এই রচনায় প্রতিশ্রুতি দেবার পর রীতিমতো বিব্রত বোধ করেছি। দীর্ঘ পরমায়ু যে একটি অভিশাপ নিয়ে আসে তা সবাই বুঝবেন না। শারীরিক অপটুতা ছাড়াও মানসিক একটা কুণ্ঠাও আসে, এমন এক মহার্ঘ বিষয় আলোচনার প্রস্তুতি এ বয়সে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। হাতের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্যেরও অভাব, নিজের পক্ষে যথাযথ অধ্যয়ন এখন অসাধ্য, মূলত স্মৃতি ও আপাতত সহজলভ্য কিছু রচনার সহায়তা ভিন্ন অন্য সঙ্গতিও নেই। তাই বেশ কিছুকাল দোমনা হয়ে কুণ্ঠিতভাবে চিন্তার চেষ্টা করেছি। এমন সময় সত্যজিৎবাবুর একটি পত্রে পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' থেকে একটি উদ্ধৃতি যেখানে কৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করে বঙ্কিম লিখছেন :

"যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, 'বেদে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশু খ্রীস্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র, যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

উদ্ধৃতিটি অজানা না হলেও আমার মতো নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, ধর্মবিশ্বাস রিক্ত, লোকায়ত দর্শনে অনুরক্ত মানুষকে কিছুক্ষণ 'স্তব্ধ' করে দিয়েছিল আর তারপরই স্থির করলাম যা হোক্ পারি একটু কিছু লিখব যা হয়ত নবপর্যায়ে *বঙ্গদর্শন*-এর 'পাতে দেওয়া' চলতে পারে।

বহুকাল আগে Carlyle-এর মতো রগচটা সাহিত্যরথী বলেছিলেন শেক্সপীয়র বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে যে একটা "area of sancity" আছে সাহিত্যক্ষেত্রেও যেখানে প্রবেশ করতে হলে চাই সম্যক্ যা লেখায় আয়ত্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহাভাগ বিষয়ে কিছু বলতে হলে নিজেকে তৈরি করতে হয়। তীর্থস্থানে দেবালয় প্রবেশকালে যথাসাধ্য শুচি স্নিগ্ধ মনে যেতে হয়। বয়সের ভার ও অন্য বহুবিধ বাধা কতটা কাটিয়ে উঠতে পারব তার বিচারের দায়িত্ব রইল সহৃদয় পাঠকদের হাতে।

নিজেকে তৈরি করতে অনেক সহায়তা পেয়েছি ১৯৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পর একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমি প্রকাসিত স্মারক গ্রন্থ থেকে। এর দীর্ঘ ও চিন্তাশীল মুখবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের ছাপ এই বৃহৎ সংকলনে সুস্পষ্ট। পুরনো ও নতুন রচনায় সুসমৃদ্ধ বইটি যদি বাংলা ভাষায় (কিছু অদল বদল করে কিম্বা আলাদাভাবে লিখিয়ে) ছাপা যেত তো একটা বড়ো উপকার সবাই পেতাম। বঙ্কিমপ্রতিভার নানা দিক নিয়ে আলোচনার অজস্র অবকাশ রয়েছে, তাই আশাকরি যে, বঙ্কিমেরই স্বগৃহে স্থাপিত গবেষণাগার থেকে যথোচিত কাজ হতে থাকবে।

ভাগ্যক্রমে গ্রন্থশাস্ত্রবিদ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* বইটি হাতের কাছে ছিল। এতে ফাঁকি নয়, তবে ফাঁক বেশ কিছু আছে। তবু সন্দেহ নেই এটি মূল্যবান্; বিশেষত মহারাষ্ট্রে ১৮৭০-এর দশকে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে-র অসমসাহস বিদ্রোহের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কতটা বিস্তৃত হয়েছিল তার বর্ণনা বিষয়ে। মূল চিন্তার দিক থেকে সহায়তা সব চেয়ে বেশি পেয়েছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'জরিপ' করে খ্যাতনামা বিদ্বান, আমার একান্ত সুহৃৎ আহ্মদ শরীফ-এর *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* এবং অন্যান্য কিছু রচনা থেকে। নতুন কিছু বলছি না কিন্তু দেশের বতমান দুর্দশা ভাবিয়ে তুলছে কেন আহ্মদ শরীফ্-এর মতো বিদগ্ধজনকে বলতে হয়েছিল :

"মানবকল্যাণ লক্ষ্যে মুক্তবুদ্ধি বঙ্কিম মানবজীবনের রহস্য প্রেরণায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ক্রমে তিনি বিশ্বের ও বিশ্বমানবের উদার অঙ্গন ত্যাগ করে স্বদেশের ও স্বজাতির সংকীর্ণ সীমায় স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করে তৃপ্ত ও কৃতার্থমন্য হতে থাকেন। তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এভাবে

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিরূপে স্বল্পালোকিত স্বসমাজ সংকটে নিবদ্ধ হল। যুগসৃষ্ট বঙ্কিম যুগোত্তর প্রতিভা নিয়েও যুগপ্রভাব অতিক্রম করে যুগস্রষ্টা হবার গৌরব থেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন। হিন্দুবন্দ্য ঋষি হবার লোভে তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্বমানবের শ্রদ্ধেয় প্রতিভূ-প্রতিনিধির আসন ত্যাগ করলেন। বঙ্কিম-ইকবাল এভাবে আমাদের বঞ্চিত ও নিজেদের বঞ্চনা করেছেন।" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ১৭৬)।

বঙ্কিমচন্দ্রের ষড়ৈশ্বর্যশালী প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব ছিল না তৎকালীন পরিবেশে। মহাকবি গ্যেটে অনেকদিন আগে বন্ধু একেরমান্‌কে লেখা পত্রে খেদ করেছিলেন, পরিবেশ 'নোংরা' ('shabby') আর 'নিরীহ' ('tame') হলে প্রতিভার অপচয় অনিবার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন বাঙালি জীবনের আবহ যে কত প্রতিকূল ছিল তা আমরা যেন জেনেও জানতে চাইনা। বরঞ্চ উল্টোপথে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রায় মস্তিষ্কহীন উল্লাস বোধ করি উনিশ শতকের তথাকথিত 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' ('বাংলার পুনর্জন্ম') নিয়ে। ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকারের মতো তথ্যবিচারে সত্যসন্ধ ব্যক্তি এতদূর উল্লসিত হন যে ঐ 'বাংলার পুনর্জন্ম'কে ইয়োরোপের পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুরূপ ঘটনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলতে সংকোচবোধ করেন নি। কথা বাড়ছে, কিন্তু উল্লেখ না করে পারি না যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বহুমানভাজন বিদ্বান লিখেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর প্যারিস বা লন্ডনের তুলনায় উনিশ শতকের কলকাতা ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে সেরা। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বাংলার 'পুনর্জন্ম' দেখেছিলেন নবদ্বীপে ও অন্যত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে (অবশ্য ইয়োরোপের 'পুনর্জন্মের' সঙ্গে তুলনীয় ভাবে একেবারেই নয়) যেটা আমরা ভুলে থাকি কিন্তু বঙ্কিম ভোলেন নি, আর ঋষি নেত্রের অধিকারী বলেই বুঝেছিলেন যে উনিশ শতকের 'নবজন্মে'র মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ফাঁকি, "প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, হিতবাদ, প্রগতি, পর মত সহিষ্ণুতা প্রভৃতির কোনোটাই তাদের আত্মোপলব্ধ ছিল না, পড়ে পাওয়া বুলির সম্পদ হিসাবেই রইল"। (আহ্‌মদ শরীফ)। 'Huxley, Vedanta and goose' নিয়ে 'আমরা reformed Hindoos,' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের, এই বিখ্যাত ব্যঙ্গ তৎকালীন ছবি এঁকেছে।

প্রায় প্রসঙ্গান্তরে আটকে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু বলতে চাই যে, সমকালীন চিন্তাবহগত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা বঙ্কিমের অমিত চিত্তৈশ্বর্যেরও সাধ্য হয়নি। বঙ্গভূমি রত্নগর্ভা বলেই ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অভিশপ্ত পরিমণ্ডলে পেয়েছি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, লালনশাহ, রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে। কিন্তু প্রায় 'নরোত্তম' বলে বর্ণিত হবার গৌরব সমন্বিত হলেও যেন এক ঐতিহাসিক কলঙ্কের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এঁদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। গোটা কেতাব একটি লিখেও এর বিশ্লেষণ প্রায় অসাধ্য, কিন্তু এজন্যই বঙ্কিম মহিমা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় যেন জাগতিক নিয়মেই তারই আনুষঙ্গিক কথঞ্চিৎ 'কালিমা' নিয়ে কিছু চিন্তায় নামতে হয়। সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য গৌরব মেঘের ছায়ায় একটু ম্লান হলেও তা অক্ষুণ্ণই থাকে।

সমকালীন 'নোংরা' ('shabby') ও 'নিরীহ' ('tame') পরিবেশের চাপ এড়ানো যে কত কঠিন তা বোঝা যায় উনিশ শতকে রুশদেশের মনস্বী লেখক চেখভ (Chekov) যখন বলেন যে প্রতি মুহূর্তে যেন দেহের রক্তস্রোত থেকে ক্রীতদাসের রক্ত ফোঁটার পর ফোঁটার মতো ('drop by drop') বার করে দিতে হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্রষ্টাকে এই যন্ত্রণা আজীবন সইতে হয়েছে। আজও পর্যন্ত তাঁর উত্তরসূরীদের কম বেশি একই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ইতিহাসের ঋণ-পরিশোধ সহজ কর্ম নয়। সবাই জানি বঙ্কিমবাবুর ইচ্ছা ছিল ঝান্সীর রানীর প্রদীপ্ত জীবন অবলম্বনে লিখবেন। কিন্তু ইংরেজের চাকরির অভিশাপ মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন বলে মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন। কী যন্ত্রণাই পেতে হয়েছিল *আনন্দমঠ* (১৮৮২) প্রকাশের পর! 'সাহেবরা' যাতে প্রচণ্ড খেপে না যায় সেজন্য বইটি ইংরেজদের বিপক্ষে লেখা হয়নি তার সাফাই গাওয়াতে হয় সমালোচকদের দিয়ে। আর প্রথম সংস্করণকে রীতিমতো বদ্‌লাতে হয়—যেখানে 'ইংরেজ', 'গোরা' ইত্যাদি শব্দ, সেখানে 'যবন' 'মুসলমান' শব্দ বসাতে হয় (শিল্পগত যুক্তি বিনাই)। ভীরু, 'ভেতো' বাঙালির বীরত্বের বড়াই ইংরেজের অপছন্দ বলে 'পঞ্চাশজন ইংরেজ'কে নিহত করি' বদলে দিয়ে 'কয়েকজন' বসাতে হল! চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যদিও প্রথম সংস্করণে ছাপা 'বন্দে মাতরম' গাথা-র 'কে বলে মা তুমি অবলে' শব্দবন্ধটিকে চতুর্থ সংস্করণে বদ্‌লে দিয়ে যে 'অবলা কেন মা এত বলে' করা হয় তার বিশদ বিবরণ দেননি। অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে যে, রাজপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে রাজরোষ থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশাতেই 'শুভার্থী' বন্ধুদের সুপরামর্শেই দেশাভিমানী শিল্পীকে এই স্খলন সইতে হয়। 'কে বলে মা তুমি অবলে?'-র মধ্যে যে তেজ আছে, দর্প আছে তা 'অবলা কেন মা এত বলে'-র প্রায় কাঁদুনিতে নামিয়ে আনা হল।

তুলনীয় না হলেও মনে পড়ছে যে এ ঘটনার অনেক পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'বঙ্গ আমার জননী আমার' লেখার সময় 'শুভার্থী'দের চাপে (এবং সরকারি চাকরি হারাবার ভয়ে) 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয় রক্ত করিয়া শেষ' পংক্তিটিকে 'খুন' করে বাধ্য হয়েছিলেন ছাপাতে 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ!' (কবিপুত্র দিলীপকুমার স্বয়ং এই তথ্যটি দিয়েছেন।

বঙ্কিম-রচিত যে মহাগীত ভারতমানসে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে, সীমিত, কুণ্ঠিত, নানা ঐতিহাসিক কারণে বিভক্তিদুষ্ট আজও অসম্পূর্ণ মুক্তি প্রয়াসের বিবরণে যে মহাগীতের ভূমিকা সদা সমুজ্জ্বল, যাকে কণ্ঠে নিয়ে বহু দেশব্রতী ফাঁসির মঞ্চে উঠে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, দশকের পর দশক যে গান এই 'মহাভারতবর্ষে' ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে, সেই 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের প্রথম অঙ্গচ্ছেদ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজে হাতে করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে (১৯৩৭ সালে) যখন সর্বজনের পক্ষে সহজে ও সানন্দে উচ্চারণযোগ্যীকরণের জন্য 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী', 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' প্রভৃতি পংক্তি বাদ দেওয়া হয়, তখন (এবং আজও পর্যন্ত) এই দ্বিতীয় 'অঙ্গচ্ছেদ' নিয়ে ক্ষোভ উষ্মা সরব হয়েছে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য-সংঘর্ষকেই সহায়তা করা হয়েছে। আমরা ভুলতে বসেছি সেই প্রথম 'অঙ্গচ্ছেদ'-এর কথা, যেখানে আমাদের মুক্তিপ্রয়াস আর প্রজাতিপ্রযত্নের মূলগত দুর্বলতা ধরা পড়েছিল।

ইংরেজকে তুষ্ট করার জন্য—অ-হিন্দু ভারতবাসীদের মনস্তত্ত্বকে সম্মান দেওয়ার জন্য নয়—তখন এই বদল ঘটানো হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসম্ভব যুক্তিজাল ছড়িয়েও না লিখে পারেন নি: "[*আনন্দমঠ*-এর] প্রথম সংস্করণে আছে, 'ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্যধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।' পঞ্চম বা শেষ সংস্করণে 'আগে' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আগে পরে নয়, সবসময় ইংরেজ রাজত্ব থাকবে, এই রকম ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে।

"পঞ্চম বা শেষ সংস্করণ আরও যোগ করা হয়েছে : 'ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কন্টকে ধর্মাচরণ করিবে।'

"পরে মহাপুরুষ যা বললেন তাতে আরও চমকিত হতে হয়। তিনি সত্যানন্দকে বোঝালেন 'ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ, ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ...।" (*আনন্দমঠ : রচনার প্রেরণা ও পরিণাম*, কলকাতা ১৯৮৩ পৃ. ৪৭)।

কেবল চাকরি বাঁচানো বা বইয়ের প্রচার যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য উৎকণ্ঠাবশে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহাভাগ এভাবে এগিয়েছিলেন বললেই অজুহাত মানা যায়না। 'ইংরেজরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা থেকে উদ্ধার করিয়াছেন' এই 'বিজ্ঞাপন' প্রথম সংস্করণের উৎসর্গের পরেই জ্বল জ্বল্ করছে। প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে ঐ সার্থকনামা সুধী বহুখ্যাত *নীলদর্পণ* (১৮৬০) রচনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, বইয়ের ভূমিকায় মহারানী ভিক্টোরিয়ার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জানাতে কুণ্ঠিত হননি। কী অভিশাপ আমাদের যে বিদেশি বিধর্মী বিভাষী এবং সব দিক থেকে অনাত্মীয় এবং শোষণ বিশারদ ইংরেজ শাসনকে বিধিদত্ত আশীর্বাদস্বরূপ ভারত মানসে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-এর কাল থেকে এর প্রচলন, আজও এর বিলোপন ঘটেনি। এ নিয়ে অজস্র কথা মনে এসে ভিড় করছে। শুধু বলি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এবম্বিধ স্খলন দেখা গিয়েছে, যার অন্যতম উদাহরণ হল 'স্বদেশী' যুগের উন্মাদনাকালে 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি, যেখানে 'রাজতপস্বী বীর'কে অভিবাদন জানানো হয়েছে 'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে' দিয়েছেন বলে, তাছাড়া আরও মারাত্মকভাবে লিখে ফেলেছিলেন ইংরেজ শাসন বিষয়ে, 'বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি/নিল চুপে চুপে/বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী/রাজদণ্ড রূপে।' বলতে ইচ্ছা করে, অন্যে পরে কী কথা? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এমন উক্তি! কলমকে টেনে ধরতে হচ্ছে। 'অলমতি বিস্তরেণ।'

পরাধীনতার যন্ত্রণা জেনেছি আর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পঞ্চাশাধিক বৎসর কেটে গেলেও দেশের দুর্দশার অন্ত ঘটানো যায়নি, দেখার ক্লেশ আরো কলুষ পীড়িত করে চলেছে বলেই হয়তো আতিশয্য করে ফেলেছি। ইতিহাস আর বিবেকের দরবারে আমরা সবাই দোষী সাব্যস্ত হব, 'এ আমার এ তোমার পাপ;' নিয়তিকে দায়ী করে বা পরস্পরকে নিন্দা করে দোষক্ষালন চলবে না; নক্ষত্রের অবস্থানবশে নয়, আমাদেরই লঘুতার হ্রস্বতার, স্খলনপ্রবৃত্তির মূল্য সবাইকে দিতে হচ্ছে।

১৯৪৫ সালে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নে লেনিনগ্রাদ শহরে বিজ্ঞান আকাদেমির গ্রন্থাগারে বঙ্কিমচর্চায় নিরত বিদুষী নোভিকোভা (কয়েকবার এদেশে এসেছেন) দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত *বিষবৃক্ষ* ও আর একটি গ্রন্থ যা তিনি দিয়েছিলেন ভারতবিদ্যাভূষণ আই. পি. মিনায়েভকে। ইনি ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮৫-৮৬-র মধ্যে তিনবার ভারতে আসেন এবং শেষবারের ভ্রমণে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে এসে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এই 'ভারতসঙ্গীত' রচয়িতাকে সবাই খুশিমনে ভুলে আছি কেন?) রমেশচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পরিবৃত বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ করেন যা সেখানে উপস্থিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিবরণে রয়েছে। (*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*-২, ১৯৮৯, পৃ. ৪১-৪১)। ইংরেজের বর্মা দখল আর কিছু পূর্বে মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের নায়কত্বে যে কৃষকবিদ্রোহ সরকারকে সন্ত্রস্ত করেছিল তা নিয়ে কথাবার্তা চলে। বঙ্কিমবাবু বুঝি বলেন যে, ছাপাখানার ওপর নিয়ন্ত্রণের কড়া আইনের ভয়ে মনের কথা খুলে বলতে তাঁরা পারেন না। রুশ সূত্র থেকে জানা যায় যে, মিনায়েভ লিখেছিলেন যে এই লেখকরা পুরো বিপ্লবী হতে পারেন নি, ইংরেজ শাসন বিতাড়নের চিন্তা তাঁদের ছিল না।

আনন্দমঠ লেখার পিছনে মহারাষ্ট্রের কৃষকবিদ্রোহের প্রভাব প্রমাণ করবার প্রযত্নে থেকেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু বঙ্কিমচন্দ্র যে মানসিকতার অধিকারী ছিলেন তাতে দেশাভিমান উদ্দীপ্ত করে তোলবার মতো ঘটনা তাঁর যৌবন থেকে প্রচুর পরিমাণেই ঘটেছিল। ১৮৫৭-র ২৪ জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। যার প্রথম স্নাতক হলেন (একজন সাথী নিয়ে) বঙ্কিম। প্রায় তখনই স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে বন্দিত, অথচ ইংরেজ হিসাবে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের সূত্রপাত দেখা যায় ব্যারাকপুরে বিদ্রোহী নায়ক মঙ্গল পাণ্ডের জীবনদানে। বাঙালি শিক্ষিতেরা (প্রায় সবাই হিন্দু) সেই বিদ্রোহ থেকে সতর্ক দূরত্ব রেখেছিল বলে প্রচলিত যে কাহিনী তা পুরো সত্য নয়। বিদ্রোহের বহুখণ্ডে যে ইতিহাস (Kaye and Malleson-কৃত) সরকার প্রকাশ করে তাতে কলকাতা আর জেলাওয়ারি বিবরণ থেকে চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ আর বিস্ফোরণের আশঙ্কা সুপরিস্ফুট। খুঁটিনাটি এখানে সম্ভব নয়, তবে খুবই গুরুত্ব রয়েছে বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী পাদরি আলেকজান্দার ডফ্ (Duff) সাহেবের মন্তব্যে যে, বাঙালি শিক্ষিতেরা ইংরেজ শাসনের প্রতি 'disaffection' ঢেকে রাখলেও তাদের দিক থেকে সরকার নিয়ে 'affection'-এর লেশমাত্র ছিলনা। কলকাতায় সাহেব ও ফিরিঙ্গিদের 'আতঙ্ক' ('panic') আর পালিয়ে যাবার জন্য জাহাজ তৈরি রাখা ইত্যাদি বহু ঘটনাই রয়েছে। বঙ্কিম যে তখন 'আমরা সব পোষা গরু। ঘুষি চাই না ভুষি পেলেই তুষ্ট রই' (ঈশ্বর গুপ্তের হৃদয়বিদারী ব্যঙ্গ) ধরনের চিন্তায় তুষ্ট। ভালো চাকরির অনিবার্যতায় পুলকিত, তা ভাবতে পারিনা।

তারপর চলেছে ঘটনাস্রোত যার একটু আভাস আমাদের পক্ষে উপকারী হতে পারে। বিদ্রোহের নৃশংস দমনের অব্যবহিত পরে দক্ষিণ বাংলার নীলচাষীর বিদ্রোহ (১৮৬০) বড়োলাট ক্যানিংকে যে ১৮৫৭ সালের দিল্লীর মতো ভয় পাইয়েছিল তা তিনি নিজে লিখে গেছেন।

সত্তরের দশকে শুধু মহারাষ্ট্র নয়, বাংলার পাবনা-বগুড়ায় কৃষকরা 'সমিতি' গড়ে নিজেদের 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে অভ্যুত্থান চালায় যা তখনই সরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমের অজানা তো ছিলই না, হয়তো বা যথাযথ প্রস্তুতি বিনা তদ্বিধ কর্ম বিষয়ে সুবিদিত অনীহা সত্ত্বেও প্রভাবিত করেছিল *সাম্য, বঙ্গদেশের কৃষক*-এর মতো এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী রচনাকে। ১৮৮২-তে *আনন্দমঠ*-এর প্রকাশ আর ১৮৮৫ সালে বড়োলাট ডফ্‌রিন-এর পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে অল্প কিছু 'অধিকার'-এর প্রলোভন দেখিয়ে Indian National Congress প্রতিষ্ঠার ভূমিকারূপে Alan Octavain Hume সিমলার শৈলশিখরে বসে গোটা দেশজুড়ে ত্রিশহাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট যাচাই করে বলেন যে বিক্ষোভ সর্বত্র, দেশ তখন 'on the brink of revolution' (ইংরেজ কলম থেকে এ শব্দটি চট্‌ করে বেরোয় না!), সাধারণ-মানুষের ব্যাপক অসন্তোষকে সংগঠিত করতেও শিক্ষিতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এগিয়ে আসছে, ইত্যাদি। তখনকার বাংলা যে এ রিপোর্টের এলাকার বাইরে, তা হতে পারে না। Wedderburn-এর হিউম জীবনীতে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এর পূর্বে ওয়াহাবি-ফরাজিরে কাগুকারখানায় কয়েক দশক ধরে ইংরেজ সন্ত্রস্ত বাংলায় চল্লিশের দশকে দুধু মিঞার (হাজি শরীয়ৎউল্লাহ্‌) নেতৃত্বে কৃষক-বিক্ষোভের (বিশের দশকে তিতুমীরের লড়াই স্মরণীয়) ঢেউ সাম্‌লানো শেষ হয়নি; ষাটের দশকে ওয়াহাবি নেতাদের ফাঁসি আর ঐ বিচারের বিবরণী পড়ে বিপিনচন্দ্র পালের মতো মানুষের 'দেশব্রতের দীক্ষাগ্রহণ' ('baptism into patriotism'), ইত্যাদি ঘটনার মেলা। তাই ১৮৮২ সালে মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌-এর পরস্পরকে লেখা চিঠিতে দেখি যে ভারতবর্ষে বুঝি বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এলাম শুধু জানাতে যে বঙ্কিম মানসে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের ছাপ নিশ্চয়ই পড়েছিল, যদিও হয়তো শিক্ষিতদের চিন্তা ও কর্মের পরিধিতে দেশ তখনও নিস্তরঙ্গ, ইংরেজ শাসনের অভিপ্রায় যে শুভ্র, তার কিছু সংস্কারেই যে ভারতের কল্যাণ এমন ধারণাও তখন প্রবল জনশক্তির অভ্যুদয় সংঘটনের বাস্তব পরিবেশ তৈরি হবার সম্ভাবনা ছিল কম।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে যে বঙ্কিম 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' চিন্তায় লিপ্ত, জ্ঞানার্জনের আগ্রহে ও স্বকীয় প্রতিভায় যখন তৎকালীন 'shabby' ও 'tame' পরিস্থিতিতেও বঙ্কিমের চেতনা নব নব উন্মেষে উদ্‌ভাসিত। অর্থাৎ 'অভিশাপ' স্বরূপ সরকারি চাকরিতে শৃংখলিত কন্টকিত হ্রস্বীকৃত অবস্থানে আটক থেকেও কী অসাধারণ কীর্তি রেখে গেলেন বঙ্কিম। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মৃত্যু। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতই সাহিত্যসম্রাট, বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক, সমাজ সাহিত্য, জীবনদর্শনের সব্যসাচী মনস্বী, দেশাত্মবোধের কথক চূড়ামণি আর (রবীন্দ্রনাথের মতো পুরুষোত্তমকে ধরলেও) বাংলা গদ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের মতোই যিনি বলতে পারতেন : 'ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো/এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো', চিত্তৈশ্বর্যে অসামান্য সেই মানুষ। সংশয়বাদী হিতবাদী মানবতাবাদী, এমনকী সাম্যবাদী দর্শনে যাঁর ব্যুৎপত্তি (মার্কস্‌-এর উল্লেখ বঙ্কিমরচনায় নেই, যদিও 'কমলাকান্ত'-এর সুবাদে Feuerbach-সেখানে হাজির) সাম্যের মহিমা আর ইতিহাস

জুড়ে গণমানবের যন্ত্রণা যিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি 'মরমিয়া-সুলভ ভক্তিতত্ত্বে অভিভূত হলেন। মনুষ্যত্বের অধ্যাত্ম-মরীচিকার শিকার হলেন' (আহ্‌মদ শরীফের ভাষা)। 'বন্দেমাতরম' গাথার, ঐতিহাসিক গৌরব তাই ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যারা অনধিকারী, বঙ্কিমমানসের সন্ধান যাদের অগম্য, হিন্দু চিন্তার বাহক হয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছে। হয়তো এই দুশ্চিন্তাই আমাকে বারবার এভাবে লিখতে বাধ্য করেছে।

জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষায় 'সূর্যবন্দনা' প্রত্যহ করার যে গর্ব ছিল বঙ্কিমের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত, তাই তথ্যের বিচার ও যুক্তির ঋজু প্রয়োগে অনুরক্ত ও পারদর্শী বঙ্কিম হয়তো ক্রমশ জীবনে প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মচিন্তার মোহন মায়াজালে বাঁধা পড়েছিলেন। তাঁর মানসিকতায় 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর' ধরনের চিন্তা স্থান পায়নি, কিন্তু বোধ হয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, ভারতবর্ষীয় ধ্যানে 'বিচার স্বতন্ত্র্য, কিন্তু আচার সমাজ-সময়-তন্ত্র'-এর ধারণা। সমাজ বাধা দেয় না কারও নিজস্ব বিচারে—কেউ নাস্তিক হলেও ক্ষতি নেই, বৈদান্তিক হোন্ বা বৃক্ষ বা সর্প পূজক হোন্, আচারে যদি সমাজের নির্দেশ মেনে চ্‌লেন তো সব ঠিক আছে। প্রত্যয়ের প্রখরতা যে পরমত-সহিষ্ণুতাকে সহ্য করতে পারে না, তারও একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে, কিন্তু আমাদের এই 'যত মত তত পথ'-এ বিশ্বাসী দেশে অনেকটা আমরা এই 'সহিষ্ণুতা'র পক্ষে থেকেছি। তাছাড়া ধর্মবিশ্বাসের যে বহুযুগব্যাপী ইতিহাস, জ্ঞানবিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও যার প্রভাব এখন ও বহুল পরিমাণে অপ্রতিহত, কার্ল মার্কস্-এর ভাষায় 'নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস। হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, জনসাধারণকে ঝিমিয়ে রাখার আফিম' বলে যার বর্ণনা তাঁর বহুধা বিস্তীর্ণ সমাজ জীবনজাত মনোমোহিনী শক্তি (উপনিষদে বুঝি একে বলেছে সর্বেষাং ভূতানাং মধু') কত মহৎ মানুষকে অভিভূত করে রেখেছে। স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য তুরীয় চিন্তাবলে 'ভগবৎপাদ' বলে পূজিত হয়েও (যদি কিম্বদন্তী ভুল না হয়) সংসারের সাধারণ স্তরে নেমে লিখতে পেরেছিলেন। 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ় মতে।' জেনেছি যে অদ্বৈত বেদান্তের অদ্বিতীয় প্রবক্তা মধুসূদন সরস্বতী নির্গুণ-ব্রহ্মের ব্যাখ্যাতা কিন্তু কুণ্ঠিত নন্ বলতে : 'পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাৎ অরবিন্দ নেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরম্ কিমপি তত্ত্বমহম্ ন জানে।' সাধকের হিতার্থেই বুঝি ব্রহ্মের রূপকল্পনা ঘটেছে। ভক্তমনের আকুলতা দেখি বহু পরিজ্ঞাত উচ্চারণে : 'যে রূপবিবর্জিত তাতে ধ্যানবলে কল্পিত রূপ আরোপ করেছি, যে অনির্বচনীয় তাকে বাক্যে স্তুতি জানিয়েছি, যে সর্বত্রব্যাপ্ত তাকে তীর্থযাত্রাদি দ্বারা সন্ধান করেছি, এই দোষ, এই বিকলতা, হে জগদীশ, তুমি ক্ষমা করো।' আশ্চর্য কী যে অসামান্য মানসিক পরিক্রমার মধ্য দিয়ে (অল্পকাল নাস্তিক্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েও) বঙ্কিমচন্দ্র অটল অধ্যাত্মবিশ্বাসে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তাঁর চিন্তাকে একটুও হেয় করতে চাইছি না, কিন্তু দেখি কী এক উদ্ভট বিবর্তনের মাধ্যমে বঙ্কিম-প্রভাবিত প্রজন্মের পর প্রজন্মের প্রতিভূ হয়েই যেন সুবিদিত সাহিত্য পত্রিকা *দেশ* (শারদীয় ১৪০৬) সম্পাদকীয়ে লেখা হল আমার চিরকালের সকল খেলার সাথী' শিরোনামা দিয়ে 'দুর্গাপূজা— মা—বাঙালির মা', এই যে মা দুর্গা এখন নিঃসন্দেহে <u>আমাদের অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের</u> সমবায়িক চরিত্রদর্পণ, তিনি আমাদের এই শতাব্দীর প্রাণময় ইতিহাসও।'

আমার মনটাই কি বেয়াড়া, কিন্তু অস্বস্তি লাগে, বিশেষ করে বর্তমান সাম্প্রদায়িক অবস্থানে, যে দুর্গাপূজাকে (কিম্বা ঈদ) প্রভৃতি হিন্দুমুসলিম সকলের মিলনের পুণ্য প্রতীকরূপে দেখার পুরানো রেওয়াজ হারিয়ে যাচ্ছে বলে। রবীন্দ্রনাথ একবার 'মহাভারতবর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করে বলেন যে বিদেশি বিধর্মী মুসলমান এসে এদেশের সংস্কৃতিতে সমন্বিত হওয়ার জন্যই এদেশের বিশিষ্ট মহিমা। আমীর খস্রু থেকে দারা শিকোহ্ থেকে আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গফ্ফর খান প্রভৃতি কি দেশের স্মরণের পরিধি থেকেই অপসৃত হবে? শিখ-মুসলিম সংঘর্ষ কত তীব্র হয়েছিল, অথচ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যস্থান বলে বিদিত 'হরিমন্দির সাহেব' (যেখানে ১৯৮৪ সালে 'Operation Bluestar'-এর গুলিবর্ষণের ফলে ইন্দিরা গান্ধীর নিধন ঘটে) উদ্‌বোধনকালে স্বয়ং গুরু অর্জুন বুঝি তৎকালে সব চেয়ে মান্য সুফী সাধু মিঞা মীরকে প্রধান অতিথি করেছিলেন। থাক্ এসব চিন্তা, ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে অপার শ্রদ্ধাবশেই প্রলুব্ধ হয়েছি এত বেশি কথা টেনে আনতে। কিন্তু একটি লেখায় মোটামুটি পূর্ণ বিবৃতি সম্ভব নয়, তাই এবার শেষ করি। বঙ্কিমকে মুসলমানবিরোধী ভাবা যে বাতুলতা, তিনি যে তেমন ক্ষুদ্রতার বহু ঊর্ধ্বে তা মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ-বিচলিত হবার হেতু ঘটলেও স্থিতধী সমালোচকরা জেনে এসেছেন, আর এ নিয়ে তুচ্ছ খুঁচিয়ে তোলার মতো অপকর্ম আর নেই। মুসলমান চরিত্র চিত্রনে অকিঞ্চিৎকর কিছু বিভ্রম থেকে গেলেও প্রকাশ পেয়েছে বহু উপন্যাসে তাঁর মনের উদার ব্যাপ্তি। অওরংজেব-এর মতো বহুনিন্দিত চরিত্রের মানবীয় দিক ফুটিয়ে তুলেছেন সহজ সুন্দর ভাবে। 'এদেশে মেয়েরাই শুধু মানুষ,' এই মহাবাক্য তিনি একবার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেন। মেয়েদের নামে উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখেছেন—*দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, মৃণালিনী, ইন্দিরা, রজনী,* তাছাড়া *কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ* প্রভৃতিতে মেয়েদের ভূমিকা বিরাট। আফগান মেয়ে আয়েষা হিন্দু রাজপুতের প্রেমে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' উচ্চারণে ভারতবর্ষ অভাবনীয় মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন। নির্মলকুমারী, জেবউন্নিসা, দরিয়া *রাজসিংহ* উপন্যাসের নিষ্প্রভাতকে যেন পরাস্ত করেছে। বঙ্কিম হীরা মেয়েটিকে 'পাগল করে ছেড়েছেন' কিন্তু আহ্‌মদ শরীফের বিচারে সেই হল 'বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রের, সমাজের ও নিয়তির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহিনী।' রোহিনীকে সৃষ্টি করে নীতিবাগীশ বঙ্কিম যতই বিমুখ থাকুন না কেন 'দেশশুদ্ধো লোক তো রোহিনীর পক্ষেই রয়েছে।' 'অসাধারণ প্রেমিক-সপ্রতিভ সুন্দরী নারী শৈবলিনী বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের অতুল্য অবদান। বিনোদিনী-বিমলা-কিরণীময়ী-অচলা-কমল কেউই শৈবলিনীর তুল্য নয়। শৈবলিনীর অরণ্য প্রবেশে গ্রন্থ সমাপ্ত হলে এ চিরকালের একটি নিখুঁত সৃষ্টি হতে পারত। হিন্দু নারীর অতি স্থূল সতীত্ব-গৌরব প্রচারের অপপ্রয়োগ সব পণ্ড করেছে। এই গ্রন্থের দলনীও একটি চিরস্মরণীয় সৃষ্টি শিল্পী বঙ্কিমের এক নিখুঁত মানসকন্যা, এক মুহূর্ত নারী মহিমা।' (আহ্‌মদ শরীফ)। বঙ্কিমের সৃষ্ট বাঙালি তিলোত্তমা ভালোবাসে রাজপুতকে, পিতা বা অভিভাবককে মানেনা। তিলোত্তমা কেবল সুন্দরী নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষিতা। বিমলা তরুণী নয় কিন্তু জাতিনির্দেশ মানেনা। কুন্দনন্দিনীকে বঙ্কিম কুসুমকোমল

করেছেন, তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে-চরিত্র ভ্রমরকে দিয়ে অপদার্থ স্বামীকে এমন চিঠি লিখিয়েছেন, যা অনেক পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' মনে পড়িয়ে দেয়। মনে ভেসে আসে মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা। বঙ্কিমের উপন্যাস সমালোচনা এখানে করছি না, কেবল দেখছি তার সৃষ্টির সাহস বৈচিত্র্য, দূরদর্শিতা যা সমকালীন পরিস্থিতিতে বিস্ময়কর।

'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি নিয়ে বঙ্কিমকে অভিবাদন জানিয়ে পুনর্মুদ্রণে আপত্তির জন্য অভিশাপ দেবার দুর্মতি পরিহার করাই উচিত। দেশের রাজনীতি যেখানে নিবীর্য, সমাজজীবনে মান্ধাতাগন্ধী, মনুবাদী, ভীরু, স্থানু, মস্তিষ্কহীন কর্মশক্তিহীনতার আধিপত্য, সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণে অল্প কিছু লোককে বাদ দিলে 'জীবনধনদীন' অবস্থান যখন প্রায় সকলের, তখন কেমন করে ভাবি যে একজন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম পরিত্রাণ-ঘটিয়ে দেবেন? কারণ বিনা কার্য নেই, আমাদের দুর্দশার হেতু সন্ধানের কাজ তো আজও চলছে। ইতিমধ্যে কৃতজ্ঞ থাকি বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের মতো বেদনাদীর্ণ অথচ উচ্চশির মনীষা ও মানবিকতার মহিমা দেখে। আর একটু জাঁক করে বলি যে 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর আলোক না পেয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় একশো বছর আগে রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন : 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না/এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা' আর শ্রেণীভেদতত্ত্বের ধারণা ধরে বলেন : "করুণাময়ি, কে বলে তোকে দয়াময়ী?/কারও দুগ্ধেতে বাতাসা। আমার এম্‌নি দশা/শাকে অন্ন মেলে কই?/কারো দিলি মা, ধনজন, হস্তী অশ্বরথচয়/মাগো, ওরা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি বুঝি তোর কেউ নই?" একই সঙ্গে ভাবি একেবারে সমাজের দীন বঞ্চিত নিম্নতম স্তর থেকে আসা অনামা কবি 'মোমিন' হয়তো বাউলদর্শনের সুবাদে 'রেনেসাঁস'-এর নামগন্ধ না জেনে লিখলেন : "নানারঙের গাভীরে দেয়/একই বরণ দুধ/জগৎ ভরমিয়া দেখি-একই মায়ের পুত।" এই হৃতদরিদ্র স্বদেশকে বড়ো বেশি ভালোবাসার দাম দিতে হয়েছে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমদেরই।

কত সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে বনিয়াদী কথা বলতেন বঙ্কিম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি উদাহরণ : "Wealth হচ্ছে—গোবরের মতো। এক জায়গায় ডাঁই করলে বেজায় দুর্গন্ধ। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দিলে জমি হবে শস্য শ্যামলা। ছ'জন বিরাট ধনী। আর ষাটলক্ষ না খেয়ে মরে। এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু আছে জগতে?" আজকের দুন্দুভিনিনাদিত 'বিশ্বায়ন'-এর কল্যাণে এই অন্যায়কেই দেখছি আর সইতে বাধ্য হচ্ছি : 'ডুবিয়াই যখন গিয়াছি তখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে?'

কারও নাম 'জপিয়াই' কিছু হবার নয়, 'আগুনের পরশমণি' জগৎ জুড়ে মানুষের প্রাণ স্পর্শ আজ না হোক্ একদিন করবে-ই। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, চলে গেলেন, দোষেগুণে রেখে গেছেন এমন মানবমহিমা যা যে-কোনো কালে বিরল। বাঙালির মনোমুকুরে সেই তেজঃপুঞ্জ অবস্থিতি চিরন্তন হয়ে থাকবে, অন্তত যতদূর ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টি যায়।

বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

‘শের-য়ে-বঙ্গাল’ ফজলুল হক

বাংলার বাঘ-বলতে সচরাচর আমরা বুঝি স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিদ্যাবারিধি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু সর্বভারতীয় সমাবেশে মুসলিম লিগের ১৯৩৭ অধিবেশনে লখ্‌নউ শহরের জনাকীর্ণ মণ্ডপ গম্‌গম্‌ করে উঠেছিল ফজ্‌লুল হকের নাম ‘শের-য়ে-বঙ্গাল’ জয়ধ্বনিতে। এই মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) সুচতুর জিন্নাহ্ সাহেব (তখন লিগের সর্বময় কর্তা) বাছাই করেছিলেন এই ফজ্‌লুল হককে ‘পাকিস্তান’ প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য। দেশভাগের সময় পাকিস্তান গঠন বিষয়ে সেই প্রস্তাব অবশ্য পুরোপুরি মানা হয়নি। কিন্তু তা হল ভিন্ন কথা। তবু ফজলুল হক সাহেবের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ করা যাক তাঁর বহু বিচিত্র বিতর্কিত আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণময় জীবন ও কীর্তি। মুসলিম লিগের উল্লেখ শুনেই যাঁরা প্রকুপ্ত হতে পারেন, তাঁদেরই জানা দরকার যে একটা সময় ছিল আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে, যেমন ১৯১৬ থেকে দশ বছর, যখন কংগ্রেস আর লিগের মধ্যে দূরত্ব ছিল অল্প। ১৯১৬ সালে লখ্‌নউ কংগ্রেসে ‘হিন্দু-মুসলমান চুক্তি’ গৃহীত হয় আর বিপিনচন্দ্র পাল লিগের সভায় ভাষণ দেন। ফজ্‌লুল হক তখনই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত; ১৯১৮ সালে যখন কংগ্রেস ও লিগ উভয়েরই অধিবেশন হয় এলাহাবাদে, তখন হক সাহেব একই সঙ্গে লিগের সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও জনজীবন থেকে ফজ্‌লুল হকের অবস্থান কখনও দূরে থাকেনি।

কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই জন্মবার্ষিকী প্রতিপালন খুবই সঙ্গত এবং আজকের দিনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বায়ত্ত শাসনমূলক আইনের প্রবর্তক, সেই আইন অনুসারে কলকাতার প্রথম নির্বাচিত ‘মেয়র’ হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ‘ডেপুটি’ হলেন হুসেন শহীদ সোহ্‌রাবর্দি (যিনি তখন কংগ্রেসী!)। তখনই কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হলেন তরুণ কর্মী সুভাষচন্দ্র বসু আর সহকারী হিসাবে দেশবন্ধু নিয়ে এলেন নোয়াখালির প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা হাজি আবদুর রশিদকে। যাই হোক দেশবন্ধুর তিরোধানের পর থেকে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী সাধনে কুচক্রীরা নানা বাধা সৃষ্টি করল। যার সুরাহা যথাযথ না হবার মাশুল সুদে আসলে গোটা দেশকে দিতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ফজ্‌লুল হকের মর্যাদা (বহু বিতর্ক সত্ত্বেও) এমন ছিল যে তিনি একবার ‘মেয়র’ নির্বাচিত হলেন। এর উল্লেখ করছি এজন্য যে বাংলায় চিরাচরিত দলাদলির প্রাবল্যে একবার সুভাষচন্দ্রকে ‘মেয়র’ নির্বাচনে (বোধহয় ১৯২৭) রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত এক ‘লিবারল’ বিজয়কুমার বসুর কাছে হারতে হয়েছিল। ফজ্‌লুল হকের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও আর একজন কংগ্রেস-লিগ উভয়েরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেজস্বী মুসলমানকে কলকাতা ‘মেয়র’ পদে বসিয়েছে; তিনি হলেন আবুদর রহমান সিদ্দীকি, অবাঙালি হয়েও কলকাতারই মানুষ।

ফজলুল হকের সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বের চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গ পরিচয় হল তাঁর 'বাঙালিয়ানা', যার অস্তিত্ব বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বোধ হয় বাংলাদেশে বেশি দেখা যায়। সেখানকার প্রখ্যাত বিদ্বান সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ-এর ভাষায় ফজলুল হক ছিলেন "এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা" এবং তাঁর সময়কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মুসলিম নেতা বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।' (দ্রষ্টব্য : "বাংলাদেশ ঃ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, 'ঢাকা ১৯০৩, পৃ. ৬০)। অনেক ঝড়ঝাপ্টা হক সাহেবের জীবনকে বিধ্বস্ত যখন করেছে তখন অতি স্বল্পকাল ঘটনাপ্রবাহে বিরোধী যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হবার সময় (১৯৫৪) সবাই শুনেছে তাঁর সাহসী ঘোষণা (যার মূল্য দিতে হয়েছিল) : "দুই বাংলার বাঙালি চিরকাল এক বাঙালিই থাকবে।" এবম্বিধ বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গে বিরল কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যানুরাগী মহলে আজও শোনা যায়। খুবই আনন্দের কথা হবে যদি অন্তত দুই বাংলায় "শের-য়ে-বঙ্গাল" ফজলুল হকের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী সোৎসাহে প্রতিপালিত হয়।

'স্বদেশী যুগে' যে জেলার গৌরবময় অবদানের জন্য তাকে 'পুণ্যে বিশাল' বলা হয়েছিল পূর্ব বাংলার সেই বরিশাল জেলার গ্রামে সম্পন্ন পরিবারে ফজলুল হক-এর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে আইন ব্যবসায় প্রতিপত্তির ফলে কলকাতায় বসবাস সত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলার গ্রামীণ জীবনের নাড়ি নক্ষত্রের জ্ঞান, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে খোলা মনে দরাজ ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষটি যে দেশের সমসাময়িক জীবনে বড় জায়গা পাবেন, তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। স্বভাবত তেজস্বী ফজলুল হক ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন আর সম্ভবত তাঁরই মতো মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের মনে ইংরেজ শাসনের বিপক্ষে বিক্ষোভ বৃদ্ধির কথা লিগ প্রতিষ্টার পূর্বে আগা খাঁর নেতৃত্বে 'রাজভক্ত' মুসলিম নেতাদের বড়লাট মিন্টোর কাছে পেশ করা বিবৃতিতে বর্ণিত হয়েছিল। যাই হোক হক সাহেব কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করে ১৯১২ সালে সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন। অনতিবিলম্বে এই উপমহাদেশের প্রধান রাজনীতিবিদ্দের মধ্যে স্থান তিনি পান।

এটা মনে রাখা উচিত যে তখনও পর্যন্ত আবদুল রসুলের 'স্বদেশী' যুগের নেতাদের মতো ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী (ইংরেজ শাসনে 'প্রিভি কাউন্সিল'-এর' প্রথম ভারতীয় সদস্য) কিংবা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্-এর (যিনি স্বদেশী আন্দোলনে 'আকৃষ্ট', হবার লক্ষণ দেখাতেই ইংরেজ সরকার বিপুল অর্থ সাহায্য করে মতিগতি বদলিয়ে দেয়) মতো অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির হাতে। এঁরা এদেশবাসী হয়েও অনেকেই 'বাংলাভাষী' ছিলেন না, যা দেখা যায় 'স্যর' আবদুর রহিমের মতো বহু গুণান্বিত মানুষের ক্ষেত্রেও। ফজলুল হক ছিলেন আলাদা জাতের মানুষ, আর কিছু পরিমাণে অস্থিরমতিত্বের জন্য খেসারত দিতে হলেও তিনি আজীবন মাথা উঁচু রেখেই দেশের জীবনে স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। গত একশো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও ভারতীয় জননেতার মধ্যে তাঁর স্থান অকাট্য। নানা অবান্তর কারণে এটা ভুলে যাওয়া হয়

আর এজন্যই তাঁকে স্মরণ করা আজকের দিনে বিশেষভাবে সকলের কর্তব্য।

১৯১৩ সালে তৎকালীন বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতার খ্যাতি তিনি অর্জন করেন। ১৯১৫ সাল থেকে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় সংস্থাকে কাছাকাছি এনে প্রগতিশীল রাজনীতির আসরে হক সাহেবের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯২০-২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে (এবং বিশেষ করে খেলাফৎ সমস্যা বিষয়ে গান্ধীজী মুসলমানকে 'কোল দেবার ফলে) মুসলিম সমাজ বিপুল সাড়া দিলেও ফজলুল হক সেই আন্দোলনে যোগ দেননি 'অসহযোগ' নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে (গান্ধীজীর 'বয়কটের' কারণে) পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের ক্ষতি ভেবেই হয়তো সেদিনের উন্মাদনা থেকে তিনি দূরে ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রগামী পরিচয় তাঁর ছিল। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে আইনসভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের নীতি প্রয়োগ করে বাংলার মুসলমানদের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে 'বেঙ্গল প্যাক্ট্' নামে এক চুক্তি সম্পাদন করেন আইনসভা ইত্যাদিতে এবং সরকারি কর্মস্থানে মুসলমানের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে বাস্তবিকই তখন মুসমানদের চিত্ত জয় করেছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেসে অনেকের বিরোধিতাকে পরাস্ত করেও তিনি ১৯২৩ সালের শেষ দিকে কোকোনাদা কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট্'-এর সমর্থন সংগ্রহ করতে পারলেন না। গোটা দেশের জন্য একটি অনুরূপ চুক্তি প্রণয়নের অজুহাতে 'বেঙ্গল প্যাক্ট্' শিকেয় উঠল। নাম-কা-ওয়াস্তে সর্বভারতীয় চুক্তির ভার দেওয়া হল লালা লাজপত রায় ও ডাক্তার আন্সারির হাতে, যদিও সবাই জানত যে দুজনের মতভেদ এত বেশি যে সবকিছু ভেস্তে যাবে, আর তাই হল।

ফজলুল হকের মতো প্রায় সবাই তখন উদ্গ্রীব হয়ে দেশবন্ধুর সাফল্য চাইলেও দেশের দুর্ভাগ্য যে এভাবে বাংলায় হিন্দু মুসলিম মৈত্রী দেদীপ্যমান হয়ে উঠে গোটা দেশকে নতুন রাস্তার দিশারি হতে পারল না। হিন্দু জমিদার ও তাদের সহায়ক শ্রেণী কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটল। দেশবন্ধুর মোহনীয় নেতৃত্বও ব্যর্থ হল। 'জমি যার, লাঙ্গল তার' বলে আওয়াজ তখনও জোরদার হয়নি। কিন্তু বাংলার চাষী (যারা দেশের মেরুদণ্ড আর যাদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগুরু) দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলল। আরম্ভ হল এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথে বাধার পর বাধা। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার স্বরাজ্য পার্টি 'বেঙ্গল প্যাক্ট্' বাতিল করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপুলভাবে ব্যাহত হল, আর স্বীকার না করে উপায় নেই যে ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষেরই বহু দুর্বলতা প্রকাশ হতে থাকার পরিণামে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে খণ্ডিত করার অভিশাপ মাথা পেতে নিতে সবাই বাধ্য হলাম।

ফজলুল হকের মতো মানুষকে দেখলাম ১৯২৯ সালে নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টি নামে নতুন দল গঠন করতে। তাঁকে দেখা গেল 'নবযুগ'-এর মতো সংবাদপত্র পরিচালনা করতে, যেখানে মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিরল বিপ্লবী স্থান পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যে বহু সংখ্যক বাঙালি মুসলমানকে রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা

যায়, তাঁরা অনেকে কৃষক প্রজা পার্টির দিকে আকৃষ্ট হলেন। বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত অথচ বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, জনসেবায় আগ্রহী এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গুণসম্পন্ন হুমায়ুন কবিরের মতো মানুষকে এঁদের মধ্যে ধরা যায়। আমার মনে হয় যে বর্তমানে ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের অবস্থানে যে অদ্ভুত নিষ্প্রভতা দেখা দিয়েছে, সে তুলনায় প্রাক্ স্বাধীনতা অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। খুঁটিনাটি বাদ দিয়েই বলি যে পূর্বেকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন 'স্যর' সৈয়দ শামসুল হুদা, যিনি ছিলেন প্রমুখ কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের আইন ব্যবসায়কালে তাঁর 'সিনিয়র' ('Senior'), এবং তাঁরই বাড়িতে (নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও) বাস করার অভিজ্ঞতা জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করে বহু গুণকীর্তন করেছেন। মনে পড়ছে 'স্যর' আজিজুল হক-এর কথা তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ হয়েছেন, বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য পদ অলংকৃত করেছেন আর আজকের রাজনৈতিক জগতে চিন্তাহীনতার আবহাওয়াতেও ভরসা করি বিস্মৃত হবেন না অন্তত তাঁর লেখা (১৯৩৭/৩৮ সালে প্রকাশিত) 'The Man Behind the Plough' গ্রন্থের জন্য। আমার ব্যক্তিগত দুঃখ এই যে ফজলুল হক মুসলিম লিগে একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে একটা অদ্ভুত অবস্থানে ছিলেন বলেই হয়তো স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলায় মুসলিম লিগের সম্পাদক, চিন্তাশীল বিবেকবান সদাচারী আবুল হাশিমের সঙ্গে স্বচ্ছ মনে একযোগে কাজ করতে পারেন নি। এবং ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ; হক সাহেবের মধ্যে একটা অশান্ত অস্থিরতা; নীতি নির্ধারণে শৈথিল্য, দরাজ চরিত্রের মানুষ হয়েও কৌশলীদের হাতে পড়ে ভুল পথে যাবার প্রবণতা ছিল (সঙ্গে সঙ্গে মামুলি রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকার মানসিক সঙ্গতি সত্ত্বেও)। যা হাশিম সাহেবের মতো স্বভাবত সত্যসন্ধ জনসেবকের মানসিকতার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। এটাই দেখা গিয়েছিল যখন শরৎ বসুর সঙ্গে মিলে হাশিম সাহেব (এবং কতকটা হুসেন সোহরাবর্দিও) ভারত বিখণ্ডীকরণ সত্ত্বেও বাংলাকে অটুট রাখার যে অতি বিলম্বিত প্রচেষ্টায় নামলেন। হক সাহেবের মানসিক সাযুজ্য ছিল সেই প্রয়াসে, কিন্তু তা কার্যকরী হল না। এর বহু কারণ আছে, যা হয়নি তা নিয়ে হা হুতাশ বৃথা, তাছাড়া সেদিনের অগ্নিগর্ভ আবহাওয়ায় আর পাঁচ শতাধিক 'নেটিভ' রাজ্যে গণ্ডগোলের ভয় এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল সামলে ওঠা লড়াই বিনা সম্ভব ছিল না। সে লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেস তৈরি ছিল না, ইচ্ছুক ছিল না। আমরা বামপন্থী বলে এ নিয়ে বড়াই করার অধিকারী নই; আমরাও দেশ বিভাগের যে অভিশাপ তাকে ঠেকোবার কাছে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারিনি; এর 'দায়ভাগে' আমরাও 'অংশীদার।'

মোটামুটিভাবে ফজলুল হকের সমসাময়িক এবং কতকটা তুলনীয় কয়েকজন মুসলিম নেতার কথা মনে পড়ছে। স্মৃতির উপর নির্ভর করে দ্রুত লিখে চলেছি। তাই বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না, ভুল ভ্রান্তিও থেকে যাবে। প্রথমে মনে আসছে আমার বিশেষ সম্মানীয় বন্ধু নওশের অলী সাহেবের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভাবি শাম্‌সুদ্দিন আহ্‌মদ, সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশ্‌মি (প্রায় পঙ্গু হয়েও বেশ কিছুকাল ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি স্পীকার), তরুণতর 'লালা মিঞা' প্রমুখ স্মরণীয় সাংসদের কথা। মনে পড়ছে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার অনুযায়ী ১৯৩৭-এর

নির্বাচনে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি প্রভূত সাফল্য পাবার পর তিনি হাইকোর্টে বার লাইব্রেরিতে এলেন আর শরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং উঠে এসে আলিঙ্গন করেন, সবাই উল্লসি হয়ে দেখল। অনেকেরই আশা ছিল যে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে হক সাহেব মন্ত্রিসভা গড়বে কিন্তু তা হল না। কংগ্রেসেরই অনীহা এর মূল কারণ, আর শীঘ্রই দেখা গেল বাংলার কংগ্রে নেতৃত্বের প্রায় অটল কৃষক স্বার্থবিরোধী মনোভাব। Bengal Agricultural Debtors Act এর মতো আইনেও জমিদার মহাজনদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত কংগ্রেসের সায় ছিল না; বাংলা মেহনতী জনতার মধ্যে এভাবে এমন এক বিকট ব্যবধানের বীজ বপন করা হয়েছিল (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো নেতা থাকা সত্ত্বেও) যে তারই কুফল ফুটে উঠল বাংলা আর পাঞ্জাবে (উভয় প্রদেশেই মুসলিম লিগ বেশ কিছুকাল দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আর দেশবিভাগের সাজা আমাদের মাথায় বাজের মতো পড়ে স্বাধীনতার আনন্দ আ উদ্দীপনাকেই ডুবিয়ে দিতে পারল।

একধরনের অদ্ভুত অস্থিরমতিত্ব সত্ত্বেও ফজলুল হকের তেজস্বী আত্মবিশ্বাস আজীব তাঁকে এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে হৃদয়বত্তা ও আবেগপ্রবণত ভুল পথে ঠেলে দিলেও তিনি কখনও নিজস্ব স্বকীয়তা হারাননি। মুসলিম লিগে থেকেছেন আবার থাকেননি, লিগের ১৯৪০ লাহোর অধিবেশনে তিনিই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের ভা পান (যদিও 'পাকিস্তান' বিষয়ে সেদিনের পরিকল্পনা পরে বিকৃত হয়ে যায়), অথচ জিন্নাহ্-এর অবাধ একনায়কত্ব মানতে পারলেন না বলে তার পূর্ণ আস্থা পেলেন না। দেশ ভাগের প স্বভূমি বরিশালে গিয়েও চুপচাপ থাকেনি। জিন্নাহ্-এর মৃত্যু আর লিয়াকত আলী খানে হত্যাকাণ্ডের পর দেশকে বাঁচানোর জন্য মওলানা ভাসানি প্রমুখকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়লে আর লিগকে হারিয়ে মুখমন্ত্রী হলেন ১৯৫৪ সালে। তখনই উর্দু ভাষা বাংলার ওপর চাপাবা বিরাট লড়াইয়ের সূচনা আর সেজন্যই কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার হক সাহেবের মুখ্যমন্ত্রি খারিজ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে তৎকালীন স্বৈরশাসন ফজলুল হক কিম্বা আবুল হাশিমে মতো মানুষকে সহ্য করতে পারল না, কিন্তু ওদেরই অলক্ষ্য প্রভাবে গড়ে উঠেছিল এম পরিস্থিতি যা ঘটাল বাংলাদেশের 'তিমিরবিদার-উদার-অভ্যুদয়', দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও যা এই উপমহাদেশে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা নির্মাণ করল।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে (তখন বলা হত 'প্রধানমন্ত্রী') ফজলুল হক নানাদিক থেকে ব্যর্থ মনোরথ হলেও এমন স্পষ্টবাদিতা ও সাহস দেখিয়েছিলে যা আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। খুব সংক্ষেপে এখানে জানাই ২ আগস্ট ১৯৪ তারিখে আভিজাত্যগর্ব জবরদস্ত লাট Sir John Herbert-এর ঔদ্ধত্যের জবাবে হক সাহেবে চিঠির কথা। সরকারি কাজে লাটসাহেবের হস্তক্ষেপ মানতে পারবেন না বলেছিলেন অকুণ্ঠে উচ্চস্বরে। 'যুদ্ধের প্রয়োজনে' বাংলার জনজীবনে দুঃখ দুর্দশা বিকটভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে তাঁর প্রতিবাদ। দেশজুড়ে অসন্তোষের আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছিল, আর তারই প্রতিধ্বনি হক সাহেবের চিঠিতে : "As the head of the Cabinet I cannot possibly allow thi attitude on your part to go unchallenged...I have detected your personal inter-

ference in alomost every matter of administrative detail. You sould allow Provincial Autonomy to function honestly rather than as a cloak for autocratic powers as if the province was being governed under section 93 of the Act" অনুবাদের দরকার নেই কিন্তু ভদ্র, সংসদীয় নীতিসঙ্গত ভাষায় এমন চপেটাঘাতে অহঙ্কারী শ্বেতাঙ্গ লাটসাহেবের গণ্ডদেশ যে রক্তিম হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। হক সাহেবকে এর মূল্যও দিতে হয়েছিল, তাঁকে অনতিবিলম্বে হটতেও হয়েছিল। কিন্তু পরাধীনতার যুগে এ ধরনের সৎ সাহস দেখাবার মতো মানুষ উচ্চপদস্থদের মধ্যে একান্ত বিরল।

এরই সঙ্গে মনে পড়ছে স্বাধীনতাপূর্ব যুগেই ২৯ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ (speaker) সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের অবিস্মরণীয় উক্তি যা এ দেশের সংসদীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় পরাজিত সরকারকে বাঁচাবার যে চেষ্টা লাটসাহেব তখন করেন, তাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি অকুতোভয় ঘোষণা করেন : "The Ministry is the creature of the House; The House can make or unmake The Ministry and **the Governor is but the registering authority of the decision of the House**"। দেশ যখন পরাধীন, যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি যখন কঠোর, তখন এই উচ্চারণ বাস্তবিকই দেশের মানুষকে বুকে বল এনেছিল। এই 'নির্দেশ' ছিল বলে স্বাধীনতা পরবর্তী বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের অনধিকার চর্চাকে বাধা দেবার নৈতিক সঙ্গতি পেয়েছিলেন। ফজলুল হককে স্মরণ করার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই শ্রদ্ধেয় বন্ধু নওশের আলী সাহেবকেও অভিবাদন জানাই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। তবুও অবশেষে আমার মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে চেয়েই একটি কথা জানাতে চাই। ফজলুল হকের মতো দেশব্রতী বাঙালির কথা আজকের ভারত রাষ্ট্রে এবং বামপন্থী শাসন পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমানদের কেমন যেন সংকুচিত ও এখনও মূলত বঞ্চিত অবস্থান দেখে কষ্ট হয় আর ভয় হয় যে এখানে (বিশেষত বি জে পি কেন্দ্রে বহাল হাওয়ার ফলে) কার্যত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' মুখোশ ছিঁড়ে গিয়ে 'হিন্দুত্ববাদে'-রই আধিপত্য যেন চলেছে। বিরল আনন্দ পেয়েছিলাম যখন বছর খানেক আগে কলকাতা কর্পোরেশন সংবর্ধনা জানায় পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছেলে, অর্ধ পঙ্গু অবস্থায় দুটি কাঠের পা নিয়ে যে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পার হয়েছে সেই মসূদুর রহমানকে। তার এই চমকপ্রদ সাফল্যে যেন দেখেছিলাম মুসলিম জনসাধারণেরই অগ্রগতির সূচনা। কিন্তু তারা এখনও অনেক পিছিয়ে; পাঁচজন বাঙালির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একজন মুসলমান হলেও জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারা যেন পশ্চাদপদ। এর সংশোধন কেমন করে হবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু কেন এমন হতে থাকবে? সবাই যথেষ্ট ভাবিত হচ্ছি বলে তো মনে হয় না।

আসন সংরক্ষণ সমস্যার সমাধান নয় জানি, কিন্তু এটা কি চিন্তার বিষয় নয় যে ১৯৯৬ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন মাত্র ২১ জন মুসলমান? ১৯৫৭ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন মাত্র ১৯ জন মুসলমান; ১৯৬২ সালে ২০; ১৯৬৭ সালে ২৮; ১৯৭১ সালে ২৪; ১৯৭৭ সালে ৩১; ১৯৮৪ সালে ৪৪; ১৯৮৯ সালে ২৭; ১৯৯১ সালে ২৫। 'টেলিগ্রাফ'

দৈনিকে ৭ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে একটি প্রবন্ধে দেখি যে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রাজস্থান আর তামিলনাড়ুসহ কুড়িটি রাজ্য থেকে একজন মুসলমানও জেতেননি। এটা ঘটেছে যদিও সারা দেশে শতকরা বারো হল তাদের জনসংখ্যা। শুধু মুসলিম নয়, এভাবে বঞ্চিত তফসিলি জাতি উপজাতির কম বেশি পরিমাণে 'দলিত' যারা। সরকারি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় মুসলিম অনুপাত হল ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে শতকরা মাত্র দুই; ডাক্তারদের মধ্যে তার শতকরা ২.৫; 'আই-এ-এস' শতকরা ২.৮৫; আই পি এস, শতকরা ২; ইনকাম ট্যাক্স অফিসার শতকরা ৩.০১, ক্লাস ওয়ান অফিসার শতকরা ৩.৩; ব্যাঙ্ক কর্মচারী শতকরা ২.৮। ব্যক্তিগত মালিকানায় এর চেয়ে একটু ভালো অবস্থা : শতকরা প্রায় চার। এটাই কি চলবে?

পশ্চিমবাংলায় লেখাপড়ায় মুসলিম ও অন্যান্য বঞ্চিতরা যে ক্রমাগত পিছিয়েই রয়েছে এটা কি ঠিক? আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বার হবার সময় বছরের পর বছর দেখে আসছি যে প্রথম পঞ্চাশ কি একশো সফল প্রার্থীরা প্রায় সকলে বর্ণ হিন্দু—মুসলমান ও হিন্দুদের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর দু'একজন ছিটকে-ছাটকে থাকতে পারেন। ভারি খারাপ লাগে যখন দেখি সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতিদের সম্মেলনে বাঙালি মুসলিম উপস্থিতি একেবারে অত্যন্ত কম। বাংলা আকাদেমির দুটি প্রধান কমিটিতে ৭০/৭২ জনের মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম।

রবীন্দ্র জন্মপক্ষ উপলক্ষে উৎসবে বাংলা আকাদেমি আমন্ত্রণ (১-৫-৯৮) করলেন দুদিনব্যাপী উৎসবে চল্লিশজন গুণীকে, যাদের মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান আর বাকি সবাই বর্ণ হিন্দু শুধু নয়, 'দ্বিজ'। ১৪ মে ১৯৯৮ তারিখে আকাদেমি কবি সম্মেলন ডাকলেন ৪১ জনকে যারা সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দু! পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ 'কমিটি' নিয়োগ করলেন (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)। যার সভ্য সংখ্যা বত্রিশ, যার মধ্যে একমাত্র মুসলমান হলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ পদাধিকারী হাশিম আব্দুল হালীম। হাতের কাছে কাগজটা নেই কিন্তু মনে পড়ছে যে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গানের বিরাট আসরে হয়তো বাংলাদেশ থেকে নিমন্ত্রিত দু-একজন থাকলেও পশ্চিমবাংলায় মুসলমান একজন নেই। হয়তো—হয়তো কেন, এটাই 'বাস্তব'—কিন্তু কী ভয়ঙ্কর বাস্তব! এর সঙ্গে কত কথাই জড়িত রয়েছে যা কি আমাদের যন্ত্রণা দেয় না?

ঐতিহাসিক কারণেই গান্ধী কথিত 'heart unity' ('ছাতি সে ছাতি মিলানা') আজও ঘটেনি। এর আভাস দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তো কতবার সবাইকে ডাক দিয়ে গেছেন, কিন্তু (আজ, যখন লিখছি ৫ ডিসেম্বর, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের স্মৃতি মনে রেখে) জোর করে আশা করতে চাইছি রবীন্দ্রনাথ কথিত 'মহাভারতবর্ষে' একদিন আমরা সবাই বাস করব—ফজলুল হকের মতো দোষে গুণে ভরা অথচ বৃহৎ ও মহৎ মানুষকে এ জন্যই স্মরণ করছি, অভিবাদন জানাচ্ছি।

'পুরশ্রী' ফজলুল্ হক্ বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১০

ফিরে দেখা, সামনে তাকানো

সতত সঞ্চারমাণ এই সীমাহীন বিশ্বে অতি ক্ষুদ্র অথচ মনোহর এক গ্রহে মানুষের বাস। কাল নিরবধি, তার আদি অন্ত নেই। নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান এক নদীর মতো তার অবারিত গতি। কোথাও কোনো ছেদ সেখানে নেই। প্রকৃতির পরিচয় মানুষকে নিতে হয়েছে আর তার বিধান জানার প্রয়োজন ঘটেছে নিছক অস্তিত্বের তাগিদে আর দৈনন্দিন কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। জীবজগতে মানুষই তার চেতনা আর ক্রমশ আয়ত্ত কর্মকৌশলের কল্যাণে অর্জন করেছে জ্ঞান, যে-জ্ঞানই হ'ল শক্তি, প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে তার নিয়ত প্রয়াসের ভিত্তিভূমি। এই মানুষ "নিরবধি কাল"-কে ভাগ করেছে নিজের জীবনের প্রয়োজনে, 'মিল্লিসেকেন্ড' থেকে 'মিলেনিয়ম'-এর ধারণা উদ্ভাবন করেছে।

পৃথিবীর নিত্য বিঘূর্ণন-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন বদলায়, আসে সপ্তাহ আর মাস আর বর্ষের পর বর্ষ। এবার কোনো কোনো বিদ্বানের গাণিতিক আপত্তি সত্ত্বেও আসছে শুধু যে নববর্ষ তাই নয়, নব শতাব্দী আর নব সহস্রাব্দ। স্বভাবতই বহু অনুষ্ঠান হবে, বিত্তবানদের বিবিধ বিলাসব্যসনের ব্যবস্থা ঘটবে, নব সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যোদয় দেখতে আন্দামান বা অরুণাচলে যাবার জন্যে আকুলতা অনেকের মনে আসবে। সচরাচর নববর্ষ উপলক্ষেই বিত্তবানদের নানা উৎসবে মেতে উঠতে দেখা যায়; এবার তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবারই সম্ভাবনা। যারা নির্বিত্ত, যে মেহনতী মানুষ 'দিন আনে দিন খায়', গতর খাটিয়ে কোনোক্রমে জীবনের সংস্থান করে, তাদের কাছে বর্ষারম্ভ বা বর্ষশেষ নিয়ে আমোদপ্রমোদ হৈ-হল্লার প্রশ্নই ওঠে না, তবে সবাই দেখে এধরনের উপলক্ষে সমাজের আর এক চেহারা। এর একটা কল্যাণকর দিকও আছে। "নব বরষেথে করিলাম পণ/লব স্বদেশের দীক্ষা"—বাংলার 'স্বদেশী' যুগে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন। আজ শতাব্দী ও নব সহস্রাব্দের সূচনাকালে যারাই পারি তারা যেন সংকল্প গ্রহণ করি এমন কাজ সবাই মিলে করতে চাই যাতে দেশ আর দুনিয়া এগিয়ে চলবে। "সকল জন সুখী হোক", "সবাই সর্বত্র যেন আনন্দ করতে পারে", এধরনের সুপ্রাচীন মানবমন্ত্র যেন সার্থক হয়।

পরাধীন যখন আমরা ছিলাম, তখন আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে কবিকণ্ঠে শোনা গিয়েছিল : "পরো দীপমালা নগরে নগরে/তুমি যে তিমিরে তুমি সে-ই তিমিরে।" এই সহস্রাব্দকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জগৎ জুড়ে অসংখ্য আনন্দ অনুষ্ঠান হবে, আলোকমালায় শহর সাজানো হবে, কিন্তু ভুলি কেমন করে যে বাস্তবিকই দুনিয়ার দুর্দশা বিশেষত সম্প্রতি আরও ঘনিয়ে এসেছে। সমাজবাদ-সাম্যবাদ নানা কারণে আপাতত রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ার অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিকরূপে শুধু এদেশের নয় গোটা দুনিয়া জুড়ে নৈতিকতার অবক্ষয় বেড়ে চলেছে, রাজনীতি অর্থনীতি কেবল নয়, জীবনের সর্ববিধ স্তরে সুনীতির অন্তর্ধান দেখা দিয়েছে। স্বার্থ সাধনের মোহে নতুন প্রজন্ম যেন মজে যাবার উপক্রম ঘটেছে আর আদর্শ আবেগ-অনুপ্রেরণা প্রত্যয় নিষ্ঠা উদ্দীপনা সবই বুঝি হারিয়ে যেতে চলেছে। ঘনায়মান অন্ধকারে অন্তত

কিছু সুলক্ষণ যে নানা দেশে দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু এখন বুঝি দুর্লক্ষণগুলো অনেক বেশি। আজ যখন লিখছি তখন খবরের কাগজে দেখি যে, এশিয়ার বুকে সাম্রাজ্য শক্তির শেষ ঘাঁটি ম্যাকাও পর্তুগীজ অধিকার থেকে স্বভূমি চীনে ফিরে গেছে। কিন্তু তাইওয়ান এখনও কার্যত সাম্রাজ্যশক্তিরই অন্তর্গত, পশ্চিম এশিয়ায় কুর্দ-দের দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এখনও রয়েছে পরপদানত জনপদ। তাছাড়া সাম্যাবদী শক্তি পিছিয়ে পড়ার ফলে তারই স্বাভাবিক মিত্র যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম তা ব্যাহত হয়েছে। দুনিয়া জুড়ে আমাদের মতো কত সদ্যস্বাধীন দেশ অর্থনৈতিক চাপে বিত্তবান কয়েকটি দেশের সঙ্গে নতুন এক "Subsidiary Alliance"-এ আটক পড়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে, প্রকৃত গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ মিলছে না। আশির দশক থেকে আগের চেয়ে নির্লজ্জ ও স্পষ্টভাবে 'প্রতিবিপ্লবী' শক্তি মাথা তুলে এখন দাপিয়ে চলছে।

আমাদের বুকে ধাক্কাটা বেশি লেগেছে কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে প্রত্যাশা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিস্ত শক্তি সুকৌশলী গণতন্ত্রের মুখোশ পরা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় প্রচণ্ড বলশালী হয়ে সোভিয়েতকে নিঃশেষ নির্মূল করার জন্য ইতিহাসে তুলনাহীন রক্তক্ষয়ী যে আক্রমণ করেছিল (১৯৪১) তা সোভিয়েট পরাক্রমের প্রত্যাঘাতে ১৯৪৫ সালে বিধ্বস্ত হ'ল। প্রায় সেই বিজয় মুহূর্তে আমেরিকা সন্ধান পেয়েছিল আণবিক বোমার মতো সর্বনাশী যুদ্ধাস্ত্র আর সেই ভরসায় ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুমান্ আর ব্রিটেনের দুর্দান্ত নায়ক উন্‌স্টন্ চার্চিল মিলিতভাবে চালাতে চান "শীতল যুদ্ধ" ("Cold War") যা সোভিয়েতের ধ্বংসসাধন বিনা ক্ষান্ত হবে না বলে দুর্ধর্ষ ঘোষণা দুনিয়া শুনেছিল ("Truman Doctrine") ইত্যাদি। "সে ভয়ে কম্পিত" হয়নি সোভিয়েতের হৃদয়। কারণ দুনিয়া এগিয়ে চলেছিল দুর্জয় বেগে। তখনই দেখা দিল সমাজবাদের সঙ্গে সর্বদেশে মুক্তিসংগ্রামের নিবিড় সম্পর্ক আর বহু পরাধীন দেশের স্বাধীনতা। ১৯৪৯ সালে ঘটনা ঘটল মহাচীনের বিপুল বিপ্লব যা ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরিপূরকরূপে সর্বত্র নন্দিত হলো। পাঁচ হাজার বছর ধরে আমাদের এই প্রতিবেশী দেশের রূপান্তর ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে আলোড়িত করলো। চীনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝা যায় ১৯৫০ সালে স্তালিনের একটা মন্তব্য থেকে। তখন মস্কোতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলকে তিনি বলেন, সোভিয়েতকে 'গুরু' ভেবে পিছিয়ে থেকো না, 'শিষ্য-এর কর্তব্য হলো গুরুর কৃতিত্ব ছাপিয়ে যাওয়া। হয়তো স্তালিনের মনে জাজ্জ্বল্যমান হয়েছিল লেনিনের কথা যে সোভিয়েত, চীন আর ভারতবর্ষ মিলে তো জগতের অধিকাংশ, সেই মিলনই দুনিয়ার চেহারা বদলে দেবে। এসব কথা আজ আকাশকুসুমের মতো শোনালেও অগ্রাহ্য করার নয়। যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে জগতের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজবাদী (বা কাছাকাছি ধরনের) রাষ্ট্রের দেখা পাওয়া গেল। "আসিবে, সেদিন আসিবে" ধরনের প্রত্যাশা আমাদের মনে পুঁতে যেতে শুরু করলো।

বহু কারণ মিলে ধনতন্ত্রের গ্লানি আর অমানবিকতা শুধু নয় সমাজবাদের তুলনায় ধনসম্পদ ঢের বেশি অগ্রসর হয়েও বাস্তব বিচারে তার ব্যর্থতা জাহির হতে থাকল বলে

সেই প্রত্যাশা আরও বাড়ল। এটা এত দূর গিয়েছিল যে বিখ্যাত "লেবর মন্থলি" পত্রিকায় আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক রজনী পাল্‌মে দত্ত ষাটের দশকের শেষদিকে লিখতে পারলেন যে ১৮১৮ সালে মার্কস-এর জন্মের একশো বছর পরে ১৯১৭ সালে যেমন সোভিয়েত বিপ্লবের জোরে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ ধনিক কর্তৃত্বের শিকল ছিঁড়েছিল, তেমনই ভাবলে বাতুলতা হবে না যে, ১৮৮৩ সালে মার্কস-এর মৃত্যুর একশো বছর পরে হয়তো পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণে আসবে। আমার বেশ মনে আছে যে সত্তরের দশকে 'স্টেটসম্যান' কাগজে বিখ্যাত সাংবাদিক Russell Warren Howe মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন যে ভবিষ্যতের যে আভাস মিলছে তা থেকে অনুমান হয় যে দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ অংশে সমাজবাদের দ্রুত বিস্তৃতি একেবারে অসম্ভব নয়। আরও অনেকে কথা বলা যায়, কিন্তু আমরা যেন ভুলে গিয়েছিলাম আমাদেরই অজস্র দুর্বলতার কথা। বুঝতে পারিনি পরিস্থিতির জটিলতা, সস্তায় কিস্তিমাতের সহজ স্বপ্নে একটু নিজেদেরই ভুলেছিলাম, ধনতন্ত্রের বহুকাল ধরে সঞ্চিত শক্তিকে যেন উড়িয়ে দেওয়া যাবে ভেবেছিলাম আর অন্তত আশা করেছিলাম যে হয়তো বিপ্লবের ধ্বনি তুলে বিরাট সমাবেশ ('rally') ঘটিয়ে আস্তে আস্তে শত্রুদমন করতে পারব এবং তাই প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যে সংগঠন ও সংগ্রাম শক্তিকে সর্বতোভাবে সংহত করার কাজে 'ঢিলে' দিলাম। কিন্তু ইতিহাসই তো শেখায় যা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : "চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না"। এ ধরনের ভুল শুধু এ দেশে নয়, তা ঘটেছে জগৎ জুড়ে। সোভিয়েত পার্টির (যা ছিল সকলের চোখে 'আদর্শ') অধঃপাত এমনই ঘটেছিল (যা দেখেও হয়তো সে দেশে সবাই দেখেনি) যে ইয়েলৎসিন-এর মতো 'দুর্বৃত্ত' (কথাটা ইচ্ছাপূর্বকই ব্যবহার করছি) আশির দশকের গোড়ায় পার্টির সর্বোচ্চ কমিটিতে স্থান পেতে পেরেছিল। গরবাচ্যভ, যাকে 'প্রতিবিপ্লব'-এর 'পালের গোদা' বলা যায়, তার বেলায় তবু বোঝা যায়। কারণ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সে এগিয়েছিল, কেবলই গড় গড় করে 'তত্ত্ব কথা' বলে যাওয়া আর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তার ছিল, কমিউনিস্ট 'ছদ্মবেশ'। নিখুঁতভাবে পরতে সে জানত, আর সেজন্যেই ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ধ্বংসের পরিকল্পনা চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে "Socialism, More Socialism, Always Socialism" আওয়াজ ('শ্লোগান') অসংকোচে তুলে দুনিয়ার অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভাঁওতা' দিতে পেরেছিল (সৌভাগ্যক্রমে এদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি একটু বিচলিত হয়ে পড়লেও গরবাচ্যভী ফাঁদে অন্যান্যদের মতো পা দিয়ে বসেনি)। গরবাচ্যভ-এর এই জঘন্য ভূমিকা ('প্রতিবিপ্লব' হল এমন এক বস্তু যাকে 'জঘন্য' ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ দিতে পারি না) আবার যেন চোখে আঙুল দিয়ে ইতিহাস দেখাল যখন, এই সেদিন, ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর বার্লিনের 'প্রাচীর' (যেখানে ছিল তার পাশে দাঁড়িয়ে গরবাচ্যভ হাস্যমুখে জার্মান নেতা হেমলুট কহল্‌ আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন-এর পাশে দাঁড়িয়ে বলাবলি করতে থাকল কেমনভাবে একসঙ্গে বহু বৎসর ধরে চক্রান্ত চালিয়ে 'জি-ডি-আর'কে (জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক) নির্মূল করা হয়েছিল। অনেকেরই মনে পড়বে যে ১৯৮৯ সালের ৯ অক্টোবর জি-ডি-আর রাষ্ট্রের চল্লিশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গরবাচ্যভ সেখানকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে

অচ্ছেদ্য বন্ধুতার কথা সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন যদিও ভিতরে ভিতরে পশ্চিমী শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য ইউরোপে সর্বত্র বহুকাল ধরে কুখ্যাত হলেও আজও বিদ্যমান এবং বহুস্থলে বর্ধিষ্ণু 'সোশাল ডেমোক্রোসি'র সহায়তায় সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে সংলগ্ন দেশগুলির সমাজবাদী কর্তৃত্বকে ধূলিসাৎ করার আয়োজন তৈরি করা হয়েছিল। 'দেরিতে বোঝা'র মাশুল আমাদের জগৎজোড়া আন্দোলনকে দিতেই হবে এবং হয়েছে—এটা ইতিহাসের কাছে আমাদের ঋণ। সোভিয়েত থেকে শুরু করে সব দেশের পার্টিকেই এই দায়ভাগ বহন করতে হবে।

অজস্র কথা মনে আসছে বলে ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারছি না। ১৯৮৭ সালে মস্কোতে সোভিয়েত বিপ্লবের সপ্তরতম বার্ষিকীতে যেতে পেরেছিলাম এবং অনেক কিছু দেখেছিলাম বলেই আমার এত যন্ত্রণা, এত বিড়ম্বনা। মনে পড়ছে প্রথম দিনে ফিদেল কাস্ত্রোর অনুপস্থিতি দ্বিতীয়দিনে গোমড়া মুখে (যা তার পক্ষে অস্বাভাবিক) কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান ও অতিসংক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ ভাষণ। মনে পড়ছে কতকগুলো পশ্চিম দেশের কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতায় গরবাচ্যভের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যেজন্য আফগানিস্তানর নজীবুল্লাহ-এর (যাকে কাবুলে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়) বক্তৃতায় উৎফুল্ল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আমার একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা। মনে পড়ছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট বাসিন্দারা মস্কোতে পার্টির কংগ্রেসকালে 'নিউএজ'-এর সংবাদদাতার (মসুদ আলি খান) ঘরে দেড়ঘণ্টা ধরে আমার মতো নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির গরবাচ্যভ-ভাষণে-অত্যন্ত ক্লিষ্ট হবার বর্ণনা দেবার অভিজ্ঞতা। (সেটা টেপ করা হয়, কিন্তু পাবো কোথায়?)। মনে পড়ছে পার্টিসভা চলাকালেই একবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা অলিভার টাম্বোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার মনোবেদনা জানাবার পর তার জবাব, যা আজও আমার কানে বাজছে : "Comrade, we have to live with all this!" ঠিক যেমন কঠিন ব্যাধি শরীরে লুকিয়ে রেখে মানুষকে অনেকসময় বেঁচে থাকতে হয় তেমনই জগৎজোড়া এই ব্যাধি—বিপ্লবভীরুতা, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে—একে নিয়েই সমাজকে বাঁচতে হবে, কিন্তু এ ব্যাধি এমন যে মানুষের মনুষ্যত্ব যতদিন আছে ততদিন কিছুতেই একে পুষে রাখা বা আমল দেওয়া চলবে না। এ ব্যাধি সারাবার দাওয়াই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনেরাই দিয়ে গেছেন, যার আমোঘ শক্তি বিষয়ে আশাকরি আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে যায়নি।

রাহুগ্রাস থেকে সমাজবাদ-সাম্যবাদের মুক্তি যে কবে ঘটবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চাই না। যদি প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যয়কে সমাদর করি এবং আন্তরিকভাবেই সে প্রত্যয় গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আজকের দুর্দিনে (যা নানা দেশে, রাশিয়া সমেত, কিছু সুলক্ষণ সত্ত্বেও) সেই প্রত্যয়কে প্রাণ দেবার চেষ্টায় বিরত হলে চলবে না। 'তাৎক্ষণিক' ('instant') বিপ্লবে বিশ্বাসীরা ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু ইতিহাসকে চালাবে যে মানুষের প্রচেষ্টা সেই মানুষ যদি সত্যই 'তৈয়ার' না হয় আর সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ চাওয়া মাত্র যদি না মেলে তো আশাভঙ্গ ঘটবেই। যদি না তৈরি থাকি বুঝে নিতে যে ইতিহাসকে ত্বরান্বিত করার ভার রয়েছে সংগঠিত জনতারই উপর। এজন্য ধৈর্য দরকার, আরও দরকার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ও চরিত্রবল। স্বভাবতই সবাই চাই যতশীঘ্র সম্ভব শোষণহীন সমাজ নির্মাণ হোক। কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকার মনোবৃত্তি

(সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী মানসিকতার অনির্বাণ উপস্থিতি) প্রয়োজন। এটা চমৎকারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন মাও জে দঙ। মহামতি এই নেতার রহস্যবোধও ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী। তিনি একবার চীন-সোভিয়েত বিতর্ক সমাপনের সভা শেষে বলেন যে, সমাজবাদ জগজ্জয়ী হতে শুধু যে কয়েকদশক লাগবে তা নয়, লাগতে পারে বেশ কয়েক শতাব্দী। এই সূত্র ধরেই বলেন যে সোভিয়েত-চীন বিতর্ক চলবে "দশহাজার বছর"। বলার পরেই দেখলেন যে সোভিয়েত প্রতিনিধির মুখটা করুণ হয়ে উঠেছে আর তাই মাও যোগ দিলেন : "আমাদের এই কমরেড কোসিগিন সোভিয়েত পক্ষের বক্তব্য এত সুন্দরভাবে বলেছেন যে, আমি ঐ 'দশ' থেকে 'এক' হাজার বাদ দিয়ে দিচ্ছি।" স্বভাবত তুমুল হাস্যধ্বনির মধ্যেই কথোপকথন শেষ হল, কিন্তু মাও কখনও গোপন করতেন না যে পর্বত লংঘনের মতো সমাজবাদ নির্মাণ ও সংরক্ষণ অতি দুঃসাধ্য কর্ম আর তা যে তড়িঘড়ি ঘটানো যায় তা নয়। অবশ্য ইংরিজি প্রবাদ বলে : "In the long run we are all dead!" অনাগতে ভবিষ্যৎ যদি এমনই সুদূরপরাহত যে, কেউই আমরা সেই শুভদিন দেখতে পাব না। তাহলে তো 'চিত্তির'! তবু বলি মার্কসবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী শোষণমুক্ত সমাজের সাফল্য সুনিশ্চিত, কিন্তু সবই নির্ভর করছে স্থানকালপাত্রের ওপর, মানুষকে নিজেদের তৈরি করতে হবে এই প্রকৃত মনুষ্যোচিত অভিষ্ট সাধনের জন্য। আমরা তৈরি হলে কেউ আমাদের রাস্তা রোধ করতে পারবে না।

এজন্যই আজ বহুবিধ কর্মোদ্যোগে নামতে হবে। অনেকে হয়তো জানেন না যে, সোভিয়েত বিপ্লবের (১৯১৭) পর বেশ কিছুকাল আমেরিকার অনেক অঞ্চলে বিদ্যালয়ের মানচিত্র থেকে সোভিয়েত এলাকাটাকে ফাঁকা দেখানো হ'ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে সে দেশকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বহুবৎসর আর পরে বাধ্য হয়ে ঢোকানোর পর আবার তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটা যুগ এল যখন সোভিয়েতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব হল, অচিন্তনীয় শত্রুতা ও বহুমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও সোভিয়েতের, অস্তিত্ব শুধু নয়, তার মর্যাদা (সোশালিস্ট বিপ্লবের 'pilot project' হিসাবে) দেশে দেশে নন্দিত হতে থাকল। হিটলারী ফ্যাশিজম্‌কে জগজ্জয়ের স্বপ্ন ছেড়ে যখন ভূমিসাৎ হতে হল তখন বুর্জোয়া ব্রিটেনের বিশিষ্ট বিদ্বানদের মুখে শোনা গেল যে সভ্যতাকে বাঁচিয়েছে, ভবিষ্যৎকে আবার উজ্জ্বল করেছে সোভিয়েত আর তার লালফৌজ। 'অ্যাটম বোমার' হুমকি থেকে নক্ষত্রযুদ্ধের ('Star war') আতঙ্কেও সোভিয়েতকে মাথা নত করানো যায়নি। প্রধানত সোভিয়েতের উদ্যোগে বিশ্বশান্তি আন্দোলন একদা বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল। দুনিয়া বুঝতে শুরু করেছিল ১৮৬১ সালে মার্কস-এর উক্তি যে "যখন দেশে দেশে শ্রমশক্তি সার্বভৌমতার অধিকারী হবে তখনই ঘটবে দেশে দেশে যুদ্ধের (এবং অবিরাম যুদ্ধায়োজনের) অবসান।" সেই বিশ্বশান্তি আন্দোলন আজ নীরব, নিথর; মাঝে জাপানী শান্তিযোদ্ধারা কলকাতায় এসেও তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সোভিয়েতের মহাকাশযাত্রা (যাতে গাগারিন, তেরেশকোভা প্রভৃতিরা বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন) আর সঙ্গে সঙ্গে কাজাক, কির্ঘিজ প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগুলিকে নিয়ে সোভিয়েত মহাসঙ্ঘের কল্যাণ প্রচেষ্টা এমন সুফল প্রসব করেছিল যাতে অর্থসঙ্গতির দিক থেকে পশ্চিমজগৎকে পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব না হলেও তাদের মনে ভয় ঢুকেছিল সোভিয়েতের প্রায় অবিশ্বাস্য অগ্রগতি দেখে। এজন্যই আশির দশকেও দেখি মার্কিন সোভিয়েত-বিরোধী নায়ক বলা হচ্ছে

সোভিয়েত জুজুকে ভয় না করলে চলে না কারণ তারা "এক এক জন দশফুট লম্বা না হলেও আট ফুট লম্বা তো বটেই"।

এটা বলছি এজন্য যে এখন, গত পনেরো বছর ধরে সাম্প্রতিক ইতিহাসকেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে (ভারতে মুরলীমনোহর যোশীও এদেশের ইতিহাস বদলাতে উঠে পড়ে লেগেছেন) কারণ কেবলই প্রচার চলছে শুধু যে কম্যুনিজমের পরাজয়ের কথা তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের কীর্তিকলাপকেও "তুচ্ছ" প্রমাণ করে মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। Solzhenitsyn, Pasternak, Shakharov প্রভৃতির কথা এখন বড়ো একটা কেউ তোলে না, যদিও গরবাচ্যভী আমলে সোভিয়েতের অতীত গৌরবকে কলঙ্কিত করার চেষ্টায় তাদের নাম খুব কাজে লেগেছিল। এখন জানাবার গুরুতর চেষ্টা হচ্ছে যে ফ্যাশিজ্‌ম-এর পরাজয়ে সোভিয়েতের অবদান যৎসামান্য (অথচ সেটাই ছিল জাজ্জ্বল্যমান বাস্তব) আর ব্রিটেন-আমেরিকাই (অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক'-এবং) বুঝি সেই সাফল্যের কারিগর। এ ব্যাপারে প্রাক্তন সোভিয়েতের নেতাদের দায়িত্বও রয়েছে, কিন্তু সমাজবাদের বৈরীশক্তি গত প্রায় একশতাব্দী ধরে মার্কসবাদী অনুপ্রেরণায় জগতের সাম্যবাদী শক্তির ব্যর্থতা শুধু নয় তার অকিঞ্চিৎকরতাকেই প্রতিষ্ঠিত 'সত্য' হিসাবে প্রচার করছে। মানুষের মনকে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করবার প্ররোচনা প্রাণপণে সংগ্রহ করছে। এবিষয়েও আমাদের মতো দেশের বহু কর্তব্য রয়েছে। যা নিয়ে এখানে আলোচনার সাধ্য ও সময় আমার নেই।

যা বলতে চেয়েছিলাম তার অনেক কথা বাদ পড়ে গেল, তবু শেষ করি। ভবিষ্যতের আশা আর আমাদের প্রত্যয়ের নিশ্চিতি থেকে আমরা যেন সরে না আসি। "আসিবে, সেদিন আসিবে"—এ ধরনের কথা নতুন শোষণহীন সমাজ বিষয়ে কবিকণ্ঠ থেকে তো আবহমানকাল থেকেই শুনে আসছি সবাই। স্বয়ং Bertrand Russell-এর মতো কঠোর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনীষী "Roads to Freedom" গ্রন্থে বোধহয় ১৯২১-২২ সালে সমাজবাদ বিষয়ে লেখেন উপসংহারে যে, তিনি চেয়ে আছেন সেই দিনের জন্য যেদিন ধনতন্ত্র পুড়ে মরবে "With its own hot passions, and out of its ashes will rise a new world full of fresh hope, with the light of morning in its eyes"। তরজমা করছি না, শুধু বলি যে এ যেন আমাদের বাঙালি "আবেগ"-এরই প্রকাশ আর জানাই যে বহু সুকর্ম করলেও মার্কসবাদ ও সোভিয়েত বিষয়ে এই দার্শনিক একেবারেই প্রসন্ন ছিলেন না।

মনে পড়ছে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে জওহরলাল নেহরু এক জায়গায় লেখেন যে কমিউনিস্টরা তাদের মতবাদের 'কট্টর' প্রকাশে প্রায়ই 'বিরক্তি ঘটায় বটে। কিন্তু তাদের একটা 'গুণ' আছে যা লেনিন থেকে আরম্ভ করে সব কমিউনিস্টের ক্ষেত্রে কম বেশি দেখা যায়—তা হলো তাদের বিশ্বাস যে ইতিহাসের স্রোতের সঙ্গে তাদের বিশ্বাস যে ইতিহাসের স্রোতের সঙ্গে তাদের সংগ্রামের সঙ্গতি রয়েছে যেজন্য তারা অপরাজেয়। আমি মনে করি এত বড়ো 'প্রশংসা' কমিউনিস্টরা কোনো অ-কমিউনিস্ট মনস্বীর কাছ থেকে বোধহয় কখনও শোনেনি। সব কমিউনিস্টকে আজকের এই যুগসন্ধিকালে বলব কবি রাম বসুর লাইন ধার করে নিয়ে "আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র।'

ইংলন্ডে সতেরো দশকের বিপ্লবে Oliver Cromwell-এর নির্দেশ ছিল যোদ্ধাদের কাছে : "Trust in God, but keep your powder dry" ("ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কিন্তু কামানোর 'পাউডার' যেন শুকনো থাকে"।) আমাদের কমিউনিস্ট প্রত্যয় যেন অটুট থাকে (সেটা যাদুমন্ত্র নয়। জীবনের বাস্তবতাপ্রসূত জ্ঞান) অথচ সব সময় তৈরি যেন থাকি বিপ্লবপ্রয়াসে, সর্ববিধ পরিস্থিতির জন্য।

আজ তাই নববর্ষ নবশতাব্দী নব সহস্রাব্দ নিয়ে বিত্তবানদের উৎসব চলতে থাকুক। "কত ধন যায় রাজমহিষীর একপ্রহরের প্রমোদে"—পড়িনি সবাই 'কথা ও কাহিনী'-তে? এই সমৃদ্ধির সমারোহে পাল্লা দিক না কেন যারা পারে এবং যারা সেভাবেই ভাবিত। আমরা না হয় বলি 'বর্বরস্য ধনক্ষয়ং'—হোক না যারা 'বর্বর' তাদের 'ধনক্ষয়'। তবে খারাপ লাগে বইকি যখন কাগজে আমোদ-প্রমোদের অঢেল ব্যবস্থার খবর দেখি—সম্ভবত এক দম্পতিই কয়েকরাতের প্রমোদে খরচ করবেন যে টাকা তা দশ বা তারও বেশি ভারতীয় গরিব পরিবারের এক বছরের রোজগারের চেয়েও বেশি। যাক একথা, এটাই আজকের 'বিশ্বায়নী' ব্যবস্থার অবদান। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে কমিউনিস্টদের চারিত্র্যকে। কৃচ্ছ্র সাধনে আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু শোষণভিত্তিক সমাজে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে যে নির্লজ্জ ব্যবধান তার মতো ঘৃণ্য আর কি আছে মানুষের ইতিহাসে? প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী শুনেছি : "মা গৃধঃ" ("লোভ করো না")। সোভিয়েত দেশে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "সমাজ দেহে লোভ বলে যে রিপু মৃত্যুশালের মতো ঢুকে রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার তোমাদের প্রয়াসকে আরও অনেক বিঘ্ন বিপদ কাটাতে হবে। আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা এই ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞে সফল হও।" স্বয়ং কার্ল মার্ক্স বহুবার বলেছেন যে, ধনতন্ত্র মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন (need) মেটাতে চায়নি, তাকে পুষ্ট করে রাখে 'লোভ' (greed), আর সেজন্যই "inhuman, sophisticated, unnatural and imaginary appetities" বেড়ে ওঠে। মূলগত কারণ হলো মার্ক্স-এর ভাষায় "Private property does not know how to change cruder need into human need" (বড্ড ক্লান্ত একটানা লিখে যাচ্ছি বলে, পাঠক তরজমা করে নিন)। ধৈর্যচ্যুতি না করে এখনই শেষ করি শুধু মনে পড়িয়ে দিয়ে যা রয়েছে 'শ্রীম'-কৃত প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ কথামৃতে : "দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোনোরকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।" আজকের 'বিশ্বায়ন'-এর নামে যে বদমায়েসি আর ধনশক্তির কাছে মাথা নত করে থাকার যে "বিষয়াসক্ত" প্রবৃত্তি আমাদের দেশ আর দেশের মানুষের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে তাকে ঠেকাতেই হবে। আশাকরি আমাদের অন্তত "বিষয়াসক্তি" নেই—তাই অত্যন্ত দুঃখের সময়েও যেন বলতে পারি ঃ 'মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় নেই, ভয় নেই, সমাজবাদ অপরাজেয়।

গণশক্তি : ২ জানুয়ারি ২০০০

ইতিহাসের চাবুক : খণ্ডিত 'স্বাধীনতার' বিড়ম্বনা

"দিল্ ধাই কর্ কাবা বানায় তো ক্যা কিয়া তো ক্যাকিয়া?" বিখ্যাত উর্দু কবি মীর-এর এই উক্তিটি মনে ঘোরে যখনই ১৯৪৭-র পনেরোই আগস্ট তারিখে আমাদের খণ্ডিত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা ভাবি। "বুক ভেঙে দিয়ে এই 'কাবা' বানিয়ে করলেটা কি, করলেটা কি?" মীর-এর কবিতাটি (অন্য উপলক্ষে বহু পূর্বে লেখা) শুনেছিলাম প্রয়াত বন্ধু, একদা বিশ্বশান্তি আন্দোলনে অগ্রণী রশীদউদ্দীন আহমদ্ খানের মুখে। দেশভাগের মূল্য দিয়ে অতি সেয়ানা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে কেনা এই 'স্বাধীনতা' পঞ্চাশাধিক বছর কেটে গেলেও সার্থকতার আস্বাদ দিতে পারল না। "পর দীপমালা নগরে নগরে/তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরে"।

সন্দেহ নেই যে, চুয়ান্ন বছর আগে ১৫ আগস্ট তারিখের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তাদের মন থেকে তা কখনও মুছে দেওয়া যাবে না। সেদিনের অভূতপূর্ব অকল্পনীয় আবেগ আর উদ্দীপনায় আমরা ভেসেছিলাম, মনের সংগোপনে কাঁটার মতো সে যন্ত্রণা ফুটতে থাকলেও। যে দাম দিয়েই হোক্, দেশ তো মুক্ত হল, আর তো ইংরেজের দাস আমরা নই, দুনিয়ার দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ তো পেয়েছি। সংস্কৃতে প্রবচন আছে যে "সর্বনাশ হাজির হলে বুদ্ধিমানের কাজ হল অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া"—আর দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও আমরা উভয়ে তো স্বাধীন। আবার তো এক হতে পারি (যা মওলানা আজাদ বললেন)।

তাই ইতিহাসের দণ্ড মাথায় পেতে ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধার চেষ্টা হবে এমন চিন্তা নিশ্চয়ই ছিল। যাই হোক, সন্দেহ নেই সেদিনের উদ্দীপনার আন্তরিকতা নিয়ে। আর আমাদের দুর্গত দুনিয়াতে এভাবেই আমাদের মতো হাজার হাজার বছর ধরে প্রায় স্বভাবস্থবির 'মান্ধাতাগন্ধী' দেশ যে আজও সঠিক রাস্তায় এগোতে পারেনি। তারও ইতিহাসসঙ্গত হেতু রয়েছে। "ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে/মেঘের সিংহবাহনে" রবীন্দ্রনাথের এমন কথা আমাদের অনেককে সান্ত্বনা পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ২০০১ সালে বসে ভাবি এমনই ভাবে দণ্ড পাচ্ছি ইতিহাসের বিচারে যে আজও বুঝি "বুক ভাঙা" অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। আজও তো দুনিয়ার ধনতন্ত্রীদের সঙ্গে প্রায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছি; পুরোনো "Subsidiary Alliance"-এর নতুন চেহারা দেখছি।

'৪৭-এর প্রায় অব্যবহিত পরে মোহভঙ্গ ঘটিয়ে আমরা আবার কতকটা আবেগাতিশয্যে "এ আজাদী ঝুটা হ্যয়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ" আওয়াজ তুলেছিলাম। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। লগ্ন পার হয়ে গেছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ঋণ হয়তো সেদিনের পক্ষে জুতসই 'বিপ্লবী' লড়াইয়ে (যা শুরু হয়েছিল) সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু খেদ করে লাভ নেই যে পারিনি, এবং সেজন্যই সেই অপরাধের মাশুল আজও দিয়ে চলতে হচ্ছে। আমার মনে লেগে রয়েছে ১৯৩৮ সালে তার আত্মজীবনীতে লেখা জওহরলাল নেহরুর বক্র কটাক্ষ

যে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্টরা একটা 'ginger group' বই কিছু নয়, দেশ বদ্‌লাবার লড়াই পারে না, শুধু আন্দোলনে একটু "আদার ঝাঁঝ" আনে।

অস্বীকার করে লাভ নেই। আজও তার চেয়ে খুব এগোতে আমরা পারিনি। গত সত্তর বছর ধরে আমাদের প্রয়াস অশ্রদ্ধেয় তো নয়ই, নানাদিক থেকে তা গরীয়ান। কিন্তু ফলের বিচারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজও আমরা পিছিয়ে। এটা শুধু আমাদের দৌর্বল্যের সূচক নয়। গোটা দুনিয়া জুড়ে, বিশেষত গর্বাচভ্-ইয়েলৎসনী বীভৎসতার পর সোশালিস্ট দেশগুলির বিপর্যয় ইতিহাসের আকাশে সূর্যগ্রহণ ঘটিয়েছে। কবে গ্রহণ মুক্তি ঘটবে কেউ বলার ভরসা রাখে না। এর একটা মূল কারণ অবশ্যই আমাদের যে জগৎজোড়া সংগ্রাম (যার গৌরবের দিক যেন কখনও না ভুলি) তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও নানাবিধ দোষত্রুটি অপরাধের সংক্রমণ যা বহুদিন ধরে চলেছে। এর ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয় কিন্তু এটাই ঘটনা। আর এর মোকাবিলা নতুন যুগের পরিস্থিতি বুঝে যথা প্রয়োজন নীতি ও কৌশলের সন্ধানে সবাইকে থাকতে হবে। খুবই কঠিন যে এই কর্ম যা অপরিহার্য। কিন্তু তা ভুললে আমরা আজকের রাজনীতির প্রায় সর্বব্যস্ত ক্ষুদ্রতা হীনতা মালিন্য ও দৌরাত্ম্যের চাপে নিজের সত্তা ও মেহনতী মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকারই অসম্মান করে ফেলব।

বলতে না চেয়েও কথা বেড়ে গেল। তবে আশা করি আমার বক্তব্যের কদর্থ ঘটবে না। এই অতি বৃদ্ধ বয়সে আর বহু বৎসর ইতিহাস চর্চার ফলে কেবলই মনে হয় যে, আমাদের মতো দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে যতটা সম্ভব গভীরে যাওয়া এবং তাতে প্রকৃত জনশক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমাদের অনেক ঘাটতি বহুকাল ধরে চলে এসেছে। 'স্বাধীনতা' আমরা লড়াইয়ের জোরে 'অর্জন' করিনি, ইংরেজ প্রভুরা তাদের পার্লামেন্টে আইন করে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' ঘটিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে কৃতার্থ করেছে (মনে পড়ছে জওহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি বড়লাট মাউন্টব্যাটেন-এর কাছে তেসরা জুন ১৯৪৭-এর ঘোষণার ('Plan Balkan') জন্য 'কৃতজ্ঞতা' প্রকাশ করেছিলেন আর মওলানা আজাদ তার একটু আগে বলেন যে ইংরেজ স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছে, তাকে বেগ না দিয়ে সে যাতে স্বচ্ছন্দে নিজের মালপত্র বাক্সবন্দি ('Packing) করে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য সাহায্য করাই দরকার। এক গান্ধীর মনের বেদনা একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি। কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিল আধ্যাত্মিক, তিনি বারবার বলতেন শুধু রাজনীতি নয়, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাঁর সকল কর্ম। একথা বলে আমি নিছক বামপন্থার প্রশস্তি করছি তা একেবারেই নয়। বরং বলব যে ১৯৪৭-এর সেই অপরিমিত ব্যর্থতার 'দায়' কিছু পরিমাণে আমাদেরও নিতে হবে। ১৯৪৫-৪৬-এ যখন প্রায়-বৈপ্লবী পরিস্থিতি তখনও আমরা বুর্জোয়া নেতৃত্বের 'পশ্চাদ্দেশ অবলোকন' করেছি (এখানে লেনিনকথিত 'লেজুড়বাদ', tailism-এর কথাই বলছি)। আমাদেরও নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ভরসার অভাব এত ছিল কংগ্রেস-লীগ মিলনের ওপর ভরসা রেখে তখনও তুষ্ট হয়ে থেকেছি—"গান্ধী-জিন্না ফিন্ মিলেঙ্গে", "কংগ্রেস-লীগ-ঐক্য হবে" ইত্যাদি স্তোকবাক্য দেশবাসীকে (এবং নিজেদেরও) শুনিয়ে চলেছি।

কি করে ভোলা যায় যে মুম্বইয়ে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে নৌবিদ্রোহকালে 'কংগ্রেস-

লীগ-কম্যুনিস্ট পতাকা' একত্র বেঁধে জনতা মিছিল করলেও কংগ্রেস-লীগ নেতারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাধ্য হয়নি (হয়তো মনের প্রেরণা ছিল না বলে প্রবৃত্তিও হয়নি) সেদিনের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে বিপ্লবের ঢেউয়ে রূপান্তরিত করার। হয়তো সেটা ধীরস্থির বিচারে হত অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা বা যাই বলা হোক্ না কেন, কিন্তু এই 'দুঃসাহস' বিনা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কখনও জয়ী হতে পারে না, 'বিপ্লব তো দূরের কথা।'

এ নিয়ে গোটা বই লেখার সাধ্য নেই—আমাদের মতো যারা নিজেদের কম্যুনিস্ট বলে আত্মপ্রসাদ পেয়েছি তাদেরই অপরাধ কি অল্প? কিন্তু যখনই খণ্ডিত ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতার' হ্রস্বতা আর খর্বতা আর প্রায় যেন এই 'মুনবাদী' দেশে জন্মগত দুর্বলতা মনের আয়নায় ধরা পড়ে, তখনই জানি আমরা ইতিহাসের ঋণ-শোধ করতে একেবারেই পারিনি। যথেষ্ট লড়াই করিনি। করার সাধ্য নেই ভেবে চেষ্টাও তেমনভাবে করিনি। এজন্যই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষফলে এই উপমহাদেশের 'স্বাধীনতা' অর্জনে যত মানুষের প্রাণ গেছে তার সংখ্যা গোটা ইতিহাসে সকল বিপ্লবের তুলনায় অনেক বেশি হলেও সার্থকতার সন্ধান আমরা পাইনি। ইতিহাসের কাছে এই দেনাশোধ করতে হবে আগামী দিনে আবার মেহনতী মানুষের লড়াইয়ে জয়যুক্ত করার প্রায় আশাহীন অথচ অপ্রতিরোধ্য অপরাজেয় কম্যুনিস্ট প্রয়াসে।

এবার শেষ করি। তবে হঠাৎ মনে এল প্রায়-বিস্মৃত হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন ১৯৪৩ সালে এখানে এসে সদ্যজাত গণনাট্য সংঘ-এর (আই-পি-টি-এ) কাজে নেমেছিলেন আর একদিকে বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য আর অন্যদিকে দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাস আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের মনে অপূর্ব উন্মাদনা জাগিয়েছিলেন তখন খুবই জনপ্রিয় তার একটি রচনা এখানে গাওয়া হলে হয়তো মনে হবে জমছে না, আজকের পরিবেশে বুঝি বেমানান, কিন্তু সেদিন তার দিলমাতানো গুণের অন্ত ছিল না। যতদূর মনে পড়ে কথাগুলো ছিল : "নভোমে পতাকা নাচত্ হ্যয় নাচত্ হ্যয়/বারে উস্‌কা রং/জনতাকী অন্তিম জং...বারে আজাদী, আজাদী চীজ বহোৎ হ্যয়্ দামী/য়ো রক্ত বহাকে খরিদেঙ্গে/আজাদীকো হম্ জিতেঙ্গে .../ভারতকো হম্ বচানোওয়ালে/সৌরজগতমে মচানোওয়ালে/অপ্‌না শক্তিসে নচানেওয়ালে বিষধর শ্বেত ভুজঙ্গ..." হরীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় কণ্ঠের তেজস্বিতা আর অঙ্গভঙ্গির মোহনীয়তা মিলে তৈরি করত এক অনন্য আবহ যা আজ আর ফিরে পাবার নয়। "আজাদী চীজ বহোৎ হ্যয় দামী"—আজাদীর যোগ্য দাম দিতে পারিনি বলেই আজকের যন্ত্রণা।

তবু বলি আশা হারাব না, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাব না, লোভ জটিল মুনাফাসর্বস্ব ভোগলিপ্সাকলুষিত ধনতন্ত্রের "ক্লেদ আর লজ্জা আর অমানবিকতা" (মার্ক্স্-এর বাক্য) কিছুতেই মানুষ সহ্য করে চলবে না। বিপ্লব করার চেয়ে 'বিপ্লবী' সাংবাদিকতাই সহজ বলে যে প্রতিভাধর কবি সমর সেন হৃদয়ের বেদনা ব্যঙ্গ-এর ছলে প্রকাশ করেছেন তারই কণ্ঠ হল : "আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে"।

গণশক্তি : ১৫ আগস্ট ২০০

সাহিত্য সমাজ ও সাংবাদিকতা

নামধন্য সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতিতে প্রতি বৎসর যে ভাষণের ব্যবস্থা বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে প্রয়াত মহাজনের পরিবারের সহায়তায় করা হয়েছে তা শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, বাংলা ভাষাভাষী আমরা যে যেখানে আছি তাদের সকলকে আনন্দিত করবে। আমার সৌভাগ্য যে প্রথমবারের বক্তৃতাটি দেবার ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বাংলা আকাদেমি এবং এই আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে না বলে পারছি না যে ইতিপূর্বে আকাদেমির কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন, ১ আগস্ট, এই সভাগৃহে বক্তৃতাটি দেব। হঠাৎ বেশ খানিকটা অসুস্থ হওয়ার ফলে প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব না হওয়ায় আকাদেমি কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি পরম উদারতা দেখিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা না করে সভা মুলতুবি করেন আর আমাকেই আবার ডাকেন। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করে আকাদেমি আমার কৃতজ্ঞতার বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই বহুবিধ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সানন্দে আমি আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি।

বেশিদিন হয়নি, 'সাংবাদিকতা সাহিত্য স্বদেশমুক্তি' শীর্ষক রচনায় বিবেকানন্দবাবু সম্বন্ধে বলেছিলাম তিনি "আমার বহুদিনের বন্ধু, তিনি কবি-বাগ্মী-প্রাজ্ঞ-সাংবাদিক-মুকুটমণি আর আজও বাঙালি সাংবাদিকের অনুপ্রেরণা।" হয়তো বাঙালি সুলভ বাক্‌বিস্তার করে ফেলেছি, আর নবশতাব্দী শুধু নয় সহস্রাব্দপূর্তির প্রাক্কালে ভুলে গিয়েছি যে আমাদের যুগের কেউই আজিকের 'বিশ্বায়ন' ও যন্ত্রদেবতার বহুবিচিত্র লীলাখেলার কালে বাতিল না হয়ে 'অনুপ্রেরণা' হতে পারেন না। তবু আমার এই বিলম্বিত স্মৃতিভাষণের মাধ্যমে শুধু যে বন্ধুকৃত্য পালনের স্বস্তি একটু পাচ্ছি তা নয়। বিবেকানন্দবাবু ও আমি একই প্রজন্মের মানুষ, তিনি আমার বয়েসে মাত্র তিন বছরের বড়ো ছিলেন। সমসাময়িক আমরা, দেশ ও দুনিয়ার হালচাল নিয়ে ভেবে চলেছি। আর বিশেষ করে জগৎ জুড়ে অধিকাংশ মানুষের দুর্দশা নিবারণ ও সমসুযোগের সমাজ নির্মাণের আজও অসফল প্রয়াসে উভয়েই দীর্ঘকাল ধরে অংশীদারী করেছি। অধুনাতন বিশ্বপরিস্থিতির আপাত বিপর্যয়ে একই ভাবে না হলেও। কতকটা আমারই মতো যন্ত্রণাভোগ তিনি করতেন তা জানি।

পুরোপুরি একই পথের পথিক আমরা ছিলাম না, কিন্তু "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম" বলতে আমাদের বাধে নি। নিজেকে কম্যুনিস্ট বলার প্রকৃত অধিকার অর্জনে হয়তো আমার শুধু কেন, আমাদের অনেকেরই ব্যর্থতা ঘটে গেছে। কিন্তু তবুও সেটাই আমাদের গর্ব, আমাদের বড়াই। কিন্তু কার্ল্ মার্ক্স্ বহুকাল আগে এক লেখকবন্ধুকে "The party in the grand historical sense of the term" বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা মনে

পড়ছে। জগৎ জুড়ে নতুন সমসুযোগের জীবন প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম অজস্র বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও চলেছে ও চলতে থাকবে। অহঙ্কার করে বলি যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহুগুণান্বিত প্রতিভাদীপ্ত কর্মকাণ্ড সেই সংগ্রামেরই সহায় হয়েছে। বাঙালি কম্যুনিস্টদের মধ্যে একজন প্রধানের মুখে শুনেছি যে এখনও ষাটের দশকের খাদ্যসংগ্রামকালে বিবেকানন্দের প্রজ্বলন্ত সম্পাদকীয়ের কিয়দংশ তার কণ্ঠস্থ রয়েছে। এই উদ্ভট বিশ্বায়ন যুগে এমন কথা আর কখনও শোনা যাবে মনে হয় না। 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ' (সে সব দিন আর নেই) বলে বিলাপ করছি না—শুধু চাইছি ভবিষ্যৎ যেন সর্বজনের কল্যাণের আদর্শকে বিকৃত না করে, বিনষ্ট না করে।

বিবেকানন্দবাবু যার মন্ত্রশিষ্য বললে ভুল হয় না, যিনি বাস্তবিকই ছিলেন তাঁর "guide philosopher and friend", সেই অবিস্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেছিলেন : "আমরা স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করার গৌরব দাবি করি না। লোকলোচনের অন্তরালে বসিয়া আমরা বিনিদ্র রজনীতে 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' নানা পুষ্প চয়ন করিয়া বরমাল্য গাঁথি। প্রভাতে আমাদের উপাস্য গণশক্তির কণ্ঠে মালা দুলাইয়া দিই, সন্ধ্যায় তাহা ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়ে।" আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্ণযুগের নায়ক সত্যেন্দ্রনাথের তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ভুলতে পারা যায় না; ধর্মাবেগ থেকে দেশাভিমান থেকে স্বদেশ ও স্বকালের সমাজ পদান্তর সাধনকল্পে সর্ববিধ প্রগতি প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিত্বের গরিমা আমরা দেখেছি; সহজ সরল স্বাভাবিক ধারায় জটিল গভীর সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত করার যে ক্ষমতা তাঁর চরিত্রে ছিল (আমার চিন্তায় এর সঙ্গে তুলনীয় থেকেছে নাট্যজগতে 'মহর্ষি' বলে বন্দিত, গণনাট্য আন্দোলনের অবিসম্বাদী অজাতশত্রু নেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অবস্থান), সেই ক্ষমতা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা থেকে বাঙালি মনে সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থকতার কামনা যে সর্বব্যাপ্ত তা বোঝা যায়—সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন অভিমান যে সাংবাদিকতা যেন সাহিত্যের অঙ্গনে থেকে দূরাবস্থিত। তবু উভয় ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রখ্যাত সাংবাদিক এম. চলপতি রাও ('এম. সি' নামে সর্বত্র পরিচিত) বলতে পেরেছিলেন যে সাংবাদিকতা হল "literature (or history writing) in a hurry", দ্রুত লিখিত সাহিত্য আর ইতিহাস রচনাই সাংবাদিকের কর্ম। এরই প্রমাণ সর্বদেশের প্রকৃষ্ট সাংবাদিকতায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অবদান যে কত মহামূল্য আর বিস্তৃত পর্যালোচনা এখনও আমরা করিনি।

বিবেকানন্দবাবুর আয়ুষ্কাল হল ১৯০৪ থেকে ১৯৯৩। প্রায় নবতি বর্ষের এই জীবনে প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর ছিল কবি-পরিচিতি। আমরাও তাঁকে সুকবি হিসাবে জেনেছি। সম্ভবত ১৯৩৭-৩৮-এ প্রকাশিত "প্রগতি" সংকলনে তাঁর কবিতা ছিল, অনেক কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে যা প্রকাশ করতে পারলে ভালো হয়। জানতাম না সেদিন পর্যন্ত যে "শতাব্দী সঙ্গীত" নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এটিকে সংগ্রহ করে ছাপানো

কঠিন কাজ নয়, রাজ্য সরকারের সম্মতি সহজে মিলবে বলেই তো আশা করি। এটা বলছি বিশেষত এজন্য যে এখন মুখবন্ধ লিখে দেবার জন্য আমার কাছে রয়েছে আমাদের অনেকেরই বন্ধুস্থানীয় এবং প্রায় বিস্মৃত হলেও "বিপ্লবের সন্ধানে" "সোভিয়েট দুনিয়া" ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা, বহু বৎসর বিপ্লব কর্মে নিরত ও নিগৃহীত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভাঁওতা" বলে একটি বই, যা ত্রিশের দশকের গোড়ায় (অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে) ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। নারায়ণবাবু শুধু সুলেখক নন, অত্যন্ত সুরসিকও ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে অতদিন আগে সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাতত্ত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা বুর্জোয়া সমাজের 'গণতন্ত্র' জাতীয় বাক্য ব্যবহারের মধ্যে যে বিপুল 'বুজরুকি' সুকৌশলে ঢেকে রাখা হয় তাকে জাহির করতে চেয়েছিলেন আর দূরদর্শী ফন্দিবাজিতে অদ্বিতীয় ইংরেজ শাসকরা তখনই তা বুঝে বইটি নিষিদ্ধ করে দেয়। একটু অবান্তর হল প্রসঙ্গটা, কিন্তু উল্লেখ করলাম এজন্য যে বিবেকানন্দবাবুরও 'নিষিদ্ধ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিতে যেন বিলম্ব না হয়।

সাংবাদিকতায় ছিলেন বলেন এবং তৎকালীন পরিবেশে নিজের পরিশীলিত মানসিকতার সহায়তায় কেবল স্বদেশ নয় সকল দেশের পরিস্থিতি নিয়ে শুধু চিন্তা নয় কর্মের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি কুণ্ঠিত হননি। তাই দেখি শুধু কবিতা নয়, আসামান্য বাগ্মীরূপে সমসাময়িক জগৎ এবং আমাদের এই বহুযুগ ধরে লাঞ্ছিত অথচ অপরাস্ত ভারতবর্ষের অবস্থান নিয়ে শুধু যে অক্লান্ত ভূমিকায় নামলেন তা নয়, প্রচুর পরিশ্রম ও চিন্তার ভিত্তিতে সম্পাদকীয় ব্যস্ততার মধ্যেই রচনা করলেন "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস," "রুশ-জার্মান যুদ্ধ" "জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী", "সোভিয়েট মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি', "এশিয়ার বন্ধনমুক্তি" প্রভৃতি পুস্তক যা বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। হালকা চালে লেখা "যখন সম্পাদক ছিলাম" উপাদেয় রচনা, যার স্বাদ তাঁর আবেগবাহী, মাঝে মাঝে জ্বালাময়ী বক্তৃতা থেকে ছিল পৃথক।

আমাদের ছেলেবেলায় 'স্বদেশী' করা, 'দেশের কাজ' ইত্যাদি কথা প্রায় শুনতাম, পরাধীনতার অপমান ও যন্ত্রণা থেকে নিস্তারের ভাবনা মনে ঢুকত। সেদিনের অপরিণত বিপ্লব প্রয়াসে হয়তো বিবেকানন্দবাবু কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। সন্দেহ নেই যে ১৯১৯-২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সংগ্রামের দীপ্তি তাঁকে স্পর্শ করেছিল, "আগুনের পরশমণির" আভাস দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি আর ১৯৩৭ সালে, যখন দেশের রাজনীতিতে নতুন এক আবহাওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত ছিলেন "যুগান্তর" পত্রিকায়। বহু বৎসর তার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং "যুগান্তর"-এর সম্পর্ক যেন ছিল অচ্ছেদ্য।

বুর্জোয়া শ্রেণীকর্তৃত্বের কারসাজি যে কত কুটিল হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্য সব সাংবাদিকের মতো তিনিও হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। "বসুমতী" "সত্যযুগ" 'ভারতকথা" প্রভৃতির সম্পাদনা করেছেন, ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের পরপর পাঁচবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, Working Journalist-দের আন্দোলনে শামিল হয়েছে। মালিকশ্রেণীর "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছেন যথেষ্ট অথচ ব্যক্তিগত সম্পর্ক

অটুট রেখেও আত্মসম্মান বজায় রেখেছেন সাংবাদিক কর্মীরূপে। শুধু বাংলা নয়। গোটা ভারতবর্ষের প্রগতি আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন এই খর্বদেহ অথচ ঋজু, সাহসিক ওজস্বী মানুষটি। বাঙালি সাংবাদিকতার যে গৌরবময় ঐতিহ্য আজ বিলীয়মান বললে অত্যুক্তি হয় না, তার এক জনচিত্তে স্থান পেয়েছেন।

আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কলমাকান্তকে উকিলের সওয়ালের জবাবে বলতে হয়েছিল : "পেশা? আমি কি উকিল না বেশ্যা যে আমার একটা পেশা থাকতে হবে?" আমরা যখন সাংবাদিকতা নিয়ে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা করি তখন প্রলুব্ধ হই একটু যেন গলা কাঁপিয়ে বলতে যে এটা নিছক জীবিকার্জনের 'পেশা' নয়। সাধুভাষায় সাংবাদিকতা তাই কেবল 'বৃত্তি' নয় বরং একটা 'ব্রত'—কিছু পরিমাণে 'নেশা'-ও বলা যায় কারণ এর একটা নিজস্ব মোহ আছে বিশেষত তাদের কাছে যারা একই সঙ্গে চায় সাহিত্যচর্চার আনন্দ আর জনকল্যাণ প্রযত্নে উপস্থিতি। ইংলন্ডে সতেরো শতকে বিপ্লবকালে (১৬৪১-৬০) দেখা গিয়েছিল 'Mercurius Publicus,' কিম্বা অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবকালে (১৭৮৯-৯৯) রব্‌স্‌পিয়ের-এর "Lami du Peuple"-এর মতো সংবাদপত্র। রুশবিপ্লবের সূচনা ও বিকাশে দেখা গিয়েছে 'প্রাভদা'-র মতো সংবাদপত্রের মুখ্য ভূমিকা। নানা কারণে ইংলন্ডের মতো দেশে সংবাদপত্রের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম নয়। রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির আবির্ভাবের পর ও গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্রের গৌরব কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হলেও বিলোপ পায়নি, সহজে হয়তো পাবে না। যে কোনো শিষ্ট সমাজে প্রয়োজন দেশবিদেশের খবর সবাইকে যথাসম্ভব জানানো। সাধারণের জ্ঞান ভাণ্ডারকে পুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদির বিবরণ মারফৎ কর্মক্লান্ত নাগরিকদের চিত্ত বিনোদনে [illegible]তা করা। এ কাজ সংবাদপত্র এখনও যথাসাধ্য করে, অন্তত করা উচিত। এজন্যই শ্যপ্তাবীরূপে জনমনকে প্রভাবিত করার শক্তি রয়েছে সংবাদপত্রের হাতে, গণমাধ্যমের দখলে। এজন্যই যখনই স্বৈরশাসন তার কর্তৃত্বকে কায়েম করতে চায় তখন সংবাদপত্রকে কব্জা করতে তারা ব্যগ্র। আর এজন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সাথে জনসাধারণের স্বার্থ অতি ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পর্কিত। বিবেকানন্দবাবুর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে যদি আমাদের দেশের সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আজও প্রকৃত প্রস্তাবে অনারব্ধ পর্যালোচনা বিদ্বজ্জন করতে এগিয়ে আসেন তো মঙ্গল।

অর্থের আধিপত্য শুধু আজকের ঘটনা নয়। এ যাবৎ সর্বত্র তার অস্তিত্ব হল অকাট্য। বর্তমানে বেশ একটু কটুভাবেই আর্থিক উন্নয়নের বিশ্বায়নী রূপ আমরা দেখছি। সবই যেন আজ পণ্য, মানুষের শুধু কর্মনৈপুণ্য নয় তার প্রতিভাও বুঝি এক ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী, খেলোয়াড় থেকে শিল্পী, এমনকি সমাজরূপান্তর প্রয়োসে লিপ্ত বলে একদা আদৃত রাজনীতিকেরা "আয়া রাম গয়া রাম" ধরনের "Commodity" মনুষ্য আকারে পণ্যসামগ্রী। এ হেন পরিবেশে সাংবাদিকেরা যে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'পেশা'দার হতে বাধ্য, অর্থাৎ নিছক অর্থের বিনিময়ে সমকালীন 'চাহিদা' মিটাবার উপকরণ বিশেষ, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভা ও মর্যাদার যে অপমান সহ্য করতে হয়েছে তা হল আবহমান কাল থেকে আমাদের সমাজজীবনে বিত্তবানদের প্রভুত্ব ও অনাবিল কর্তৃত্ব প্রবণতার প্রকাশ বললে খুব ভদ্র ও নম্রভাবে বাস্তবেরই বর্ণনা দেওয়া হয়।

অধুনা বৃহৎ পুঁজির সংবাদপত্র জগতে নোংরা দাপটের চিহ্ন পূর্বের চেয়ে বেশি প্রকট। তাতে সন্দেহ নেই। একদা অন্তত কিছু 'ডাকসাইটে' সম্পাদক নিজেদের জাহির করতে পারতেন। সত্যেনবাবু বা বিবেকানন্দবাবুর মতো ব্যক্তির মর্যাদা এমন ছিল যে তাদের অতিরিক্ত 'ঘাঁটাতে' মালিককে কিছুটা ইতস্তত না করে উপায় ছিল না। এখন তো দেখি, বিশেষত দিল্লি বা বোম্বাইয়ের মতো ধনকুবের অধ্যুষিত জায়গায় যে সাধারণের কাছে অকল্পনীয় টাকার টোপ দিয়ে সবচেয়ে উঁচু তাকের সম্পাদকদেরও দাবিয়ে রাখা যায়। সম্প্রতি প্রেস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুরাহার কিছু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অর্থব্যবস্থার মতিগতি এমন যে আশান্বিত বোধ করা সহজ নয়। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের চেহারা তার মেজাজ। তার মতামত, তার তথ্যবিনাস, তার বিজ্ঞাপন বাহুল্য, 'স্টক্ এক্স্চেঞ্জ'-এর মতো জাঁকালো জুয়ার আড্ডার মাহাত্ম্যপ্রচার আর বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির গহন গভীর বিস্তার ইত্যাদি এমন বদলাচ্ছে যে আমার মতো পুরানা ঘরানার মানুষ আর হদিশ্ পাই না।

তবুও বলব, বিবেকানন্দবাবুর মতো সাংবাদিককে স্মরণ করেই বলব যে হাল ছাড়লে চলবে না। তাছাড়া এখনকার সাংবাদিকদের মধ্যে অনেক নতুন পেশাগত (professional) গুণ আছে। আগে নানাকারণে যার অভাব ছিল। স্বয়ং লেনিন বলতেন যে প্রকৃত বিপ্লবকর্মীরা হবে 'Professional revolutionary"। এই পেশাদারী নৈপুণ্য মনে হয় এখন আগের চেয়ে বেশি। যদিও সম্পাদকীয় সাহস ও চিন্তাশীলতার দিক থেকে আজ প্রচুর ঘাটতি দেখি।

'পেশা' কথাটা একটু কেমন কেমন মনে হলেও যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রয়োজন। যা কাজের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। সাম্প্রতিক সাংবাদিকতার 'রিপোর্টিং', ফটোগ্রাফি ইত্যাদি প্রকৃতই বিপুল সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করছে—তা খেলাধূলার হোক্ বা শিল্পকৃতির হোক্ বা কার্গিল-এর মতো রণক্ষেত্রেরই হোক, আর তরুণ সাংবাদিকরা সাহস ও সততা নিয়েই কাজ করছেন। দেশের মানুষের মতামত 'সৃষ্টি'তে সহায়ক হয়ে সম্পাদকীয় ও অন্য নিবন্ধ লেখকেরা হয়তো আগের চেয়ে অনেকেই শক্তিমান কিন্তু জনকল্যাণের নিরিখে তেমন বিবেকবান্ নয়। সংকোচের সঙ্গেই একথা বলছি। তবে বিবেকানন্দবাবুর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে গিয়েই এ কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেল।

পেশা হোক্ নেশা হোক্, সাংবাদিকতা শুধু যে 'বৃত্তি' নয়, জীবনধারণের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন, কিছু পরিমাণে অন্তত এটা যে একটা 'ব্রত'-এরই মতো ('Vocation', 'dedication', 'mission'), এ ধারণার মূল্য কম নয়। বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায় যে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত উপকরণ দুর্লভ হলেও এই 'পেশায়' বহু গুণী সানন্দে ও বহু কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে এসেছেন। এই 'বৃত্তি'র পরিবেশে একই সঙ্গে সাহিত্যচর্চার সুযোগ আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের দুর্গত জীবনে রূপান্তর সংঘটনের প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট টাকার আনন্দ তারা

পেয়েছেন। আমাদের এই অতিপ্রাচীন ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছর যে নিছক্ নিপাট সর্বতোভাবে বিদেশীয় সাম্রাজ্যের শৃংখলে যখন বাঁধা থেকেছি। তখন আমাদের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা আর পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি অর্জনের প্রয়াসে সাংবাদিকতার অবদান আজকের মতো উপলক্ষে তাই সকলেরই স্মরণীয়।

পরাধীনতাকালেই আমাদের সাংবাদিকতার জন্ম ও বিকাশ বলেই বোধহয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর সাহিত্য শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতিক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকে গেছে। সাংবাদিক বৃত্তিকেই যেন গৌরবমণ্ডিত করেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শুধু বাংলা নয় সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী উর্দু ফারসী সাংবাদিকতায় পুরোধা ছিলেন তাঁর যুগন্ধর ভূমিকারই অনুসরণে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যের "আড়াই জন ঋষি"-র কথা বলতেন—বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল মধুসূদন আধ। বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথকে সাংবাদিক বলবার তো অজস্র প্রমাণ রয়েছে আর মাইকেল মাদ্রাজে সাংবাদিকতার কল্যাণে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন বলে কল্লতরু সেনগুপ্ত মহাশয় তো তাঁকে এদেশের প্রথম 'working journalist' বলে বর্ণনা করেছেন। আমার সময় নেই নাম উল্লেখ করে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে যারাই অবদান রেখে গেছেন তাদের অধিকাংশই যে সাংবাদিকতায় সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন তা এখনই তুলে ধরার—তার প্রয়োজনও নেই। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল, সত্যজিৎ রায়, সমর সেন, সুকান্ত যে পরম্পরা চলে এসেছে, সেখানে তো দেখি যে প্রায় সবাই সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে একটা গোটা বই লেখা যায়। কিন্তু কেউ কি লিখবেন? আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় 'বসুমতী' অফিসে দেখেছি ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বহু বৎসর মাসিক ভারতবর্ষ-এর সম্পাদক) কিম্বা বিশ্বপতি চৌধুরীকে, যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাংলা M.A পরীক্ষায় পাশ করে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি নেন। এখনও দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে নামজাদা অনেকেই লিপ্ত রয়েছেন (কিম্বা থেকেছেন) সাংবাদিক কর্মে। হাসি পাচ্ছে ভেবে, কিন্তু না বলে পারছি না যে ইস্কুল কলেজে শিক্ষকতা করে কিম্বা খবেরর কাগজে অনিয়মত এবং অল্প বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ না পেলে বাংলা সাহিত্যের অনেক দিগ্‌গজ লেখককে পাওয়া যেত না।

আজকাল তো বাংলায় শুধু 'এম-এ' নয়, কাঁড়িকাঁড়ি 'ডক্টরেট' প্রতিবছর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখনও সাংবাদিকতায় (বাংলা ও ইংরিজি) বাঙালি (এক্ ভারতীয়) কৃতিত্বের বিবরণ লেখা হচ্ছে না। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বাঙালি ও দক্ষিণ ভারতীয় সাংবাদিকদের যে প্রাধান্য একদা ছিল তা এখন অনেকটা বদ্‌লে গেছে। সঙ্গত কারণেই, কিন্তু এ ধরনের বিবরণ যদি অনুশীলন ও কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি ও পরিপ্রেক্ষিত বোধ নিয়ে লেখা হয় তো দেশের মঙ্গল। এখনকার সাংবাদিকের কাছে আবেদন করি এ কাজে এগিয়ে আসুন।

সাংবাদিকের পক্ষে কত বড় গৌরবের কথা এই যে পরাধীনতার অভিশপ্ত পরিবেশে এবং ইতিহাসের সবচেয়ে চতুর ও বিচক্ষণ-ও সঙ্গে সঙ্গে ভালোমানুষের মুখোস্‌পরা নির্মম

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কৌশলের সম্মুখীন হয়ে ভারতবর্ষ শুধু রাজনৈতিক নয় সকল অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম ও স্বকীয় ভাগ্যনিয়ন্তারূপে গড়ে তোলার বহুমুখী সংগ্রামে যারাই নেমেছেন— দক্ষিণ, বাম, মধ্যপন্থী যাই হোক্ না কেন—তারা প্রায় সবাই সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী; শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ থেকে মুহম্মদ ইকবাল ও আবুল কালাম আজাদ; বিদ্যাসাগর থেকে রানাডে, মহাত্মা ফুলে আর আম্বেদকর; হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে রামস্বামী নায়কর; সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় থেকে চিন্তামণি ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী; কৃষ্ণদাস পাল থেকে সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা; মুহম্মদ আলী থেকে হস্‌রৎ মোহানি; মীর মোশারফ হোসেন থেকে মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী; শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় থেকে নজরুল ইসলাম ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('নির্বাসিতের আত্মকথা'); মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ থেকে সোমনাথ লাহিড়ী; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু— এই যে পরম্পরা একটু ভাবলে মনে ভেসে আসছে (একে সহজেই আরও পুষ্ট করা যায় কিন্তু ভাবছি তালিকা বাড়িয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি), তা শুধু 'অতীত গৌরব বাহিনী' নয়, বর্তমানে আমাদের সকলের, (শুধু, 'জনগণ পথ পরিচায়ক' হবার সম্ভাবনার অধিকারী সাংবাদিকদের অন্বেষণ, অনুশীলন, নিদিধ্যাসনও সর্বসমক্ষে প্রচারের বিষয় নয়?

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুবরণে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাপাল 'Panic in Calcutta'—সাহেবসুবোর সাঙ্গোপাঙ্গ পলায়নের হুড়োহুড়ি। অকুতোভয় হরিশ মুখার্জি লিখলেন এ হল 'Mutiny' নয় 'Revolt'— "যে বিদ্রোহ বিদেশী প্রভুত্বে অবশ্যম্ভাবী অনাচারেরই প্রতিফলন।" সেই সময় "সমাচার সুধাবর্ষণ"-এর সম্পাদক শ্যামানন্দ সেন ছ'মাসের কারাদণ্ড পেলেন। আর কলকাতার উর্দু পত্রিকা "পয়গম্-য়ে-আজাদী"-র সম্পাদক মির্জা বেদার বখ্‌ত-এর ফাঁসি হল, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম সাংবাদিক শহীদকে ইতিহাস পেল।

বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, থেকে কয়েকবছর আগে প্রকাশিত "সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা" বইটি দেখে এবং গ্রন্থের শিরোনাম থেকে বহির্ভূত বহু চিন্তাউদ্দীপক তথ্যের সম্ভারে পুলকিত বোধ করেছিলাম। আমি এখন খুব বেশি পড়াশোনায় অক্ষম। তবে একটা ধারণা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় এবম্বিধ গবেষণা তেমন হচ্ছে না। অথচ এই ক্ষেত্রে 'হিন্দু মুসলমানের যুগ্ম সাধনা' কত কি-ই অজানা রয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দ-বাবুর স্মৃতিরক্ষা ব্যপদেশে এদিকে যদি আমরা উদ্যোগী হতে পারি, সেই আশা উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানিয়ে রাখলাম।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর দুনিয়া জুড়ে শোষণমুক্ত সমসুযোগী সমাজ নির্মাণ যে একই সূত্রে বাঁধা এক লড়াই। তা বিবেকানন্দবাবুর পূর্বোল্লিখিত বইগুলির নামেতেই ধরা যাবে। এ জন্যই তাঁকে দেখা গেছে একই সঙ্গে দেশাভিমানী এবং আন্তর্জাতিক চেতনায় ঋদ্ধরূপে। সময় নেই ব্যাখ্যা করে বলার। কিন্তু এজন্যই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের একজন প্রধান ভারতীয় প্রবক্তা বিবেকানন্দবাবু নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন দেখে যে সোভিয়েটে প্রতিবিপ্লবের প্রাধান্যের ফলে বিশ্বশান্তি সংসদের (যার তিনি সদস্য ছিলেন) সুবিপুল সংগঠন কোথায় মিলিয়ে গেল

আর আমাদেরই স্বদেশীয়, 'Order of Lenin' ভূষিত কম্যুনিস্ট রমেশচন্দ্র হয়ে পড়লেন আজও প্রায় নিরুদ্দেশ, সংবাদপত্রে তার সন্ধান আর মেলে না। সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী প্রয়াস তা স্তব্ধ হয়ে রইল। এবছরের প্রথম দিকে জাপান থেকে আগত এক শান্তি সংগ্রামী দলের উপস্থিতিতে সি-পি-আই (এম)-এর উদ্যোগে কলকাতায় মস্ত সভা হল, সেখানে বক্তৃতা করে, যেন বুকে বল পেলাম যে বুঝি আবার নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধবিরোধী লড়াই আবার চলবে। হিরোশিমার বার্ষিকীতে 'মানবশৃংখল' নাম দিয়ে বিরাট জমায়েত হল, কিছু বক্তৃতা ছাড়া প্রকৃত শান্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি। সাম্প্রতিক বহু বিড়ম্বনা ও বিচ্যুতির কথা তুলছি না, কিন্তু আশঙ্কা যে V.S.Naipaul-এর মতো ব্যক্তি "India : A Million Mutinies Now" গ্রন্থে "the pious Marxist laziness and nullity of Bengal' বলে অসঙ্গত বিদ্রূপ করলেন, তার জবাব দিতে এগোলাম না। বিবেকানন্দবাবুর মতো মানুষের কাছে নিশ্চয়ই যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছে এই পরিস্থিতি।

সম্প্রতি আমাদের রাজ্য ও রাজধানীর নাম বদল নিয়ে একটা আলোড়নের আভাস দেখা দিয়েছিল আর এরই অবলম্বনে 'নবজাগরণ' নাম দিয়ে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার এর প্রধান দাবি, যা এতদিন পূরণ না হয়ে থাকাটাই আমাদের, লজ্জা আমাদের অভিশাপ। কিন্তু গোড়ায় যে গলদ থেকে গেছে সেদিকে নজর পড়েছে কিনা বুঝি না। এটা যখন লিখছি (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) তখন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বামপন্থী এক আলোচনায় আহ্বান এল, ভুল ইংরিজিতে ছাপা এক নিমন্ত্রণপত্রে। 'আজকাল' পত্রিকা সোৎসাহে 'নবজাগরণ'-এর প্রচারে লিপ্ত। অথচ এই কাগজের ১৭ জুলাই '৯৯ তারিখে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় দেখি—"হঠাৎ মুখ ফস্‌কে দু'একটা বাংলা—বিধানসভা না কমন্‌স্ সভা?" শীর্ষক বিবরণ, যা নিয়ে পত্রিকায় বিচক্ষণ সম্পাদক এবং বাংলাভাষা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত সাহিত্যিকদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাইনি। এই রিপোর্টে জানা যায় বিধান-সভাধ্যক্ষ (স্পীকার) মহোদয়ের আগমন ইংরিজিতে ঘোষিত হবার পর প্রশ্নোত্তরপালায় প্রথম প্রশ্ন ইংরিজিতে করলেন পঙ্কজ ব্যানার্জি নামধারী বিধায়ক এবং ইংরিজিতে জবাব দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে যাকে পরিশ্রমী বুদ্ধিমান পার্টিকর্মী বলে জানি। তারপর সওয়াল চল্‌ল (Supplementary প্রশ্ন) দুই পক্ষের ইংরিজি ভাষায়—কেমন যেন ন্যক্কারজনক লাগে না কি?

সামান্য ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করছি হয়তো শুনব। কিন্তু আমি অন্তত কিছুতেই মানতে রাজি নয় "আ মরি বাংলা ভাষা/মোদের গরব মোদের আশা" ধ্বনি দিচ্ছেন যারা তাদের আন্তরিকতাকে। কেমন করে ভুলতে পারি যে ১৯৯৮ ডিসেম্বরে শেষাশেষি রাজ্যের পক্ষ থেকে ভারতগৌরব বঙ্গসন্তান অমর্ত্য সেন-এর সম্বর্ধনা সভায় রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমাবেশে বসে দেখলাম যে বিধানসভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন পাঠ করলেন স্পীকার হালীম ইংরিজি ভাষায়—এটা বাংলায় রচনা করার যে বাধ্যবাধ্যকতা শুধু নয়, একান্ত নৈতিক কর্তব্য ছিল যে বিধায়কদের, তা সবাই—মন্ত্রীরা, সবদলের বিধায়করা, সবাই!—

মিলে বিস্মৃত হলেন। হয়তো এমন বিচ্যুতি বিড়ম্বনাই স্বাভাবিক, যখন দেখি যে ভারতের অন্যান্য প্রায় সব রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় বিধানসভায় ইংরিজির চল বেশি (অদ্ভুত এক শৈথিল্যবশে গত বিশ বছরের বিবরণী যে বিধানসভা ছেপে ওঠার দায়িত্ব পালন করেনি তা ভিন্ন প্রসঙ্গ)। যাই হোক্ এ ঘটনায় সভাস্থলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পাশে উপবিষ্ট বহুদিনের কম্যুনিস্ট সতীর্থ বিনয় চৌধুরীকে বলেছিলাম যে 'বাংলায় বলুন' বলে চিৎকার করে উঠতে চাইছি আর তিনি বললেন : 'ধৈর্য ধরুন, উপায় কি?' বৃদ্ধ বয়সে সভার গাম্ভীর্য ভঙ্গ করার অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত রইলাম। কিন্তু আজও ঘটনাটি মনে হলে কষ্ট হয়। ক্রোধ হয়। ক্ষোভ হয়, শুধু আদর্শ নয় সহজ সাধারণ সাবলীল স্বভাষানুরাগ এমনভাবে লংঘিত দেখে যন্ত্রণা হয়। বিবেকানন্দবাবু বিশ্বশান্তি সংসদে বাংলায় বক্তৃতা করেছেন; সত্যেন মজুমদার মহাশয় যখন ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রগতি লেখকসংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভাষণ দেন তখন তার ইংরিজি তরজমা আমি করি। অমর্ত্য-সম্বর্ধনায় বিবেকানন্দবাবু উপস্থিত থাকলে আমার যন্ত্রণার ভাগ যে নিতেন তা জানি।

আরও অনেক কথা মনে ছুটে আসে যা বলার চেষ্টা করব না। তবু প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করতে গিয়ে মনে ঘুরছে শতাধিকবর্ষ পূর্বে কবি সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর কথা : "আর কবে ভাই মানুষ হবে/দেখে তোর আকার প্রকার আচার বিকার/মানুষ কবে, মানুষ কবে?" কী নিদারুণ বেদনা আজীবন বহন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো মহাভাগ না বলে পারেন নি যে "সাত পুরু চামড়া তুলে না নিয়ে।" বাঙালিকে মানুষ করা যাবে না। "আবার তোরা মানুষ হ"—এ ডাক তো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো মানুষ বড়ো দুঃখেই জানিয়েছেন। সবাই জটিল রবীন্দ্রনাথের অপরূপ আর্তনাদ : "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী/রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করো নি"। আজও কি শুধু বাংলাভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা নয়। অন্য নানা বিষয়ে আমাদের চিত্তবৈকল্য সতর্ক করে দেয় না যে আমাদের সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক বাঙালি গর্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে কার্যক্ষেত্রে যে চিন্তারহিত, শৈথিল্য কণ্টকিত, আবেগ সর্বস্ব, কর্মকুণ্ঠ অসাফল্য আমাদের এই রাজ্যের বর্তমান পশ্চাৎপদতায় প্রকট সেই বিকলতাকে দূর করতে হবে—এ কাজ সহজ নয় আর সবাই তো জানি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ : 'চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না'। বিশ্বায়নের জগৎজোড়া কালো ছায়াকে কাটাতে হলে কত দুরূহ চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে।

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা"—এ কথা প্রচলিত ছিল একসময়, কিন্তু এখন যেন হাসি অন্তর্ধান করেছে আমাদের জীবন থেকে, সাহিত্য থেকে, সাংবাদিকতা থেকে তো বটেই (হয়তো আমার ভুল, তবে জীবনান্তের দেরি তো নেই। সে ভুল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি না।) আর তাই বোধহয় আমাদের অর্থাৎ বিবেকানন্দবাবু ও সমসাময়িক বহুজনের পক্ষ থেকে এই অধম আজ বছর বারো-তেরো ধরে বলে চলেছি : "ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য/বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য/ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ/হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।"

রবীন্দ্রনাথ : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে

লিখতে বসে একটু যে অস্বস্তি বোধ করছি, তা বলে নিতে চাই, আর আশা করি পাঠকদের কাছ থেকে মার্জনা পাব। শিরোনামা যদি হত 'আমার চোখে রবীন্দ্রনাথ' তা হলে নিশ্চিন্তে নিজেরই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা—যা তো আমাদের কাছে মহাভারতের মতোই 'অমৃতসমান'—বলার চেষ্টা করতাম। সেটাই অবশ্য করব, কারণ কেউ তো জন্মাই না মার্কসবাদী কি অন্য কোনও 'বাদী' হয়ে, আর যদি বাস্তবিকই একটা জীবনদর্শন (বা একটু রঙচঙে ভাষায় 'বিশ্ববীক্ষা', জার্মান weltanschauung-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।) অর্জনের স্পর্ধা রাখি তো তাতে সেই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়তে বাধ্য। মুশকিল এই যে মার্কস-তত্ত্ব-সরোবরের সন্তরণ সহজ কর্ম নয়। জীবদ্দশাতেই স্বয়ং মার্কস প্রমাদ গণেছিলেন 'মার্কসবাদী' বলে স্বঘোষিত কিছু ভক্তের বাড়াবাড়ি দেখে। একবার তো বলেন তিনি : "Thank God, I'm not a Marxist!" আবার ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন : "বীজ পুঁতেছিলাম যাতে জন্ম নেয় দৈত্য, আর ফসল তুলছি কি না একপাল পোকা!" ("I sowed dragons, but I reap a harvest of fless?") সবসময় এটা মনে থাকে বলে নিজের সম্বন্ধে একবার "যথেষ্ট ভালো মার্কসবাদী নই" ("not a good enough Marxist) বলার ফলে ছোটখাটো একটা ঝড় উঠেছিল (১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনকালে) যে 'হীরেন মুখার্জি নিজেই স্বীকার করছে সে মার্কসবাদী নয়'। ইংরিজী নবিশরাও কেউ কেউ মাতলেন এই রব নিয়ে—আজ ভাবতে গেলে হাসি পায়। 'দেশ' সম্পাদকমহাশয়কে ধন্যবাদ তিনি আমাকে অন্তত ধরে নিয়েছেন মার্কসবাদীদের একজন প্রতিনিধি বলে। বিশেষত বর্তমানে, মার্কসবাদকে পরিমার্জন করা শুধু নয় তাকে পরিহার করা, মার্কসতত্ত্বের বিশ্বাস নিয়ে অপ্রতিভ বোধ করা আর ইয়োরোপের নানা দেশে মার্কসবাদ বর্জন করার রেওয়াজ যখন প্রবল, তখন আমি কৃতজ্ঞ, বলবার সুযোগ পেয়ে যে সমাজবাদ-সাম্যবাদে আমার প্রতীতি অক্ষুণ্ণ, অনুশোচনার লেশমাত্র না নিয়ে আমি নিজেকে কম্যুনিস্ট বলে ভাবি এবং যথাসাধ্য কর্তব্যকর্মে লিপ্ত থাকার চেষ্টা করি। নিজেকে নিয়ে কৌতুকই করব এই নিয়ে, কারণ মনে পড়ছে বিশ্ববিদিত ইংরেজ লেখক ফিলডিংয়ের 'Tom Jones', উপন্যাসের এক চরিত্র 'Rev Mr. Thwackum' যিনি বলেছিলেন : "আমি যখন বলি 'ধর্ম', তখন আমি বলতে চাই 'খ্রীস্টধর্ম' আর শুধু খ্রীস্টধর্ম নয়, 'প্রটেস্টান্ট ধর্ম', আর কেবল 'প্রটেস্টান্ট ধর্ম' নয়, 'চার্চ অফ ইংলন্ড'।" অনাকর্ষক এই পাদরি সাহেবটির মতোই বলি; "যখন নিজেকে কম্যুনিস্ট বলি, তখন বলতে চাই আমি মার্কসবাদী; আর শুধু মার্কসবাদী নই, সঙ্গে সঙ্গে লেনিনবাদী; আর কেবল তাই নয়, প্রায় পঞ্চান্ন বছর ধরে ভারতবর্ষের কমুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমি জড়িত।" আমার মতো অভাজনের এবম্বিধ বাক্য শুনলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হতেন—তিনি তো ছিলেন ঋষি, ত্রিকালজ্ঞ, আর তাই কতদিন আগে, ১৯২৫ সালে, মুজফফর আহমদ-নজরুল ইসলাম-এর 'লাঙ্গল' পত্রিকাকে

আশীর্বাদ করেছিলেন, ডেকেছিলেন 'বলরাম'-কে তার 'মরুভাঙ্গা দল' নিয়ে সমাজক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলতে, বিবিধ 'ব্যর্থ কোলাহল'কে 'স্তব্ধ' করে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আজ নেই, গোটা দুনিয়াতে নেই তাঁর পরিত্যক্ত হরধনু ভঙ্গ করার মতো মানুষ যিনি বলেছিলেন আজকেরই প্রায় অনুরূপ দুঃসময়ে। "মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারক/শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে/কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী/নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিত বীভৎসা 'পরে/ধিক্কার হানিতে পারি যেন।" রবীন্দ্রনাথ মৃত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরঞ্জীব, মানবমহিমার প্রজ্জ্বলন্ত প্রতীক এই পুরুষোত্তম। তাঁকে নিয়ে 'গর্ব' করি বলেই কখনও 'খর্ব' হব না আমরা।

সব কথা গুছিয়ে বলি কেমন করে, কিন্তু মার্কসবাদী হিসাবেই আনন্দ পেয়েছিলাম জেনে যে মাত্র কয়েক বৎসর আগে ভিক্টর হ্যুগো-র মৃত্যুর পর থেকে শতাব্দপূর্তি নিয়ে ফ্রান্স যখন উত্তাল, তখন সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র সোল্লাসে সোৎসাহে উচ্ছ্বসিত সম্পাদকীয় বিবৃতি দিল যে ফ্রান্স "drunk with Victor Hugo"! আমাদের, অর্থাৎ বাংলা যাদের ভাষা তাদের কাছে ফরাসীদের মনে হ্যুগোর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা যে বেশি তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রজয়ন্তী নিয়ে হয়তো আতিশয্য কিছু ঘটাই আমরা, কিন্তু তাতে বিস্মিত বা লজ্জিত হবার হেতু নেই। নিশ্চয়ই উচিত পরিমিতি রক্ষা করা, নইলে রবীন্দ্রনাথেরই অমর্যাদা ঘটে যায়, কিন্তু কম করে দেখি কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের বাড়াবাড়ি বর্জনীয় হলেও না-হয় হোক, মাঝে মাঝে তো মনের আর মর্মের লাগাম ছাড়ার দরকার পড়ে। আমাদের এই "সার্বভৌম" কবি—শুধু কবি কেন, জীবনের সর্ববিধ শুভব্যঞ্জনায় ভারত-আত্মার হিমালয়সদৃশ প্রতীক যিনি, তাঁকে নিয়ে অহঙ্কার আমাদের রিক্ত জীবনে যে অনন্তপার সম্পদ তা মাথায় তুলে রাখব না?

লিখে চলেছি আর ভাবছি যে হয়তো কেউ খোঁটা দিয়ে উঠবেন যে রবীন্দ্র-দূষণের কলঙ্কের ভাগী কিছু পরিমাণে মার্কসবাদীরা, আর আমারও কোনও পুরনো মন্তব্য তুলে ধরে হয়তো লজ্জা দেওয়া হবে। রবীন্দ্রসমালোচনায় কেবলই প্রশস্তি থাকবে, একেবারেই কোনও অতুষ্টি প্রকাশ পাবে না, প্রয়োজনেও কিঞ্চিৎ কঠোর বাক্য উচ্চারিত হবে না, এমন শর্ত অগ্রাহ্য বলতে আমার দ্বিধা নেই। কিন্তু সজ্ঞানে সচেতনে কখনও তাঁর অমর্যাদা করিনি তা হলফ করে বলতে পারি। ১৯৪৮-৪৯ সালের জগৎজোড়া টালমাটালের যুগে আর আমাদের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার একটা বিরস, প্রায়-বিকট চেহারা সাধারণ মানুষের জীবনকে যখন ব্যতিব্যস্ত করছিল, তখন ছদ্মনামে একজন প্রধান বাঙালী কম্যুনিস্ট বাস্তবিকই বল্‌গা-ছাড়া রবীন্দ্র নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু নিন্দিত হয়েছিলেন নিজের দলের মধ্যেই, স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন যে চিন্তারহিত অবিমৃশ্যকারিতা ঘটিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া এবম্বিধ আতিশয্য যে অভাবনীয়, তাই বা মনে করব কেন? হাতের কাছে বইপত্র নেই, কিন্তু বেশ মনে আছে রুশদেশে বহুদিন আগে সম্ভবত লেরমন্টভ-এর সমাধিকালে সমাবেশ হয় যেখানে বক্তৃতায় ডস্টয়েভস্কি বুঝি মৃত কবির তুলনা করেন পুশকিন-এর সঙ্গে, যা অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। কিন্তু সেখানে উপস্থিত থেকে তৎকালে তরুণ প্লেখানভ নাকি মন্তব্য করেন পুশকিন সম্বন্ধে যে তিনি তো শুধু গেয়ে গিয়েছেন "নৃত্যপটীয়সীদের পদাঙ্গুলি বন্দনা" ("sang of the toes of

ballerinas")! যে প্লেখানভ স্বয়ং লেনিনের সহচর যাকে মার্কসতত্ত্বে পারদর্শী বলে বর্ণনা করেছেন, সেই প্লেখানভ 'বিপ্লবী' উৎসাহাতিশয্যে পুশকিন-এর মতো রুশদেশে সর্বমনের পরম আদরণীয় কাব্যস্রষ্টার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ যদি করতে পেরে থাকেন, সর্বদেশে সমকালীন কর্তৃপক্ষীয়দের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতা যখন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য তখন প্রতিবাদের বহু বিচিত্র, এমন কি অশোভন, প্রকাশও সম্পূর্ণ মার্জনীয় না হলেও বোধগম্য হওয়া সমীচীন মনে করতে পারি, তো, '৪৮-'৪৯ সালে বহুনিন্দিত 'রবীন্দ্র গুপ্ত'-কৃত রবীন্দ্রনিন্দা এমন কিছু স্থায়ীভাবে স্মরণীয় ঘটনা হতে পারে না।

নিজের কথা যখন বলেই চলেছি তখন এখানেই বলে নিই যে ১৯৩৭ সালে সদ্যস্থাপিত প্রগতি লেখক-সংঘের পক্ষ থেকে প্রয়াত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সহযোগিতায় 'প্রগতি' আখ্যা দিয়ে সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা করি—বইটি উৎসর্গিত হয় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বরণীয়েষু।" সুরেনবাবু নিজে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির হস্তে সেটি দেন, সুরেনবাবুকে রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে যে চিঠি দেন তা স্বচক্ষে দেখেছি। 'বরণীয়েষু' শব্দটি আমিই বাছাই করি—বলছি বিশেষত এ জন্য যে ১৯৩৯ নাগাদ সময়ে নিখিলভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের কলকাতা (১৯৩৮ ডিসেম্বর) অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে আমার বন্ধু (পরে রবীন্দ্রচর্চায় স্বনামধন্য) আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে সম্পাদনা করি 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন, যেটিও পৌনঃপুনিকতা সত্ত্বেও আমরা উৎসর্গিত করি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বরণীয়েষু'। একটু মজা লাগছে ভাবতে যে অনেককাল বাদে যখন আমার 'তরী হতে তীর—পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত" (১৯৭৪) প্রকাশ হয়, তখন আবার সেটিকে উৎসর্গ করি রবীন্দ্রনাথকে—'নিত্যস্মরণীয়েষু' অভিধায়। এতেও শানায়নি, কারণ উৎসর্গপত্রেই উদ্ধৃত করি এক শ্লোক : "ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ/তুভ্যমেব সমর্পয়ে।" গোবিন্দের এই উল্লেখ অবিশ্বাসীর মুখে অবশ্য বেমানান। মনে পড়ছে 'তরী হতে তীর' প্রকাশে যার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি আর কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ছিল আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ সেই অকালপ্রয়াত স্নেহভাজন দিলীপ বসু এই 'গোবিন্দ' শব্দটি মানতে পারেননি। কিন্তু আমি পেরেছি এভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ-স্বীকার করতে। আমাদের মতো যারা রবীন্দ্র প্রভাবের যুগে মানুষ হয়েছি, তারা যা কিছু করি তা যেন হল রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিবেদন, তাঁরই বস্তু তাঁকেই যেন জানাবার অক্ষম অভিপ্রায়।

কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করছি না, কিন্তু হয়তো এ জন্যই ভালো লাগে ১৯৫৮ সালে দিল্লিতে প্রশ্নোত্তরে প্রাতঃস্মরণীয় হো চি মিন্-এর উক্তি : "গান্ধীজীর সঙ্গে আমার তুলনা হল অসঙ্গত, কিন্তু বিপ্লবী হলেও আমরা সবাই মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, এর বেশি কিছু নয়, কমও কিছু নয়"। একটু বদলে নিয়ে বলি যে মার্কসবাদী হলেও আমার মতো ভারতবর্ষীয় মানুষের চোখে পুরুষোত্তম ("Hero") হলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। জীবনচিন্তার সামগ্রিকতা, মানবচেতনা প্রবাহের অখণ্ডতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংহতিভিত্তিতে বিশ্ববোধের সহজ সত্যতা রবীন্দ্রনাথে সতত কীর্তিত এবং মার্কসবাদী চিন্তা ও প্রয়াসের শ্রেষ্ঠস্তরে তার নিয়ত ঘোষণা, বাস্তবতার কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষায় তার বিকৃতি ঐতিহাসিক কারণে আর মানুষেরই অনিবার্য অক্ষমতা হেতু যতই মর্মন্তুদ হোক না কেন।

সেদিন হঠাৎ দেখলাম রবীন্দ্রনাথের "গানের ভাণ্ডারী" দিনেন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠি, যাতে তিনি কোন একটা ঘটনাব্যপদেশে বলছেন : "মঙ্গল কখনো মরতে পারে না। যদি তা মরে তো উচ্চতর মঙ্গলকে জীবন দিয়ে তবে মরবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নেই"। চমকে উঠতে হল; ভাবলাম আজ যখন ইয়োরোপে সোসালিজম-এর বিপর্যয় নিয়ে বহু বিচিত্র বিচিন্তা, তখন মন গভীর উক্তি শুনছি না 'মার্কসবাদী' ছাপ-মার্কা মহলে। কিন্তু কী সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ যেন আশ্বাস দিচ্ছেন। আশীর্বাদ করছেন, পতন-অভ্যুদয়ের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করছেন। সাধে কি সবাই দেখেছি যে 'নোবেল'-পুরস্কৃত কবি Joseph Brodsky সাম্যবাদী বিশ্বাস হারিয়ে লিখছেন 'Lullaby of Cape Cod' : "Having sampled two/Oceans as well as continents/I feel that I know/ What the globe itself must feel/There's no where to go!" কোনও 'বাদ'-এর খাতায় কখনও নাম না লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথ-জীবনান্তের সামীপ্যে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটে ব্যথিত ও শঙ্কিত হয়েও মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোকে মহাপাপ বলে ধিক্কার দেন, স্বমহিমার ভাস্বরত্ব নিয়েই তাঁর ঘোষণা যে, আমাদের এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই আবার ঘটবে মানুষের জয়যাত্রা। দুঃখ আজ যে, এমন বহ্নিমান ঋষিবাক্য থেকে অধুনা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থশক্তি মার্কসবাদ প্রেরণা সংগ্রহ করে না।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ করি আমার দশবছর বয়সে। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় আমাদের বাড়ির খুব কাছে ওয়েলিংটন (এখন রাজা সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে। গেটের কাছে ভিড়ে আমিও ছিলাম—মনে আছে যেন আওয়াজ উঠল 'ঐ রবি ঠাকুর!' আর আলখাল্লা-টুপিপরা দীর্ঘদেহ কবি নামলেন প্রবেশদ্বারে। আমাদের বইয়ে ঠাসা বাড়িতে মানুষ হয়েছি বলে তখনই 'রবি ঠাকুর' অচেনা ছিলেন না। 'কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতাই তখন মুখস্থ—আবৃত্তি করাতেন গুরুজন : "নব বরষেতে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা"। কিশোর বয়সেই আবিষ্কার করলাম অপরূপ এক 'কাব্যগ্রন্থ'। সম্পাদনা করেছিলেন মোহিতচন্দ্র সেন—'বঙ্গবীর'-এর চেহারা তখনই পেলাম : "তবে আর কিছু নাহি প্রয়োজন/সভাতলে মিলি বারো তেরোজন/শুধু তরজন আর গরজন এই করো অভ্যাস।" পরাধীনতার যন্ত্রণা বুকে খোঁচা দিতে শুরু করে তখনই, আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব" ধরনের ঘোষণায় যেন একটু উপশম ঘটত। দাদু ও বাবার কাছে শুনতাম রবীন্দ্রনাথের কথা—দাদু কিছুদিন 'হিতবাদী' পত্রিকায় ছিলেন, তাতে বুঝি "রবিবাবু"ও লিখতেন। পিতৃবন্ধুদের মধ্যে একজনের হৃদ্যতা ছিল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর। যার তালতলাস্থ ডাক্তার লেনের বাসায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুঝি হঠাৎ এক একদিন ছ্যাকরা গাড়ি চড়ে জোড়াসাঁকো থেকে আসতেন। বাড়িতে ডাঁই-করা বই আর মাসিকপত্র—'সাহিত্য' 'নারায়ণ' থেকে 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে খাতির ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী'-র (সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজী 'মডার্ন রিভিউ') আর বড়োদের মতে কেমন যেন 'ন্যাকা ন্যাকা' ভাব সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-এর। একটু বড়ো হয়ে আলমারির মধ্যে খুঁজে পেলাম 'রবিয়ানা', রবীন্দ্রদূষণে ভরা এক পুস্তিকা, বোধ

হয় সরিয়েই রাখা হয়েছিল আমাদের নজর থেকে। ভালো লাগেনি সেই চটি বইটা। কারণ রবীন্দ্ররচনায় তখনই মন মজতে আরম্ভ করেছে। ঝাপসাভাবে মনে আছে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের 'নাইটহুড' পরিত্যাগ; বাবার কাছে শুনলাম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের রোগশয্যায় কবি স্বয়ং পড়লেন পদত্যাগপত্র আর সর্বজনশ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রবাবু তাঁর পদধূলি নিয়ে বললেন যে মরতেও আর যেন দুঃখ নেই। 'রবি ঠাকুর' আমাদের চোখে তখনই বিরাট এক মহাকবি শুধু নন, মহাপুরুষ বলে স্থান নিয়েছেন—সেই অনুভূতির রেশ আজও কাটেনি।

আমার ছেলেবেলার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ১৯২৩-২৪ সালে কলেজে বোলপুর ফেরৎ অধ্যাপকের বারণ না মেনে একবার চলে গেল জোড়াসাঁকোয়, অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে। অবাক হয়ে দেখলাম পাতা-ভর্তি কবিহস্তে লেখা একটি কবিতা ('প্রবাহিনী'-তে পরে প্রকাশিত) নিয়ে এল, বিকেলের জলখাবার, পেট পুরে খেয়ে এল (ঠাকুর বাড়ি থেকে মিষ্টিমুখ না করে কেউ বুঝি ফেরে না)! মাঝে অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে (১৯২১ সেপ্টেম্বর) তখন তৎকালীন গান্ধী-অভিভূতির মেজাজে একটু আঘাত পেয়েছিলাম কারণ, গান্ধীর সঙ্গে কবির বিতর্ক চলেছিল—'সত্যের আহ্বান' ঘোষণা করে কবি গান্ধীর ভুল ধরিয়ে দিচ্ছিলেন, কয়েকমাসের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি যে ভুয়ো তা বলতে কুণ্ঠিত হননি, সবাই রোজ একঘণ্টা চরকা কাটলেই ইংরেজ পালাতে বাধ্য হবে বলে মানুষকে চাঙ্গা করাকে বুজরুকি বলে বর্ণনা করেন। যুক্তির পথ ছাড়ার বিপদ বুঝিয়ে দেন, বিলিত কাপড় পোড়ানর নিন্দা করেন আর গুরুবাদ ব্যাপারটারই অকল্যাণ দেখাতে গিয়ে বলেন যে গুরুপদভজনে স্বর্গলাভ সম্ভব হলে তেমন স্বর্গের জন্য তিনি লালায়িত নন। গান্ধীজীর জাদুকরী প্রভাব তখন এমনই যে এ-ধরনের কথা সবাই বুঝে উঠত না। তবে মহাত্মা নিজে বুঝতেন, আর বিতর্ক হয়েছিল অবিস্মরণীয় পরস্পর সৌজন্য সহকারে। এ বিষয়ে রম্যাঁ রলাঁর অপূর্ব সুন্দর বিবরণ রয়েছে—এখানে উল্লেখ করছি শুধু এ জন্য যে এই দুই মহামনার সম্পর্ক সহায় হয়েছিল আমাদের মনের অনেকগুলো দরজা খুলে দিতে। গান্ধী আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথ টানলেন যেন বেশি করে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই যেন শেখালেন গান্ধীজীকে তুচ্ছ করার মতো ক্ষুদ্রতা যেন কখনও না হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে উঁচু ক্লাসে যখন পড়ি, তখন ছাত্রদের উদ্যোগে "রবীন্দ্র পরিষদ" গঠিত হয়। বিরাট বিদ্বান দর্শনশাস্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে সভাপতি করে। তার পাণ্ডা না হলেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল আর দেখলাম যে প্রায় যেন পাল্লা দিয়ে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' গঠিত হল। আমরা কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই আচ্ছন্ন, আর সে জন্যই বুঝি সৌষ্ঠব বজায় রইল, ঝগড়া বাধল না। বেশ মনে আছে একদিন কলেজ সভায় বন্ধু সুশীলকুমার দে (পরে আই-সি-এস) গাইল অতুলপ্রসাদের 'ওগো সাথী মম সাথী' আর রবীন্দ্রনাথের সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করবো নিবেদন'—তারপর দেখি ছটফট করছে, আমায় বললে 'তোমার কোনটা ভালো লাগল বলতো?' তার জবাব দিলাম : 'কেন? সকল দুখের প্রদীপ-টাই তো'। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ভয় হয়েছিল বুঝি অসম্মান করে ফেলেছে

রবীন্দ্রনাথকে। অনেকে হয়তো বুঝবেন না কি বলতে চাইছি। আসলে একটা আচ্ছন্নভাবই ছিল আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। এটা কেটে গেল সহজেই, একাধিকবার কবির কাছে যেতে পারার ফলে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে : তিন চারজন আমরা গিয়েছি কি যেন জানাতে। তিনি সহজ সরসভাবে কথা বললেন আর বোধহয়, তখন সদ্যলেখা গান গাইলেন; "একটুকু ছোঁওয়া লাগে। একটুকু কথা শুনি"—সেদিনই গেয়েছিলেন, একটু যেন কাংস্য কণ্ঠে, বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে, "তবু মনে রেখো"—এটা তেমন ভালো লাগেনি। কিন্তু "একটুকু ছোঁয়া লাগে" যেন কবিকণ্ঠে আজও শুনতে পাই। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের গলায় এটি শুনি—তাঁরই একটি রচনায়, দেখেছি রবীন্দ্রনাথ একদিন হঠাৎ তাঁকে এবং অল্প কয়েকজনকে মৃদুস্বরে শুনিয়েছিলেন : "সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে/সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে", আর কেমন যেন উদ্বেল হয়ে বলেছিলেন : 'তোমরা বুঝবে না আমার দেশকে আমি কত ভালোবাসি।" স্মৃতি থেকে লিখছি বলে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণপণে চাইব আমার মূল বক্তব্য যেন পাঠকদের এড়িয়ে না যায়।

আমার সৌভাগ্য যে অক্সফোর্ড বাসকালে দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে ১৯৩০ সালে—বাইবল-এর ঋষিমূর্তি নিয়ে Hibbert Lectures দিলেন, কলেজের প্রকাণ্ড রঙিন কাঁচ-এর জানলা থেকে অপরাহ্ণের রৌদ্র এমন আভা দিল সেই মূর্তিতে যে বিদেশী বিভাষী বিরূপমতি শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইল। কবিকে যে বেশ কয়েকজন পার্শ্বচর একটা গণ্ডীর মধ্যে আটকাচ্ছেন তা বুঝতে কিন্তু দেরি হল না। তবে দেখলাম তাঁকে সহজ স্বস্তিতে যখন এলেন ভারতীয় ছাত্রদের 'মজ্‌লিশ্‌'-এ। সেই সংবর্ধনাকালে একটু বিচলিত হতে হল তাঁকে। কিন্তু দেখলাম প্রতিভার বিভূতির এক অবিস্মরণীয় আভাস। আমাদের মধ্যে একজনই তখন পাতে দেওয়ার মতো গান করতে পারতেন আর আমার সেই বন্ধু মহীন্দ্রলাল মিত্র দুরূহ কর্মটি করতে গিয়ে উদ্বোধনী গাইলেন : 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী", সেটা শুনে রবীন্দ্রনাথ (রক্তমাংসের মানুষও তো তিনি) একটু হেসে বললেন : "এটাকে স্বদেশী গান বলো তোমরা?" সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে মজলিশ-সভাপতি (উত্তরপ্রদেশের মুসলমান) বলে ফেললেন : "কবি, তোমাকে পেয়ে আমাদের কত আনন্দ, কত গর্ব। কিন্তু দেশে আজ তুমুল লড়াই চলছে, আমাদেরও মন চঞ্চল, তুমি এখানে কেন, গান্ধীজির পাশে কি তোমার স্থান নয়?" একটু আমাদের দিকে ঝুঁকে কবি বললেন : "আমার কোনো বই কাছাকাছি আছে?" ছুটে গিয়ে একখণ্ড 'চয়নিকা' (বিলেতযাত্রার পূর্বে পাওয়া বন্ধুদের উপহার) নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। যেটি হাতে নিয়ে প্রথমে বললেন : "তোমরা বুঝবে না, কিন্তু গান্ধীজি জানেন আমার নিজস্ব হাতিয়ার নিয়ে একই লড়াইয়ে আমি রয়েছি, দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতবর্ষের চারণ আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি"। আর পড়লেন "দুঃসময়" কবিতাটি : "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে/সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া/যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে/যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া/মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন-মন্তরে/দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা/তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর/এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

সেই "চয়নিকা" আজও সযত্নে রয়েছে আমার মেয়ের কাছে। আবৃত্তি যে কত অর্থঘন

হতে পারে, তা আগে জানিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠ থেকে পূর্বে শোনা সত্ত্বেও। অনন্য কালজয়ী প্রতিভার সেই উদাত্ত উচ্চারণ কখনও ভুলতে পারব না। কবির সেই দৃপ্ত প্রজ্ঞালোকিত দেশাভিমানী মূর্তি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। তখনও জানি না, তিনি যাবেন সোভিয়েট দেশে, "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ" দেখবেন, সমাজদেহ থেকে লোভ-রূপী "মৃত্যুশেল" উদ্‌ঘাটিত করার প্রবল প্রয়াসকে আশীর্বাদ করবেন। স্বদেশ ও বিশ্বের হিতকল্পে অবিকল প্রব্রজ্যায় আমৃত্যু প্রবৃত্ত থাকবেন। চোখের আর মনের সামনে সেদিন প্রতিভাত হয়েছিল শুধু মহাকবি নয় এক মহামানবের মূর্তি, যাঁর জীবনব্রত হল 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো," তত্ত্বের গণ্ডীতে যাকে বাধা যায় না অথচ সর্ব শুভ তত্ত্বের সারাৎসার তাঁর আয়ত্ত, "মনুষ্যধর্মের" যিনি প্রোজ্জ্বল প্রবক্তা যাঁর মূল অধিষ্ঠান স্বদেশেরই ভিত্তিভূমিতে, কিন্তু চিত্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত সর্বজনের অন্তরে।

১৩৪৭ সালের ১ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন ঋগ্বেদের এক আশ্চর্য বচন : "অগুনী তো পুনরস্মাসু চক্ষুঃ/পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্/জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্/অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি"। ("প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ আবার দিয়ো ভোগ। উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো")। একই উপলক্ষে তিনি বলেন : "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" এখানে সন্ধান মিলবে এক বৈপরীত্যের সহাবস্থানের। অত বড় চক্ষুষ্মান ("হে সূর্য, হে আমার বন্ধু") হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের বহুযুগব্যাপী চিন্তায় পরম সৌকর্যে লালিত নির্লিপ্তি সতত আকর্ষণ করেছে। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় যে, বর্হির্দৃষ্টিকে হ্রস্ব করে দিয়েছে, হয়তো অগোচরে অনুভূতির নিছক মানবীয় অন্তঃসারকে শীর্ণ করে দিয়েছে। হয়তো বা কিছু পরিমাণে কাব্যসত্যের লঙ্ঘন ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষে চিত্তবৃত্তির পরম্পরা এমনই ঐশ্বর্যের অভিসারী যে তার কল্যাণে সত্তার সন্ধান ও 'বিশ্বসাথে যোগে'র সূত্র আবিষ্কারের দুরূহতা হ্রাস পায়। তুলনার কথা নয়, তবে মনে পড়ছে ফ্রান্সে কবি রাসিন্ (Racine)-কে বোয়ালো-র (Boileau) পরামর্শ : "অনায়াস কবিতা কষ্ট করে লিখতে হয় সেটা শেখা চাই"। ভারত মহিমার কল্যাণে আমাদের কাছে এই দুরূহতার পরিমাণ কমাতে আমরা পারি, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ বিপদও থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ অন্তত সহজ পথে চলতে চাননি। যদিও হাতের কাছে প্রায় স্বতঃসৃষ্ট ঐতিহ্যগত সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব চলেছে এমনভাবে যাতে খর্বতা সর্বদা বিলীন হতে পেরেছে। কীর্তনানন্দের মতো বস্তুকে বিদ্রূপ সহজ হলেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো ব্যাপার নয়, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথ অন্তত কখনও নিজেকে মাতোয়ারা হতে দেননি। তবে হয়তো কিঞ্চিৎ কৌতুকসহকারেই বলা যায় যে, অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টি (কিংবা অনুরূপ চিত্তকল্প) বিষয়ে তাঁর মায়া একটু বেশি ছিল। অভিজাত শব্দটি দ্ব্যর্থক বলে ব্যবহারে বিপদ আছে। তবে কেমন যেন আপনা থেকে সুসংস্কৃত পরিমিতিবোধ থাকার ফলে তাঁর কাছ থেকে সবাই পেয়েছি (ব্যতিক্রম ঘটে গেলেও) এক বিশিষ্ট মহিমা যার দেদীপ্যমান সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যের গৌরব।

পৌষ ১৩৩৮-এ ছিদ্রান্বেষীদের অপ্রতিভ করেই যেন এক ভাষণে কবির অভিমান ও সঙ্গে সঙ্গে অমিত অথচ শোভন শ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছিল :

"আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে। আমি প্রণাম করেছি মহৎকে। আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে। আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি, অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

শ্রদ্ধাস্তব্ধ মনে অনুধাবন করতে হয় এমন উক্তি যা নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যেই আপাতবিচারে কবিগুণান্বিত বহুজনের মুখে স্মিতহাস্যের উদ্রেক ঘটাবে, কিন্তু ক্ষতি নেই। 'গুরুদেব' বলে প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে রবীন্দ্রভজনের সব চেয়ে সজোর প্রতিবাদী তো ছিলেন কবি নিজেই। তবে কষ্ট হয় বইকি দেখে যে প্রতিষ্ঠিত ('মার্কসবাদী' নয়!) বাঙালী কবি হয়তো বা আত্মপ্রচারের অচেতন প্ররোচনায় ঘটা করে বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন না : "রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমায় টানে না, সেখানে হাড়মাংসসহ যে-জীবন তা বিশেষভাবে অনুপস্থিত"। সূত্র উল্লেখ করব না, অহেতুক অপ্রসন্নতার বৃদ্ধি নাই বা ঘটালাম। আর তা ছাড়া, এ নিয়ে অতিরিক্ত মস্তিষ্কপীড়া নির্বুদ্ধিরই পরিচয় দেবে। মস্ত কেতাব লিখে রবীন্দ্রকীর্তির পরিচয় দেওয়া যায় না। প্রবন্ধের পরিসরে সে-চেষ্টা তো বাতুলতা। কিন্তু মনে পড়ে যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রতিভার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছে আবার মাঝে-মাঝে শুধু যে বিপরীত মেরুতে অবস্থান তাই নয়, থেকে থেকে ক্বচিৎ কদাচিৎ হলেও লক্ষ করার মতো অপরুচিতে অবতরণ—এতে কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ, ভারসাম্য ফিরে এসেছে, সুশালীন সিদ্ধান্তে উভয়েরই আত্মিক স্বস্তি পাঠকদের আশ্বস্ত করেছে। মার্কসবাদীদের সম্পর্কেও দেখা যাবে ভিন্ন কালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন মত—দেখা যাবে হয়তো জ্ঞানের স্বল্পতা বা বিচারের বিপত্তি বা রুচির স্খলন, কিন্তু সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে রবির কিরণের মতোই স্পষ্ট হবে যে তত্ত্ব কর্ম নিয়ে সর্ববিধ বিতর্ক ও বিস্ফোরণকে ছাপিয়ে আমাদের সকলের গর্ব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কেমন করে ভুলি মার্কসবাদে সহজ সরল বিশ্বাসী কবি দিনেশ দাস অজস্র পরিপ্রশ্নকে ছাপিয়ে প্রণিপাতের ভঙ্গিতে লিখে গেছেন মধুর-মহৎ পংক্তি : "তোমার পায়ের পাতা/সবখানে পাতা/কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম?"

মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা আজও আমাদের রীতিমতো দুর্বল, অপরিণত, লঘু। কারও নাম ধরে কিছু বলতে অরুচি। তবে নাম করব দুজনের যারা চলে গেছেন আর কখনও ঠিক কোনও দলের চাপরাশ গায়ে না দিলেও ছিলেন মূলগত বিচারে মার্কসবাদী বিশ্বাসে

অবিচল। একজন একেবারে অপরিচিত ও বিস্মৃত, কিন্তু আমার গুরুস্থানীয় বন্ধুরূপে আমার কাছে নিয়ত সমাদরণীয়—জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, অক্সফোর্ডে ইংরিজি সাহিত্যে বহুমূল্য গবেষণা করেছেন, এডোয়ার্ড টম্‌সন-এর পর সেখানে বাংলা পড়িয়েছেন, বিলাতের অন্যত্রও অধ্যাপনা করেছেন, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর প্রবাসী থেকে সেখানেই ১৯৭৫ সালে দেহরক্ষা করেছেন। স্বদেশের প্রতি একান্ত ভালোবাসা নিয়ে অভিমান ভরে এই যে প্রবাস-জীবন, তাতে তার দুঃখ কম ছিল না—আমায় বলতেন : "এই বর্ণবিদ্বেষী দেশের পোকাগুলোও আমার মরা হাড়ে মুখ দেবে না। তবুও এখানে মরতে হবে"। যাই হোক, ১৯৩৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রচারিত ভারতীয় প্রগতি লেখকসংঘ বিষয়ে ইশতেহারটি রচনায় তাঁর হাত ছিল অনেকটা, আর হয়তো খানিকটা প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করেছিলেন "Bengali Literature" (Oxford University Press, 1948) রচনা করে, যাতে ফাঁক এবং ফাঁকি (আমাদের প্রায় সকলেরই স্বভাব অনুযায়ী!) থেকে গেলেও (খানিকটা দীর্ঘায়ত প্রবাসের অনিবার্য ফলে) বোধহয় ইংরিজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মার্কসবাদী বিশ্লেষণ মিলবে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা এতে নেই। কারণ, বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী তথ্য আলোচিত হয়নি। তবুও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনিবার্যভাবে অনেক কথা আছে, পশ্চিম জগতে রবীন্দ্রনাথকে একদা প্রায় যেন মাথায় তুলে নৃত্য এবং তারপর অনেকটা অসূয়া ও অবিদ্যা-জনিত অবজ্ঞার ব্যাখ্যা কিছুটা আছে ওই গ্রন্থে, কিন্তু বেশ বোঝা যাবে প্রখর শাণিত সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ বিতর্কাতীত গৌরবের মহিমা সানন্দে স্বীকৃত। বহুদিন আগে 'পরিচয়' পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা করেন আমার অতুলন সুহৃৎ বিষ্ণু দে, যিনি মার্কসবাদী তক্‌মা লাগিয়ে পার্টিতে নাম লেখানো অকাট্য ভাবেননি কিন্তু আমৃত্যু ছিলেন চিন্তার গভীরে মার্কসতত্ত্বের মহিমায় সুস্নাত। যাকে স্বয়ং মার্কস বলতেন, "The Party in the grand historical sense of the term", তারই শিরোভূষণ তাঁকে বলতে ইতস্তত বোধ করি না।

হয়তো বহু সদভিসন্ধিভিত্তিক অথচ অক্ষম ও অপ্রতুল মার্কসবাদী সমালোচনার ত্রুটি অনেকটা স্খালন হবে যদি এখানে বিষ্ণু দে-র কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরি : "একটু শ্রমস্বীকার করলে আমরাই উপলব্ধি করতে পারব 'কবিকাহিনী'-র আশ্চর্য বালক নিবিষ্ট কিন্তু স্বাভাবিক মননে ক্রমান্বয়ে নিজের অখণ্ড বিকাশে গভীরতা ও প্রসার অর্জন করেছেন, বাস্তব জীবনের সব দিকের সমস্যায় সঙ্কটে লগ্ন হয়ে বিরাট রাষ্ট্রবিদের মতোই সমাধানের পথ ভেবে ভেবে আবার ক্রমান্বয়ে শিল্পসাহিত্যে সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে জীবনসংলগ্ন অভিজ্ঞতার ধাক্কাতে রূপান্বিত করে বিজেতা শিল্পকীর্তিতে। ক্রমান্বয়েই, কোনও সিদ্ধি-সাফল্যেই আবদ্ধ না থেকে। সমাজ-উত্তরণ ও বিকাশ ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে, ক্রান্তি পরম্পরায়, মৃত্যুকাল অবধি"। "প্রতিভাধর আরও কেউ কেউ থাকলেও এই অন্তরঙ্গ ব্যাপ্তি ও গভীরতায় গোটা দেশে নিত্য প্রভাবের এবং বহুবিধ সংবেদনের দিক থেকে কেউ রবীন্দ্রনাথের তুল্য নয়।"

চিন্তাঘর এই বাক্যসমষ্টির টীকা প্রয়োজন হতে পারে সাধারণ পাঠকের পক্ষে, কিন্তু তা আমার পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভবও। তবে ধরে নিতে পারি 'দেশ'-এর মনোযোগী

পাঠকেরা চাইবেন সেই মানসিক পরিশ্রম করে নিতে। এমন সংহত বাক্য ব্যবহারে, আমাদের সর্বগরিষ্ঠ কবি (স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাকে মহাভারতকার ব্যাসদেবের পার্শ্বে স্থান দিতে চেয়েছিলেন) সম্পর্কে অধুনাতন কালের একজন প্রমুখ কবি-মনীষীর চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে যে উদ্ধৃতি দিয়েই আমি তুষ্ট।

'তুষ্ট' শব্দটি লিখেই ভাবছি যে, বলতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এত বিপুল, এত বিচিত্র, এত সীমাহীন যে নানাদিক থেকে অপরিতুষ্ট আমরা থেকেছি আর সেজন্যই যেন কতকটা অবিবেকবশেই কখনও কখনও উষ্মা প্রকাশ করে বসেছি। হয়তো এটা ঘটেছে যে, স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে একটা যেন বিমূর্ত ধারণার পটভূমিতে বিচার করতে লেগেছি। ভুলে বসেছি কী ধরনের নিঃস্বতার পরিবেশে, চিত্তৈশ্বর্যের ক্ষুদ্রতার মধ্যে, নিষ্প্রাণ নকলনবিশীর আবহাওয়ায়, ভারতজীবনের এক অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় (মনে আসতে পারে 'The Legacy of India' গ্রন্থে সংকলক G. T. Garwatt-এর মন্তব্য যে ইংরেজ শাসনকাল হল ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে অনুর্বর অধ্যায়) তিনি জীবন কাটিয়েছেন। বহুকাল আগে মহাকবি গ্যেটে খেদ করেছিলেন পরিবেশ "নোংরা" ("Shabby") আর "নিরীহ" ("tame") বলে প্রতিভার কী পরিমাণ অপচয় ঘটে থাকে। সব কিছু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, অসূয়া আর নির্বুদ্ধিতার গঞ্জনা ক্রমাগত সইতে হয়েছিল, সমকালীন সমাজজীবন থেকে সহায়তা মিলেছে অতি অল্পই (আর কিছুটা মিললেও স্বদেশীযুগের মতো আবার তাঁকে ক্লিষ্টমনে কক্ষচ্যুতির বেদনা পেতে হল)। এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কীর্তি, শুধু সাহিত্য নয় শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত অর্থে নবজীবন নির্মাণের বাস্তব ব্যাপৃতিতে, এমনই ভাস্বর যে, বিশেষণকে ব্রীড়ানত হয়ে সরে যেতে হয়।

তবুও বলতে হয়, শুধু মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অন্যদিক থেকেও বেশ কিছু অতুষ্টি আমাদের রয়ে গেছে। হয়তো অকিঞ্চিৎকর একটা অনুযোগ এই যে ইয়োরোপের সত্তার মধ্যে যে মহিমা তা তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু ফাঁক বেশ কিছু থেকে গেছে এবং তারই ফলে দেখি যে, সাহিত্য গবেষণার নামে মাদাম ওকাম্পো-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য ও সামীপ্যের উদ্ভট চর্চা ঘটতে পারে, এমন পণ্ডিতম্মন্য চর্চা যা কবিমানসের গহনে প্রবেশের অক্ষম, আর পাশ্চাত্য জীবনচর্যার কল্যাণে পরস্পরসখ্যের মধ্যে যে অনাবিল মধুরিমা কবিচিত্তকে স্পর্শ না করাই এক অভিশাপ, তাকে বুঝতেই অপারগ। এ নিয়ে বাক্‌বিস্তার বিরক্তিকর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যখন আমরা পেয়েছি যাকে Dryden-এর ভাষায় বলা যায় 'God's plenty', যখন তাঁর 'স্বদেশী গান' হল এমন যার তুলনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নেই, যখন তিনিই জগতের একমাত্র কবি যিনি হলেন দুটো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের (ভারত, বাংলাদেশ) জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, যখন তাঁরই গান আর কবিতা কণ্ঠে নিয়ে বহু বিপ্লবী ফাঁসিকাঠে উঠে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, যখন দেশের মানুষের মুক্তিপ্রয়াসে তাঁর অবদান হল তুলনাহীন, তখন তিনিইবা কেন লিখলেন "চার অধ্যায়"? ক্ষুব্ধকণ্ঠে একজনকে বলতে শুনেছি যে, না হয় বিরক্ত হয়ে "ঘরে বাইরে" লিখলেন (ওতে ভালো বস্তুর অভাব নেই) কিন্তু "চার অধ্যায়" বরদাস্ত করা যায় কি? এখানে জবাব

চাইছি না, শুধু প্রশ্নটি—জবাব অবশ্য আছে, তা সত্ত্বেও। আর এর থেকে জোর দিয়ে ওঠে একটা কথা যা অধুনাসৃষ্ট বাংলাদেশের একজন প্রমুখ মনস্বী, আহ্‌মদ শরীফ সাহেব তুলেছেন। বিশেষ করে নামোল্লেখ করছি এ জন্য যে, আহ্‌মদ শরীফ্ বাংলা সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে মুক্ত মন নিয়ে বহুমূল্য গবেষণা বহুদিন ধরে করেছেন, স্পষ্টবক্তা অকুতোভয় বিদ্বান বলে তাঁর খ্যাতি। রবীন্দ্রমাহাত্ম্যে কারও চেয়ে কম মুগ্ধ না হয়েও একবার লিখেছিলেন : "যে রবীন্দ্রনাথ প্রমত্তা পদ্মায় জেলে-মাঝিকে ডুবে মরতে দেখেছেন, পদ্মার যমুনার তীর ভাঙনে হাজার হাজার গরীব চাষীমজুরকে নিঃস্ব হতে, উদ্বাস্তু হতে দেখেছেন, দেখেছেন সচ্ছল চাষীকে সপরিবারে পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে, প্রত্যক্ষ করেছেন দুর্ভিক্ষে অনাহারে-অপুষ্টিতে তুচ্ছ রোগে ভুগে-ভুগে অকালে অপমৃত্যু কবলিত হতে হাজার হাজার নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর-নির্বিরোধ মানুষকে। আরও দেখেছেন, তাঁরই হুকুমে বা সম্মতিতে তাঁরই গোমস্তাদের খাজনার দায়ে তাঁরই প্রজার ঘটি-বাটি ক্রোক করতে, প্রজাকে ভিটে-ছাড়া করতে, বারবার দেখেছেন ঝড়-খরা-বন্যাতাড়িত মানুষের চরম দুঃখদুর্দশা ও অপমৃত্যু—সেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল-বিচিত্র রচনায় এদের নাম-নিশানামাত্র নেই কেন?..." ('এবং আরো ইত্যাদি' ঢাকা ১৩৯৩, পৃ. ১৫৪) । জানি এর জবাব আছে, তবে ভুলি কেমন করে যে, শ্রেণীসমাজের ক্লেদ থেকে যাঁকে পুরুষোত্তম বলে বন্দিত করেছি এই প্রবন্ধে, সেই রবীন্দ্রনাথও নিস্তার পান না। কেমন করে ভুলি আজও যা প্রবলভাবেই প্রকট—মহাচীনের নায়ক মাওৎসে-তুংয়ের বাক্য : "Never forget the class struggle" ("কখনও শ্রেণীসংগ্রামকে যেন ভুলি না!")? রবীন্দ্রনাথের তো অজানা ছিল না শ্রেণীস্বার্থে সঞ্চালিত সমাজের চেহারা—আজও তো বড়াইয়ে—ভরা কলকাতা শহরে দেখি একদিকে একদিনের হোটেল-বিহারে একজনের খরচ কয়েক হাজার টাকা আর দোকানের ধারে ফুটপাথে ফেলে-দেওয়া আইস্-ক্রীমের কৌটো সাগ্রহে চাটছে নিঃস্ব ঘরের নিষ্পাপ বুভুক্ষু শিশু।

শেক্‌স্‌পীয়র-এর মতো সাহিত্যসৃষ্টির তুঙ্গনাথকে নিয়ে ভল্‌তেয়ার থেকে বার্নার্ড শ'-এর বিরূপোক্তি অনেকেরই জানা, তবে মনে হয় এটা যেন কিছু পরিমাণে বৈরিভাবে ভজনারই প্রকাশ। আহ্‌মদ্ শরীফ্ সাহেবের বক্তব্যকে হয়তো সেভাবে দেখা যেতে পারে। যারা "রবীন্দ্রনাথ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবসুলভ আবেগে ভক্তিতে বিগলিত হন", তাদের "মন-বুদ্ধি, রুচি-চিন্তা চেতনা-বিবেক-বিবেচনার পরিপক্কতায় আস্থা অটল রাখা সম্ভব হয় না", যখন তিনি বলেছিলেন তখন এই সতর্কবাণীর প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু সম্ভবত নিজেই তিনি সামগ্রিক বিচারে মানবেন যে "রবীন্দ্রনাথের শক্তির ও রচনার অসামান্য গুণমান-মাত্রা ও মাহাত্ম্য" (যা তিনিই অকুণ্ঠে অভিবাদন করেছেন) ছিল এমনই যে ছিদ্রান্বেষিতা ক্ষুদ্রজনের জন্য ছেড়ে রেখে সেই মহাজীবন ও আশ্চর্য কর্মব্যাপৃতি ও চিত্তৌদার্য ও মানবমমতাকে অতুল সম্পদ নিয়ে গর্বোচ্ছ্বাসও অসঙ্গত নয়—কেবল সাবধান থাকা চাই যাতে আমাদের স্বভাবশৈথিল্য উস্‌কানি পেয়ে বিকৃতি সৃষ্টি না করে। রবীন্দ্র প্রতিভার সামনে প্রণিপাতে ক্ষতি নেই কিন্তু যথাযথ পরিপ্রশ্ন বিনা তা ব্যর্থ হবে। রবীন্দ্রগরিমারই অবমাননা ঘটবে।

জন্মদিনের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯৩১ সালে কবি পরম দুঃখে না বলে পারেননি :

"খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে, আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি"। মার্কসবাদী বলে পরিচিতদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কটূবাক্য উচ্চারিত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু সেটাকে ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি বললেও ভুল হবে না। যে "অসম্মাননা"-র কথা অভিনন্দন মুহূর্তেও তিনি বলেছিলেন তাতে মার্কসবাদীদের অংশীদারী নেই এবং থাকলেও একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। বরঞ্চ যতদূর জানি, প্রথম থেকেই এ দেশের মার্কসবাদ রবীন্দ্রসৃষ্টি থেকে প্রভূত নৈতিক উদ্দীপনার সন্ধান পেয়েছে, কবির কিশোরকালের রচনা থেকে শুরু করে অজস্র রত্নের দ্যুতি থেকে তাদের বহুবিঘ্নিত পন্থা আলোর খোঁজ পেয়েছে। রাজশেখর বসু মহাশয় একবার বলেন যে ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়ে যদি কেউ বাঙালীর হৃদয়ের পূজা পেয়ে থাকেন তো তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬১ সালে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রমেলা সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রতি তাদের সানন্দ সম্মাননা।

আবার একটু ফিরে যাই আহ্মদ শরীফ সাহেবের প্রখর মন্তবের দিকে। আশা করি তিনিও মানবেন সেই মন্তব্যে রয়েছে আতিশয্য, অসঙ্গতি, বেশ একটু বিভ্রমও। রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিসীম প্রত্যাশা বলেই অতুষ্টিতে আমরা ক্লিষ্ট হই, কিঞ্চিৎ রুষ্টও হতে পারি, কিন্তু সমসাময়িক জীবনের অবস্থান থেকে তাঁকে মহাদেবের ত্রিশূলে রাখা বারাণসীর মতো বিচ্ছিন্ন করে দেখি কোন্ যুক্তিতে? ইতিহাসের বাধা অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টাও কি অসাধ্যসাধনে সমর্থ? বিপ্লবী প্রয়াসের পরিবেশ নির্মিত হওয়ার চিহ্ন মাত্র খুঁজে পেতে যখন দিবালোকেই প্রদীপের প্রয়োজন ঘটে, তখন মহাকবিপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই কি সর্ববিধ প্রতিবন্ধকের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন? "দেবতার দীপ হস্তে" এই ভবধামে যিনি আসেন, সময়ের "কারাগার" তাঁকে "অভ্যর্থনা" জানাতে পারে কিন্তু পূর্ণ নিস্তার তো দিতে পারে না। বিপ্লবী ও পরা-বিপ্লবী সাহিত্যসৃষ্টি তবুও যে আমরা চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের শ্রীহস্ত থেকে। তাহলে তাঁকেই প্রণাম জানাবার এক ভঙ্গীমাত্র। Unacknowledged legislators of the earth" বলে যে কবি-সংজ্ঞা শেলী দিয়ে গেছেন বহুদিন পূর্বে। তার অর্থভেদ তো কর্তব্য। তাই বলি আহ্মদ শরীফ-এর কথায় রূঢ় তা সন্দেহ করে ভ্রান্তি যেন না ঘটে। অবশ্য তিনি নিজেই নিজের কথা জানাবার অধিকারী। আমি শুধু এই উপলক্ষে কিছু না বলে পারলাম না।

শেক্স্পীয়র সম্বন্ধে যেমন "সহস্রমনা" মহাসমুদ্র সদৃশ" ইত্যাদি শব্দপ্রযুক্ত হয়েছে। ভিন্নতর মাত্রায় তাই কেবলই মনে আসে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। কিশোর বয়স থেকে প্রায় মৃত্যুদিবস পর্যন্ত কী অনন্য সৃষ্টিময়তা—সাহসের কী স্পষ্টতা, কী সমাজচেতনার সাক্ষ্য, কী দেশাত্মবোধ আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববোধের মধুনিষ্যন্দ আভাস, কবিসুলভ "সুরভিত অবসর" সম্পর্কে কী অনীহা, কর্মোদ্যোগের কী অপরাজিত অভীপ্সা। ছেলেবেলা থেকেই দেশাত্মবোধ প্রাণিত, "আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির" রাজনীতিতে অস্বীকৃত কংগ্রেসের মতো প্রয়াসে সহযোগী অথচ সন্দিগ্ধ ("একী শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা!") "বাংলার মাটি বাংলার জল"-এর মায়ায় বাঁধা আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচেতনায়

অন্তরঙ্গ, যে-কারণেই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা সময়ে "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্" বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সহজ সৌষ্ঠব নিয়ে, (গান্ধী-নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানের তুঙ্গ মুহূর্তে)। আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ দলনের পাশবিকতাকে ধিক্কার দিলেন কবি ১৮৯৩ নাগাদ সময়ে—"বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা" যে সংসারে সেখানে ডাক দিলেন বঞ্চিত নিষ্পিষ্ট মানুষকে : "মুহূর্ত তুলিয়া শির/একত্র দাঁড়াও দেখি সবে/যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে/যখনি দাঁড়াবে তুমি। তখনই সে পলাইবে ধেয়ে, পথ কুকুরের মতো"। অবশ্য তখনও তিনি সমাজের ধীর স্থির প্রসন্ন অগ্রগতিতে আস্থা রাখেন আর না বলে পারলেন না। "এ দুঃখ-মাঝারে কবি/একবার নিয়ে এসো স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি"। চলতে লাগল জগৎ জুড়ে মানুষের পরীক্ষা, পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে, আর আমাদের কবিও এগিয়ে চললেন, গেলেন দেশদেশান্তরে ভারতবর্ষের অপরাজেয় বীণাহাতে নিয়ে, সাম্রাজ্যতন্ত্রের কখনও লুক্কায়িত কখনও উলঙ্গ দানবিকতার তাৎপর্য বুঝলেন। রম্যাঁ রলাঁর মতো পাশ্চাত্য মণীষীর সাহচর্যে হৃষ্ট হলেন। তাই একটা গোটা যুগের নির্যাস যেন প্রকাশ পেল "স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি" হারিয়ে ফেলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' : "যাহারা তোমার বিষায়েছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো?"

নিজের কথা বলতে দ্বিধা কিন্তু বলবার কথা স্পষ্ট করার জন্যই জানাই কিছু পুরোনো তথ্য। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক আন্দোলনের পক্ষ থেকে তদানীন্তন ফ্যাশিষ্ট অমানুষিকতাকে ধিক্কৃত করার জন্য একটি বিবৃতি প্রস্তুত করতে হয় আমাকে। 'পরিচয়' পত্রিকার শুক্রবাসরীয় আড্ডায় সমবেত সুধীদের পরামর্শ নিতে যাই আর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য একজন সুবিদিত (এবং আমার শ্রদ্ধেয়) সুধী বললন বিবৃতির সুরটা একটু নরম করে দিতে। নইলে কবি অপ্রসন্ন হতে পারেন। তাই করলাম, অনিচ্ছায়। আর যখন আমার প্রয়াত বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিয়ে গেলেন কবিগৃহে তখন দেখলাম তাঁর কথায় ও ব্যবহারে যে আরও বেশি, সুস্পষ্ট বিবৃতিতেই তিনি সানন্দে স্বাক্ষর দিতেন এবং প্যারিসে রলাঁ-আহুত সম্মেলনে তা পড়া হলে আমাদের বুক আরও ফুলে উঠত। এর পরে আবার যখন ১৯৪১ জুন মাসে সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পর পার্টির পক্ষ থেকে অগ্রণী হয়েছিলাম এখানে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠনে। আর আমার পূর্বোক্ত সুহৃদ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী গেলেন বোলপুরে কবিকে সমিতির পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণের অনুরোধ করতে। রাজি তো হলেনই রবীন্দ্রনাথ, অনেক আলোচনা করলেন সুরেনবাবুর সঙ্গে। বললেন, 'দেখো, তোমরা কম্যুনিস্টরা ভুল কোরো না, যুদ্ধের-চাপে ইংরেজ যাই বলুক, তাকে বিশ্বাস করো না। সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বাসঘাতকতা করবেই।' অপ্রতিভ হতে হয়নি সুরেনবাবুকে। কারণ, সে সময় পার্টি সংকল্প ছিল একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ট আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই (যা কতকটা বদলানো পরে ঘটে অনেক বিপত্তির হেতু হয়ে পড়ে)। এখানে জোর দিয়ে বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে। জীবনের শেষ পত্রে (Eleanor Rathbone-কে লেখা) তিনি অস্বীকৃত হন ইংরেজ শাসন বিষয়ে লেশমাত্র প্রশস্তিজ্ঞাপনে—বলেন দৃপ্তকণ্ঠে যে শুধু অশিক্ষা নয়, যে-শাসনে গ্রামে পানীয় জলের একান্ত অভাব, যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে কাদা ঘেঁটে জল কলসীতে ভরে মেয়েদের আনতে হয়। শিশুর মুখের জল

এভাবে না আনলে চলে না, সেদেশে শাসন করে যে ইংরেজ তার সুখ্যাতি সম্ভব নয়। অখণ্ডমণ্ডলাকার এই চরাচর ব্যাপ্ত প্রতিভার মহিমাকে আমরা ধরি কেমন করে? মাঝে মাঝে ভাবি যারা তাঁর শারীরিক উপস্থিতির সঙ্গে পরিচিত 'Ah' did you see shelley Plain? And did he speak to you?" হতে পেরেছি কিছু পরিমাণে তারা তো বন্য বোধ করতেই পারে। বাক্‌বাহুল্য এড়াতে পারলাম না বলে ক্ষমা চাই।

রিক্ত, দুর্গত, বহুধাবিভক্ত, কলহকলুষিত, কর্মকীর্তিহীন বাঙালি জীবনের ব্যর্থতা (যা আজও বিপুল, আর কষ্ট পাই দেখে যে V. S. Naipal-এর মতো ব্যক্তি 'India; A million Mutinies Now' গ্রন্থে লিখতে পারেন; "the pious Marxist idleness and nullity of Bengal"?) কাটিয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথের মতো মহাত্মাকে স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। মার্কসবাদী বিচার আজও দুর্বল, এখনও যথোপযুক্ত নিদিধ্যাসনের উপর তা প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু আমরা কবিকে প্রণিপাত জানাই, পরিপ্রশ্নের পূর্ণ অবিকার ও প্রয়োজনের কথা না ভুলে আর কীর্তির গভীরতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টি আমাদের গর্ব, আমাদের পুলক কারও চেয়ে ন্যূন নয়। দারুণ অস্বস্তি বোধ করি তাদের সম্পর্কে যারা বলেন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন কবিতায় নয়। থাকবেন শুধু গানে—গানে তো থাকবেনই। অমন অপরূপ কীর্তিকে কোন্ বিশেষণ দেবার চেষ্টা করব? "আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে"—সাতটা শব্দ যেন সাত সমুদ্রের ধনের কথা তুলে ধরে। তবে অমর্যাদা করব তাঁর কবিতাকে, পরিমাপেও গুণ সন্নিপাতে যা বিশ্বজনের বৈভব? ভুলে যাব সাহিত্যের সর্ব বিভাগে তাঁর উৎকর্ষ—গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর নিরুপম সৃষ্টির ঐশ্বর্য? ফ্রান্সে আঁদ্রে জিদ্ যেমন দেশের শ্রেষ্ঠ কবিকে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন : 'Helas, Victor Hugo", কতকটা তেমনই কি বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম করতে হলে বলব না : "গোরা"-র লেখক রবীন্দ্রনাথ"? মাঝে মাঝে দেশিবিদেশী সংস্কৃতি-মুরুব্বিরা বলে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ মস্ত লেখক সন্দেহ নেই কিন্তু সব চেয়ে দামী স্মৃতি তাঁর হল ছবি। জীবনের শেষভাগে আঁকা ছবি। নিশ্চয়ই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ দেশের ও অঙ্কনশিল্পেরই গর্ব, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির এই বক্র ও উন্নাসিক অবমূল্যায়ন তো সহনীয় নয়। অশীতিবর্ষব্যাপী সাধনা যে সুমহান অখণ্ডতা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মে। আর আমাদের মানসে এনেছে যে পবিত্রতার ক্ষেত্র, যে পুণ্যগন্ধ, তাকে ভাষার পোষাকে আনতে পারেই বা ক'জন? কোথায় পাব এমন মানুষ যার সম্বন্ধে গোটা একটা জাতির বলতে কুণ্ঠা নেই। "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"? হোক্ না কিছু অতিকথন, হোক্ না কিছু উচ্ছ্বাস, তবু আজও লোভজর্জর জগতের অজস্র বিড়ম্বনা ও দুর্বৃত্তি দূরীকৃত না হলেও (হবে কেমন করে যখন ইতিহাস নির্মম আর মানুষের অন্তহীন অগ্নিপরীক্ষা) একটু উপশম ঘটবে, স্বস্তির আস্বাদ মিলবে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে। যেন বলতে পারি সবাই বাঙালী : "নিত্য তোমাকে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি"। "প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে, নিধীনাম্ ত্বা নিধিতমম্ হবামহে"।

দেশ : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৮

জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে

নিজের ওপর বেশ খানিকটা জোর খাটিয়ে লিখতে বসেছি। আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে পশ্চিমবাংলায় পার্টির ২১তম রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। পার্টির রীতি হল যে এমন উপলক্ষে পার্টির সবাই যথাসাধ্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অর্থে আত্মসমীক্ষা করব, দেশ আর দুনিয়ার দুর্দশা নিয়ে সবাই মিলে চিন্তা করব, আলোচনা করব আর যতদূর পারি পথের সন্ধান করে আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি স্থির করার চেষ্টা করব। এ কাজটি যেন এমন ভাবে হয় যে আজকের দুর্দিন কাটাতে খুব বেশি দেরি হবে না। দুর্দিন যে এসেছে এবং চলেছে তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই। এক দশকের বেশি কাল ধরে সমাজবাদ-সাম্যবাদ যেন রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রহের বেলায় রাহুগ্রাস অল্পস্থায়ী হলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাহুমুক্তি যে কত কাল নেবে তা বলা যায় না। এখানে অকাট্য নিয়তির কথা নেই। 'নিয়তি' বলে তো কেউ মানুষের ভবিতব্য নির্ধারণ করছে না (যদি না অবশ্য কেউ মন্ত্রীপ্রবর মুরলীমনোহর জোশীর মতো জ্যোতিষে বিশ্বাস করি!)। আমরা প্রায়ই বলি 'ইতিহাসের গতি' 'ইতিহাসের ধারা'—কিন্তু 'ইতিহাস' বলেও কেউ নেই, কারণ যা কিছু করার তা মানুষকেই করতে হয়। মানুষ একক নয়, সম্মিলিত মানবশক্তিই পরিবর্তন আনে, সমাজরূপান্তর ঘটায়। তাই বিশ্বসংকট ঘোচাতে পারে মানুষেরই সদ্বুদ্ধি, সংকল্প, সংগঠন, সংহতি, সংগ্রামশক্তি যা অন্ধকার কাটিয়ে আলো দেখাবার সামর্থ্য রাখে। এজন্যই দেশে দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের প্রয়োজন এত বেশি। কম্যুনিস্ট চিন্তা ও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এত অপরিসীম প্রয়োজন ও গৌরব। এ বিষয়ে যতটা পারি তলিয়ে ভাবার চেষ্টা যেন সবাই মিলে আমরা করতে পারি। এখানেই তো পার্টি সম্মেলনগুলির সার্থকতা। এদিক থেকে আমার এই অতি বৃদ্ধ বয়সের বহু যন্ত্রণা নিয়ে আমার মতো এখন প্রায়-অপটু কম্যুনিস্টকে কলম ধরতে হচ্ছে।

একটু সামলে নিয়ে বলি যে আমার এমন ধৃষ্টতা নেই যে একেবারে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান"-এর মতো না হলেও পার্টিতে এবং পার্টির বাইরে আমার কর্মসহচরদের মূল্যবান কিছু উপদেশ দেবার এক্তিয়ার আমার আছে। তা নেই, কারণ অন্য বহুজনের মতোই প্রকৃত 'কম্যুনিস্ট' হবার যোগ্যতা প্রায় আজীবন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আয়ত্ত করতে পারি নি। আমার এমন অহঙ্কার লেশমাত্র নেই যে দেশবিদেশের খবরাখবর বিশ্লেষণে আমার বিশেষ অধিকার আছে আর সঙ্গে সঙ্গে জানি যে আমার দেশের মানুষের প্রকৃত জীবনযাত্রা ও মনস্তত্ত্ব আমরা অনেকেই এত কম জানি যে তাদের নাড়ির খবর দূরে থাক তাদের আসল পরিচয়ও আমাদের (অন্তত অনেকের) খুবই অল্প। যাক্ সে কথা—শুধু বলব যা কিছু লেখার চেষ্টা করছি (কোনোরকমে 'পাতে দেবার মতো' করার আশায়) তা করছি একান্ত সুবিনীত ভাবে। আমি চাই যে আজকের এই দুরূহ পরিস্থিতিতে 'ভালো' করতে গিয়ে 'মন্দ' কিছু করে না ফেলি। একটা অজুহাত শুধু এই যে আমি নিজে থেকে এই

লিখে ওঠার চেষ্টা করতাম না। কিন্তু আমার বহুদিনের স্নেহভাজন কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য-এর সনির্বন্ধ অনুরোধে (প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তারই ভাষায় আমার কাছে তার 'আবদার'।) সাড়া না দিয়ে পারছি না। ভরসা করি আমার লেখা মাঝে মাঝে হয়তো একটু কটু আর কর্কশ হলেও কেউ আহত হবেন না। এটুকু প্রত্যাশা করব যে পাঠকেরা বিশ্বাস করবেন যে আমার মনে আত্মম্ভরিতা আর যাকে বলা যায় 'অসূয়া' তা একেবারেই নেই। পার্টির একজন বহুকাল ধরে একনিষ্ঠ সদস্য হিসাবেই কতকগুলি মনের কথা তুলে ধরছি।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে 'তরী হতে তীর : পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত' বইটিতে এক জায়গায় লিখি আমাদের পার্টি বিষয়ে : কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ড টেনেছে হাজার হাজার নাম না জানা মানুষকে যাদের দুঃখবরণ সম্বন্ধে বলা যায় : "Upon such sacrifices the gods themselves throw incense" ("দেবতারাই তাদের আত্মবিসর্জন দেখে ফুল চন্দন দিয়ে অভিবাদন করে")। এটা নিছক বড়াই নয়, এটা নানা দেশের কম্যুনিস্ট কার্যকলাপে কখনও কখনও কিছু কলঙ্ক কলুষ ঢুকে গেলেও মূলগতভাবে তার বাস্তব মূল্যায়ন। এদেশের ব্রাহ্মণ জীবনে পুরুষদের উপনয়ন হয় (যাকে 'পৈতে' বলা হয়) যা বুঝি দেয় 'দ্বিতীয় জন্ম', তারা তখন হয় 'দ্বিজ'। যে-কোনো দেশে কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে 'কম্যুনিস্ট' হয়, তখন তার ক্ষেত্রে প্রকৃতই ঘটে, 'পুনর্জন্ম'। যথার্থ কম্যুনিস্ট হতে হলে কায়মনোবাক্যে নিজেকে বদলাতে হয় আর বিশেষত পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে যারা সচেতন তাদের বেলায় স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটে, তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকে না। মানুষের বহুযুগব্যাপী লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার লড়াইয়ে এভাবেই এসেছে কম্যুনিস্টরা। এ নিয়ে বড়াই করতে চাইছি না। কারণ এটা হল আদর্শ এবং আমরা অনেকেই পারি না এর ধারে কাছে আসতে। তবু এই আদর্শের টানেই মানুষ কম্যুনিস্ট হয়, সবাই আদর্শের মর্যাদা রাখতে যে পারি না তা ভিন্ন কথা। কিন্তু একথাটা ভুলে থাকা আমাদের পক্ষে অপরাধ। আমাদের যে জীবন দর্শন, যে বিশ্ববীক্ষা সর্বমানবের কল্যাণসাধন যার মূল অন্বিষ্ট, তা থেকে বিচ্যুতি ঘটলে আমাদেরই মনুষ্যত্বের অপমান। এটা বলে সাধারণ মানুষ থেকে আমরা আলাদা আর সরেস, তা একেবারেই বলছি না। সাধারণ মানুষের মধ্যেই অসাধারণ সম্ভাবনা আছে, তারাই নতুন সমাজ নতুন দুনিয়া গড়ার সাধ্য রাখে। এজন্যই প্রত্যেক কম্যুনিস্টেরই মনে রাখা উচিত যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দল থেকে গুণগতভাবে তারা পৃথক। কেবল সমাজে ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিম্বা তার ভগ্নাংশ নিয়ে লড়ালড়ি তার কর্ম নয়। সাময়িকভাবে প্রয়োজন হলে তেমন ধরনের 'টেক্কাটেক্কি'-তে কতকটা জড়িয়ে পড়তে হতে পারে, কিন্তু নিছক ক্ষমতার জন্য রেষারেষি যে আমাদের বিকৃত না করে। কখনও যেন আমরা ভুলি না কার্ল মার্কস-এর কথা : "দর্শনশাস্ত্রীরা নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অন্বিষ্ট হল জগৎটাকেই বদ্‌লে দেওয়া।" এরই যেন প্রতিধ্বনি ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশে রবীন্দ্রনাথের বিদায় বাণী : "তোমরা লোভ নামে যে 'মৃত্যুশেল' মানুষের সমাজ দেহে প্রোথিত তাকে

সমূলে উৎপাটিত করতে চেষ্টা করছ। এটা অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু এটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো কাজ। আমরা শুভেচ্ছা রইল যেন তোমরা সফল হতে পারো"।

(ঠিক এই ভাষা নয়। কিন্তু আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি)

জানি অনেকে উপহাস করবেন, বিদ্রূপ করবেন-এসব হল উচ্ছ্বাস, কাগুজে আদর্শ নিয়ে কচ্‌কচি-তাছাড়া খাস সোভিয়েট ভূমিই তো এখন লোপাট, সমাজবাদ-সাম্যবাদের বারোটা বেজে গেছে। এখন আর এই ভাববিলাস চলবে না। শুনতে হবে আরও অনেক কটুকাটব্য। শুনেও আমরা চলেছি। বি-জে-পির শাসনে আমাদের দেশের ইতিহাসকে যেমন নোংরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বদ্‌লাবার চেষ্টা চলেছে, তেমনই জগৎ জুড়ে ইতিহাসের পাতা থেকে গত একশো বছরের বেশি ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। আমাদেরও এই দুরবস্থার দায়িত্ব কিছু পরিমাণে নিতে হবে, কারণ সোভিয়েট সমেত কম্যুনিস্ট দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র আমাদেরই পুঞ্জীভূত দোষ ও দুর্বলতা দূর করতে পারিনি বলে অবলীলাক্রমে গর্বাচভ-ইয়েলৎসিনের মতো চতুর ছদ্মবেশধারী প্রতিবিপ্লবীদের দুষ্কর্ম ঠেকাতে পারা যায় নি। আবার যদি আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি (যার কিছু লক্ষণ আজ স্পষ্ট) তাহলেই প্রমাণ হবে যে "ইতিহাসের অবসান" ঘটে নি, শোষণভিত্তিক পুঁজিশাহীর "ক্লেদ, লজ্জা ও অমানবিকতা" (কথাগুলি মার্কস-এর) মানুষ কখনও চিরকাল বরদাস্ত করবে না। আর আমরা তো শিরোধার্য করে রাখব রবীন্দ্রনাথের অন্তিম নির্দেশ যে "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর মতো পাপ" আমরা করতে পারি না।

এত কথা টেনে ফেললাম কারণ আমার সুযোগ হয়েছিল কমরেড রাজেশ্বর রাও-এর সঙ্গী হয়ে ১৯৮৭ সালে মস্কোতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সপ্ততিতম বার্ষিকী (নভেম্বর ১৯৮৭) অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে এবং তখন থেকেই গর্বাচভের অতি সুকৌশলী ঘোষণা "For Socialism, More Socialism, Always Socialism" (তারই লেখা পুস্তিকার শিরোনাম) যে কত গভীর প্রবঞ্চনাকে লুকিয়ে রাখছিল তা নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল যা আমি রাজেশ্বর রাও ছাড়াও আফগানিস্তানের কমরেড নজীবউল্লাহ্ (যাকে বিপ্লব-শত্রুদের হাতে অতি পৈশাচিকভাবে মরতে হয়) আর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়াত কমরেড অলিভার টাম্বো এবং আলফ্রেড নজো-কে মস্কোতেই জানিয়েছিলাম। পার্টির 'নিউএজ' পত্রিকার বহুকাল ধরে মস্কোবাসী সংবাদদাতা কমরেড মসুদ আলী খান-এর ঘরে তৎকালে মস্কোবাসী ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, নেপালী ও শ্রীলঙ্কার কম্যুনিস্টদের সামনে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করি, যার 'টেপ' নেই কিম্বা হারিয়ে গেছে। আমার মনে একটা যন্ত্রণা তখন থেকে খচ্‌খচ্ করে চলেছে। আমার পার্টি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি—যাকে আমি ১৯৩৬ সাল থেকে কখনও ছাড়িনি, ছাড়তে পারিনি, ছাড়লে নিঃশ্বাস ফেলতে পারব না বলে ছাড়িনি, সেই আদি পার্টির নেতৃত্বে এবিষয়ে টালবাহনা (যা কতকটা সংশোধিত হয়েছে) আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি যে নির্ভুল, সবজান্তা-এমন দর্প লেশমাত্র নেই, কিন্তু আশা করি কমরেডরা আমার বেদনা অন্তত একটু বুঝে আমার কথার কদর্থ করবেন না। বেশ কিছুকাল ধরে ফিদেল কাস্ত্রোর তেজস্বী

ঘোষণা থেকে সান্ত্বনা পাচ্ছি আর সম্প্রতি Seattle থেকে Genoa পশ্চিম জগতের জনশক্তির আলোড়ন দেখে উৎসাহ সঞ্চয় করছি। জীবনান্তের আগে দেখতে পাব না, কিন্তু অনেক কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে রয়েছি।

* * *

আমাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বিদেশ থেকে ধার করা বলে এদেশের মাটিতে মিশতে পারে না বলে নালিশ বহুকাল ধরে চলে এসেছে। আজও চলছে। আমরা দেশকে ভালোবাসি না, সোভিয়েটকে আমরা 'পিতৃভূমি' ভাবি ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ অথচ মারাত্মক নিন্দা শুনে আসতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হয়েছে। একটা সময় (বিশেষত ১৯৪২-৪৫-এর সময়) আরও নিদারুণ মারাত্মক গালাগাল শুনেছি যে আমরা দেশদ্রোহী, এমনকি ইংরেজের চর হয়ে পুলিশকে সাহায্য করি ইত্যাদি ইত্যাদি। আশ্চর্য কি যে তখন তিক্তবিরক্ত হয়ে আমরাও ভুল করে বসেছি আর সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশভক্তকে কটু ভাষায় নিন্দার মতো অপকর্ম করে ফেলেছি। এখানেই বলে রাখি যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরস্পর মতভেদ সত্ত্বেও আমাদের সুসম্পর্ক ছিল (একত্র আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি)। তাঁর দেশত্যাগকালে কম্যুনিস্ট কমরেড তলোয়ার তাঁর সঙ্গে ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তাঁর একান্ত অনুগামীদের সঙ্গে আমাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছিল আর স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র সঙ্গে আমাদের একত্রে কাজ করেছি। ১৯৪২ সালের দেশজোড়া আলোড়ন যখন ঘটে তখন কিছুকাল 'স্বাধীন' বলে ঘোষিত মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলের নেতা নানা পাতিল আমৃত্যু কম্যুনিস্ট পার্টিতে ছিলেন। মেদিনীপুরে কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় নেতা সতীশ সামন্তের সর্বাধিনায়কত্বে যখন 'স্বাধীন' অঞ্চল স্থাপিত হয় তখন ভূপাল পাণ্ডা প্রমুখ আমাদের কমরেডদের ভূমিকা কম ছিল না। উত্তরপ্রদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সরযূ পাণ্ডে, ঝাড়খণ্ড রাই প্রভৃতি কম্যুনিস্টদের কথা ভুলবার নয়, যেমন বলা যায় বিহারে কিশোরীপ্রসাদ সিংহের কথা। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আরও অনেক কথা মনে আসছে, কিন্তু ক্ষান্ত হই। শুধু এইটুকু বলি যে বিয়াল্লিশ-এর অভ্যুত্থানে প্রধান নেত্রী অরুণা আসফ আলী যুদ্ধোত্তর কালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান শুধু নয় তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে কুণ্ঠা বোধ করেননি আর আজও কানপুরে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাই বাহিনীর' যশস্বিনী নেত্রী লক্ষ্মী স্বামিনাথন (পরে সায়গল) যিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য।

কথার উপর কথা বেড়ে যাচ্ছে তবু বলি যে এই সম্প্রতি কম্যুনিস্টদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ দেখে বলেছিলাম একবার যেতে কলকাতার 'এস-এস-কে-এম' হাসপাতালে যেখানে বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে রয়েছেন তিন প্রায় যেন প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ গণেশ ঘোষ, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল হালদার যারা তিনজনই কম্যুনিস্ট। তিনজনেই আমৃত্যু উৎসৃষ্টপ্রাণ কম্যুনিস্ট, দেশাভিমানীদের মধ্যে যাদের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। মনে পড়ে যাচ্ছে যে ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কলকাতায় পার্টির যে দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তার Credentials Commitee-তে ছিলাম বলে আজও মনে গেঁথে রয়েছে

যে উপস্থিত ছয়-শো প্রতিনিধির পরিচয়পত্র থেকে জানা যায় যে তখন সেই সদ্যস্বাধীন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে যে কর্মীরা এসেছিল তারা ইংরেজ শাসনকালে সর্বসমেত দেড় হাজার বছর কারাবাস করেছেন, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে আড়াই বছর জেল খেটেছেন। আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামে কম্যুনিস্টরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের অবদান, তাদের আনুপাতিক অংশগ্রহণ যে একেবারেই অল্প নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ নিয়ে বাক্‌বিস্তার করতে চাই না, কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ, নিতান্ত শত্রুপক্ষীয়দেরও তা মানতে হবে যদিও তা তারা মানেন না।

জওয়াহরলাল নেহরু যখন ১৯৩৬ সালে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন তাতে একটু যেন ঈর্ষান্বিত ভাবে লিখেছিলেন যে কম্যুনিস্টরা ব্যক্তিগত ব্যবহারে কেমন যেন মাঝে মাঝে বেয়াড়া ভাব দেখালেও তাদের কর্মশক্তি আর নীতি প্রচুর আর তাই লেনিন থেকে শুরু করে তাদের সবাইয়ের মনে একটা দৃঢ় ধারণা যে সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রবাহে সমাজবাদ-সাম্যবাদের অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। এজন্য তারা সর্বদাই আশাবাদী এবং সেজন্যই উৎসাহ হারায় না। মাঝে মাঝে জওয়াহরলালের কাছ থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সহায়ক কিছু উক্তি পাওয়া গেলেও তার লিবারল-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি ছাড়তে পারেননি আর ১৯৪৮-৪৯ সালের মতো জটিল সময়ে বলতে পেরেছিলেন যে কম্যুনিজ্‌ম আর কম্যুনালিজ্‌ম'-এর (সাম্প্রদায়িকতা) মধ্যে তফাৎ হল শুধু এই যে একটা হল জলে ডুবে আর একটা হল পাহাড় থেকে পড়ে মরার মতো। অথচ ১৯৩৬ সালে আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে ঐ দুটো শব্দের মধ্যে মাত্র একটা অক্ষরের তফাৎ হলেও প্রভেদটা হল বিরাট। সংকটকালে দোদুল্যমান এই দেশনেতা তাই ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'The discovery of India' গ্রন্থে নিশ্চিন্ত মনে লিখলেন যে ভারতবর্ষে কম্যুনিস্টরা বামপন্থী হিসাবে একটা "ginger group"-এর বেশি কিছু হবে না। অর্থাৎ "আদার ঝাঁঝ"-এর মতো একটা বস্তু তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমদানি করতে পারে মাত্র। বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত চিত্ত ও অগ্রসর বলে খ্যাত তাদের মুখে এমন বাক্য শুনে একটু মজা হয়, ক্রোধও যে হয় না তা নয়। তবু আজও আমার আশঙ্কা যে দেশের আধুনিক ইতিহাসে যোগ্য ভূমিকায় নামবার সুযোগ পেয়েও বুঝি আমরা নামতে পারলাম না। মনে ঘুরছে অতি সম্প্রতিকালের 'তৃতীয় মোর্চা' ("Third Front") গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে সংবাদপত্রে আলোচিত প্রসঙ্গ। এখনও আমরা যেভাবে এগিয়ে যাবার লক্ষণ দেখাতে পেরেছিলাম, সেভাবে এগোতে পারিনি—কতকটা নানাবিধ ঘটনার চাপে আর তার চেয়েও বেশি নিজেদের অনৈক্যের কারণে। সে প্রসঙ্গ হল আলাদা, এখন শুধু বলছি যে বুর্জোয়া মহারথীদের এ ধরনের বাগাড়ম্বর অন্তত প্রমাণ করে যে দেশের মানুষের সমর্থনে সংগঠন শক্তিতে কম্যুনিস্টদের অগ্রগতি আমাদের শত্রুশ্রেণীকে কতদূর ভুগিয়েছে, ভাবিয়ে তুলেছে। 'শত্রুশ্রেণী' শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি উঠতে পারে; বিশেষত নিছক 'গণতন্ত্র'-এর (যে বস্তুটির অস্তিত্ব নেই, আছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, যেখানে সর্বহারারা বিপর্যস্ত আর 'প্রোলেটেরিয়ন' গণতন্ত্র, যেখানে বুর্জোয়াদের বেশ কিছু পরিমাণে বঞ্চিত হতে হয়) জয়গানে মাতিয়ে

'বিশ্বায়নী' অর্থনীতির দাপট চলেছে, তখন 'শ্রেণীশত্রু' কথাটিতে বিরক্ত হবেন অনেকেই। তবু বলব, কখনও যেন না ভুলি মহাচীনের বিপ্লবনায়ক মাওৎসেতুং-এর শিক্ষা : "শ্রেণীসংগ্রামকে যেন কখনও না ভুলে বসি" ("Never forget the class struggle")। বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে তার রূপ বদলায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আজও চলছে এবং চলতে থাকবে মূলগতভাবে যা হল 'শ্রেণীসংগ্রাম', আজকের 'বিশ্বায়নী' বদ্‌মায়েসিকে জব্দ করার লড়াই শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

* * *

দেশে দেশে স্বাধীনতার সঙ্গে কম্যুনিজ্‌ম-এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে মার্কসীয় চিন্তায় অনেক মূল্যবান তত্ত্ব ও কর্মের নিশানা পাওয়া গেছে। কতকাল আগে—১৮৫৮ সালে মার্কস্ আর এঙ্গেল্‌স-এর পত্রালাপে দেখা যায় তাদের উদ্বেগ : সমাজবাদী বিপ্লব শুধু উন্নত দেশগুলিতে হলে তো বাকি গোটা দুনিয়াতে বুর্জোয়াদের প্রভুত্ব টিকে থাকবে যার জোরে ইয়োরোপের মতো ভূখণ্ডও তাদেরই পদানত থাকবে। সেজন্যই বিপ্লবকে হতে হবে জগজ্জয়ী এবং সে জন্যই দেশে দেশে লড়াই চালাতে হবে। পুঁজিশাহী যেমন আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সমাজবাদ-সাম্যবাদকে আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়ে এগোতে হবে। দুনিয়ার শ্রমজীবীকে এক হবার উদাত্ত আহ্বান তাই ১৮৪৮ সালের কম্যুনিস্ট ইশ্‌তেহারে। পরে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেনিন সমাজবাদ-সাম্যবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতার অকাট্য সম্পর্কের নীতি ঘোষণা করলেন। সোভিয়েট বিপ্লব (১৯১৭) হল কম্যুনিজ্‌ম আর জাতীয় মুক্তির একাত্মতার প্রতীক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে (১৯৩৯-৪৫) সোভিয়েটের বিজয়েরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়, ১৯৬০-এর দশকে দুনিয়া দেখ্‌ল এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জনশক্তির অগ্রগতি।

ইতিহাসের এই ধারার সঙ্গে পা মিলিয়েই আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের একান্ত আত্মীয় সম্পর্ক। এটা বলে 'শ্রেণীসংগ্রামকে' অস্বীকার করা হয় না, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে বহু ব্যাপারে আমাদের বিরোধকে চাপা দেওয়া হয় না। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে সেই শৃংখলমোচন যে সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য, তাকেও অস্বীকার করা হয় না। এ নিয়ে হাজার তর্কাতর্কির কচ্‌কচির মধ্যে ঢুকছি না, কিন্তু স্বাধীনতা (সাম্রাজ্যতন্ত্রের শিকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা) যে একেবারে প্রাথমিক কর্তব্য তা কম্যুনিস্টদের মতন কে বুঝতে পেরেছে? ভেবে দেখা হোক্, ১৯২১ সালের শেষদিকে আহ্‌মদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন, যেখানে কারারুদ্ধ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসনে হাকিম আজমল খান সেখানে, এদেশে কম্যুনিজ্‌মের সেই শৈশবকালে, কম্যুনিস্ট চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে মওলানা হস্‌রৎ মোহানি দাবি করলেন দেশের 'পূর্ণ স্বাধীনতা', ইংরেজ সাম্রাজ্যের অবসান, দাসত্ব শৃংখলকে চূর্ণ করে নবজীবন নির্মাণের প্রয়াস। কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে 'স্বরাজ'-এর যে লড়াই মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করে অপূর্ব মহিমায়, জনগণমন অধিনায়ক রূপে চালিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের যে ভাস্কর সংগ্রামশক্তি তখন দেখা গিয়েছিল, তারই প্রস্ফুটন চাইলেন হস্‌রৎ মোহানি, কিন্তু গান্ধীজীই বাধা দিলেন

বলে যে অমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ হবে অবিমৃষ্যকারিতা, তিনি কিছুতেই দেশকে সাঁতার কাটতে সম্পূর্ণ পটু হবার আগে গভীর জলে নামাবেন না, আর তাছাড়া 'অহিংসা' নীতি অনুসরণে আমরা নাকি সফল হতে পারিনি। যাই হোক্, এর মাস দুয়েক পরে উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় একটি থানা জ্বালিয়ে গ্রামবাসীদের পুলিশী অত্যাচারের বদ্‌লা নেওয়ার 'অপরাধে' গান্ধিজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, বিরাট এক সংগ্রামের নিরীহ পরিণতিতে দেশবাসী মুষড়ে পড়ল আর অনিবার্যভাবে সংগ্রাম পিছিয়ে গেল বহুদূর। একদিকে এই মর্মন্তুদ ঘটনা, কিন্তু ১৯২২ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ আদালতের বিচারে মহাত্মা গান্ধী যখন পেলেন ছয় বৎসরের কারাদণ্ড তখন তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিই (যা এত কাল আমার কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে) :

"The government established by law in British India is carried on for the exploitation of the masses. No sophistry, no jugglery in figures, can explain away the evidence that skeletons in the villages present to the naked eye. The miserable little comforts of the town dwellers in India represent the brokerage they get for the work they do for the foreign exploiters, and the profits and the brokerage are sucked from the masses. I have no doubt whatsoever that both England and the town dwellers in India will have to answer if there is a God above, for this crime against humanity which is perhaps unparalleled in history."

"আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে চলছে জনগণের শোষণের ভিত্তিতে। গ্রামাঞ্চলে অনাহারে কঙ্কালসার মানুষকে দেখলে কোনোরকম বাক্‌বৈদগ্ধ্য আর সংখ্যাতত্ত্বের জাদুকরির জোরে তার ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যায় না। ভারতবর্ষে শহরবাসীরা যে অতি তুচ্ছ কিছু আরামের উপাদান পেয়ে থাকে তার অর্থ হল যে তারা বিদেশী শোষণকারীদের কাছ থেকে দালালি হিসাবে কিছু পাচ্ছে। পুরো মুনাফা আর এই দালালির টাকা অবশ্য জনগণের কাছ থেকে শুষে নেওয়া হচ্ছে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে যদি ভগবান থাকেন তো ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের নগরবাসী উভয়কেই মানবিকতার বিরুদ্ধে এই মহাপাপের জবাবদিহি করতে হবে। এই মহাপাপের তুলনা হয়তো পৃথিবীর ইতিহাসের কোথাও মিলবে না।"

বিশেষ করে এই উদ্ধৃতি আমার মনে ঘুরছে আজকের "বিশ্বায়নী" অর্থনীতির মায়াজালে আচ্ছন্ন হতে চলেছি বলে। 'বুর্জোয়াজি' শব্দের অবিকল অনুবাদ হল 'শহরবাসী'। ১৯২২ সালে 'বুর্জোয়া' শব্দটি প্রায় অজানা ছিল। গান্ধীজীর কাছে তো বটেই। গত দশ বছরের অর্থনৈতিক ওলটপালটের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে (যার সাক্ষ্য হল বছরের পর বছর United Nations Development Report যে জগতের ওপর তলার পনেরো শতাংশ মানুষ আরও ধনশালী হয়েছে আর নীচে রয়েছে পঁচাশি শতাংশ যাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে)। মার্কস্‌বাদী ভাষায় যে বহুবার বলা হয়েছে তার সত্যতাই প্রমাণ হচ্ছে : "ধনী আজ আরও ধনী, গরীব আজ আরও গরীব'। ইংরেজ কবির কথায়, "wealth accumulates and men decay" ("ধনসম্পত্তি

বাড়ে আর মানুষ শুকিয়ে পড়ে")। জগৎ জুড়ে সোশালিজ্‌মের নিধন ঘোষণা করে সভ্যতাকে এই পর্যায়ে আজ নামানো হয়েছে। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর সত্যেরই আভাস মিলছে ১৯২২ সালে গান্ধীজীর ঘোষণার। এর অর্থ নয় যে তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। বরঞ্চ তিনিই সাম্যবাদী বিপ্লবকে ধিক্কার দিয়েছেন, তাকে রোধ করে চলেছেন বহু বৎসর ধরে। তবু আমার উদ্দেশ্য হল বলা যে দেশের মুক্তি চাইতে গেলে দেশের মানুষের বঞ্চনা আর যন্ত্রণার কথা ভোলা যায় না, জাতীয় স্বাধীনতা তখনই সার্থক যখন তার পরিপূরণ ঘটে সমসুযোগের শোষণ মুক্তসমাজ প্রতিষ্ঠায়। এ জন্যই ১৯২২ সালের শেষে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উদাত্ত ভাষায় "শতকরা ৯৮ জনের স্বরাজ" তাঁর মূলনীতি বলে ঘোষণা না করে পারেন নি। এটা শুধু মহাত্মা গান্ধী বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক কলাকৌশল বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। গান্ধীজী যখন আমাদের বলতেন যে তিনি ঢের বেশি 'কম্যুনিস্ট', তখন সেটা শুধু রহস্য নয়। আমরা যেন না ভুলি যে কম্যুনিজ্‌ম-এর সঙ্গে মানবিকতার ("humanism") একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। যাকে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন কখনও তাচ্ছিল্য করেননি। একটা জায়গায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সবাইয়ের একযোগে কাজে নামার বিরাট অবকাশ আছে, এ কথা একান্ত সংকটকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভুলে যাওয়া কম্যুনিস্টদের অকর্তব্য। মার্ক্সীয় "কথোপকথন" ("dialogue") যে গুরুত্ব নিতে পারে, তা জানি। মস্কোতে কথা হয়েছিল নিকারাগুয়ার 'কম্যুনিস্ট' বিদেশমন্ত্রী Father d'Escoto-র সঙ্গে। তিনি পেশায় ছিলেন ক্যাথলিক গির্জার পাদরী। সোভিয়েট বিষয়ে সবচেয়ে সহৃদয় ও প্রাণবন্ত গ্রন্থ হল The Very Rev, Hewlett Johnson (Dean of Canterbury Cathedral)-এর "The Socialist Sixth of the Earth" যা 'সোভিয়েট দুনিয়া' নামে বাংলার তরজমা হয়েছিল।

* * *

এলোমেলা হয়ে গেলেও মনের কয়েকটি কথা সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। বলতে চাই যে সব দেশের মতো এখানেও কম্যুনিস্ট পার্টি আর আন্দোলনের মূল শক্তি আর প্রেরণা হল দেশেরই মানুষ, অন্য কোথাও থেকে ধার করে আনা বা অনুকরণ করা কিছু নয়। ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিণতির পরিচয় মেলে দেশের মেহনতী মানুষকে রাজনীতি অর্থনীতিসহ সর্বব্যাপারে টেনে এনে জীবনকে "শোষণের কারাগার" থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াসে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিতে তাই দেখা গেছে তাদের যারা 'স্বদেশী' করেছেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যকে হটিয়ে দেবার লম্বা লড়াইয়ে নেমেছেন, প্রয়োজনে 'সন্ত্রাসবাদী' হয়েছেন, শ্রমজীবীদের লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা অবসানের জন্য মজুর কিষাণদের নিয়ে সংগঠন করেছেন, নতুন শ্রেণীহীন সমসুযোগ নির্মাণের দীর্ঘায়ত, "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' অবলম্বন করেছেন, সকল দেশপ্রেমিক দেশাভিমানীকে নিয়ে শোষণ মুক্ত নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা সংকল্প নিয়েছেন। এমনই কঠিন এই ব্রত, আমাদের মতো সুপ্রাচীন সমস্যাসংকুল জটিল পরিস্থিতির দেশে এই সংকল্প সাধন এমনই দুঃসাধ্য যে দুর্বল মানুষকে দিতে হবে চরিত্রের অতি কঠোর পরীক্ষা। সহজ সাফল্য আশা করাই হল নির্বুদ্ধিতা, অথচ এরই মধ্যে আশার আলো জাগিয়ে রাখতে হবে আমাদেরই। এ কাজে কম্যুনিস্টরা ছাড়া আর কেউ কায়মনোবাক্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও 'একা' আমরা নই। সক

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জড়ো করে নতুন ইতিহাস নির্মাণে অগ্রণীর ভূমিকা আমাদেরই।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বিষয়ে ১৯২২-এর মার্চ মাসে গান্ধীজীর বিবৃতি উদ্ধৃত করেছি। আমাকে বেশ কিছুকাল গান্ধী চরিত্র প্রায় আচ্ছন্ন করেছিল, তা নিয়ে গোটা বইও লিখেছি। তবে গান্ধী চিন্তা থেকে মার্ক্স তত্ত্বে সাধ্যমতো উত্তরণও আমার—শুধু আমার নয়, অন্য বহুজনের জীবনের ঘটনা। গান্ধীজীকেই বারবার অবশ্য দেখা গেল আসন্ন প্রায় 'বিপ্লবী' অভ্যুত্থানের রাশ টেনে ধরে ধরে লড়াইকে স্তব্ধ করে দিতে (যা ঘটেছে ১৯২২-এ, ১৯৩০-৩২-এ ১৯৪২ আগস্ট আলোড়নের পর বা ১৯৪৫-৪৬ এও ইত্যাদি)। তিনি ১৯২৮ সালের পয়লা এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লেখেন জওয়াহরলাল নেহরুকে : "আমি তোমার সঙ্গে একমত যে ধনী আর শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়েই ("without the rich and the educated class") আমাদের লড়াইয়ে নামতে হবে। কিন্তু তার সময় এখনও আসেনি ("the time is not yet")।" তখন সদ্য ১৯২৭ সালে সোভিয়েট ফেরত জওয়াহরলাল একটু মেতেছিলেন সমাজবাদ নিয়ে, আর গান্ধীজী তাকে 'সামাল' দিচ্ছিলেন। ১৯২৯ সালেই উত্তরপ্রদেশে (এবং অন্যত্র) কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ আন্দোলনের পথে চলেছিল তখন গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন যে কেউ যেন প্রত্যাশা না করে যে তিনি "বিপ্লব আর লাল সর্বনাশ" "revolution and red ruin") ধরনের ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন। তখন নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এমন কথা উঠেছিল আর এরই মধ্যে কম্যুনিস্টদের কাজ করতে হয়েছিল। ভুল ভ্রান্তি যে ঘটেছিল তা আশ্চর্যের কিছু নয়। আমরা প্রায় অনিবার্যভাবে দু'রকম ভুল করে চলেছি। কখনও দেশের মানুষকে সঙ্গে না পেয়ে বেশি এগিয়েছি কিম্বা আমরা দেশের জাতীয় নেতাদের পিছন পিছন ধাওয়া করেছি (হয় sectarianism নয় tallism)। এর জন্য লজ্জিত নই; এটা বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন। এটা বারবার ঘটেছে। আর মূলগতভাবে এজন্যই ঘটেছে স্বাধীন ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাবার মতো সর্বনাশী কাণ্ড, যার কুফল শুধ্রে না নিতে পারলে আমাদের (এবং দেশের) নিস্তার নেই।

* * *

শুধু শত্রুরা নয় আমাদের নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন মাত্র নয়, রীতিমতো আওয়াজ মাঝে মাঝে ওঠে যে কম্যুনিস্টরা কেবলই বারবার "ভুল" করে চলেছে আর ক্রমাগত "ভুলের" এই বোঝা যাদের মাথায়, তাদের ওপর জনগণ নির্ভর করবে কেন? ব্যাপারটা একেবারেই অত সহজ নয়। এদেশেরও সকল দেশেরই ইতিহাসে সংগ্রামী শক্তির 'ভুল' করার উদাহরণ অজস্র। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির মতো বিরাট ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, নবসমাজ গঠনের গৌরবমণ্ডিত পার্টি কতবার 'ভুল' করেছে তার সংখ্যা কম নয় (সবচেয়ে সাম্প্রতিক যে 'ভুল' এর ফলে জগতের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে সকল সমাজবাদ-সাম্যবাদ যে 'প্রতিবিপ্লবী' ধাক্কা খেয়েছে সেটা সবচেয়ে টাটকা উদাহরণ)। আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী আর মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'লড়াকু' পার্টি বলে যার নামডাক ছিল সেই কংগ্রেস যে কতবার কত মারাত্মক ভুল করেছে আর দেশ স্বাধীন হবার আগে ইংরেজকে সেই 'ক্ষমতা' হস্তান্তরের মূল্য হিসাবে দেশভাগে সম্মত হয়ে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করেছে তা কি ভুলে যাব?

অবশ্য সবাই ভুল করি বলে আমাদের ভুলকে মার্জনা করা হোক্ বলছি না। শুধু বলি একটু ঐতিহাসিক মানদণ্ডে বিচারটা হোক্।

১৭৮৯-৯৫ যখন "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" মন্ত্র নিয়ে ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখন থেকে নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু আজও তার প্রতিশ্রুতি সর্বমানবের জীবনে বাস্তবায়িত হয়নি। তারই প্রধান প্রতিপূরকরূপে অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭), মহাচীনে বিপ্লব (১৯৪৯) এবং এদেরই অনুসারী বহু জাজ্জ্বল্যমান ঘটনা সত্ত্বেও সমাজবাদ আজ রাহুগ্রস্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) লড়া হয়েছিল "যুদ্ধের অবসান ঘটাতে" ("a war to end war") বলে যে বাণী একদা আওড়ানো হত, তা একটা ঠাট্টা বই আর কিছু নয় বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েটের হাতে (১৯৪১-৪৫) ফ্যাশিজ্‌ম-এর পরাজয়কে একটা চূড়ান্ত ঘটনা মনে করা গিয়েছিল, ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল জগৎ জুড়ে সমাজবাদের প্রসার, কিন্তু এই যে ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা তা তখন ব্যাহত, 'বিশ্বায়নী' দৌরাত্ম্য আজ জগৎ জয় করার দিকে আগুয়ান। পবিত্র 'গণতন্ত্র' (যার কোনো অস্তিত্বই নেই, আছে হয় বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেখানে দলিত মানুষ দলিতই থেকে যায়, নয় প্রোলেটেরিয়ন গণতন্ত্র যেখানে বুর্জোয়ারা বিপন্ন) এখন বুঝি সর্বত্র বিরাজমান (আফগানিস্তানে নিরস্ত্র মানুষের মাথায় বহু বিচিত্র বোমাবর্ষণকারী আমেরিকা যার 'পথচারিচায়ক'!)-এই পবিত্র গণতন্ত্রের গুণগান সর্বত্র, তার নামাবলী কম্যুনিস্টদের অনেকেই স্বচ্ছন্দে পরিধান করেছেন, কিন্তু মনুষ্যজীবনের কষ্টিপাথরের বিচারে তার মূল্যায়ন কি হবে? গণতন্ত্রের নামে দুর্বৃত্তি চলছে বলে গণতন্ত্রের গরিমা কি অস্বীকৃত হবে, তার মূলীভূত মহিমা বাতিল হবে?

ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ ফ্যাশিজম্ যখন দেখা দিল, তখন দার্শনিকপ্রবর বেনেদেত্তো ক্রোচে-কে (Croce) জিজ্ঞাসা করা হয় : 'গণতন্ত্রের কি ভবিষ্যৎ আছে?' উত্তরে মহামনীষীর জবাব ছিল : "গণতন্ত্রের পরিপূরক যে সমাজবাদ-সাম্যবাদ, সমসুযোগের ভিত্তিতে যে নবজীবন মানুষের প্রায় চিরকালের কাম্য, তারও (ক্রোচের অনুপম ভাষায়) শুধু ভবিষ্যৎ নেই, রয়েছে অনন্ত কাল। কে পারে তার জয়যাত্রা রোধ করতে? 'বিশ্বায়নী' শক্তির কর্ণধারেরা তো সম্প্রতি বাধ্য হয়েছেন সুইট্‌সারলাণ্ডের 'দাভস'-এর মতো পর্বতশিখরে অবস্থিত শহরে তাদের বহুখ্যাত বার্ষিক জমায়েত বাতিল করে অন্যত্র আয়োজন করতে। Seattle থেকে Genoa এবং অন্যত্র পশ্চিম জগতের মানুষের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ হতে দেখে তারা সন্ত্রস্ত। ফিদেল কাস্ত্রো রহস্য করেছেন যে এবার হয়তো মহাশূন্যে এই কুবেরদের জমায়েত বসাতে হবে। মানুষ তার মনুষ্যত্ব না হারালে লোভ আর লালসার অবাধ কর্তৃত্ব মানতে পারবে না—এটা পশ্চিম জগতেও স্পষ্ট হতে দেখা দিয়েছে।

* * *

এত কথা মনে ভিড় করে আসছে বলে বার বার পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। তবে কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন যে যা মনে আসে তা যেন জানাই। ভরসা করি যে একেবারে অবান্তর কিছু বলছি না। হয়তো বা কিছু বলছি যা পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে ভাবার একটু দাম আছে।

না বলে পারছি না যে আমাদের এই অতি বৃহৎ বিচিত্র জটিল দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রামী মূল্য দেওয়া দরকার ছিল তা আমরা দিতে পারি নি এবং শেষ পর্যন্ত সে জন্যই দেশবিভাগের মতো বিকট মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্যই আমাদের শহীদদের নিয়ে গর্ব করা সঙ্গত, কিন্তু আমি অন্তত ভাবি যে আমাদের সংগ্রামে ফাঁক আর ফাঁকিরও পরিমাণ অনেক থেকে গিয়েছে। আর কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সাহস ও শৌর্য সত্ত্বেও গাফিলতি কম থাকে নি। বুর্জোয়া রাজনীতির সীমিত সংসদীয় ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেন আমরা মূলগতভাবে আজও আমাদের পিছিয়ে থাকাটা না ভুলে বসি। একটু আগে জওয়াহরলাল নেহরুর পুরোনো শ্লেষবাক্য শুনিয়েছি যে আমরা বুঝি "ginger gruop" বই কিছু নই! কথাটা কটু কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি কি? স্বাধীনতার পর পঞ্চাশধিক বছর কেটেছে, অথচ পশ্চিমবাংলা, কেরালা এবং ত্রিপুরায় প্রশাসনের বড়াই কিম্বা দিল্লিতে অধুনা 'বহু দলের জোট সরকার চালু হওয়ায় সংসদে বামপন্থীদের গুরুত্ব' কি আমাদের তুষ্ট রাখতে পেরেছে? বি-জে-পি-র মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী দলের প্রায় আশ্চর্য সংসদীয় অগ্রগতির (এবং তাদের বর্তমান কর্তৃত্ব) তুলনায় আমাদের অসাফল্যের বেদনা কি বিঁধছে না? বামপন্থীরা এখন 'তৃতীয় ফ্রন্ট' গঠনের অতি সঙ্গত ও একান্ত প্রয়োজন প্রযত্নে রত, কিন্তু কম্যুনিস্ট শক্তিবৃদ্ধি না ঘটলে পথের কাঁটা সরানো যাবে না তা কি আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝি না? এজন্যই একটু পিছনে তাকিয়ে আত্মসমালোচনা আজ দরকার। নানা ঐতিহাসিক কারণে সংসদীয় ব্যবস্থার মায়াজালে বাঁধা পড়ে আমাদের আন্দোলনে অনেক ক্ষতি হয়েছে; বিশাল জমায়েত জড়ো করার ('র‍্যালি') অসামান্য নৈপুণ্য (যা বিদেশী কম্যুনিস্টদের অবাক করেছে) আর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে সাংগঠনিক ব্যাপারে শৈথিল্য স্বাধীনতার পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই গোটা দেশকে পথ দেখাবার 'দুঃসাহস' ও চরিত্রবল দেখাবার সাধ্য আমাদের হয় নি, আজও আমরা মোটামুটি সব কম্যুনিস্ট একত্র হয়ে সেই সংহতির জোরে এগোবার সঙ্গতি সংগ্রহ করতে পারিনি। এটা দ্বিধা, ত্রিধা শুধু কেন, বহুধা-বিভক্ত কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যারা আছেন তাদের আলাদা করে সমালোচনা নয়। এটা হল স্বীকার করা যে আমাদের সকলেরই চিন্তায় আর কাজে অনেক ঘাটতি থেকে গেছে, যাকে সরানো খুবই দরকার অথচ সেদিকে তেমন নজর যেন নেই।

* * *

দেশভাগের জন্য আমরা সঙ্গত ভাবেই প্রধান দায়িত্ব চাপিয়ে থাকি কংগ্রেসের নেতৃত্বের ওপর। কিন্তু যদি না ধরে নিই যে তখন আমরা একান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিলাম, আমাদের দায়িত্বও যে কিছু পরিমাণে থেকেছে তা মানা দরকার। দেশভাগের কিছু আগে ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) আমরা সাক্ষী তা ছিল সাম্রাজ্যশাহীর সৃষ্টি—একথা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেই বুকভাঙা অভিজ্ঞতার পরেও (কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' লড়াই যখন স্তিমিত হয়ে আসছে) আমরা 'জনযুদ্ধ'-এর নীতিকে কালোচিত সংগ্রামী পরিবর্তন ঘটিয়ে (স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের পর সোভিয়েটের বিপদ তখন কাটতে শুরু করেছে)

আন্দোলনে নামার সাহস রাখিনি। অজুহাত অবশ্য ছিল, কারণ জাপান তখন বীর বিক্রমে এগিয়ে আসছিল আর মনে রাখতে হবে যে ১৯৪২-এর জুন জুলাইয়ে স্বয়ং জওয়াহরলাল নেহরু প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র যদি ফ্যাশিস্ট জাপানকে নিয়ে আসেন "আমি খালি হাতে লড়াই করেও বাধা দেব"। (এখানে স্মরণীয় যে 'জনযুদ্ধ' নীতি বাবদ কম্যুনিস্টদেরই 'সবদোষ নন্দ ঘোষ' বানিয়ে প্রচার আজও শুনি।) কিন্তু অজুহাতটা অকাট্য নয়; স্থানকালপাত্র নিয়ে মতভেদ সম্ভব কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেই আমাদের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের অবসর যে মেলেনি তা বলা যায় না। যুদ্ধান্তে সারা দেশ যখন সংগ্রামের জন্য উন্মুখ তখন সেই মানসিকতার সাথী হয়েও আমরা কেমন যেন গুটিয়ে থেকেছি, একধরনের 'লেজুড় বৃত্তি' ("tailism") করেছি, মূলত কংগ্রেস আর কিছুটা মুসলিম লীগেরও মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছি। দুটো ব্যাপারে আমাদের শৈথিল্য ঘটেছে মনে করি, আর হয়তো তার মূল কারণ বিপ্লবের 'মূল্য' নিয়ে একটা ভীতি, একটা সংকোচ, যা হল আমাদের মতো বুর্জোয়া ঘেঁষা কম্যুনিজ্‌ম-এরই লক্ষণ। হয়তো কথাটা ঘুলিয়ে ফেলেছি কিন্তু বলতে চাই যে কংগ্রেসের তো দেশব্যাপী শক্তিধর সংস্থা যেমন সংগ্রামভীরুতার দরুন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যথাযোগ্য লড়াইয়ের 'দাম' দিতে প্রস্তুত ছিল না এবং দেয়নি, অনেকটা তেমনই আমরাও দেশের পরিপূর্ণ সার্বিক স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য সংগ্রামের উপযুক্ত মনোবৃত্তি ও শক্তি ও দুঃখবরণের সামর্থ্য দেখাতে পারিনি। তেলেঙ্গানা, তেভাগার লড়াই আর দেশের বহু স্থানে আমাদের অগণিত খণ্ডযুদ্ধের কথা ভুলছি না, কিন্তু পরাধীনতার নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলার প্রকৃত সঙ্গতি ও সংকল্প আমাদের ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়ে গেছে আর তারই আনুষঙ্গিক দীর্ঘব্যাপী রক্তক্ষয় ও অন্যান্য নির্মম বিপর্যয় দেশের মানুষের জীবনে এমন ভাবে ঘটেছে যে ইতিহাসের বহু বিরাট বিপ্লবেও তেমন ঘটেনি। গান্ধীজীর 'অহিংসা' ব্রত এই অভিজ্ঞতার ফলেই যে আঘাত পেয়েছিল তাতেই তাঁর মৃত্যু, গোডসে নামে এক হিন্দুবাদী দুর্বৃত্ত তো উপলক্ষ মাত্র।

ইতিহাসের কশাঘাত আমরা পেয়েছি, তার জ্বালা আজও মেটেনি। সেজন্যই এমন কথা মনে ঘুরছে। ভাবতে না চাই তো ভিন্ন কথা, কিন্তু একটু ভাবতে বসলেই মনে হয় ১৯৪৫-৪৬ সালে যখন দেশ সংগ্রামের উন্মাদনার উদ্‌গ্রীব এবং সেই উন্মাদনায় ইন্ধন দিয়েছি আমরাই আর কংগ্রেস পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে তখনও আমরা আত্মশক্তিতে ভরসা হারিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি বুর্জোয়াদের হাতে। ১৯৪৬-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত গোটা দেশ ছিল অগ্নিগর্ভ আর 'জনযুদ্ধ'-এর সুবাদে বহুনিন্দিত কম্যুনিস্টরাই যেন অগ্রণী। এই সময়টাকে গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "The Almost Revolution"। এই সময়েই কলকাতায় ছাত্র অভ্যুত্থানে, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে অপূর্ব উদ্দীপনা, সৈন্যদলে বিস্তৃত বিক্ষোভ, দেশজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর তেজস্বী আন্দোলন, বহু প্রদেশে কার্যত কৃষকবিদ্রোহ, আর সংক্ষেপে বলতে গেলে সবকিছু ছাপিয়ে বোম্বাইয়ে নৌবাহিনীর বিদ্রোহ (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। এই বিদ্রোহ দমন ইংরেজ করতে পারেনি, করেছিল আমাদেরই রাজনৈতিক নেতৃত্ব। মুসলমানদের এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ এমন

একটা জাজ্জ্বল্যমান ঘটনা যা কেমন করে সবাই ভুলে আছি জানি না। বোম্বাই শহরে তখন ইংরেজ শাসন যেন খতম, শহরের পথে চলছে মিছিলের পর মিছিল; তারা কংগ্রেস, লীগ আর কম্যুনিস্ট পতাকা একসঙ্গে বেঁধে চলেছে। আলাদা রাজনৈতিক চেতনা যে উবে গেছে তা নয়, কিন্তু দেশের মেজাজ এমন যে জনতাই ডাক দিয়েছে "সবাই এক হও"। হয়তো অবিচার করছি কিন্তু আমার কি অনেকটা অসহায়ের মতো হাল ছেড়ে দিলাম না, যখন কংগ্রেসের বল্লভভাই পটেল আর এস কে পাতিলের মতো নেতা নয়, স্বয়ং জওহরলাল নৌবিদ্রোহীদের দমন ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা দিলেন আর মহাত্মা গান্ধী (যিনি ১৯৪২-এ "করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে" ডাক দিয়েছেন) নির্দেশ দিলেন অরুণা আসফ আলিকে রাস্তার লড়াই ছেড়ে আসতে। হয়তো আমাদের 'এলেম' ছিল না, কিন্তু অমন আগুন ঝরা পরিস্থিতিতে জনতার নিজস্ব অস্ত্র সংবরণের মতো ভীত ত্রস্ত নিরীহ পদক্ষেপে আমরা বাধ্য হলাম। এমন এক বৈপ্লবিক 'মুহূর্ত'কে হেলায় হারালাম। হয়তো এটা ছিল অনিবার্য, আমাদের হাতিয়ার যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু খটকা লাগে, বাস্তবিকই কি 'বিপ্লবী' হতে পেরেছি আমরা?

আর একদিক থেকেও আমরা পঙ্গু হতে দিয়েছিলাম নিজেদের এবং সেটা হল হিন্দু মুসলিম সৌহার্দ্য বজায় রাখা আর দেশভাগের কলঙ্ক নিবারণ বিষয়ে। চল্লিশের দশকে, পাকিস্তান প্রস্তাব জোরদার হবার পর কংগ্রেসেরই এক প্রধান রাজা গোপালাচারী ধিকৃত হলেন এজন্য যে তিনি চেয়েছিলেন আপাতত আমরা এক হয়ে লড়ি আর স্বাধীনতার পর 'পাকিস্তান' প্রস্তাব নিয়ে সবাই সিদ্ধান্ত করব। সারা দেশে মুসলমানদের মধ্যে এর সমর্থন বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু কংগ্রেস রুষ্ট হয়ে এমতের প্রবক্তাকে 'একঘরে' করল (যদিও পরে তাকে ঘরে ফিরিয়ে 'স্বাধীন' ভারতের প্রথম বড়োলাট বানাতে কসুর করেনি) আর আমরাও চুপচাপ রইলাম। আমাদের পক্ষ থেকে কমরেড গঙ্গাধর অধিকারী যখন অনেক চিন্তার পর পার্টিরই পক্ষ থেকে একটা সুনিশ্চিত নকশা দিলেন যাতে দেশটাকে অটুট রেখেই সতেরোটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের ব্যবস্থা ছিল অথচ ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের নীতি স্বীকৃত হল না। হয়তো এতে ভুল ভ্রান্তি ছিল কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে অনেক স্ববিরোধী কথাবার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অধিকারীর মতো মনস্বীর চিন্তাটাকেই সরিয়ে দেওয়া হল। সংযুক্ত বাংলা নিয়ে মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম ১৯৪৭ সালে শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে ঐকান্তিক প্রয়াসে নেমেছিলেন। তাঁর মতো ব্যক্তির সঙ্গে কমরেড অধিকারীর যে কোনও যোগাযোগ পার্টির পক্ষ থেকে ঘটানো হয়নি তা জেনেছি আবুল হাশিমেরই স্মৃতি কথা থেকে। এটা আমাকে বাস্তবিকই আশ্চর্য করেছে। যাই হোক পাকিস্তান প্রসঙ্গে আমাদের মনের জড়তা ও বিভ্রান্তি যে ঠিকভাবে তখনই কাটাতে পারিনি এটা দেখে সত্যই কষ্ট হয়। তখন কী এমন মনোবৃত্তি চাপল আমাদের যে গান্ধী জিন্নাহ আলোচনার ওপর দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেবার মতো দুর্মতি আমাদের হয়েছিল। বুর্জোয়া চক্রান্তকারীরা 'আটঘাট বেঁধে' এমন ব্যবস্থা করেছিল যে ঐ দুজনের মিল হল না, হতে দেওয়া হল না। আমরা কিন্তু তাদের আলোচনা ব্যর্থ হবার পরও পথে ঘাটে "গান্ধী জিন্নাহ

যিন্দ্ মিলেঙ্গে" আওয়াজ তুলে তুষ্ট থাকলাম, হয়তো ভাবলাম এটাই-তো আন্দোলন! স্বীকার করছি আমরা অনেকে তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভাবতে গেলে কষ্ট হয়। এটা নিজের জোরে বিপ্লব না হোক্ প্রাক-বিপ্লবী আলোড়ন ঘটাবারও সামর্থ্য নেই ভেবে আত্মবিশ্বাসের অভাবকেই তুলে ধরছে না? কংগ্রেসকে এবং স্বয়ং গান্ধীকে শেষ পর্যন্ত দেশভাগের অপরাধের জন্য দায়ী বলে কতটা তুষ্টি আমরা পেতে পারি? আমাদেরও দায়িত্ব আছে, তুলনায় কম হলেও আছে—"এ আমার, এ তোমার পাপ!"

আমাদের বাস্তবিকই বহু গর্বের পার্টি এবং আন্দোলনের কুৎসা একেবারেই আমার কাম্য নয়, শুধু কতকগুলো ভাবনা তুলে ধরছি। ব্যক্তিগতভাবে নিজেও যে বিপ্লবী বিচারে কত অপরাধী তা মনে সর্বদা ঘুরছে। সর্দার পটেল একবার রহস্য করে বলেন যে কম্যুনিস্ট কর্মীরা "সোনার চাঁদ" ছেলে বলে স্বীকার করি কিন্তু সোনা দিয়ে ছোরার মত অস্ত্রও তো তৈরী হয়। বুর্জোয়া দুঃশাসন দমনে সেই 'অস্ত্র'-এর ভূমিকায় আমাদের অনেক গলদ থেকে গিয়েছে।

* * *

এই গলদ দূর করার চেষ্টা হল পার্টির কলকাতা কংগ্রেসে (১৯৪৮)। দেশবিভাগের মূল্য দিয়েও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ প্রথমে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের উল্লসিত করেছিল। অথচ পরাধীনতার বন্ধন থেকে তো মুক্তি পেয়েছি, বিজেতার পদানত হয়ে থাকা থেকে তো নিস্তার মিলেছে, এবার নতুন করে দেশ গড়ব। ভাঙা দেশকে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে জোড়া দিতে পারব। এই যে অনুভূতি তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, দেশবাসীর মনস্তত্ত্বে আঘাত দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথেরই কথায় বলি যে আমরা বুঝি ভাবলাম : "ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে", মেঘ কেটে যেতে দেরি হবে না। কিন্তু দেখা গেল স্বাধীন ভারত শাসনের স্বৈরাচারী চেহারা, তাই ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আওয়াজ তুললাম "ইয়ে আজাদী ঝুটা হয়," পথে পথে রব উঠল : 'ইয়ে সরিগলি সরকার কো এক ধক্কা আওর দো"। পার্টি নিষিদ্ধ হল, সরকারি অত্যাচার তুঙ্গে উঠল, বৎসরাধিক কাল চল্‌ল 'কশ্‌মকশ্‌'-পার্টি যেন পূর্বতন "শোধনবাদী" ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করতে তখন উত্তাল। এক্ষেত্রেও আবার আমরা আবিষ্কার করলাম (এবং সোভিয়েট পক্ষ থেকে পরামর্শও এল) যে আমাদের 'বাড়াবাড়ি' হয়ে যাচ্ছে, গভীর চিন্তা ও দেশের বাস্তব পরিস্থিতির যথাযথ পর্যবেক্ষণ বিনা কতকটা যেন 'হঠকারিতার' পথে নেমেছি। আর তাই ১৯৫০-৫১ সালে পার্টি যেন করল আত্মসংবরণ এবং নিছক সদাসংগ্রামী পথ ছেড়ে গোটা দেশের রাজনৈতিক স্রোতে ফিরে এল। তখনও দেখা গেল যে দেশবাসীর আনুকূল্য আর ভালোবাসা আমরা হারাই নি। যেখানে আমরা সক্রিয় থেকেছি সেখানেই জনতা আমাদের পরিত্যাগ করেনি। যুদ্ধকাল থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যে কটূ কর্কশ শুধু নয়, নোংরা মিথ্যা অপবাদ বর্ষিত হয়েছিল তাকে অগ্রাহ্য করে দেশবাসী (যেখানেই আমরা তাদের সেবায় থেকেছি) আমাদের সমর্থন করে চললেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে দেখা গেল পশ্চিমবাংলা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশে (এবং অন্যত্রও) কম্যুনিস্টদের প্রভাব ও মর্যাদা অটুট রয়েছে।

নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে (সে নির্বাচন যতই অর্থবানদের দাপটে কলুষিত হোক্ না কেন) প্রমাণ করল যে শত্রুশ্রেণীর অতি কুশলী আক্রমণকে কম্যুনিস্টরা অন্তত কিছু পরিমাণে প্রতিহত করতে পারল। সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যায় কম হলেও শাসক কংগ্রেস দলের বিরোধী পক্ষে আমরাই হলাম প্রধান। 'স্বাধীন' দেশে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে রাজনীতির প্রধান মঞ্চে তখন থেকে আমাদের ভূমিকা পরীক্ষিত হয়ে চলেছে, আজও চলছে।

* * *

লেনিনের নির্দেশ ছিল যে শত ত্রুটি সত্ত্বেও বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রে' পার্লামেন্টের মতো সংস্থায় কম্যুনিস্টরা গিয়ে 'বাক্যবাগীশদের ডেরা'-কে একটা "আসল কাজের জায়গা বানিয়ে" বিপ্লবেরই বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে। পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথার খুবই তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু সে হল অন্য প্রসঙ্গ। এদিক থেকে বিচারে কম্যুনিস্টদের সাফল্য ও অসাফল্য দুই-ই দেশে দেখেছে এবং আজও দেখছে। যাই হোক্, মূলগতভাবে আমাদের দেশে বিপ্লব সম্ভাবনা পিছিয়ে যাচ্ছে এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলন সঠিক রাস্তায় চলছে না ভেবে আমাদেরই পার্টির একাংশে একটা যেন 'বিদ্রোহ' দেখা দিল। সংসদীয় মোহে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলছি, পার্লামেন্টের মতো "শূয়োরের খোঁয়াড়ের" মায়ায় মজে বসেছি এই আশঙ্কায় শুরু হল একটা ধারা যাকে 'নক্‌শালবাড়ি' নামে দেশ জেনেছে। সন্দেহ নেই যে ১৯৬৪ সালেই পার্টি ভেঙে দু'ভাগ (সি-পি-আই/সি-পি-আই-এম) হবার পর এল তার ত্রিধা বিভক্তি। অনিবার্যভাবে গোটা আন্দোলনের মস্ত ক্ষতি হল। অতি উগ্রপন্থায় যারা এগোলেন তারাও পরে বুঝলেন নিজেদের ভুল। কিন্তু তাদের সেই অভ্যুত্থান (যাকে কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে একটা সমুজ্জ্বল অধ্যায়, ব্যর্থতা সত্ত্বেও আদরণীয় অধ্যায় পরিগণিত করা সমুচিত মনে করি) আবার পুরোনো মূলগত প্রশ্নটিই তুলে ধরেছিল।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে : "It is better to have loved and lost than never to have loved at all" ("কখনও কাউকে না ভালোবাসার চেয়ে ভালোবেসে হেরে যাওয়া ভালো")। অতি-উগ্র বামপন্থা কালিক প্রতিবন্ধকসমূহকে অগ্রাহ্য করে হঠকারিতার আতিশয্য করে থাকলেও যেন আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বহু অমূল্য তরুণ বিপ্লবী জীবন বিসর্জন দিয়ে জানাল যে "কখনও বিপ্লব না করার চেয়ে বিপ্লবের চেষ্টা করে হেরে যাওয়া ভালো"। তাদের যেন অবজ্ঞা না করি; "মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ, ন চ ধূমায়িতং চিরং"।

সংস্কৃত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অপ্রতিভ নই। "চিরকাল ধিক্‌ধিক্ আগুন থেকে ধোঁয়া বেরোনোর চেয়ে মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠা ভালো"-একথাই যেন এই "নক্‌শাল" অধ্যায়ের মর্মবাণী (তার বর্তমান চেহারায় সাহসের অভাব না থাকলেও সুবুদ্ধির অভাব দেখে ক্ষুব্ধ হয়েও এটা বললাম)। ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বৃত্তান্তে এদের যেন কিছুতেই ছোটো করে দেখা না হয়।

আজ যখন সি-পি-আই আর সি-পি-আই (এম) উভয়েরই মহাসম্মেলন হতে চলেছে তখন আমার মতো 'আদ্যিকালের' পুরোনো বাতিল, অপটু, অসহায় কম্যুনিস্টের চিৎকার

করে বলতে ইচ্ছা জাগে—"আজকের দুর্দিনে আমাদের বৈরীশক্তি যখন একজোট আর নিজেদের ঝগড়া ভুলে 'বিশ্বায়নী' ফাঁদে দুনিয়াকে ভুলিয়ে রাখার সব আয়োজন করেছে, অন্তত বেশ কিছুকালের জন্য সমাজবাদ-সাম্যবাদকে যখন রাহুগ্রস্ত হতে হচ্ছে, নতুন দুনিয়াতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের দৌলতে নতুন ঢঙে লড়াই যখন দরকার, সঙ্গে সঙ্গে দৌলতশাহী দেশগুলিতেও সাধারণ মানুষের দুর্গতি দূর না হওয়ায় জগৎজোড়া নতুন লড়াইয়ের সম্ভাবনাও যে ফুটে উঠছে তখন আমরা সবাই (যারা নিজেদের কম্যুনিস্ট ভেবে গর্ববোধ করি) তত্ত্বের কচ্কচির মধ্যে না গিয়ে সাম্যবাদের মূল আদর্শ মনে রেখে এককাট্টা হব না কেন? বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে তো লড়াই, তাতে 'এক' না হলে তো দাঁড়াতেই পারব না। জানিনা কি যে ১৯৬৪ সালে পার্টিভাগ না হলে যে সংসদীয় ক্ষেত্র আজও সংগ্রামের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেখানে আমরা কত বেশি শক্তিশালী হতাম। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে একত্র থাকলে সংসদে আমাদের শক্তি ২০০১ সালের তুলনাতেও বেশি হত। কমরেড রণেন সেনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি; "কানু ছাড়া গীত নেই—সব কম্যুনিস্ট বিনা শর্তে আলোচনা করে একজোট হয়ে দাঁড়াক, "রাম লক্ষ্মণ পাশাপাশি না লড়লে জিত্‌ব কেমন করে?" এই শেষ মিনিত জানিয়ে বিদায় নিই; আমাদের তত্ত্বে প্রত্যয় রেখে পার্টির চরিত্র, তেজ, সাহস, কর্মশক্তি পুনরুদ্ধার করে দেশ ও দুনিয়াকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে যেন পারি।

Dire Damage to Our Civilisational Entity

On December 6, 1992, when the 500 years old Babri mosque in Ayodhya was brought down with devilish glee by contingents of frenzied religio-fascists mobilised by the notorious Sangha Parivar, with its political flagship the BJP and odious outfits like Vishwa Hindu Parishad, Shiv Sena, Bajrang Dal, etc, it was not only our fleeting image as a 'secular state' but our historically involved civilisational entity which lay nearly shattered. Other events followed, helping the BJP to rise from near-inconsequentiality in Lok Sabha (where its membership was reduced to two!) to its present position of power. This piteous predicament from the common people's point of view was cruelly compounded earlier this year when a suspiciously incendiary enormity in Godhra presaged an unprecedented, government-condoned, unspeakably cruel, four-month program, reminiscent of Balkan style "ethnic cleansing" that delighted the gloating 'globalisers' of the West that has found the going so good in the post-Gorbachev period of moral-ethical atrophy all over the earth.

LOWEST POINT IN RECENT HISTORY

"Hey Ram!' were the last words from the lips of Gandhiji as, on January 30, 1948, he fell to bullets fired by a Hindutva fanatic. *'Jai Shri Ram'* ('Hail Shri Ram'), said the 'volunteers' *(karsevaks)* breaking the Babri mosque, not only a place of worship but a massive edifice adorning the skyline of a city of shrines, Ayodhya. As the structure came down, the BJP's national leaders watched and cheered, so very unlike an old-style Congress leader and priest to boot, the late Kamlapati Tripathi, who once said (I remember distinctly) that if a brick of the mosque was broken he would go there and fast till death.

The Congress, of course, had changed; it was Congress leaders from Govind Ballabh Pant to Rajiv Gandhi who had queered the pitch for a peaceful settlement at the site of the mosque. The day after

the vandalism, on December 7, 1992, the parliament met, in an outwardly stormed (but perhaps with many who really rejoiced but concealed their glee!), and while Vajpayee looked sad beyond words and Advani appeared dazed, the Congress prime minister P V Narasimha Rao sat pouting his lips, the very picture of melancholy. However, the parliament, in spite of the usual hullabaloo, remained supine, discarding even the then speaker's reported advice that a resolution of national sorrow be communicated to the world, especially to heal the would in Muslim hearts. It was perhaps the lowest point in our recent history.

How ironic in this context is recollection of the verse in Valmiki Ramayana where Ram tells Lakshmana that "this golden Lanka" *(iyam swarnamoyee Lanka)* was "not to his liking" and went on to add that "the mother and motherland were more glorious than heaven" *("jananee janmabhoomischa swargaadapi gareeyashi")*. Such words seem to be anathema today in Hindutva-touting India!

HIDEOUS SLUR ON INDIA'S IMAGE

Field Marshal Lord Wavell, India's viceroy preceding Mountbatten with his 'Plan Balkan" (1947), noted in his 1946 diary that he was surprised at Labour foreign minister Ernest Bevin's venomous hostility towards India's freedom, and also his anxiety that the 'West' must continue to be in control of 'the middle of the earth,' the Indian subcontinent. Britain, never conceding independence, agreed to the "transfer of power" to India and Pakistan, extracting in exchange the partition of our country. For historic reasons the region comprising Pakistan would be made easily to slide into the pocket of imperialists and serve, as a time bomb, to be switched at will against India—a role Pakistan has been playing even today.

But India, for all her debility and degeneracies, has been more intransigent and during the Cold War period could have the gumption to spout the concept of non-alignment and was accused of 'tilting' towards the Soviet Union. Thanks to the 'contrived' eclipse of socialism since 1987-89, the world is 'safe' again for a rejuvenated capitalism—or rather 'corruptalism', in view of its innate link with corruption and crime—and we have today in India a party in power, though more than precariously, the BJP, with its peculiar adherence

to a sort of religio-fascism whose depredations from Ayodhya (1992) to Gujarat (2002) have been and are such a hideous slur on India's image.

A clever ruse is being attempted at present to show us all a cleaner face of the BJP, projecting its leader, Atal Behari Vajpayee, as a humane and sensitive person (even his deputy, the already tainted Advani poses as a 'liberal') running a "secular" government that the constitution requires it to be. The Savarkar-Golwalkar 'doctrine' that Muslims (and presumably other religious minorities) are "only territorially Indians" in a virtually Hindutva state is the sheet-anchor of the BJP's perverted ideology. What is known as the 'Sangh Parivar' ensures that the team, including the so-called National Democratic Alliance (NDA) in whose name the union government is run, toes the same line of policy. The Bal Thackerays and Ashok Singhals and others, whose noxious names one hates to mention, are thus having the time of their lives. While the law of the land remains discreetly frozen, the unspeakable Gujarat inhumanities could happen and continue for months, and these neo-fascist incendiaries gloat openly about their "unfinished agenda" of performing before long in holy cities like Mathura and Varanasi enormities similar to what they have so egregiously done in Ayodhya (1992).

CATEGORICAL IMPERATIVE

This is why there is anxiety over what might happen on the tenth anniversary of the Babri mosque demolition. When Gujarat happened, the prime minister Vajpayee could only express abroad a small part of his dismay over the demonisation of politics that had sullied India's reputation but he could do it stealthily. In parliament he defended his heinous goons in Gujarat and elsewhere. Putting on the regulation RSS shorts, he repeatedly affirmed loyalty to the Golwalkar line. No wonder the Bush-Blair duo and other blackguards pat on the back just as more blatantly as they patronise their stooge who runs Pakistan. It has been our failure, the failure of the multifurcated communist movement, and of the Left generally, which will be listless in the absence of communist unity, that has in some way facilitated the BJP and its usually amoral allies to surge on sensationally to seize power in New Delhi. It will be more calamitous we fail again

to stop their blackguard advance.

That must not be allowed to happen. There are many signs of our people resenting and resisting the religio-fascist turn in our politics. On the tenth anniversary of the Ayodhya infamy, if some of us find it difficult to overcome that pessimism of the mind that has set in (whether we know it or not) since the Gorbachev excrescence and the atrophy of morals and ethics in public life, we must mobilise optimism of the will and unitedly call upon our people to rise to the occasion and throw out, as soon as possible, the BJP's neo-fascist regime. The basic good sense of our people was seen in the fact that the Gujarat epidemic of the demonisation of man could not spread in spite of the nefarious government being in power. This task—helping our "mother and motherland who are more glorious than heaven" to emerge again in a new lustre—is a categorical imperative.

SYNTHESIS OF CULTURES

It is more than time for us to remember with pride that for all our defaults and debilities, this old country of ours has been from time immemorial hospitable to religions and races, always nurturing the idea of Unity in Diversity, a co-existence of differences, an almost infinite eclecticism that could come to terms with militant affirmations (like that of some Muslim rulers), some capacity also of achieving not only commingling but also a kind of synthesis of divergent cultures.

We have had nothing like the Christian Crusades against Islam, the persistent religious wars as in Europe, whence Islam had been ejected with merciless cruelty from Spain, south Italy, Sicily, etc; nothing like the Thirty years' War (1618-48) and the *auto da fe'* and burnings at the stake of Christian dissidents, no such concepts as the monarch's religion to be compulsorily followed by the subjects *("Cujus regio ejus religio").* We have absorbed Persians, Greeks, Scythians, Sakas, Pallavas, Huns, etc, who found shelter in India's bosom. Long before Muslim invaders came, we had contacts with pious men as well as traders from Arabia whose tombs near Madurai and Tiruchi and elsewhere in south India pre-date the celebrated Khwaja Moinuddin Chishti, laid to rest near Ajmer where Muslims

and Hindus have been paying homage for seven hundred years.

Unlike the marauders from Europe—Portuguese, Dutch, French, English *et al*—Muslims proved they were niether 'birds of prey' nor 'birds of passage' and settled in this country. This was clear by the 14th century when, says Rabindranath Tagore, the new *Mahabharatvarsha* began, with Muslims as part of the soil, its life and culture. May I add that around 1940, at a Calcutta debate on the then new-fangled idea of Pakistan, I shared the platform with the Muslim League spokesman, Abdur Rahman Siddiqui, the mayor of Calcutta? This former Congressman said that though Calcutta, his home, could not be in Pakistan, but he did not mind. When a Hindu dies, he added, his body is burnt and the ashes are thrown into the river to be carried by the current the devil know where, but when a Muslim dies he wants six feet by three of the country's earth, showing that he "he belongs to this country in life and in death." It thrills me even now to recollect this and I know that the great Muhammed Iqbal, *Brahmanzada-e-Kashmir* as he proudly called himself, not only wrote some of our loveliest patriotic hymns but also on "this land where Chishti brought the gospel of truth, this garden where Nanak taught the unity of all religions," adding that here "the habitations of the heart" *(dil ki basti)* are becoming "empty". He said : "Let us together build a new temple of ours *(naya shivala).*"

I know I am being tiresome. But how can I keep out repeated mention of that stupendous genius, Amir Khusrau, court poet of the Khiljis 700 years ago, who could write that "every pearl in the royal necklace congeals the tears in the eyes of the oppressed peasantry"! A disciple of the great syncretist, Hazrat Nizamuddin, he called himself 'Hindustani Turk', Khusrau was one of the makers of Hindi and a creative contributor to music and the arts. How can one forget the great Nanak, "Guru to Hindus and Pir to Muslims", or Mahatma Kabir who preached what he called *'Bharatpanth'*, or Baba Fareed and Shah Lateef, virtual makers of Punjabi and Sindhi, or Ramananda and Ravidas, or Meera Bai and Chaitnya (with his Muslim disciple Haridas), or other gentle giants of the Bhakti movement, emanating with the saints of Tamilnadu and of Maharashtra, and in amity with the Sufi trend in Muslim thought (Shah Kalandar, Bahruddin Zakaria and others) which spread over all India an aura of sweetness and

light! How wonderful was Prince Dara Shikoh's presentation of the Upanishads "a moment," wrote K N Panikkar, "in universal history!" How inspiring it is to remember that in spite of the most virulent politico-military Sikh-Muslim hostility, Guru Arjun who built in the Golden Temple the 'holy of holies' called "Hari Mandir Saheb" (damage to which cost Mrs Indira Gandhi's life in 1984) and at its inauguration brought in as chief guest the most revered saint of the time, Miyan Mir! What a phenomenon has been the Indo-Muslim synthesis in architecture, music, literature, painting, philosophic reflection, jurisprudence, even cookery and dress habits and ways of living that have a luminous quality! No wonder we have the second largest Muslim population in the world, much larger than Pakistan's! No wonder that we cherish the fact of our Kerala having the world's record mix of various Christian denominations apart from Muslims, Jews, etc, and Christians forming today a sizeable part and even a majority in Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Goa—all being states of the Indian Union! Even more, we cherish Kashmir, that lovely slice of earth, which has a dominant Muslim majority and yet with her own Kashmiriyat that gells better with India (with her Unity in Diversity) than with Pakistan.

NO TIME TO DESPAIR

At ninety-five plus, doubtless at the end of my tether, I pen this rigmarole to justify myself to myself as a communist who joined the party, then legally banned in British India (1936). I confess I am in torment to see our movement at home and abroad going through a troubled timespan. But as a communist, however unworthy, I cannot despair : I prefer, in Shelley's words, "to hope till hope creates out of its wreck the thing it contemplates." And as I see bright signs of people's mobilisation against the fraudulent, so called 'globalisation' claiming for ever to demolish socialism, I remember what some seventy five years ago, a great teacher of mine, Kuruvila Zachariah, told me when I was agonised by things happening in the then world. In life, he told me, certain things happen that are "ineluctable" and you cannot prevent them, but you must "learn to see the rainbow in the rain."

That rainbow, today as in modern history, has been communism,

"the gospel according to St Marx," as some witty critics have said. But that is the message—that the workers of the world, the salt of the earth, will rise again to uphold and never let it down in India as well as elsewhere. This petty and putrid menace of neo-fascism (of Hindu or other vintage) will go, burnt in the fire of its own evil passions, and out of its ashes will rise, slowly but steadily, a new humanity. Let us pledge we will do all we can to assure the future and get rid of the demonising blackguards of religio-fascism in our land.

People's Democracy, December 2-8, 2002

'Hey Ram'!

Remembering Tees January 1948

Roman Rolland dedicated his memorable study of *Mahatma Gandhi* (1924) "to the land of glory and of servility, to the land of impermanent empires but of eternally glorious thoughts, to the people who bid defence to Time, to renovated India". That renovation has not come, even after more than half a century of freedom, and seems unsure in the near future. This country lives in hope, however—for "Hope, till Hope creates/From its own wreck the thing it contemplates".

Perhaps the recent BBC polls to find out popular perception of the greatest figures of the last century and the last millennium, where Mahatma Gandhi evoked unexpectedly high estimation, will help to rectify the prevalent fashion of denigrating most, it not all, our national "heroes". Not that such polls matter a lot, but accustomed as we are to being virtually among "the wretched of the earth" we tend to find them a sort of salve to our pride as a people For myself I remember the agonies of subjection—forty years of my life have been spent when India was unfree and tormented by an anguish inconceivable to the present generation. We used at one time to find some flattering unction to our soul in pronouncements, for example, of the American missionary, the Rev JH Holmes who said (in 1921) about Gandhi : "When I think of Romain Rolland, I think of Tolstoy.

FASCINATION

When I think of Lenin, I think of Napoleon. But when I think of Gandhi, I think of Jesus Christ. He lives His life; he speaks His word; he suffers, strives and will one day nobly die for His Kingdom on earth."

It is nearly 70 years ago that I began to shed my early fascination for Gandhiji (I have written a whole book on him and umpteen essays), but I have never hesitated to give him his due and if only to irritate (and I hope, also amuse) those inclined to pour idelogical obloquy on me on this account, I quote what the Times of India (Delhi edition, 7 April 1958) reported as having been said by that impeccable Communist Ho Chi Minh, that great and good man,

resenting any "comparison" as "a wrong formulation" did not hesitate to add : "I and others may be revolutionaries, but we are disciples of Mahatma Gandhi, directly on indirectly, nothing more, nothing less." Not that this obviously extempore statement clinches the matter, but I leave it at that.

The last great days of Gandhi's life (January 1948) could well be a sort of passion play—his fasts, the indomitable espousal of guarantees that a secular state must give to all citizens irrespective of religious persuasion, his successful insistence that India, inspite of Pakistan's demonstrative hostility, hand over Rs 45 crores that were rightfully due, his prayer meetings (which he refused to hold without recitations from the Quran) : "I am late by ten minutes," he murmured as he came for his last appearance, "I should be here at the stroke of five," and in a matter of seconds he was shot at by a fanatic and he was dead.

As I write, I think of a report in *Time*, the US news magazine which, during IK Gujral's rather fatuous tenure as Prime Minister, asked him, ironically, if he had any hopes of rapprochement with Pakistan, and for once Gujral replied with unwanted spirit that between our two countries there was a basic bond of amity. He recalled that he had been in Karachi the day Gandhi was killed and has seen every shop shuttered up and every eye in tears. Would that, remembering "Tees January", our two countries begin building the basis for an *entente* which is history's imperative!

Sophisticated strictures of Gandhi's mistake in espousing the *Khilafat* movement as integral to our freedom struggle (the aim of non-cooperation, 1919-22, was redressal of *Khilafat* and Punjab "wrongs" and for *Swaraj*) notwithstanding, it must not be forgotten how he had, with thoughtful colleagues like Maulana Azad and so many others, forged a massive communal fraternity that marked an unforgettably ecstatic period and he had touched the Muslim heart as never before or since and had persuaded all Indians to share the agony of fellow-citizens tortured by the British government's declaration (through Prime Minister Lloyd George's proud claim) that in the Great War of 1914-18 they had not only taught Turkey a lesson but had won "the last and most triumphant of the Crusades" and humiliated the Muslim *jehan*. It was the moment of opportunity for consolidating

Hindu-Muslim unity which Gandhi eagerly seized when Muslim emotion had been most deeply stirred and was aching for response.

OPPORTUNITY

Post facto political wisdom may scoff at Gandhi's sociological naivete, but he and Azad and others could not let that moment of opportunity slip out of their hands. This part of out history is being misinterpreted and virtually obliterated, which is one reason why at the present moment a chauvinist orientation perverts our politics and even after the Babri mosque demolition unhealed wounds are allowed to fester and the best traditions of our freedom struggle glibly forgotten.

In March 1922, sentenced to six years' jail for sedition, Gandhi in his statement to the court said he had "played with fire and would do so again if he was free", and in a superb formulation affirming that "the government established by law in British India is carried on for the exploitation of the masses", added flaming words : "The miserable little comforts of the town-dwellers in India represent the brokerage they get for the work they do for the foreign exploiter, and the profits and the brokerage are sucked from the masses." These are Gandhi's words, stuck in my memory for close on 78 years, and mind you, town-dwellers is the synonym of *bourgeoisele* (a term perhaps unknown then to Gandhi).

How aptly the description applies to the current "golbalising" days when, in "free India", only an affluent minority of 10 per cent or so would lord it over the submerged majority, with "socialism" in retreat and a comfortable "democracy" for the fortunate few assured! Gandhi, of course, had a horror of "revolution and red ruin" as he said himself in 1928 and many other times, but perhaps he had a point when he claimed to be a better "Communist" than those who have gone by that name!

In any case I have for years now and especially since counter-revolutionary froces brought about the recent eclipse of world socialism, waited for Communists and leftists here to speak Gandhi's language of March 1922.

This is not a summary survey of Gandhi's life and work which cannot be reviewed in a cursory fashion. It is my intention only to draw attention to some essential lessons we can draw from Gandhi's life. Released for health reasons in 1924, Gandhi went straight from

jail to Maulana Muhammed Ali's home in Delhi and began a 21-day fast in expiation of the crime of communal conflict that had broken out. There, at his bedside, was held a unity comference attended not only by national leaders but by such personalities as the Bishop of Calcutta, Dr Foss Wescott, and *The Statesman's* then editor, Arthur Moore.

CONFERENCES

This was the precursor of many unity conferences which unhappily, could not solve basic problems—negotiations for communal agreement reaching typical deadlocks "You are a Jew, you are a Bania", once shrieked Muhammad Ali in Calcutta, 1928 : "You compromise with Britain, accepting dominion status instead of independence, but you resist Muslim demands for 33 per cent representation at the Centre" (which ultimately gave rise to the concept once considered fantastic by Muslims themselves, of a separate Pakistan).

Gandhi cannot be altogether exonerated over this development, but fairness demands recognition that, in peculiarly complex circumstances, British guile and Indian debilities combining, Gandhi had tried, in his own way which was often ecentric, even esoteric, to see that the country was not divided. History, however, is "a cruel goddess" and for our defaults and deformations, we have had a pay too heavy a price. One thinks of the words of the Urdu poet Meer : *Dil dhai-ke kaba banaya, to kya kiya, to kya kiya?* ("You have broken hearts to build a Kaba : O what have you done, what have you done?"

Old times had better be in their shelves, protected by moth balls, and not brought out to talk nostalgically about the light of other days Thus, even with a sense of futility about things as they are and as they threaten to be in these affluence-aiming, exploitation-oriented, consumption-crazy days, one's thoughts rush back to *Tees January* 1948. "Both England and the town-dwellers in India will have to answer, if there is a God above, for this crime against humanity, which is perhaps unparalleled in history"—this was what Gandhi told the court trying him in March 1922. I sigh, poor man, for comparable modern pronouncement from those who care for "the wretched of the earth".

The Sunday Statesman : 30.1.2000

American Trauma—I

Time To Recall Words of Martin Luther King

Years ago, in the days, as it were, before the Flood, in the ancien regime before World War II, Rudyard Kipling, then poet-laureate and first British recipient of the Nobel Prize for literature, once found himself in a contrite mood to write; "Far called our navies melt away/ On dune and head land sinks the fire/Lo, all our pomp of yesterday is one with Nineveh and Tyre/Lord God of Hosts, oh, spare us yet/ Lest we forget, last we forget!"

This was not very typical of Kipling who sang haughtily of the glores of Empire, of "the lesser breed without the law" (like poor us in India) who were—how picturesque!—"the white man's burden". The sight of British troops in India would make him ecstatic; "Proud in their mien, defiance in their eye/We see the lords of human kind pass by!" Kipling did not live to see the nemesis, the retreat from the world scene, by no means complete yet, of that ugly phenomenon, white supremacism, but after all, being a poet, he had some inkling of the future.

SYMPATHY

There can be no doubt of the world's sympathy for sorely stricken United States of America over the infamous, if also technologically super-ingenious and at the same time fanatically motivated, assault at about the same time on New York City's World Trade Center and Washington's famous landmark, the Pentagon, strident symbols, as it were, of the "military-industrial complex" that runs America and as much else of the world as it can. The damage to the Pentagon, physically speaking, is not beyond repair but New York's proud showpiece, the massive 110-floor pile with its twintower, ungainly but stupefying, has been razed to the ground.

That such an amazing operation, designed, coordinated and executed with extra-ordinary expertise, attention to detail and almost unerring efficiency on the part of some highly trained people ready

and willing to die inevitably, in the process, has meant not only enormous sorrow but a sheer shock to which no adequate adjective can be found. It has hurt, irreparably, the 'United States' pride in herself, pride earned through historical trials—pride, particularly and currently, as the dominant, unipolar superpower on earth.

The US President, whatever his mettle, is during the tenure of his office the world's most powerful single person. That involves certain primary responsibilities which appear to be arrogantly flouted as the present incumbent outsoars his father and predecessor in office who, some 10 years ago, at least consulted the international community and wangled broad agreement for the most pitiless pulverising action against an identified state, Iraq which still suffers cruelty for dire delinquencies. The junior Bush, forgetting the moral imperatives of his elevated stature, does not hesitate angrily to spout "war, war, war" and in what may be called Old Testament fashion call for vengeance, naming specially the prime target of his inflamed ire a notorious incendiary terrorist sheltered in Afghanistan where US partronage and unstinted suport via loyal Pakistan has installed and till now sustained an odious fanatic set-up.

POWER

The Taliban was rewarded earlier for helping the United States destroy the republic (1979-89) installed after the Saur (Aprill) revolution that had allied with the then USSR and upset the balance of power in a region, strategically vital, in what the British Labour Minister Bevin said in the late '40s was "the middle of the earth". It is no surprise that the most gratuitously voluble echo of President Bush's anger (behind which at least there is legitimate anguish and a certain amount of grievous provocation) comes from Britain's Prime Minister Tony Blair. Both are top figure in today's world scene, such as it is, and know very well that there happens to be nuclear arms capability, modest but murderous enough, in at least three countries of the region.

There is no lack of sinister, not just stupid, leaders, and who know what abomination might follow even unintended, berserk blackguardries? For Bush, with Blair at his tail, mouthing the slogan of "war" implies that sense and sensibility, let alone statesmanship,

is almost *nonest.*

It so happens that as I write, I receive from a friend the 10-year-old text of Mother Teresa's open letter to then US President Bush, Sr, and the Iraqi President Saddam Hussein, besseeching both to stop the abominably merciless fighting and to "build peace". By another coincidence my own son gives me a copy of the late Martin Luther King's unforgettable speech "I Have A Dream" at the Lincoln Memorial in Washington, DC on the centenary (28 August 1963) of the Emancipation Proclamation that was "a beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice". That hope still remains unfulfilled though a lot of ground has been covered.

PROMISE

That great Christial (and near Gandhian) reminded his countrymen of the glorious promise of the American Revolution (1776) and the Declaration of Independence (1783) guaranteed to all men who were "born equal", the right to "life liberty and the pursuit of happiness". America, he said, has "defaulted on this promissory note", awaiting to be redeemed as and "when all of God's children will be able to sing with a new meaning "My country," tis of thee/Sweet land of liberty/ Of thee I sing./ Land where my fathers died/ Land of the pilgrims' pride/ From every mountain side/ Let freedom ring!"

I fear I am being naive to the point perhaps of ridicule. But I do not mind, I am reconciled to having to speak a language which is almost discarded.

The Statesman : 1.10.2001

American Trauma—II

Let Us Proceed With Civilised Humility

I wish to the Devil I had not lived to see this time when "wealth accumulates and men decay" and things happen that indicate that hopes for the future, once dearly held, are almost doomed. I see around me, even in this long-deprived land of ours, a sort of spirit that says, some-what pathetically in our conditions : "Earn! Earn! Earn! Then spend, spend, spend. Give the tired nerves no rest, the fagged and jaded brain no repose, the weary heart no peace. Look not above, where stars glisten in the sky. Look only below where you have paved the green earth with burning gold!"

This is rhetoric with a vengeance, I laugh as I say it to myself, but the words (how learnt years ago I cannot be sure) have stuck in my memory and often recur as I watch a world where "liberty, equality and fraternity" are myths, where man's right to "life, liberty and the pursuit of happiness" is an empty ejaculation, where socialism is in eclipse so that a modern reader of Bertanand Russell's "Roads to Freedom : Socialism, Anarchism, Syndicalism" (c 1925) will hardly believe his final expectation that the acquisitive, exploitative society "will die, burnt in the fire of its own hot passions and out of its ashes will rise a new world with the light of the morning in its eyes". O tempore..., O mores!

KEEP THE PEACE

Leaving aside this digression, I rejoice that in spite of the dubious glories of "globalisation" (and its accoutrements) overshadowing everything, the unfortunate (and I trust, only passing) bellicosity in President Bush's "Delenda est Carthago" (Carthage must be destroyed) speech before the US Congress and elsewhere does not appear to be widely shared. The Supreme Head of the the Catholic Church, Pope John Paul II has felt it necessary to tell urbi et orbi (Rome, the eternal city, and the world) : "With all my heart I beg

God to keep the peace," perhaps his immediate predecessor John XXII would have phrased it differently, giving mankind also a role in the matter. I see the report of a Swiss opinion poll in 31 countries (excluding Russia, China, Egypt, Vietnam, Cuba, India etc) which showed that a majority favoured the Bush stance only in the United States and Israel, while the rest by majority wanted peace efforts at once, 46 per cent even in the United States rejecting bellicose attitudes.

In *The Statesman* (Calcutta, 24 September) there is a remarkable survey (ND Batra, "Cyberage") which notes that the Bin Laden fixation ("Dead or alive", reward of 25 million dollars for information, etc) is decried and this Indo-American academician forcefully notes that "the bloody carnage" of 11 September that caused such hideous damage could not have been planned and executed by one ferocious fanatic and his mates "without the power and resources of a multitude of strategists and financiers living in sanctuaries not only in Pakistan, Afghanistan and the Arab world, but also in open and secular societies in Wesern Europe, Canada, the USA and not the least, India". Why he stresses "India" seems obscure, but he adds : "Would Laden's 'elimination' eradicate terrorist cells, for example, in Egypt, Germany, Britain or India, countries very friendly with the USA?"

ENLIST HUMANITY

The evaluation may not be correct and Professor Batra may be wrong. But there can be no doubt that, especially since Hiroshima and Nagasaki (1945) and American "doings" in Korea, Vietnam, Cuba, Libya, a whole bunch of African countries, the Caribbean, Bosnia, Iraq (1991) and elsewhere let alone its blatant assumption of being the "world gendarme" (without accountability), its outstretched ring of "bases" on foreign soil (Diego Garcia, etc), its despatch of the Seventh Fleet (1971) to brow-beat India and Bangladesh in the latter's freedom struggle (the list is endless)—the United States, wittingly and unwittingly, has often not scrupled to outrage the world's conscience and flunt its unassailable material strength. This has earned near-universal opprobrium which, in spite of the US's unipolar dominance has created a crisis. In spite of blemishes, however, today's

world is not like Britain (1856) on the eve of the crimean War when crowds sang in London : "We don't want to fight/ But by Jingo, if we do/ We've got the men, we've got the ships, we've got the money too!"

Away then with "vengeance is mine" and all Old Testament wrath! And on with bona fide international cooperation and also national endeavour not only to root out the evil of global terrorism but to repair (as Americans will, rapidly) the damage so diabolically inflicted on the US economy, to repair also the inevitably consequential damage to the world economy with its socio-political concomitants and enlist, through the United Nations and cognate agencies, all humanity, to the extent we can, for tasks ahead. Even countries known to be the US's bitterest enemies have expressed sympathy in her distress and assured cooperation in combating and rooting out the evil of insensate terrorism.

WHAT RAMAINS ?

I remember how in 1924 (when the US in disgust and dismay over the October Revolution, refused even to recognise the USSR) Stalin, delivering speeches included in "Fundamentals of Leninism", had not shrunk from saying that socialist ardour needed "American efficiency" to achieve success. Why can't there be true world cooperation in ridding our planet of the odious evils besetting us all? Let us all proceed, with civilised humility, not—even on the part of the mighty US—the sort of wrathful hauteur we have seen. For myself, anyway, I rejoice that even to revolutionaries—as the Very Rev Hewlett Johnson, Dean of Canterbury, in his "the Socialist Sixth of the Earth" (1936) averred · "love is the fulfilling of the Law".

It is love that makes the world go round, and whatever the hurdles, ever will, "Now remains Faith, Hope, Love, these three; and the greatest of these is love". (St Paul to Corinthians, I 13).

The Statesman : 2.10.2001

Remembering Jawaharlál and Indira

Life has a certain resilence, So that hardly any one, not even the great ones of creation, are missed for very long after their death. But as November comes along, the month when Jawaharlal Nehru was born on the 14th in 1889 and Indira Gandhi on the 19th in 1917didn't the father once tell his daughter to note the Symbolism, through entirely accidental, for her being born just after the "ten days that shook the world" in shape of the world's first socialist revolution? It is only right to reflect on their life and work. Unless one chooses not only to be a Partisan which, in essence, one has to be-but also petty and Peevish, it is not possible to Pool-Pool Jawahar- lal's legacy, for he was in some way, as an Arab dignitary said at his death in 1964, "the seneptor of the ethics fo much of our time and our world." This is a legacy that shadows not withstanding, remains luminous. In Indira's case also, even her wrost critics must concede that whatever obloquies be heaped on certain phases of her career and however controversial the ultimate assess ment of her at her best and one should be judged at one's best— There was a lustre to her life, her courage and her character which especially shone out as she died a martyr on October 31 last year

There are occasions when Personal recollections can not be avoided, and I recall first time I met Jawaharlal face to face in a few comrades in October 1936. We heard him them resolve the dichotomy, in many minds, between the strugle for freedom and the strugle for Soialism, the latter of which, some felt, could wait till after freedom was won. "We have to stretch ourselves out", he said "and fight for the two lodoos together, and in course of that effor the question of which we grab first will settle itself." I know of no more homely. Yet clear and categoric, for-mulations on the link between, libcration and socialism.

The second time I talked to him was in early 1942 when, afte a nearly two year stint in Jail, he came to Calcutta. Along with my then inseparables, Jyoti Basu ans Snehangshu Acharya, I met him to discuss the then recently set up movement of the friends of the

Soviet Union (FSU) in Dr. B.C.Roy's House. At 4. P.M., when he were to see him, his Secretary upadhyay took in the Rev. Leonard Sehiff (whom I knew well), where upon an inp in me made me write a note stating cooly that if the foreigner had preference because of the colour of his skin we were ready to clear off. This brought the great man out at once, laughing of course but apologising for the mistake and with a typically fond gesture whisking us together into his room.

The third time, to be followed by memberless times, was on the floor of the Lok Sabha in May 1952 when Feroze Gandhi took him acrose the chamber to meet some of us I remember the first debate on the President's address, during which, in a fit of pharase-mongering I had pilfered a Trotsky quotation to say that the Prime Minister had "lost his place in history for the sake of a tinsel portfolio." There upon, replying to the debate, he played for a while with the word 'tinsel' and averred that he cared not so much for 'a place in history" as for a place in the hearts of his people through service in their cause. It was a delight indeed even to be floored in such civilised debate.

One could, in Parliament then, without disrespect but drastically say, as I once did, that the Prime Minister did not deserve to be the leader of the House. Since he could not sheel his Partisanship. In a mellower, if also impishly malicious, mood I have referred also to Jawaharlal as one who orchestrated platitudes and sought vainly to specialise in ommiscience, "even describing him once as "a minor poet who has missed his vocation." It used to perturb some people, his Parlamentary Minister Satyanaryan Sinha often suggesting plaintively that the great man should not be heart that way; but I know for a fact that Jawaharlal never minded, rather he enjoyed sophisticated, if also stern, verbal sallies.

This is far from being an easay at appraisement of Jawaharlal; but while one cannot be sure of what the youth of today feel about him, hardly anyone of our generation (and those a great deal younger) can deny the impact he had no us and on his times. "Out of place everywhere, at home nowhere" during his young years, he was drawn by the Gandhi majic into the struggle, identifying himself to the extent he could with the masses of his people, "hungering and thirsting for

freedom." "Yet able always to be" "world's kin," coordinating India's liberation with the advance of freedom forces everywhere. It was no surprise that in February 1929 a secret Government circular freared "young leaders, notably Pandit Jawaharlal Nehru and Babu Subhas Chandra Bose" adding further. "There is a tendency for Political and communist revolutionaries to join hands and Pandit Jawaharlal, and extreme nationalist, who is at the same time genuinely attracted by some of the communist doctrines, stands almost at the meeting Point."

Imperialism's fear and frenzy over the likely convergence of the forces of freedom and of Socialism found Pathetic expression in J. Coatman's official report, "India in 1932". "Pandit Nehru has now one secret ambitio, which is to rival Lenin or Stalın in the history of communism." (1) This was bilge, of course, but if one person in the national leadership can be named who put Socialism in the map of our Polities, it was Jawaharlal. If one leader is to be singled out who linked the Indian struggle with world developments, whose concern for planning indicated anxiety over the condition of the people, whose identification of imperialism and facism" as the twin enemies (Pace his Lacknow Congress Speech 1936) presaged our Post-independence role in world affairs, it was Jawaharlal. His shining secularism once drew from Sardar Patel a humorous gibe that Jawaharlal was "the only nationalist Muslim he knew." His worry not only for India's but the world's woes made the Sardar Quip once. "Indonesia? Ah! where ıs Indonesia? Better ask Jawaharlal.

On April 1, 1928, Gandhiji wrote to Jawaharlal "I am quite of your opinıon that some day we will have to have a movement without the rich and without the vocal educated class. But the time for that is not yet." That time never came for eighter of them, not even in 1945-46 when perhaps a last effort could have been made to win freedom for an undivided India. The fault, however, vests not in Gandhi and in Jawaharlal but in all the rest of us together and in our hıstorical predicament where those of us who are communist still remain little more, nationally, than that Jawaharlal called us : a ginger group."

Let there be no cheep satisfaction drawn from tannts about Jawaharlal's indecisions, his inability to make up his mınd about the

Price fo fundamental socio-economic change, his declared belief that "there is no grave mistake than to lap the abyss in two jumps" and yet his commitment to unmitigated gradulism, his failure, thus as an epoch-maker, a failure, that is to say, in he sterner tests of history. Far rather let us remember his having been, with his frailties, and frustrations, a gem of a man who loved India and envisged her "Tryst with destiny," who was the first spokesman of Asian and African fellow sufferers under imperialism determined" no longer to be petitioners before the chanclleries of the west," who pioneered polices of friendship with socialist countries as indispensable to India's global role, whose place in history, thus, is not only that of a hero of India's liberation but a Prime influence in the contemporary world's tortured advance towards freedom and peace and hapiness.

It is agony still to think of that vile day last year (Oct-31) when, in her own backyard and in the presence of her aides, Indira Gandhi was gunned down by her own bodygurard. It is even greater agony-for one must go back to the elements (Panchabhoot) and "death will come when it will come"—that treasonable and fiendish forces at home and abroad, sustaine shamelessly by neo-imperialists who have never forgiven India her independence still pursue their malevolence without being brunded as they should be by our cruelty injured people.

The Indira murder trial proceeds fesultorily-no wonder since, as Shakespear said long ago, "the law is an ass." Little, if anything, is being done to reveal and revile "the foreign hand" about which Indira, when alive, often warned her people ("the greatest threat ever," she said on June 12, 1984.) and which was answered with wicked cartoons in the media ridiculing the accusation.

Only for a while did such ugly lampooning stop, but the disgusting trend only a little veiled, continues. Even as the Punjab elections took place, tactical considerations. perhaps insuperable, demanded that there should be no mention of Indira's martyrdom while nobody, it seems, could stop noising about of the theme that Indira's killer was 'Shaheed-e-Azam.'

At the moment of her death, in harness into the last, fulfilling her own prophecy that she would give her life and the last drop of her blood to her country, Indira left, as it were, an intimation or her

immortality, and the people's emotion indicated her indentification with them, the only sure criterion of the quality of a national leader. The immediate Political beneficiaries where her party (and also her own Progeny) but ever since the event an earnest effort had gone on to shift India away from what might be termed the Jawaharlal-India legacy. The stance, for instance, that Indira took when accused of "tilting" towards the Soviet Union—when she retorted that her country stood "erect" but knew how to choose her friends. Due not has not yet been taken of her repeated averment that "the greatest threat ever" was "attempts by some foreign countries to destabilise India."

With characteristic crudity, the New York Times once wrote of Indira's metamorphosis "from a China doll into an iron lady," but perhaps in time perceptive studies will appear of her evolution from a lonely, fastidious, often unhappy, perhaps in wordly seething, personality into what she later proved to be.

"That woman", was the ejaculation about her of Yahya khan (or was it Ayub Khan?) but more precipient was the french reaction some years ago-"Quelle femme" (what a woman!"). She began her brobation in high of ice as a sensitive, often shy and indraw personality, but learning the rather rude "trade" of Prime Minister she achieved the dignity and grace and equiposi-even a sort of serenity in spite of occasional lapses into fretflness and folly-which she never lost in the most exacting of or deals. She will be faulted badly, no doubt, for a kind of Authoritarian Predilection and for such errors as the imposition of Emergency (1975), but history will note that she was one who could talk back with proude courage to the great ones of the world and also touch a chord in the humblest Indian heart.

When she died the whole wide world felt diminished, and India's sense of the loss of a fitful but dearly beloved daughter will not pale easily.

The first censure motion (1966) Indira faced as Prime as Minister in Perliament was in my name. There were countless occasions when we exchanged hard words in debate-I a great deal more than she died, and as she said once, if she was half as stern in language as I had been I would have "a fit". However in spite of a certain mutual

impatience, I had developed for her a kind of real fondness. "I talk often as a Dutch Uncle, " I would say "but I pat you on the back whenever you are a good girl". These things come back as I see before me now her letter-one of her last-dated February 9, 1984. "...Thank you for your 'Pat on the back' though I wonder if a hand can reach my back in the midst of the present conserted shower of brickabats. .I wish others had the same appreciation. People ignore the difficulties of today's would and the great care and determination needed to fight the forces of neoimperialism, which are fast growing all around us and I am afraid our country also..."

In umpteen places I have referred to Indria's Prebisch Lectures in Belgrade (June 1983) denouncing "the new type of surrogate colonialism" which she said the world will not tolerate. She told me more than once of pressures on her, similar to pressures on the 'frontline' African States, the anger and antagonism of vested 'Western' interests American Reporters like William Hersch and Jack Anderson have written about the "controlled fury" with which she would U.S. insinuations, ever upholding the honour of her India.

She had many faults, doubtless; she delighted in her leading fellowers being what I wrote once in 1972-"minions." This bad authoritarian streak remains inscribed even in her party's nomenclature But frail and lovely, she had in her the wherewithal keeping under her thumb (as she told me around 1976) formidable cabined ministers "two hundred Percent against" her. And covering up nearly all her faults was her felling for her country—didn't she note in one of the last freagments of jotings.

"A poet has written... 'How can I feel humble with the wealth of you beside me'. I can say the same of India. I cannot understand how any one can be an Indian and not be proud—the richness and infinite variety of out composite heritage; the magnificence of the people's spirit, equal to any disaster or burden, firm in their faith, gay spontaneously even in poverty and hardship."

This was indeed Jawaharlal's daughter speaking—proud of herself (which every worth wile Person needs to be) Proud of her family (which she often was to excess), but proudest of all of her India. Not everything, of course, but much indeed can be forgiven her. How, in any cases, can one expect perfection in human behaviour and

achievement? Perfection also, like life in heaven, is terminal and dull.

Long ago, in November 1973, writing in Modern Review under the Psendonym 'chanakya,' Jawaharlal had warned that "a little twist" might turn him into a "dictator," the makings of which he carried in himself and tried to guard against. Accustomed to adulation, Indira thought, wrongly, that she just could not be affected by it. Few things are more Perilous than to have a leader supposedly gifted with charisma and sure of unquestioning obedience. Rajiv, as Indira's successor, heads the government and also an enoromous, country wide organisation long lacking facilities for democratic functioning.

This unfettered Power is a dangerous phenmenon, accentuated by, the currently fashionable allergy to principle and reliance on pragmatism (even in "Ideologically' oriented Political circles) and the "management" of Politico-economic issues for a conducted leap-foogging, as it were, into the 21st century. Here is peril which can be averted if only the best in the legacy of Jawaharlal and of Indira is reflected thoughtfully in the performance of our national and international tasks.

Amrita Bazar Patrika ·17th Nov. '85

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীহুমায়ুন কবির-এর সম্পাদনায় 'একশো একটি' রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদের যে সংকলন গ্রন্থ বের হয় (প্রকাশক মুম্বাই-এর এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-১৯৬৬) সেখানে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নীচের কবিতাগুলি অনুবাদ করেন। তাঁর রবীন্দ্রানুরাগ ও সংস্কৃতিকর্মের বহুমাত্রিকতার অন্যতম চিহ্ন হিসেবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সঙ্গের এই অনুবাদ কবিতাগুলি প্রকাশিত হল।—*সম্পাদক*

THE FOUNTAIN AWAKES

How is it that this morning the sun's rays enter my very heart!
How comes it that early bird-song pierces today the cavern's gloom!
I do not know why, but after so very long my soul is awake.

My whole being surges and the waters break their bonds.—
The heart's pain, and its passion, I can no longer hold in leash!

The mountain shivers in every pore and rock on rock rolls down.
The water foams and fumes and in pent-up anger roars.
Like mad, it moves in boisterous endless rings, rushes blindly
at the dungeon-door it cannot see but wants to break!

Why is God so stony?
Why these barriers all around?
Awake today, my heart, and win fulfilment.
Break, break into bits the boulders in the way!
Let blow rain on blow as wave rumbles after wave!

When the soul is aglow, who cares for this rampart of gloom or
the hurdle of stone?
What in the world is there to fear when the waters of desire
overflow its shores?
I'll break this prison-house of stone and flood the world with the
waters of compassion!
I'll pour myself out in mad fervid songs, flashing the bounty
of my hair and weaving bouquets of bloom.
I'll float in the air my rainbow wings and drain my heart to
print a smile on the fleeting sunbeam.

I'll rush from peak to peak, and sweep from hill to hill, and
laugh and chant and clap to my own measure.
I have so much to say and to sing,—my heart so crowded
with desire and bliss

I know not what happened today, but my heart is awake and
from afar I hear the ocean's roll.
Why around me this dark prison cell?
I'll rain blow on blow and break, break, break its walls : for the
bird-song is in my ears and the sunshine in my eyes!

1883 [নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সঙ্গীত, ১৮৮৩]

TWO BIRDS

There was a bird in a cage of gold,
another free in the woods.
One knoweth not what whim of God
brought the two together of a day.
'O my friend in the cage,' said the bird from the woods,
'Let's together fly away to the woods'.
'Let us live quietly in the cage'
rejoined the bird in the cage.

'Oh no', said the bird from the woods;
'those fetters I'll never wear!'
'Alas', the other replied,
'I know not my way out in the woods.'

The bird from the woods sat on a bough,
and sang all the wild songs it knew.
The other said all it had learnt by rote,
the languages they spoke were different.
'Sing a song of the woods, my friend in the cage',
the bird from the woods was pleading;
'Learn a cage-song, please, my love from the woods',
was the other's importuning.

'Oh no', said the bird from the woods,
'I want no tutored rhyme',
'Alas', the other rejoined,
'I know no song of the woods!'

'The sky is blue', said the bird from the woods,
'and there is never an end to it'
'Look, how neat this cage is', the other replied,
'how secure on all four sides!'
'Why not let us go', said the bird from the woods,
'and lose ourselves among the clouds?'
'Why not' said the other 'lock ourselves safe
in a corner of our own love-nest?'

'Oh no', said the bird from the woods,
'Where then shall I have room to fly?'
'Alas', the cage-bird sighed,
'where does one perch in the clouds?'

So it happened the birds loved each other,
but closer they could never get.
Across bars of the cage their beaks would meet
and also their silent stare.
Each failed to sense the other's state
nor why they differed so—
Lonely, they beat their wings
and plaintively called one to the other.

'Oh no', said the bird from the woods,
'the cage door might shut me in'.
'Alas', the cage-bird moaned,
'I haven't the strength to fly!'

July, *1892* [দুই পাখি, *সোনার তরী*, আষাঢ় ১২৯৯]

BRAHMAN

It was evening, the sun had just set and on the *Saraswati's* banks the forest shadows had darkened. To the silent *ashram* returned the children of the sages, on their heads small loads of sacrificial log collected in nearby woods. Called back from daylong pasture, the *ashram* cattle browsed calmly, tired, yet their eyes tranquil with content. A knot of young people, freshly bathed, sat in the open space before the hut, circling round Gautam, their *guru.* The darkness was lit by the embers of the sacrificial fire. Above, in the heaven's immensity, a great peace ruled sunk in thought. The stars in rows stood quiet and curious like expectant pupils. Silence broke, as Gautam's voice rang softly : 'Listen carefully my children, for I shall tell you of Brahman, the knowledge of Reality.'

It was then that a young lad came into the compound, holding in both hands a casket of flowers and fruit. He placed it devoutly at the sage's lotus feet, and bowing profoundly, spoke in ambrosial voice that the cuckoo could envy : 'Sire, I am *Satyakama,* from Kurukshetra. Desirous of initiation at your hands, I wish to learn the truth about *Brahman.*'

The great sage smiled. 'May your path be smooth', he said, his voice full of the quietude of compassion, 'Tell me your clan, my child, for Brahmins alone have the right to such study.' Slowly, the lad made reply : 'I do not, sire, know my clan; let me ask mother and I'll tell you tomorrow.'

Bowing again at the sage's feet, the boy walked back along the dark forest paths, crossing on foot the thin opaque and restful Saraswati—back to his mother's cottage by the sand, where the sleeping harnet ended.

The evening lamp flickered dimly, as his mother Javala stood by the door, anxiously awaiting her child's return. She drew him to her and kissed his head, murmuring words of benediction. 'Tell me, mother,' he asked : 'What is my father's name? and our clan? To the sage Gautam I went and begged initiation as his pupil. Only Brahmins he said had the right. What is my clan, mother?'

Her face lowered, his mother softly said, 'When I was young

and very poor, I served many masters and you came into my lap. You are the son of Javala who had no husband. You are my child, but your clan I know not.'

Morning came. Dawn, fresh and benign, wakened the tree-tops. The sage's disciples matched the young light's dewy rediance, emitting as it were the luminousness of virtue cleansed in the tears of devotion. Straight from morning ablutions, their matted hair still dripping, they sat around Gautam in the shade of the aged banyan, Gautam whose presence was an effulgence of beauteous purity. Birds and honey bees and the running stream made a concord of sound, grave and sweet, as many young throats chanted Vedic verse.

Slowly came Satyakama, bowing low at the sage's feet, and sat, without a word, his large eyes unclouded. The sage gave him his blessings and asked : 'What is your clan, my serence and comely child?' 'Sire', said the boy, his head upraised, 'I do not know, but I asked my mother. She said she did not know either, for she had served many masters, and I was born in the lap of Javala who had no husband.'

The strange tidings stunned all. Like bees scattered by a blow on a honey-hive, they hummed in agitation. Some laughed in derision, some cursed the arrogance of the shameless outcaste. Only Gautam rose, his arms open. Hugging the boy to his heart, he said : 'You are not beyond the pale, my child. You're the best of Brahmins for you are born to Truth!'

[ব্রাহ্মণ, *চিত্রা*, ফাল্গুন ১৩০১]

BAD TIMES

Though evening comes with slow weary steps
and all song is stilled at a hint,
though the endless skies stretch, lonely,
and weariness descends on every limb,
though a great fear counts its silent beads,
and the face of the horizon is veiled,
Yet, O bird, mine bird,
do not, sightless, furl your wings!

Here isn't the hum of murmuring woods,
but the sea-swell roaring with the serpent's rage.
Here isn't a bower tinted with *Kunda* blossom,
but the restless surge of loud, rollicking foam!
O where is the coast where flowers and twigs entangle?
O where is the nest, the sheltering bough?
Yet, O bird, mine bird,
do not, sightless, furl your wings!

Still stretches ahead the lengthening night,
and the sun sleeps in the distant sunset hill,
Stockstill and with bated breath the world
keeps lonely vigil as the moments glide.
There, in the far sky, floats a pale moon,
sickle-thin, swimming out of the deeps of gloom.
O bird, mine bird,
do not, sightless, furl your wings!

High in the sky the stars stare down,
fingers outstretched, their glances backoning.
Far below, in a hundred waves,
Death rushes in tumult, heedless and grave.
'Come, O come!' call anxious voices,
from far away, heavy with pity and pleading.
O bird, mine bird,

do not, sightless, furl your wings!

No, there's neither fear nor the binding fancies of love,
there is no hope, for hope is plain deceit,
there isn't the wangle of words and vain crying,
there isn't home nor floral bedecking.
Only these wings are there and the sky's boundless realms
dawn-abandoned, hued with deep gloom—
O bird, mine bird,
Do not, sightless, furl your wings!

['দুঃসময়', *কল্পনা*, বৈশাখ ১৩০৪]

THE LORD'S DEBT

Apace went news from village to village, *Maitra Mahashay** was on pilgrimage bent to where the Ganga merges into the sea. Quickly enough there gathered around him company, young and old. At the river ghat two country boats lay ready.

'Let me come with you, *Thakur,** prayed Mokshada, a young widow, pining for piety. Her eyes piteous and pleading, she would listen to no reason and take no refusal. 'But there is no room!' said Maitra, 'I cling to your feet', she replied in tears, 'I will find room in some corner.'

Won over by pity, the Brahmin asked still in doubt : 'Haven't you a small child? Where will he stay?'

'O Rakhal?', the woman answered, 'he'll be with his aunt, the one who brought him up. I was long ill and Annada fed him and her own child at her breast. Ever since, he prefers his aunt to me and when he is naughty and I punish him, why, his aunt takes his side and hides him in her lap. He'll be happier, *Thakur,* with her than with me.'

The Brahmin agreed and soon enough Mokshada was ready. With her little packing done, she bowed at her elders' feet and took sad leave of her friends.

At the ghat, who would she see but her Rakhal? He had slipped from home early and sat silent and unworried in the boat.

'You here'? his mother asked, and heard the answer, 'Why, yes, I'm going to the sea'.

'You are, are you?' she shouted, 'come down at once, you bandit-child!'

Again he said, his firm eyes wide open, 'I'm going to the sea, mother!'

He clung to the boat's side as his mother tried to drag him down. The Brahmin, moved by pity, smiled and said 'Let be, let him stay'.

'All right', the mother suddenly blurted, 'I'll leave you in the bottom of the sea!'

As she heard her own words, arrows of remorse bit at her heart, '*Narayan!* Narayan!', she muttered, invoking her god and took the child in her arms, caressing him fondly.

In a quiet voice, Maitra whispered, 'What madness possessed you that you spoke such evil words?'

News travelled soon of Rakhal going with the pilgrims. His aunt came rushing to the *ghat* urging him to stay.

'I'll be back soon, auntie,' Rakhal smiled at her, 'but I must really go to the sea'!

'My Rakhal is so naughty and I only can manage him, and he's never been away from me, *Thakur'* Annada pleaded. 'Don't take him, please; let me have him back'.

Rakhal would not bend and said, 'I tell you, auntie, I'll go now and come back soon'.

In affectionate tones the Brahmin said, 'Don't you fear for Rakhal! I shall be there and there's no worry. The winter days are here, the rivers and streams are clam, the roads are safe and crowds are going. Barely two months shall we need to go there and return. Your Rakhal will be safe with us'.

At the auspicious moment, invoking *Durga's** name, the boat moved off. On the ghat stood the village women, crying as they bade farewell. On the *Choorni's* bank the village looked tearful, bathed in *Hemant's*† morning dew.

The fair over, the pilgrim groups started homeword. The old boat, tied again at the ghat, awaited the afternoon tide.

All wonder spent, Rakhal was famishing for home and his aunt's caress, his mind numbed by the ceaseless sight of unending waters. Waters that were dark and sleek and crooked and cruel, and like serpents lolled out hungry tongues. Wicked and deceitful waters that raised a million hoods and roared and moaned everlastingly, mouth watering, as they yearned to devour Earth's children.

O Earth our loving mother, dumb but protective, you are hoary with age and tolerant of all truancies, our cradle of joy, soft-bosomed. How your unseen arms, O charming mother, draw us all the time, mightily, to your quiet, horizon-spanning heart!

The restive boy, his patience ended, asked again and again : 'When will flowtide come, *Thakur?'*

Animation suddenly shot through the tranquil waters. The river swelled, as if with tidings of hope. The boat turned right about, its

ropes shivered and groaned. The triumphant sea marched up the river with the waves' thundering music. The tide had come and the boatmen, bowing before God, steered quickly northwards.

'When shall we reach home?' asked Rakhal, nestling up to the Brahim.

Two leagues ahead, the sun not yet set, the north wind freshened. Sandbanks blocked *Roopnarain's* mouth and the river narrowed. There began tumult heady and strong, between the rowdy north wind and the oncoming tide.

The pilgrims cried aloud, 'Draw the boat ashore!' Ashore, but where was the shore?

All around were the frenzied waves tossing in dread dance, beating time with a million hands, mocking the heavens in foam-speckled wrath. Far away showed the dim line of the distant forest. On all sides rose the greedy and angry waves like fierce proud rebels against the tranquil sunset.

The boat refused to obey the helm and span round and round like a restless foolish drunkard. The bitter wind mingled with the cold sweat of fear to make all tremble as on the day of doom.

Some had lost speech. Others shouted hoarsely or wept as they called on their kin. Face shrunken and pale, Maitra sat with eyes shut and muttered his prayers. Rakhal, in a cold tremor, hid his face in his mother's breast.

The boatman, desperate, suddenly called out, "One in this boat has cheated the Lord, has offered Him a gift but has not kept his word : That explains this untimely storm and unruly waves. He must carry out his pledge. I warn you, you cannot flout an angry God!"

The pilgrims threw overboard whatever they had,—money and clothes and all, but to no avail. The waters again rushed fiercely on the boat.

'Listen before it is too late', the boatman cried again. 'Who is it is taking back what belongs to the God?'

Suddenly the Brahmin rose and pointed to Mokshada, 'There's the woman who offered her child to God and is taking him back.'

Hearts merciless with fear, the pilgrims cried with one voice, throw him overboard.

'Save him, O save him', cried Mokshada, clasping Rakhal to her breast, 'Save him, *Thakur*, in the name of God save him.'

The Brahmin shouted back angrily, "Am I his protector? You are his mother and yet in anger you offered him to God, and now I am to save him! You must pay God's debt and keep your vow or else all these people will drown."

'I am a poor foolish woman', Mokshada wailed, 'Do you, my Lord, accept as truth what I said in sudden anger, you who are the Lord of the inmost heart? Did you not know how vain were my words? Did you only hear the word of my mouth but not of my heart?'

Even as she cried, the boatmen and the pilgrims tore Rakhal from her arms and threw him into the raging river. With set jaw and closed eyes, Maitra turned his face away, covering his ears with his hands.

"Aunt, O aunt" screamed Rakhal and suddenly Maitra felt lightning lash his heart. A hundred scorpions bit him as the helpless infant's last cry pierced into his ears like an arrow of fire.

'Hold! Hold!' the Brahmin shouted as his eyes rested for a moment on Mokshada who had fainted at his feet.

For a second he saw the child's terror-stricken eyes as with a last piteous cry for its aunt it disappeared in the boiling waves. Two tiny fists desperately clutched at the sky and then were lost.

'I'll bring you back', cried the Brahmin, and plunged headlong into the river.

October, 1898

* 'Mahashay' and 'Thakur' are terms indicating respect.
* Durga—name of a goddess widely worshipped by Hindus.
† Hemanta—Late autumn.

['দেবতার গ্রাস' কার্তিক ১৩০৪, 'কথা']

BEHOLDEN

"Forget you? Never!" I had said when, on tear's brink, your eyes, wordless, held my face.

Forgive me if I have forgotten.

Years have gone since that day's caress.

Many a spring has passed in between, its *madhavi* blooming in bunches and fading off again, and multitudes of days have come and gone, weighed by the tired slumber that dove-song brings at noon.

Your dark eyes with shy and shrinking glances had scrolled in my soul the first epistle of love.

Over the signature of your heart has passed the brush of time, fitful with the light and shade of passing hours.

Many an evening has painted on it the molten gold of oblivion, many a night has covered it over with its alphabet of dreams in a maze of unclear lines!

Like a lad who hath no care, each moment is busy, always and meanderingly, drawing memory's lines on the canvas of the mind, weaving a web of forgetfulness.

If in today's spring-time I have forgotten the voice of an earlier *Phalgoon*, forgive me.

If, unnoticed, the flame has gone out of my lamp of pain, forgive me.

Yet this I know, that it was only because you came that my life was filled with a harvest of songs, a harvest that yet knows no end.

The light in your eyes stole out of sunbeams the secret in their core and made music of it all.

Your touch is no longer with me, but in my being you've left a touch-stone that again and again fills with sweetness the picture of our world,—

Fills, without cause, the bowl of joy out of which I might drink.

Forgive me then if I have forgotten.

Do I not know that you had called me once to your heart?

I can pardon my fate for all the sorrow and sadness stacked into my days.

From my parched lips Fate has snatched the cup, it has piled deception, with a smirk broken faith, drowned a full boat within sight of the shore.

All these I forgive.

No longer with me, you're farther than far away.

The vermilion wiped off your hair's parting has left the very evening desolate.

Alone, I dwell in a house bereft of beauty.

All this I know, but most of all I know that one day you and I were together.

['কৃতজ্ঞ', নভেম্বর ১৯২৪, পূরবী]

QUESTION

From age to age, O God, you have sent your apostles to this pitiless world : And they preached their gospel : 'Forgive all trespasses, love all, and banish hate from all hearts.' They claim our homage, time will not forget them, and yet, my regard unavailing, I must turn them back.

Have I not seen stealthy malice, in the night's deceitful shadow, hurl death at the helpless? Have I not seen Justice mourn, wordless and desolate, when the strong flaunt their unchecked crimes? Have I not seen youth, in agony, rush madly to break their head against the baffling cruelty of stone?

Today I am throttled, my flute has lost its music. *Amavasya's** gloom has smothered my world in a nightmare. And so, in tears, I ask : 'Have you foregiven them who poison your air and blot out your light? Have you blessed them with your love?'

* *Amavasya* : the moon's darkest phase.

[প্রশ্ন, পৌষ ১৩৩৮, *পরিশেষ*]

THEY WORK

Lazily, floating on time's stream my mind gazes into infinity. And traversing through space I see myriad pictures drawn in light and shade.

Aeon on aeon, in the lengthening past have marched masses of men proudly, with victory's arrogant speed.

Here came Pathans, empire-hungry, and then the Mughals, waving storms of dust and flags of triumph.

I look, today, into the alleys of space. They have vanished without a trace, but from age to age sunrise and sunset have reddened the speckless blue.

Again, under that sky, have come marching columns of the mighty British, along iron-bound roads and in chariots spouting fire, scattering the flames of their force.

I know that the flow of time will sweep away their empire's enveloping nets, and the armies, bearers of its burden, will leave not a trace in the path of the stars.

I turn my eyes on this earth, our earth, and see multitudes moving with vibrant voices along many roads and in many groups, from age to age, working to meet daily needs of men who live and die.

Through eternity they pull the oars, hold the helm. In field after field, they sow and cut the corn. They work in town and country.

Royal sceptres break, War-drums cease, Victory towers gape, stupidly, self-forgetful. Bloodstained arms and blood-shot eyes are lost in children's tales.

The people work. In every country, go where you will. In Anga, in Banga, in Kalinga's seas and river-*ghats,* in Punjab, Bombay, and Gujrat.

The hum and the roar of their toil link nights and days, made vibrant by work. Sorrows and joys, from day to day, orchestrate life's great music.

Empires by the hundred collapse and on their ruins the people work.

[ওরা কাজ করে, ফাল্গুন ১৩৪৭, *আরোগ্য*]

চিঠিপত্র

CONFIDENTIAL & PERSONAL
NO. 447-PMO/57

New Delhi
June 9, 1957

My Dear Hiren,

I have had your letter with me for some time. If you found it a little difficult to write it, I find it no easier to reply to it. But I went to tell you that I liked reading it and it led me to a chain of thoughts and emotions. Where they lead to, I do not quite know. Thoughts have a way of going in to unexpected channels.

You are a senssitive person and you must pay the price for that, as all of us do. I suppose I am also to some extent sensitive, though life hardens one.

You ask me about your writing about Ganhiji. I think you should do so. Indeed, I would like you to do so. I do not think I could attempt any kind of a long account or appraisal of Gandhiji's work. I have occasionally referred to him, in speech and writing, but such references have been brief. I have often been asked to write about him and I have consistently avoided doing so, except for brief messages of no importance.

I find that whenever I think of him, I get emotionally worked up, and that is no mood for proper writing. If I was a poet, which I am not, perhaps that mood might help.

You are also an emotional person, but if you feel the urge to write about him, you should certainly give in to that urge. It sometimes comes to me as a bit of a shock how far the present generation has moved away from Gandhiji's day and how little most of us understands him or can enter into the spirit f the twenties or the thirties. Even those who swear by Gandhi's and are supposed to be his fervent followers and disciplis, appear to me to have learnt literally some small part of his mesage and missed he spirit. How much more so those who did not come ino intimate contact with him?

Sometimes I have looked into his own writings or his letters to me They have carried me back to another world and I have realised how fa we had moved away from it. Of course, we had

to move, because the world moves and things are not what they were. Sometimes indeed I have read my own old letters to him and these have also produced strange sensations.

Has anybody in India ever written what might be called a good biography? I do not know of any such book. Usually such books are records of somebody's public activities and full of eulogy. A few criticise biterly. Neither appears to approach in the proper frame of mind or with requisite abiliy.

You accuse me of limiting myself to being merely the Congress Party leader. It is difficult for me to jüdge myself or my activities. Perhaps you are right to some extent, but I do not myself understand what people mean by saying that I should leave party and become, what is called, a national leader. Does that not ultimately mean starting a new party and be limited by that? We have had many great men ın the past who, rebelling against the caste system or something else, ended merely by starting a new sampradaya. To the multitude of our gods and goddesses and of our sects, they added a few more.

Jayaprakash Narayan has frequently summoned me to this national leadership, that is to get together men of goodwill from all groups and parties and march ahead. Exactly where one is going to march to and in what manner and by what methods is not made clear. It appears to be thought that if people of good will just got together in a room, all would be well. As Jayaprakash, for whom I have always had a good deal of affection, is entirely opposed to both mydomestic and foreign policies, I do not quite know how both of us together will chalk out a common path. It that is so between us two, what of a larger crowd?

We are all, I suppose, rather lonely persons, sometimes doubting what we ourselves say or do. Anyhow, I am going abroad in a few days. I shall certainly visit Norway, though I fear there will be no time to go to the fjords. I visited these Norwegian fjords in 1910 just after I had taken my Degreeat Cambridge. That was, I suppose, before you werr born.

Write to me when you have the urge to do so

Yours as ever,
Jawaharlal Nehru

Dilip Kumar Roy ওঁ HARI KRISHNA MADIR
১৭.৩.৭৩ INDIRA NILOY
POONA 16
PHONE : POONA 57387

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। আমি ভেবেছিলাম হয়ত বইটা ছুঁয়েই রেখে দেবেন তাকে তুলে বা বিলিয়ে দেবেন। আপনি দরদী তাই আমার এ-অত্যাচারী উপহার সইতে পারলেন। আজই সকালে আপনার গুণগান করছিলাম যে, আপনি ভূমা-কে মানেন ও "নাল্পে সুখমস্তি" উদ্ধৃত করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাই আপনার বস্তুবাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে মানতেই হবে। নীরেনের মধ্যেও ছিল। আশ্চর্য এই যে আমার আস্তিক বন্ধুদের মধ্যেও আমি এত ভালো খুব কম বন্ধুকেই দেখেছিলাম যেমন দেখেছিলাম নীরেনকে। আপনিও আমার স্নেহের পরিধির মধ্যে পড়েন সেজন্য আমি নিজেই খুশী—সে মতামত নিয়ে কথা নয় কথাটা স্নেহপ্রীতি শুভেচ্ছা নিয়ে। কবি...একটি শ্লোক আমার মনে গেঁথে আছে :

"When the spirit wakens অন্তরতম যখন জাগে—সে
If will not hour less হয়না কো কভু স্বল্পসুখী :
Than the while of life গাঢ় কোমলতা আকিঞ্চনেই
For hits tenderness." হয় যে সে যারা বিষমুখী

আমি যেখানেই গেছি বন্ধু পাকড়েছি—আপনি তাদের একজন। আশা করি আপনার প্রতি আমার প্রীতির মূল বিচ্ছিন্ন হবে না শেষ ডাক আসা পর্যন্ত—যার বড় বেশি দেরি নেই। একটা মস্ত পরীক্ষা সামনে'। মন বিষণ্ণ, কিন্তু ফেল করব না মনে হয়। আপনিও সেই আশীর্বাদই করবেন, কেমন?

সম্প্রতি ম্যাকমিলান আমাদের স্মৃতিকথা নিয়েছে, বোধহয় এপ্রিলে বেরুবে। ওরা লিখেছে জর্মন ভাষায়ও বইটি ছাপা হবে বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে। এ-অবস্থায় কূলে এসে নৌকাডুবি হবে না আশা করি। এ-বইটি ভারতবর্ষে কাটিবে কি না জানি না তবে ওদেশে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়েছে—ডক্টর স্পীফেনবার্গ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

আপনার মূল্যবান্ সময় আর নেব না। বেশি অত্যাচার করলে টান সইবে না ভয় হয়।

আমার বইটির জ্যাকেটের ভিতর দিকে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ ছাপা হয়নি। তাই পাঠালাম। আপনার শরীর ভালো যাচ্ছিল না শুনেছিলাম। আশা করি সেরে উঠেছেন। আপনার মতো বলিষ্ঠমনাদের...দমাবে আপনাদের? আমরা প্রার্থনাপন্থী তাই সময় সময় দুর্বল মনে করি আত্মবিশ্বাসকে। তবে কাটিয়েও উঠি ঠাকুরের কৃপায়। এ-যাত্রাও উঠব ভরসা রাখি ঃ "নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।" প্রীতি শুভেচ্ছা ধন্যবাদ পাঠাই। স্পীফেনবার্গের ভূমিকার একটি কপিও পাঠালাম। ...ও কামাথকে দেখাবেন যদি সুবিধা হয়। না, ...না। আমার বড় বেশি প্রশংসা আছে। বিজ্ঞপ্তি ভালো নয়। ইতি ভবদীয় প্রীতি-ঋণী দিলীপ।

Oxford 29 aug.

স্নেহের হীরেন,

গত সপ্তাহে তোমার চিঠি পেয়েছি। আশা করছি যে ক্রমশঃ মন বসে যাচ্ছে দেশে। না বসলেই বা উপায় কি। শুনলাম যে কাপূরের সঙ্গে দুজনে একটা বাড়ী নিয়েছ। এতে ভালই হ'ল। এটা কটা মাস ওখানে কাটিয়ে দিয়ে পরে আইন ব্যবসায়ের জন্য যখন কলকাতায় ফিরবে তখন নানা কাজে মন ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং এদেশের অভাব তখন অত অনুভব করতে সময় পাবে না। এবং তাতে ভালই হ'বে।

একরকম মানুষ আছে (তুমি ও আমি হচ্ছি সেইরকম) যারা Unreal ; অর্থাৎ যাদের মন real affairs, real work ইত্যাদি বাস্তব পৃথিবী থেকে খালি সরে এসে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ঢুকে থাকতে চায়—অনেকটা কুকুর যেমন নোংরা ও অন্ধকার গর্ত্তে পায়ের তলায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। ঐ সব লোক যে পরিমাণে পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে সেই পরিমাণে তারা নিজেদের মনে মনে নানাপ্রকার আকাশ কুসুম রচনা করে : 'আমি এই চাই", "আমি এই নই", "আমি এ হ'তে পারতাম" ইত্যাদি। বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে হ'লে যে পরিমাণ কার্য্যক্ষমতা, অধ্যবসায়, লড়বার ক্ষমতা ইত্যাদি দরকার হয় এ' সব লোকের সেগুলি নাই। কারণ বাস্তব সর্ব্বদাই সর্ব্বদেশে কর্কশ, কঠিন ও দুর্দ্ধর্ষ, এবং তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তাকে জিতে নিজের উৎকর্ষসাধন ও অস্তিত্ব স্থাপনই হচ্ছে পৃথিবীর বড় লোকদের কাজ ও বরাবর তাঁরা তাই করে এসেছেন। ভারতবর্ষে আমরা চিরকালই বাস্তবকে বেশ সহজেই এড়িয়ে চলে এসেছি—যুগ যুগ ধ'রে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ ক'রে, চিন্তাশীল মনকে ('rational mind) নিবিয়ে দিয়ে, বেশ সুখসাধ্য ও আরামপ্রদ স্বপ্নরাজ্যে মজাসে বিলাস ক'রে এসেছি—তা সে স্বপ্নরাজ্য তথাকথিত ধর্ম্মই হোক্ বা কলা-কবিতা-সাহিত্যই হোক্ বা বিজ্ঞান ইত্যাদিই হোক। সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্নের সহজ পথ অবলম্বন করেচি, বাস্তবের কঠিন পথ থেকে পলায়ন দিয়েচি। এবং এই পলায়নের জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাক্, ঐটেকেই নানাভাবে নানারসে নানা ঢং-এ বড় করেচি ও হেলেদুলে কোমর বেকিয়ে ভূমানন্দে মাতুয়ারা হ'য়ে নানাপ্রকার পাগলাম ও মাতলাম করেচি। যথা : রবি ঠাকুরের "art", "Gandhism" কীর্ত্তন, গোপালভাব, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, তপোবন, আশ্রম, ও আত্মাপ্রবণতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের মনে পৃথিবীর অন্য জাতের সঙ্গে তুলনায় বেশী সহজে ছায়া পড়ে। সূর্য্যের আলো আমাদের মন থেকে প্রায় সর্বদাই স'রে থাকে। আমাদের হৃদাকাশে সতত গোধুলি। (আবার নিজেদের দেশী গোধূলির অন্ধকার, ছায়া, অবসাদ, ধুলা, ধোঁয়া, মশকজাল, ড্রেনগন্ধ ও জাগ্রতস্বপ্ন আমাদের পুরো মাতালতা দেয় না ব'লে আমরা বিদেশ থেকে Celtic twilight ইত্যাদি নানাপ্রকার কাল্পনিক গোধুলি আমদানি ক'রে থাকি—যেন দেশী Unreal এ নেশা পুরো জমবে না ব'লে doubly unreal বিদেশী-স্বপ্নমদ চাই)—আমরা কোনো জিনিস চোখে দেখি না, কানে শুনি না, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ বা মনদ্বারা অনুভব করি না—কেবলমাত্র চক্ষু

কপালে তুলে বোম ভোলানাথ হ'য়ে তথাকথিত হৃদয়ের রসে ডুবে ছানাবড়া হ'য়ে থাকি। অনন্তে বুঁদ হ'য়ে যাই, কল্পিত স্বপ্নরাজ্যে রঙীন ও সূক্ষ্ম পাখা মেলে সুখে সন্তরণ দি। যেমন আয়েসী রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকার সহজ স্বপ্নে, সহজ সুরে, সহজ ভাব ভাষায় সর্ব্বদাই নিজেকে নানাভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে সারা অঙ্গে সুখের কাঁটা তুলেচেন। বা ধর্ম্ম ও রাজতন্ত্র বিলাসী গান্ধী কখনো নেংটী প'রে কখনো উপবাসদ্বারা নাসিকান্তপ্রাণ্ডজীবিত হ'য়ে, কখনো সাধুগিরির ঢং ফলিয়ে—ইত্যাদি নানাভাবে self-dramatisation ও exhibritionism-এর চূড়ান্ত করচেন।

যে দুটী ইংরাজী বাক্য এখন হঠাৎ এসে পড়ল—self dramatisation ও exhibitionism—এ'দুটীই আমাদের রোগের গোড়া। যাদের বাস্তবের, Realityর সঙ্গে যোগ নাই তারা নানাপ্রকারে নানা কাল্পনিকের সাহায্যে নিজেদের ঐভাবে জাহির ক'রে থাকে। এবং যেহেতু বাস্তব থেকে সত্য খুঁড়ে, ভেঙ্গে, লড়াই ক'রে বের করবার মত ক্ষমতা তাদের নেই, তারা সেইজন্য অবাস্তবের মায়াজালে নিজেদের ঘিরে রাখতে চায় এবং সেইজন্যেই আমাদের দেশে হৃদয়, স্বপ্ন (rather স্বপন), ভাব, দশা, সমাধি ইত্যাদি মনহীন, প্রাণহীন জড়ত্বের এত আদর হয়েচে।

সুতরা হে নবীন, তুমি মন থেকে স্বপ্ন বিসর্জ্জন দাও ও সবল হস্তে তোমায় মনে এতকাল ধ'রে যে কুয়াসা ও ধোঁয়া ও মাকড়সার জাল জমেচে সেগুলি দূর কর। এদেশে প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে খালি ঘরের মধ্যে কুঁনোব্যাং হ'য়ে রইলে—বাস্তবের সঙ্গে এতটুকুও পরিচয় করলে না—দূর থেকে মেয়ের শুভ্র স্কন্ধ বা সুন্দর চুল দেখে কৃত্রিম তুষ্টির সৃজন ক'রে নিজের মনপ্রাণকে পদে পদে ঠকালে। কিন্তু আর তা কোরো না। তোমার মনে যে স্বভাবজাত মাকড়শাটী সর্ব্বদাই নানাপ্রকার স্বপ্ন ও কৃত্রিমতা ও মিথ্যার জাল বুনে থাকে তা এখনো বুনচে সেটীকে বধ কর। দিনের আলোতে চোখ মেলে কাজ করতে সুরু কর। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত ও লড়াই-এর ভিতর দিয়ে নিজেকে জাহির ও পূর্ণ কর। লেখ, পড়, বক্তৃতা দাও, সভাসমিতি কর, যে সব ভাল জিনিস তোমার ভেতর গজ্ গজ করচে সেগুলোকে জাহির কর। নিজের সঙ্গে আর ন্যাকামি কোরো না। আমাকে দেখে বোঝ তার ফল কি।

রাধাকৃষ্ণননের পায়ে গড় জানাবে। কাপুরকে নমস্কার।

জ্যো।

শ্রী

A/6 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস
কলকাতা 700054
7 জুলাই 1998

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ডাকে দেওয়া চিঠিটা শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে পৌঁছবে কি না, এ নিয়ে একটু সংশয় ছিল। কেননা রাস্তার নাম লিখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার পরবর্তী চিঠিটি পেয়ে নিশ্চিন্ত লাগছে।

প্রণব আপনাকে আমার কোনো কোনো বই পড়িয়েছে, আপনি সময় করে পড়েছেন, সে-বিষয়ে ওর কাছে নানা কথা লিখেছেন, এমনকী বইয়ের মধ্যেও কোথাও কোথাও পার্শ্বিক মন্তব্য করেছেন, এতে যে আমার কতদূর সম্মানিত লাগছে তা বলবার নয়। আজকাল কম লিখতে পারি, কিন্তু পারি যদি কখনো তো আপনার এইসব কথা আমাকে নিশ্চিতভাবেই প্রেরণা জোগাবে।

একটা প্রসঙ্গে ছোটো একটা অনুযোগ তুলেছেন কুণ্ঠিতভাবে, হয়তো ভেবেছেন আমাকে কষ্ট দেওয়া হবে। মতবৈষম্য বা চিন্তাবৈষম্য কোথাও কোথাও তো ঘটতেই পারে, সেটা জানতে পারলে আমি আহত হব কেন? তবে বিশেষ যে চিন্তাবৈষম্য বা বোধবৈষম্যের উল্লেখ করেছেন আপনি, সেখানে আমাদের বিষমতা হয়তো খুব বেশি নয়। মনে হচ্ছে আমার ধারণাটা খুব স্পষ্ট করে আমি প্রকাশ করতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় নারীর প্রভাবপ্রতিপত্তি লক্ষ করা আমাদের কারো কারো 'ফিক্সেশন' হয়ে উঠেছে বলে আপনি ভাবছেন, ভাবছেন যে সেই চিরন্তন eternal tringle-এর তত্ত্ব দিয়েই তাঁর জীবনকে আর রচনাকে আমরা বুঝতে চাইছি। প্রসঙ্গত সেখানে কেতকী কুশারী ডাইসনের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রণবের কাছে লেখা চিঠিতে।

কেতকীর এবং আরো কারো কারো এই 'ফিক্সেশন' কিছুটা তৈরি হয়েছে বলে আমারও মনে হয়। আমি কিন্তু নানা সময়ে কথা বলতে চেয়েছি তার বিরুদ্ধেই। কিন্তু বিরুদ্ধে বলবার জন্য কখনো কখনো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিচারবিবরণকে সবিস্তারে হয়তো বলতে হয়েছে পূর্বপক্ষকে উপস্থাপন করবার গরজে। আমার মনে হয়, 'কবির অভিপ্রায়' নামে আমার বইটির প্রথম অধ্যায়ের 2/3/4 অংশকটি থেকেই আপনার মনে হয়েছে কেতকী আর আমি হয়তো একরকমই ভাবছি প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম অংশটি কিন্তু শুরুই হয়েছে এই বাক্য দিয়ে : 'কিন্তু সেটাই কি সত্য জানা হবে?' এই শেষ অংশেই আমার বক্তব্য জানাতে গিয়ে পরে লিখেছি : কবির 'বলবার মুহূর্তে সমকালীন জীবনতথ্যের সঙ্গে মিশে যায় কত বহুকালীন অনুভব-অভিজ্ঞতার রেশ, মুহূর্তটাকে ছুঁয়ে থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে ভরে আসা কত অজস্র মুহূর্তের টান, তার কি কোনো হিসেব আছে?' লিখেছি : 'রক্তকরবী লিখবার মুহূর্তে সদ্যযুবতী রাণু অধিকারীর ক্ষিপ্র চলাচল, তাঁর সরল এবং অদম্য দিনযাপন, সুসামাজিকতার সমস্ত জাল, তার বাধা আর

নিয়মতন্ত্র ভেঙে দিয়ে কবির একলা-জীবনের উষরতার মধ্যে তাঁর নবীন এক সঞ্চার নিয়ে আসা : নিছক তথ্য হিসেবে এর কোনো দাম নেই তা নয়। কিন্তু সে-তথ্যকে প্রধান করে তুললে তাকে কি বলা যাবে সেই মহানাটকের অভিপ্রায়, যা আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের বহুবিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতাকে একই সঙ্গে ধরে রেখেছে বলে দেখতে পাই?' ইত্যাদি। ব্যক্তিগণ্ডির বিচ্ছিন্ন তথ্য দিয়ে সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি যে অসংগত, সেইটেই কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল।

অবশ্য, বক্তব্য নিশ্চয় স্পষ্ট হয়নি। তা নইলে আপনার এই ধারণা হবে কেন।

'কবির অভিপ্রায়' বইখানির প্রায় কুড়ি বছর আগে 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' নামে আরেকটা বই লিখতে হয়েছিল, তার ভূমিকাতে এই কথাটা একবার মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে নারীপ্রসঙ্গে ব্যক্তিনারীতে খুঁজতে গিয়ে আমাদের পাঠ অনেক সময়ে খণ্ডীকৃত হয়ে যায়। প্রণবের কাছে জেনেছি যে 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' আপনাকে ও পড়ায়নি। বইটির নতুন এক সংস্করণ সদ্য ছাপা হয়েছে, এই সুযোগে তার একটি কপি আপনার কাছে পাঠাই। 'বিজয়ার অলিন্দে' শীর্ষক এর ভূমিকাংশটি যদি একবার পড়েন, আমার ভালো লাগবে। মতে হয়তো এখানেও সম্পূর্ণ মিলবে না, তবে নারীপ্রসঙ্গটি নিয়ে আমি কীভাবে ভেবেছি তার একটা আভাস এখানে আছে।

'কবির অভিপ্রায়' ফুরিয়ে গেছে, নতুন ছাপার কাজ শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যে। বেরোলে সেটাও পাঠিয়ে দেব আপনাকে।

আপনি এখনও অনেক পড়েন, ভালোবেসে পড়েন, তাই বই পাঠাবার এই ধৃষ্টতা করছি।

অধীর চক্রবর্তী নামে ইতিহাসের (পরে প্রাচীন ইতিহাসের) এক ছাত্রের কথা আপনার মনে আছে কি না জানি না। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সে আপনার নিকটছাত্র ছিল 1949-51 সালে, এম.এ.দেয় 1953-তে। তারপর দীর্ঘকাল সরকারি কলেজের অধ্যাপনা আর অধ্যক্ষতা করেছে, বছর চারেক আগে মারা গেছে হঠাৎ।

আমি সেই অধীরের সহপাঠী, স্কুলের। স্কুল ছাড়ার পর দুজন দুই কলেজের ছাত্র হয়ে যাই। ও পড়ে ইতিহাস, আমি পড়ি বাংলা।

এতগুলি খবর বললাম এইজন্যে যে সর্বার্থেই আমি আপনার ছাত্রতুল্য। তাই, ভবিষ্যতে যদি কিছু লেখেন আমায়, 'তুমি' বলেই লিখবেন।

আমার প্রণতি জানবেন।

স্নেহার্থী

শঙ্খ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৫-বি ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-২৯
১৫।৬।২০০০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। কিছুতেই কাগজে কলম ছোঁয়ানোর সাহস হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি আমার গুরুমশাই ছিলেন ব'লে নয়—আমার চল্লিশ বছরের পার্টি জীবনেও আপনি ছিলেন আমার গুরুজন।

ভেবেছিলাম চিঠির বদলে নিজে গিয়ে সামনে হাজির হব। বাধ সেধেছে আমার কান। কানে যন্ত্র লাগিয়েও কিছু শুনতে পাই না। কেবল চোখের দেখায় মন ভরে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার লেখার প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য খুবই ন্যায্য। আসলে তত্ত্বে আমার মন বসে না। সব কিছুতেই একটা উড়ু-উড়ু ভাব। দিন আনি দিন খাই করতে গিয়ে।

পত্রপাঠ শুরু করেছিলাম লিখতে। কিন্তু শেষ করতে পারিনি। ফরমায়েশি লেখার চাপে লেখায় বাধা পড়েছিল। খুব যত্ন ক'রে রেখে দেওয়ার ফলে আপনার লেখা চিঠিটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিকে মরমে মরে যাচ্ছিলাম উত্তর দিতে না পারার জন্যে।

আমার এখনকার অবস্থা কাউকে ব'লে বোঝাতে পারব না। একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথের দশা। হাতের কাছের জিনিসও নেড়ে চেড়ে দেখা কিংবা উঠে কোনো বইপত্র খোঁজা—নিজে কিছু করার ক্ষমতা নেই। অথচ এ নিয়ে কাঁদুনি গাইতেও লজ্জা করে। যাই হোক, এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

আমার সবচেয়ে বড় আপশোস, আপনি হয়ত আমাকে খুব অকৃতজ্ঞ ভাবছেন।

আপনি নিজগুণে মাপ করে দিলেও আপনার কাছে আমার ঋণ এ জীবনে শোধ হওয়ার নয়। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সঙ্কলন থেকে তার শুরু।

বাবা ছিলেন আবগারি দারোগা। জীবনে এক পয়সা ঘুষ নেননি। যৌথপরিবারে অভাবে মানুষ হলেও বাবার সততার জন্যে মনে মনে গর্ব বোধ করেছি ব'লে কোনো দুঃখই গায়ে লাগেনি। ফ্রি অর হাফ-ফ্রিতে পড়েছি। বই পড়েছি চেয়ে চিন্তে। ফলে, সেভাবে জ্ঞান অর্জন হয়নি। বারো বছর বয়সে টাইফয়েডে গানের গলা, চোখের দূরদৃষ্টি আর স্মৃতিশক্তি হারাই। জীবনে যেটুকু পড়েছি, তাও মনে রাখতে পারিনি। ফলে, চিরকাল হাতুড়ে হয়েই থেকে যেতে হল।

একবারই আপনার কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে। কিন্তু কাছে ঘেঁষার সাহস হয়নি। শুধু আপনি নন, কোনো নেতারই।

খুব ইচ্ছে করে, আপনার কাছে যেতে। তাছাড়া, আপনি ছাড়াও, ও বাড়িতে আমার আরও চেনা মানুষ আছেন। কিন্তু একবর্ণ শুনতে পাই না ব'লে যেতে গিয়েও পিছিয়ে যাই।

এতটা লিখে ফেলার পর হঠাৎ ছেলেবেলায় পরীক্ষায় বসার কথা মনে পড়ল। এই বয়সেও

স্বপ্ন দেখে বুক ধড়াস ধড়াস করে। দেখতে পাই, পরীক্ষায় ডাহা ফেল করে চোখের জল ফেলছি।

অবশ্য গুরুজনদের কাছে সে কথা চেপে যেতে হয়।

সশ্রদ্ধ প্রণাম। সবাইকে ভালবাসা।

সুভাষ

দ্র. চিঠিটা আমার এক মেয়ের হাত দিয়ে পাঠালাম। কণিকা ঠাকুর। পাথুরিঘাটার ঠাকুরবংশে জন্ম। বিবাহসূত্রে এখন কণিকা হোসেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২১.৩.২০০০ তারিখের চিঠি আজ পয়লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে তারিখে পেলাম, আমার প্রকাশকের মাধ্যমে। অশেষ ধন্যবাদ আপনার চিঠি ও আমার বই সম্পর্কে সহৃদয় মন্তব্যের জন্য।

আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু দু'বার দেখা হয়েছে—একবার আপনার বাড়িতে সোমেশ বাবু'র কল্যাণে, তারও আগে কলকাতার বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রদত্ত সম্মাননা অনুষ্ঠানে—যেখানে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং জনৈক তামিল কবির সঙ্গে আমিও মঞ্চে ছিলাম। এতদিন পর অবশ্য আপনার মনে থাকার কথা নয়। আর আমারও ভারি বদ অভ্যাস, ব্যস্ততার কারণে চিঠির যোগাযোগটা রাখতে না পারা।

আপনি ঠিকই ধরেছেন, আপনার প্রয়াত বন্ধু আইয়ুব সাহেবের বিশ্ববোধের সঙ্গে আমার ধারণার মিল নেই, থাকার কথাও নয়। যেমন তাঁর দর্শনচিন্তায় আলোকিত ইতিহাস চেতনার সঙ্গে আপনার ডায়ালেক্‌টিক্‌স সমৃদ্ধ ইতিহাস-নিরীক্ষার মিল হয়তো সামান্যই। আর আপনার কাব্যবোধ যথেষ্ট বলেই না আধুনিক কবিতার অমন সুচয়িত একটি সংকলন প্রকাশ একদা সম্ভব হয়েছিল।

আমি আপনার সঙ্গে একশ ভাগ একমত যে সম্প্রতি দুই বাংলাতেই জীবনানন্দের রচনা (কবিতা, উপন্যাস দুইই) নিয়ে "বহ্বাড়ম্বরের বহর" অবিশ্বাস্য। এক ধরনের ঘোর, বলা যায় জীবনানন্দ নিয়ে আকুলি-বিকুলি বাঙালি পাঠক সমাজকে পেয়ে বসেছে; স্বচ্ছভাবনার ঘটেছে নির্বাসন। আপনি ঠিকই বলেছেন গত এক শতকের বাংলা কবিতার যথাযথ বিশ্লেষী মূল্যায়ন গভীরভাবে হয়নি, যদিও হাজার বছরের কবিতার (চর্যাপদ থেকে ধরে) ঐতিহ্য নিয়ে আমরা ঠিকই খুবই গর্ব অনুভব করি। কথাও বলি সে অনুপাতে।

সম্প্রতি আমার একটি বই বেরিয়েছে বাংলাদেশ ও তার রাজনীতি বিষয়ে। বইটা পাঠালাম। জানিনা চোখের অসুবিধার জন্য পড়তে পারবেন কিনা। কয়েকমাস পরে বের হবে রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন। আমাদের একটি রবীন্দ্রচর্চা ট্রাস্ট সংগঠন আছে, বছর বারো বয়স, তারই একটি পরিচিতিপত্রও পাঠালাম। বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রচর্চার এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, বাকি সব গানের সংগঠন। সত্যি দেশ-দুনিয়ার হালচাল আমাদের জন্যও বড় যন্ত্রণার। স্বাধীনতাযুদ্ধে মানুষের চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার কোনো মিল নেই। ভবিষ্যত কাল বর্তমান পরাশক্তির একাধিপত্যের মধ্যে কতটা ঐ ঘাটতিপূরণ করতে পারবে বলা কঠিন। না-পারাটাই মনে হচ্ছে দুর্বল দুনিয়ার ভবিতব্য।

সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এটাই একমাত্র কামনা।

আহমদ রফিক

১২/২ সিদ্ধেশ্বরী রোড,

ঢাকা ১২১৭।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Bhattacharya

163 New Campus
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067
Phone : 665913

৩/১১/০১

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ১৫ তারিখের পত্রের জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করি। পড়ে মনে হ'ল যে বর্তমানে আমার কি বক্তব্য আপনার অবগতির জন্য জানানো প্রয়োজন কেননা আপনার মতামত (বিপরীত হোক্ বা না হোক্) মূল্যবান করে করি—তাই 'দেশ' পত্রিকায় কি লিখেছিলাম তার প্রতিলিপি পাঠালাম। বিশ্বভারতীর হাতে অনন্তকাল স্বত্বাধিকার থাকুক এ কথা আমি বলিনি। কেবল বলেছিলাম যে রবীন্দ্ররচনা ও সংগীতাদির শুদ্ধতা ও অখণ্ডতা যেন বাজারের দুর্নীতি থেকে রক্ষা পায় এই চেতনা জনমানসে জাগরিত হোক্। না হলে গণেশ জিতবে, সরস্বতী'র হার হবে।

(২) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ-এর মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং প্রকাশ্যে প্রবন্ধাদিতে মতবিরোধ বিষয়ে কিছু কাজ করেছিলাম শান্তিনিকেতনে থাকতে, ভাইস্‌চ্যান্সলর-গিরির বিড়ম্বনা থেকে মাঝে-মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। বইটি আপনার হাতে পৌঁছায়নি বলছেন, এখনই পাঠালাম ডাকযোগে।

(৩) Computer-এ লিখেছিলাম চোখ প্রায় অকেজো হয়েছিল বলে। কিন্তু তাছাড়াও আমি চিরকাল laxinization of Indian Script-এর পক্ষে, একটা সমিতিও ছিল আমাদের যাতে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, আমার বাবা নির্মল ভট্টাচার্য ইত্যাদি ছিলেন। বৃথা চেষ্টা হয়েছিল, এখন এটা আমার একটা খেয়ালিপনা মাত্র।

নমস্কারান্তে।
সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

পুনশ্চ : দিল্লীর বাইরে ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরী হয়েছে।

28th July, 1982

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ৬ই তারিখের চিঠির জবাব দিতে অনেক দেরি করে ফেললুম—নানান্ ঝঞ্ঝাট। তার মধ্যে সব থেকে এখন কষ্টকর হচ্ছে—লোকজনের। উনি এতো অসহায় হয়ে পড়েছেন যে ওঁকে সব সময়েই ধরে তুলতে হয়, বসিয়ে দিতে হয়। স্নান খাওয়া সবই করিয়ে দিতে হয়। আর লম্বা লোক তো আমি একা পারি না, একজন না ধরলে পড়ে যাবেন ভয় করে। মানে, আমি সমেত পড়ে যাবেন, তখন তো আরো কেলেঙ্কারি হবে—এই ভয় সদাই। ডাক্তার বারবার করে বলেছেন, পড়ে যেন না যান। তাই পুরোনো লোক আদতেই "মোর পুরাতন ভৃত্য" কে জোর করেই এনেছি ফিরে। সে বাড়ীর অন্য লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছিলো। ওদেরও তো মনুষ্যত্ব আছে—তারই টানেই বোধহয় এক দিন, ওঁকে দেখতে এসেছিলো। উনি দেখেই চিনেছেন, আর হেসেছেন। আমি তখনই (on the spur of the moment যাকে বলে) বলে ফেলেছিলুম—"আনন্দ, তুমি যেখানেই কাজ করছো, ছেড়ে দিয়ে 'বাবু'র কাছে ফিরে এসো। আমি তোমাকে বেশী মাইনে দেবো, পুষিয়ে দেবো।" ও আমার কথা রেখে ফিরে এসেছে, কিন্তু যেহেতু ওকে বেশী মাইনে দিচ্ছি অন্য একজন রাঁধুনী আছে (refugee) তার বেশ গাত্রদাহ! সেই খুব অশান্তি করছে—নানা অসুবিধা সৃষ্টি করছে, থেকে থেকে বাড়ী যাচ্ছে, কামাই করে—আমি আনন্দর সাহায্য পাই না। আনন্দ আমাদের বাড়ী ৩০ বছরের বেশী কাজ করছে। আমাদের পুরোনো ঠাকুর (আপনি তো তাকে দেখেছিলেন—সে মারা গেছে) এনেছিলো। তখন ও ছোটো ১২-১৩ বছরের ছেলে ছিলো—সব কাজ জানে, রান্না খুব ভালো করে। আর মুখটি বুজে। সেটা যে আমাদের রাঁধুনীটির (অত্যন্ত মুখরা সে—কাজের লোক বটে—তাই পপামীরা তাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু ওরা তো আর তার দিনের বেলার চেঁচামেচি বকাবকির কথা জানতে পারে না!) সহ্য হয় না—নানা রকমের অসুবিধা সৃষ্টি করে!! আমার তাই কিছুই সুবিধে হচ্ছে না। খুব খাটুনী-কষ্টকর ও ভয়েরও বটে। ওর বন্ধু, Percy Marshall-এর স্ত্রী april Edinburgh থেকে Propolis বলে একটা be-hive jelly পাঠিয়েছেন—আগেও ওষুধ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন—সেটা খাইয়ে শরীরটা একটু ভালো হয়েছিলো ক'দিন। তাই আবার পাঠিয়েছে £2.1od. ডাক খরচা করে। April অনেক bee-hives করে। সেই propolis alchol বা vodka তে মিশিয়ে দিলে dissolve করে যায়। এখানে alcohol বা vodka আমি কোথায় পাবো? তবু আমাদের একটি banker বন্ধু alcohol জোগাড় করে দিয়েছেন। সেটা তৈরী করে আবার খাওয়াচ্ছি ভাগ্যটা আমারই খারাপ—আগে এ ওষুধটা পেলে হয়তো অনেকটা ক্ষতিই arrest করে যেতো—এখন অসুখটা এতো বেশী এগিয়ে গেছে যে পুরো সারানো শক্ত—কিন্তু definitely ভালো আছেন। বইগুলি ওঁর কটা, ছবির বই ক'টা পাশে রেখে দিয়েছি—খুলে দেখেন সারাদিনই ওগুলি দেখেন। কি বোঝেন জানি না, তবু তো দেখেন—ক'দিন আগে কিছু করতেন না—আমার এ টুকুতেই আনন্দ! গত ১৮ই জুলাই, ওঁর ৭৩ বছরের জন্মদিন পার হলো ১৯০৯-এ জন্ম। সিদ্ধেশ্বর সেন অনেকগুলি লাল গোলাপ এনেছিলেন, আর সুলেখা সেন

অনেক সন্দেশ এনেছিলেন। গোলাপ ও সন্দেশ তো খুব ভালোবাসেন, আপনি জানেন। আমরা রোজ বাড়ীতে সন্দেশ করে খাওয়াই—দোকানের জিনি না, যদি বাসি হয়, সে ভয়ে। এমনিতে আর সবদিক থেকে ভালো, খালি কথা একদম বলেন না। বিভা কেমন আছে? এখানে সারা আষাঢ়টা যা কষ্টে গেছে, এবার শ্রাবণের ধারা নেমে যেন বাঁচিয়েছে আমাদের—রেশনের চালই ৩্ টাকার উপর দাম হয়েছে, কিলোতে। আশাকরি আপনি ভালো আছেন। আমার কতগুলি ছোট ছোট ফোঁড়া খুব ভোগাচ্ছে, একটা সারছে তো আরো দু'তিনটে হচ্ছে। অনেক কপালে দুর্ভোগ আছে, দেখছি! বিভাকে আমার কথা বললেন—একা বসে থাকি যখন খুব ভাবি ওর কথা। আমার ভালবাসা জানাচ্ছি বলবেন। আপনি আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি

আপনাদের প্রণতি

পুঃ আপনাকে একটা খবর জানানো হয়নি—পপা মীরারা Candaর যাচ্ছে Sept এ, এক বছরের জন্য, Post doctoral Followship পেয়েছে। কিন্তু Govt. অনেক ঝামেলা করছে bond দিতে হবে—এই সব বলছে—কি হবে শেষ পর্যন্ত জানি না। নাতনীরা থাকবে।

10.9.78

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার চিঠিখানি যখন আসে তখন ওঁর আবার খুব অসুখ করেছিলো—প্রচণ্ড কাশির সঙ্গে হাঁপানীর টান। খুব bronchitis—আমি একটু ঘাবড়েই গেছিলুম, কোনো cough mixture-এ সারছিলো না। Sedative-এ অল্প আরাম। শেষে, কলকাতা থেকে একটা mixture পপারা পাঠালো। আর জ্বর হলে আর বেশীদিন continue করলে একটা ওষুধ লিখে দিলেন ওঁর রিপন কলেজের 'ছাত্র-ডাক্তার'। Anti-biotic Ledermycin। সেটা খাইয়ে এখন খানিকটা ভালো আছেন, কিন্তু খুব দুর্বল, ও complete briain-fag—চিঠি দেখেই বুঝতে পারবেন। শরীরটা একদম ভেঙে গেছে—সেই ৭৫-এর accident-এর পর দেখছি কিছুতেই আর উন্নতি হচ্ছে না। গতবার আমরা যখন কলকাতা গেছিলুম, Feb-March 78-এ, তখন expert ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন—eschemia of the brain–আর দু'বার এরকম bronchial troubles-এর পর আমার মনে হচ্চে না সেটার কিছু arrested হয়েছে। বরং বেড়েই গেছে—যদিও নিয়মিত ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছি। এমনিতে এখন ভালো আছেন। কিন্তু হাতে ব্যথা, hernia কাটাটায় continuous ব্যথা, (75-এ এখানে সজত বোসের বাড়ীর caretaker এর অসভ্যতায় যে accident টা হয়েছিলো। তারই effect এ)–সমস্ত শরীরের set-back টা সেই accident থেকেই। তার আগে বেশ ভালো ছিলেন এখানে। লেখা কিছুই হচ্ছে না, জানি না ডাক্তাররা অন্য কিছু করে সারাতে পারবেন কিনা। খুব চুপচাপ থাকেন। এখানে তো strain কিছু নেই—আমি তাই মেনে নিয়ে আছি। Nov-এ কলকাতা যাবার কথা আছে—কতদিন থাকবেন—ডাক্তাররা dictate করবেন। আশা করি বিভা এখন ভালো আছে, ও রিনি লামু ভালো। ছেলে মেয়েরা ছুটিতে আসে। —অন্য আত্মীয় বন্ধুরাও আসেন। আপনি মাঝে মাঝে চিঠি লিখলে খুশি হন।

ইতি

আপনাদের প্রণতি দে

কলকাতা
১৪।১১।৯৫

প্রিয় হীরেনবাবু,

আপনার ১০।১০।৯৫-এর চিঠি আমি কাল রাত্রে অর্থাৎ ১৩।১১।৯৫ তারিখে পেলাম। বুঝুন কি রকম রাজত্ব। ম্যালেরিয়ায় লোক মরতে আরম্ভ করার পর আজ মহাকরণে রাজ্য, কেন্দ্র, কলকাতা করপোরেশন, পুলিশ, মিলিটারী—সকলের সমবেত আলোচনা ও পরামর্শ চলবে। পরে ঘন্টা কে বাঁধবে তা নিয়ে তর্কাতর্কি এবং জনসভা মহামিছিল হবে। সর্বত্রই এই অবস্থা। আর ছমাস পরে নির্ব্বাচন তাই মনে রেখে সকলেই সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন—দক্ষিণ. বাম। যাই হোক, সি পি আই-এর খবর আমি জানি না। দিল্লি পার্টি কংগ্রেসে আমায় আমন্ত্রণ জানান হয়নি। আপনাকে তবু আমন্ত্রণ জানিয়েছিল?

আপনার 'চিঠির' সংবাদ এখন বাসী হয়ে গেছে। তাই জানতে চাই না। আপনার খবর পত্রিকা ও টিভির মারফৎ পাই। মনে হয় ভালই আছেন। দৈনিক কালান্তরে একদিন আপনার প্রশস্তি দেখে ভাল লাগল। তবুও তো তারা মনে রেখেছে।

আর বেশী বাড়াব না। তবে আমি আরও ঐ চারজনের গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়ছি। তাঁরা বিজ্ঞানী ছিলেন, তারই আলোকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপরেখা এঁকেছিলেন। আজকার নবায়ন, শিল্পায়ন গণতন্ত্রীকরণ আমি ঠিক মানি না। আর ৮৭ বছর হল, নতুন কিছু শিখবার প্রবৃত্তিও নেই।

যাই হোক, চিঠিটা কবে পাবেন বলতে পারি না। এখনই ডাকে দিচ্ছি।

আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নেবেন।

ইতি
রণেন সেন

মনজুরুল আহসান খান
৩২/১ চামেলীবাগ
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

কমরেড হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭.০৫.২০০১

শ্রদ্ধেয় কমরেড,

আপনার স্বহস্তে এবং সুন্দর হরফে লেখা চিঠি পেয়ে আমার কি যে অনুভূতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। আমাকে লেখা আপনার এই চিঠিটা আমার জীবনের একটা বড় পুরস্কার। সেদিন হঠাৎ করেই আপনার বাড়ীতে গিয়ে আপনার সাথে কথা বলে মনটা কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল অনেক দিনের চেনা। মনে হয় এই সম্পর্কটাকেই কমরেড শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। আসলে আপনাকে অনেকদিন ধরে চিনতাম লেখার মাধ্যমে। আরও অবাক লাগে ভাবতে সেই পাকিস্তান আমলে ৬০-এর দশক থেকে আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির সাথে জড়িত। কিন্তু কেউ তেমন করে আপনার লেখার কথা, বইয়ের কথা বলে নি। আমি নিজেই আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। আপনার লেখা পড়ে ইতিহাসের সমাজের আমাদের লড়াই সংগ্রামের ব্যাপারে বহু জমে থাকা প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তার বাস্তবতা, তার বিকাশ ও দ্বান্দ্বিকতা, তার শ্রেণী ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য, মনস্তত্ব আবেগকে, তার সাফল্য ব্যার্থতা স্বপ্নকে এমন নিপুণভাবে কেউ তুলে ধরতে পেরেছে কিনা আমার জানা নেই। তবে খুব অবাক লাগে যখন দেখি ভারতে কি বাংলাদেশে আপনার বইয়ের প্রচার নেই বললেই চলে। অথচ এটা খুব প্রয়োজন। ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানার জন্য। তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। পার্টি করতে গিয়ে, আমাদের রাজনীতি এগিয়ে নিতে আমাদের বারবার ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয়। বুর্জোয়া প্রচারণা ও ইতিহাস বিকৃতির বিপরীতে সঠিক ইতিহাস তুলে না ধরলে আমরা বর্তমানের সাথে অতীতকে যুক্ত করতে পারি না। আজকের সঙ্কট সমস্যা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সেগুলির অতীত উৎসকে বোঝা খুবই জরুরী। বাংলাদেশে বিপ্লব সম্পর্কে আমার ভাবনাগুলির ব্যাপারে আমি আপনার কাছে গভীরভাবে ঋণী। আপনার লেখা, আপনার তথ্য, আপনার বিশ্লেষণ আমাকে সাহস জোগায় অনেক অপ্রচলিত কথা লিখতে। এবং লিখতে গিয়ে দেখছি প্রচুর সাড়া মিলছে। আপনার অনুমতি না নিয়েই আপনার লেখাগুলি আমি অনুবাদ করে ছাপবার কথা ভাবছি। ইতমধ্যে একজনকে Was India's Partition Unavoidable? বইটি দিয়েছি। Partition রদ করার ভাবনা থেকে নয়। কিভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতার ফলে "inverted desperation" হয় সেটা তুলে ধরতে। আমার সহকর্মীদের বইগুলি পড়াচ্ছি। ওরা অনেকে আপনাকে বামফ্রন্ট সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেখেছে TV তে। আপনার সাথে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয়। আমার স্ত্রী আপনাকে তার গানের ক্যাসেট দিয়ে আসতে পারে নি সেজন্য তাঁর অনুতাপের শেষ নেই। বড় ইচ্ছে করে আপনাকে ঢাকায় নিয়ে আসতে। আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সাহস পাই না। আপনার 'বাগান'টা যদি দেখে যেতে পারতেন। "...ইস চমন আবাদ রহে।" ভাল থাকবেন।

আপনার স্নেহের
মনজুর

সমরেশ বসু

Samaresh Basu

12, Circus Range
Calcutta-700019
Tel. 44-5116

7.3.86

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গতকাল শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আপনার চিঠিটি পেলুম। আমারও ইতিমধ্যে মনে হয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা ও কথা হলে ভালো হয়। জানবেন, আপনার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা কোনো কারণেই নষ্ট হবার নয়। চিনুদাকেও আমি অশেষ শ্রদ্ধা করি। আপনাদের দু'জনের সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। মাঝখানে বেশ ভুগে উঠলুম। এখনও কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হচ্ছে। তবে আগের তুলনায়, অনেকটা শিথিল। একটু আধটুর চেয়েও বেশি, শান্তিনিকেতন পর্যন্ত ঘুরে এলুম। এক সপ্তাহের নিবিড় বিশ্রাম।

আপনি যদি পাটনা কংগ্রেস থেকে ফিরে, আমার সঙ্গে একটু টেলিফোনে যোগাযোগ করেন, এবং 'চিনুদা'র আপত্তি না থাকে, তবে আমার এখানেই আমরা বসতে পারি। সুনীলকে (গঙ্গোপাধ্যায়) আমি নিশ্চয় বলবো। আসবে কি না, জেনে নিয়ে আপনাকে জানাবো। মার্চের শেষে হলেই ভালো হয়। কারণ 2nd April আমি সম্ভবতঃ দিল্লী যেতে পারি।

আপনার ও চিনুদার প্রত্যাশায় রইলুম। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

ইতি
সমরেশ বসু

SIR VITHALDASCHAMBERS,
16, APOLLO STREET, FORT,
BOMBAY.

September 16, 1971.

My Dear Hiren,
Please excuse this dictated letter.

I thank you for your kind letter of the 7th instant and extend to you my most sincere apologies for not writing to you earlier.

I am most greatful to you for the affectionnate sentiments you have expressed about our victory and my indirect share in it. I am as happy and proud of what our cricketers have done in England and West Indies as you are, Hiren. Although the major portions of your time are directed to politics I know from my personal experience that you are a sportsman at heart and want that everything in life should be managed in a clean manner and with a sporting outlook. When you were in the All-India Council of Sports I often said to myself that you would make an excellent organiser of sports in the country because you had no personal axe to grind and had a positive outlook. That was, however, not to be and the loss of sports was the gain of politics.

God has been extremely good to me, Hiren, and I have got much more than I ever deserved. I did my work with a clean pair of hands and clear conscience but even then did not know that my efforts would be rewarded to such an extent. Those who wanted me out of the Selection Committee at the time I got Ajit Wadekar appinted captain now want me in it. However, God had given me the gift of knowing when to get away and so I have decided to stick to my original intention of retiring. Besides, my health would not permit my taking over anything which puts strain on me.

You have also been very kind to me in what you have mentioned about the post-victory statement I have made. They all come straight from the heart and are sincere. If you are not an early sleeper, why not hear every Monday night my programme of the 3-R Society—Society for Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Research for

Leprosy and Burns. It comes over Vivid Bharati at 10.30 p.m. The idea is to convey the message of leprosy to every home where cricket is listened and enjoyed. There will be only three minutes of leprosy and 11 minutes of cillcket in that talk. I somehow have a feeling that you might enjoy.

Many good friends like you have suggested to me that I should write a book. I somehow do not feel like it, Hiren, and my work is not confined to cricket only but other fields of life also. Hence it would not give a complete picture of me. I would, therefore, leave it to those who know about my cricket and about my work to remember me in their hearts after I am gone. I would love to meet you again and have a long chat about cricket. Is htere any likelihood of your coming to Bombay? You have my promise that when I next come to Delhi I will not return to Bombay without meeting you.

Is there anything I can do for you in Bombay? Please do not hesitate to utilize my services. They will always be at your disposal.

With warm personal regards,

Yours as ever,
Vijoy

Mr. Hiren Mukerjee, M.P.,
21, Rakabganj Road,
New Delhi-1.

SATYAJIT RAY

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিটা বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি—clippings সমেত। বিদেশ থেকে এসে এমন চিঠির স্তূপের সামনে পড়তে হয়েছিল যে হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। সেক্রেটারি রাখিনি কোনদিন। তাই সব চিঠির জবাব নিজেকেই দিতে হয়—এমন কি টাইপ করা চিঠি পর্যন্ত। দশ বছর বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করে কেটা আপিস-ভীতি হয়ে গিয়েছিল; সেক্রেটারি রাখলে বাড়িতে একটা আপিস-আপিস ভাব এসে পড়বে তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে এসেছি। ফলে চিঠি কিছুদিন না উত্তর দেওয়া অবস্থায় পড়ে থাকে। যাদের দোষ সয়না তাদেরই। আগে জবাব দিতে হয়। আর যারা সহৃদয়, যারা বললে বুঝবেন, তাদের জবাবে মাঝে মাঝে দোষ হয়ে যায়।

আপনার লেখাটা আগেই পড়েছিলাম। কারণ brocher একটি কপি আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আপনি যেভাবে আমাকে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, এবং এখনো দিয়ে থাকেন। তার জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে—একথা হয়ত আমি আগেই বলেছি—আমার লেখা আপনার ভালো লাগে জেনে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। কারণ আমি নিজে লিখে আনন্দ পাই। শেষ জীবনটা লিখেই কাটাতে হবে এটাও বেশ বুঝতে পারছি। ফিল্মের কাজে এখন অনাবিল আনন্দ নেই। বিশেষ করে একটা ছোট করে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার সামনে পড়তে হয়—যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সদ্‌গতি—সেটা ঝেড়ে ফেলার অভ্যাস সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়নি এখনো। সদ্‌গতি আমার নিকৃষ্ট ছবি এমন মন্তব্যও পড়তে হয়েছে দিল্লী-বোম্বাইয়ের কাগজে। আমার ধারণা ছবিটা দেখলে আপনার ভালোই লাগত। তবে সেটি না দেখাই ভালো। আপনি কলকাতায় এলে house এ দেখানোর ব্যবস্থা করা কঠিন নয়। সেই সঙ্গে ??? 'পিকু' ছবিটাও দেখাতে পাই আপনাকে।

আমার ছেলে এখন ফটিকচাঁদ কাজ করছে। তার কাজ শেষ হলে পরে নভেম্বরে ঘরে-বাইরের কাজ শুরু করব।

আপনার তরী হতে তীর অতি উপভোগ্য বই হয়েছে। গাল-ভরা নামের ইংরিজি বইটি। হাতে আসেনি এখনো। এলে অবশ্যই পড়ব। আমার ছেলেবেলার স্মৃতি 'যখন ছোট ছিলাম' কি চোখে পড়েছে? ছোটদের জন্য লেখা সহজ। সরল বই। চোখে না পড়লি জানাবেন। আপনাকে এক কপি পাঠিয়ে দেব।

লোডশেডিং পোল্যুশন, পাতাল রেল, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে আছি এখনো। মুশকিল এই যে এখানে ছাড় কোথাও কাজ করার কথা ভাবতে পারি না। তবে ছবিকরার কাজের অবস্থা আদৌ ভালো না। দিনদিন নতুন সমস্যা, নতুন অন্তরায় দেখা দিচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত লেখার উপরেই ভরসা।

আপনি আপনার disfustingly ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকুন আরো অনেকদিন এটাই

আমরা চাই।

অমিয়বাবুর সঙ্গে মাসে-দুমাসে একবার দেখা হয়। আমার খবর যে পাই না তা নয়। তবে দেখা হয়নি বহুকাল।

আমরা মোটামুটি ভালোই।

আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

সত্যজিৎ
১৭।৬।৮২

১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কঃ ২৬
১২।১০।৭১

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিটি পেয়ে খুশি লাগল, যেমন বরাবর লাগে, মৈত্রীর উত্তাপে; এবারে অহম্-বোধও তৃপ্ত হল—বই বিষয়ে লিখছেন বলে। নামকরণ ঃ পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয় ঃ বেশ ভালোই মনে হয় তো, একটু ভারি কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? স্রোত চলে সূর্য জ্বলে ঃ 'Presumptions হবে' কেন: তবে হয়তো কম ভারি। প্রথমটিই আমার মনে হচ্ছে শোভন হবে।

কিন্তু লিখতে শঙ্কা ও সংকোচ দমন করা দরকার। কারণ আপনার ঐ অতীত ও বর্তমান ভ্রমণটা অনেকের ভালো লাগবে এবং লাভও হবে কমবেশি। কনক্রিট ও কনসেপটুয়াল দুইই হবে—যদি স্রোত ছেড়ে দেন। প্রথমটাতে সংকোচ বাধা দয়ে। (বক্তৃতা দিচ্ছি তো? এদিকে নিজে স্মৃতিচারণ মুখে করলেও লিখতে পারি না নিজে। কিন্তু অসামাজিক কবিতা লেখকের ক্ষেত্রে যুক্তি থাকুক বা না থাকুক; যিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভারতবর্ষে প্রকাশ্য সভায় ময়দানে কত লোককে মাতিয়ে রাখছেন, তাঁর পক্ষে এই ইনছিবিশ্ন্ দমন করা উচিত আর সম্ভবত বোধ হয়—কারণ ঐ সভাবক্তৃতায় তাঁর ইনহিবিশন তো দায়িত্বের চাপে ডেকেছে। এই লেখটাও তো দায়িত্ব। একবার আরম্ভ করে দিন, তারপরে বাঁধ খুলে স্রোত চবলে সূর্যও জ্বলে থাকবে। ??? কিনা? নিশ্চয়ই, এ বিশ্বাস আমার নিশ্চিত এবং ধারণা তা আরো অনেকেরই। কবে পড়ব?

বিভাব শরীর বিষরা খবরে মন খারাপ প্রণতির ও আমার। ডাক্তাররা কি বলেন? বিভা নিজে কি ভাবেন? আমার চিঠি লিখতে বসতে ও লিখতে অনেক দেরি হল। শারীরিক কারণে। গরমে ঠাণ্ডা লেগে বয়িষ্ণু দেহমনে (প্রতিবেশী বাংলার ব্যাপারে কয়েকমাস ধরে অধিকতর কাবু মনে ও সুতরাং দেহে—her body thought কথাটা পুরুষ হলেও আমি সারাজীবন হাড় হাড়ে বুঝি। তার ওপরে তো আমাদের স্বদেশ বাংলাও আছে—less spectacular, more serdid রূপে।) অসুখ করল। বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে—কার্ডিওগ্রাফটা শুধু বাকি। ভালোই আছি সে হিসেবে। বাড়িতে ও বাইরে স্থানাভাব, চুপচাপ থাকার অভাব তো থাকবেই, সেটা মানবার ও মানিয়া নেবার চেষ্টা তো ক'রেই যাই। আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লেখা হ'য়ে গেছে। এই খবরটা পত্রান্তরে জানার ইচ্ছা প্রবল।

আপনার বিষ্ণু

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
১৬.১১.৯৪

পরমশ্রদ্ধেয়,

উত্থক প্রকাশণীর 'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর' পুস্তিকাখানি সমীর রায়চৌধুরী প্রকাশকের তরফ থেকে আমাকে এক কপি দিয়ে গেছেন। উৎসর্গপত্রে তিনি অনুজের মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন দেখে আমি বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত। গণশক্তি, পরিচয়, দেশ, এমন কি Statesman-এও আপনার সাম্প্রতিক রচনাগুলি দেখে আপন ভাবনায় বেশ কিছুটা শক্তি পাই। তবে আমরা ত অতীত; ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলি নবীন প্রজন্মই তাদের মত করে সফল করবে। মার্ক্সীয় দর্শন যে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলি এ উঠে যায়নি; বরং অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান যা জীব বিজ্ঞানকে নানা কৌশলে ধনতন্ত্র মনুষ্যেতর জীবসৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা একটা মারাত্মক আকার ধারণ করার আগেই, আশা করি, আমরা সুস্থ জীবন বোধ ফিরে পাব। এবং সেটা হবে বিশ্বব্যাপী এবং যুগপৎ। আর তা যদি হয়, মনুষ্যপ্রজাতি বাধ্য হবে তার ষড়রিপুকে পরিহার করতে। আমাদের দেশে যে পার্টিকে গড়তে আপনাদের মত বর্ষীয়ান্‌রা একদিন সর্বলোভ ত্যাগ করেছিলেন; আজ সেই পার্টির আকর্ষণে মধুপায়ীদের সমারোহ। গ্রামে গঞ্জে শহরে একই দৃশ্য। কেউ কেউ বিচলিত; তাঁরা কিন্তু চালনা শক্তিহীন। আমি বহুদিন থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্রের ভাবনাগুলি ত ছাড়তে পারিনি। আমাদের যৌবনে সমাজতন্ত্রের যে মহান্ অভ্যুদয় দেখেছি, শোষিতের ক্রন্দনে ক্রোধে এবং সংগ্রমে তা আবার ফিরে আসবেই এই বিশ্বাস দুর্বল হলে বিড়ম্বিত এবং বিপর্যস্ত বোধ করি। যখন আপনারা অভিজ্ঞাতা এবং প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন এবং প্রয়োজনীয়তার আশ্বাস দেন, তখন আনন্দিত হই। বিশ্বাস এবং স্বপ্ন মনে চেপে বসে; মার্ক্স্‌-এঙ্গেল্‌স্ যে স্বপ্ন মনে চেপে বসে; মার্ক্স্‌-এঙ্গেল্‌স্ যে স্বপ্ন সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর আগে দেখেছিলেন। আমি শিল্পকর্ম করি। আমার concept-একটাই—'ক্ষত'। আমার বক্তব্য—সমাজজীবনে এত বিলাস ব্যসনের মধ্যে একটা লোকও নিরাশ্রয় থাকবে কেন, অভুক্ত থাকবে কেন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে যখন পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব, কলকাতায় তখন দিনরাত্রির ক্রিকেটের মেলা; বিস্মিত হই এবং হইও না যখন দেখি, গ্রামের এই অভাবী লোকগুলিও সমান উৎসাহে হাততালি দেয় এবং বাজি পোড়ায়। ধর্মের পরিবর্তে দূরদর্শন আজ জনতার আফিমে পরিণত হচ্ছে।

আপনার স্নেহের প্রকাশে অভিভূত হয়ে অনেক বাচালতা করলাম; আপনি ক্ষমা করবেন। আপনার সংগ্রামী এবং দীর্ঘজীবন কামনা করে চিঠি শেষ করছি।

প্রীত্যর্থী
সোমনাত হোর

সপ্তপর্ণী 16 F
58/1 বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা-৭০০০১৯
31.11.2000

স্নেহের সুভাষ,

বারবার ভেবেছি তোমাকে লিখ্‌ব। কিন্তু বাধা পড়েছে আর ভেবেছি কেমন করে গুছিয়ে অনেক দিনের জমে থাকা অনেক কথা গুছিয়ে লিখে উঠতে পারব কি? প্রশ্নের জবাব অবশ্য এই যে তেমন লেখা আমার পক্ষে সাধ্য নয়। তাছাড়া গত বারো-তেরো বছর ধরে রাজ্যের বিরক্তি আর বিচলিতি মনের মধ্যে বাসা বেঁধে এমন বিপত্তি ঘটিয়েছে যে যা লিখতে চাই তা আমার অসাধ্য। খটোমটো হয়ে গেল কথাটা, 'পোষাকী' বলে সন্দেহ কেউ করলে আশ্চর্য হব না। কিন্তু লিখে ফেলেছি। সাম্‌নেই প্রণব বসে আছে। এভাবে লিখ্‌তেও আমি অভ্যস্ত—কিন্তু বাস্তবিকই তোমাকে যে সব কথা বলে যেতে চাই তা বলে ওঠা সম্ভব নয়। ভরসা এই যে তুমি কবি। তৃতীয় নেত্র একটা তোমার আছে, তুমি অনুমান করে নিতে পারবে।

খেই হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তুমি কয়েকটা বই পাঠিয়েছো—সেজন্য ধন্যবাদটাই দিই নি এতক্ষণ। সে চেষ্টা করব না, তোমার লেখার যে গুণ গোটা দেশকে কত আনন্দ দিয়েছে, তা নিয়ে বাক্‌বিস্তার এই অতিবৃদ্ধ না হয় না-ই করল। তবে পড়েছি আর মাঝে মাঝে প্রত্যাশা পরিতুষ্ট না হলেও খুশি হয়েছি। একই সঙ্গে বিব্রত ও আনন্দিত হয়েছি যে তুমি কোথায় যেন লিখেছ যে আমার কাছ থেকে কিছু 'অনুপ্রেরণা' তোমার মনের ভাণ্ডারে মজুদ হয়েছে। না, সুভাষ, আমার বেশ মনে আছে তুমি যখন MA পড়ছ, তখন Marxist Philosophy পড়াতে গিয়ে কী প্রচণ্ড ফাঁকিই দিয়েছিলাম। যা তোমার মতো বুদ্ধিমানের কাছে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। তাছাড়া আমার এই দীর্ঘ পরমায়ু জুড়ে যে ক্রমান্বিত ব্যর্থতার ফিরিস্তি আমাকে অবসন্ন করে রেখেছে, তা থেকে কারও কোনো 'অনুপ্রেরণা' নিশ্চয়ই মেলে না। থাক্‌ এ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা জুড়ে দেবার আশঙ্কাকে ঠেলে ফেলি।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তোমার সাহিত্য আকাদেমি ভাষণ কিন্তু আমাকে একটু হতাশ করেছে। কেমন যেন মনে হয়েছে গতানুগতিক। তোমার মতো ছেলে, বাঙালি ছেলে, যে দেশবিদেশের মানুষের কাছ থেকে আদর পেয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, তার চোখে রবীন্দ্রনাথের মহিমা (কণ্টকিত কালিমা সত্ত্বেও) অবাঙালি পাঠকদের কাছে তুমি পৌঁছাতে পারতে তা যেন করোনি। কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল—তবুও প্রত্যাশা আমার অতুষ্ট।

আমার 'বদ অভ্যাস' বেরিয়ে আসছে—ধানাই-পানাই লিখে চলেছি। বাঁচোয়া এই যে বাস্তবিকই 'জাত-লিখিয়ে' তো আমি নই—'মুফৎ'-সে একটা 'খ্যাতি' একটু আধটু রটেছে—ব্যস।

তোমার কাছ থেকে আমার মূল প্রত্যাশা আজও—হয়তো ভবিষ্যতে (আমি থাকি বা না থাকি) সে প্রত্যাশা তুমি মেটাবে। 'কম্যুনিজ্‌ম্' বস্তুটি আমাদের টেনেছিল। একেবারে সর্বতোভাবে মনুষ্যজীবন বদ্‌লাবার একটা জগৎজোড়া আয়োজনে মিলেছি সবাই। কম্যুনিজ্‌মে বিশ্বাস দাবি করে "un oui trop massif et charnel" ("এমন একটি 'Yes' [হাঁ] যা সুগভীর আর প্রদেয় থেকে উৎসারিত')—এক বিরাট ফরাসী বিদ্বানের এই কথা। এই পথে আসার স্বপ্ন ও বাস্তব প্রয়াস—এটা বোধহয় আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে সুকঠোর "যুক্ত', যার যোগ্যতা সহজসাধ্য নয়। দোষে গুণে "real exiting socialism" একটু তার আস্বাদ দিয়েছে, যাকে অস্বীকার করতে আমি অপারগ। তোমার কাছ থেকে আমার মনের ও মর্মের জিজ্ঞাসা ('জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা)—তা কেমন করে পূরণ হবে?

আর কেন কথা বাড়াই। বিষ্ণুবাবুকে মনে পড়ছে। তুমি বুঝবে ভালো থেকো। ভালোবাসা জেনো। তোমার

শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সপ্তপর্ণী 16 F
কলকাতা-৭০০০১৯
1.4.2002

স্নেহাস্পদেষু,

সুভাষ, শারীরিক ও মানসিকভাবে ২০০২ 'কথঞ্চিৎ' ক্লিষ্ট হয়েও তোমাকে লিখছি আবার তোমার যে অত্যন্ত মূল্যবান বইটা আমাকে 'উৎসর্গ' (!) করেছো সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন পড়তে লিখতে একটু 'কষ্ট' হতে আরম্ভ করেছে। দেখি কোথায় দাঁড়ায়। তোমারও কম বয়সে কানটা গেছে—'আমারও প্রায় তার কাছাকাছি। তবে 'এককান কাটা'র মতো সসংকোচে আর মানসিকভাবে অপ্রতিভ হয়ে 'বিরাজ' করছি। একবার এক মহাপুরুষকে "বলেছিলাম যখন কানে কম শুনতে শুরু করি। 'I am getting deaf and when I am dumb, it will be beat tude"। পার্লামেন্টে বিবাহ বিষয়ক আইন পাশ করা ব্যপদেশে আওড়াই বইয়ে পড়া কথা; "The ideal marriage is between a dumb wife and a deaf husband"—এখানে কোনো ব্যক্তিগত ইশারা নেই। বিশ্বাস কোরো। এখনও আমার রুচিবোধ সম্ভবত হারাই নি।

আসল বক্তব্য ভুলে যাচ্ছিলাম। তোমার বইটা বাংলা আকাদেমি বার করলে তাদের গর্ববোধের অবকাশ মিল্‌ত। কেমন করে কত দিনের কত গভীর পরিশ্রম ও চিন্তার ফল তোমার এ বই—ভেবে অবাক হই। তোমার কলমে ফুলচন্দন পড়ুক—এটা বলছি সারা দেশ জানে তোমার লেখার জাদু।

শেষ করি এই বুড়ো বয়সের বাকবাহুল্যের প্রদর্শনী। ভালো থেকো সবাই—এবং তোমার লেখা বেরোতে থাকুক।

একটাই দুঃখ যা না স্বীকার করলে নিজেকে অসৎ বলে আবার ধিক্কার দিতে হবে। কত ভালো হত, যদি তোমাকে "The god that Failed"—বিঘোষকদের সান্নিধ্যে তোমাকে না দেখতাম। ভুল বুঝবে না জানি বলেই সাহস পেলাম।

নিত্যশুভৈষী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কবিকুলরত্নেষু

ব্যক্তিগত

স্নেহের সুচিত্রা,

তুমি একটু অবাক হবে। হঠাৎ আমার চিঠি পেয়ে। লিখছি Sudden impulse-এ।

মাঝে কাগজে কোথায় দেখলাম তোমার বয়স পঁচাত্তর হয়েছে। আমি তো প্রথমটা অবাক হলাম, তুমি বয়সে এত বড়ো হয়ে গিয়েছ! তা অবশ্য হবে—সবাইয়েরি বয়স বাড়ে, আমার তো বয়সের 'গাছপাথর' নেই। কদিন বাদে বিরানব্বই পার হব! একেবারে যে বহাল তবিয়তে আছি তা নয়। তবু দিনযাপনের গ্লানি কাটাতে একটু-আধটু কাজও করে যেতে পারছি

সে কথা যাক্। তুমি শতায়ুষ্মতী হয়ে গৌড়জনকে আনন্দ দিতে থাকো। এতদিন যা দিয়েছো তা তো অমূল্য। মনে পড়ছে South-East Asian Youth সম্মেলন ১৯৪৬ (?) -এ বালিগঞ্জে তোমার গান : "সার্থক জনম আমার"—তোমার এ গান গোটা দেশ শুধু নয়, দুনিয়ার সম্পদ! বেঁচে থাকো আর গান গেয়ে চলো। ভালো থেকো।

শুভার্থী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুঃ—প্রণব বিশ্বাস নানা কারণে এখন আমার খুব কাছের মানুষ। তার হাত দিয়ে পাঠালাম

শ্রীঅরুণ মিত্র
কবিবরেষু
প্রিয়বরেষু

প্রণব-এর কাছে শুনলাম এই মাসে কোনোদিন আপনি 'নব্বই পেরিয়ে' ক্লাব-এ প্রবেশাধিকার অর্জন করছেন। একজন পূর্বসুরী (!) হিসাবে অভ্যর্থনা জানাই।

এ ক্লাব-এর সভ্যদের মেয়াদ খুবই অনিশ্চিত, তবু যতদিন চলে ততদিন আটক থাকতেই হয়। বহুবিধ যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়। তবু মনুষ্য জীবন তো মহার্ঘ। বেঁচে থাকাটাই একটা 'কীর্তি'।

কি যে লিখছি জানি না, ?? ?? চিন্তে টানা নিয়ে চলেছে—প্রণব 'সাক্ষী' রয়েছে তার সামনেই লিখছি।

গত বছর শিশির মঞ্চ-এর সভায় যা বলেছিলাম তা আপনার মনে না থাকলেও আমার মনে আছে। আমরা উভয়েই চাইব এবং চাই যে জীবনান্ত (যা ত্বরান্বিত হলেই ভালো) পর্যন্ত যেন সাময়িকভাবে একেবারে 'পঙ্গু' না হয়ে পড়ি, কিছু পরিমাণে 'সক্ষম' থাকি।

আপনি কবি, অর্থাৎ 'দ্রষ্টা। ত্রিনেত্রের অধিকারী। আপনার কাছে দেশের ও দশের প্রত্যাশা অনেক। শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন। দেশবাসীর জীবনে কল্যাণ সাধনব্রতে লেগে থাকুন।

আপনার
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

7-5-83

Dear Hirenbabu,

Thank you so much for your delightful letter. I liked the quotation on Athens.

This is my first real visit to Greece. I have once spent the night in Athens in the old days when planes did not fly at night. So I could pay a brief but memorable visit to the Acropolis.

Indira Gandhi

গ্রন্থপঞ্জি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : গ্রন্থপঞ্জি

গৌতম নিয়োগী সংকলিত

[এই গ্রন্থপঞ্জি বা বিব্লিওগ্র্যাফিটি পূর্ণাঙ্গ এমন কোনও দাবি বর্তমান সংকলকের নেই; অন্তত প্রবন্ধের তালিকা যে ভীষণভাবে অসম্পূর্ণ তা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জীবনে যত গ্রন্থ-প্রবন্ধ-সমালোচনা ইত্যাদি বাংলা ও ইংরেজিতে লিখেছেন তার পূর্ণাঙ্গপঞ্জি একজনের পক্ষে করা কঠিন; বস্তুত এ কাজ একটা 'টিম্' দীর্ঘকাল ধরে করলে সার্থক হতে পারে। গ্রন্থপঞ্জি বা সম্পাদনা কী করে করতে হয়, তার পদ্ধতি ও প্রকরণ কেমন, এ বিষয়ে কিংবদন্তী-প্রতিম প্রয়াত রবীন্দ্রচর্চা বিশারদ পুলিনবিহারী সেনের পদপ্রান্তে বসে কাজ শেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম বলেই নিজের ঘাটতি নিজেই বুঝতে পারি। তবু এই সংকলনের ব্যক্তিগত অক্ষমতার ত্রুটি কিছুটা মেটানো গেছে বহু ব্যক্তির সহৃদয় আনুকূল্য এবং সানুগ্রহ সহযোগিতায়। এদের মধ্যে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের নাম সবার আগে করতে হয় কারণ যখনই যে প্রশ্ন মনে এসেছে তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। 'কোরক' পত্রিকার 'হীরেন মুখার্জী সংখ্যা'য় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ পাঁচ সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শঙ্কা সংকট প্রত্যয়' শীর্ষক সম্মাননা-গ্রন্থে গ্রন্থতালিকা দেওয়া আছে, যদিও কোনওটি সম্পূর্ণ নয় এবং বহু ভ্রান্তি আছে। এই রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করতে নানা গ্রন্থাগারের সাহায্যও নিতে হয়েছে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু বইয়ের প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ পাইনি। তবু সযত্ন প্রয়াস নিয়েছি প্রথম সংস্করণ দেখা, ক্ষেত্রবিশেষে নানা সংস্করণের মধ্যে পাঠভেদ জানার। গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রকাশের কালানুক্রম রক্ষা করা হয়েছে। এ কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁরই পুত্রবধূ মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়। স্বতন্ত্রভাবে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানানো স্থানাভাবে সম্ভব না হলেও প্রণব বিশ্বাস এবং কমল সমাজদ্দার, এই দুই বন্ধুর কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হবে। —গৌ. নি]

(ক) বাংলা বই

১. *ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ*
   প্রথম প্রকাশ/১৯৪৩/কলকাতা
   প্রথম সংস্করণ/সমবায় পাবলিশার্স/৩৩/২ শশিভূষণ দে স্ট্রিট/কলকাতা থেকে মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত/পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস/৪৭ মধু রায় লেন/কলকাতা থেকে গোপালচন্দ্র বসাক কর্তৃক মুদ্রিত।
   আজ ও আগামীকাল সিরিজ/পৃ. ৮+১৫৭/মূল্য দুই টাকা
   উৎসর্গ : 'মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের করকমলে।

ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"এই বই-এর প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটি কোন-না-কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, তা সহজেই পাঠকের চোখে পড়বে আশাকরি। মার্কসবাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত না হলে সমাজের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা যে দূর হতে পারে না, তা ক্রমেই অনেকে বুঝছেন। মার্কসবাদ আয়ত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছি বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। এই বই-এ যে তাই অনেক ক্রটী রয়ে গেছে, তা আমি বিশেষ করেই জানি।"

মূল সংস্করণে বারোটি মৌলিক প্রবন্ধ সংকলিত। বারোটি রচনার সূচি :

ভারতের জাতীয়তার স্বপ্ন ; ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস ; ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য ; ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য : দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ৎ ; ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ; অষ্ট্রো-মার্কসিজমের বিড়ম্বনা ; মানুষ খুনের ব্যবসা ; রুশ বিপ্লব ও লেনিন ; সোভিয়েট ইতিহাসের একটি অধ্যায় ; সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান ; সোভিয়েত রাষ্ট্র। মূল লেখাগুলি 'পরিচয়', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সোভিয়েট দেশ', 'মন্দিরা' প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৫-এ বের হয়। তাতে মূল বারোটি প্রবন্ধের সঙ্গে 'ইতিহাস' নামে সোভিয়েত ঐতিহাসিক এস এন চাক্রভস্কির রচনার অনুবাদ যুক্ত হয়। 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ' গ্রন্থের আটটি রচনা (সব নয়) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (সম্পাদক : প্রণব বিশ্বাস) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৪০৫ সাল) সংকলিত হয়েছে।

২. *ভারতের জাতীয় আন্দোলন*

প্রথম প্রকাশ/১৯৪৩/কলকাতা

ন্যাশানাল বুক এজেন্সি/১২ কলেজ স্কোয়ার/কলকাতা-১২

এই পুস্তিকাটি লেখকের সুপরিচিত ইংরেজি গ্রন্থ *India's Struggle For Freedom*-এর বাংলা নয়। ইংরেজি বইটি *India Struggles For Freedom* শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ এক চিঠিতে প্রণব বিশ্বাসকে জানিয়েছেন (দ্র. নির্বাচিত প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৩০৯) :

'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' ১৯৪৩ সালে পার্টির পক্ষ থেকে, প্রখর রাজনৈতিক বাতাবরণের তাগিদে লেখা প্রায় তাৎক্ষণিক রচনা। নিজের লেখা পুরো পড়ার ধৈর্য নেই, তবু চোখ বুলিয়ে দেখলাম স্মরণীয় তেমন কিছু নেই।

৩. *হিন্দু ও মুসলিম*

প্রথম প্রকাশ/এপ্রিল ১৯৫৫/কলকাতা

ন্যাশানাল বুক এজেন্সি/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে সুরেন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। গণশক্তি প্রেস/৮ই ডেকার্স লেন/কলকাতা-১ থেকে কালীপদ চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

পৃ. ৬+৫১

'প্রকাশকের কথা' অংশে আছে :

> 'হিন্দু ও মুসলিম' মাসিক 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করছি। 'পরিচয়'-এ প্রথম লেখাটা বার হওয়ার পরে (শ্রাবণ, ১৩৫৩) অনেক জায়গা হতেই অনুরোধ আসে যে লেখাটাকে পুস্তিকার আকারে বার করা হোক। নানা কারণে তা হ'য়ে ওঠেনি। তারপরে, ফাল্গুনের (১৩৫০) 'পরিচয়'-এ আগেকার লেখার পরিপূরক হিসাবে আরো একটি লেখা বার হয়েছে। এই দুটি লেখাই একত্রে এই পুস্তিকার ছাপা হলো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ইতিহাসের কৃতী ছাত্র, যশস্বী অধ্যাপক এবং সক্রিয় সমাজকর্মী হীরেন্দ্রনাথ বরাবরই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। 'হিন্দু ও মুসলিম' পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধটি 'পরিচয়' শ্রাবণ ১৩৫৩ অর্থাৎ ১৯৪৬-এর আগস্টে কিন্তু 'The Great Calcutta Killing' (দ্য স্টেটস্‌ম্যানের ভাষা) আগে লেখা। আর দ্বিতীয় রচনাটি 'পরিচয়' ফাল্গুন ১৩৪৩ অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে লেখা। লেখকের অসাম্প্রদায়িক ঐক্যপ্রয়াসী লেখা আমরা পরেও পাই। উল্লেখ্য বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় জুন, ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিন্দু মুসলমান কী জয়'।

৪. *মার্কসবাদের অ আ ক খ*

প্রথম প্রকাশ/এপ্রিল ১৯৫৫/কলকাতা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে সুরেন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত গণশক্তি প্রিন্টার্স/৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট/কলকাতা-১৬ থেকে সুনীল কুন্দগামী কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দেড় টাকা।

পৃ. ৬+১৩৮

গ্রন্থে মোট সাতটি রচনা, সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। সেগুলির শিরোনাম যথাক্রমে :

'সব লাল হো জায়েগা' ; স্বপ্ন থেকে বাস্তব ; নাই অন্যপথ ; ইতিহাসের গতি ; শোষণ ও শাসন ; মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি ; দিন আগত ঐ।

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জিকা দেওয়া আছে। 'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছিলেন :

> "যথা সম্ভব সহজ ভাষায় এবং অল্প কথায় মার্কসবাদের মূলনীতি ব্যাখ্যার একটা চেষ্টা করছি। আশা আছে যে এটা পড়ে পাঠকদের মনে মার্কসবাদের গভীর অনুশীলন সম্বন্ধে আগ্রহ জাগবে। আরও আশা আছে যে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় কিংবা নিছক জ্ঞানের অভাবে মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভুল ধারণা বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলো দূর করতে এই রচনা কিছুটা সাহায্য করবে।"

৫. *গ্রীসের পুরাকাহিনী*

প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ হয়নি। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি।

২য় সংস্করণ/কলকাতা/১৯৮২

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/আর্য ম্যানসন/নবম তল/৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার/

কলকাতা-১৩ থেকে মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক দিব্যেন্দু হোতা কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রেস এজেন্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড/২ বিধান সরণি/কলকাতা-৬ থেকে এস. কে. শীল কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : প্রশান্ত হাজরা

মূল্য : ১৪ টাকা

পৃ. XVI+২১৬+গ্রন্থপঞ্জী

২য় মুদ্রণ/জুলাই ১৯৮৯

মোট আঠারোটি অধ্যায়ে প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাস লিখেছেন লেখক। 'মুখবন্ধ' লিখতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন : "গ্রীসের পুরাকাহিনী সম্বন্ধে ঐ স্বল্পায়তন গ্রন্থ পাঠক সাধারণের কাছে আদৃত হলে রচনা প্রচেষ্টা সার্থক হবে। শোনা যায় যে নিতান্ত পরীক্ষার প্ররোচনায় ছাত্রেরা বিনা আর কেউ গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ রাখেন না। এ ধারণা যথার্থ না হওয়ারই সম্ভাবনা ; সভ্যতার ভাণ্ডারে প্রাচীন গ্রীকদের ভাস্বর অবদান বিষয়ে আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই অবহিত মনে করা বোধহয় ভুল হবে না। বর্তমান গ্রন্থে ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও রচনা যাতে জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই সহায়তা করতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে।"

৬. *চক্ষুষা কাণঃ*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ (১৯৫৬)

বাক্/১০ চৌরঙ্গী/কলকাতা-৬ থেকে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : তিন টাকা।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : যামিনী রায়।

ভূমিকা চার পৃষ্ঠা। পৃ ১৪+১৬০

উৎসর্গ : "স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতা যাঁকে অভিমানভরে ত্রিশবৎসরাধিক কাল প্রবাসী করে রেখেছে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কিছুকাল বাংলার অধ্যাপক ছিলেন, সাহিত্য বিষয়ে যাঁর গবেষণা বিদেশে বিদ্বজ্জনের প্রকৃত সমাদর পেয়েছে, সেই ঋজুচিত্ত স্নেহশীল, জ্ঞানব্রতী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের করকমলে।" চক্ষুষা কাণঃ বইতে পনেরোটি মৌলিক প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল দুটি অনুবাদ প্রবন্ধ—কার্ল-মার্ক্স-এর রচনার তর্জমা 'ধনিকের আবির্ভাব' ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর প্রবন্ধের তর্জমা 'শিল্পে বস্তুনিষ্ঠা'।

মৌলিক রচনার সূচি :

চক্ষুষা কাণঃ; স্বপ্ন থেকে বাস্তব; আধুনিক বাংলা কবিতা ; বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে ; আমাদের ইতিহাস; প্যারিস ১৯৪৪; প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ ; কয়েকটি সোভিয়েট বই ; 'ভারত আবিষ্কার' ; আন্তর্জাতিক ও বিশ্ববিরাজ ; 'বাঙালীর ইতিহাস' ; ফুটবল প্রসঙ্গে ; কেরলে কয়েকদিন; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; 'সাহিত্যপত্র' ও স্বদেশজিজ্ঞাসা।

গ্রন্থটির অনুবাদ রচনা দুটি বাদে বাকি অংশ নির্বাচত প্রবন্ধের, ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ৭৯-২১২)। প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে পূর্বোক্ত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' রচনাটি আবু

সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র দ্বিতীয় ভূমিকা। আধুনিক বাংলা কবিতা বইটি প্রকাশ করেছিলেন 'কবিতা ভবন', ২০২ রাসবিহারী এভেনিউ, কলকাতা-২৯ থেকে বুদ্ধদেব বসু ১৩৪৬-এর শ্রাবণে। প্রচ্ছদ যামিনী রায়-কৃত। উৎসর্গ : 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরণীয়েষু।' 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল নাভানা প্রকাশন সংস্থা থেকে 'বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা' বেরুবার (১৯৫৫) পর। লেখক বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে পরে আরও দু'বার অন্তত লিখেছেন।

অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, হীরেন্দ্রনাথের 'মার্কসবাদের অ আ ক খ' বইটির 'স্বপ্ন থেকে বাস্তব' রচনাটি 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭. *ভারতবর্ষের ইতিহাস*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১ম খণ্ড/১৯৫৮/২য় খণ্ড/১৯৫৮

অখণ্ড সংস্করণ/১৯৮৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ/৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার/কলকাতা-১২ থেকে মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শিবনাথ চট্টোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত/

নবজীবন প্রেস/১৬৬ গ্রে স্ট্রিট/কলকাতা-৬ কালীচরণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত

২য় সংস্করণ/কলকাতা/১৯৮৬/পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০

মূল্য ৩০ টাকা

পৃ. ৩৪+৬০২

'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছেন :

"প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা হলেও এই ইতিহাস সাধারণ পাঠকেরও মনোরঞ্জন করতে পারবে আশা করছি।

মোটামুটি ১৫২৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস এখানে বিবৃত হয়েছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী ধারা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা অবশ্য করা গিয়েছে, কিন্তু দেশের একান্ত আধুনিক বিবরণকে এখনও সাংবাদিকতার পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে ইতিহাসের আকারে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

লেখকের 'আজীবন বন্ধু' অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাদর প্ররোচনায় বইটি লিখিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ সংস্করণ প্রকাশের সময় (১৯৮৬) হীরেন্দ্রনাথ বইটির এক নতুন 'মুখবন্ধ' লিখে দেন, যা তাঁর ইতিহাস দর্শন বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান।

৮. *অল্পে সুখ নেই*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১ জানুয়ারি/১৯৬৪

মিত্রালয়/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে সত্যশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

রূপনন্দা প্রেস/১৩৮/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড/কলকাতা থেকে প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক মুদ্রিত।

পৃ. ৬+১৩১

মূল্য : চার টাকা

উৎসর্গ : আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর করকমলে।

৬ পৃষ্ঠার মুখবন্ধটি লেখক লিখে ফেলেন ১৯৬৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির সংসদ ভবনে বসে। 'মুখবন্ধ'-এর এক জায়গায় লেখক মন্তব্য করছেন :

> "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'—আমাদের এই ঋষিবাক্য যদি কাল মার্কসের জানা থাকত তা হলে হয়তো একেই তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নীতিসূত্র মনে করতেন। মার্কসবাদকে নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় কথার কচকচি আর কাজের ক্ষেত্রে গণ্ডগোল এমন হয়েছিল যে উত্যক্ত হয়ে তিনি একবার বলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি নিজে মার্কসবাদী নই।" কিন্তু তাঁরই ন্যস্ত উত্তরাধিকার ব্যবহার করে লেনিন ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিলেন—যে সমাজবাদ 'আকালস্থঃ নিরলম্ব বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ' অবস্থায় কবিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল তা যেন হল ইতিহাসের নব সব্যসাচী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে তার বিপুল উন্মেষ আমরা দেখতে পেয়েছি। একই সঙ্গে দেখেছি বহুবিধ প্রাপ্তি আর অপকর্ম আর বিড়ম্বনা, যা সমাজবাদের ভাতিকেও অনেকের চক্ষে মলিন করে থাকতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক জগতে সমাজের নবরূপায়ণ আজ সম্ভাবনার ক্ষেত্র অতিক্রম করে বাস্তবে পরিণতির দিকে অগ্রসর যে হচ্ছে তা প্রশ্নাতীত। এখনো অবশ্য অন্ধকার বহুস্থলেই দূর হয়নি। এখনো অজস্র বাধা রয়েছে পথে।"

'অল্পে সুখ নেই' গ্রন্থ লেখকের মোট বারোটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার সূচি : ভারতের সংহতি; মহাবীর ও বুদ্ধ, মুসলমান শাসনকালের গুরুত্ব; যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব; সাহিত্যে শাসন; গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে; রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ; কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ; সার্বভৌম কবি; ইন্দ্রপাত; ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল; অল্পে সুখ নেই।

'অল্পে সুখ নেই' রচনাটি 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় (১৩৭০) প্রথম বেরিয়েছিল। প্রাসঙ্গিক আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। এই বইতে হীরেন্দ্রনাথের তিনটি রবীন্দ্র-বিষয়ক লেখা স্থান পেয়েছে। যথাক্রমে 'কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ' (প্রথম প্রকাশ প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সংসদ প্রকাশিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থেও মুদ্রিত). 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' (প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়', আশ্বিন, ১৩৬৮) এবং 'সার্বভৌম কবি' (প্রথম প্রকাশ গোপাল হালদার সম্পাদিত ও ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত রবীন্দ্র শতবার্ষিক প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১) বইতে)। উত্তরকালে 'সার্বভৌম কবি ও অনান্য প্রবন্ধ' নামে যে বই প্রকাশিত হয় (১৯৯৩)। তাতে হীরেন্দ্রনাথ কিন্তু 'সার্বভৌম কবি' রচনাটি অন্তর্ভুক্ত করেননি, যদিও রবীন্দ্র বিষয়ক ভিন্ন দুটি রচনা সেখানে আছে। অন্য প্রবন্ধ গ্রন্থেও যেমন রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ আছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও কিছু কম নয়, যা নানা পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো, 'ভারতের সংহতি' ও 'অল্পে সুখ নেই' রচনা দুটি হীরেন্দ্রনাথের 'চরৈবেতি চরৈবেতি' (১৯৯২) প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদিও 'ভারতের সংহতি'র নাম সেখানে 'ভারতবর্ষের সংহতি'।

৯. *মার্কসবাদ ও মুক্তমতি*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/আশ্বিন ১৩৭৯ (১৯৭২)

বাক্ সাহিত্য প্রা. লিমিটেড/৩৩ কলেজ রো/কলকাতা-৯ থেকে স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেস/৬ শিবু বিশ্বাস লেন/কলকাতা-৬ থেকে গোপাল ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : কানাই পাল

মূল্য : ৮ টাকা। পৃ. ২৩২

উৎসর্গ : "অধুনা বিস্মৃতপ্রায় হলেও এ যুগের চিন্তা ও কর্মে যাদের অবদান মহামূল্য। বাংলার প্রগতি প্রকাশে একদা যাঁরা ছিলেন প্রকৃত প্রাজ্ঞ পুরোধা, যাঁদের জীবন ও জনহিতে বিবিধ প্রযত্ন ছিল আত্মচিন্তার সংস্পর্শমুক্ত, সেই তিন বিচিত্র চরিত্রের বাঙালী মনস্বী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।"

'নির্বাচিত প্রবন্ধ', ২য় খণ্ডে এই বইয়ের তেরোটি রচনা নেওয়া হয়েছে, যদিও মূল সংস্করণে ছিল মোট ১৯টি প্রবন্ধ, যা লেখক লিখেছিলেন ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 'রচনাগুলিও নানা বিষয়ের, সে দিকে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি 'মুখবন্ধ'-এ লেখেন :

> "বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত আমার কতকগুলি প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে এগুলিকে প্রকাশ করা কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের পরিচয় সন্দেহ নেই। আমার নিজের এ-ব্যাপারে সংকোচ ও শঙ্কা ছিল। এখনও তা কাটেনি। কিন্তু কয়েকজন সুহৃদের আগ্রহে এই প্রকাশনে সম্মতি দিয়েছি। নিজের দায়িত্ব অপর কয়েকজন সহৃদয় সজ্জনের উপর চাপাবার উদ্দেশ্যে একথা বলছি না। এ ব্যাপারে দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আমার; তবে বলছি নিজের মনের দ্বিধা একেবারে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি বলে।
>
> বহু বিষয়ের উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে ঘটেছে। আশা করি পাঠক তার মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধানে সহজে পাবেন। ভারতবর্ষের ভূমিতে একান্তভাবে প্রোথিত যার সত্তা, তার পক্ষে মার্কসবাদ কেমন করে 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দ'-এর ভিত্তিস্থল হতে পারে, 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' মন্ত্রের সঠিকতম অস্ত্ররূপে উপলব্ধ হতে পারে, তারই সাক্ষ্য এখানে যদি মেলে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

১০. *তরী হতে তীর*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৭৪

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড/৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে শ্রীদিলীপ বসু কর্তৃক প্রকাশিত বোধি প্রেস/৫ শঙ্কর ঘোষ লেন/কলকাতা-৬ থেকে সিদ্ধার্থ

মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

উৎসর্গ : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিত্যস্মরণীয়েষু'

দাম : কুড়ি টাকা

পৃ. ১৫৫। উৎসর্গপত্রে 'তদ্বীয় বস্তু, গোবিন্দ, তুভ্যমেব সমর্পয়ে' বাক্যটি উদ্ধৃত।

'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছেন :

"এই রচনার পরিসমাপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। যে সুহৃজ্জনের নির্বন্ধাতিশয্যে এ ধরনের লেখায় হাত দিয়েছি, তাঁদের আগ্রহ ভারত ভূখণ্ডে স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা যেন লিখি। পারব কি না বলা সম্ভব নয়—সময় এবং সাধ্যে কুলোবে কিনা জানা নেই, আর আপাতত ভাবি। পাঠক সাধারণের মনে এই রচনার প্রতিক্রিয়া না জেনে কলম গুটিয়ে রাখব। একটানা এতগুলো পাতা লিখে যাওয়ার পর না হয় জিরোলাম।"

১১. *কালোত্তীর্ণ সম্পদ*

প্রথম প্রকাশ/এপ্রিল/১৯৭৬

চলতি দুনিয়া প্রকাশনী/৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সমীক্ষা প্রেস/৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ছয় টাকা

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

পৃ. ভূমিকা+৯৯

ভারত-সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধুত্বের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন লেখক।

১২. *স্বদেশ জিজ্ঞাসা*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/এপ্রিল, ১৯৭৬

জয়দীপ পাবলিকেশনস্/২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ এর পক্ষে দীপক বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত। তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্/২৬ বিধান সরণি/কলকাতা-৬ থেকে নিশিকান্ত হাটই কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য দশ টাকা।

এই বইটি নামে নতুন বই হলেও বস্তুত এটি লেখকের 'চক্ষুষা কাণঃ' গ্রন্থেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। চক্ষুষা কাণঃ (১৯৫৬) গ্রন্থে সঙ্কলিত কোনও প্রবন্ধই এই গ্রন্থে বর্জিত হয়নি। বরং যুক্ত করা হয়েছে বারোটি নতুন রচনা এবং একটি অনুবাদ প্রবন্ধ।

হীরেন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় লিখেছেন :

"বেশ কিছুকাল আগে 'চক্ষুষা কাণঃ' নাম আমার যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ হয়েছিল, তা বহু দিন দুষ্প্রাপ্য বলে পুনর্মুদ্রণের কথা কেউ কেউ ভেবেছিলেন, প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িকী থেকে সংগৃহীত বলে হয়তো বর্তমানে অচল মনে করে

সংকোচ বোধ করলেও আমার প্রাক্তন ছাত্র অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে বই আবার বার করতে রাজী হয়েছি। নতুন করে ছাপবার অজুহাতকে মজবুত করবার জন্য অন্য কয়েকটি লেখাও খুঁজে পেতে অনিলবাবু জুড়ে দিয়েছেন। প্রতিটি রচনার তারিখও দেখানো হয়েছে, যাতে কালানুক্রমিকতা শুধু নয়, সমসাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্তিরও একটা সামঞ্জস্য থাকে। ভূমিকা লিখছি সন্তর্পণে, কারণ নিজে এই প্রকাশনের তত্ত্বাবধান করতে পারিনি, সে ভার অনিলবাবুই নিজগুণে তুলে নিয়েছিলেন। বস্তুত এই বই প্রকাশিত হচ্ছে অনিলবাবুরই তাগিদে—যদিও অবশ্য রচনার গুণাগুণের জন্য পাঠকদের কাছ থেকে দায়িত্ব এককভাবে আমার।"

আরও বলা দরকার 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতে যে উৎসর্গপত্র ছিল, তাতেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ প্রসঙ্গে লেখক 'ভূমিকা'য় জানিয়েছেন :

"চক্ষুষা কাণঃ যাকে উৎসর্গ করেছিলাম, তিনি আর নেই। সম্পূর্ণ একক অবহেলিত অবস্থায় প্রবাসে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। বলা যেতে পারে প্রায় ইচ্ছামৃত্যু—দেশ মায়ের ওপর অভিমান করে যেন দেশের বাইরে জীবনাবসানই ছিল তাঁর কাম্য। উৎসর্গ যে ভাষাতে করেছিলাম, তার কোন অদলবদল করলাম না। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি না—সুতরাং জানি এতে তাঁর কোনো সান্ত্বনা নেই। তবে আমার মতো ব্যক্তি হয়তো এ থেকে একটু সান্ত্বনা পাব।"

'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' বইতে যে চারটি প্রবন্ধ নতুন যুক্ত হয়েছে সেগুলি হলো : 'মহামতি লেনিন', 'এঙ্গেলস্ স্মরণে', 'ভারত চেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা' এবং 'সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু'। তাছাড়া অনূদিত রচনা 'ভারতে ইংরাজ শাসন' সংযোজিত। বাকি সব রচনার জন্য পূর্বোক্ত 'চক্ষুষা কাণঃ' বিষয়ে তথ্য দ্রষ্টব্য।

'চক্ষুষা কাণঃ' নির্বাচিত প্রবন্ধ। প্রথম খণ্ডে এবং 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা'র মাত্র দুটি নির্বাচিত গ্রন্থ : দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত (পৃ. ১১৭-১২৮) 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' বইটির এক সমালোচনা বেরিয়েছিল 'ইতিহাস ও আত্মজিজ্ঞাসা' নামে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ (১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬)।

১৩. *বিপ্লবের পরাজয় নেই*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৯০

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড/১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে তিমিরকুমার মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : প্রতাপ সিংহ

দাম : ২২ টাকা

পৃ. ৭৯+১৪

বিপ্লবের পরাজয় নেই গ্রন্থে মোট নটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সেগুলির সূচি এরকম :

ইনকিলাব জিন্দাবাদ; মার্কসচিন্তা, গান্ধীজি, ভারতবর্ষ; ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী; সোভিয়েট নব-প্রবোধন-প্রয়াস প্রসঙ্গে; বিপ্লবে : সংকটে নয়, চাই সন্ধান,শুদ্ধি সংকল্প;

সংকটেরই কল্পনাতে হ'য়ো না ম্রিয়মান; পেরেস্ত্রৈকার পাঁচ বছর ; নয়া জার্মানী আর দুনিয়ার দুশ্চিন্তা; বিপ্লবের পরাজয় নেই।

প্রবন্ধগুলি নানা পত্রপত্রিকায় আগে প্রকাশিত।

সূচিপত্রের আগে বিষ্ণু দে অনূদিত দুটি কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি 'উত্তর পুরুষকে' বের্টোলট ব্রেষ্ট্-এর রচনার অনুবাদ। অন্যটি 'লেনিনের কবর', ল্যাংস্টন হিউজ-এর বিখ্যাত কবিতার বিষ্ণু দে-কৃত তর্জমা। এই বইয়ের যে 'ভূমিকা' লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। এই বইটির এক দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন বাসব দাশগুপ্ত (দ্র. 'বিপ্লবের পরাজয় নেই', কোরক সাহিত্য পত্রিকা। হীরেন মুখোপাধ্যায়-সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৮-১৩৯)

১৪. *গণনাট্য হিন্দু-মুসলমান সমাজবাদ*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১ মে ১৯৯১

বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন/১৩/১ ক্রীক লেন/কলকাতা-৭০০০১৪-এর পক্ষে সুভাষ নাহারায় কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস/৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি/কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

মূল্য : পনেরো টাকা

পুস্তিকাটি বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ৪৫ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত।

মুখবন্ধ, গণনাট্য কর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ, 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়', ভারতচেতনা সমাজবাদ মানবিকতা এবং সমাজতন্ত্রের জয় অনিবার্য—এই পাঁচটি রচনা পুস্তিকায় আছে। 'মুখবন্ধ' টি হীরেন্দ্রনাথের রচনা (তাং ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১)। গণনাট্য কর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯-এ ১৩/১ ক্রীক লেনের দোতলার হল ঘরে গণনাট্য কর্মীদের সামনে বক্তব্য। ক্যাসেটে-ধৃত। ঈষৎ-সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশিত। ক্যাসেট থেকে অনুলিখন কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হিন্দু মুসলমান কী জয়' 'চতুরঙ্গ', জুন ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত, 'ভারতচেতনা সমাজবাদ মানবিকতা' প্রথম বেরিয়েছিল 'অমৃত' ১৩৭৭ শারদীয়া সংখ্যায় এবং 'সমাজতন্ত্রের জয় অনিবার্য' লেখাটি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোশাল সায়েন্স কর্তৃক ২৭-২৯ এপ্রিল। রাজ্য যুবকেন্দ্রে (মৌলালি, কলকাতা) 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং ভারতের সাম্প্রতিক সমস্যা' শীর্ষক এক সেমিনারে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত অনুলিখন রতন ভট্টাচার্য।

১৫. *চরৈবেতি চরৈবেতি*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/সেপ্টেম্বর ১৯৯১

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-৭৩ শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত দি নিউ মণ্ডল প্রিন্টার্স/৪/১ বিডন রো/কলকাতা-৬ থেকে মমতা মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

মূল্য : পঁচিশ টাকা

পৃ. ১৫৬

মোট ১৩টি প্রবন্ধ এই বইতে সংকলিত। সেগুলির সূচি :

ভূমিকা ; চরৈবেতি, চরৈবেতি; কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব ; কার্ল মার্কস : ভারতচিন্তা ও ভবিষ্যৎ; ধর্ম ও সমাজবিপ্লব; প্রগতিলেখক সংঘ; স্মৃতি সত্ত্ব ভবিষ্যৎ; দেশাভিমানী রামমোহন; স্বাধীনতার স্বাদ, সাম্প্রদায়িকতার শাস্তি, সংহতির সন্ধান; সংস্কৃতের ভূমিকা বিষয়ে; সাহিত্য, সমাজদায়িত্ব, রুশদির দুর্মতি; কোলকাতা : কিছু ভাবনা; অল্পে সুখ নেই; ভারতবর্ষের সংহতি।

উল্লেখ এই যে 'ভারতে সংহতি' এবং 'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ দুটি হীরেন্দ্রনাথের "অল্পে সুখ নেই" (১৯৬৪) প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উৎসর্গ : 'কবি-সুহৃৎ বিষ্ণু দে স্মরণে বাংলাদেশের প্রখ্যাত মনীষী সাহিত্য ও সমাজ সত্য সন্ধানে সদা সন্নিবিষ্ট আহমদ শরীফ-এর করকমলে এই রচনাগুচ্ছ সাদরে সমর্পিত হল।' ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> বেশ কিছু পুরোনো রচনা সমেত কতকগুলো লেখা একত্র করে এই গ্রন্থাকারে প্রকাশে সম্মতি দিয়েছি কুণ্ঠা নিয়ে।...
>
> আশা করব পাঠক এই প্রবন্ধ সমাবেশে পৌনঃপুনিকতার অপরাধ ক্ষমা করবেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই"—তেমনই আমার বলায় এবং লেখায় দেখা যাবে কি-ভাবে আমার সর্বচিন্তা ও কর্মে মার্কসতত্ত্বের অমোঘ প্রভাব অকাট্যরূপে ধরা পড়ব। না হয় একটু মৃদু গর্ব করেই বলি যে দেশাভিমান এবং তারই পরিপূরকরূপে 'ধনতন্ত্রের লজ্জা, বীভৎসা আর অমানুষিকতা'কে (মার্কস্-এরই ব্যবহৃত শব্দগুলি) ধিক্কার ও বিদূরণ-প্রয়াস আমার নিয়ত অন্বিষ্ঠ। বাধাবিপত্তি যতই আসুক, মানব অভ্যুদয়ের জয় হবেই। ব্যর্থতার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে আমাদের দেশ এবং সর্ববিশ্ব।

'কোরক' সাহিত্য পত্রিকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় সংখ্যায় 'আমি থাকি বা না থাকি' শিরোনামে এই বইটির সমালোচনা করেছেন (আর একটি বই 'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর' সহ) সৌমিত্র লাহিড়ী। 'বিপ্লবের পরাজয় নেই'-এর ৮টি প্রবন্ধ নির্বাচিত প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৬. *সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৯৩

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড/১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : প্রতাপ সিংহ

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

পৃ. ১১৮+৮ (রয়াল সাইজ)

এই বইতে মোট ১৭টি প্রবন্ধ সংকলিত। যার মধ্যে কিছু আগেকার বইগুলি থেকে নেওয়া। সূচিপত্র এরকম :

> রবীন্দ্রনাথ : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে; রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণ মহিমা; বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে; ধর্ম ও মার্কস চিন্তা প্রসঙ্গে; আধুনিক বাংলা কবিতা; গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে; প্রগতি সাহিত্য শিবির ম্লান কুণ্ঠিত স্তিমিত কেন?; জয় হোক, আমাদের ইতিহাস; ভারত চেতনা সমাজবাদ ও মানবিকতা; বিপ্লব আবেগ ও প্রজ্ঞা; সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ; সত্যজিৎ স্মরণে

উৎসর্গ :

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সমরেশ বসু
তিন কীর্তিধন্যের সদাশয়
সৌহার্দ্য স্মরণে

উল্লেখ্য যে বর্তমান গ্রন্থের 'সার্বভৌম কবি' রচনাটি লেখকের 'অল্পে সুখ নেই' (১৯৬৪), 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' রচনাটি একই গ্রন্থের, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' রচনাটি 'চক্ষুষা কাণঃ' গ্রন্থের (১৯৫৬), 'গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে' রচনাটি 'অল্পে সুখ নেই'-এর 'আমাদের ইতিহাস' রচনাটি 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতে আগেই ছাপা হয়েছিল। আবার আমরা দেখিয়েছি যে চক্ষুষা কাণঃ বইটির পরিবর্তিত রূপ 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' বইটি। আরও বলা দরকার যে, বর্তমান বইতে 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' রচনাটি 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' নামে (প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়' পৌষ ১৩৬২ সংখ্যায়) 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতে সংকলিত হয়েছিল।

'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' থেকে ছ'টি রচনা প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৩৪৪ গ্রহণ করা হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভাবনার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন শঙ্খ ঘোষ, তাঁর 'সময়ের জলছবি' বইতে, 'মুক্ত আবেগ' রচনায়। সুতরাং 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' হীরেন্দ্রনাথ অন্তত তিন দশক (পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে নব্বই-এর গোড়ার দিক) ব্যাপী ভাবনা চিন্তার ফসল বলা যেতে পারে।

'ভূমিকা'য় হীরেন্দ্রনাথও স্পষ্ট করে লিখেছেন :

> পঞ্চাশাধিক বর্ষের ব্যবধানে এবং বিবিধ বিষয়ে ও উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ সংকলিত হলেও কিছু পরিমাণে কালিক অপ্রাসঙ্গিকতা আর পুনরুক্তির সম্ভাবনা এড়ানো চলে না। এজন্য হয়তো পাঠকদের মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি দেখা দেবে জেনেই অগ্রিম মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্তত অজুহাত হিসাবে নিবেদন করব—ছোটমুখে বড়ো কথা শোনানো হচ্ছে জেনেও বলব—যে আমার দেশাভিমানী ভারতবর্ষীয় মানসে মার্কসীয় বিশ্ববোধকে সুসমঞ্জসরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে লিপ্ত থেকে যে প্রত্যয় আমাদের মতো অভাজনকেও 'শুধু দিন যাপনের গ্লানি' থেকে অন্তত কিঞ্চিৎ অব্যাহতি দিতে পেরেছে ভাবতে পারা আমার একমাত্র অহংকার। সেই প্রত্যয়ের

পরিচয় অপরিহার্য হলেও এ রচনাপুঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকেই তো দেখি অধুনা সে প্রত্যয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন অল্পাধিক পরিণামে কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এমনও হতে পারে আমি ভ্রান্ত, আর আঁকড়ে রয়েছি একটা 'গোঁড়ামি'-কে কিন্তু তা আমি অন্তত মানি না।'

১৭. *'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর?'*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/৩ মে ১৯৯৪

উত্থক প্রকাশনী/৪০ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড/কলকাতা-৬০ থেকে তপতী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন/কলকাতা-৬ থেকে শ্যামলকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : তপন কর

মূল্য : চল্লিশ টাকা

পৃ. ভূমিকা+১৬১

পরিবেশক চ্যাটার্জী পালবিশার্স/১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-৬

উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' (১৯৪০)-এর অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতার অংশ রয়েছে। অতঃপর

শিল্প প্রতিভা ও হৃদয়বত্তায়
প্রোজ্জ্বল অনুজ ত্রয়
সোমনাথ হোর
সিদ্ধেশ্বর সেন
মহাশ্বেতা দেবীর
করকমলে অর্পিত হল

এই বইতে পনেরোটি রচনা সংকলিত। সম্পূর্ণ সূচি এরকম :

'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর', স্বদেশিকতা ও কমুনিজম; 'নাই নাই ভয়' : 'কিউবার অমৃতমন্ত্র; 'ভারতছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর'; 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে'; 'ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়'; পূর্ব জগৎকে জাগাতেই হবে; মস্কো নভেম্বর ১৯৮৭; আফগানিস্তান, সোভিয়েট এশিয়া; নববর্ষ নবশতাব্দী; 'সভ্যতার সংকট' ও জগতের যন্ত্রণা; পাশ্চাত্যের অধঃপাত আর গণতন্ত্রে ভাঁওতা; মার্কস মার্কসবাদ এবং আমরা; স্ট্যালিন, ধর্ম, মার্কসবাদ; নভেম্বর বিপ্লব : 'মনুষ্যত্বের পরাভব নেই'।

'ভূমিকা' লিখতে গিয়ে (৬ এপ্রিল ১৯৯৪) হীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন : "বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনে কুণ্ঠা সংবরণ করে এই বইটি ছাপতে দিতে সম্মত হয়েছি। এর দোষগুণের দায়িত্ব অবশ্যই আমার'।

রচনাগুলি নন্দন, পাক্ষিক বসুমতী, শারদীয়া পরিচয়, শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৮. *পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৯৭

আজকাল পাবলিশার্স-এর পক্ষে/প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক/৯৬ রাজা রামমোহন রায় সরণি/কলকাতা-৭০০০০৯/থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রক : ইউনিক কালার প্রিন্টার্স/কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ২৫

বইটি 'তরী হতে তীর' (১৯৭৪) বইয়ের অংশবিশেষ নিয়ে পুনর্মুদ্রণ বলা যেতে পারে।

১৯. *যুগের যন্ত্রণা : প্রত্যয়ের সংকট*

(স্বদেশ স্বকাল সাহিত্য সমাজ বিষয়ক একগুচ্ছ নিবন্ধ)

প্রথম প্রকাশক/কলকাতা/২০ মে ১৯৯৯

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড/কলকাতা-৭০০২০

মুদ্রক : বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড/১০/বি ক্রীক লেন/কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : ৭০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 'নিবেদন' লিখেছেন। এছাড়া হীরেন্দ্রনাথের মুখবন্ধ ও সূচি ছাড়াও পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০

উৎসর্গপত্র :

স্মরণ

ভারতবর্ষের দুই পুরুষোত্তম

'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

মহাত্মা গান্ধি

'নিত্বীনাম্ ত্বা নিধিতমং হবামহে'

'মুখবন্ধ' লিখতে গিয়ে (এর তারিখ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ষষ্ঠ দিবসে) হীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন :

> "বাংলা আকাদেমির মতো সর্ব অর্থে সম্ভ্রান্ত ও সমাদরণীয় সংস্থার পক্ষ থেকে আমার এই প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে। এ হল আমার পক্ষ থেকে এক অপ্রত্যাশিত ও অনুপ্রাণিত সম্মান। ...ভারতবর্ষের খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে পঞ্চাশ বর্ষ পার হওয়ার উপলক্ষে উৎসবাদির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে যে জওয়াহরলাল নেহরু-কথিত 'the glow of freedom' ('মুক্তির দীপ্তি') দেশবাসীর অন্তরে জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজবাদ সাম্যবাদ নানা পরিস্থিতির চাপে রাহুগ্রস্ত

হওয়ার ফলে দুনিয়া জুড়ে সাধারণ মানুষের মনে নৈরাশ্য এসেছে, জগতের ইতিহাস বুঝি এই বিংশ শতাব্দপূর্তি কালে কতদূর আর কতদিনের জন্য পিছিয়ে নিয়েছে, তা কারও জানা নেই। এমন পরিস্থিতিতে প্রায় অনিবার্যভাবে এসেছে প্রত্যয়ের সংকস্ট, এসেছে দিকভ্রান্তি, এসেছে শুভ কর্মপথে নির্ভয় অগ্রগতিতে বাধাবিঘ্নের কন্টকরাশি। স্বভাবতই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ আহ্বান; মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর মতো মহাপাপ যেন আমরা না করি। 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'।"

চারটি ভাগে বিন্যস্ত ক'রে মোট ২২টি প্রবন্ধ এই বইতে সংকলিত। সূচি এরকম : প্রথমপর্বে—'কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম,' 'রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণমহিমা, 'রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা'; 'সভ্যতার সংকট ও জগতের যন্ত্রণা'; 'আগে এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র'; 'সাংবাদিকতা, সাহিত্য, স্বদেশমুক্তি'; 'পদ্মানদীর মাঝি' : সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে'; 'বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা।'

দ্বিতীয় পর্বে—'প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে'; 'মানুষ আমরা নহি তো মেঘ'; 'পরাধীনতার অভিশাপ মোচন এখনও হয়নি', 'ইতিহাস এক নিষ্ঠুর দেবতা'; 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়'; 'স্বাধীন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা'।

তৃতীয় পর্বে—'কমিউনিস্ট ইস্তাহার; মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি; 'ইতিহাসের মহাকাব্য'; 'আফ্রিকা' : মুক্তিপথে কাঁটা—আশা ও আকাঙ্ক্ষা'; 'দুনিয়ার দখল নেবে দলিতের দল'।

চতুর্থ পর্বে—'সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান', 'রাধারমণ মিত্র : বিস্মৃত অসমান্য মানুষ'; 'আম্বেদকর স্মরণে'; 'আবুল হালিম স্মরণে'।

এর মধ্যে 'রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণ মহিমা' এবং বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব' নামে 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বইতে (১৯৯৩) স্থান পেয়েছিল।

২০. *'আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে'*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

অনুষ্টুপ প্রকাশনী/২ ই নবীন কুণ্ডু লেন/কলকাতা-৯ থেকে অনিল আচার্য কর্তৃক প্রকাশিত

এম ডি গ্রাফিকো/১০/৪ মি মনোহরপুকুর রোড/কলকাতা-৭০০০২৬ থেকে বর্ণবিন্যাস এবং দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রা. লিমিটেড/৭৬ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট/কলকাতা থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

মূল্য : ৭০ টাকা

উৎসর্গ : 'আমার ছেলে অভিজিৎ-কে'

'যে হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝবে যে আমার অতিদীর্ঘ জীবনব্যাপী বহুবিধ অথচ মূলগতভাবে একনিষ্ঠ ও প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন কর্মব্যাপৃতির আপাত বিচারে সর্বতোব্যর্থতা ছাপিয়ে রয়েছে যুগপৎ বেদনা আর বৈভব, গ্লানিবোধ আর গরিমা, যা নিশ্চিত করেছে জগৎজোড়া কমিউনিস্ট প্রত্যয় যে বিপ্লবের পরাজয় নেই। এই গ্রন্থের কবি-কথিত শিরোনামা শুধু কল্পনা বিলাস নয়।'

প্রসঙ্গত বলা দরকার হীরেন্দ্রনাথ গ্রন্থের শিরোনাম ব্যবহার করেছেন কবি সমর সেনের কবিতার লাইন। গ্রন্থের মধ্যে বারোটি রচনা অন্তর্ভুক্ত। সেগুলির সূচি :

'মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি'; 'জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে'; 'গণতন্ত্রের সার্থক পরিণতি সাম্যবাদে', 'সাম্যবাদ : স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'; 'সহস্রাব্দ পূর্তি সাম্যবাদ ও ভবিষ্যৎ' 'ভিড় করে আসা কিছু স্মৃতি; 'ভাবনা : দুর্ভাবনা', 'একুশের ভাবনা'; 'চিত্তপ্রসাদ স্মরণে'; '২২শে শ্রাবণ, ১৪০৮'; 'বঙ্কিম গরিমার উত্তরাধিকার'; 'কেন লিখি'।

এর মধ্যে মার্চ, ১৯৯৮-তে লেখা, মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি রচনাটি 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার : মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি' নামে পূর্বোল্লিখিত 'যুগের যন্ত্রণা : প্রত্যয়ের সংকট' (১৯৯৯) বইতে সংকলিত হয়েছিল। এই বইতে কমিউনিস্ট ইস্তাহার কথাটি শিরোনামে বাদ গেছে।

'আকাশগঙ্গা ও আমাদের পৃথিবী' শিরোনামে 'প্রকাশকের নিবেদন' লিখেছেন অনিল আচার্য। 'ভূমিকা'য় হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "সম্প্রতি নজর করলাম আমার এক কীর্তিমান লেখক বন্ধু 'ভূমিকা' বা 'মুখবন্ধ' (বা একটু স্মিতহাস্যসহ 'গৌরচন্দ্রিকা') না লিখে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামা দিয়েছেন। তাঁর শব্দবোধের একজন গুণগ্রাহী হয়েও কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভেবে দেখি ঠিকই করেছেন। পাঠকদের সামনে কিছু পরিমাণে আসামীর মতোই বিচারের কাঠগড়ায় লেখককে থাকতে হয়। যা লিখি তাই হল জবাবদিহি। নিজের কাছে, আর বই ছেপে বের হচ্ছে বলে পাঠক সাধারণের কাছে। সমাজের কাছে।"

(খ). ইংরেজি বই

1 *An Introduction to Socialism*
Calcutta, N.B.A, 1938, Unfortunately this book could not traced and checked.

2. *China Calling*
Anti-Fascist Peoples Union, 249 Bowbazar Street, Published by Satyabrata Chatterjee, Calcutta, 1942, pp 88. 12 Annas.

3. *Under Marx's Banner*
Purabi Publishers, Calcutta, 1944, Rs. 3/- 12 Essays. Published by Girin Chakraborty.

4. *India Struggles For Freedom*
1st edn, Kutub Mahal, Bombay, 1946. 2nd Edn, entitled *India's Struggle for Freedom,* National Book Agency, Calcutta, 1948; 3rd edn, 1962 Rs. 5/-

5. *Gandhiji : A Study*
National Book Agency 12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta, 1958, pp 215, Rs. 5 50. 2nd rev edn, 1960; 3rd rev. ed, pp 225, Rs. 30\ 4th rev. ed, 1991, Rs. 120/-

6. *Himself a True Poem : A Study of Rabindranath Tagore*
   Peoples' Pubslishing House, New Delhi, 1961. 11 Chapters, Rs. 11.50
7. *India and Parliament*
   Peoples Publishing House, New Delhi, 1962 10 Chapters, pp 160.
8. *The Gentle Colossus : A Study of Jawaharlal Nehru*
   Published by Tarun Sengupta on behalf of Manisha Granthalaya, Calcutta, 1964 and Printed by P. C. Roy at Sri Gouranga Press. A Paperback edition is published by Jaico, Bombay 1969, Rs. 4.
9. *Remembering Marx*
   Communist Party of India Publication, New Delhi, 1962, Rs. 2/ - from 4/7 Asaf Ali Road, New Delhi. Dedicated to Gangadhar Adhikari.
10. *Time-Tested Treasure : Recollections and Reflections on Indo-Soviet Friendship* Allied Publishers, Bombay etc. 1975 pp 63, Rs. 20/-
11. *Bulgaria : A Popular Histroy*
    Peoples Publishing House, New Delhi, 1975, pp 122, Rs. 15/-
12. *Bow of Burning Gold : A Study of Subhas Chandra Bose*
    Peoples Publishing House, New Delhi, 1977, Reprinted 1993, Rs. 30/-
13. *Potrait of Parliament : Reflection and Recollection,* 1952-1977
    Vikas Publishing House, New Delhi, 1978, pp 158+index Rs. 35/-, 2nd edn, Basumati Corporation, Calcutta, 1992, including a new 'Foreward'+new chapters. Rs. 65.
14. *Hungary Past and Present*
    Sterling Publishers, New Delhi, 1980, pp 154, Rs. 40/-
15. *Recalling India's Struggle For Freedom*
    Seema Publications, Delhi, 1982 Preface+20 Chapters, Rs. 125/-
16. *Sixty Years of the USSR*
    Soviet Land Bookleets, Information Deptt of the Soviet Embassy, New Delhi, 1982, pp 73, 6 Chapters, Rs. 1/-
17. *The Great Tibetologist : Alexander Csome De Koras : Hermit Hero From Hungary.*
    Sterling Publishers, Delhi, 1984. Rs. 50/-
18. *Under Communism's Crimson Colours : Reflections on Marx-*

ism, India and the World Scene
Peoples Publishing House, New Delhi, 1982, pp 329, Rs. 65/ - (32 Essays).

19. *Dimitrov : Titan of Our Time*
Vision Books, New Delhi, pp. 140, Rs. 60/-
20. *In Dimitrov's Footsteps*
Vision Books, New Delhi, 1983. Preface+14 Chapters, pp 135, Rs. 60/-
21. *Marx, Great October, India and the Future*
Allied Publishers, New Delhi, 1984 pp 146, Rs. 35/-
22. *Epic Victory, 1941-45 : The Soviet Triumph over Fascism*
Allied Publishers, New Delhi, 1985, pp 106, Rs. 35/-
23. *Was Imda's Partition Unavoidable?*
Manisha Granthalaya, Calcutta, 1987, pp 84. Rs. 18/-. The book came out of lectures at Osmania University, Hyderabad. 7 Essays.
24. *Credo · Some Communist Affirmations*
Basumati Corporation, Calcutta, 1993, pp 198. Rs. 65/-
25. *India's Ordeal*
Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd, Calcutta, 2001. Rs. 200/-

N.B Apart from the above-mentioned English Books, the readers should also take note of the book, which I had inadvertently missed out. *The Stalin Legacy. Ivory Flawed but Ivory Still.*

(গ) ইংরেজি পুস্তিকা

1. *The Communal Problem and Freedom Strugle,* 1919-47
Osmania University, Hyderabad, 1973. Grew out of Moulana Abul Kalam Azad Memorial Lectures, given in August, 1973. Price not Stated.
2. *The Indian 'Renaissance' and Rammmohan Roy*
University of Poona, Pune-7 1985. Grew out of A Series of Lectures in Late P.K. Shivalkar Memorial Lectures, pp. 44. Rs. 3.75
3. *Csoma de Koras : A Dedicated life*
Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi, 1981. pp 32. Price not stated.

4. *Vivekananda and Indian Freedom*
   The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Calcutta, 1986, pp 40. Rs. 4/-
5. *Communists in Parliament*
   With A.K.Gopalan as co-author. A. CPI publication, New Delhi, 1957.
6. *Socialist Democarcy*
   Navyug Publishers, Delhi, year not mentioned, Rs. 4/-
7. *Proletarian Internationalism*
   A CPI Pubilication, New Delhi, 1978
8. *FSU Beginnigs*
   ISCUS (Indo-Soviet Cultural Society), New Dehil, 1981
9. *Our Freedom Struggle and the Communist Party : Some Reflections and Observations.*
   A CPI Publication, New Delhi, 1984, pp 56, Rs. 2/-
10. *The Legacy We Cherish! 60 years of CPI*
    A CPI Publication, New Delhi 1985, pp 38, Rs. 1/-
11. *Seventy Soviet Years : A Salute to Great October*
    A CPI Publication, New Delhi, 1987, pp 47, Rs. 2/-
12. *FSU to ISCUS ; Forty years of Indo-Soviet Friendship*
    ISCUS National Council, New Delhi, 1981, Rs. 3/-
13. *Rabindranath Tagore*
    Three Lecutres at Marathwada University, Aurangabad, 1976, Rs. 3/-. Published by the same University of Maharashtra.
14. *Gandhi, Ambedkar and the Extinction of Untouchability*
    Peoples Publishing, New Delhi, 1982, Rs. 8/- Originally given as lectures by the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, pp 55.
15. *Three Decades of Indo-Soviet Amity*
    Navyug Publishers, Delhi, Rs. 1/- Year of publication not mentioned.
16. *From Amir Khusrau to Abul Kalam Azad*
    The Commingling of Cultures in India. The Asiatic Society, Calcutta, 1999, pp 26, Rs. 25/-
17. *Management of Power : The Indian Ethos*
    Indian Institute of Management, Calcutta, 1999. Originally given as Sri Aurobindo Memorial Oration, 7 August. 1998.

N.B. There may be, I am sure, some more pamphlets which I have possibly left out I may recall one entitled *Who Fonght For India's Freedom* which is not available to me just now. Moreover, this list of Pamphlets are not arranged chronologically.

(ঘ) বাংলা পুস্তিকা

১. *সর্বহারার শ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন*
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৪১

২. *স্বাধীনতার শত্রু জাপান*
কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৪৩

৩. *বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন স্মরণে*
বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা, কলকাতা, ১৯৯২

(ঙ) রচনা সংগ্রহ

১. *নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড*
প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ (১৯৯৮)
সম্পাদনা : প্রণব বিশ্বাস
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি/১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট/কলকাতা-৭৩ থেকে সবিতেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস সি অফসেট ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন/কলকাতা-৮৫ থেকে মুদ্রিত
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন
মূল্য : ১১০ টাকা
লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মুখবন্ধ, নিবেদন ছাড়া এই খণ্ডে আছে ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ, হিন্দু ও মুসলিম, মার্কসবাদের অ আ ক খ, চক্ষুষা কাণঃ, অল্পে সুখ নেই। গ্রন্থ পরিচয় ও প্রসঙ্গকথা সম্পাদক-কৃত।

২. *নির্বাচিত প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড*
প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/মাঘ ১৪০৫ (১৯৯৯)
সম্পাদনা : প্রণব বিশ্বাস
মিত্র ও ঘোষ/কলকাতা/কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন
মূল : ১২৫ টাকা
নিবেদন, মুখবন্ধ ছাড়া রয়েছে মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, স্বদেশ জিজ্ঞাসা, বিপ্লবের পরাজয় নেই, চরৈবেতি চরৈবেতি, সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ।

(চ) সম্পাদনা (বাংলা)

১. *প্রগতি*
(সহযোগী সম্পাদক : অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী)
প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪ (১৯৩৭)
উৎসর্গ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরণীয়েষু'
২য় সংস্করণ, উথক প্রকাশনী, ৪০ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড/কলকাতা-৬০/১৯৯১
প্রচ্ছদ সজল রায়/৫০টাকা/পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা।

২. *আধুনিক বাংলা কবিতা*
(সহযোগী সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব)
প্রথম সংস্করণ/কলকাতা/১৯৪০
২য় সংস্করণ/দে'জ পাবলিশিং/কলকাতা/জানুয়ারি, ১৯৯৯
প্রচ্ছদ অজয় গুপ্ত/প্রচ্ছদ যামিনী রায়/১০০ টাকা

৩. *সোভিয়েট দেশ*
(সহযোগী সম্পাদক গোপাল হালদার)
সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ, কলকাতা, ১৯৪১

৪. *জাতীয় সঙ্গীত*
ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ, কোলকাতা, ১৯৪৪

(ছ) সম্পাদনা (ইংরেজি)

1. *The Land of Soviets*
(Co-editor Snehanghsu Kanta Acharya)
Friends of Soviet Union, Calcutta, 1941
2. *US : A People's History*
Anti-Fascist Writers and Artists, Calcutta, 1943.
3. *Indo-Soviet Souvenır*
Friends of Soveit Union, Calcutta, 1944

(জ) অনুবাদ (বাংলা/ইংরেজি)

1. Six Poems of Rabindranath Tagore
in *One Hundred & One Poem of Tagore,* edited by Humayun Kabir, New Delhi, 1981
2. Tagore's Prose
in *Your Tagore for Today* (translation from Selected Prose),

edited by Hiran Kumar Sanyal, Peoples Publishing House, Bombay, 1945

3. *Formation of Communist Party of India Abroad*
   A from Muzaffor Ahmed's Bengali work, National Book Agency, Calcutta, 1958.
4. *Boatman of Padma*
   Translation of Manik Bandopadhyay's 'Padma Nadir Majhi', Kutub Publishers, Bombay, 1945; Subsequent edition Sahitya Academy & NBT.
5. *Epochs End*
   Transalation of Tarasankar Bandyapadhyay's 'Manvantar, Mitralaya, Calcutta, 1944.
6. *The Land of the Soviets*
   (Ltr. by Hirendranath, along with S.k. Acharya) F. S. U, Calcutta, 1941
7. *Boatman Tarini*
   tr. of Tarasanker Bandyopadhyay's short story in Sahitya Academy's Authology.
8. সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, ১৯৩৮
   স্তালিন ও অন্যান্য কৃত, বাংলায় প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার অনুবাদ, কলকাতা, ১৯৪৪
9. কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' থেকে কয়েকটি অধ্যায়
10. কার্ল মার্কসের ভারত বিষয়ক নিবন্ধ ১৮৫৩, প্রগতি সংকলন
11. লরেন্স ক্যাসানোভার 'আর্ট অ্যাণ্ড সোশাল লাইফ', কলকাতা, ১৯৪৮
12. স্তালিন, অক্টোবর বিপ্লব

(ঝ) প্রবন্ধ, সমালোচনা, প্রকাশিত বক্তৃতা ইত্যাদি

[এই পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো-ছিটানো প্রবন্ধের তালিকা ভীষণভাবে অসম্পূর্ণ। একসময় এগুলি দেব না-ই ঠিক করেছিলাম কিন্তু কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে যতদূর সম্ভব বাংলা প্রবন্ধের অসম্পূর্ণ তালিকা দিলাম। ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে হাতই দিলাম না। আসলে এই কাজ দু'বছর ধরে এবং একার বদলে একটা 'টিম' নিয়ে করলে সম্পূর্ণ হতে পারে। শুধু পত্রিকাই নয় (যার মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, শারদীয়া বা ত্রৈমাসিক আছে), নানা স্মারক গ্রন্থ, স্মরণিকা ইত্যাদিতে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ গবেষকদের কথা মাথায় রেখে এই তালিকা দেওয়া হলো, যা অত্যন্ত কম সময়ে করা হয়েছে। —গৌ. নি]

১. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪২

এটি 'পরিচয়' (তখন সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথের প্রথম লেখা বইটি এমিলি বার্নস্ অনূদিত ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর 'অ্যান্টি ড্যুরিং'

২. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪২
৩. 'সংস্কৃতি সংকট' (প্র), 'পরিচয়' ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৩
৪. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩
৫. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৩
৬. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৩
৭. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড; ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৩
৮. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪
৯. 'চীনের প্রতিরোধ' (প্র), 'পরিচয়' ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৪
১০. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৫
১১. 'ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম' (প্র), 'পরিচয়', ৮ম বর্ষ, ১ খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৫ (ছাত্রছাত্রী সম্মেলনের ভাষণ)
১২. 'দেশে বিদেশে', (প্র) 'পরিচয়' ৮ম বর্ষ, ১ খণ্ড, ২ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৫
১৩. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬
১৪. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬
১৫. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৬
১৬. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৬
১৭. 'ভারতবর্ষ ও কার্লমার্কস', (প্র) 'পরিচয়', ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৭
১৮. 'ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য', আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৪১
১৯. 'দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ৎ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪০
২০. 'মানুষ খুনের ব্যবসা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৬
২১. 'সোভিয়েট ইতিহাসের একটি অধ্যায়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ নভেম্বর, ১৯৩৮
২২. 'লেনিন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি, ১৯৪০
২৩. 'ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে, ১৯৪১
২৪. 'সোভিয়েট রাষ্ট্র' 'সোভিয়েট দেশ', প্রবন্ধ সংকলন , ১৯৪১
২৫. 'অস্ট্রোমার্কসিজমের বিড়ম্বনা', 'মন্দিরা', আশ্বিন, ১৩৪৫
২৬. 'হিন্দু ও মুসলিম', 'পরিচয়', শ্রাবণ, ১৩৫৩
২৭. 'হিন্দু ও মুসলিম', 'পরিচয়', ফাল্গুন, ১৩৫৩
২৮. 'ধনিকের আর্বিভাব', (মার্কস-এর অনুবাদ), 'চতুরঙ্গ', পৌষ, ১৩৪৫
২৯. 'শিল্পে বস্তুনিষ্ঠা' (এঙ্গেলস্-এর অনুবাদ), 'সাহিত্যপত্র' মাঘ, ১৩৫৫
৩০. 'চক্ষুষা কাণঃ', 'সাহিত্যপত্র', কার্তিক, ১৩৬০
৩১. 'আধুনিক বাংলা কবিতা' একই নামের বই, সম্পাদনা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও

আবু সয়ীদ আইয়ুব, কলকাতা, ১৩৪৬, জুলাই ১৯৪০; এর দ্বিতীয় ভূমিকা

৩২. 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে', 'পরিচয়', পৌষ, ১৩৬২

৩৩. ঐ, পুনর্মুদ্রিত, 'সাম্প্রত' পত্রিকা, হীরেন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' অংশে কিছু লেখা যুক্ত করেছেন

৩৪. 'বিদায় বিষ্ণু দে', 'পরিচয়' কার্তিক ১৩৮৯
মূল রচনাটি ইংরেজিতে 'নিউ এজ'-এ বেরিয়েছিল। এটি দেবেশ রায়-কৃত অনুবাদ

৩৫. 'চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর মুক্তিস্নান', 'এবং এই সময়', বিষ্ণু দে স্মরণ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৬

৩৬. 'আমাদের ইতিহাস', স্বাধীনতা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০

৩৭. 'প্যারিস ১৯৪৪', পরিচয়, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫১

৩৮. 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ', পরিচয়, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৭-৫৮

৩৯. 'কয়েকটি সোভিয়েট বই', দিগন্ত পত্রিকা

৪০. 'ভারত আবিষ্কার', দৈনিক স্বাধীনতা

৪১. 'ফুটবল প্রসঙ্গে', দৈনিক স্বাধীনতা

৪২. 'আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববিরাজ', সাহিত্যপত্র, কার্তিক, ১৩৫৭

৪৩. 'বাঙালীর ইতিহাস', সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৭

৪৪. 'কেরলে কয়েকদিন', সাহিত্যপত্র, বৈশাখ, ১৩৬১

৪৫. 'মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য', সাহিত্যপত্র

৪৬. 'সাহিত্যপত্র' ও স্বদেশজিজ্ঞাসা, সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৬১

৪৭. 'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব', পরিচয়, শারদীয়া ১৩৬৫

৪৮. 'সাহিত্যে শাসন', পরিচয়, আশ্বিন ১৩৬৬

৪৯. 'ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল', 'পরিচয়, মাঘ, ১৩৬৬

৫০. 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ', পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৬৮

৫১. 'ইন্দ্রপাত', সাহিত্যপত্র, ১৩৬৭

৫২. 'অল্পে সুখ নেই', সাহিত্যপত্র, ১৩৭০

৫৩. 'গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে', নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে (১৯৪৮) ভাষণের অনুলিপি

৫৪. 'কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ', প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬১

৫৫. 'সার্বভৌম কবি', গোপাল হালদার-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' (ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬১) বইয়ের জন্য লেখা।

৫৬. 'কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম,' পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ১২৫ বিশেষ সংখ্যা, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯৩

৫৭. 'রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা'; রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনের রচনা, ১৯৮৬

৫৮. 'নব্বই পেরিয়ে', কালান্তর, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯৭

৫৯. 'উদ্বোধনী ভাষণ'; সার্দ্ধশতবর্ষের আলোকে কমিউনিস্ট ইস্তাহার স্মরণিকা, ষষ্ঠ বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্মেলন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, ২৮-৩০ মার্চ, ১৯৯৮ রচনার নাম 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার : মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি।
৬০. 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৭০
৬১. 'ভারতবর্ষ ও মানবিকতা', পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৭১
৬২. 'বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা', পরিচয়, শারদীয়া ১৩৭৭
৬৩. 'জওয়াহরলালজী নেহরু, পরিচয়, আষাঢ়, ১৩৭১
৬৪. 'মঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে', পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২
৬৫. 'যে মস্তকে ভয় নাই লেখা', পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৭৩
৬৬. 'ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম', মূল্যায়ন, ৭ সংখ্যা, ১৩৭২
৬৭. 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা', মূল্যায়ন, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫
৬৮. 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং', নতুন পরিবেশ, শারদীয়া ১৩৭৩
৬৯. 'সমাজ শিল্প সাহিত্য', কালান্তর, শারদীয়া, ১৩৭৭
৭০. 'দুর্বল সংশয় হোক অবসান', সপ্তাহ, শারদীয়া, ১৩৭৭
৭১. 'গান্ধীজী', কম্পাস, শারদীয়া, ১৩৭৬
৭২. 'ভারত চেতনা', সমাজবাদ ও মানবিকতা', অমৃত, সাপ্তাহিক, শারদ ১৩৭৭
৭৩. সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু, বেতার জগৎ, শারদীয়া, ১৩৮০
৭৪. 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' কালান্তর, শারদীয়া, ১৯৮৯
৭৫. 'মার্কসচিন্তা, গান্ধীজী, ভারতবর্ষ; ভারত-জি ডি আর মৈত্রী সমিতির পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৭
৭৬. 'ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী', নক্ষত্র, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৯
৭৭. 'সোভিয়েট নব প্রবোধন প্রসঙ্গে', দেশ, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৭৮. 'বিপ্লব : সংকট নয়, চাই সন্ধান, শুদ্ধি সংকল্প', চতুরঙ্গ, নভেম্বর, ১৯৮৯
৭৯. 'সংকটেরই কল্পনাতে হ'য়ো না ম্রিয়মান', কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, জুন, ১৯৮৯
৮০. 'চরৈবেতি চরৈবেতি', পরিচয়, শারদীয়া, ১৯৮০
৮১. 'প্রগতি লেখক সংঘ : স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ', পরিচয়, শারদীয়া, ১৯৮৬
৮২. 'কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব', এক্ষণ, কার্ল মার্ক্স সংখ্যা, ১৯৬৮
৮৩. 'ধর্ম ও সমাজবিপ্লব', দেশ, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯১
৮৪. 'কলকাতা : কিছু ভাবনা', দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৯
৮৫. 'সংস্কৃতের ভূমিকা বিষয়ে', দেশ ১০ অক্টোবর, ১৯৮৭
৮৬. 'দেশাভিমানী রামমোহন', রামমোহন স্মরণ গ্রন্থের লেখা, প্রকাশক রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি
৮৭. 'স্বাধীনতার স্বাদ, সাম্প্রদায়িকতার শাস্তি, সংহতির সন্ধান' কালান্তর শারদীয়া, ১৯৮৭
৮৮. 'রবীন্দ্রনাথ : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৮

৮৯. 'রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণ মহিমা', যুগান্তর, শারদ সংকলন, ১৪০৩
৯০. 'বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব', বাংলা আকাদেমির পঞ্চম বর্ষপূর্তি ভাবনা, ১৯৯১
৯১. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', নন্দন
৯২. 'প্রগতি সাহিত্যে শিবির ম্লান, কুণ্ঠিত, স্তিমিত কেন', কালান্তর, শারদীয়া, ১৩৯৫
৯৩. 'সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ', নন্দন
৯৪. 'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর', নন্দন, জানুয়ারি, ১৯৯৩
৯৫. স্বাদেশিকতা ও কম্যুনিজম, পাক্ষিক বসুমতী, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
৯৬. 'নাই নাই ভয়' : কিউবার অমৃতমন্ত্র, পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৯৯
৯৭. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, নন্দন, শারদীয়া ১৯৯৪
৯৮. 'ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়', পাক্ষিক বসুমতী, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩
৯৯. পূর্বজগৎকে জাগাতেই হবে, পাক্ষিক বসুমতী, এপ্রিল, ১৯৯১
১০০. মস্কো নভেম্বর ১৯৮৭, পাক্ষিক বসুমতী, ১ মে ১৯৯৩
১০১. আফগানিস্তান 'সোভিয়েত এশিয়া', পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯২
১০২. নববর্ষ নব শতাব্দী, পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ অক্টোবর ১৯৯৩
১০৩. 'সভ্যতার সংকট' ও জগতের যন্ত্রণা, দেশ, ২ জানুয়ারি ১৯৯০
১০৪. পাশ্চাত্যের অধঃপাত আর গণতন্ত্রের ভাঁওতা, শারদীয়া দৈনিক বসুমতী, ১৯৯১
১০৫. মার্কস, মার্কসবাদ এবং আমরা, নন্দন, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৩
১০৬. স্ট্যালিন, ধর্ম, মার্কসবাদ। পাক্ষিক বসুমতী, ১৯৯৩
১০৭. নভেম্বর বিপ্লব : মনুষ্যত্বের পরাভব নেই, পাক্ষিক বসুমতী, নভেম্বর ১৯৯২
১০৮. 'গণনাট্যকর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ' গণনাট্য, ১৯৯০
১০৯. 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়', চতুরঙ্গ, জুন ১৯৯০
১১০. ইতিহাসের মহাকাব্য, ১৯৯১
১১১. 'আফ্রিকা' মুক্তিপথে কাঁটা—আশা ও আকাঙ্ক্ষা
১১২. 'সভ্যতার সংকট' ও জগতের যন্ত্রণা
১১৩. 'আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র', কোরক, ১৯৯৬
১১৪. সাংবাদিকতা, সাহিত্য; স্বদেশ মুক্তি ১৯৯৩
১১৫. 'পদ্মানদীর মাঝি : সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে'।
১১৬. 'প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে', 'পরিচয়' মাঘ-চৈত্র, ১৪০৩
১১৭. 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ', ১৯৯৭
১১৮. ইনকিলাব জিন্দাবাদ, শারদীয়া কালান্তর, ১৩৯৬
১১৯. 'ইতিহাস এক নিষ্ঠুর দেবতা'
১২০. স্বাধীন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা

১২০ক. দুনিয়ার দখল নেবে দলিতের দল, ঐকতান
১২১. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান
১২২. রাধারমণ মিত্র : বিস্মৃত অসামান্য মানুষ
১২৩. আম্বেদকর স্মরণে
১২৪. আবুল হালিম স্মরণে, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০৫
১২৫. 'জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে,' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস -এর পূর্বে পার্টির রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা, ডিসেম্বর ২০০১ লিখিত, প্রকাশ ২০০২
১২৬. গণতন্ত্রের সার্থক পরিণতি সাম্যবাদে ২০০১
১২৭. সাম্যবাদ : 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ', কালান্তর শারদীয়া, ২০০০
১২৮. সহস্রাব্দ পূর্তি, সাম্যবাদ ও ভবিষ্যৎ, ১৯৯৯
১২৯. ভিড় করে আসে কিছু স্মৃতি, পরিচয়, সেপ্টেম্বর, ২০০০
১৩০. ভাবনা দুর্ভাবনা, গণশক্তি, শারদীয়া ২০০২
১৩১. একুশের ভাবনা। ফেব্রুয়ারি ২০০০
১৩২. চিত্তপ্রসাদের স্মরণে, চিত্তপ্রসাদ শিরোনামের গ্রন্থের জন্য লেখা, জানুয়ারি ২০০২
১৩৩. ২২শে শ্রাবণ, ১৪০৮, আগস্ট ১৯৯৮
১৩৪. বঙ্কিম-গরিমার উত্তরাধিকার, বঙ্গদর্শন, ১৯৯৮
১৩৫. কেন লিখি? ১৯৯৮
১৩৬. মহাচীনের জয়যাত্রা, 'পরিচয়' মাঘ, ১৩৫৫
১৩৭. ইতিহাসের বিচার, 'পরিচয়', ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬১
১৩৮. তারাশংকরবাবু, 'পরিচয়' বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৫
১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েট দেশ, দৈনিক কালান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০
১৪০. ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক জর্জি দিমিত্রভ, দৈনিক কালান্তর ১২ জুন, ১৯৮২
১৪১. সোমনাথ লাহিড়ী স্মরণে, দৈনিক কালান্তর ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
১৪২. পার্টি কংগ্রেস সার্থক হোক, দৈনিক কালান্তর, ২৪ মার্চ ২০০২
১৪৩. বুশ ব্লেয়ারের দর্প-দম্ভ-দাপটকে দলন দুনিয়ার দায়, দৈনিক কালান্তর, ৬ এপ্রিল, ২০০৩
১৪৪. মঙ্গলাচরণ চলে গেলেন, দৈনিক কালান্তর, ২৭ এপ্রিল, ২০০৩
১৪৫. দস্যু চুড়ামণি বুশ ব্লেয়ারের দর্প চূর্ণ করুক দুনিয়ার বিবেক, দুনিয়ার জনতা, দৈনিক গণশক্তি, ২৩ মার্চ, ২০০৩
১৪৬. জওয়াহরলাল নেহরু : আমার চোখে, 'দেশ', ১২ নভেম্বর ১৯০৮
১৪৭. ধরণী গোস্বামী স্মরণে, ইসকাস পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮
১৪৮. ভারত-সোভিয়েট চুক্তির জয় হোক, ইসকাস পত্রিকা, আগস্ট ১৯৮৪
১৪৯. লেনিন ও ভারতের স্বাধীনতা, 'সোভিয়েট সমীক্ষা', ৪ বর্ষ, ৫৯/২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
১৫০. একটি স্মরণীয় দিন সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা, 'সোভিয়েট সমীক্ষা', ৯ বর্ষ, ৩৬-

৩৭, ৯ আগস্ট, ১৯৭৪

১৫১. মানুষ কি পিশাচ হতে চলেছে, শারদীয়া কালান্তর ১৪০৯

১৫২. সংসদীয় ব্যবস্থা, সমাজ রূপান্তর, কমিউনিস্ট ভূমিকা, শারদীয়া কালান্তর ১৪০৮

১৫৩. পরাধীনতার অভিশাপ মোচন এখনও দূর হয়নি, শারদীয়া কালান্তর ১৪০৪

১৫৪. জানিয়ে দাও তুমি ভয় পাওনি, শারদীয়া কালান্তর ১৪০২

১৫৫. দেশব্রতী প্রাজ্ঞ প্রগতিপ্রয়াসী ক্ষিতীশপ্রসাদ, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০১

১৫৬. দেশব্রতী বিজ্ঞান সাধক মেঘনাদ সাহা, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০০

১৫৭. রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্মরণে, শারদীয়া কালান্তর ১৩৯৯

১৫৮. আজকের দুনিয়া নিয়ে কিছু ভাবনা, শারদীয়া কালান্তর ১৩৯৮

১৫৯. কবি স্মৃতি : লন্ডনে, সাপ্তাহিক কালান্তর ১১ মে, ১৯৬৩

১৬০. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পঞ্চাশ বছর, সাপ্তাহিক কালান্তর ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৯

১৬১. স্বাধীন মঙ্গোলিয়ার ষাট বছর, সাপ্তাহিক কালান্তর; ৪ এপ্রিল, ১৯৮১

১৬২. রবীন্দ্র মহিমা স্মরণ করে, সাপ্তাহিক কালান্তর, ৯ মে, ১৯৮১

১৬৩. হাভানা অভিমুখে : জোট নিরপেক্ষতা সমস্যা ও সম্ভাবনা, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

বিয়োগপঞ্জি

শিশিরকুমার দাস

ভোর হয় হয়। হাইড্র্যান্টে জল এসেছে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে গুমটি ছেড়ে প্রথম ট্রাম কোমর দোলাতে দোলাতে চলছে। এমনই সময় দক্ষিণ কলকাতার একটি ছাপাখানার গুমোট ঘর থেকে চারটি তরুণ সদ্যছাপা কয়েক কপি বই বুকে চেপে কারামুক্ত কয়েদির মতো দে-ছুট দে-ছুট। তাদের জামায় মলাটের কাঁচা রং লেগে যাচ্ছে। বই ঠিক নয়, একটি বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। নাম—'একতা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্র। সে বছরের সম্পাদক—আমার সহপাঠী শিশির। শিশিরকুমার দাশ। ওই সকালের দৌড়বাজদের একজন।

সহাধ্যায়ীদের সবাইকে হারিয়ে সে যেমন বি এ ও এম এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিল, তেমনি সেই সকালের ছুটন্ত অশ্বদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই জীবনের নশ্বর সড়ক পেরিয়ে কোন অর্ফিয়ুসের বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে না-ফেরার দেশে চলে গেল। আর, আজ সকালে যেই সংবাদ প্রতিদিন-এর সাপ্তাহিক কলম গত সাড়ে সাত বছরের মতো নিয়মমাফিক লিখতে বসেছি, সামনে চোখ মেলতেই বইয়ের তাক থেকে তাঁর প্রথম, কৃশ ও লাজুক চেহারার কাব্যগ্রন্থ 'জন্মলগ্ন' একটু উঁকি দিয়ে আমাকে বলে উঠল—'ভালো আছিস, অমিতাভ?' এর পরেও, অন্তত আমার যতটুকু জানা, শিশিরের আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ' ও 'হয়তো দরোজা আছে'। কিন্তু 'জন্মলগ্ন' আমার কাছে শুধু একটি কবিতার বই-ই নয়, কবি শিশিরেরও জন্মলগ্ন। আমরা তখন সবাই ছাত্র। আমাদেরই একজন প্রিয় বন্ধু অনেক কবিতা লিখেছে আর সে-সবের ভেতর থেকে বাছাই করে পুরো একটি গ্রন্থও ছেপে ফেলেছে, এই আনন্দ ও বিস্ময়ের স্বাদই ছিল আলাদা।

একজন কবি লিখেছিলেন—"আমরা তখন সবাই প্রেমিক, সবার বয়স অল্প।" আমাদেরও এরকম একটা জীবন-পর্যায়ে হঠাৎ শিশির এক বিকেলে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকজনের কাছে প্রস্তাব রাখল—সে একটি প্রেমের কবিতা-সংকলন প্রকাশ করতে চায়। প্রশ্ন করা হল—সেখানে কাদের কবিতা থাকবে। শিশির বলল, "যে-সব কবি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গিয়েছেন বা যাঁরা এখনও ছাত্র, তাঁদের।" প্রস্তাব তো নয়, যেন তপ্ত তাওয়ায় ঘি। সবাই হইহই করে উঠলাম। শিশিরের নেতৃত্বে কবিতা ঝাড়াই-বাছাই শুরু হল। সঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতি-চর্চায় অগ্রণী ব্যক্তিত্ব সুধীর চক্রবর্তী, আমাদেরই আর এক সহপাঠী, তখন বড় বড় কবিতা লিখত। 'কথা বল, কথা বল, বিশ্বরমা উভয়ভারতী'—তার একটি দীর্ঘ কবিতার ওই প্রথম পঙক্তিটি আজও আমার মনে আছে। শিশিরের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি মদত দিয়েছিল সুধীর। মাসদুয়েকের মধ্যেই আমাদের মুখ আলো করে বেরিয়ে গেল ওই প্রেমের কবিতা সংকলন—'অমৃতযন্ত্রণা'।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তখন ছিলেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। বিশাল পণ্ডিত, হৃদয়বান মানুষ, খানিকটা সাত্ত্বিক গোছের। আমাদের প্ররোচনায় দুরুদুরু বুকে শিশির তাঁর হাতে একটি কপি দিয়ে এল। তারপর আর পায় কে? বই পৌঁছে গেল বাংলার অধ্যাপকদের ঘরে প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছে। আর কে না জানে, স্নেহ সর্বদাই নিম্নগামী। তা না হলে বিশীমশাইয়ের মতো অমন ডাকসাইটে সাহিত্যিক ও অধ্যাপক কেনই-বা 'অমৃতযন্ত্রণা' প্রকাশের মাসদুয়েক যেতে না যেতেই তখনকার 'চতুরঙ্গ'-র মতো অভিজাত সাহিত্য পত্রিকায় সংকলনটির লাগামছাড়া প্রশংসা করে লিখে ফেললেন পাতা চারেকের একটি নিবন্ধ।

শুধু তাই নয়, এই অধমের একটি চার লাইনের কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি উল্লেখ করে এমন প্রশংসা-বচন করলেন তাঁর মোহিতলালি ভাষায়,......"অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা'—এই ছত্রে এ যুগের যৌবনের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত। সেই রূপটিকে স্বীকার না করিয়া লইলে এ যুগের নবীন কবিদের কাব্য বোধহয় বুঝিয়া ওঠা সম্ভব নয়। ...তরুণ কবি সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমুন্য, উত্তরা তাঁহার মানসপ্রতিমা, প্রেম কাব্য সেই অন্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। সম্প্রতিকালে লিখিত নবীন কবিদের প্রেমের কবিতা পড়িয়া একটি অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় একজন নবীন কবির কাব্যে ঐ ছত্রটি পাইলাম, মনে মনে বলিলাম যাঁহাদের ব্যথা তাঁহারাই ভাষা দিয়াছেন, আমার দায় অনেক কমিয়া গেল।" বলা বাহুল্য, তাঁর ওই লেখায় আমার কবিতাটি উপলক্ষ ছিল মাত্র, আসলে আমাদের সময়ের গোটা কবিকুলের অনুভূতিকেই তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। আর সবার আগে শিশিরের নাম তো বলতেই হয়, কারণ সে-ই উদ্যোগী হয়ে কবিদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রণয়-গাথাগুলিতে এক বহুবর্ণ ফুলের তোড়ায় বেঁধেছিল।

নির্দিষ্ট বছর পরীক্ষা না দিয়ে পরের বার এম. এ পাশ করে আমি চলে গেলাম ধানবাদের সদ্য গড়ে ওঠা একটি কলেজে পড়াতে, আর, আমার সহাধ্যায়ীরা মুঠো খোলা খইয়ের মতো সঙ্ঘ ভেঙে যে-যার মতো ছড়িয়ে পড়ল এখানে-ওখানে। তবে, বাংলায় আগেকার কৃতী ছাত্রদের ফলাফলের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে শিশির সোজা চলে গেল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকি ও এশীয় বিদ্যাচর্চার অধ্যাপনা করতে। ওই মহার্ঘ সংবাদটি শুনে তাঁর প্রতিটি সহপাঠী বন্ধুর বুক ফুলে সেদিন দশহাত হয়ে গিয়েছিল, এ-আবেগটুকু এই বয়সেও আমি প্রকাশ করা সঙ্গত বলেই বোধ করি। মার্কিন দেশে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল ভাষাবিজ্ঞানের পাঠও নিয়েছিল শিশির।

না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সেরা ছাত্র শিশিরকে কলকাতা কোনওদিনই অধ্যাপক হিসাবে পায়নি। কেন, সেই বিড়ম্বনাময় প্রশ্নটির উত্থাপন করে লাভ নেই, কারণ, শিশিরও আর আমাদের মধ্যে নেই। সে আজীবন তাঁর পঠনপাঠনচর্চা ও কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে, যেখানে আধুনিক ভাষা বিভাগে অধ্যাপনার সূত্রে সে ভারতবিদিত হয়ে ওঠে। থাকত প্রবীণ রোডে অধ্যাপক কোয়ার্টারে, শেষদিকে নতুন বাড়ি করে ওই দিল্লিতেই অন্য অঞ্চলে উঠে যায়। দিল্লিবাসী শিশির বহুবার কলকাতায় এসেছে।

অনেক সেমিনারে খালি ওকে দেখতে এবং ওর আলোচনা শুনতে গিয়ে হাজির হয়েছি। কাজে-অকাজে দিল্লিতে গিয়ে বারদুয়েক শিশিরের কোয়ার্টারেও জমিয়ে আড্ডা মেরেছি। শেরপা-র দক্ষতায় ছোট থেকে মেজো, মেজো থেকে বড় শৃঙ্গ জয় করে খ্যাতির চুড়োয় উঠে যাওযা শিশিরের মধ্যে কিন্তু পরিচয়ের প্রথম পর্বের মতো শেষেও আচরণে কোনও আড় পাইনি। আদ্যন্ত বিনয়ী ও মার্জিত এই মানুষটি খোলস ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত তার সাবেক বন্ধুদের সামনে, প্রশ্রয়লালিত-আতিথ্য দিত।

অথচ, এক নীতিদীর্ঘ জীবনে কী-ই না করে গিয়েছে শিশির, ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। ইংরেজিতে চারটি গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে তার—"The Shadow of the Cross', 'Western Sailors', 'Eastern Seas' এবং "Pundits and Munshis'। উইলিয়াম কেরি থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : প্রথম পর্বের বাংলা গদ্য নিয়ে গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি পায় শিশির। বাংলা ছোটগল্পের উপর আলোচক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি. ফিল খেতাব দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপরে তার একটি অনবদ্য গ্রন্থপাঠের সুযোগ পাই—'An Artist in Chains'। আর এসবেরই পাশাপাশি সর্বভারতীয় সাহিত্যের মহাকাব্যপ্রতিম ইতিহাস সে লিখে গিয়েছে। সাহিত্য অকাদেমি থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'English writings of Rabindranath Tagore'-এর মতো, আমাদের সবার পক্ষে জরুরি একটি গ্রন্থ।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যে-রসিকতা করে লিখেছিলেন, সেই "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত", তা কখনওই কব্জা করতে পারেনি আমাদের শিশিরকে। উল্লিখিত যাবতীয় মহান প্রয়াসের পাশাপাশি সে সাবলীল ঝরনাকলমে লিখে গিয়েছে শিশু ও কিশোরদের জন্য একটির পর একটি চমৎকার বই, একটির পর একটি নাটক ও অনুবাদ-নাটক। তার তিনটি নাটক—'আকবর-বীরবল', 'বাঘ' আর 'সোক্রাতেসের জবানবন্দী' নাট্যরসিকদের রীতিমতো প্রশংসা অর্জন করেছিল।

সৃজন থেকে গবেষণা—এই বিস্তৃত, আয়তনবান প্রান্তরে সারাজীবন ভ্রাম্যমাণ শিশির সাড়ে তিন হাত দেহ একজন্মে অনেক শিশিরকে সংলগ্ন করেছিল, যাদের মধ্যে বস্তুত কোনও ব্যবধান বা দূরত্ব ছিল না। আমার দেখা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ওই এক এবং একক শিশিরকে শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্মরণ করতে পেরে বহুকাল পর ভাল লাগছে, বড্ড ভাল লাগছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্মৃতির সূত্রে ধনঞ্জয় দাস
মিহির সেন

কবি, প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিক কর্মী ধনঞ্জয় দাসের জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ অধুনা বাংলাদেশ খুলনার কালিকাপুর গ্রামে। মৃত্যু কলকাতার নিজস্ব আবাসে—৫ মে ২০০৩-এ। আনুপাতিক বয়স বিচারে তাই এই মৃত্যুকে অকালপ্রয়াণ বলা যায় না। অবশ্য যে কোনও মানুষ স্মরণযোগ্যতা অর্জন করে বয়স নয়, তার সারা জীবনের অবদান দিয়ে।

সেদিক দিয়ে এক কর্মময়, বর্ণময় জীবনযাপন করে গেছে ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪৮ সাল নাগাত। দু'জনই তখন কলেজের ছাত্র। দু'জনই দেশ বিভাগের বেদনা নিয়ে ভেসে এসেছি, ঠাঁই নিয়েছি কলকাতায়। একজন দিনাজপুর থেকে, অন্যজন খুলনা।

সেই থেকে আজীবন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রাজনীতি, সাহিত্যের সহমর্মী, সহযাত্রী হিসেবে। পারিবারিক সূত্রেও। সেও তো কম সময় নয়। অর্ধ-শতাব্দীর বেশি। ধনঞ্জয় প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলে তাই ব্যক্তিগত এলোমেলো টুকরো স্মৃতি মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ধনঞ্জয় একই সঙ্গে ছিল অনমনীয় রাজনৈতিক কর্মী, অনলস সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, পরিশ্রমী সংগঠক।

মার্কসবাদে দীক্ষা ছাত্র-জীবনেই। খুলনার দৌলতপুর কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিল। প্রথম কারাবাসের অভিজ্ঞতাও সেই পর্বেই। ১৯৪৫ সালে বন্দী আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে। তারপর একাধিকবার।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিল ১৯৪৮ সালে। পরের বছরই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল। কেননা কমিউনিস্ট পার্টি তখন 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'' ঘোষণা করে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছে। অনেক কমরেডের সঙ্গে ধনঞ্জয়ও গ্রেপ্তার হল। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকতে হল বিনা বিচারের বন্দী হিসেবে। দেশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ও বাংলায় তখন মুসলিম লীগ সরকার। সেখানেও আবার কারাবন্দী হতে হল কয়েক মাসের জন্য। ১৯৫১ সালে আমাদেরই প্রকাশিতব্য একটি পত্রিকার টাকা সংগ্রহের জন্য খুলনায় গিয়েছিল। পুরোনো নথিপত্রের সূত্রে আবার গ্রেপ্তার। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, খুলনার জেলে নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে কাটাতে হল।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে

প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছি ধনঞ্জয় কী গভীর নিষ্ঠা আর দৃঢ়তার সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রেই সমান সক্রিয়।

সাহিত্যচর্চার শুরু কবিতা দিয়ে। প্রগতিশীল নামা খ্যাত পত্র-পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত কবিতা লিখত। কবি হিসেবে খ্যাতিও অর্জন করেছিল। ওর তিনটি কবিতা-গ্রন্থ-সরসন্ধান, পালাতে পারি না, নির্বাচিত কবিতা পাঠক সমালোচকদের স্বীকৃতিও লাভ করেছিল।

একই সঙ্গে গদ্য বা প্রবন্ধ রচনাতেও ওর দক্ষতার প্রমাণ—মণীন্দ্র রায়, কবি ও কবি-ব্যক্তিত্ব, রাধারমণ মিত্রঃ অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব। গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা—ভারতের জাদুঘরে, প্রোগেসিভ কালচারাল মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, টেরাকোট্টা অব পাঁচমুড়া : প্রাইমেরি ইনভেস্টিগেশন এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও ওর নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। আমি ও ধনঞ্জয় যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলাম—কবিতা-সংকলন মহাচীন ও গল্প সংকলন প্রতিবাদের গল্প। এ ছাড়াও নানা ধরনের পত্রিকা বা গ্রন্থ সম্পাদনার সঙ্গে নানা সময়ে যুক্ত থেকেছে। ওর নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশিত—মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, বস্তুবাদী সাহিত্য-বিচার ও অন্যমত আর বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, মার্কসবাদী সাহিত্য শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে যে এক অপরিহার্য আকর-গ্রন্থ হয়ে থাকবে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পরিচয় পত্রিকার একজন সক্রিয়কর্মী হিসেবে যোগদান করেছিল ১৯৪৯ সালে। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও গল্পকার সুশীল জানা তখন পরিচয়ের দায়িত্বে। সেই থেকে আমৃত্যু পরিচয়-পরিবারের একজন ছিল। ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এ পরিচয়ে গর্বিত ছিল চিরদিন।

একই সঙ্গে সাংবাদিকতাও করেছে কিছুদিন। 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকায়।

পার্টির প্রত্যক্ষ কাজ ছাড়াও নানা সংগঠনের সঙ্গেও নানা সময়ে যুক্ত ছিল। প্রগতি লেখক সংঘ, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, জাতীয় সংহতি পরিষদ, শিল্পীচিত্র, সাহিত্য সমবায় ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানে ওর ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে ধনঞ্জয়কে দু'বার মানসিক আঘাত পেতে দেখেছি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি খণ্ডিত হবার সময়, আর সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর। মনে মনে এতে বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্তু আদর্শচ্যুত হতে দেখিনি। ও থেকে গিয়েছিল সি. পি. আই-তেই। আজীবন সেই পার্টির সদস্যপদ বজিয়ে রেখেছে।

নিজের আদর্শের ক্ষেত্রে ধনঞ্জয় ছিল অনমনীয়। চিরদিনই স্পষ্টবক্তা। মাঝেমাঝে রূঢ়-ভাষীও মনে হয়েছে। সতর্ক করলেও শুনত না। পরে বুঝেছিলাম, নিজের আদর্শের প্রতি তীব্র ভালবাসাই এর কারণ।

বিপরীতে ছিল অসাধারণ বন্ধুবৎসল। বন্ধুদের আপদে-বিপদে সবসময় পাশে আছে। বন্ধুদের সাফল্যে খুশি হতে দেখেছি। বিচ্যুতিতে বেদনার্ত।

বাইরের এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পারিবারিক কর্তব্যের ক্ষেত্রেও ছিল সতত সজাগ। মাঝে মাঝে দেখে অবাক হতাম।

ধনঞ্জয়ের একটি কবিতার কিছু অংশ সেদিন নজরে পড়ল।—'আমার বুকের গভীরে/কিছু ছাই-চাপা আগুন/এখনও লুকিয়ে রেখেছি/তোমরা নেবে ভাই?/তাপটা যাই যাই করছে/আইনের আড়ালে পড়ন্ত সূর্যের মত।'

মানুষকে ভালবেসে, জীবনকে ভালবেসে জীবনের এই উত্তাপ বজিয়ে রেখেই বিদায় নিয়েছে ধনঞ্জয়। শুধু তাই নয়, প্রবল প্রত্যাশায় সেই উত্তাপ পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যেতে চেয়েছে। এ তো সহযাত্রী আমাদেরও গর্ব।

তাই ধনঞ্জয়ের মৃত্যুতে শোক নয়, ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

PARICHAY February-July 2003 Reg. No. 13273 WB/EC–265

পরিচয়

দাম ঃ একশো টাকা

শারদীয়

পরিচয়

১৪১০

জাতীয় সংহতি

..."ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্য সাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অংক কসানো, সায়ন্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৪৩১৭/২০০৩

বালি পৌরসভা

৩৮৪, জি. টি. রোড, বালি, হাওড়া

বর্তমান কার্যালয় ঃ ৫, গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া

"বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তে যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান; তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অরুণাভ লাহিড়ী
উপ-পৌরপ্রধান

কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা
পৌরপ্রধান

মুহূর্তের অসতর্কতা
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড

গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন—

★ বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ত্রুটিমুক্ত রাখুন।

★ অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না।

★ তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন।

★ আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর দিন।

★ অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপক সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৪৩১৭/২০০৩

পরিচয়

আগস্ট-অক্টোবর ২০০৩
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১০
১-৩ সংখ্যা ৭৩ বর্ষ

স্মৃতিআলেখ্য

স্মরণলেখ

প্রবন্ধ

রম্যরচনা

অগ্রন্থিত গল্প

গল্প

মহেশতলা পৌরসভা

মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সি. এম. ডি. এ. আই. পি. পি. এইট প্রকল্পের অর্থানুকূল্যে নির্মিত পৌরসভার মাতৃসদন চালু হয়েছে। এই হাসপাতালে শিশু ও স্ত্রী রোগের বহির্বিভাগ সহ ২০টি শয্যা ও ৪টি কেবিন আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বহির্বিভাগ সহ সাধারণ প্রসব, ফরসেপস্ ও সিজারিয়ান প্রসব সমেত প্রাক প্রসব ও প্রসব পরবর্তী চিকিৎসার এবং প্রতিষেধক ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মাতৃসদনে পরিষেবার জন্য প্রদেয় ফি—

		বেনিফিসিয়ারী	নন-বেনিফিসিয়ারী
১।	আউটডোর টিকিট	১০ টাকা	২৫ টাকা
২।	ভর্ত্তি ফি	১০ টাকা	২৫ টাকা
৩।	বেড চার্জ্জ	১০ টাকা	২৫ টাকা
৪।	নর্মাল ডেলিভারি	৪০০ টাকা	৮০০ টাকা
৫।	নর্মাল ডেলিভারি উইথ এপিসিওটমি	৬০০ টাকা	১০০০ টাকা
৬।	ফরসেপস্ ডেলিভারি	৮০০ টাকা	১২০০ টাকা
৭।	সিজারিয়ান অপারেশন ডেলিভারি	২৫০০ টাকা	৪০০০ টাকা
৮।	অন্যান্য মাইনর অপারেশন	১০০০ টাকা	১৫০০ টাকা
৯।	অন্যান্য মেজর অপারেশন	২০০০ টাকা	৫০০০ টাকা

মহেশতলা পৌরসভার ব্যানার্জীহাট, মহেশতলায় নবনির্মিত উৎপল দত্ত মঞ্চ চালু হলো। এলাকার সাংস্কৃতিক সংগঠন/প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংগঠনের ব্যবহারের জন্য অত্যাধুনিক এই মঞ্চ অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ভাড়া দেওয়া হবে। ইচ্ছুক সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে বিশদে জানার জন্য পৌরসভায় যোগাযোগ করতে হবে।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে পরিষেবায় নিয়োজিত করতে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি।

কালী ভাণ্ডারী
পৌরপ্রধান
মহেশতলা পৌরসভা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ছোটো থেকে বড়ো হওয়া

প্রণব বিশ্বাস

'দুঃখিনীর পোড়া কপালে
লালটিপ
আমাকে অন্ধকারে আলো দেখায়
আমি নতজানু হই
সারবাঁধা
ক্ষুদেক্ষুদে পিঁপড়ের কাছে—
আর
খোদার কাছে দোয়া করি
যেন তাদের পাখা না ওঠে
ছেঁড়া পাড় থেকে রঙিন সুতো
খসিয়ে নিয়ে
একটা তুচ্ছ ছুঁচ
পুরোনো কাপড়ে ফুল তুলে
নতুন কাঁথা বোনে
মাঘের শীতে
আমি গুণকীর্তন করি
শীর্ণদেহ সেই ছুঁচের
আমি প্রার্থনা করি
বল্লমের ফলা হয়ে
যেন তা কারো বুকে না বেঁধে।।'

খ্যাতি-প্রতিষ্ঠায় ঢাকা না-পড়া এই এক মানুষ। অথচ খ্যাতি এসেছিল পরিপূর্ণ যৌবনে পা দিয়ে দাঁড়ানোরও ঢের আগে, সেই ১৯৪০-এ। বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বৃত্তির টাকায় কবিতা ভবন থেকে বেরুল চটি একটা বই। *পদাতিক।* বত্রিশ পৃষ্ঠার বইয়ে তেইশটি কবিতা সংকলিত। 'কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?' কিংবা 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা' সেই চল্লিশেই প্রবাদ হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। কবির বয়েস সবে একুশ। স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এ অনার্সের ছাত্র। বইটি ছেপে বেরুনোর পর বুদ্ধদেব বসুকে লিখতেই হল, '...বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।' তাঁর মনে হল,—

অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তিনি এখন

> কবিকনিষ্ঠ। কিংবা নিছক এ-কারণেও নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব, যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে-পদেই চমক লাগায়।...
> সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি, প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিলো। দ্বিতীয়ত কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্য রচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে ব'লে মনে করি।

আমাদের মনে রাখা ভালো ১৯৪০-এ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে। এ বছরেই বেরিয়েছে তাঁরও দুটি কাব্যগ্রন্থ *সানাই* আর *রোগশয্যায়*। নজরুল তখনো সৃষ্টিশীল। আর বাংলা কবিতার উজ্জ্বল নক্ষত্র তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সমর সেনেরা। সলতে পাকানো পর্বের একটি ঘটনার কথা জেনেছি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণার সূত্রে। এখানে তার একটু উল্লেখ করি। কৃষ্ণনগর থেকে সুভাষ, দেবীপ্রসাদকে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় পৌঁছে দেবার জন্য। একটা খাম খুলে খামের ভেতরের যে জায়গাটা হয়, তাতে খুদিখুদি করে লেখা। কবিতাটি নিয়ে দেবীবাবু গেলেন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবনে।
এরপর দেবীবাবুর কথায়—

> ...সুধীন দত্ত বসে আছেন, আবু সয়ীদ বসে আছেন বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে। তা কবিতাটা দিয়েছি। বুদ্ধদেব কবিতাটা নিলেন, পড়লেন, কিছু বললেন না। সুধীন- বাবুর হাতে দিলেন। সুধীনবাবু পড়ে বললেন, উনি তো আবার ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলতেন না—My god, this boy is going to beat us।

মাথা তো তখুনি ঘুরে যাবার কথা। কিন্তু ঘোরেনি। সেদিন না, তার পরেও না। আন্তর্জাতিক পরিচিতি। এত পুরস্কার, এত সম্মান। তবু সেই যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন। আটপৌরে সাদাসিধে জীবন, কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার সব উপকরণ তো হাতের কাছেই ছিল তবু প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠলেন না। বরং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিকতার বিপ্রতীপেই থেকে গেল তাঁর অবস্থান। খুব বলতেন 'সাধারণ মানুষ, সাধারণের মতোই চলে যেতে চাই'। এই বলাটা বাইরের কোনো আলগা কথা ছিল না, উঠে এসেছিল বিশ্বাসের গভীরতা থেকেই। যাঁরা তাঁর রোজকার জীবন দেখেছেন শুধু তাঁরাই জানবেন এর সত্যমূল্য কতটুকু।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁকে পদাতিকতায় ভূষিত করার কত আগেই তো তাঁর পথ চলার সূত্রপাত ঘটেছিল। অবিরাম অবিশ্রান্ত সে চলা। নিজেকে প্রশ্ন করতে করতে এগোনো সারাটা জীবন ধরে। এই এক কবি হাঁটতে না পারলে যাঁর কলম চলে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই এক গল্প। রাস্তাই যে তাঁর একমাত্র রাস্তা।

কলকাতা, কলের কলকাতা

১৯৩০। দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, অফুরন্ত খেলার মাঠ, মোরগের ডাকে চোখ মেলে ভোরের

আজান শোনা, সকালে শিউলি বিকেলে বকুল কুড়োনোর আনন্দ। সন্ধ্যায় হাঁসকে ঘরে তুলতে চই, চই ডাক, এইরকম আরো অনেক মাধুরী পিছনে ফেলে এগারো বছরের এক কিশোর এই কলের শহরের এক এঁদো গলিতে এসে দাঁড়াল। আকাশ এখানে চিলতে হয়ে দেখা দেয়, রোদ আসে হাসপাতালের রোগীর পোশাকে। মন বসে না কোথাও। সব যেন কেমন ছাড়াছাড়া। শুধু ফুসমন্তরে সুইচ টিপে ঘরের আলো নেভানো আর জ্বালানোর মজা, কলের মুখ দিয়ে জলের গড়িয়ে পড়া, 'মাটি লিবে গো মাটি' হেঁকে যাওয়া লোকের মুখ, ট্রামের তারে জমে থাকা শিশির বিন্দু, কিংবা ঠোঙা ভরা গরম জিলিপির আস্বাদ কতক্ষণ আর মন ভুলিয়ে রাখতে পারে। কথায় বাঙালে টান, তাই পাড়ার ছেলেরা বন্ধু হয় না, আড়ালে একটু হাসি মস্করাও করে। একদম একা হয়ে যাওয়া সেই এগারো বছরে একটু একটু করে বন্ধুত্ব জমে ওঠে রাস্তার সঙ্গে। 'আকাট দেয়ালগুলো অবশ্য সামনে দাঁড়িয়ে বাদ সাধে। দেয়ালে দেয়ালে চামচিকের মতো কেবলি ঠোকর খেতে থাকে তার চোখ দুটো। ঠোকর খেতে খেতে ঠোকর খেতে খেতে একদিন এক অবাক কাণ্ড! দেয়ালের গায়ে কারা যেন সেঁটে দিয়ে গেছে একটা হাতে লেখা কাগজ। কাগজের এক কোণে যেন কথা কইছে একটা মন্ত্র : বন্দেমাতরম।'

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময় সেটা। আইন অমান্য করে দলে দলে জেলে যাওয়া। পুলিশি নিপীড়নকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মিছিলে মিছিলে হৃদয় কাঁপানো 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। রাইটার্সে অলিন্দ যুদ্ধ। চট্টগ্রামে মাস্টারদা আর তাঁর অসমসাহসী সহযোদ্ধাদের জীবনপণ লড়াই, ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হওয়া ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম আর গান্ধীর ছবি।

খবরের কাগজ তখন বন্ধ। সারাদিন এ-পাড়া, ও-পাড়া, এ-রাস্তা, ও-রাস্তা ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় গ্যাসের আলো জ্বালার আগে বাড়ি ফেরা। পাড়ার বুড়োদের আড্ডায় তখন তার খুব কদর। সবাই বলে পাড়ার গেজেট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে-সব খবর বলে। কোথায় বিলিতি কাপড় পুড়ল, পুলিশ কোথায় লাঠি চালিয়েছে, কে কোথায় ধরা পড়ল, কবে কোথায় পিকেটিং —সব খবর। নেবুতলার মোড়ে টাঙানো হাতে লেখা বুলেটিন থাকত তার কণ্ঠস্থ। সেইসব বুলেটিনে কলকাতার বাইরের খবরও থাকত। এইভাবেই একদিন তার খবরের সঙ্গে নাড়ির যোগ ঘটে গেল। আর সেই সূত্রে অনাত্মীয় গলিতে সে পেল কিছুটা সমাদর।

এমন সময় একদিন। জেলেপাড়া লেনের সরু গলি দিয়ে যখন সে হাঁটছে হঠাৎ একদল ছেলে এসে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। বাঙাল বলে টিটকারি দিল না, বরং খুব নরম করে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কুচকাওয়াজে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলল। এক কথায় রাজি হয়ে গেল সেই কিশোর। কলকাতা, কলের কলকাতা একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাধার দেয়াল সরতে থাকে একটু একটু করে। বাকি সারাটা জীবন তো এই কিশোরকে দেয়াল ভাঙার কথাই বলতে হবে, বলবে, 'বাধার দেয়াল তুলেছ কে? ভাঙো।'

আর একদিন। গ্যাসের আলো জ্বলা পথ দিয়ে সে আসছে। বৃষ্টির জল জমে থাকা এক খোঁদলের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। নিচু হয়ে দেখে মেঘের ফাঁকে চাঁদসুদ্ধু আকাশ সাষ্টাঙ্গে যেন তার পায়ে এসে পড়েছে। যত দেখে তত সে অবাক হয়। দেখে যেন আশ আর মেটে না। 'ব্যস, সেদিন থেকে কলকাতা আমার, আমি কলকাতার।' ভাব হয়ে যায় কলের শহরের সঙ্গে।

কিন্তু এ কোন কলকাতা? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের আরো অনেকদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ১৯৯১তে, সেদিনের সেই কিশোর, আজকের যশস্বী এই কবি যখন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবেন, তখন, তিনি অদ্ভুত একটা শর্তের কথা বলবেন পুরস্কার দাতাদের। এক, পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানটা করতে হবে কলকাতায়, তাঁর পাঠকদের সামনে, আর দুই, পুরস্কারটা তিনি নেবেন বাংলার প্রবীণতম লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাত থেকে। আর পুরস্কারটা হাতে নিয়ে তাঁকে বলতে হবে,—

> ...আমাদের এই শহরের দর্পণে আমি দেখি সারা ভারতের মুখ। এখানকার শান বাঁধানো পাথরে মাথা কুটে যারা বংশ পরম্পরায় কলকাতাকে বড়ো করেছে, আজ বস্তা বস্তা টাকা এসে তাদের মাথা গোঁজার জায়গা, পার্ক, ময়দান, জলাভূমি— সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে। এই হরবোলা শহরে, আসুন আমরা একবাক্যে হাতে হাত বেঁধে এই অধোগতি রোধ করি।

প্রতিবাদ-প্রতিদিন

প্রতিবাদে হাতেখড়ি হয়েছিল সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে। দক্ষিণ কলকাতার এই স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। স্কুল ম্যাগাজিন 'ফল্গু'তে লিখে সুভাষ অনেক প্রশংসা পেয়েছিলেন। শিক্ষকরা ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ। মন বসা বলতে যা বোঝায় এখানে ঠিক তাই হয়েছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন স্কুলের এক সেক্রেটারি। স্কুলে আর আপিসে শিক্ষকে আর কেরানি যে এক নয় কর্তালি করতে আসা ভদ্রলোক সে-কথা বোঝেননি। অনেকটা আজকের মতোই হম্বিতম্বি করে নয়কে হয় করতে গিয়ে বিপত্তি বাড়ল। নিরুপায় হয়ে শিক্ষকরা একদিন স্কুলে আসাই বন্ধ করে দিলেন। ছাত্ররা অনেকেই শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়াল। স্কলারশিপের টোপ এসেছিল সুভাষের কাছে। টোপ গিলতে রাজি না হওয়ায় ওঁর ফ্রিশিপ গেল আর বদলাতে হল স্কুল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আর প্রলোভনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর এই অভ্যাস একবার আয়ত্ব হয়ে যাওয়ায় বাকি জীবনে আর কখনো পা হড়কে যায়নি।

মানুষের বিপন্নতা

শ্রীশ কাকাবাবুর কথা ভুলতে পারেননি সুভাষ। শ্রীশ কাকাবাবু ছিলেন বাবার বন্ধু। রোজ সন্ধ্যায় আসতেন বাবার কাছে। প্রীতিলতা, কল্পনা দত্তদের বীরত্বের কাহিনী খুব আবেগ দিয়ে বর্ণনা করতেন। পড়ে শোনাতেন সূর্য সেনের ডায়েরি থেকে। তারকেশ্বর দস্তিদারের চিঠি। কিশোর সুভাষ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অগ্নিমন্থন করা সেইসব কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যান। ঘোরের মধ্যে কেটে যায় সারাটা রাত। ভোর হলে অপেক্ষা করেন সন্ধের জন্য। কখন শ্রীশ কাকাবাবু আসবেন? একদিন ছন্দপতন ঘটে। কী সূত্রে যেন সুভাষ জানতে পারেন শ্রীশ কাকাবাবু সরকার পক্ষের উকিল। মামলায় তাঁর সওয়াল মাস্টারদাদের ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর জন্যে। মনটা দমে যায়। বাবাকে সরাসরিই বললেন কথাটা। তারপর দিন বাবা শ্রীশবাবুকে সুভাষের প্রশ্নটার কথা বলে দিলে সেই যে মুখটা ম্লান করে তিনি চলে গিয়েছিলেন আর কখনো এ-বাড়িমুখো হননি। মুখ কালো করে শ্রীশবাবুর চলে যাওয়ার দৃশ্যটা তাঁর কাছে ভোলার নয়। মানুষের কত রকমের যে বিপন্নতা থাকে।

আচ্ছা ঢোলগোবিন্দ, সত্যি-মিথ্যে, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-খারাপ এ-সবের এমন কোনও মাপকাঠির কি হদিশ পেয়েছ, যার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই? বাজারের তেজি-মন্দায় যার কোনো ওঠাপড়া নেই? যা সব সময় একদর এবং প্রকৃতির নিয়মের মতোই যা নির্মমভাবে অলঙ্ঘ্য আর অমোঘ?...যুদ্ধং দেহির দল এখন তোমাকে টিটকিরি দিয়ে বলে রণছোড়জির কাছে নাড়া বেঁধেছ। সব কিছুই দেখছ ক্ষমার চোখে, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুরই পেছনে যুক্তি খুঁজে দেখছ। হতে চাইছ সাংখ্যের পুরুষ। একবার এ-রাস্তায় পা দিলে কোথায় পৌঁছুবে ভেবে দেখেছ?

জীবনের পাঠ

সৎ জীবন যাপনের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বাবার কাছে। বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র ছিলেন আবগারি দারোগা। জীবনে এক পয়সা ঘুষ নেননি বলে তাঁর ছিল অন্য মর্যাদা। হাজারো দুঃখকষ্টের মধ্যেও আলাদা একটা সম্ভ্রম নিয়ে চলতে জানতেন তিনি। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ, যাদের নাকি দু'হাত ভরে ঘুষ নিতে বাধত না তারাই আবার মুশকিল আসান হয়ে ক্ষিতীশবাবুর বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতে চাইতেন। তাঁদের নাকি একটাই ভয় ছিল, বিপদের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত ক্ষিতীশও যদি ঘুষখোরদের দলে ভিড়ে যায়, শেষ পর্যন্ত যদি আর মাথা উঁচু করে না থাকতে পারে?

বাবাকে নিয়ে পরিবারে গৌরব তো কিছু কম ছিল না। কিন্তু বিপন্নতা কি উঁকি দিয়ে যায়নি কখনো সখনো। স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল সময়ে দুর্মুখ অনেকেই ছেলেদের সরকারি কর্মীর ছেলে বলে দুয়ো দিতে ছাড়েনি। আর তিনি যে চাকরি যাবার ভয়ে অনেক সময়েই কাঁটা হয়ে থাকতেন সেটাও কি ভালো লেগেছিল সেইসব দিনে ছেলেদের! তবু নিজেকে কখনো বাবার নখের যুগ্যি বলেও মনে হয়নি। কেননা বাবার কথা মনে হলেই জেল থেকে বেরোনোর পরের সেই গল্পটার কথা তার মনে পড়ে যায় যে।

জেল থেকে বেরোনোর পর সংসারের হাল দেখে যখন সুভাষের মনে হয়েছিল রোজগারের একটা ধান্দা না করলেই নয় তখন একদিন এক ব্যারিস্টার বন্ধুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সব শুনে টুনে সেই বন্ধু খুব সহজভাবেই একটা কাজের কথা বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন পরের দিন এসে ভাউচার সই করে তিনমাসের বারোশো টাকা নিয়ে যেতে। সুভাষের খটকা লেগেছিল। কিন্তু সংসারের হাল বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে প্রসঙ্গটা পেড়ে খুবই অপদস্থ হতে হয়েছিল তাঁকে। বাবা বলেছিলেন 'কাজ না করে টাকা নেওয়ার মতো একটা মিথ্যা ব্যাপারে আমার সায় নিতে এসেছ? কেন মুখের ওপর তোমার বন্ধুকে না বলে দিতে পারলে না?' বাবার সেই আরক্ত মুখচ্ছবি চিরদিন তাঁকে পথ চলতে সাহায্য করেছে।

মা তুমি বিশাল মা তুমি অপার
মা তোমার নেই শেষ
মা তুমি বিরাট বিশ্বে ছড়ানো
তুমিই বাংলাদেশ।

'জয়মণি স্থির হও'—কোনো বিঘ্ন বিপদ বা ঝড়ের সংকেত দেখলে মায়ের মুখে মন্ত্রের মতো বাজত শব্দ কটি। মায়ের মুখের কথা থেকেই কান আর মন দুই তৈরি হয়েছিল। ইংরেজি না-জানা মায়ের কাছে এ-ভাবেই হয়েছিল ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ। এছাড়া মা হিন্দী আর ওড়িয়াও বলতে পারতেন অনর্গল। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের অনেকেই বলেছেন এমন সুন্দর করে কথা বলতে বুঝি তারা আর কাউকেই দেখেননি। সহমর্মিতা আর অন্যের ভালোয় খুশি হওয়ার অপার্থিব আনন্দ সেও মা'র কাছেই শেখা। এই আনন্দের বোধ থেকেই কি 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কাজে তাঁর জড়িয়ে পড়া? একান্নবর্তী পরিবারের হাজারো ঝক্কি সামলে তাঁকে চলতে হত। বাড়ির সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে যাবার পর বেলা একটু গড়িয়ে গেলে যামিনী দেবী বাজার করতে যেতেন। নিজের হাতে বাজার করা ছিল তাঁর শখ। সবাই ভাবত সংসারে একটু সাশ্রয়ের জন্যই বোধহয় বেলায় বাজারে যাওয়া তাছাড়া নিজের পছন্দমতো এটা ওটা কেনাও সহজ হয় সে-সময়। আড়ালের সত্যটা ছিল অন্য। দুর্ভিক্ষের সময় থেকে বাজারের বাইরের ফুটপাথে বসে তরিতরকারি বেচা গাঁয়ের লোকদের সাধ্যমতো সাহায্য করতেন তিনি। ছেলেমেয়েদের পুরোনো জামাকাপড় দেওয়া, অসুখ করলে চেনাজানা ডাক্তারদের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বিপদে আপদে বুদ্ধি-পরামর্শ দেওয়া ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। হঠাৎ অসময়ে মৃত্যু না'হলে তাঁর জীবনের এই আরেকটি দিক হয়তো কোনোদিন জানাই যেত না। মৃত্যুর পর বাড়ি বয়ে এসে তারাই সব জানিয়ে গিয়েছিল। '৪৭-এ দেশ ভাগাভাগির পর একদিন কালীঘাটে যামিনী দেবীর সঙ্গে হঠাৎ-ই দেখা হয়ে যায় দেশ-গাঁয়ের অল্পপরিচিত একটা পরিবারের সঙ্গে। সব আশ্রয় খুইয়ে তখন বোধহয় তারা কালীঘা[illegible]। দেখে খুব মন খারাপ হয়ে যায় তাঁর। মনে মনে ভাবেন বাড়িতে যদি একটু থাকার ব্যবস্থা করা যায়। মনে মনে এও জানতেন তাঁর এই প্রস্তাবে কেউ রাজি হবে না। তাছাড়া ৫বি শরৎ ব্যানার্জি রোডে তখন লোকে ঠাসাঠাসি। আর কেউ যে তার কথায় সায় দেবে না সে তো জানাই ছিল কিন্তু রাত্তিরে খেতে বসে যখন দুই ছেলের কাছে কথাটা পাড়লেন তখন তাদের দিক থেকেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে খুব হতাশ কণ্ঠে তাঁকে বলতে হয়েছিল—'শেষ পর্যন্ত তোরাও, তোরা না কমিউনিস্ট!'

নিশান আর নিশানা

কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন নিতান্তই ভালোবাসার টানে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' কথাটার একটা মানে হয়তো খুঁজে পেয়েছিলেন এখানে। তারপর সমর সেন একদিন তাঁকে পড়তে দিলেন *হ্যাণ্ডবুক অব মার্ক্সিজম্* বইটি। তারপরের কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়,—

> এ বই প'ড়ে শুধু যে আমার পুরোনো ধ্যানধারণা আমূল বদলে গিয়েছিল তাই নয়, আমার গোটা জীবনটাকেই নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছিল।
>
> এটা বলতেই হবে যে, সমর সেনের কাছে আমার ঋণ শুধু কবিতার চোখ ফোটানোর জন্যেই নয়। তাঁরই ঠেলায় আমার জগৎ চেনায় পালাবদল ঘটেছিল।

'৪০-এ পার্টির সংস্পর্শে আসা, '৪২-এ সদস্যপদ প্রাপ্তি। তারপর ১৯৮০ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন

সেই সম্পর্ক। পার্টিতে কতরকমের কাজের সঙ্গেই না যুক্ত থেকেছেন। পার্টি মুখপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা হয়ে ঘুরেছেন অবিভক্ত বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। সাংবাদিক গদ্যের নতুন একটা আদল তৈরি হয়েছে তাঁর হাতে। দেশ দেখার চোখেও বদল এনেছেন তিনি। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে কাজ করেছেন 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায়। চটকল মজুরদের সঙ্গে ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ, জাহাজি শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ, ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক, প্রগতি লেখক সংঘ আর গণনাট্য সংঘের সঙ্গে নিবিড় যোগ। '৪৮-এ পার্টি বে-আইনি হয়ে গেলে আড়াই বছরের মতো জেলে। সেখানে ৪৭ দিনের অনশন ধর্মঘট। সেও হাসতে হাসতে। কত কবিতায় কত গদ্যে তার ছবি ফুটিয়েছেন নিবিড় মমতায়। জেল থেকে বেরিয়ে চটকল মজুরদের মধ্যে কাজ করবেন বলে সটান চলে গেলেন ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে—চটকল মজুরদের এক মহল্লায়। সবই হাসি মুখে, ভালোবাসার টানে, আদর্শের টানে।

পার্টি তাঁকে 'তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ' দিয়েছিল। শ্রমিক বা মজুর বললে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে নাম-পরিচয়হীন একটা দলকে, কারখানার দুটি ভোঁ-এর মাঝখানে যারা শুধু গায়েগতরে খেটে চলে। সেই ৪৭এর ক কিংবা ৬৯এর ঙ যেন সবাই। ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে চটকল মজুরদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে থাকতে থাকতে দেখার চোখ একটু একটু করে পাল্টাতে লাগল। প্রত্যেকটি শ্রমিক এক একটি আলাদা মানুষ হয়ে উঠতে থাকল। হাসি-কান্নায়, আশায়-আশাভঙ্গে, প্রেমে-প্রেমহীনতায় প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। অভাবে-অনাহারে ছোটো হয়ে যাওয়া আবার বুক চিতিয়ে সিংহের মতো দাঁড়ানো। দুঃখে-বেদনায় দীর্ণ আবার আনন্দে আত্মহারা হওয়া—এক একটা গোটা মানুষ প্রত্যেকে। জীবনের টানে তারা কখনো এক-দলবদ্ধ, জীবনেরই টানে আবার আলাদা-একক। পার্টিরই দেওয়া চোখে এইসব অভিব্যক্তি একটু একটু করে ধরা পড়তে থাকে। দেখার চোখ বদলালে বোঝার মনও বদলায়। প্রত্যেকটি স্থির ছবি এখন হেঁটে বেড়াতে চায়। জীবনের জন্য তত্ত্ব না তত্ত্বের জন্য জীবন? উপলব্ধি সত্য কথা বলবে নাকি বই-এ পড়া বুলি-মুখস্থ হয়ে যাওয়া ধারণা! কবিতায়ও বদল ঘটে। দেখার চোখ বদলে গেলে পালাবদল তো ঘটবেই। এই পর্যায়ে লেখা হয় নতুন সব কবিতা, আশ্চর্য গদ্য। অনেক গভীরে টান লাগল। পরিবর্তন এল ভেতর থেকে, বাইরের মন দিয়ে তা বোঝা সহজ নয়। যখন লিখলেন 'যত দূরেই যাই'—তখন অনেকেরই মনে হতে লাগল এ তো দল ছেড়ে চলে যাওয়া, দলের ভেতরে থেকেও যেন নেই।' 'নিকোনো উঠোনে সারিসারি লক্ষ্মীর পা' ধন্দটা উসকে দিল আরো। পাঠক কি লক্ষ করেননি *পদাতিক*-এর সেই 'চিমনির মুখে শোনো সাইরেন শঙ্খ'? শঙ্খ কি শুধুই একটা শব্দ, একটা ধ্বনি? আর কিছু না? সুকান্ত-প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সুভাষ লিখেছিলেন 'কী নিয়ে লিখব এটা কখনই আমাদের আলোচনার বিষয় হত না। কেমন করে লিখব এই নিয়েই ছিল যত মাথাব্যথা'। কথাটা নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি, এখনো যে তর্কটা থিতিয়ে গেছে এমন তো নয়। এই রকম টুকরো টুকরো নানা বিষয় নিয়েই প্রশ্ন উঠছিল। কেউ কাউকে বুঝতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন না নাকি বুঝতে চাইছিলেন না?

শেষ নয় আরম্ভ

জেলে গিয়েছিলেন বে-আইনি পার্টির কর্মী হিসেবে। পার্টির তখন মনে হয়েছিল '৪৭-এর স্বাধীনতা আসলে ঝুটো। তারপর জেল থেকে বেরুনোর বেশ কয়েক বছর পর সুভাষ যখন ডাকবাংলার ডাকে সাড়া দিয়ে আবার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে বাংলাকে চষে বেড়াচ্ছেন তখন পায়ে পায়ে স্বাধীনতা পৌঁছে গেছে দশবছরে। স্বাধীনতা উত্তর খণ্ডিত বাংলার আদত চেহারাটা দেখতেই তো আবার এই বেরিয়ে পড়া। তাঁর বেরিয়ে পড়া, দেখে বেড়ানো তো কোনো ভ্রমণার্থীর বিস্ময় নয় এতো নিকট আত্মীয়ের বেদনা আর সহমর্মিতা—ভালোবাসায় মাখামাখি—একাকার, আবার গাঁ-গঞ্জের মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ। তাদের সঙ্গে পথ চলে, কথা বলে, সুখ-দুঃখের খবর জেনে, ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদান করে আবার নতুন এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাঁকে। আবার কি বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে। জাতীয় মূলধারা থেকে সরে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে কি সমাজতন্ত্রের মহৎ কাজ করা সম্ভব? এইসব প্রশ্ন পার্টির মধ্যেও তখন উঠছিল। জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক কেমন হবে? ন্যাশানাল ফ্রন্ট নাকি লেফট ফ্রন্ট? জাতীয় গণতন্ত্র নাকি জনগণতন্ত্র। রাষ্ট্রের সঙ্গে শুধুই লড়াই নাকি সংগ্রাম ও ঐক্য? স্বাধীনতা কি পথের শেষ নাকি আরম্ভ মাত্র? এইসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ ছিল না। স্বাধীনতাকে দেশের আপামর জনসাধারণ সেদিন কোন চোখে দেখেছিল সেটা বুঝতেও সময় কম লাগেনি। এমনকী সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও সময় লেগেছিল। কিন্তু তন্নতন্ন করে দেখার চোখ একদিন তাঁকে এই উপলব্ধিতে এনে দাঁড় করাল—

> ...নেহরু আমাদের যে স্বাধীনতার স্থপতি, আজন্ম সেই স্বাধীনতার মুখ সমাজতন্ত্রের দিকে ফেরানো। অহিংসা, শান্তি, বাধাবাঁধনহীন মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, পঞ্চশীলতারই উপর গড়ে উঠবে আমাদের বিচিত্র হয়েও এক এবং এক হয়েও বিচিত্র মানবমুখী সমাজতন্ত্র।

আর একটু সময় গেলে, দুনিয়াজোড়া নানা পালাবদলের, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাতুর ঘটনার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আবার তাঁকে বলতে হল—

> সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তা ছেড়ে বলতে গেলে সবাই এখন ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসতে চায়। নেহরুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে এতদিন আমরা দুয়ো দিয়ে এসেছি, দুনিয়াজোড়া কাণ্ডকারখানা দেখে ঢোঁক গেলা ছাড়া এখন আর আমাদের উপায় নেই।

একটা জায়গায় টান লাগলে আরো হাজারটা জায়গা নড়ে ওঠে। জরুরি প্রশ্ন জেগেছিল সুভাষের মনে—যেমন স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধরাবাধা রীতিপদ্ধতি নিয়েও। কত কথাই তো উঠে এসেছে—সব আন্দোলন যদি শেষ পর্যন্ত মজুরি আর ভাতায় এসে ঠেকে যায় তবে মজুরির সামান্য উনিশবিশ হলেও যে শ্রমিকদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে না। *কমরেড, কথা কও*-এর একটা জায়গায় আছে না,—

> প্রকৃতির নিয়মগুলো পর্যন্ত তোমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে, ভাইসাহেব।
> যেটা ভাঙতে চাও, তার চেয়েও শক্ত হওয়া চাই যা দিয়ে ভাঙবে।
> সেই জোর না থাকায় চোট খেয়ে খোদ হাতিয়ারটাই ভেঙে খানখান হয়ে গেল।...

ওপরটা সরিয়ে নড়িয়ে নীচে চাপা-পড়া জিনিসগুলো যদি বার করা যেত,
তাহলে আজকের এই বুক-চাপা ধরার ভাবটা কাটানো যেত। তাহলে
পার্টি ভাগাভাগির এই সর্বনাশটা বোধ হয় হত না।...

অদ্ভুত সময়

পার্টির ভাগ হওয়াটা তাঁর কাছে ছিল একটা নাড়ি ছেঁড়া ব্যাপার। শুধু তাঁর কাছেই বা বলি কেন, পার্টির হাজারো কর্মীর আঁতের কথা তো তাই ছিল। ভাঙাভাঙি একবার শুরু হলে আর তো থেমে থাকে না। যা অনিবার্য তা আর ঠেকানো যায়না।

এ এক ভারি অদ্ভুত সময়।

পুরোনো ভিতগুলো যখন বালির মতো ভাঙছে
আমরা ভাইবন্ধুরা
ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।

যখন
একসঙ্গে হাত মুঠো ক'রে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সবকিছু পাই—
তখন
বিভেদের একটুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।।

ছেড়ে যাইনি, সরে দাঁড়িয়েছি

'ছেড়ে যাইনি, একপাশে সরে শুধু উত্তরের অপেক্ষায় আছি' বলে এবার সুভাষ নিজেই সরে দাঁড়ালেন পার্টি থেকে। চুপি চুপি 'বসে যাওয়া' নয়, রীতিমতো ঘোষণা করে সরে দাঁড়ানো। ১৯৮০তে যখন পার্টির সঙ্গে চল্লিশ বছরের সম্পর্কে ছেদ পড়ল, তখন রাজ্যের ক্ষমতায় ভাই-বন্ধুরা। দেশের রাজনীতিতে পালাবদলের পালা। পার্টির মধ্যে পুরোনো অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশি বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বেঁধে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে লড়াই নাকি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসি সরকারকে উপড়ে ফেলা ইত্যাদি জরুরি প্রশ্নে পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য তুঙ্গে। এস. এ. ডাঙ্গের মতো পার্টিনেতাও তখন বহিষ্কৃত। টালমাটাল সেই সময়ে এস. এ. ডাঙ্গের নেতৃত্বে নতুন একটি পার্টি তৈরি হল। সুভাষের মানসিক অবস্থান ডাঙ্গের চিন্তার সঙ্গে সমন্বিত। কিন্তু নতুন করে কোনো পার্টির সদস্য হয়ে শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত হতে মন আর চাইল না। প্রতিবাদের সব মঞ্চেই তখন তাঁর অবাধ যাতায়াত। ক্ষুদ্র দলীয়তার কোনো নিগড়ে আর বাধা থাকা নয়। মনে আর মুখে এক এমন মানুষ আমাদের চারধারে প্রায় নেই বললে অত্যুক্তি হয় না নিশ্চয়ই। সুভাষ সেই বিরলদের একজন যিনি কথায় আর কাজে, মুখে আর মনে এ

রয়ে গেলেন সারাটা জীবন ধরে। এইসব ক্ষেত্রে সামান্য একটু কৌশল বা ছক আর একটু এগিয়ে সাময়িক নীরবতা দিয়ে অনেক জটিলতা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন কিছু না। সুভাষ সে পথে হাঁটেননি। খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন,—

কে, কী মনে করবে এই ভেবে চুপ করে থাকার সময় এটা নয়।
মনের কথা খুলে বলাই ভালো। ভুল বললে, ধরিয়ে দেবার লোকের অভাব হবে না।
সবই এখন নতুন করে ভাবছি।

সুভাষ মনের কথা খুলে বলতে চাইলেও আমরা মন খুলিনি। অগ্রজ এক কবি লিখেছিলেন,—

> অবশেষে সুভাষের বর্তমান রাজনীতি। আমি এখানে দর্শক হিসাবে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত।
> এই এলাকায় আমাদের মানসিক অবস্থান ভিন্ন ও সুদূর। এতটাই যে, দুজনের কেউই
> সীমানা অতিক্রম করে আলোচনায় বসার কথা ভাবতেও পারি না।

ভাবতে না পারার এই সংক্রমণটা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শীতলতা ভেঙে মন খুলে কথা বললে, (আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলাটা এতই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল—কোনো মালিন্য যেমন তিনি পুষে রাখেননি, অন্যের মুখ ম্লান করে দেওয়ার নির্মম খেলাটাও কখনো খেলেননি।) হয়তো বোঝার ভুলের পাথরটা একটু একটু করে সরে যেত। তবে কি আমরা সবাই 'নিজেদের জালে বন্দী নিজেদেরই তৈরি করা জেলে'?

> 'যে বিশ্বাসে ভর দিয়ে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তায় লাঠিগুলির
> মোকাবেলা করেছে, জেলখানায় দাঁতে দাঁত দিয়ে না খেয়ে থেকেছে—সে বিশ্বাস
> কি এতটাই ঠুনকো ছিল?

লাল উষ্কিতে পরস্পরকে চেনার অঙ্গীকার তবে শুধুই কথার কথা, কথার বুঝি দাম থাকতে নেই? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ও শেষ আশ্রয় জনতার সংগ্রামী শিবির। কনোরিয়ায় যখন শ্রমিকরা লড়াই করে, ভিখিরি পাশোয়ান যখন হারিয়ে যায়, সাংবাদিক দিবাকর মণ্ডল-কে যখন প্রাণ দিতে হয়, বানতলায় নৃশংসতা হলে, জলাভূমি বেহাত হলে, সবুজ ধ্বংস হলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পথে নামেন। শিল্পী হুসেন-এর স্টুডিও তছনছ হলেও পথে নামেন। হকারদের পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করলে, খালপাড়ের গরিব মানুষরা বাস্তুচ্যুত হলে, মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর হাত পড়লে তিনি সাধ্যমতো রুখে দাঁড়ান। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের তিনি আত্মিক শরিক। উন্নয়নের কুহকে তাঁর মতিভ্রম হয় না। অরুন্ধতী রায়ের প্রতিবাদী লেখনী তাঁর সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। শরীর যখন আর দেয় না তখন গুজরাটের নারকীয়তার খবর জেনে নিস্ফল অস্থিরতায় তার প্রহর কাটে। সেইসব সময়ে তাঁর অসহায় অস্থিরতার ছবি যাঁদের চোখে লেগে আছে তাঁরা বুঝবেন যন্ত্রণাটা ঠিক কোথায় বিধলে এমন অস্থির হতে পারে মানুষ।

অনন্য আর একা

একটা কথা উঠেছিল কবির দায় আর কবির প্রতি দায় নিয়ে। 'দায়' কথাটায় সুভাষের তেমন বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভালোবাসায়। সেই ভালোবাসার জোরেই তাঁর বেঁচে থাকা, তাঁর হয়ে ওঠা। ভালোবাসার এই পাঠ সেই ব্যঞ্জনহেড়িয়ার দিনগুলোতেই তিনি

পেয়েছিলেন নিবিড় করে। আর সারা জীবনের পাথেয়ও এখান থেকেই তিলে তিলে তাঁর সংগ্রহ করা। তাঁর ভালোবাসার, নিবিড় মমতার টানে মানুষ যেমন ধরা পড়ত তেমনি ধরা পড়ত বেড়াল, কুকুর, পাখি, পায়রা, মাছ থেকে শুরু করে মা-মাটি, দেশ, আকাশ, জল, হাওয়া, গাছ এমনকী ট্রামের তারে জমে থাকা শিশির বিন্দু পর্যন্ত—কিছুই বাদ যেত না। এতো সাজানো কিছু ছিল না। এসেছিল যাপিত জীবন আর জীবনের থেকে—সহজে আর স্বচ্ছন্দে। তাঁর ভাবনার ধরনই ছিল এই। কিছুই বাদ যেত না। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসও অনাদরের নয়। জীবনে প্রথম বিদেশ যাবার টাকা জুগিয়েছিল বজবজের আহম্মদ। সেও ধার-দেনা করে। শর্ত অবশ্য একটা ছিল। ফেরত ধীরে-সুস্থে দিলেও চলবে তবে সুদ দেওয়া চলবে না। ভালাবাসার টানেই তো এটা সম্ভব হয়েছিল। আবার হাসপাতালে যখন তাঁর বাড়াবাড়ি অবস্থা তখনো সেই বজবজের শ্রমিকেরাই তো দলবেঁধে হাসপাতালে এসে তাঁর আরোগ্য কামনা করে যায়। আসে কানোরিয়ার শ্রমিকেরা, সংগ্রামী হকাররা। আলোকিত পৃথিবীর এঁরা কেউ নয়, ওঁদের 'সংবেদনশীলতা'র কথা খবরের কাগজের ব্যানার হেডলাইন হয়না সত্যি। কিন্তু এঁদের আত্মীয়তার মধ্যেই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন বারবার। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই জন্যই তিনি অনন্য আর ভীষণরকমের একা।

দুঃখিনীর পোড়া কপালের লালটিপ

শেষদিন পর্যন্ত 'দুঃখিনীর পোড়া কপালের লালটিপ' তাঁকে অন্ধকারে আলো দেখিয়েছে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি প্রায়ই বলতেন 'আমাদের পার্টি'। কথাটা নিয়ে পরিচিত মহলে হাসাহাসি কম হত না। কেউ যখন এগিয়ে এসে বলত 'পার্টির জন্য জীবনে কত ত্যাগ...' কথা থামিয়ে দিয়ে বলতেন 'মিথ্যে কথা, যা করেছি ভালোবসে করেছি, আত্মতৃপ্তি পেয়েছি বলে করেছি।' শুধু নিজের কথা নয় অন্যদের প্রসঙ্গেও তাঁর মত ছিল খুব স্পষ্ট, 'পার্টির মধ্যে আমার চেনা জানার পরিধি তো কম ছিল না। অনেক ভুলভ্রান্তির পরেও এমন কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, যে তার অতীত সর্ম্পকে অনুতপ্ত, যে ভাবে জীবনটা অন্য খাতে বইয়ে দিলে সে সুখী হত।' একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন বিকেলে হাসপাতালের বারান্দায় বসে চলে গিয়েছিলেন দূর অতীতে। তাঁর মনে পড়ছিল বীরেশ মিশ্রর কথা, বারীন দত্তর কথা। সিলেটে ত্রিপুরায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার গোড়ার দিকের কথা। নৃপেন চক্রবর্তীর কথা, সুশীল চ্যাটার্জির কথা। অনেকটা সময় ধরে সেইসব স্মৃতির কথা তন্ময় হয়ে বলে যাচ্ছিলেন। কথা থামালেন এই বলে 'আমাদের পার্টির গৌরব করার মতো অনেক কিছুই ছিল।'

গুরুজনেরা বন্দেমাতরম্‌ ব'লে কপালে হাত ঠেকিয়ে
তিনটে রং
কলাপাতায় সিঁদুর চন্দন বুলিয়ে
আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন।
আগুনের তাপে
তিনটে রং এক ক'রে আমরা পেলাম
টকটকে লাল—

আমাদের ধমনীতে বহমান যে রক্ত
তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে
সেই রঙে আমরা ছুপিয়ে নিয়েছিলাম
আসমুদ্র হিমাচলের আকাশে তোলা
আমাদের নিশান।

ভাই, ও ভাই।
তোমরা কি তাকে ভুলে গিয়েছ?
নোংরা হাতের টানাটানিতে
আর ক্রমাগত
হাত বদলের ঠেলায়—
রক্তের সঙ্গে মেশালে আর সাতনকলে
আমাদের সে নিশানের
সে রং আর নেই।
ফিকে তো বটেই, তা ছাড়ো কী জানো,
রোদে একটু পুড়লে
জলে একটু ভিজলেই উঠে যাচ্ছে।
মাটি থেকে তুলে তিনটে রং
গনগনে আঁচে জ্বাল দিলেই
টকটকে লাল হবে।
ভাই, ও ভাই।

'কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম'-এর বোম্বে অধিবেশনে (১৯৫১) বাংলার লেখকদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়ে বুদ্ধদেব বসু নিজেই সেদিন সবচেয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। নিন্দেও তাঁর কম হয়নি। জানিনা সে কলঙ্ক আজও কতটা মোচন হয়েছে। বুদ্ধদেবের একান্ত অনুরাগী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সেদিন সরাসরি অভিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে 'পরিচয়'-এর পাতায় একটা খোলা চিঠি লিখে। মৃদুভাষী বুদ্ধদেব সেদিন শুধু বলেছিলেন 'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ।' অন্নদাশঙ্কর রায় 'সাহিত্যিকা'র এক অধিবেশনে (১৯৫১) সুভাষের এক বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন, 'আপনি তো দেখছি শেষ পর্যন্ত স্টিফেন স্পেন্ডারদের দলে গিয়ে ভিড়বেন।' কথাটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আঁতে লেগেছিল। কেননা সেদিনের বক্তৃতায় সুভাষ যা বলেছিলেন তা ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা। বজবজের দুই আড়াই বছরে মানুষের ভালোমন্দ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি বদলেছে, বদলেছে বিচারের মাপকাঠি। সেই নতুন মাপকাঠি থেকেই তো বলেছিলেন সেদিন। একবারও তাঁর মনে হয়নি তিনি ভুল কিছু বলছেন। বক্তৃতার বিষয়টা যখন খবরের কাগজে 'সংগ্রাম না সহানুভূতি' শিরোনামে বেরিয়েছিল তখন পার্টি কমরেডদের অনেকে তাঁকে বুঝতে পারেননি। আজও কি আমরা বুঝতে পেরেছি? বুঝতে চেষ্টা করেছি? হাসপাতালে বসেই তাৎপর্যপূর্ণ দুটি পঙ্‌ক্তি তিনি লিখেছিলেন—

'তুমি কোন্ দলে
পা যে-দিকে চলে'।

সারা জীবনের পথ চলা, আদর্শ আর ভালোবাসার টানে, জীবনকে ছুঁয়ে থাকার নিজস্ব ধরন, মায়ের মমতায় চারপাশকে দেখা, শক্ত পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, এইসব তো বাইরের আলগা জিনিস নয়। অনেক ভেতর থেকে উঠে আসা প্রত্যয়, ঠুনকো ঠেলাঠেলিতে তা ভেঙে যাবে কি করে। রাজনীতির যে-পিঠে আদর্শ, যে-পিঠে ত্যাগ সারাটা জীবন সেইখানে তাঁর থেকে যাওয়া।

ঝড়ঝাপটা জীবনে কম আসেনি, ধাক্কা লেগেছে বারেবার। দ্বিধা, সন্দেহ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার কুটিল পথ পেরিয়ে পেরিয়ে পথ চলা।

তাঁর জীবন আর তাঁর সৃষ্টিকে রাজনৈতিক অভিমানের বাইরে দাঁড়িয়ে সত্যমূল্যে আবিষ্কার না-করা পর্যন্ত কী করে বোঝা যাবে তিনি কোন দলে, পঁচাশি বছরের জীবনে তাঁর পা চলেছে কোনদিকে?

তিনি কি God that failedদের দিকেই চলে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, নাকি ছিলেন 'The party in the grand historical sense of the term'-এ। প্রশ্নটা জটিল, মীমাংসা সহজ নয়। সত্যি সহজ নয়? নাকি জটিল করে দেখতে আমাদের ভালো লাগে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বই-এর বিষয়গত তালিকা

কবিতা

১. পদাতিক (ফেব্রুয়ারি ১৯৪০)
২. অগ্নিকোণ (অক্টোবর ১৯৪৮)
৩. চিরকূট (এপ্রিল ১৯৫০)
৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
৫. যত দূরেই যাই (মে ১৯৬২)
৬. কাল মধুমাস (মে ১৯৬৬)
৭. এই ভাই (সেপ্টেম্বর ১৯৭১)
৮. ছেলে গেছে বনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)
৯. একটু পা চালিয়ে ভাই (মে ১৯৭৯)
১০. জল সইতে (মে ১৯৮১)
১১. চইচই চইচই (মার্চ ১৯৮৩)
১২. বাঘ ডেকেছিল (সেপ্টেম্বর ১৯৮৫)
১৩. যা রে কাগজের নৌকা (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯)
১৪. ধর্মের কল (জানুয়ারি ১৯৯১)
*১৫. ফুল ফুটুক
(স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৩৯৯)
*১৬. একবার বিদায় দে মা (অক্টোবর ১৯৯৫)
*১৭. ছড়ানো ঘুঁটি (বইমেলা ২০০১)

ছড়া

১. মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো (জানুয়ারি ১৯৮০)
*২. সাত সকালের ছড়া (জানুয়ারি ২০০০)
*৩. বকবকম (জানুয়ারি ২০০১)
*৪. হরে কর কমবা (বইমেলা ২০০৩)

অনুবাদ কবিতা

১. নাজিম হিকমতের কবিতা (এপ্রিল ১৯৫২)
২. দিন আসবে (জুলাই ১৯৬১)
৩. পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ (এপ্রিল ১৯৭৩)
৪. রোগা ঈগল (ডিসেম্বর ১৯৭৪)
৫. নাজিম হিকমতের আরো কবিতা (বৈশাখ ১৩৮৬)

৬.	পাবলো নেরুদার আরো কবিতা	(এপ্রিল ১৯৮০)
৭.	হাফিজের কবিতা	(ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)
*৮.	চর্যাপদ	(মে ১৯৮৬)
*৯.	অমরু শতক	(জানুয়ারি ১৯৮৮)
*১০.	গাথা সপ্তসতী	(ডিসেম্বর ১৯৮৯)

কবির নিজের কবিতার বই-এ ছড়িয়ে আছে দেশি বিদেশি কয়েকজন কবির কবিতার অনুবাদ। তার তালিকা :

	কবি/কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার সংখ্যা	
১.	চর্যাপদ	৫টি পদ	ছেলে গেছে বনে
২.	শাহরিয়ার (উর্দু)	২	ছেলে গেছে বনে
৩.	ৎভারদভ্স্কি (রুশ)	১	ছেলে গেছে বনে
৪.	তু-ফু (চীনা)	২	ছেলে গেছে বনে
৫.	এরিখ ভাইনার্ট (জার্মান)	১	ছেলে গেছে বনে
৬.	তিনটি পুরোনো গ্রীক কবিতা	৩	ছেলে গেছে বনে
৭.	রাইনর মারিয়া রিলকে (ফরাসি)	১	ছেলে গেছে বনে
৮.	হেরমান হেসসে (জার্মান)	১	ছেলে গেছে বনে
৯.	ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা (স্প্যানিশ)	২	একটু পা চালিয়ে ভাই
১০.	সেসার ভালেহো (স্প্যানিশ)	২	একটু পা চালিয়ে ভাই
১১.	মহাকবি ভাল্লাথোল (তামিল)	১	একটু পা চালিয়ে ভাই
১২.	আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন (রুশ)	৪	একটু পা চালিয়ে ভাই
১৩.	সি. এফ. এন্ড্রুজ (ইংরেজ)	১	একটু পা চালিয়ে ভাই
১৪.	রবার্ত রোজদেস্তভেনস্কি (রুশ)	৩	জল সইতে
১৫.	নাজিম হিকমত (তুর্কি)	১	জল সইতে
১৬.	লাৎভিয়ার লোকমুখে	৮	চই চই চই চই
১৭.	মারিস চাকলাইস (লাৎভিয়া)	১	চই চই চই চই
১৮.	ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (উর্দু)	১	বাঘ ডেকেছিল
১৯.	সদুক্তি কর্ণামৃত (সংস্কৃত)	১	বাঘ ডেকেছিল
২০.	রাজশেখর (")	১	বাঘ ডেকেছিল
২১.	গোবর্ধনাচার্য (")	১	বাঘ ডেকেছিল
২২.	আলেকজান্দার ব্লক (রুশ)	১	যারে কাগজের নৌকো
২৩.	পারভেজ শহীদী (উর্দু)	১৩	যারে কাগজের নৌকো
২৪.	জর্জ সেফেরিস (গ্রীক)	১	ধর্মের কল
২৫.	মিখাইল শাৎরভ (লালঘাসে নীল ঘোড়া নাটকের গান) (রুশ)	৬	ধর্মের কল
২৬.	ডি. এইচ. লরেন্স (ইংরেজি)	৩	একবার বিদায় দে মা

২৭. কেওয়াপেটসে খোসিট সিলে (দক্ষিণ আফ্রিকা)	১	একবার বিদায় দে মা
২৮. আহমেদ তিজানি সিফে (")	২	একবার বিদায় দে মা
২৯. ইয়েহুদা খামিচাই (ইজরায়েল)	৩	একবার বিদায় দে মা

উপন্যাস

১. হাংরাস (বৈশাখ ১৩৮০)
২. কে কোথায় যায় (জুলাই ১৯৭৬)
৩. অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ (বৈশাখ ১৯৩০)
*৪. কাঁচাপাকা (আগস্ট ১৯৮৯)
৫. কমরেড, কথা কও (জানুয়ারি ১৯৯০)

অনূদিত উপন্যাস ও গল্প

১. কত ক্ষুধা (১৯৫৩)
(মূল রচনা So many Hunger—ভবানী ভট্টাচার্য)
২ রুশ গল্প সঞ্চয়ন (মার্চ ১৯৬৩)
৩. ইভান দেনিসোভিচর জীবনের একদিন (ডিসেম্বর ১৯৬৫)
(মূল রচনা One day in the life of Ivan Denisovitch)
*৪. তমস (মে ১৯৮৮)
(মূল রচনা ভীষ্ম সাহানী)

রিপোর্টাজ, ভ্রমণ কাহিনী

১. আমার বাংলা (১৩৫৮)
২. যখন যেখানে (১৩৬৭)
৩. ডাক বাংলার ডাইরি (১৩৭২)
৪ নারদের ডাইরি (১৩৭৬)
৫. যেতে যেতে দেখা (১৩৭৬)
৬. ক্ষমা নেই (১৩৭৮)
৭. ভিয়েতনামে কিছুদিন (১৯৭৪)
৮. আবার ডাকবাংলার ডাকে (১৯৮১)
৯. অগ্নিকোণ থেকে ফিরে (১৯৮৪)
১০. টো টো কোম্পানী (১৯৮৪)
১১. এখন এখানে (১৯৮৬)
১২. খোলা হাতে খোলা মনে (১৯৮৭)

১৩.	কুড়িয়ে ছিটিয়ে	(১৯৯০)
১৪.	চরৈবেতি চরৈবেতি	(১৪০৬)

আত্মজৈবনিক রচনা, স্মৃতিকথা

১.	ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন	(জুলাই ১৯৮৭)
*২.	টানা পোড়েনের মাঝখানে	(জানুয়ারি ১৯৯৪)
*৩.	ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই	(জানুয়ারি ১৯৯৪)
*৪.	চিঠির দর্পণে	(এপ্রিল ১৯৯৬)
৫.	হেমন্তর কী মন্তর	(১৯৯৭)

তত্ত্ব, প্রবন্ধ, ইতিহাস

১.	ভূতের বেগার	(১৯৫৪)
২.	বাঙালীর ইতিহাস (নীহাররঞ্জন রায় কৃত বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব-এর সংক্ষেপিত রূপ)	(১৩৫৯)
৩.	অক্ষরে অক্ষরে	(সেপ্টেম্বর ১৯৫৪)
৪.	কথার কথা	(১৯৫৫)
৫.	কবিতার বোঝাপড়া	(জানুয়ারি ১৯৯৩)
*৬.	কথার গুণে তরি কথার দোষে মরি	(মে ১৯৯৮)
*৭.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ সংক্ষেপিত)	(১৯৯৮)
*৮.	Tagore Without Bounds	১৯৯৯
৯.	কাজের বাংলা	(জানুয়ারি ২০০২)
*১০.	ফকিরের আলখাল্লা	(২০০২)

ছোটোদের লেখা

১.	জগদীশচন্দ্র বসু	(১৯৫৫)
*২.	দেশবিদেশের রূপকথা	
৩.	ইয়াসিনের কলকাতা	(১৯৭৮)
৪.	রূপকথার ঝুড়ি	(১৯৮৮)
৫.	জানো আর দ্যাখো জানোয়ার	(১৯৯১)
৬.	এলাম আমি কোথা থেকে	(১৩৯৮)

অনুবাদ গদ্য

১. রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ (জুন ১৯৫৪)
*২. ব্যাঘ্রকেতন (১৩৬৭)
(মূল রচনা হিউ টয়-এর The Springing Tiger)
৩. চে গেভারার ডায়েরী (ডিসেম্বর ১৯৭৭)
৪. ডোরাকাটার অভিসারে (জানুয়ারি ১৯৬৯)
(মূল রচনা শের জং)
*৫. সেদিন বনে জঙ্গলে
৭. আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী (বইমেলা ১৯৮২)
*৮. ভারত স্বাধীন হল (১৯৮৯)
(মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর India Wins Freedomএর বঙ্গানুবাদ)
*৯. চড়াই উৎরাই (২০০২)
(সেলিম আলির Fall of a Sparrow-এর বঙ্গানুবাদ)

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. একসূত্রে (ডিসেম্বর ১৯৪২)
(গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত ফ্যাসিবিরোধী কবিতার সংকলন)
২. কেন লিখি (১৯৪৪)
(হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী)
৩. পাতাবাহার (আশ্বিন ১৩৬২)
(ছোটোদের জন্য সংকলন)
৪. আগামী
(বার্ষিক সংখ্যা ছোটোদের সাহিত্য সংকলন)
৫. কেন লিখি (জানুয়ারি ২০০০)
(পঁচানব্বই জন বাঙালি লেখকের জবানবন্দী)
(প্রণব বিশ্বাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত)
৬. শঙ্কা সংকট প্রত্যয় (২৩ নভেম্বর ২০০২)
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু
(শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, সৌরীন ভট্টাচার্য, প্রণব বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পাদিত)

রচনা সংগ্রহ

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (এপ্রিল ১৯৭০)
২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ-১ম খণ্ড (নভেম্বর ১৯৭২)

৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ-২য় খণ্ড (আগস্ট ১৯৭৪)
৪. কবিতা সংগ্রহ ১ (এপ্রিল ১৯৯২)
৫. কবিতা সংগ্রহ ২ (এপ্রিল ১৯৯৩)
৬. কবিতা সংগ্রহ ৩ (১৯৯৪)
৭. কবিতা সংগ্রহ ৪ (ডিসেম্বর ১৯৯৪)
৮. কবিতা সংগ্রহ ৫ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)
৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)
(প্রথম দে'জ সংস্করণ)
১০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা (বইমেলা ১৯৯৩)
১১. গদ্য সংগ্রহ ১ (জানুয়ারি ১৯৯৫)
১২. গদ্য সংগ্রহ ২ (বৈশাখ ১৪০৩)

বাংলাদেশে প্রকাশিত

১. পদাতিক (জুন ১৯৭০)
২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন (১৯৭৫)
৩. বাংলা আমার বাংলা দেশ (আগস্ট ১৯৮৮)
(নির্বাচিত গদ্য ও পদ্যের সংকলন)

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

১. পরিচয়
২. সন্দেশ
৩. লোটাস
৪. সপ্তাহ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়গত তালিকা এখানে করা হয়েছে। সব বই যে হাতে নিয়ে তালিকা তৈরি করা গেছে এমন নয়। তাঁর অনেক বই এখনই দুষ্প্রাপ্য। সহৃদয় পাঠকদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে। বই-এর নামের পাশে প্রথম প্রকাশের সময় চিহ্নিত করা হয়েছে। * চিহ্নিত বইগুলির কোনো দ্বিতীয় মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়নি।

জীবনানন্দ বিষয়ে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। সেটি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর রচনারও একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে। কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে হয়তো এ কাজ করা সম্ভব হবে না। পাঠক পাঠিকাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ভবিষ্যতে হয়তো তা করা সম্ভব হবে।

সংকলন : প্রণব বিশ্বাস

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : আদর্শের ঐক্যে ও কবিতার বৈচিত্র্যে

সুমিতা চক্রবর্তী

সরকারি চাকুরে সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রতিমা দেবীর শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২০ সালের ১৭ জুন যশোর জেলার নলডাঙায়। পৈতৃক নিবাস ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুমহেশ্বরপুর গ্রাম। তখন অবিভক্ত বাংলা। পিতার কর্মসূত্রে নানা জায়গায় ঘুরতে হত পরিবারটিকে। কিন্তু বাড়িতে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ লেখাপড়া চর্চার পরিবেশ। পিতামহীর মুখে শুনেছেন রূপকথার গল্পের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি।

বালক মঙ্গলাচরণের স্মৃতিতে প্রথম যে পরিবেশের ছাপ পড়েছিল তা বরিশাল শহর। এই ছোট শহরটি একদিকে ছিল নিবিড় প্রকৃতি-সংলগ্ন। ছিল কীর্তনখোলা নদীর বাঁধানো প্রশস্ত পাড়। ছিল ঝাউগাছের সারি দেওয়া সুন্দর পথ। জীবনানন্দেরও শৈশব কাটে এই বরিশালে। প্রকৃতি এখানে মানুষের সঙ্গে দূরত্বে অবস্থান করে না। জীবনানন্দের কবিতা পড়লেও তা বোঝা যায়। এই বরিশাল জেলা স্কুলে ক্লাস ফোর-এর ছাত্র হিসেবে প্রথম তিনি নিজের মনকে অনুভব করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বরিশাল তাঁর স্মৃতিতে ফিরে এসেছে বার বার। কবিতা লিখেছেন সেই স্মৃতিকে ঘিরেই।—

এক যে ছিল ছোট্ট ছেলের বরিশাল
স্মৃতির নূপুর ঝুমুর দুপুর তারিখ সাল
... ...
ইস্কুলে যায় মাঠে খেলায় সাতসকাল
ছোট ছেলের সঙ্গী দুষ্টু বরিশাল

('বুকের মধ্যে', কোথাও যাবার কথা ছিল)

বরিশাল মঙ্গলাচরণের চিত্তে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আরও একটি দিক থেকে। স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাসে বরিশালের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। মঙ্গলাচরণ ১৯২৯ সালে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। বয়স নয় বছর। খুব ভালো করে স্বদেশি আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার বয়স না হলেও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের যে উত্তাপ বরিশালে বিশেষভাবে অনুভব করা যেত তার আঁচ পেয়েছেন তিনিও। বরিশালের সন্তান অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বাদেশিকতার বোধ চিরকালই বরিশালের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁর দেশচেতনার অগ্নিবর্ষী গানে মাতিয়ে রেখেছিলেন বরিশাল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিকে। বিংশ শতাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকই সেই সময়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা ১৯৩০-এ। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসু বরিশালে এসেছেন স্বাদেশিকতা বোধের জাগরণে রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায়। বরিশালে বসত স্বদেশি মেলা। প্রথম কৈশোরেই পরাধীনতাকে অনুভব করতে

শিখে গিয়েছিলেন মঙ্গলাচরণ। এই স্বদেশ-সংবেদনা মঙ্গলাচরণের মনের একটি বিশেষ গড়ন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।—

ঘোলা স্রোতের ঘূর্ণি কী উত্তাল
অগ্নিযুগে নিশির ডাকের বরিশাল
... ...
স্বদেশ স্বদেশ করে মিছিল টালমাটাল
ফাঁসির চেরাগ মুখ দ্যাখে তার বরিশাল

('বুকের মধ্যে', কোথাও যাবার কথা ছিল)

পরাধীনতার কালে সব শিক্ষিত মানুষের মনেই সঞ্চিত হয়েছিল অধীন থাকার গ্লানি আর স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা। তবুও এই স্বাদেশিকতার চেতনা সব কবির লেখাতেই সমানভাবে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল—তা নয়। একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই মনে হয় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের কবিতায় ভারতের পরাধীনতা পরিস্থিতিজনিত উপলব্ধি প্রকাশ্য অভিব্যক্তি খুব কমই পেয়েছে। ফ্যাসিবাদের উত্থান ও আগ্রাসন-সম্পর্কিত আশঙ্কা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মানব সভ্যতার বিপন্নতা বোধের যে চিত্র তাঁদের কবিতায় পাই তার প্রকৃতি কিন্তু যতটা আন্তর্জাতিক ততটা স্বাদেশিক নয়। সেই তুলনায় যাঁদের বলি চল্লিশের কবি তাঁরা মার্কসবাদের আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে প্রত্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে জনযুদ্ধ নীতি গ্রহণ করে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থন করলেও, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও পরাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের বোধ কবিতায় রূপায়িত হয়েছে বলে অনুভব করা যায়। তাঁদের মধ্যেও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতার চেতনা ছিল অতীব প্রত্যক্ষ বিশেষভাবে বাংলার কথাই অবশ্য তিনি ভেবেছিলেন। মন্বন্তরের নির্মম আগ্রাসনে বিপন্ন বাংলা থেকে শুরু করে বঙ্গবিভাগের কালে দ্বি-খণ্ডিত বাংলার বেদনা তাঁর কবিতায় বহুভাবে মর্মস্পর্শী ভাষা পেয়েছে। আমরা যথাসময়ে তা দেখাব।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে মঙ্গলাচরণ এসে ভর্তি হলেন মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন-এ। তখন কলকাতায় তাঁদের পরিবারের বসবাস। বরিশালের স্কুলজীবন থেকেই ভালো ছাত্র এবং বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী রূপে তিনি কিছুটা পরিচিতি পেয়েছিলেন। পড়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস; রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সেখানে স্কুলের পত্রিকায় কবিতাও লিখেছিলেন। তবে সে কবিতা নিতান্তই গতানুগতিক ধারার লেখা। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথেরই বালকোচিত অনুসরণ।

মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন-এ নবম শ্রেণীতে তাঁর বন্ধু হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই বন্ধুত্ব হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। রাজনীতিবোধের উন্মেষ এবং কবিতাবোধের বিবর্তনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সময়ে তাঁর মানস-প্রবাহের পথ প্রদর্শক হয়েছে। আবার এই সম্পর্ক-প্রভাবের মধ্যে থেকেই নিজের পথও সন্ধান করেছেন কবি।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় মঙ্গলাচরণ উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৭ সালে। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শাখায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব অব্যাহত। কিন্তু আধুনিক কবিতা

সম্বন্ধে কোনো ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম শুনলেন বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা ভবন'-এর কথা। দেখলেন 'কবিতা' পত্রিকা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে রাজনৈতিক মতের অমিল সত্ত্বেও যাতায়াত শুরু করেছেন 'কবিতা'-র আসরে। মঙ্গলাচরণও নিজের মতো কবিতার চর্চা করছেন। তাঁর একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে ১৯৩৯ সালের দোল সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদক এবং সাহিত্যের পাতা দেখাশোনা করেন অরুণ মিত্র।

মঙ্গলাচরণ বি. এস. সি পাঠক্রমের ছাত্র ১৯৪০ সালে। তখনই তিনি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-র আসরে প্রথম গেলেন। সেখানে পরিচয় হল বহু সাহিত্যিক এবং আধুনিক কবির সঙ্গে। আধুনিক কবিতার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু রাজনীতিবোধের ক্ষেত্রে প্রগতি শিবির অথবা বাম-মনস্কতা সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহ তখনও জাগেনি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাপ্রীতি এবং কবিদের প্রতিও প্রীতি ছিল গভীর। কিন্তু রাজনীতি-প্রীতি ততটা ছিল না। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় কবিতায় সমাজমনস্কতার প্রাধান্য, সাম্যবাদী ভাবনার অভিব্যক্তিকে কিছুটা অপছন্দই করতেন তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেনের প্রতি তরুণ বন্ধুরূপে তাঁর নিবিড় প্রীতি সত্ত্বেও; তাঁদের কবিপ্রতিভার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা থাকলেও বুদ্ধদেব বসু কিন্তু তাঁদের কবিতা সমালোচনার সময় এই দুই কবির নির্দিষ্ট রাজনীতি-উন্মুখতাকে সর্বদাই কিছুটা সমালোচনা করে এসেছেন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এই প্রথম পর্বে খানিকটা হয়ত বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা প্রভাবিতই ছিলেন।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ফ্যাসিস্ট বিরুদ্ধতার উদ্দীপ্ত চেতনা সর্বস্তরে অনুভূত। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আহূত লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে ভারত থেকে যোগ দিয়েছেন প্রতিনিধিরা। বাণী পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ভারতে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ১৯৩৬ সালে। শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'পদাতিক'-এর কবিতাগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরুদ্ধতা এবং সাম্যবাদের উদ্দীপ্ত উচ্চারণ। 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা' এবং 'কমরেড আজ নবযুগ আনবে না/কুয়াশা-কঠিন বাসর যে সম্মুখে'—ইত্যাদি পঙ্ক্তির অভিনবত্ব এবং ভাষা-ছন্দের ঝংকার মুগ্ধ করে দিয়েছে কবিতার পাঠকদের। তবুও কিন্তু দেখা যায় যে, মঙ্গলাচরণ কবিতার সাম্রাজ্যে বন্ধুর এই বিজয়ী পদক্ষেপের ধরনটিতে তখনই আকৃষ্ট হননি।

এখানেই আমরা মঙ্গলাচরণের মানসিকতার খানিকটা পরিচয় পেয়ে যাই। দ্রুত আবেগের বশে কোনো কিছুতেই তিনি সহসা আকৃষ্ট হন না। নিজস্ব চিন্তা এবং যুক্তির পথ পরিক্রমা না করে খুব তাড়াতাড়ি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায় না তাঁকে। এজন্যই কবিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু সময়ই তাঁরা আগের পথ বর্জন করেছেন; স্বীকার করেছেন পূর্ববর্তী চিন্তার আংশিকতা। কিন্তু মঙ্গলাচরণের যেহেতু আগেই ভালো করে ভেবে নেবার অভ্যাস ছিল তাই নিজের ক্ষেত্রে মত ও পথ পরিবর্তন করে নেবার প্রয়োজন প্রায় কখনই তিনি অনুভব করেননি। তাঁর কবিতাতেও আছে এই সুস্থির-মনস্কতার ছাপ।

মঙ্গলাচরণের প্রথম কবিতা-সংকলন 'স্নায়ু' প্রকাশিত হল 'কবিতা ভবন' প্রকাশন থেকে

১৯৪১ সালে। ওই সালেই বি. এস. সি পাস করে তিনি ভর্তি হলেন কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুল-এ। সংকলিত কবিতাগুলি দুটি ভাগে বিন্যস্ত; প্রথম সতেরোটি কবিতা প্রয়াত জননীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত; শেষ ছয়টি কবিতা উৎসর্গ করা হয়েছে বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। মোট তেইশটি কবিতার সবগুলিই নিরূপিত ছন্দে কলাবৃত্তের রীতিতে লেখা। নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বের প্রতিফলন নেই। জীবনের প্রতি আগ্রহ আর অনুরাগই কবিতাগুলির মূল সুর। রাজনীতিও কবিতাগুলির মধ্যে আসেনি।

ভাববস্তুর দিক থেকে বলা যায় যে 'স্নায়ু'-র কবিতাগুলিতে, বুদ্ধদেব বসুর সান্নিধ্যের প্রচ্ছায়াতেই সম্ভবত মঙ্গলাচরণ বিপ্লবের রাজনীতিকে যেন প্রত্যাখ্যানই করেছেন। দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি।—

১. হে বাসুকি বৃথা ফণায় আগুন জ্বালো।
ভুলবো না আমি কৃষ্ণচূড়ার নীড়।
পৃথিবীর মায়া আজো চোখে ভালো।

('সব্যসাচী', স্নায়ু)

২. বিপ্লবীরা এসেছিলো; ফিরে গেলো। ফিরে গেছে আজ।
দূরে দূরে অন্ধকার; বিপ্লবীরা ফিরে গেছে আজ
এসো না শান্তির নীড় বেঁধে রাখি এইবার কপোত-কপোতী?

('মা নিষাদ', স্নায়ু)

কিন্তু 'স্নায়ু' পর্বের কবিতাগুলিতে বিপ্লব প্রত্যাখ্যান করার এই মানসিকতা বিষয়ে তরুণ কবির মনের দ্বিধারও প্রকাশ আছে। যেন মনে হয় কোন পথ গ্রহণ করবেন—মনোজগতে এবং লেখার জগতে—তা নিয়ে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তাঁর। যেন তিনি সন্ধান করছেন মনোমুক্তির পথ। উল্লেখ্য একটি কবিতা।—

আমাদের নারী আছে, আমাদের পুঁথি আছে
আমাদের আছে
গলিত আগুন আর বন্যার ক্ষ্যাপামি ঃ শুধু
যুদ্ধ ভুলে গেছি।

('যুদ্ধ', স্নায়ু)

এই উচ্চারণে কিছুটা আত্মগ্লানি অনুভব করা যায়। মধ্যবিত্ত মনের আবদ্ধতা এবং নিষ্ক্রিয়তার সত্য উঠে এসেছে এখানে। সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের বাক্চাতুর্য-সর্বস্বতার প্রতিও আছে ইঙ্গিত।

কিন্তু 'স্নায়ু' কবিতাগ্রন্থটি তরুণ কবির স্বচ্ছন্দ প্রকরণ কুশলতার জন্য উল্লেখযোগ্য। সব কবিতাই মিশ্র কলাবৃত্ত অথবা কলাবৃত্তে রচিত। কোথাও স্খলন নেই। কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগই বেশি। কলাবৃত্তের পর্বকেই বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন বিন্যাসে সাজিয়ে কবি ছন্দে বৈচিত্র্য এনেছেন। দুটি দৃষ্টান্ত।—

১. উষ্ণ তুষার গলে গলে পড়ে। আমাদের রাত
হারানো চোখের কামনায় নীল, দিনের কিরাত

তবু জীবনের পাঁজরের নিচে শব্দবেধীর
সন্ধান জানে।
মায়া কেন আর এই পৃথিবীর
মহামারী. আর প্রণয়ের আর মানুষশিশুর?
স্তন্যপায়ীরা ভাবছে—ফিরবে মৃত জরায়ুর
জন্মবিহীন যন্ত্রণাহীন জটিল পথেই।

('আজ', স্নায়ু)

২. হারানো-দিন কখনও যদি আসে
সাপের মতো শহরে রাজপথে,
আমরা ভিড় জমাই আশেপাশে।

('ঝাঁপির গান', স্নায়ু)

প্রথম উদাহরণটি সহসা মিশ্র কলাবৃত্তের মতো দেখালেও পড়তে শুরু করলেই ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত চিনতে পারি। কলাবৃত্ত ছন্দে প্রবহমানতা অর্থাৎ বাক্যের ভাবার্থ চরণান্তরে প্রবাহিত করিয়ে দেবার কুশলতা তরুণ কবির কলমে নিপুণভাবেই প্রকাশিত। দ্বিতীয় উদাহরণে পাঁচ মাত্রার কলাবৃত্তের ললিত ঝংকারের সঙ্গে বক্তব্যের ঈষৎ জটিলতা বেমানান হয়নি। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বে 'কখনও' শব্দটিকে কবি সংগতভাবেই তিন মাত্রায় উচ্চারণ করেছেন, চার মাত্রায় নয়। যদিও শব্দটি দেখলে চার মাত্রা বিশিষ্ট মনে হতে পারে। ছন্দের ক্ষেত্রে চোখের কোনো ভূমিকা নেই, শ্রুতির ভূমিকাই প্রধান—তা এখানে বুঝতে পারি।

বুদ্ধদেব বসু কবিতার করণকুশলতার দিকটিতে মনোযোগী ছিলেন। উপমা-চিত্রকল্প-প্রতীকের প্রয়োগে নতুন দৃষ্টিকোণের সমর্থন ছিল তাঁর দিক থেকে। মঙ্গলাচরণের কবিতাতেও সেই যুগের পক্ষে চোখে পড়ার মতো চিত্রকল্প ও বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। পূর্বোক্ত উদাহরণে আমরা ফিরে আসা হারানো দিনকে শহরে রাজপথে 'সাপের মতো' বলে বর্ণিত হতে দেখেছি। নিঃসন্দেহেই একটু নতুন এই প্রয়োগ। এই সর্প ইমেজের আর একটি দৃষ্টান্ত পাই যা মনের দাহময় অন্তর্দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করেছে।—

শিরা আর ধমনীর গলিতে
নোনা ঢেউ আছে বুঝি জ্বলিতে
দেহময় দুটো সাপ দুমুখো

('রক্ত', স্নায়ু)

উপমার ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি।—

তবু আশা মরে নাকো, চিরজীবী আমরা ফাল্গুন
চিরযুবা হোতে চাই, অন্যদিকে নিশঙ্ক মূষিক
অরণ্য রোদনে পটু। (বিধাতা অত্যন্ত প্রাকৃতিক)

('বহুরূপী', স্নায়ু)

ছন্দের দিক থেকেও দেখা যায় এই কবিতাটি মিশ্র কলাবৃত্তের দীর্ঘ পয়ারে রচিত। 'ত্রিশঙ্কু

মুষিক' চিত্রকল্পটির নির্মাণ কবির ক্ষমতার পরিচয় দেয়। মহাভারতীয় বাতাবরণে শূন্যে প্রলম্ব রাজা ত্রিশঙ্কুর তবুও কিছু মহিমা ছিল। কিন্তু ত্রিশঙ্কু শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে ঝুলন্ত অর্থে ব্যবহার করে সেখানে স্থাপিত মুষিকের ছবিটি সমকালের তুচ্ছতাকে যেন তুলে ধরেছে।

'স্নায়ু' পর্বে কবি হিসেবে একভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর মানসলোকের বিবর্তন ঘটল। কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুলে যখন তিনি পড়ছেন তখন বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেবর পার্টির সদস্য। পার্টির গোপন কাগজপত্র অনেক সময়ই থাকত মঙ্গলাচরণের কাছে। ওই সময়টাই এমন যে শিক্ষিত বাঙালি তরুণকে রাজনীতি কোনো না কোনো ভাবে আকর্ষণ করবেই। মঙ্গলাচরণকে প্রত্যক্ষত কৃষ্ণনগরের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তাঁর পিসতুতো ভাই জগৎ মুখোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে। মঙ্গলাচরণ নিজের স্বভাব অনুসারে মার্কসবাদ সংক্রান্ত বইপত্র পড়ে বিষয়টি বুঝে নিতে চেষ্টা করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গভীর আকর্ষণ বোধ করলেন মার্কসবাদের প্রতি। এই তত্ত্বে ১৯৪৪ সালের মধ্যেই তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুললেন অনেকটা। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিকথার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি আমরা যা প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার পৃষ্ঠায় :

"১৯৪৩-১৯৪৪ সালে প্রথম বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রধানত তর্জমার মধ্যস্থতায় মার্কসবাদী বুনিয়াদী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার অন্তর জগতে এত বড় বিপর্যয় তার আগে আর কখনও ঘটেনি। বলা যেতে পারে জীবন-দৃষ্টিতে একটা বিপ্লবই ঘটে গেল।"

('পরিচয়-এ বিশ বছর', পরিচয়, নভেম্বর ১৯৮১)

তরুণ বয়সে অনেককেই দেখা যায় কোনো বন্ধুর বা শিক্ষকের প্রভাবে, অথবা পারিবারিক পরিবেশের কারণে, অথবা তাৎক্ষণিক কোনো আবেগবশত একটি তত্ত্ব ভালো করে না বুঝেই কেউ কেউ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করেন। পরেও কখনও তাঁদের তাত্ত্বিক মানসভিত্তি সেভাবে গড়ে ওঠে না। মঙ্গলাচরণ ছিলেন একটু আলাদা। সুচিন্তিত ধারণা করে নিয়েই তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। পরে এই ধারণার আর মূলগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বিবর্তন তাঁর কবিতায় অবশ্যই আছে, বৈচিত্র্যও আছে; কিন্তু তাঁর বিশ্ব বীক্ষণের মূল দৃষ্টিকোণটির বদল ঘটতে দেখা যায় না।

প্রাথমিক চিন্তার এই ভিত্তিটি সুদৃঢ় ছিল বলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার জটিলতা, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তার স্বাধীনতা বিষয়ে অনুচ্ছ্বাস, স্তালিন-বিরোধিতা পর্যায়ের দ্বিধা-সংশয়, চীন-আক্রমণ ইত্যাদি নানা ঘটনায় যখন অনেক বামপন্থী লেখক বিচলিত হয়েছেন তখনও মঙ্গলাচরণকে কোনো বিরোধী মতাদর্শের কথা ভাবতে হয়নি। যদিও বামপন্থী শিক্ষা অনুসারেই আত্মসমালোচনায় তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না কখনও।

কবির মনে এই পরিবর্তন পুরোপুরি ঘটে উঠবার আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা সংকলন 'মনপবন' ১৯৪২ সালে। এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু পরিকল্পিত 'এক পয়সায় একটি' পুস্তিকা-মালার অন্তর্ভুক্ত বই হিসেবে। আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করবার জন্য বুদ্ধদেব বসু চার আনা (পুরোনো ষোলো পয়সা) দামের ষোলো পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এক একটি কবিতার বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। সিরিজটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

পরিকল্পনার প্রথম পর্বেই তরুণ কবি মঙ্গলাচরণের সংকলন প্রকাশিত হওয়া বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাই সূচিত করে। এই কবিতাগুলিতে মঙ্গলাচরণের দৃষ্টিভঙ্গি ঈষৎ ব্যঙ্গকটাক্ষ প্রবণ। গতানুগতিক রোমান্টিক ভাবালুতাকে একটু বিদ্রূপ করেছেন। ভঙ্গির আপাত লঘুতা এবং তির্যক দৃষ্টির সম্মিলন লক্ষণীয়। বাণিজ্য-মনস্ক বিত্তমুখী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কবির অসমর্থন বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটি উদাহরণ।—

"চতুর চোখের চাওয়া—
বাণিজ্যের হাওয়া
যে-দিকে ফিরবে মোড়—
সেইদিকে তোর
জাহাজের তুলে দিবি পাল,
কালের রাখাল।

('মনপবন ২', মনপবন)

অপর একটি ছোট কবিতা সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি। এই কবিতাগুলিকে কবি এপিগ্রাম নামে চিহ্নিত করেছেন।—

গোরুর মতো শুধু জাবর কাটে
পৃথিবী এইখানে শুক্‌নো মাঠে।
পৃথিবী এইখানে জীর্ণ ঘাটে
জল না-পেয়ে শুধু পাঁক-ই চাটে।

অথচ বৎসেরা শহুরে হাটে
কাটছে চড়া দামে; মূল্য বাঁটে
চতুর ব্যাপারীরা। জীর্ণ ঘাটে
পৃথিবী এক গোরু পাঁক-ই চাটে।

(পৃথিবী এক গোরু, মনপবন)

'মনপবন'-এর কবিতাগুলি মঙ্গলাচরণের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্ভুক্ত এমন নয়। কিন্তু কবি যে নিরন্তর তাঁর বলবার বিষয় এবং বাচনের শৈলী নিয়ে চিন্তা করছেন তা কবিতাগুলিতে অনুভব করা যায়। চিনতে পারি এক কবিকে—যিনি অল্প বয়সেও নিজের কাব্যিক উচ্চারণকে মননশাসিত রাখতে চাইছেন। অল্পদিন পরেই যখন এই মাননিকতার সঙ্গে মিশেছে আবেগময় উপলব্ধির যথার্থ মাত্রা—তখন-ই মঙ্গলাচরণের কবিতা প্রত্যাশিত সিদ্ধিতে পৌঁছতে পেরেছে।

সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে যে ভাবনার আবর্তের মধ্যে থেকে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে নিজস্ব একটি পথের সন্ধান করে নিলেন মঙ্গলাচরণ, অনতিকাল পরেই সেই বিশ্বাস অনুসারে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার পথে পা রাখলেন তিনি। তাঁর নিবিড় সততার পরিচয় এখানে পাই। আদর্শ বলে যা উপলব্ধি করি সেই অনুসারে নিজের জীবনকে আমরা ক'জনই বা গড়ে তুলতে পারি!

মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর মনে হল এই তত্ত্বের যথার্থ প্রয়োগের জন্য ব্যাপক

গণসংযোগ থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীবিহীন সমাজকে সত্য করে তুলতে গেলে শ্রেণী-চ্যুতির অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। মঙ্গলাচরণ ১৯৪৪ সালে অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন। তিনি যোগ দিলেন 'পরিচয়' পত্রিকায় অবৈতনিক কর্মী হিসেবে। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ সংযোগ শুরু হল তখন থেকেই। সেই বছরই, ১৯৪৪ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'পরিচয়' পত্রিকাকে তুলে দিয়েছেন তাঁর কমিউনিস্ট বন্ধুদের হাতে। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক গোপাল হালদার এবং হিরণকুমার সান্যাল। পার্টির সদস্যপদ ১৯৪৫-এর শেষের দিকে অর্জন করলেন মঙ্গলাচরণ।

কিন্তু জীবিকার প্রয়োজন। অভিভাবকদের বিরূপতার সঞ্চার করেছেন ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল পারিবারিক অর্থ-সাহায্য। মঙ্গলাচরণ অস্থায়ী কাজ নিলেন মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কে। কিছুকাল সেখানে কাজ করবার পর সামান্য বেতনে যোগ দিলেন 'স্বাধীনতা' (প্রকাশ : ১৯৪৫) পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে (১৯৪৭)। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক তখন সোমনাথ লাহিড়ি, প্রচার সচিব প্রমোদ দাশগুপ্ত, বার্তা-সম্পাদক সুকুমার মিত্র। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন ননী ভৌমিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য। সমকালীন অপর প্রগতিশীল পত্রিকা 'অরণি'-র (প্রকাশ : ১৯৪১) সঙ্গেও সংযোগ ছিল মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের। সেই পত্রিকার সঙ্গে ছিলেন অরুণ মিত্র, সুশীল জানা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এই সমাবেশ মঙ্গলাচরণের মার্কসবাদী প্রত্যয়কে সব দিক থেকেই সঞ্জীবিত রেখেছিল।

মঙ্গলাচরণের মনের মধ্যে শ্রেণী-চ্যুতির প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেই বঙ্গীয় রেনেসাঁস-এর কাল থেকেই এই কথাটি বলা হয়ে থাকে যে, এই মানস-জাগরণ সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের সমাজে। কথাটি মিথ্যাও নয়। কিন্তু এই আংশিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রেখেও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা শ্রেণী-বিচ্যুত হতে পারেননি। পূরণ করতে পারেননি এই আংশিকতা। ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-বিভাজনের শিকড় এতই গভীর।

মঙ্গলাচরণ কাজ করতে চেয়েছিলেন কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে। কিন্তু কবিরূপে তখনই তাঁর পরিচিতি অবিসংবাদিত। কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে সেই কবিতার রচয়িতা কবির নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। সব সময়ে কবিকে ঠিকমতো বোঝবার পক্ষে তা অনুকূল না হলেও এমন ঘটনা ঘটবার কারণও নিহিত থাকে কবিরই প্রবণতার মধ্যে। মঙ্গলাচরণের নাম করলেই যে-দুটি কবিতার নাম মনে পড়ে সে-দুটি হল 'মেঘবৃষ্টিঝড়' ও 'জননী যন্ত্রণা'। প্রথম কবিতাটি লেখা হয়ে গিয়েছিল ১৯৪৫-এ; প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়'-এ। সকলেরই মন কেড়েছিল কবিতাটি। মনন ও হৃদয়াবেগের যে সংমিশ্রণে মঙ্গলাচরণের কবিতা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলে উল্লেখ করেছি আমরা তার প্রথম সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ ঘটেছিল এই কবিতাটির মধ্যেই। কবিতাটি লিখিত হবার পর থেকে কবি মঙ্গলাচরণকে সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্রেই বেশি করে টেনে নিলেন সাম্যবাদীরা।

দরিদ্র ভারতীয় জনগণের সঙ্গে মেলবার সুযোগ তাঁর প্রথম হল তেভাগা আন্দোলনের সময়ে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পক্ষ থেকে মালদা জেলায় তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখে পাঠাবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁর উপর। সময় ১৯৪৬-৪৭। মালদহের গ্রামে গ্রামে

ঘুরে কৃষকদের জীবন এবং আন্দোলনকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন তিনি। আবার সেই সময়েই ঘটেছিল ১৯৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। এই সময়টাতেই তাঁর জীবনে শ্রেণীচ্যুতির অভিজ্ঞতার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন তিনি।

মঙ্গলাচরণ মনে করেছেন, প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা সদস্যদের দ্বারা গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টিতে এই সমস্যাটি যথেষ্ট গভীর। মানসিক সংযোগের অভাব চিরকাল থেকে গেছে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবী জনতার মধ্যে। দীর্ঘকাল পরেও, পরিণত বয়সে, এই ভাবনা থেকেই তিনি লিখেছিলেন—"সমগ্রভাবে মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশেষত সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে স্বশ্রেণী থেকে উত্তরণের সংগঠিত প্রয়াস কিংবা তার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বঞ্চনাজাত ক্ষোভ ও অসূয়ার বিকল্পকেই প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণীশোষণ-সঞ্জাত ক্রোধ হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি।"

('পরিচয়-এ বিশবছর', পরিচয়, নভেম্বর, ১৯৮১)।

মালদহের গ্রামগুলিতে ঘুরে কৃষকদের জীবনের নৈকট্যে পৌঁছতে পারার এই অভিজ্ঞতাকে তিনি সারা জীবন মনের মধ্যে লালন করেছিলেন। তাঁর কবিতায় জনজীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চিত্রকল্পরূপে কৃষক, জমি, ফসল—ইত্যাদি বিষয় বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রমিকদের কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তাঁর কবিতায় জনজীবনের চিত্রটি আঁকা হয়েছে বাংলার গ্রাম ও কৃষককে ঘিরে। এই সময়ে তিনি বেশকিছু কবিতা লিখেছিলেন, যেগুলি 'মেঘবৃষ্টিঝড়' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৫১ সালে। কিন্তু তার আগেই ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত একটি কবিতা সংকলনে আমরা পেয়েছি মঙ্গলাচরণের পাঁচটি কবিতার একটি গুচ্ছ। এই বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ঘুমতাড়ানি ছড়া' নামে কিশোরদের জন্য চিত্রশোভিত একটি কবিতার সংকলন এই সময়ে প্রস্তুত হয়েছিল। কিশোর মনকে জনজীবন, প্রগতিমনস্কতা আর গণসংগ্রামের দিকে আকর্ষণ করবার জন্য নতুন ধরনের ছড়া ও কবিতা লিখেছিলেন। সেই সময়ের চারজন প্রগতিবাদী কবি—বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। এই সংকলনের পাঁচটি কবিতাতেই মঙ্গলাচরণকে প্রথম পাওয়া গেল সংগ্রাম ও সাম্যবাদের ভাবাদর্শের কবিরূপে। তেভাগা-র অভিজ্ঞতাকে রূপ দিলেন তিনি; সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আদর্শকে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করলেন; সাধারণ মানুষের জীবনের গল্পকে করে তুললেন কবিতার বিষয়। এই সময় থেকেই তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-স্পন্দিত জীবনের বহমান স্রোত মিশে যেতে লাগল। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি থেকে মঙ্গলাচরণের রচিত তিনটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছি। দেশের মাটি ও মানুষকে ঘিরে তাঁর কবিতার যে পরবর্তী সম্ভারের আমরা পরিচয় পাবো তার সূত্রপাত এই কিশোর-সংকলনটির কবিতা থেকেই।—

১. এই বাংলা দেশ। এর স্বপ্ন শেষ। এর প্রাণ জ্বালায়
সব পঙ্গপাল। ভাই ধান সামাল। ভাই মান সামাল,
ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না। ঘুম তাই পালায়।

('ঘুমতাড়ানি গান', ঘুমতাড়ানি ছড়া)

২. আমরা ধানকাটার গান গাই। আমরা লোহাপেটার গান গাই।
আমরা গান গাই।
আমরা রাম-রহিম সর্দার, সারছি যার যা কাজ কারবার—
এমনি দিন ভোর।
('ধানকাটার লোহাপেটার গান', ঘুমতাড়ানি ছড়া)

৩. সেই কবে দুই ভাই এই দেশে ঘর বেঁধে গড়লাম
মাঠভরা ধানসোনা-স্বপ্নের নবান্ন দুর গাঁয়ে,
ভরলাম পাতাঝরা ঘরজ্বলা আকালের ঘুরপথে
....
তারপর কোত্থেকে দুশ্‌মন ফুসমন্তরে তার—
লাগ্—লাগ্—ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করে দিলে তারপর।
....
—এ রক্ত-সমুদ্দুর,
পার হয়ে ঘরপোড়া-মন তাই বুক বাঁধে, চোখে জল,
আসল যে শয়তান তার মুখে হাসি দেখে শেষ পরে
হুঁশিয়ারি হাঁক পাড়ে, ভাবে কবে সেদিন—যেদিন এই
কান্নার পান্নায়ও ঠিকরোবে বজ্র ও বিদ্যুৎ?
('কান্নার পান্নায়ও ঠিকরোবে', 'ঘুমতাড়ানি ছড়া')

পরের বছরেই প্রকাশিত হল মঙ্গলাচরণের 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪৮) নামক কবিতা সংকলন। এই সময়টিতে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ এবং কর্মপন্থা তিনি দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেছেন। তাই ঠিক সেই সময়ের ভারতে কমিউনিস্টদের অবস্থান দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য একটু বেশি স্পষ্টভাবেই উঠে এল তাঁর কবিতায়। তখন তেলেঙ্গানায় মার্কসবাদীদের পরিচালনায় ঘটেছিল কৃষক-অভ্যুত্থান। গড়ে উঠেছিল এক সাময়িক স্বাধীন অঞ্চল। সেই উদ্দীপনার অভিঘাতে লেখা হল কিছু কবিতা—আন্তরিক কিন্তু একটু বেশি স্পষ্ট; একটু বেশি বক্তব্যমূলক। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হল।—

অশান্ত কলকাতা ডাকছে
মালয়ের হুঁশিয়ার কামিনের গান,
প্রচণ্ড কলকাতা ভাসছে চীনের চাষীর ডাক
উদাত্ত ইউক্রেন,
('শান্তির মশাল', তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা)

'মেঘবৃষ্টিঝড়' কবিতাটি মঙ্গলাচরণকে কবি হিসেবে অসংশয় পরিচিতি দিয়েছিল, 'মেঘবৃষ্টিঝড়' সংকলনটি তাঁকে দিল বাংলা সাহিত্যের পরম্পরায় বিশিষ্ট কবি রূপে এক সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা। 'মেঘবৃষ্টিঝড়'-এর প্রকাশকাল ১৯৫১। তারপরে প্রকাশিত তাঁর কবিতা সংগ্রহগুলি হল—'ক'টি কবিতা ও একলব্য' (১৯৫৯), 'বৈরী মন' (১৯৭১), 'সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিন্‌দেশী' (১৯৮৩), 'কোথাও যাবার কথা ছিল' (১৯৮৬), 'ঝাপট দাপট অলৌকিক এক'

(১৯৮৭), 'ঠিকানা-বেঠিকানা' (১৯৯৩)। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি সময় ব্যাপ্ত করে লিখে যাওয়া এই কবিতাধারাকে আর এখন স্বতন্ত্রভাবে দেখবার ততটা প্রয়োজন নেই। মনের একটি উত্তরণ সম্পন্ন হয়েছে। কবি-চিত্তে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে কীভাবে, কোন শৈলীতে, কোন উপলব্ধির সংবাহনে তিনি গড়ে তুলবেন তাঁর কাব্য-ভুবন। কবিতার সেই রাজ্যে সর্বাতিশায়ী হয়ে আছে স্বদেশ ও স্ব-ভূমি। বিশেষ করে বাংলার পটচিত্রই তার অবলম্বন। সেই কবিতার জগতে আছে দেশের মানুষ—গ্রামীণ নারী ও পুরুষ, কৃষক ও শ্রমিক—যারা বিন্দু বিন্দু শ্রমে গড়ে তোলে নিজেদের একমুঠো সংসার। যখন সেই প্রিয় বাসভূমি বিপর্যস্ত হয়ে যায় খরায়, বন্যায়, মড়কে; যখন সেই প্রিয় ঘর উচ্ছিন্ন হয়ে যায় রাজনৈতিক সংঘাতে, সাম্প্রদায়িকতার বিষে—তখন আহত, বিক্ষত মানুষের বেদনা, ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা, শোক এবং পুনশ্চ বাঁচবার সংগ্রামকে ধ্বনিত করেছেন কবি। এখানে আর স্পষ্ট করে কিছু ঘোষণা করতে হয়নি; পেশ করতে হয়নি রাজনৈতিক বক্তব্য। হৃদয়ের স্বতোৎসারিত আবেগে সাধারণ মানুষের জীবন-চলচ্চিত্র উঠে এসেছে কলমের আঁচড়ে। মানুষে মানুষে প্রিয় সম্পর্কের বাঁধনগুলিতে লেগেছে টান। কবিতা উঠে এসেছে ছবিতে, চিত্রকল্পে আর কবির নিজস্ব বাচনে। সেই নিজস্বতা, একজন প্রকৃত প্রগতিমনস্ক কবির মতোই ব্যক্তিমনের অনুভব আর গণমানসের সঙ্গে সংলগ্নতার সংশ্লেষে সুনিবিড়।

কবিতা-সংকলনগুলির স্বতন্ত্র আলোচনায় না গিয়ে আমরা মঙ্গলাচরণের সৃষ্টিধারার কয়েকটি দিককে অনুসরণ করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু তার আগে এখানেই আমরা একটু আলোচনা করে নিতে পারি সমাজ, রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ এবং শিল্প সৃষ্টির আদর্শ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের দিক।

আমরা দেখেছি যে মার্কসবাদী শিক্ষা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনদৃষ্টির ব্যাপ্তি ও বিস্তার ঘটেছিল। সাধারণভাবে মার্কসবাদের অভিমুখীনতা সমগ্র বিশ্বের শ্রেণীবিভক্ত বিন্যাসের দিকে প্রবাহিত। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রিক সীমারেখার গণ্ডীতে মানুষকে সাধারণত বাঁধেন না। তাঁদের কাছে পুঁজিবাদী শোষক এবং শোষিত সর্বহারা—সমগ্র বিশ্বে এই শ্রেণী বিভাজনই প্রধান। দ্বিতীয়ত এই মতাদর্শ যতটা আন্তর্জাতিক ততটা যেন স্বদেশমুখী নয়। স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে বিত্তনির্ভর শ্রেণীবিন্যাসের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোই তাঁদের কাছে মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশ্বাসের কারণে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বার বার সমালোচিত হয়েছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের কালে। গান্ধি-পরিচালিত কংগ্রেসের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁদের ভাবনার মিল ছিল না, আবার সশস্ত্র বিপ্লবী পন্থাতেও তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে তীব্রতর করবার পরিবর্তে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মিত্রশক্তিকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের উত্তাল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করেননি। সর্বোপরি ভারত স্বাধীন হলে তাঁরা সেই স্বাধীনতাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রতিটি পদক্ষেপই কিন্তু তাঁদের খানিকটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল স্বাধীনতাকামী সাধারণ ভারতবাসীদের কাছ থেকে। কমিউনিজম-এর ধারণাটাই মূলগতভাবে আন্তর্জাতিক। দেশাত্মবোধে আপ্লুত হয়ে পড়া কমিউনিজম-এর ধর্ম নয়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্ট হিসেবে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সবই কিন্তু সমর্থন করেছিলেন।

অন্তত বিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য পরবর্তীকালেও লিখিতভাবে প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁর কবিতার অনুসরণে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলা নামের দেশটির সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে চিরকাল জড়িয়ে ছিল তাঁর হৃদয়। হয়ত বা শৈশবের বরিশালের অগ্নিযুগ-স্মৃতিই তার কারণ। স্বদেশের প্রতি এই অনুরাগ ও মমত্বের বন্ধন থেকে যে কবিতা জন্ম নিল তাঁর মনের মধ্যে সেখানে উদ্বেল হয়ে আছে বঙ্গভূমির প্রতি তাঁর ভালোবাসা। এখানে তিনি একটি পরম্পরা-সিদ্ধ চিত্রকল্পে স্বদেশকে মূর্ত করেছেন কবিতায়। তিনি দেশকে দেখেছেন নারী প্রতীকে।

এই কল্পনাটি একেবারেই নতুন নয়। দেশ এবং মৃত্তিকাময়ী ভূমি এক অবিচ্ছিন্ন ধারণা। উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন ভূমি এবং নারী সুপ্রাচীন কাল থেকে পরস্পরের চিত্রকল্প রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রমে সন্তানের জননী আর শস্যময়ী মৃত্তিকার অস্তিত্ব মিশে গেছে শিল্পীর কল্পনায়। তাই শাস্ত্রকার ঋষি এক সূত্রে বেঁধেছেন জননী আর জন্মভূমিকে, তাকে দিয়েছেন স্বর্গের চেয়েও উচ্চ স্থান।

বাংলা কবিতায় স্বদেশের মাতৃকা-মূর্তি বহু প্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল এবং সেই পর্বের আরও অনেক কবির কথাই বলা যায়। এই কবিদের লেখা কবিতায় সাধারণত দেশমাতৃকার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তির পরিকল্পনাই করা হয়েছে। যদিও পরাধীন ভারতের চিত্র অঙ্কনে মলিন মুখ জননীর ছবিও ভেসে এসেছে বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনায়। মঙ্গলাচরণের কবিতায় দেশজননীর মূর্তি দুঃখে, উপবাসে, নির্যাতনে এবং সন্তান হারানোর যন্ত্রণায় আহত। চল্লিশের অধিকাংশ কবিই দেশের মাতৃকা রূপ সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করেননি। মঙ্গলাচরণ এ বিষয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম।

জননীরূপিণী স্বদেশের চিত্রকল্পটিকেই আগে দেখা যাক। নিপীড়নের যন্ত্রণায় আর আঘাতের রক্তক্ষরণে মা এবং সন্তানের চিত্রকল্পকে এক সূত্রে বেঁধে মঙ্গলাচরণ লিখেছেন—

আয় তুই ঈশানী মা
মিথ্যে এই কাকবাসা ভেঙেচুরে একবার আয়
আমার দগদগে বুক মাড়িয়ে, ঘা দিয়ে, পায়ে-পায়ে
ঝরিয়ে দরদর রক্ত, যন্ত্রণায় জারিয়ে মহিমা।

আয় জন্মদুঃখিনী মা রক্তে আলতা পরাই দু'পায়ে

('হায় জন্মদুঃখিনী মা', 'মেঘবৃষ্টিঝড়')

মায়ের দুঃখের এই কবিতাগুলিতে একসঙ্গে মিশে গেছে মন্বন্তরের বিপন্নতা, দেশবিভাগের বিপর্যয় আর ঔপনিবেশিক শাসকের অত্যাচারে হারিয়ে যাওয়া দেশসেবকদের জন্য কবির কাতর হৃদয়ের সহমর্মিতা। তাই তিনি আর এক মাতৃমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেন দেশবিভাগের পটভূমিতে।—

শিয়ালদ'র প্ল্যাটফর্মে আছড়ে-পড়া উদ্বাস্তু সংসারে
বিষাদপ্রতিমা
মা তোমার ঘর নেই।
... ...

কত লোক আসে যায়
সেই যে ছেলেটা ফেরে নাকো
ঘরে-ঘরে এত ঘর, প্রাসাদনগর কলকাতা
মা তোমার ঘর নেই, মাগো।

('শুকনো মুখ, উস্কোখুস্কো চুল', ক'টি কবিতা ও একলব্য)

কখনও তাঁর কবিতার ভাষায় স্বদেশের সমস্ত বিপন্নতা একীভূত হয়েছে এবং জন্ম নিয়েছে 'জননী যন্ত্রণা'র মতো কবিতা। সঙ্গতভাবেই এই কবিতাটির তীব্র অনুভবের আঘাত পাঠক সহজে ভুলতে পারেন না। এই কবিতায় সংকটের প্রবল আততি, সংগ্রামের মরিয়া অভিযান আর মানুষের দুর্মর আশা মিলেছে এক অঙ্গে। কবিতাটির কিছুটা অংশ কবির ভাষায় না শুনলে তার বিপুল ব্যঞ্জনার উপলব্ধি সহজে অনুভব করা যাবে না।—

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে—যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।

... ...

ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মতো এককোণে বউ, দুয়োরে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।

... ...

একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে :
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে
এক নামে যেই ডাকলে—অ-নে-ক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

('জননী যন্ত্রণা', ক'টি কবিতা ও একলব্য)

কিন্তু মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দেশ-সংক্রান্ত নারী চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য এখানে—সর্বত্রই মাতৃকা ইমেজের আধারে তিনি দেশকে দেখেননি। চিত্রকল্পটি নারীর, সব সময়ে জননীর নয়। 'মেঘবৃষ্টিঝড়' কবিতায় অত্যাচারিত এক গ্রামবধূর ছবিতে তিনি স্বদেশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। লিখেছেন—

সেই তোমার সবুজ শাড়ি,
কালো কাজল চোখ
ছিঁড়ল টেনে সংগ্রামের সংঘাতের নখ।
সময় নেই, সময় নেই

কবে জানাই শোক

('মেঘবৃষ্টিঝড়', মেঘবৃষ্টিঝড়)

এই কবিতাটিতে স্বদেশকে তিনি দেখেছেন 'নিতান্ত এক গাঁয়ের মেয়ে'-র মূর্তিতে। ধান ভানা, জল আনার জীবন, জীবনের শান্তি সেখানে উন্মূলিত হয়ে গেছে দেশভাগের ফলে। পথের মধ্যে নিপীড়িত হয়েছে সেই নারী। স্বদেশকে ধর্ষিত নারীর উপমায় বোধহয় একমাত্র মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ই দেখেছেন।

নারীরূপিণী এই স্বদেশকে বধূরূপে, প্রিয়ারূপে কল্পনা করবার স্বাতন্ত্র্যও সম্ভবত কেবল মঙ্গলাচরণের লেখাতেই আমরা পাই। জীবনানন্দ বাংলার যে রূপকে দেখেছেন তাকে আমরা বলেছি 'রূপসী বাংলা' (নামটি কবির দেওয়া নয়)। মঙ্গলাচরণ তাঁর কোনো কোনো কবিতায় যা লিখেছেন তার সাক্ষ্যে বলতে পারি—তাঁর বাংলার সৌন্দর্য যেন প্রেয়সী বাংলার রূপ।—

দরজা খোল একটিবার দরজা খোল দাঁড়াও
দাঁড়াও চোখে জল ঠোঁটের কমলারঙ হাসির
আভাসে মন রাঙিয়ে মুখ তোলো না, মুখ ফেরাও
বাংলা, তুমি বাংলা, তুমি বাংলাদেশ আমার।

('বাংলা, হায় বাংলা', মেঘবৃষ্টিঝড়)

এই বৈচিত্র্যের এখানেই শেষ নয়। যখন দেখি এর পরেও স্বদেশকে তিনি কোনো কোনো কবিতায় কন্যার চিত্রকল্পে উপলব্ধির বৃত্তে আনতে প্রয়াসী হয়েছেন তখন তাঁর স্বদেশচেতনার আবেগমথিত নিবিড়তায় আমাদের মন নতুন করে মুগ্ধ হয়। স্বদেশকে কন্যা অনুভব করবার মমত্ব বাংলা কবিতায় বোধহয় আর কোথাও দেখা যায়নি।—

দূরে রাখতে তোরে বড় ভয়
রে কন্যকা, আমার স্বদেশ।
অবুঝ রে, অভিমানী তুই
তোরে দিয়ে যাই হাতে কার!
যে তোরে কর্ষণ করে তার
স্বপ্ন বোনে ইস্পাতে যে—তার
বিদ্যুৎ-খর্পর বাহু যার
তোর গলায় বরমাল্য—সেই
রূঢ় ঋদ্ধ সংবেদনশীল
হাতে তোরে করি সমর্পণ।

('রে কন্যকা, স্বদেশ আমার', কোথাও যাবার কথা ছিল)

এর পরেও কবি আমাদের বিস্মিত করে দেন আরও এক আশ্চর্য দেশকল্প নারী-প্রতীক নির্মাণে। অতীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে যুগ্মভাবে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত কবিতা-সংকলনে তিনি এই ব্যতিক্রমী চিত্রকল্পটি তুলে ধরেছেন।—

মাটির মনের মধ্যে জননীর অন্ধকার
অন্ধকারে পুনর্জন্মে ফেরা

আমাকে উন্মাদ করবি আস্ত গিলে খাবি বলে
রাক্ষসী স্বদেশ।

('ফেরা' ঝাপটদাপট অলৌকিক এক)

'রাক্ষসী' চিত্রকল্পটি এখানে কোনো সর্বনাশের দেশক নয়। বাঙালির ঘরোয়া বাগ্‌ধারায় স্নেহসিঞ্চিত সম্পর্কের রেশ ধরে এই ধরনের উক্তি প্রায়শই করা হয়ে থাকে। মঙ্গলাচরণের সমগ্র কবিতাবলি ব্যাপ্ত করে এই দেশ-নারী ইমেজ আরও বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে আছে। গর্ভিণী জননী, ঘুমপাড়ানি মা, ঘুঁটে কুড়ুনি মা, রজস্বলা যুবতী ইত্যাদি বহু অনুষঙ্গেই কবির এই কল্পনা প্রাণিত হয়েছে।

স্বদেশকে অবলম্বন করে রচিত তাঁর এই কবিতাস্রোতে বার বার নতুন তরঙ্গের উচ্ছ্বাস কবির হৃদয়ে আলোড়ন এনে দিয়েছে। প্রথম যুগের স্বাধীনতা আন্দোলন; তারপর দেশ বিভাগের যন্ত্রণার স্মৃতি; সব শেষে ১৯৭০-৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার আন্দোলনে তাঁর দেশ ভাবনা ভাষা পেয়েছে বার বার। প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত 'বুকের মধ্যে' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭১। সেই কবিতায় আছে বাংলাদেশ যুদ্ধ-প্রসঙ্গ।—

আজকে হঠাৎ দেশান্তরের পঙ্গপাল
উড়ে এসে বসল জুড়ে বরিশাল
... ...
রক্ত খালি রক্ত—স্মৃতি স্বপ্ন লাল
লক্ষ নদীর রক্তস্নানে বরিশাল
... ...
বুকের মধ্যে দাপায় বাংলাদেশ দামাল
বুকের মধ্যে ভূগোল-ভোলা বরিশাল।

('বুকের মধ্যে', সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিন্‌দেশী)

বাংলাদেশের আন্দোলনকে ঘিরে অনেক কবিতাই লিখেছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষত নারী-ইমেজ সর্বত্র নেই। কিন্তু কবির মনের মধ্যে গভীর-প্রোথিত হয়ে আছে যে স্বদেশমূর্তি তারই রূপায়ণ এই কবিতাগুলিতে। আমরা দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে মঙ্গলাচরণের লেখায় বঙ্গভূমি স্বদেশ-প্রসঙ্গটি শেষ করব।—

রাত্রি ভোর হবে বলে
বিনিদ্র বাংলার ভাষা বুক পেতে বসে আছে
রাইফেলের মুখে...

('এই রাত্রে', কোথাও যাবার কথা ছিল)

নবজাতকের জলতরঙ্গ কান্নায়
আ মরি বাংলা ভাষা
আমার সোনার বাংলা
আহ্, বাংলাদেশ

('নাম বাংলাদেশ', কোথাও যাবার কথা ছিল)

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবন উপলব্ধির যে চিত্রকল্পগুলি পুনরাবৃত্ত হয় তার মধ্যে প্রধান হল কৃষি চিত্রকল্প। একাধিক কারণের সমন্বয়ে তা ঘটেছে। প্রথমত, স্বদেশ-ভাবনারই অবিচ্ছিন্ন উপাদান মৃত্তিকা স্মৃতি। মাটি-ই মানুষের প্রথম আশ্রয়, তার দাঁড়াবার জায়গা; মাটির বুকেই মানুষের ঘর তোলা এবং বসবাস। যে অরণ্য আদিম মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির অবলম্বন ছিল মাটির বুকেই তার জন্ম। মৃত্তিকা কর্ষণ করে ফসল ফলাবার শিক্ষা থেকেই মাটির সঙ্গে মানুষের স্থাবর সম্পত্তির ধারণা একাত্ম হয়ে গেছে। মাটির ভাগ নিয়েই মানব সভ্যতায় দেখা দিয়েছে যুদ্ধ। খরায় মাটি পুড়লে, বন্যায় মাটি ভাসলে মানুষ বিপন্নতার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছয়। মঙ্গলাচরণের স্বদেশ-অনুরাগের সঙ্গেই তাই মৃত্তিকাবোধের স্বাভাবিক সংযোগ। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছিল গ্রামে। তাই মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। পরে নাগরিক জীবন সেই মৃত্তিকার স্পর্শ ভুলিয়ে দিতে পারেনি।

মঙ্গলাচরণ সাম্যবাদের দীক্ষা যখন নিয়েছেন, তখন থেকেই চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিত্ত ও সংস্কৃতির দূরত্ব অতিক্রম করে প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে। যখন মেডিকেল স্কুল-এর পড়া ছেড়ে দিয়ে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে এসেছিলেন তিনি, তখন থেকেই চেয়েছিলেন কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে। কিন্তু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এই প্রবন্ধ লেখককে তিনি জানিয়েছিলেন, যে, পার্টি থেকে তাঁর স্থান নির্দেশিত হল সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে—লেখকরূপে। কারণ তাঁর হাতের কলমে ছিল প্রকৃত লিখন প্রতিভা। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা প্রধানত চালিত বলে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রকৃত পরিস্থিতি, সমস্যা এবং মনস্তত্ত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ ধরা দিত না। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে এই সমস্যা যথেষ্ট গভীর ছিল বলে তিনি চিরকাল মনে করেছেন। তাঁর পরিণত জীবনে রচিত প্রবন্ধ থেকে তাঁর অভিমত দেখতে পাই।—

"সমগ্রভাবে মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশেষত সংস্কৃতি-কর্মীদের মধ্যে স্বশ্রেণী থেকে উত্তরণের সংগঠিত প্রয়াস কিংবা তার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বঞ্চনাজাত ক্ষোভ ও অসূয়ার বিকল্পকেই প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী শোষণ সঞ্জাত ক্রোধ হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি।" ('পরিচয়-এ বিশ বছর', পরিচয়, নভেম্বর ১৯৮১)

বাক্যের গঠনে যে সামান্য জটিলতার আভাস পাওয়া যায়, ঠিক তেমন গদ্য লিখতেন না মঙ্গলাচরণ। আত্মসমালোচনার অথবা তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানগত সমালোচনা অপ্রিয়তাকে কিছুটা আবৃত করবার জন্যই সম্ভবত অভিব্যক্তির ওই ঈষৎ ঘোরানো ভঙ্গি। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা সোজা কথায় বললে দাঁড়ায়—মধ্যবিত্তপ্রধান কমিউনিস্ট পার্টিতে শ্রেণীচ্যুত হবার কোনো প্রকৃত প্রয়াস বা সচেতনতা ছিল না। ফলে সর্বহারা শ্রেণীর মানসিকতার বিচারে তাঁরা নিজেদের শ্রেণীর ধারণাই আরোপ করতেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৬-৪৭ সালে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় যখন তেভাগার প্রতিবেদন লেখবার কাজ নিয়ে মালদহে গেলেন, তখন কিছু সময়ের জন্য তিনি কৃষকদের জীবন ও সমস্যার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। সেই প্রথম তিনি চিনলেন প্রকৃত দরিদ্র শ্রেণীকে। এই সংযোগ তাঁর মনের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার ঐকান্তিকতা

থেকেই তাঁর মনের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের চিত্রকল্পরূপে স্বাভাবিক রূপনির্মিতি হয়ে উঠত মাটি, জমি, কৃষক, কৃষিকর্ম এবং ফসল। শ্রমিকদের চিত্র এবং চিত্রকল্পও তিনি এনেছেন। কারণ সাম্যবাদী মতাদর্শে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল বিভিন্ন দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে সেই গুরুত্ব অনেকটাই মধ্যবিত্ত মানসে প্রতিফলিত একটি আদর্শ ও কল্পনামিশ্রিত মনোভঙ্গিতে পরিণত হয়েছিল—এই সত্য কথাটি-ই উচ্চারণ করেছিলেন মঙ্গলাচরণ।

এই মানসিকতা থেকেই বার বার ওই মৃত্তিকা এবং কৃষক সংক্রান্ত চিত্রকল্প মঙ্গলাচরণের কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছে। 'মেঘবৃষ্টিঝড়' কবিতায় লিখেছেন—

> "চষা-জমির কানে-কানেই ভোরবেলার সোনালী গান গেয়েছিলাম পেয়েছিলাম তার বুকেই ফিরে আসার ইশারা :"

ওই পর্বের অনেক কবিতায় তিনি মাটির বিভিন্ন রূপের ছবি এঁকেছেন। কখনো সেই ছবি ভয়ঙ্কর—"করোটি-কণ্ঠী কঙ্কাল-হাওয়া পোড়ো প্রান্তর" ('মেঘবৃষ্টিঝড়'); কখনো আবাদহীনতার বিষণ্ণতায় তাঁর স্বর ভারাক্রান্ত—"মাঠ...মাঠ.../যতদূর চোখ যায় ধুলোয় ধূসর খেত জমি" ('এ জমি', কটি কবিতা ও একলব্য)।

'মেঘবৃষ্টিঝড়' সংকলনের অন্তর্গত তাঁর আর একটি সুপরিচিত কবিতা 'হিমাচল আসমুদ্র রুদ্র'। এই কবিতার চিত্রকল্পটি কবির কল্পনার ব্যাপ্তিকে ধারণ করে। এখানে সমগ্র পৃথিবী এক মৃত্তিকা-খণ্ড এবং নদীগুলি যেন অ-লৌকিক কোনো বিশাল অঙ্গুলি—আঁকড়ে আছে মাটিকে।—

> "কী ঢেউ
> মেঘনায় নীল পদ্মায় পলিরঙ গঙ্গায় গেরুয়া—যে-কেউ
> নর্মদা বাহুবন্ধে, সিন্ধু
> আঙুলে পাঁচটি আঙুলে, সে-ঢেউ
> আঁকড়িয়ে ধরে মাটিকে, যে-মাটি
> পঞ্জাব ধূ-ধূ সিন্ধু পাথুরে
> বিন্ধ্য যে-মাটি
> বাংলা স্নেহের কাঙাল, এ-মাটি
> হিমাচল আসমুদ্র, রুদ্র"

আবার কখনও আকাশ ও সমুদ্র পরিব্যাপ্ত এই মৃত্তিকার স্বপ্নে সঞ্চরণ করে কবি ফিরে আসেন বাস্তবের মাটির জন্য চিরকালীন মানবের আদি সেই আহ্বান।—

> "অন্ধকারের কাফন ছেঁড়ে দুহাত
> খুঁজি মাটি...মাটি...বনরাজিনীল মাটি"
>
> ('দৈনন্দিন', কটি কবিতা ও একলব্য)

মৃত্তিকা এবং কৃষক সংক্রান্ত বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে কৃষকের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা একটিমাত্র কবিতার উল্লেখ করছি। কৃষককে অন্নদাতা-র ভূমিকায় রেখে মহিমান্বিত করবার কল্পনা বাংলা কবিতায় অনেক দেখা গেছে। অমিয় চক্রবর্তী মন্বন্তরের সময় রচিত একটি

কবিতায় কৃষককে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—

"তোমরা অন্নদাতা/জয় করো এই শানবাঁধা কলকাতা।"—এই পংক্তিতেও আছে কৃষককে শক্তিমানরূপে দেখবার কল্পনা। মঙ্গলাচরণ বিপন্ন কৃষককে দেখেছিলেন খুব কাছে থেকে। তাই বেশ কিছুকাল পরেও যখন কৃষককে নিয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি, তখন সেখানে প্রধান সুর হয়েছে বেদনা। হয়তো, 'অন্নদাতা' কবিতাটি লেখবার সময় তাঁর মনে পড়েছিল অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাটির কথাও।—

"খুঁজে কৃষককে মুখে-ফেনা-তোলা দেয়ালে কুটেছি মাথা
কিংবা ফুসলে নিয়েছে স্বপ্ন আমন অলীক গাঁ :
চমক ভাঙতে দেখি ফুটপাথে হা-অন্ন হাত-পাতা
গ্রামছেঁড়া আর গঞ্জ না পাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ছা—
আমার অন্নদাতা।"

('অন্নদাতা', বৈরীমন)

মৃত্তিকা-প্রতীকেরও বহু বিচিত্র রূপায়ণ আছে তাঁর কবিতায়। তার কিছু পরিচয় আমরা দিয়েছি। ঈষৎ ভিন্ন ধরনের একটি চিত্রকল্প উদ্ধৃত করে শেষ করব এই প্রসঙ্গ। এখানে মাটিকে রজস্বলা যুবতী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই নারীর উর্বর হয়ে ওঠার কামনা পূর্ণ করে এমন কেউ কোথাও নেই। অজন্মা তাকে ফেলে পালায়; খরা তাকে গ্রাস করে, কিন্তু সেই খরা নপুংসক। আকাশে মেঘ তাকে ভোলায়, কিন্তু সর্বদা সেই মেঘে বৃষ্টি ঝরে না। তাই মাটি থেকে যায় অ-ফলা। নারী এবং মৃত্তিকা—এই দুই অস্তিত্ব মানুষের আদিতম কল্পনা থেকেই একে অপরের চিত্রকল্প রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, প্রত্যক্ষত উৎপাদন সম্ভব করে মৃত্তিকা ও নারী উভয়ে। উভয়েরই উৎপাদিকা শক্তি কর্ষণ-সাপেক্ষ। এই সত্যটিকে খুব অভিনব ধরনের একটি চিত্রকল্পে মূর্ত করেছেন মঙ্গলাচরণ।—

"ফেলে পালায় যুবতী ভুঁই অজন্মার ভরা
প্রায় ফি-সন নপুংসক খরা
আবার থেকে-থেকে মেঘের রমণ ডাকে ছলা
যুবতী-বুক কন্যা ভুঁই কনে রজস্বলা।"

('চাওয়া পাওয়া', 'কোথাও যাবার কথা ছিল')

কবিতার বিষয় এবং কবিতার নির্মাণ অ-বিচ্ছেদ্য। কিন্তু মঙ্গলাচরণের কবিতার ভাষা, চিত্রকল্প এবং ছন্দের বিবিধ কারিগরি বিশ্লেষণ করে দেখাবার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধের পরিসর প্রয়োজন। আমরা এখানে তা করব না। কিন্তু সামগ্রিক কবিতা শৈলী-র দিক থেকে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশের জন্য দুটি রীতিগত পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেছেন বার বার। সেই দুটি প্রসঙ্গ আমরা একটু আলোচনা করব।

প্রথম পদ্ধতিটিকে বলা যায় উল্লেখ-পদ্ধতি। উপলব্ধির সবটুকুই ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা না করে কবি উল্লেখ করেন একটি বা দুটি শব্দ। সাধারণত সেই শব্দ কোনো ব্যক্তিনাম বা স্থান-নাম; অথবা কোনো একটি সাল বা তারিখ। সেই শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনো-না-কোনো কাহিনি, ইতিহাস অথবা বিশেষ কোনো ঘটনার অনুষঙ্গ।

সেই উল্লেখের সূত্রে পাঠকের মনে জেগে ওঠে সেই স্মৃতিপুঞ্জ। তার ফলে কবির উদ্দিষ্ট ব্যঞ্জনা পাঠকও অনুভব করেন সমগ্র বিস্তারে ও গভীরতায়। এই রীতিতে কবির বলবার কথাটি বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। ভাষার শক্তি বাড়ে। কবির উপলব্ধির বিস্তার হয় বহুব্যাপ্ত। কিন্তু এই রীতির সমস্যা হল পাঠকের পঠনবৃত্ত ও মনন-শক্তির তারতম্য। প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, সমকালীন রাজনীতি—এই সবের সঙ্গে পাঠকও যদি কবির মতোই পরিচিত না হন তাহলে সেই উল্লেখসূত্র পাঠকের মনকে আলোকিত করবে না। থেকে যাবে অজানা। ফলে পাঠকের কাছে এর ফলে কবিতার দুরূহতা বাড়বে। তেমনই হয়েছে। আধুনিক কবিতাকে অনেক পাঠক যে দুরূহ বলে মনে করেন আজও—এই রীতিটাই তার প্রধান কারণ।

মধ্যযুগের কবিতায়, উনিশ শতকের কবিতাতেও এই রীতির প্রয়োগ ছিল। কিন্তু সেই উল্লেখ সাধারণত পুরাণ-প্রসঙ্গকেই অবলম্বন করত। পুরাণ-প্রসঙ্গগুলি দীর্ঘকাল ধরে শ্রুতিবাহিত হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত থাকত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় এই জাতীয় উল্লেখ বহু ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণত ভারতীয় পুরাণ এবং ইতিহাস থেকেই গৃহীত হয়েছে সেই উল্লেখের সূত্র। শিক্ষিত বাঙালির কাছে সেগুলি অচেনা ছিল না। কিন্তু তিরিশের দশক থেকে যে-কবিরা রচনা করলেন আধুনিক বাংলা কবিতা—তাঁরা অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই উল্লেখ-সূত্র আহরণের পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিলেন সমগ্র বিশ্বে। প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তরকালে শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতির রূপটি অনেকটাই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল। বিশ্বযুদ্ধ কাছে এনেছিল বিশ্বকে। এলিয়ট-এর বিখ্যাত 'ওয়েস্টল্যান্ড' (১৯২২)-এ এই পদ্ধতির আত্মবিশ্বাসী প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন কবি। বাইবেল-এর আখ্যান থেকে শুরু করে জার্মান নাটকের গানের পংক্তি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এমনকী জার্মান ভাষায় লেখা গানটির ভাষা অনুবাদ করে দেবার চেষ্টাও করেননি।

এই এলিয়টীয় উল্লেখ-রীতি দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী ইউরোপীয় কবিদের খুবই আকর্ষণ করেছিল। বাংলা কবিতাতেও বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল এই পদ্ধতি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে এই উল্লেখ পদ্ধতির বিস্তারকে এতটাই ব্যবহার করেছিলেন যে প্রধানত তাঁদের কবিতায় এই অজানা শব্দানুষঙ্গের অভিঘাতেই পাঠক আধুনিক বাংলা কবিতাকে দুরূহ বলে স্থির করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিচলিত হননি এই কবিরা। তাঁরা দাবি করেছিলেন শিক্ষিত পাঠক, দাবি করেছিলেন পাঠকের শ্রম এবং অভিনিবেশ।

পাঠকের কাছে এতখানি দাবি করা সঙ্গত কিনা—এই বিতর্ক এখনও অবসিত হয়নি। কিন্তু মোটের উপর এটা স্বীকৃত হয়ে গেছে যে, কবির রচনায় এই উল্লেখ-রীতির স্বাধীনতাকে মেনে নিতেই হবে। তাই কালক্রমে পাঠক জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার দুরূহ অনুষঙ্গগুলির বুঝে নেওয়ার দিকে মনোযোগী হয়েছে। তিরিশের কবিতায় এই উল্লেখপুঞ্জ যতটা ভিন্ন দেশীয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে, তার থেকে সরে এসেছেন চল্লিশের কবিরা। তাঁরা কবিতাকে সাধারণ পাঠকের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাই বেশ বর্জনই করেছিলেন এই জাতীয় প্রয়োগ। মঙ্গলাচরণও কবিতাকে দুর্বোধ্য বা দুরূহ করে তুলতে চাননি। তবে শৈলী হিসেবে এই উল্লেখ পদ্ধতি তখন এতটাই গৃহীত হয়ে গেছে যে তাকে বর্জন করেও তিনি চলতে চাননি। চল্লিশের কবিতায় এ জাতীয় উল্লেখের

প্রধান উৎস ছিল আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সমকালীন রাজনৈতিক সংঘাত এবং শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গকেও তাঁরা কবিতায় স্থান দিয়েছেন। পাঠককে সেখানে সচেতন থাকতে হয় সমকালীন সমাজ-রাজনীতির বাতাবরণ সম্পর্কে। 'হিমাচল আসমুদ্র রুদ্র' কবিতায় মঙ্গলাচরণ জনজাগরণের প্রসঙ্গে পলাশি, তিতুমীর, জালিয়ানওয়ালাবাগ, বাংলার নীল-চাষ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং চৌরিচৌরা ও ডাণ্ডির উল্লেখ করেছেন। পাঠকের কাছে ভারতীয় ইতিহাসের জ্ঞান যে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। সুপরিচিত 'জননী-যন্ত্রণা' কবিতায় একই সঙ্গে 'কালনাগিনীর দ', আবার ক্ষুদিরাম আর কানাইলালের উল্লেখ আছে। এখানেও কবি পাঠকের মনে পুরাণস্মৃতি ও বিপ্লবের স্মৃতি জাগাতে চেয়েছেন।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবিরা সারা বিশ্বের শোষণ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিলেন বলে সেই সংগ্রামের ইতিহাসের প্রসঙ্গ বারবার তাঁদের কবিতায় আসে। মঙ্গলাচরণও গোর্কি, লেনিন, হো চি মিন, সোভিয়েত-ভূমি, নেলসন ম্যাণ্ডেলা-র উল্লেখ করেছেন কবিতায়।

আবার বিশ্বের নান্দনিক সংস্কৃতির প্রতিও অপরিসীম টান ছিল মঙ্গলাচরণের। বিশেষ করে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সৌন্দর্য-স্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁর কবিতার ভাষা নির্মাণে একাত্ম হয়ে গেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন 'গথিক গীর্জা' এবং গ্রিক ভাস্কর্যের গ্রীবার প্রসঙ্গ। রোদ্যাঁ-র ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ কবি কবিতা লিখেছেন 'ওই করপুটে কোন' (কোথাও যাবার কথা ছিল)। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ঈষৎ দুরূহ একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

> সহসা মনের মধ্যে ঘোড়ার দুরন্ত লাফদাপ।
>
> ....
>
> দা-ভিঞ্চির স্কেচ বইয়ে যেমন উচ্ছ্রিত পেশী স্তব্ধ তীব্র গতি,
> গীতিকবিতার পংক্তি সচ্ছল স্পন্দিত যেন জুন পের্অ-র ঘোড়া,
> আহামরি রকমারি ঘোড়া—
> কোথা থেকে এল ওরা সহসা মনের মধ্যে? কবে?
>
> (সহসা মনের মধ্যে/কোথাও যাবার কথা ছিল)

এভাবেই এই উল্লেখ-রীতি যাথার্থ্য পেয়েছে মঙ্গলাচরণের কবিতায়।

মঙ্গলাচরণ-এর কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণের কয়েকটি দিক আগেই আলোচিত হয়েছে। এখন তাঁর লেখায় এই উল্লেখ রীতির অন্য একটি দিক দেখানো যায়। অনুষঙ্গ প্রয়োগের পদ্ধতিতে যেমন বিভিন্ন দেশের প্রসঙ্গ উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই ভারতীয় পুরাণ এবং স্বদেশীয় লোকায়ত জীবনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও ব্যবহার আছে প্রচুর। দেশজ ঐতিহ্য ব্যবহারের প্রতি প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিলেন মঙ্গলাচরণ। প্রথম থেকেই আমরা সেই আগ্রহের প্রমাণ পাই। প্রথম পর্বের কবিতাগ্রন্থ 'স্নায়ু'তে এই ধরনের প্রয়োগ খুব গভীর হতে পারেনি। বাসুকী, ত্রিশঙ্কু, মাথুর ইত্যাদি শব্দের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ; মহাভারতের খলনায়ক শকুনিকে অবলম্বন করে সভ্যতার শত্রুদের মুখ তুলে ধরার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'মনপবন' কবিতাগ্রন্থটিতে যদিও মনপবনের নৌকোর রূপকথার স্মৃতি আছে, কিন্তু কবিতাগুলি নাগরিক ধরনের। 'ঘুমতাড়ানি ছড়া'-য় কবির ছড়া আর ঘুমপাড়ানি গানের ভাষা ও কাঠামো প্রকরণে

মসৃণ ও অবারিত হয়ে গেছে এই জাতীয় স্বদেশীয় অনুষঙ্গের প্রয়োগ-রীতি। আমরা অর্জুন, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, সতী এবং বিশেষভাবে মহাভারতের একলব্য কাহিনিকে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হতে দেখেছি। এ-জাতীয় উল্লেখ আমাদের কাছে বহু পরিচিত। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব যেখানে বাংলার লোকপুরাণ, মঙ্গলকাব্য এবং লোককথা-রূপকথার বিভিন্ন অনুষঙ্গ শিল্পোত্তীর্ণ রূপ পেয়েছে।—

১. মনে পড়ে ঘরে সেই
ঘুঁটেকুড়ুনি মা কাঞ্চনমালা জীবনের খেই
খুঁজতে পাঠাল ছেলেকে কখন
রোদে-জলে হিমে দুধ নদী পার
ক্ষীর সমুদ্র কড়ির পাহাড়

('ছাড়িয়ে এলাম', মেঘবৃষ্টিঝড়)

২. গান ধরলাম আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ফিরব যখন ভাঙাবাসায়—দাওয়ায় মাটি লেপে
চাষ করব, গান ধরব, ধানও দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

('মেঘবৃষ্টিঝড়', মেঘবৃষ্টিঝড়)

৩. মন কালিন্দী, হাওয়া কালীদহে তাথৈ তাথৈ।
শ্রীমন্ত সদাগর যে-ডিঙার স্বপ্ন সাজায়
আজ তার ভরাডুবি।

('জলতরঙ্গ'; মেঘবৃষ্টিঝড়)

৪. তবু তো ঢের বর্গী এল ধুলো-ধুলোয় ধূসর
রাঙামাটির পথে, পদক্ষেপ রক্তে রঙিন;
বুলবুলিরা ধান খেয়েছে প্রায় প্রতিটি বছর;

('বাংলা, হায় বাংলা', মেঘবৃষ্টিঝড়)

৫. বাইরে এখন বোশেখি ঝড়, রাত্তির।
বাতাস হাজার রাক্ষসী, প্রাণ-ভোমরার
খোঁজ পড়েছে : কে নিল প্রাণ, কই সে?

('মা গাইছে', কটি কবিতা ও একলব্য)

৬. দক্ষিণে যা-গতির পাখা পাবি দক্ষিণ-পবন,
রূপকথারই বাগান, মধ্যে রাক্ষসদের ভবন
দাঁড়ে হীরামনকে পাবি ফুলে গন্ধ-আতর :
তবু পাথর, জল-মাটি-বন-রাজকন্যে পাথর।

('আশ্বিনের আকাশ', কটি কবিতা ও একলব্য)

খুব সুনির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র কোনো কাব্যতত্ত্ব ভাবনা মঙ্গলাচরণের মনে দেখা দেয়নি। তিনি অধিকাংশ সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবির মতোই বিশ্বাস করেছেন যে কবিতা জনমানস বিচ্ছিন্ন

হওয়া আকাঙ্ক্ষিত নয়। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবের সন্ধান আমরা পাই 'সমাজশরিকী ও একালের বাংলা কবিতা' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'নিষ্পন্ন' পত্রিকার ১৯৮৬ সালের সংকলনে। প্রবন্ধটি থেকে তিনটি অংশ আমরা উদ্ধার করছি।—

১. বেশ খানিকটা রবীন্দ্র প্রভাব-মুক্তি ও স্বকীয়তা অর্জনে, নতুন শব্দ চয়ন, স্বকীয় বাক্যবিন্যাস ও কিছুটা বুদ্ধিমনস্কতায় এঁরা অনেকেই হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট, কিন্তু কবিতায় অখণ্ড জীবনবোধ ও ভাবকল্পনাও ব্যাপ্ত সামাজিক আবেগের আপেক্ষিক অভাব এবং অতিরিক্ত মস্তিষ্ক নির্ভরতা এই কবিকুলের অনেকের পক্ষে মহৎ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
২. চল্লিশের দশকের পরবর্তী তিন দশকের বাংলা কবিতার একটি বড় অংশ সমাজ-সমস্যা ও গভীরতর জীবন অন্বেষার ব্যাপারে অনীহ কিংবা বীতশ্রদ্ধ এবং সমাজবিযুক্ত আত্মমুখ 'আমি'-র সন্ধানে ব্যাপৃত।
৩. চল্লিশের এই কবিতা...প্রথমেই অঙ্গীকার করল গভীরতর জীবনবোধ ও ব্যাপ্ত সামাজিক চৈতন্যকে। উপরন্তু কবিতার মানুষ ও তার মানসিকতাও যে অনির্দেশ্য কোনো চিরায়ত প্রথা নয়, বরং অগ্রসরমান ইতিহাসের নির্দিষ্টপটে বিশিষ্ট ও শ্রেণীদ্বন্দ্বে দ্বিধাচ্ছিন্ন এই বোধ সেই প্রথম স্পষ্টভাবে বাংলা কবিতায় সঞ্চারিত হল।

মঙ্গলাচরণের বক্তব্যের সঙ্গে সর্বাংশে সহমত হবেন না অনেকেই। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটুকুই নির্দেশ করা—কবিতার যথার্থ নিদর্শন বলতে কী বোঝেন মঙ্গলাচরণ। কেন তাঁর কাছে বুদ্ধি-সংবেদী এবং পাশ্চাত্য অনুভাবনা-স্পর্শী তিরিশের দশকের কবিতা মহৎ তাৎপর্যময় বলে মনে হয় না? আত্মগত উপলব্ধির প্রাধান্যময় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিতাও কেন তাঁকে ততটা আকর্ষণ করেনি?

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম সেখানে তাঁর জীবন ও জীবন-বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গতির দিকটাই উঠে এল স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু একজন কবির মন গড়ে ওঠে বহু উপলব্ধির সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর স্তর-বিন্যাসে। সমাজমনস্ক ও সাম্যবাদে প্রত্যয়ী কবিদের রচনাকর্মের অন্তর্গত রোমান্টিক অনুভবের কবিতা সম্পর্কে প্রায়ই তাই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না আমাদের। কী অপরূপ ব্যঞ্জনাময় প্রেমের কবিতা লিখেছেন অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তা আমরা উল্লেখ করতে ভুলে যাই। প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাসও তাঁর কবিতার অন্যতম এক সমৃদ্ধির দিক। একজন কবি তাঁর কিশোর বয়স থেকেই কবি হয়ে ওঠার আকাশ খুঁজে পান এই নিসর্গ-মুগ্ধতার পলকপাতে; প্রেমের প্রথম নিভৃত গুঞ্জরণে।

মঙ্গলাচরণের কবিতায় এই প্রেম-অনুভব ও নিসর্গ-অনুরাগের ভাবিত ব্যঞ্জনার দিকে তাকালে আমরাও মুগ্ধ হয়ে যাই। দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে রাখা যেতে পারে।—

মনের অন্দরে বন্দী পাখি ও-যে থাকত চোখে-চোখে
নিজেকে ঠুকরিয়ে নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত—মুখে-মুখে
গোপন জানাজানি আমাতে-ওতে শুধু, শুধু আমাতে-ওতে

ঘোমটা টানা মুখ ঘরের কোণে সে-ই আমার ভালোবাসা।

(আমার ভালোবাসা, কটি কবিতা ও একলব্য)

প্রসঙ্গটি আমরা এখানে বিস্তৃত করব না। রোমান্টিকতা যে-কোনো কবির মনের অত্যন্ত সরল একটি দিক। যে-কবি রোমান্টিক নন, তাঁর পক্ষে কি কবি হওয়া সম্ভব আদৌ? এই দিক থেকে চল্লিশের কবিদের নতুন করে পড়া হয়তো অপেক্ষিত আছে এখনও।

আমরা মঙ্গলাচরণের নিসর্গ-মুগ্ধতার একটি কবিতাংশের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এই লেখা শেষ করব। কবিতার নাম 'হঠাৎ হাওয়ায়'। আলো, হাওয়া, জল, মাটি, আকাশ, গাছ, ফুল, পাখি—প্রকৃতির এই আদি উপাদানগুলি বার বার নতুন হয়ে ওঠে কবিদের লেখনী-স্পর্শে। মঙ্গলাচরণ কীভাবে এই হাওয়ার অনুভবকে, প্রকৃতির এই অজস্রতার দানকে গ্রহণ করেছেন তাঁর দেহে ও মনে—তার একটি উদাহরণ রইল।—

ও কি ও বাতাস? বাতাস বাতাস আঙুল বুলোয়
হৃদয়ের রাজকন্যের ঘুম ভাঙায় কী বলে
বাতাস বাতাস আলোর হল্লা ধুইয়ে ধুলোয়
মন জেগে ওঠে মন বেজে ওঠে সর্‌গম্ বোলে।

('হঠাৎ হাওয়ায়', বৈরী মন)

হৃদয়ের নিবিড় উপলব্ধির তলদেশ থেকে একজন সর্বাঙ্গীন কবি হয়ে উঠেছিলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কবিতাকে অবলম্বন করে কোনো প্রাতিষ্ঠানিকতায় তিনি কিন্তু পৌঁছবার চেষ্টা করেননি। প্রয়াণ-কাল পর্যন্তই তিনি তাঁর কবিতার আসনটিকে অবিচল রেখেছিলেন শান্ত আভিজাত্যে। এই আভিজাত্য আত্মবিশ্বাসের আত্মমর্যাদার—আর সাহিত্য-অনুরাগের সমন্বয়ে তাঁকে ঘিরে যে জ্যোতির্বলয় রচনা করেছে—তা কবিতার প্রকৃত পাঠক সহজে বিস্মৃত হবেন না।

সেকালের কথা—৩

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

আমার হাইস্কুলের কথা বড় কম লিখি নাই, কিন্তু এই কথা যেন ফুরায় না। অথচ, এই ইস্কুলের এখন কোনো অস্তিত্ব নাই। ইহার নাম, নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল, এখন আর কেহ জানে না। কিন্তু এই ইস্কুল আমার কাছে একটি মন্দির। সেই মন্দিরে এখন আর কোনো ঘণ্টা বাজে না। কিন্তু আমি আজও এই অষ্টাশি বছর বয়সে ইস্কুলের ঘণ্টা শুনিতে পাই। প্রত্যেকটি শিক্ষকের মুখ দেখিতে পাই। প্রত্যেকটি সহপাঠীর কণ্ঠ শুনিতে পাই। ইহার কারণ বলি। জীবনে যদি কোনো শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি সেই শিক্ষার গোড়াপত্তন এই ইস্কুলেই হইয়াছে। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই অনেক নূতন নূতন জিনিস শিখিয়াছি। কিন্তু সেই শিক্ষার ভিত্তি এই ইস্কুলের শিক্ষা।

আজকাল আমরা দুইরকম ইস্কুলের কথা শুনি—English medium school আর Bengali medium school। আমাদের সময় শিক্ষাক্ষেত্রে এমন বিভেদ ছিল না। সেই যুগে ইস্কুলে ইংরাজির একটা প্রাধান্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ও বাংলা এই দুইটি ভাষা আমাদের যত্ন করিয়া শিখিতে হইত। কোনো কোনো ইস্কুলের নামের মধ্যে HE ইস্কুল অর্থাৎ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের কথাটি থাকিত। কোনো ইস্কুলকেই বাংলা বিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত করা হইত না। আমার মনে হয় উচ্চ ইংরাজি কথাটি কোনো কোনো ইস্কুলের নামের মধ্যে থাকিত উহাদের পাঠশালা বা চতুষ্পাঠী হইতে পৃথক করিবার জন্য। আমাদের সময় Matric বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাতটি Paper-এর জন্য বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। ইহার মধ্যে ছয়টি Paper compulsory এবং একটি additional। Compulsory ছয়টি ছিল—ইংরাজি দুই Paper, বাংলা এক Paper, অঙ্ক এক Paper এবং সংস্কৃত এক Paper। একটি additional paper চার পাঁচটি বিষয় হইতে বাছিয়া লইতে হইত। আমি পড়িয়াছিলাম সংস্কৃত। ইতিহাস বলিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝাইত। আমরা অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িতাম। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলি নাগরী হরফে মুদ্রিত। তবে প্রশ্নের উত্তরে কোনো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিবার অনুমতি ছিল।

পাঠ্যবস্তুর যে হিসাব দিলাম তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে আমরা প্রায় কিছু না শিখিয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতাম। আজকাল মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশ Paper এবং পাঠ্যবস্তুর পরিমাণও অনেক বেশি।

কিন্তু সেকালে আমরা মনে করিতাম না যে আমরা অশিক্ষিত। সারা দুনিয়ার, সর্বশাস্ত্রের সংবাদ রাখিতাম না। কিন্তু যেটুকু শিখিতাম তাহাতে আমাদের পেট ভরিত। ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতাম, তবে আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় হইত না। এই অল্পবিদ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র

ভট্টাচার্য, দর্শনের এই দুই অদ্বিতীয় মনীষী এই সাত Paper-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

স্বীকার করি আমাদের ইস্কুল একটু ইংরাজিমুখী ছিল। ইংরাজিতে কথা বলিতে শিখাইবার জন্য এক ইংরাজ মহিলা Mrs. Lucus আমাদের ইস্কুলে ইংরাজি class লইতেন। তবে এই ক্লাশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্তই চলিত। আমি ইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলাম বলিয়া আমার আর Mrs. Lucus-এর class করিতে হয় নাই। আমাদের ইস্কুলকে ইংরাজিমুখী বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষকেরা আমাদের সঙ্গে বাংলা ভাষায়ই কথা বলিতেন। আমাদের আচারে ব্যবহারে কোনো ইংরাজিপনা ছিল না। একটি বাংলা স্তব গাহিয়া class আরম্ভ হইত। প্রতি রবিবার সকালে কিছু ছাত্র একত্র হইয়া উপাসনা করিত। বিদেশী ভাষা যত্ন করিয়া শিখিতাম, কিন্তু আমাদের আচার আচরণে, কথাবার্তায় আমাদের দেশী ভাব প্রকাশ পাইত। Thank you, O.K., That's wonderful ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আমরা জানিতাম না। চিন্তায়, ভাবনায়, অনুভূতিতে আমরা একান্তভাবে বাঙ্গালী ছিলাম, একালে ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই বাঙ্গালীত্বের অভাব দেখিতে পাই।

আমরা যখন প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ Matric class-এ পড়ি তখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১৯৩০ সালের এই আন্দোলনের সঙ্গে ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের একটা বিভিন্নতা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ইস্কুল কলেজ ছাড়িতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের আন্দোলনে ইস্কুল-কলেজ ছাড়িবার প্রয়োজন ছিল না। তথাপি সারা শহরে একটা অস্থিরতার ভাব ছিল। পুলিশের এক ইংরাজ কর্ম্মচারী আমাদের ইস্কুল বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আমাদের ক্লাশঘরে আসিয়া পড়িলেন। তখনও আমাদের শিক্ষক ক্লাশে আসেন নাই। পুলিশ সাহেব টেবিলের উপর বসিয়া পা দোলাইয়া দোলাইয়া অনেক কথা বলিলেন। মিছিল করিতে বারণ করিলেন, সভা করিতে বারণ করিলেন এবং করিলে যে বিষম শাস্তি পাইতে হইবে তাহাও বলিলেন। আমাদের ক্লাশে কেহই বিপ্লবী ছিল না এবং কেহই পুলিশ সাহেবের সঙ্গে তর্ক করিল না। পুলিশ সাহেব চলিয়া গেলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যে একটা terrorist movement চলিতেছিল তাহার কোনো লক্ষণ আমাদের ইস্কুলে বা ইস্কুলের অঞ্চলে দেখি নাই। তবে Writers Building-এ যে কাণ্ড চলিতেছিল সেই কাহিনী আমরা জানিতাম। এখন সেই দিনগুলির কথা মনে হইলে একটি কথা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। আইন অমান্য আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন ছিল না, এবং সন্ত্রাসের ক্রিয়াকলাপও দেশ জুড়িয়া ঘটিত না। কিন্তু এই দুই আন্দোলন সারা দেশে একটি স্বদেশী ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা মনেপ্রাণে স্বদেশী ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম, স্বদেশী যজ্ঞে আহুতি দিতে অগ্রসর হই নাই। যাহারা অগ্রসর হইতেন তাহাদের আমরা শ্রদ্ধা করিতাম। কোনো বিপ্লবীর ফাঁসি হইলে আমরা অশ্রুজলে ভাসিতাম, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন গান্ধী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই দুইটি আন্দোলনের কোনোটিই যেন ঠিক দেশময় আন্দোলন ছিল না। ভাবের অভাব ছিল না, কর্মের অভাব ছিল। ইস্কুল-জীবনেই যেন বুঝিয়াছিলাম আইন অমান্য আন্দোলন একটি সর্বাত্মক আন্দোলন হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইস্কুলের কথা আর কত বলিব। আমাদের হেডমাস্টার মশায় যে ইংরাজির এক অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন তাহা বলিয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমার কথাও বলিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকেরা যত্ন করিয়া পড়াইতেন। অঙ্কের মাস্টারমশায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইস্কুলের Assistant Headmaster। ইনি পড়াইতেন বাংলা এবং ইংরাজি। Blackboard-এ অঙ্ক কষিয়া গণিতের রীতি-পদ্ধতি বুঝাইয়া দিতেন। আমি অঙ্কে কাঁচা ছিলাম বলিয়া সব অঙ্কও বুঝিতাম না, কিন্তু ক্লাশের প্রায় সকলেই বেশ বুঝিত।

ভূদেববাবু বাংলা বড় সুন্দর পড়াইতেন। উনি কবিতা বড় সুন্দর আবৃত্তি করিতেন। লাইনগুলি শুনিয়াই যেন মুখস্থ হইয়া যাইত। একটি কবিতার লাইন আজও আমার কানে বাজে—'মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী শরৎকালের প্রভাতে।' বড় বেশি ব্যাখ্যা করিতেন না। মনে আছে এই লাইনটি পড়িয়া তিনি বলিলেন জননী স্বশরীরে দাঁড়াইয়া নাই, কবি তাঁহাকে কল্পনার চোখে দেখিতেছেন। ভূদেববাবু ধীরস্থির-শান্ত মানুষ ছিলেন। তবু কেন যেন আমরা তাঁহাকে একটু ভয় করিতাম। বোধহয় এই ভয় শ্রদ্ধারই এক বিশেষ রূপ। এখন ভূদেববাবু সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। আমরা যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখন বাবার সঙ্গে বৈঁচি গ্রামে গিয়াছিলাম। ওই গ্রামে বাবার এক বিশেষ বন্ধু Settlement officer ছিলেন। তাঁহাকে আমরা প্রফুল্লকাকা ডাকিতাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রেল স্টেশন হইতে কিছুক্ষণ হাঁটিয়া বৈঁচিগ্রামে পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই এক ভদ্রলোক প্রফুল্লকাকার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সেই ভদ্রলোক আমাদের Assistant Headmaster মশায় ভূদেব মুখেপাধ্যায়। আমি বেশ ভয় পাইয়া গেলাম। উনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন 'তুই রবি না?' হারিকেনের অল্প আলোকে আমাকে ভালো দেখিতে পারেন নাই। আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম 'হ্যাঁ স্যার, আমি রবি'। আমার ভয় হইল আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে হয়তো ভূদেববাবু কথা তুলিবেন, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করিলেন না। আমি বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু পরের দিন বিকালে বাসে কলিকাতা রওনা হইবার সময় দেখিলাম ভূদেববাবুও ওই বাসেই কলিকাতা যাইবেন। ইহাতে বাবা খুশি হইলেন, কিন্তু আমি খুশি হইলাম না। আমার ভয় হইল ছাত্র হিসাবে আমি কেমন সেই কথা ভূদেববাবু বাবাকে বলিবেন। আমি কোনো অর্থেই মেধাবী ছাত্র ছিলাম না। ইহা আমি জানিতাম, আমার সহপাঠীরাও জানিত এবং আমার শিক্ষকেরাও জানিতেন। আমি মেধাবী ছিলাম না বলিয়া আমার কোন লজ্জা ছিল না। কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম এই মেধাহীনতার কী পরিচয় ভূদেববাবু বাবাকে দিবেন। আমার পিতামহী আমার বুদ্ধির অল্পতা দেখিয়া আমাকে যেই প্রাণীটির সঙ্গে তুলনা করিতেন সেই প্রাণীটিকে অতি কুলীন প্রাণী বলিতে পারি না। কিন্তু ভূদেববাবু পড়াশুনা কথার কোনো উল্লেখ করিলেন না। তিনি বাবাকে আমার সম্বন্ধে একটি গল্প বলিলেন। তিনি বাবাকে বলিলেন রবি বেশ তোখর ছেলে। একদিন ক্লাশে ছাত্ররা আমাকে বলিল বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলা রচনার জন্য তাহারা কীভাবে প্রস্তুত হইবে। আমি দশটি বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে ইহার মধ্যে যে-কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখিতে হইবে। এই দশটি বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে এই কথা একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে ভারতবর্ষে আছে এমন একটি বিষয় সম্বন্ধেই তোমাদের লিখিতে হইবে। এই দশটি বিষয়ের

মধ্যে একটি বিষয় ছিল discipline। ইহা শুনিয়া রবি উঠিয়া বলিল ওই দশটি বিষয় হইতে একটি বিষয় বাদ পড়িল, কারণ ভারতবর্ষে discipline নাই। আমি বাঁচিয়া গেলাম, ভূদেববাবু আমার মেধাহীনতার কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন না। ইহার পর ভূদেববাবু বাবার সঙ্গে গল্প করিলেন, আমার প্রসঙ্গ উঠিল না।

আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশায় ছিলেন এক মজার মানুষ। তিনি বক্তৃতার ঢঙে পড়াইতেন। অনর্গল বাংলা বলিয়া যাইতেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন ভরিত না। তিনি আরও চমকপ্রদ কিছু চাহিতেন। যখনই তাঁহার কোনো স্থান-নামের উল্লেখ করিতে হইত তখন তিনি শব্দটি উচ্চারণ করিয়া বলিতেন ছেলেরা সকলে চিৎকার করিয়া বল মুর্শিদাবাদ বা পলাশী। আমরা সমস্বরে ওই স্থান-নামটি উচ্চারণ করিতাম। তখন তিনি বলিতেন আবার বল এবং আমাদের ওই নামটি তিনবার উচ্চারণ করিতে হইত। ক্লাশ বেশ জমিত।

ইংরাজি Composition-এর Class লইতেন সুশীলবাবু। তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল সর্ববিষয়ে খুব ছিমছাম। আমাদের রচনা শুদ্ধ করিবার জন্য তিনি আমাদের খাতাগুলি বাড়ি লইয়া যাইতেন। সমস্ত Correction অতি সুষ্ঠুভাবে লাল কালিতে করিতেন। খাতাগুলি ফেরত দিতেন তিন ভাগে। কতকগুলি খাতা excellent, কতকগুলি খাতা good আর কতকগুলি fair এই তিন রকম খাতা তিনি আবার তিন রঙের ফিতায় বাঁধিয়া আনিতেন। তবে ইংরাজি শিখাইবার পদ্ধতি তাহার বড় সুন্দর ছিল। তিনি আমাদের spelling এবং idiom সম্বন্ধে খুব বুঝাইতেন। Definite article আর indefinite article-এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করিয়া দিতেন। ওনার একটা বড় গুণ ছিল এই যে উনি ইংরাজিতে দুর্বল ছাত্রদের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাহাদের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। Headmaster মশায় এবং সুশীলবাবু আমাদের ইংরাজি ভাষার সব কিছুই সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেন। হেডমাস্টার মশায় দেখাইতেন এই ভাষায় সৌন্দর্য কোথায়, আর সুশীলবাবু বুঝাইতেন এই ভাষার ব্যবহারের বিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা।

আমার মেজোভাই কমলাক্ষ দাশগুপ্ত আমার সঙ্গে এই ইস্কুলে এক ক্লাশেই পড়িত। সে এখন এক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের Physics-এর Eameritus Professor। তাহার additional বিষয় ছিল Mathematics এবং Mechanics। সে আমাকে তাহার mechanics-এর শিক্ষক অমিয়বাবুর কথা খুব বলিত। তিনি mechanics-এর এক অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। অমিয়বাবুকে আমি দেখিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অঙ্কের ক্লাশ লইতেন। কমলাক্ষকে তিনি এক মেধাবী ছাত্র হিসাবে খুব স্নেহ করিতেন। কমলাক্ষ যে কলেজে এবং ইউনিভারসিটিতে Physics-এ বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে তাহার গোড়াপত্তন ইস্কুলেই হইয়াছিল। কমলাক্ষ ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Physics-এর M. Sc. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। পরে এই বিষয়ে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ Studentship লাভ করিয়া ইংলন্ডে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. অর্জন করিয়াছিল। সে বলিত অমিয়বাবুর কাছে সে mechanics-এর ছাত্র হিসাবে Physics-এর কতকগুলি মূলকথা mechanics ক্লাশেই আয়ত্ত করিয়াছিলাম। কমলাক্ষের কোনো কালে কোনো Private tutor ছিল না। আমাদের ক্লাশের কোন ছাত্রেরই Private tutor ছিল না, এবং আমাদের কোনো

শিক্ষক tutionই করিতেন না। আমার বাবা Private tutor রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি আমাদের বলিতেন যাহা তুমি নিজের চেষ্টায় শিখিবে তাহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু কমলাক্ষ আমার সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে Matric পরীক্ষা দিতে পারে নাই। কেন পারে নাই সেই কাহিনী বলি। Test পরীক্ষায় দুই ভাই পাস করিলাম। তাহার পর বাবা আমাদের লইয়া ইস্কুলে পরীক্ষার fees দিতে ইস্কুলে উপস্থিত হইলেন। ইস্কুলের Head clerk গঙ্গাধরবাবু কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন কমলাক্ষর Matric পরীক্ষা দিবার বয়স হয় নাই। তবে ইহাতে কোনো সমস্যা নাই। বাবাকে বলিলেন একখানি কাগজে লিখিয়া দিতে যে কমলাক্ষের জন্ম তারিখ ভর্তির সময় অসাবধানতার জন্য ভুল দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর একটি নতুন তারিখ বসাইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য হেডমাস্টার মশায়কে কিছু বলিতে হইবে না। আমি বাবাকে কোনো দিন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু সেইদিন তিনি Head clerk মশায়কে চিৎকার করিয়া বলিলেন আপনি এমন কথা কোন সাহসে উচ্চারণ করিলেন। আপনি কেন ভাবিলেন যে আমার ছেলের যাহাতে এক বছর নষ্ট না হয় সেই জন্য আমি কাগজ কলমে একটা মিথ্যা কথা বলিব। Head clerk মশায় এই তিরস্কার সবিনয়ে গ্রহণ করিয়া বলিলেন কোনো কোনো পিতা এইরূপ জন্মতারিখ পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়াই তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বাবা বলিলেন আপনি আমার বড় ছেলের fees গ্রহণ করুন, কমলাক্ষ আগামী বৎসর পরীক্ষা দিবে। কিন্তু কমলাক্ষ ১৯৩২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩৬ সালে B. Sc. পরীক্ষা দিতে পারে নাই। তাহার জলবসন্ত হইয়াছিল। আবার M. Sc. পরীক্ষার বছরেও সে কঠিন উদরপীড়ার জন্য পরীক্ষা দিতে পারে নাই। আমরা বুঝিলাম সত্যবাদিতার কোনো পুরস্কার নাই।

ইস্কুলে আমাদের ক্লাশে যে বরাবর First হইত সেই তপেন গুপ্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল না। বৃত্তি পাইল শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কোনো কথা হইল না, তপেন শশাঙ্ককে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করিল। আর কোনো ছাত্র বলিল না যে তপেন হেডমাস্টার মশায়ের এবং অন্যান্য শিক্ষকের প্রিয় বলিয়া ক্লাশে বরাবর প্রথম হইত। ১৯৭৯ সালে আমি যখন আমার প্রথম নাতির মুখেভাতের অনুষ্ঠান করিলাম, তখন আমি আমার ছয়জন ইস্কুলের সহপাঠীদের খোঁজ পাইয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ করিলাম। সেই ছয়জনের মধ্যে তপেন এবং শশাঙ্ক ছিল। দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্য যে অটুট ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। শশাঙ্ক Chemistryতে Ph. D. অর্জন করিয়া West Bengal Agriculture Research Institute-এর Director হইয়াছিল। তপেন তেমন উল্লেখযোগ্য কর্ম করিত না। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে আমাদের সময়ে আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতার ভাব ছিল না। কে বড়, কে ছোট, কে কত মায়না পায়, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিত না। এখন দেখি পদমর্যাদা মানুষে মানুষে একটা দূরত্বের সৃষ্টি করিয়াছে।

এখন হাই ইস্কুলে পড়িবার সময় আমাদের পল্লীর অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি। আমাদের সময়ে কলিকাতায় একটা পল্লীজীবন ছিল। ধনী দরিদ্র লইয়া এক অখণ্ড সমাজ আমি দেখিয়াছি।

আমরা গৌরীবাড়িতে থাকিতাম। আমাদের বাসস্থান ছিল পরেশনাথ মন্দিরের পাশে। পরেশনাথ মন্দির বলিতে চারটি মন্দির বুঝায়। ইহার মধ্যে বদ্রীদাসের মন্দির বৃহত্তম। এই মন্দিরের পুষ্করিণীর পাশেই আমাদের বাসস্থান। ইহাকে বাড়ি বলিলাম না এইজন্য যে আমরা পূর্ববঙ্গের কলিকাতাবাসীরা ভাড়াটে বাড়িকে বাসা বলিতাম। আমাদের বাড়ি আমাদের গ্রামের ভদ্রাসন। কিন্তু কলিকাতায় আমাদের পল্লীতে আমরা বহিরাগত বলিয়া কোনোদিন চিহ্নিত হই নাই। বরং আমাদের পল্লীতে আমরা সকল প্রতিবেশীর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি বিশেষ করিয়া পল্লীর প্রাচীনদের সঙ্গেই বেশি মিশিতাম, এবং তাঁহাদের কথা আমি আজিও মনে করি। এখানে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিতে চাহিতেছি। কথাটি হইল এই যে আমরা আমাদের সকল শিক্ষা ইস্কুলে লাভ করি নাই। পল্লীর মুক্ত-বন্ধ সমাজ আমাদের অনেক কিছু শিখাইয়াছে। সেকালের কথা এখন মনে আসিলে আমি ভাবি যে বাল্যকালে এবং যৌবনে আমাদের শিক্ষার স্থল ছিল তিনটি—ইস্কুল, গৃহ এবং পল্লী। এখন দেখি সমাজ বলিতে কলিকাতায় এমন কিছু নাই। আমি যখন সংবাদপত্রে সমাজবিরোধীদের কথা পড়ি তখন আমি মনে মনে বলি যে সমাজ কোথায় যে কেহ সমাজ-বিরোধী হইবে। একটি সুস্থ, শান্তিপ্রিয়, হৃদয়বান, বিবেকবান সমাজ একটি সুস্থ, হৃদয়বান, বিবেকবান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। যেখানে সমাজের বন্ধন নাই সেখানে রাষ্ট্রের বন্ধন কোথা হইতে আসিবে। আমার মনে হয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা সমাজ হারাইয়াছি। এখন দেখি সমাজে রাজনীতির প্রভাব চরমে উঠিয়াছে। ইংরাজ আমলে ইংরাজ-ভক্ত রায়সাহেব, রায়বাহাদুর তাঁহাদের ইংরাজমুখিতা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এখন রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের সমাজের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। ইংরাজ আমলে আমাদের পরিবার ছিল কংগ্রেসমুখী এবং পল্লীর প্রায় সকলেই কংগ্রেসমুখী বলিয়া পল্লীসমাজে কোনো বাদবিসম্বাদ ছিল না। তবে একথাও ঠিক যে এখন সারা সমাজ সরকারমুখী। কলিকাতাবাসী হিসাবে আমি ভাবি আমাদের সমাজ বলিতে কিছুই নাই। সমাজের স্থান সরকার লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী সমাজের কথা বলিয়াছেন সেই সমাজ আর দেখি না। সেই সমাজের পুনরাবির্ভাবের কোনো লক্ষণও দেখি না। আমাদের দেশে চুরি-ডাকাতি বাড়িতেছে। কেন বাড়িতেছে তাহা সমাজ তাত্ত্বিকেরাই বলিতে পারিবেন। আমাদের পল্লীতে পঁচিশ বছরে একটিও ডাকাতি হয় নাই। চুরি হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কোনো চুরির কথা শুনি নাই।

মাহিলাড়া

ইস্কুল-জীবনে মাত্র একবারই পূজায় দেশে গিয়াছিলাম। মাহিলাড়া গ্রাম আমার কাছে ছিল এক ভূস্বর্গ। আমরা কলিকাতায় প্রায় বিশজন থাকিতাম। এই বিশজনের পক্ষে প্রত্যেক পূজায় দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মাহিলাড়া গ্রাম বরিশাল বা বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে মুসলমান বড় ছিল না, কিন্তু যে কয়ঘর মুসলমান ছিল তাহাদের সঙ্গে হিন্দুদের কোনো বিবাদ ছিল না। হিন্দুর দুর্গাপূজায় মুসলমানরা আসিত। তাহারা অবশ্য অঞ্জলি দিত না কিন্তু সন্ধ্যারতি দাঁড়াইয়া দেখিত, এবং নারিকেল এবং কলা দিলে তাহা গ্রহণ করিত। এখানে একটি গল্প বলিতে পারি। কোনো কারণে একবার পূজায় দেশে পৌঁছাইতে বেশ বিলম্ব

হইয়াছিল। সপ্তমীর দিন সকালে আমরা নৌকায়। পূজার শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। মুসলমান মাঝি আমাদের আশ্বাস দিয়া বলিল, 'কর্তা, ভয় নাই বলির আগেই আপনাগ মাহিলাড়া লইয়া যামু।' কথাটি শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। একজন মুসলমান হিন্দু পূজা ও বলির কথা বলিতেছে এবং আমাদের যথাসময়েই গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। এখন শুনি কলিকাতার বারোয়ারি দুর্গাপূজায় মুসলমান যুবকরা চাঁদা দেয় এবং উৎসবে যোগ দেয়। মূর্তিপূজার কাব্যময়তা যে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদেরও আকৃষ্ট করে সেই সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। আমি যখন একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম তখন আমি সরস্বতী পূজার দিন সরস্বতীর মূর্তির সামনে ধূপকাঠি এবং মোমবাতি জ্বালাইয়া কিছু ফল-মিষ্টি নিবেদন করিতাম। ইহা আমি একাই করিতাম। আর কাহাকেও ডাকিতাম না। একবার সরস্বতী পূজার দিন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরাজ অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। এই অধ্যাপকের নাম ছিল Sir G. M. Clark। তিনি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের Orient College-এর Prevost হইয়াছিলেন। অধ্যাপক Clark সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলিয়া তখন পরিচিত। তিনি British Academy-র সভাপতিও ছিলেন। এমন একজন বিশিষ্ট ইংরাজের বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ হইবার প্রশ্নই ওঠে না। Clark সাহেবের জামাতা Peter Bayby আমার বন্ধু ছিলেন বলিয়া এই নিমন্ত্রণ। সরস্বতী পূজার জন্য আমার Orient College-এ পৌঁছাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। ইহাতে আমি লজ্জাও পাইয়াছিলাম। Peter আমাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল এই বিলম্বের কারণ কী। আমি যখন বলিলাম সরস্বতী পূজা তখন Peter এই সরস্বতী সম্বন্ধে তাঁহার শ্বশুরমশায়কে কিছু বলিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি Dr. Clarkকে আমার দুর্বল ইংরাজিতে কিছু বলিলাম। দেখিলাম Clark আমার কথা শুনিয়া চমৎকৃত এবং প্রায় গদ্গদ হইয়া আমাকে বলিলেন Can you bring me an image of this white goddess seated on a white lotus with a white swan at her feet with a lyre in one hand and a book in another. I will keep the image in my study and tell my Christian friends that she is my private goddess. তারপর তাঁহার ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইংলন্ডে মূর্তিপূজা বর্জিত হইবার কারণ কী হইতে পারে। পুত্র ইতিহাসে Cambridge-এর Tripos লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন মূর্তিপূজা বিরোধী ইহুদীরাই ইহার জন্য দায়ী। Clark সাহেব ইহার পর বলিলেন আমি খুশি হইতাম যদি ইংরাজ ছেলে-মেয়েরা বসন্তকালে সরস্বতী পূজা করিত। আমার ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরিয়া হাতির দাঁতের একটি সরস্বতী মূর্তি Clark সাহেবকে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু কলিকাতায় ইহা পাইলাম না। Clark সাহেব বহুকাল আগেই গত হইয়াছেন। তাঁহাকে সরস্বতীর মূর্তি পাঠাইতে পারি নাই বলিয়া আমার আজও দুঃখ হয়। তবে খ্রিষ্ট জগতে মূর্তির অভাব নাই। রোমে Vatican-এর শ্রেষ্ঠ গীর্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম সেটি যেন একটি মূর্তির museum। পরে Dr. Seznec -এর *The Survival of Pagan Gods in Christian Europe* বইখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে ইউরোপেও ধর্মের সঙ্গে আর্টের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তবে ইউরোপে কোনো

Pagan রাষ্ট্র নাই। এশিয়া মহাদেশে মূর্তিপূজা বিরোধীদের রাষ্ট্র সংখ্যাতীত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরাজ কবি Wordsworth তাঁর একটি কবিতায় লিখিলেন : 'I would rather be a pagan suckled in a creed outworn'। ওই যুগের ওই সময়ে ইংলন্ডে বা ইউরোপের কোনো দেশে মূর্তিপূজা বিরোধীদের রাষ্ট্র বলিতে কিছু ছিল না। তবে বঙ্গদেশের এক কবি, হিন্দু না হইয়াও বৈষ্ণব ও শাক্ত ভাবের এক শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এখন ইস্কুলজীবনে আমাদের পারিবারিক কথা কিছু বলি। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে আমরা কুড়িজন একত্রে বাস করিতাম। পরিবারের সর্বময় কর্তা ছিলেন আমার পিতামহী। আমার বাবা তাঁহার মাসিক মাহিনা মায়ের হাতে দিতেন এবং তিনি সেই টাকা খরচ করিতেন। সর্বব্যাপারেই ঠাকুরমার কর্তৃত্ব। বাড়ির বাহিরে যাইতে হইলেও তাঁহার অনুমতি লইতে হইত। ইস্কুলে যাইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইত। বাবা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অফিসে যাইতেন। সন্ধ্যাগমের পূর্বেই আমাদের বাড়ি ফিরিতে হইত। অনেক সময় ঠাকুরমা তেতলার ছাদে দাঁড়াইয়া দেখিতেন নাতিরা কোনদিকে যাইতেছে। বেশিদূর যাইবার অনুমতি ছিল না।

প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীর অর্চনা হইত। মা, জ্যেঠিমা, বড়মা একত্র হইয়া লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়িতেন। তারপর ছেলেমেয়েদের ডাক পড়িত হরির লুটের গান গাহিবার জন্য। আমরা ভাইবোনেরা গান গাহিতে জানিতাম না। দুই দিদি অবশ্য গান শিখিতেন। তবে আমরা গলা ছাড়িয়া গান গাহিতাম। কিছু গান বাবার কাছে শিখিয়াছি, কিন্তু বেশিরভাগ গান আমাদের সূর্যবাবু শিখাইয়াছিলেন। সূর্যবাবু বরিশালের মানুষ। আমার জ্যাঠামশায়ের বন্ধু। আমাদের বাড়িতে থাকিতেন। স্বপাক খাইতেন। কয়েকটি গানের নমুনা দিতেছি। লুটের গান সবশেষে গাহিতাম। কিন্তু তাহার আগে কয়েকটি গান হইত। যে গানটি আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিল সেই গানের শেষ কথাগুলি এখনও মনে আছে—

এই কর হরি দীনদয়াময়
তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়
জলেরই তরঙ্গ জলে কর লয়
চিদ্‌ঘন শ্যাম সুন্দর।

আর একটি গান ছিল এইরূপ—

দয়াময় হরি, দয়াময় হরি
জপরে মন রসনা
হরির নামে ভক্তি নামে মুক্তি
নামে পূর্ণ কামনা।

আর একটি গান ছিল—

কি দিয়ে পূজিব হরি কি আছে আমার
মহাপূজার উপাচার কোথায় আমি পাব আর
প্রেমফুলে পূজিলে নাকি পূজা হয় তোমার
এই হরিনাম নিতে নিতে যদি সে ফুল ফোটে চিতে
ছুটিলে পারে ছুটিতে নয়নেরি ধার

এই হরিনাম কণ্ঠে ধরি
ধূলায় যাব গড়াগড়ি
ও পায় রাখ বা না রাখ হরি
সে ইচ্ছা তোমার।

আশ্চর্য এই সূর্যবাবু আমাদের যে গানগুলি শিখাইয়াছিলেন তার মধ্যে একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতও ছিল। অর্থাৎ বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের গান পূর্ববঙ্গের গ্রামেও পরিচিত ছিল। আমরা যখন এই গানটি গাহিতাম তখন জানিতাম না যে ইহা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। সূর্যবাবুও কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করেন নাই। 'হায় রে, ওরে যায় না কি জানা'। এখন দেখি গানটি ১৩৩৪ সালে (১৯২৭) আষাঢ় মাসে রচিত।

লুটের গান ছিল দুটি। তার মধ্যে একটি ছিল—

লাগলো হরি লুটের বাহার লুটে নেরে তোরা
লুটে নেরে তোরা ব্রজের বালক যারা

আর একটি গান—

এসে লুট বিলায়ে যাও
এসো কাঙ্গালের হরি
তুমি সত্যযুগে বামনরূপে হে এ-এ-এ
এস বলিরে ছলনাকারী এস কাঙ্গালের হরি
তুমি ত্রেতাযুগে রামরূপে হে এ-এ-এ
এস রাবণ সংহারকারী এস কাঙ্গালের হরি
তুমি দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপে হে-এ-এ-এ
এস যদুকুল ধ্বংসকারী এস কাঙ্গালের হরি
তুমি কলিতে গৌরাঙ্গরূপে হে এ-এ-এ
এস কোপিন করঙ্গধারী এস কাঙ্গালের হরি

আমাদের আবার প্রত্যেক রবিবার সকালেও গান গাহিতে হইত। বাবা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, এবং আমরা রবিবার সকালে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতাম। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্তের গান ছাড়া আর কাহারও গান করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। গান ছাড়া সংগ্রন্থ পাঠেরও নিয়ম ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়া হইত না। তবে বাইবেলের কোনো কোনো অংশ পড়িতাম। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ। কিন্তু খেলাধূলা করি নাই। তাহার কারণ এই যে রাস্তায় ক্রিকেট খেলা বারণ ছিল। আমার ঠাকুরমা দূরে কোনো মাঠে যাইতে দিতেন না। ছাদে কখনও কখনও ভাইয়েরা হাডুডুডু খেলিতাম। কালেভদ্রে পরেশনাথ মন্দিরের ছোট্ট মাঠে দৌড়াইতাম। তবে পাড়ায় একটি gymnasium ছিল সেখানে কেবল আমি কয়েক বছর সকালে ব্যায়াম করিতাম। ইস্কুল কোনো খেলার মাঠ ছিল না। এখন ভাবি প্রথম জীবনে খেলাধূলা করি নাই বলিয়া আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। যেমন আমরা নিজেরা খেলিতাম না, গড়ের মাঠে কখনও খেলা দেখিতে যাইতাম না। গড়ের মাঠে মাত্র একবার ফুটবল খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম।

সে ১৯৩৮ সাল। আমার একটি ছাত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর তাহার ফুটবল খেলা দেখিতে আমাকে একদিন মাঠে লইয়া গিয়াছিল। ১৯৩৮-এর পর আর সেই ছাত্রটিকে দেখি নাই। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। তবে ইস্কুলজীবনে মাঝে মাঝে দেশবন্ধু পার্কে রাজনৈতিক সভায় যাইতাম। ঠাকুরমা দেশবন্ধু পার্কে যাইবার অনুমতি দিতেন। তবে একটি কঠিন শর্ত ছিল। তিনি বলিতেন যখন দেখিবে পুলিশ লাঠি চালাইতেছে তখন সভার বিপরীতদিকে এক মাইল দৌড়াইবে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিবে কী হইয়াছিল। একবার লাঠিচালনা হইয়াছিল। আমি ঠাকুরমার আদেশ পালন করিয়া এক মাইল দৌড়াইয়াছিলাম। দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার একপাটি চটি হারাইলাম। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ইহাই আমার একমাত্র contribution।

অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা স্বদেশী সঙ্গীত বড় কম গাহিতাম না। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর ১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হইত। তখন আমি ইস্কুলের শেষ ক্লাসের ছাত্র। ওই দিন আমরা ভাইবোনেরা একত্র হইয়া কতকগুলি স্বদেশী গান গাহিয়াছিলাম। তাহার কিছু নমুনা দিতেছি—

হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির নাহি ভয়

আর একটি গান রাজদ্রোহিতার গান—

মুক্ত সমুন্নত পতাকাতলে
মিলাও ভারত সন্তান সকলে।
এস রিপু শোণিতে
মেদিনী রঞ্জিতে
এস রণবেশে ভীষণ অসিধারিণী

অবশ্য আমাদের রাজদ্রোহিতা সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯২৮ সালে আমি সেকালের থার্ড ক্লাশে অর্থাৎ একালের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। তখন Simon Commission Report লইয়া হুলুস্থুল চলিতেছে। সেই Report-এর মর্ম তেমন জানিতাম না। কিন্তু উহা যে নেতারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা জানিতাম। ওই বৎসরই Nehru Report কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়। Wellington Square-এ কংগ্রেসের সভা বাহির হইতে দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম। সেইখানে সুভাষচন্দ্র বসুকে G.O.C.র পোশাকে দেখিলাম। মহাত্মা গান্ধী সৈনিকের পোশাকে কংগ্রেস কর্মীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন সারকাস দেখিলাম। ১৩ বছর বয়সে G.O.C এবং তাঁহার Volunteer-এর দল দেখিয়া তাঁহাকে Circus বলিয়া মনে হয় নাই। ইস্কুলজীবনে যে ঘটনা আমাদের বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহা হইল যতীন্দ্রনাথ দাসের অনশনে মৃত্যু। শবযাত্রা দেখিতে কালীঘাট গিয়াছিলাম। এত মানুষের ভীড় ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখি নাই। ইহার পর বেশ কয়েকটি শবযাত্রা দেখিয়াছি। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে করিব। তবে সেইসব শবযাত্রা দেখিয়া ১৯২৮ সালের শবযাত্রা সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এই শবযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নীরব। মনে হইল সেই বিশাল চলমান জনতা সত্যই শোকাহত। কোনো ধ্বনি নাই, কোনো চিৎকার নাই, কোনো ঠেলাঠেলি নাই।

এমন আত্মসংযম একালের জনসমাবেশে দেখি না। ১৯৪১ সালের ৯ই অগাস্ট রবীন্দ্রনাথের শবযাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া দুঃখ পাইয়াছিলাম।

সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আচরণ বড় সুন্দর ছিল। তখন কোনো সভায় নেতাদের ছবি দেখি নাই। নেতাদের নাম উচ্চারণ করিয়া জয়ধ্বনিও শুনি নাই। আমার ইস্কুলজীবনে যত রাজনৈতিক সভা দেখিয়াছি তাহা সবই ছিল কংগ্রেসের সভা। রাজনীতি বলিতে কংগ্রেসনীতিই বুঝিতাম। হিন্দু মহাসভা ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে কংগ্রেসের কোন বিষম বিবাদের কথা শুনি নাই। Muslim League-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। মহাত্মা গান্ধীকে আমরা দেবতাস্থানে ভক্তি করিতাম।

রাজনৈতিক সভাকে আমরা স্বদেশী সভা বলিতাম। এই সভা গড়ের মাঠেও হইত। কিন্তু গড়ের মাঠে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত অনেক সভায় উপস্থিত হইয়াছি। যে সব দেশনায়কের বক্তৃতা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারজন—শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং হেমন্তকুমার বসু। সকলেই বেশ সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। কেহই বেশিক্ষণ বলিতেন না এবং কেহই বাগ্মিতায় বিশেষ কোনো ধরণ অনুসরণ করিতেন না। কিন্তু আমরা বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। সেকালে বাঙ্গালীর মুখের ভাষার একটা সুষ্ঠুতা ছিল। কেহই বাংলার সঙ্গে ইংরাজি মিশাইয়া কথা বলিতেন না, তবে সেকালের রাজনৈতিক বক্তৃতার সঙ্গে একালের রাজনৈতিক বক্তৃতায় একটি বিশেষ ভিন্নতার কথা বলিতে পারি। একালের রাজনৈতিক সভায় আমি উপস্থিত থাকিতে পারি না। তবে দূরদর্শনে অনেক সভার বিবরণ পাই। তারপরে খবরের কাগজে তার report পড়ি। একালের বক্তৃতায় বক্তা অন্য পার্টির সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি করিয়া থাকেন এবং এই কটূক্তির ভাষা সুন্দর হয় না। সেকালের রাজনৈতিক বক্তৃতায় অন্য কোনো পার্টির প্রসঙ্গ উঠিত না, কারণ অন্য কোনো পার্টি ছিল না। আমাদের বিবাদ ছিল ইংরাজের সঙ্গে। কিন্তু ইংরাজ সরকার সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা শুনিয়াছি, কটূক্তি শুনি নাই।

সেকালের রাজনীতিতে ঘরোয়া বিবাদ একেবারে ছিল না এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সে বিবাদ কখনই বিষম আকার ধারণ করিত না। আমরা বুঝিতাম যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ মতানৈক্য ছিল। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন গান্ধীপন্থী, সুভাষ চরমপন্থী। কিন্তু এই মতভেদ বাংলার রাজনীতিকে কলুষিত করে নাই।

আমি একজন দেশনেতাকে ভালোই চিনিতাম। তিনি প্রথমশ্রেণীর নেতা ছিলেন না, কিন্তু মৈমনসিং-এর সকল মানুষের তিনি হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিপিনবিহারী সেন। আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল বলিয়া আমাদের কলিকাতার বাড়িতে কয়েকবার আসিয়াছেন। আমি যখন থার্ড ক্লাশে পড়ি তখন তিনি আমাদের বাড়িতে দুই-একদিন কাটাইয়াছিলেন। একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 'গেঞ্জি খুলিয়া আমার সামনে দাঁড়াও'। আমি আদেশ পালন করিলাম এবং তিনি চার আঙুল দিয়া আমার chest মাপিয়া বলিলেন 'বাবাকে ডাক'। আমি বাবাকে ডাকিয়া আনিলাম এবং তিনি বাবাকে বলিলেন, 'নলিনী, রবির শরীরের দৈর্ঘ্য হিসাবে উহার chest দুই ইঞ্চি কম। ইহা কেন তুমি লক্ষ কর নাই। তুমি অবিলম্বে ইহাকে একটি chest expander কিনিয়া দাও, এক বছরেই chest দুই ইঞ্চি বাড়িবে।' আমি chest

expander না কিনিয়া পল্লীর ব্যায়ামাগারে ভর্তি হইলাম। এখন বুঝি সেকালের দেশনেতারা দেশের সম্বন্ধে কত ভাবিতেন। দেশের ছেলেরা স্বাস্থ্যবান হউক তাহারা এই কামনা করিতেন। আমি ইহার কিছু পরে ময়মনসিংহে বিপিনবিহারীর বাড়ি গিয়াছিলাম। লক্ষ করিলাম তিনি দলের ছেলেদের বড় স্নেহ করিতেন এবং তাহারা অনেকেই তাঁহার বাড়িতে আহার করিত। দলের কর্মীর সঙ্গে দলপতির এই স্নেহের বন্ধন এখন আছে কিনা জানি না, তবে আমি দূর হইতে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে দেখিয়া ভাবিয়াছি ইহাদের মধ্যে যেন গভীরতা ও কোমলতার অভাব। অবশ্য এই অভাবে বোধহয় কিছু যায় আসে না। তবে একালে আমাদের সমাজে এই কোমল ও গভীরতার অভাব দেখিতে পাই। আমরা যত বুদ্ধিমান তত হৃদয়বান নহি। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মাইকেল বলিয়াছিলেন 'করুণার সিন্ধু তুমি'। একালের রাজনীতিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রশাসনে এখন বোধহয় কাহাকেও ঠিক করুণার সিন্ধু বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর প্রাণ ও বাঙ্গালীর মনের কথা বলিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মন অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার প্রাণের পরিচয় যেন বড় পাই না। বৈষ্ণব কবি জয়দেব নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে স্পষ্ট করিয়াছেন। জয়দেবের কথায় বুদ্ধ ঈশ্বরের অবতার কেন না তিনি 'সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম'। এই সদয় হৃদয় এখন কোথায়? আমি আমার ইস্কুল জীবনে কলিকাতায় সদয় হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি, ইস্কুলে পাইয়াছি, বাড়িতে পাইয়াছি, পল্লীতে পাইয়াছি। আমি সেকালে বাঙ্গালীকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। একালে বাঙ্গালীর চোখে জল বড় দেখি না। সকল জল যেন জিহ্বায় আসিয়া জড় হইয়াছে। এত লোভ, অর্থলোভ, পদলোভ, ক্ষমতালোভ সেকালে যেন তেমন দেখি নাই। মাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি। আমাদের গ্রামের ইস্কুলে অর্থাৎ অনন্তনারায়ণ ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া কোনো বড় ইস্কুলে শিক্ষকতা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'এই গ্রামেই আমি ভাল আছি, কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা নাই'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে চাই যে তিনজন মাহিলাড়াবাসী বরিশালের হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন—জেলা স্কুলে রসরঞ্জন সেন, চৈতন্য স্কুলে নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ব্রজমোহন স্কুলে অমৃতলাল দাশগুপ্ত। বোধহয় বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে আমাদের গ্রামের মানুষের একটু অভিমান ছিল। আমাদের গ্রামের আট মাইলের মধ্যেই গৈলাগ্রাম। গৈলাবাসী যখন বলিতেন বাংলার এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গৈলার মানুষ, আমরা মাহিলাড়াবাসীরা বলিতাম বঙ্গদেশের এক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মাহিলাড়ার মানুষ। অথচ সুরেন্দ্রনাথ সেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন 'দেখ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তাহা আমরা দেশে বসিয়া বুঝিতে পারি না। আমি বিলাতে দেখিয়াছি তিনি Lord Haldane-এর সঙ্গে বসিয়া খানা খাইতেছেন। আমি আমাদের গ্রামে বা কলিকাতায় আমাদের ইস্কুলে ঈর্ষা বড় দেখি নাই। মাইকেল দুঃখ করিয়াছিলেন 'মাৎসর্য্য বিষদশন কামড়য়ের অনুক্ষণ'। একালে আমাদের ঈর্ষার অন্ত নাই। ঈর্ষার উৎস আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমানের জন্যই আমাদের দেশের রাজনীতিতে এত দল এবং উপদল। দেশের রাজনীতি সরসীতে শতদল ভাসিতেছে, দেশকেও ভাসাইতেছে।

পাঠক বলিতে পারেন আমি সত্তর বছর পূর্বের বঙ্গদেশকে বড় idealize করিতেছি। আমি তাহা মনে করি না। আমি স্বীকার করি সেকালেও মনুষ্যত্বহীন মানুষ অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় কম। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন সেকালের বাঙ্গালীর প্রধান গুণ কী ছিল? এখন আমরা বলি অমুকে অসাধু, অমুকে অহঙ্কারী, অমুকে নীচমনা ইত্যাদি। আমি বলি আমাদের কালের বাঙ্গালীর হৃদয় ছিল এবং এই হৃদয়ই সকল গুণের উৎস। হৃদয়বান মানুষ বিবেকবান মানুষ। যেখানে হৃদয় নাই, সেখানে বিবেক নাই। একালের সকল অন্যায়ের মূলে হৃদয়হীনতা, করুণার অভাব। করুণারও উৎস হৃদয়। রবীন্দ্রনাথের কথা : 'হৃদয় যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস'। ইহার অর্থ এই যে প্রভু, আমাকে হৃদয়বান কর।

আমি এই হৃদয়ের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। এই কলিকাতা শহরে আমার বাবার এক বন্ধু ছিল প্রিয়নাথ বিশ্বাস। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের গণিতের অধ্যাপক। বাবা এবং প্রিয়নাথ জ্যাঠামশায় রাজসাহী কলেজে এক ক্লাশে পড়িতেন। এই প্রিয়নাথ জ্যাঠামশায় থাকিতেন কালু ঘোষ লেনে। বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীটের আমাদের বাসা হইতে বেশ দূরে। তিনি রিক্‌শা করিয়া আমাদের বাড়িতে আসিতেন, আমার পিতামহীকে প্রণাম করিতেন। তাহার পর সকলের সঙ্গে কথা বলিতেন। এই আত্মীয়তাবোধ এখন বড় দেখি না। এই প্রিয়নাথ জ্যাঠামশায় ১৯১৮ সালে আমার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন। আমি গণিতে দুর্বল ছিলাম বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন না। একালে দেখি কেহ কাহারও সঙ্গে বিনা কারণে দেখা করে না। আড্ডা বলিতে এখন আর যেন কিছুই নাই। আমি যখন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতাম এবং চাকুরী জীবনের প্রথমদিকে খুব আড্ডা দিতাম। ক্রমে যেন আড্ডা উঠিয়া গেল। এখন সকল দেখা-সাক্ষাৎই কাজের দেখা-সাক্ষাৎ। আমাদের আড্ডা ছিল সামাজিকতার অনাসক্তি যোগ। আড্ডায় কাজের কথা হইত না, সকল কথাই অকাজের কথা, সকল পুলক অকারণ পুলক। অধ্যাপক হইয়াও বড় আড্ডা দিতাম। বাবা বলিতেন এত আড্ডা দিলে পড়বি কখন, কী পড়াবি।

সেকালে আমাদের জীবনের দুই-একটি কথা বলিয়া ইস্কুল জীবনের প্রসঙ্গ শেষ করি। একালে মনে হয় 'কর্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার'। এত কর্মের মধ্যে মধুর আলাপের সময় কোথায়। আর আলাপ কার সঙ্গে করিব এবং কী আলাপ করিব। বস্তুত বাঙ্গালী সমাজ বলিয়া এখন কিছু আছে এমন মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ মুক্তবদ্ধ সমাজের কথা বলিয়াছেন। এখন সেই সমাজ দেখি না। আমাদের রাজনীতি আমাদের সমাজকে দুর্বল করিয়াছে। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্রের রজ্জু কে ধরিবে ইহা লইয়াই সকলে ব্যস্ত। রথের দড়ি বহুজনের দড়ি। রাষ্ট্রের দড়ি কিছুজনের দড়ি। ইস্কুলজীবনে আমাদের একটা নিবিড় সমাজবোধ ছিল। আমাদের পল্লীতে ধনীদরিদ্র মিলিয়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত মিলিয়া একটি সমাজ ছিল। সকলের সঙ্গে সকলের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কে কী কাজ করে, কে কী আয় করে, কে কী শিক্ষালাভ করিয়াছে, এই সকল প্রশ্ন উঠিতই না।

বড়দির বিবাহ

আমার স্কুলজীবনে আমাদের পরিবারের সব চাইতে বড় ঘটনা আমার বড়দির বিবাহ। এই বড়দি যে আমার সহোদরা নন সে কথা বেশ বড় হইয়া শুনিয়াছি। বড়দির যখন বিবাহ

হয় তখন আমার বয়স তেরো, থার্ড ক্লাশে পড়ি। বড়দির বিবাহে খুব ঘটা হইয়াছিল। আমাদের ভাইবোনদের বিবাহে এমন ঘটা হয়নি। বড়দির মাকে আমি দেখি নাই। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি গত হন। তবে মায়ের কাছে তাঁহার কথা শুনিয়াছি। তিনি মাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং যৌথ পরিবারে কীভাবে চলিতে হয় তাহা শিখাইতেন। একদিন মা নাকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আমার শাড়ীখানা পাইতেছি না'। তিনি বলিলেন, 'ছোট বৌ, শাড়ী বলিবে, আমার শাড়ী বলিও না'। এই সরযূ পিসিমার মৃত্যুর দুই-এক বছরের মধ্যেই সারদা পিসেমশায়ের দেহাবসান হইল। তিনি S. C. Auddy বইয়ের দোকানে কাজ করিতেন। বড়দির তখন দুই কি তিন বৎসর বয়স। তখন হইতেই বড়দি আমাদের বাড়ির মেয়ে হইয়া গেলেন। বড়দি ইস্কুলে পড়েন নাই, বাড়িতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। গানও শিখিয়াছিলেন। বড়দির যখন আঠারো বৎসর বয়স তখন তাঁহার বিবাহ ঠিক হইল। সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন বাবার বন্ধু এবং বিদ্যাসাগর কলেজের গণিতের অধ্যাপক প্রিয়নাথ বিশ্বাস। পাত্র বিদ্যাসাগর কলেজের Vice Principal এবং দর্শনের অধ্যাপক ক্ষিরোদচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথমে ক্ষিরোদবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী দিদিকে দেখিয়া গেলেন। আমাদের বাড়িতে মেয়েদের ব্যবহারের জন্য কোনো প্রসাধন ছিল না। প্রিয়নাথ জ্যাঠামশায়ের স্ত্রী বাড়ি হইতে Snow, Powder ইত্যাদি লইয়া আসিলেন এবং তিনি দিদিকে সাজাইয়া দিলেন। ইহার কিছু পরে পাত্র শৈলেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত দিদিকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল ক্ষিরোদবাবুর এক কন্যা। তিনি দিদিকে একটি গান করিতে বলিলেন। আমাদের বাড়িতে একটি হারমোনিয়াম ছিল। দিদির জন্যই কেনা হইয়াছিল। দিদি হারমোনিয়াম বাজাইয়া একটি গান করিলেন। গানটি আমার এখনও মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের—

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহনার ধারে।

বড়দি দেখিতে খুব সুন্দর ছিলেন। পাত্র এবং তাঁহার ভগ্নী উভয়েই বড়দিকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য হইল—১৩৩৫ সালের ২৪শে আষাঢ় মধ্যরাত্রি। জামাইবাবু অবশ্য বিবাহের দিন নয়টার সময় আমাদের বাড়ি পৌঁছাইলেন। তিনি ছিলেন স্যার কৈলাশ বসুর এক ছেলের বিশেষ বন্ধু। সেই বন্ধুর সঙ্গে স্যার কৈলাশ বসুর গাড়িতে জামাইবাবু আসিলেন। গাড়ির চালক ছিল এক দীর্ঘদেহী সাহেব অর্থাৎ Anglo-Indian। আমরা চার ভাই তাঁহাকে দেখিয়া বেশ অবাক হইলাম। তবে পাত্রের বাড়ির যে একটা বনেদী Style ছিল তাহা বিবাহের দিনে সকালেই বুঝিয়াছি। ওই বাড়ি হইতে গায়ে হলুদের যে তত্ত্ব আসিল তাহা তেরোজন বহন করিয়া আনিয়াছিল। আমার মনে আছে বাবা বারোজনকে একটি করিয়া টাকা দিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তাহাকে দুই টাকা দিয়াছিলেন। ওই প্রধানের হাতে ছিল একটি মণিমুক্তাখচিত নেকলেস। আমরা ভাইবোনেরা তত্ত্বের ঠাট দেখিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। বিবাহের রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। অনেক অতিথি আসিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে raincoat ছাতা লইয়া সুরেন্দ্রনাথ

সেন আসিলেন। তিনি আমাদের গ্রামের মানুষ, বাবার বিশেষ বন্ধু। সেকালে নিমন্ত্রণ রক্ষা এক ধরনের ধর্মাচরণ ছিল। সুরেন সেন তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor of Medieval and Modern History। Oxford হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন। সুরেন সেনের সঙ্গে আমার পিতামহীর যে কথা হইয়াছিল তাহা এখনও মনে আছে। ঠাকুমা বলিলেন, 'আমার নাতনি আজ পর হইয়া গেল'। সুরেন সেন বলিলেন, 'নাতনি পর হয় নাই, একটি ছেলে আপন হইল'।

আমরা ভাইবোনেরা বহুদিন এই বিবাহের আনন্দে ছিলাম। মনে আছে ক্ষিরোদবাবুর বাড়িতে বৌভাতে খুব ঘটা হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সময় যে দিদি সঙ্গে আসিল না সেইজন্য কাঁদিয়াছিলাম। ঠাকুমা আমার অবস্থা বুঝিয়া আমাকে প্রায়ই ৩নং সুকিয়া স্ট্রীটে দিদির বাড়িতে পাঠাইতেন। ১৯৩০ সালে দিদির সাধেও খুব ঘটা হইয়াছিল। দুইদিন সাধের উৎসব হইয়াছিল। একদিন ভাজা-পোড়া সাধ, দ্বিতীয় দিন পায়সের সাধ। অবশ্য পায়সের পূর্বে পুরা আহারের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলিতে পারি। আমার উপর ভার ছিল বড়দির শ্বশুরবাড়ির লোকদের আমাদের বাড়িতে লইয়া আসা। আমি ক্ষীরোদবাবুর বাড়িতে গেলাম। বড়দি তখন তো আমাদের বাড়িতেই। ক্ষীরোদবাবু বলিলেন তাঁহার স্ত্রী যাইবেন না, তুমি লহরকে লইয়া যাও। লহর ক্ষীরোদবাবুর পুত্রবধূ। ছয়মাস পূর্বে তিনি স্বামীহারা হইয়াছেন। ক্ষীরোদবাবুর স্ত্রী বলিলেন লহর যাইবে না। সাধভক্ষণে বিধবারা উপস্থিত থাকিতে পারে না। ক্ষীরোদবাবু একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিলেন, 'লহর যাইবেই, তুমি একটি রিকশা লইয়া আস।' আমি আদেশ পালন করিলাম। ক্ষীরোদবাবু হাত ধরিয়া লহরকে রিক্‌শায় উঠাইয়া দিলেন। পরে যখন বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়িলাম তখন বুঝিলাম ক্ষীরোদবাবু বিদ্যাসাগর কলেজের এক যথার্থ অধ্যাপক। ক্ষীরোদবাবু পরে ওই কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইস্কুলজীবনের কত কথাই তো মনে পড়ে। সব কথা লিখিবার যোগ্যতা নাই। অকিঞ্চিৎকর ঘটনাকে সুখপাঠ্য ভাষায় উপস্থিত করিবার কলম আমার নাই। দুই একটি কথা উপস্থিত করিতে পারি।

আমাদের বাড়ি কোনো আত্মীয়স্বজন আসিলে তাহার জন্য মিঠাই আনিবার ভার আমার উপরেই পড়িত। কারণ আমি বাড়ির জ্যেষ্ঠ ছেলে। কিন্তু আমার এই মিঠাই আনিবার কাজটি বড় মধুর ছিল না। সেকালের অতিথিরা ছোট ছেলেমেয়ে দেখিলেই লেখাপড়ার কথা তুলিতেন। অনেক সময় প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন একজন অতিথি মাদুরে বসিয়া ঠাকুমার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। সামনে একটি ছোট্ট থালাতে দুটি রসগোল্লা, আর দুটি সন্দেশ। সামনে এক গ্লাস জল। চারটি মিষ্টি আকারে বড় ছোট ছিল না। তাহার মূল্য উল্লেখ করিলে একালের কেহ বিশ্বাস করিবে না। এই চারটি মিষ্টির দাম দুই আনা, অর্থাৎ আট পয়সা। ওই দিন আমি ঠাকুমার কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আছি। ভদ্রলোক আমাকে miscellaneous শব্দটির বানান জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রশ্নটি করিয়াই একটি মিষ্টি মুখে দিলেন। আমি কোনো মতে বানান করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই lieutenant শব্দটি উচ্চারণ করিলেন এবং করিয়াই দ্বিতীয় মিষ্টিটি মুখে দিলেন। আমি শব্দটির বানান করিতে পারিলাম এবং তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিলাম। ভাবিলাম এখনও দুইটি মিষ্টি পড়িয়া আছে। আরও দুইটি শব্দের বানান

করিতে হইবে। সেই দুইটি শব্দ আমার বিদ্যার বাহিরে থাকিতে পারে। আমি বানানে বৃহস্পতি ছিলাম না। কোনো কোনো অতিথি আবার খাতা দেখিতে চাহিতেন, এবং কোন বিষয়ে গত পরীক্ষায় কত পাইয়াছি জিজ্ঞাসা করিতেন। নম্বর শুনিয়া বলিতেন তুমি অঙ্কে বড় দুর্বল। কেহ কেহ আবার ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্ন করিতেন। বিবাহের নিমন্ত্রণে এই দুর্দশা হইত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিতেন এই কবিতাটি পড়িয়াছ কিনা এবং আমি যদি বলিতাম হ্যাঁ, পড়িয়াছি তাহা হইলে ওই কবিতার অন্ততঃপক্ষে চার লাইন মুখস্থ বলিতে হইত। সেকালে ইস্কুলের বাহিরেও অধীত বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হইত।

কোনো ভ্রমণকাহিনী উপস্থিত করিতে পারি না, কারণ ইস্কুল-জীবনে দেশের বাড়ি মাহিলাড়া ছাড়া আর কোথাও যাই নাই। খেলাধুলাও বড় ছিল না। থিয়েটার-সিনেমায় যাইবার কথা একেবারেই উঠিত না। তবে দুর্গাপূজার সময় যে একরাত্রি থিয়েটার হইত তাহা দেখিতাম। বাবা-মা সেই থিয়েটারে যাইতেন না। কিন্তু ঠাকুমা যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা যাইতাম। বাবা অবশ্য নীরব থাকিতেন।

শীতলা পূজায় আমাদের পল্লীতে দুই রাত্রি যাত্রা হইত। ঠাকুমার সঙ্গে আমরা দুই ভাই যাইতাম। বাবা কোনো আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাবা যেমন তাঁর মাকে মান্য করিতেন, ঠাকুমাও তাঁর ছেলের মনোভাবটা বুঝিতেন। যাত্রা দেখিয়া যখন কাকভোরে বাড়ি ফিরিতাম তখন ঠাকুমা বলিতেন মুখ ধুইয়া চোখে সরিষার তেল দিয়া পড়িতে বসিতে। বলিতেন, এখন ঘুমাইলে চলিবে না। আমরা ঠাকুমার কাছে শুইতাম। ইস্কুল খোলা থাকিলে ইস্কুলেও যাইতাম।

সরস্বতী পূজায় আমাদের বাড়িতে খুব ঘটা হইত। আমাদের পল্লীর ভূপতি চক্রবর্তী আমাদের বাড়ির ছেলে হইয়া গিয়াছিল তবে আমরা তাঁহাকে ভূপতিদাদা বলিতাম না, ভূপতিবাবু বলিতাম। তিনি সরস্বতী ভাসানের দিন সন্ধ্যায় একটি লরির ব্যবস্থা করিতেন। আমরা সেই লরিতে সরস্বতীর মূর্তি বসাইয়া সতরঞ্চি পাতিয়া ভাইবোনরা বসিতাম। সঙ্গে বাবা ও ঠাকুমাও থাকিতেন। আমরা চলন্ত গাড়িতে বসিয়া সরস্বতীর গান গাহিতাম। দুই একটি গানের পদ এখনও মনে আছে। একটি গান ছিল—

সম্মুখে পশ্চাতে গভীর রাত্রি
তথাপি তীর্থে চলিয়াছে যাত্রী।

আর একটি গান ছিল আমার বাবার রচনা। বোধহয় রাজশাহী কলেজে পড়িবার সময় লিখিয়াছিলেন। তাহারও দুই-একটি লাইন মনে আছে—

যবে মন্দমলয় মারুতে
সরসী উঠিবে কাঁপিয়া
তরঙ্গ খচিত চাচর-চিকুর
দিয়ো মা ভারতী এলিয়া
আমি অনিমেষ রব চাহিয়া মরালবাহিনী নবিনা।

সরস্বতীর স্তবও আবৃত্তি করিতাম। এই সরস্বতীর কথা বলিয়াই সেকালের কথায় এই অংশ শেষ করিলাম।

ছেলেবেলার কথামালা

কুমার রায়

শৈশবের স্মৃতি উদ্ধারের ঘটনাটা সচরাচর ঘটে না। মনে করতে গিয়ে অনেক সময়ে, বড়দের কাছে বহুবার শোনা ঘটনাগুলোই মনে হয়, নিজের স্মৃতি-ধৃত বুঝি। তবু এবারের ঘটনাটা বিবৃত করতে হল সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশে। এই তো সেদিন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বন্ধুজনদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের বরফঢাকা পাহাড় অঞ্চলে। তা আমি তো, এই পঁচাত্তরে পা-রাখা মানুষটা বরাবরই ধুতি-পাজামা-পাঞ্জাবি-চপ্পলে এবং শাল-আলোয়ান নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ক'দিন থেকেই বরফ পড়ছিল;—দূরের বরফ ঢাকা পাহাড়ের চুড়োগুলো তো ছিলই, কিন্তু আশেপাশের সবুজ পাহাড়ের মাথাগুলো সাদা হতে শুরু করল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও বাতাস হাঁড়কাঁপানো ঠাণ্ডা ফেলেছিল। সঙ্গীরা মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, আর আজকাল ঠাণ্ডা হাওয়া ঠেকানো সব বিদেশি জামা পরে নিয়েছে। আমাকেও একজন মাথায় টুপি পরিয়ে দিল তার নিজের বাড়তি সঞ্চয় থেকে। গল্পটা সেই সময় মনে পড়ে গেল—শৈশবের সেই গল্পটা সঙ্গীদের শোনালাম—টুপি আর দস্তানা খুলতে খুলতে।

আমার জন্মের পর পর আমার মা-এর শরীর ভেঙে যায়। আমি মাতৃদুগ্ধ থেকে সেই শৈশবে বঞ্চিত হয়েছিলাম। বড় বাড়ি। অনেক কাকিমা ছিলেন—তার মধ্যে একজন আবার আমার মাসিমাও। শুনেছি তাঁর আদরে যত্নে খানিকটা বড় হয়ে উঠে আবার মাকে সুস্থ অবস্থায় পেয়েছিলাম। তখন আর মায়ের দুধ খাবার বয়স নেই—অনুভবেও নেই। আমার জন্যে একটা রামছাগল পোষা হয়েছিল। সে থাকত আমাদের বাড়ির উত্তরদিকে যেখানে গোয়ালঘর ফিটন গাড়ির ঘোড়ার আস্তাবল এবং গোলাঘর, সেখানে। সেই গোলাঘরের নীচে সে থাকত—সঙ্গে সেই গোলাঘরের নীচের খোপগুলোতে কয়েকটা রাজহাঁসও ছিল। রামছাগল আর রাজহাঁসের দলের সহাবস্থান। আজ লিখতে গিয়ে রামছাগল বলছি, কিন্তু সে ছিল 'কালিন্দী দিদি' বা সংক্ষেপে কালীদিদি। তারই দুধ আমি খেয়েছি। তা সেই কালিন্দী দিদি বা কালীদিদিকে আমি শীতকালে আমার মোজা, টুপি দস্তানা খুলে তার চার পায়ে এবং শিং-এর ওপর পরিয়ে দিতাম। বেশ মনে আছে কালীদিদিও শান্ত হয়ে আমার কথা শুনে সেগুলো নির্বিবাদে পরে থাকত—অন্তত কিছুক্ষণ তো বটেই। তা এই গল্পটা আমি বললাম। আর সেই সঙ্গে সেই দিনগুলোর আঁচ পেলাম। সেই কথাই টুকরো টুকরো করে বলব আজ। টানা শৈশব কাহিনী তো সম্ভব নয় শোনান। কারই বা মনে থাকে!

স্মৃতির হাত ধরে যতটা পিছনে ফেরা যায়,—সেখানে ফিরে গিয়ে যেখানে পৌঁছুবো সেটা অবিভক্ত বাংলার এক জেলা শহর দিনাজপুর। উত্তরবঙ্গের এই শহরটি স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

ছোটবেলায় দেখেছি তিনটে জিনিস বাড়িতে গুরুত্ব পেত। প্রথমটি হল স্বদেশিয়ানা, দ্বিতীয় শিল্পসাহিত্য চর্চা, আর তৃতীয়টি হল ধর্মবোধ। বর্ধিষ্ণু পরিবারে ক্ষয়ের চিহ্নটা সেই ছেলেবেলাতেই বেশ প্রকট। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সময়টাকে এভাবে বর্ণনা করা যায় : হলঘরের

ঝাড়লণ্ঠনগুলো নামানো হয়ে গেছে—সন্ধেবেলায় আর কেউ সেখানে বাতি জ্বালবে না। আস্তাবল শূন্য, ফিটন গাড়িটা কবেই যেন বিক্রি হয়ে গেছে। কেবল ছেলেবেলায় সেই আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার সাজে হাতবোলান—আর দেখা যেত কোচবাক্সের দু-পাশের পিতলের বাতিদানগুলো কাচভাঙা পড়ে আছে কোণাতে। আর ঘোড়ার পায়ের লোহার নাল কয়েকটা। সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে সে লোহার নালগুলো কেউ কেউ নিয়ে গিয়ে ঘরে রেখে দিত। সৌভাগ্য চলে যাওয়ার চিহ্নগুলো কী করে সৌভাগ্য আনবে কে জানে? কিন্তু সেই ছেলেবেলায় এসব ভাবনা তো আসার কথা নয়—আসেওনি। বরং সেই ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে ঝোলান ত্রিশিরে কাচগুলো (প্রিজম্) যে খুলে খুলে যেত, তাতে আনন্দ হত। কেননা তার একটা হাতে পেলে—পাড়ার সমবয়স্কদের মধ্যে দেখান যেত যে চোখে দিয়ে সে ত্রিশিরে কাচের মধ্যে রামধনুর রঙ দেখতে পাওয়া যেত। কে কটা খুলে নিতে পেরেছিল এবং নিজের কাছে রাখতে পেরেছিল সেটাই গর্বের ব্যাপার বলে মনে হত। মনে হত—হাতে যেন সাতরাজার ধন মাণিক।

উল্টোদিকে ওই ভাঙনের মধ্যে ধাক্কা দিয়েছিল সেই ছোট্ট মনে,—যখন বাড়ির মাঝখান থেকে প্রাচীর উঠে গেল একদিন। ভাগাভাগি। খুব কষ্ট সেই অবুঝ মনে। বালক বয়স থেকে কৈশোর উত্তীর্ণ কালে সে প্রাচীর অবশ্য ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেও এক স্বস্তি। একেবারে বড় হয়ে যখন সে দেশভাগ দেখল,—দেশ বাড়ি ঘর ছাড়তে হল—তখন অনেকদিন সে ভেবেছে—ওই যে বাড়িতে প্রাচীর ওঠান এবং কয়েকবছর বাদে প্রাচীর ভেঙে ফেলা—সেটা কি এই দেশের প্রাচীরের ক্ষেত্রে হয় না। আসলে সে সময় অনেকেই তো সে আশায় বুক বেঁধেছিল। এসব তো পরের কথা। সেই শৈশব আর বাল্যের দিনে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ার দিনগুলো ছিল ঠাকুরবাড়ির নানান উৎসবে—দোল, ফুলদোল, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, নবান্ন-র সময়—তখন সেই ভাগাভাগির মনগুলো এক হয়ে যেত কদিন। ছোটবেলায় সেই ঠাকুরবাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায়, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজলেই—সকলকে যেতে হত আরতির সময়। শ্যামরায়ের মূর্তি (রাধাকৃষ্ণ) গোপাল এবং শালগ্রাম শিলা, নিত্য পূজা। তা আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজানোয় একটা রেষারেষি তো ছিলই। কে তালে বাজাতে পারে এবং কে পারে না। তারপর আরতি শেষে চরণামৃত পান করে হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় পড়তে বসা। সেটা নিয়মমতো চলত। পাড়ায় এক চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্পেনসারি ছিল। বোধহয় পূর্ববঙ্গের কোনও অঞ্চলের ফর্সা, অল্পবয়সের টাক পড়া এক কমপাউন্ডার ছিলেন—তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন এবং তাঁর আহারের আয়োজনও এ বাড়িতেই ছিল। বিনিময়ে, বোধহয়, তিনি আমাদের সমবয়সের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন সন্ধেবেলায়। কিছুদিন পরে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়—এবং অন্য বাড়ি ঠিক করে আমাদের বাড়ির পাট উঠে যায়। কিন্তু তার পরেও অনেকদিন সন্ধেবেলায় পড়াতে আসতেন। এই কম্পাউন্ডারবাবুকে সকালে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে দেখেছি—ওষুধ তৈরি করার ঘরে কী অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে তিনি ওষুধের গুঁড়ো মাপছেন—অন্য ওষুধের সঙ্গে মেশাচ্ছেন,—নানা রঙের শিশিতে ঢালছেন। আর ঢালবার আগে কাগজ ভাঁজ করে কী কৌশলে কাঁচি চালিয়ে ওষুধের দাগ কেটে আঠা দিয়ে সেই শিশিতে এঁটে দিচ্ছেন—এবং রুগির হাতে বা অন্য কারো হাতে তুলে দিচ্ছেন। কাগজ

কেটে ওষুধের দাগ কাটার ব্যাপারটায় আমার ভীষণ কৌতূহল। খানিকটা প্রশ্রয় পেতাম আমরা সে ঘরে প্রবেশ করবার—কেননা তিনি তো আমাদেরই মাস্টারমশায়। মাঝে মাঝে সিরাপ চেয়ে খেতাম। এখন মনে হয় ওই সিরাপের লোভটাই বোধহয় ওই ডিস্‌পেনসারিতে টেনে নিয়ে যেত। ডাক্তারখানার কথা যখন উঠল—তখন তো ডাক্তারবাবুর কথাটাও বলতে হয়। ১৯৩২ সালে এক অদ্ভুত কবিতার বই পেয়েছিলাম। বইটা এখনো আমার কাছে অতি ভালোলাগার জিনিসের মতো রয়ে গেছে। ডাক্তারবাবুর সূত্রেই এই বইটার কথাও গাঁথা আছে এবং আজও রয়ে গেছে। সালটা বইটাতে উপহারের জায়গায় আমার নামের পাশেই লেখা, তাই সাল তারিখটা উল্লেখ করতে পারলাম। "ছোটদের চয়নিকা"—গিরিজাকুমার বসু ও সুনির্মল বসু সম্পাদিত। আমার দৃঢ় ধারণা, আমার বয়সি—যাঁরা সেই বয়সে এই বই হাতে পেয়েছেন—তাঁদের স্মৃতিতে সেই ছোটবেলার এক বড় সম্পদ বলেই বিবেচিত ছিল এই সংকলন। হাসির কবিতার একটা স্বতন্ত্র অংশ ছিল। সেই অংশেই নজরুল ইসলামের একটা কবিতা ছিল—'খাঁদু দাদু'—সঙ্গে সব কবিতার মতোই ইলাসট্রেশন হিসেবে খাঁদু দাদুর একটি রেখাচিত্রও ছিল। তা সেই ডাক্তারবাবুর গোঁফজোড়া সমেত মুখটা অবিকল সেই রেখাচিত্রের মতো। এমনকী টাকটাও। শুধু দাদুর বয়সটা বেশি—আর ডাক্তারবাবুর বয়স কম। ধুতির মধ্যে সার্টগোঁজা—ওপরে একটা কোট। সাইকেলে তাঁর যাতায়াত—তাই মালকোঁচা করা কাপড় পরা। আর সাইকেলের রডে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগটা বাঁধা। ওই কালো চামড়ার ব্যাগটা আমার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। বড় রোগভোগে শহরের বড় ডাক্তার ডাকা হত। এমনিতে ম্যালেরিয়া, পেটব্যথা, মাথাব্যথা, পা ব্যথায়, সর্দিকাশিতে—এই ডাক্তারবাবু। ক্যাম্বেলের এল. এম. এফ পাস করা ডাক্তার। এটা জানা হয়ে গিয়েছিল ওঁর ঘরের বাইরের নামের ফলকের মধ্যে। হ্যাঁ, ক্যাম্বেল স্কুল এবং কলকাতাটাও লেখা ছিল যে। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরে ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর-এর প্রসিদ্ধি ছিল। আর আমি সেই ছোটবেলায় বড় ভুগতাম। সেই ভোগান্তির সূত্রেই ওই প্রমথবাবু ডাক্তার এবং তাঁর কালো চামড়ার ব্যাগ আমার কাছে আতঙ্কের ব্যাপার। জ্বর দেখেই পট্ করে বড় সিরিঞ্জ বের করে কুইনিন ইনজেকশন ফুঁড়ে দিয়ে চলে যেতেন। কাঁপুনি, মাথায় জল ঢালা সমানে চলত। ইনজেকশনে ভয় কার না করে সেই বয়সে; সেই সঙ্গে সেই ডিস্‌পেনসারি থেকে গোলাপি রঙের ৬ দাগ কুইনিন মিক্সচার কিংবা কুইনিন ট্যাবলেট। কী তেতো—কী তেতো। আজকাল তো উঠেই গেছে সে সব। ইন্‌জেকশনের জায়গাটায় ভীষণ ব্যথা, তখন সন্ধেবেলায় লণ্ঠনের মাথায় নুনের পুঁটুলি চেপে গরম করে—সেই গরম সেঁক। মিক্সচারে দাগ ধরে মেজার গ্লাসে ওষুধ ঢালত যখন তখন কেবলই মনে হত কম্পাউন্ডারবাবুটাও কী নিষ্ঠুর! আরো বেশি করে আমার শিশিটাতে মিষ্টি সিরাপ কেন ঢেলে দিতেন না। উনি তো জানতেন আমার জ্বর। ওষুধের শিশিতে একদিকে কাগজকাটা দাগ এবং অন্যদিকে কাগজের লেবেল সেঁটে দিয়ে তো আমার নাম ওঁকেই লিখে দিতে হত।

বছর ছয় যখন বয়স তখনই ওই 'ছোটদের চয়নিকা' আমার হাতে আসে। আর রোগভোগের সময় দুপুরবেলায় ওটাই আমার সঙ্গী হয়ে উঠল। কবিতা তো বটেই—কিন্তু ওর ছবিগুলো—কোথায় নিয়ে চলে যেত। পূর্ণ চক্রবর্তী, ফণী গুপ্ত আর প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়-

এর আঁকা ছবিগুলো কখনো রূপকথার জগতে, কখনো গ্রামের ছোট নদীর পাড়ে, কখনো সেই বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ দেখায় কিংবা 'অরুণ আলোর রথে' মুঠি মুঠি সোনা ছড়ান আকাশে, ময়দানবের সেই বিশাল পুরীতে সোনার পালঙ্কে রাজকুমারীর লোটান দেহ—জীয়ন কাঠির স্পর্শের ছোঁয়ার অপেক্ষায়, আর রাখাল ছেলের বাঁশি—"মধুর সুরে রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশী—"। কবিতার বিষয় কবিদের নাম তখনই আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সেই বয়সে ছবির রঙ ও ছবির রেখা। ছবি আঁকার যে পরবর্তী প্রচেষ্টা সেটার উৎসমুখ এই 'ছোটদের চয়নিকা'। আর আবৃত্তিও। ছন্দ বুঝি না—কিন্তু ছন্দের দোলা তো অনুভবে এসেছে পড়তে পড়তে। একটি কবিতার সংকলন গ্রন্থ এতো ভাবে যে সেই ছেলেবেলার মনকে উদ্বেলিত করতে পারে—সেটা এই বয়সে ভাবতে বসে অবাকই লাগে।

সেই ছেলেবেলায় আরো কয়েকবার বড় বড় অসুখ হয়েছে। টাইফয়েড্ এবং রিউম্যাটিক্ হার্টের অসুখ। অনেক দিন বিছানায়। রোগের উপশমের পরও বেশ কিছুদিন বিছানার আশ্রয়ে কাটাতে হত। সেই বিশ্রামের সময়ে ওই চয়নিকার মতোই আরও একটা বই আমাকে আবিষ্ট করে রাখত। বই বললাম—কিন্তু সেটা আসলে একটা এ্যাট্লাস্। সেই এ্যাটলাসের পাতা ওল্টান, নানান দেশের মানচিত্র দেখা—সেখানকার নানা জায়গা খুঁজে বের করার খেলা এবং খুঁজে বের করে এক আত্মতৃপ্তি। পথহারা তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্র তো নয়,—নেহাতই রোগজীর্ণ এক ছেলে বিছানায় শুয়ে মানচিত্রের পাহাড়ে, ক্যাসপিয়ান সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! 'কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াং'—তখনো জানা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের এ কবিতা আরো পরে জানা। কিন্তু সেই মানচিত্র ধরে 'জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা, নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল বোনা' নিজের মতো করেই চলত। হালকা জগৎ মনে মনে গড়া হয়ে যেত।

মনকে আর এক স্তরে গড়ার কাজটা খানিকটা শুরু হয়েছিল আমাদের বাড়ির বড় হলঘরকে কেন্দ্র করে। লম্বা হলঘর—দু-পাশে ছ-টা করে দরজা। একপাশে টানা ফরাস পাতা। দু-পাশে টানা বারান্দা। ওই হলঘরের পাশের ঘরটা ছিল লাইব্রেরি ঘর। আলমারির বই-এর চাইতে সেই ছেলেবেলায় ওই ঘরের লাল-নীল কাচ দেওয়া জানালার সার্সিগুলো ছিল বেশি আকর্ষণীয়। বিকেলবেলায় পশ্চিমদিকে যখন সূর্য ঢলে পড়ছে তখন সেই কাচের রঙিন সার্সির ভেতর দিয়ে রঙিন আলোগুলো ঘরের পুব দেওয়ালে, আলমারিতে, মেঝেতে বিচিত্র আলপনা এঁকে দিত। সেই লাইব্রেরিটা একদিন পারিবারিক গণ্ডী কাটিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার হয়ে গেল। বাড়ি ছাড়া হয়ে চলে গেল অন্যত্র। সেই সাধারণ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে বাইরের লনে বার্ষিক উৎসবে নাটক অভিনয় হত। সেই লনের একপাশে ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থাও ছিল। প্যারালাল বার, ঝোলান রিং, মুগুর ভাঁজার সরঞ্জাম। বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে পাড়ার বড়রা যোগ দিতেন। আমাদের ছোটদের কাছে সেই মঞ্চনির্মাণের ব্যাপারটা অপার কৌতূহলের ছিল। মাচা তৈরি করে কেমন করে উইঙ্গ, ফ্লাই লাগিয়ে—আর সামনে ড্রপ সিন, পিছনে গোটান সিন লাগিয়ে সে মঞ্চ তৈরি হত। সিন গোটান হচ্ছে এবং সেই গোটান সিন খুলতে খুলতে নেমে আসছে—সে বয়সে এই পদ্ধতিটার গূঢ় কৌশল

তার জানা ছিল না—তাই অপার বিস্ময়। পাশে লাইব্রেরি ঘরে সেইসব সন্ধ্যায় সাজপোশাক, রূপসজ্জার আয়োজনই কি কম আকর্ষণীয় ছিল। আজ মনে হয় থিয়েটারের বীজটা বোধহয় এইসব আয়োজনের মধ্য দিয়েই রোপণ করা হয়ে গেল। আর সেই ঠাকুরবাড়ি থেকে আনা পেটা ঘণ্টাটা নাটক আরম্ভের সঙ্কেত হিসেবে একবার, দুবার এবং তিনবার বেজে উঠত—তখন যবনিকা উত্তোলনের সেই আশ্চর্য মুহূর্ত শিহরণ জাগাত। ইলেকট্রিসিটি তো ছিল না, তখন হ্যাজাক্ বাতি এবং পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে সে সব অভিনয়। হ্যাঁ, হলঘর থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে এই হলঘরের গুরুত্বটা যে রয়েই গেছে। সেই হলঘরের মধ্যে বড় বড় ছবি ছিল পিতৃপুরুষদের। ছেলেবেলায় তাঁদের নাম শেখান হত। সেই ছবির ফাঁকে ফাঁকে সোনালি গিল্টি করা ফ্রেমে বিলিতি সব নিসর্গচিত্র ঝোলান। তারই মাঝে একপাশে উঁচু দেওয়ালে রবি বর্মার আঁকা একটা বড় ছবি—সেটাও ওই সোনালি ফ্রেমে বাঁধান। শিশুপাল বধের উপক্রমণিকার ছবি। রঙিন। অনেক চরিত্র সে চিত্রে—মহাভারতের চরিত্র সব। শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম প্রভৃতি। কয়েকটি চরিত্র বেশ মারমুখী। শ্রীকৃষ্ণ শুধু স্মিত হাসি নিয়ে অর্জুনকে নিবৃত্ত করছেন। কাহিনীটা জেনেছি বাবার কাছে। ছেলেবেলায় সেই ছবির নীচে দাঁড়িয়ে ছবির প্রত্যেক চরিত্রের ভঙ্গী অনুকরণ করতাম—কেউ দেখে ফেললে অবশ্যই লজ্জা পেয়ে সরে যেতাম। কিন্তু কী করব। ছবিতে আঁকা পোশাক-পরিচ্ছদ, দাঁড়ান বা বসার ভঙ্গী, হাতের, চোখের, মুখের ভাব যে অনুকরণযোগ্য বলেই মনে হত। তাদের গায়ের অলঙ্কার, শিরোভূষণ যে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত সেই বয়সে।

সেই হলঘরের দু-দিকের একটায় ভিতরদিকের ঢাকা বারান্দায়—দেওয়ালে একই মাপের ফ্রেমে বাঁধান জাতীয় নেতাদের ছবি। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপৎ রায়, মহাত্মা গান্ধী, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রমুখদের ছবি। সেই মিছিলে তুলনায় একটু বড় মাপের দুটি ছবি—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। সেই ছোট বয়সেই এঁদের সবার মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল আমার। সুভাষচন্দ্রের ছবিও ছিল। ছবির মিছিলে ওই দুটি অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ছবির মানুষ দুটি যেন আলাদা।

অন্যদিকের অর্থাৎ বাইরের দিকের বারান্দায় বাবা একটি পাঠশালা বসিয়েছিলেন—একজন পণ্ডিতমশায় রেখে। তাঁর স্বদেশিয়ানা এবং সমাজ সংস্কারকের একটা মন সক্রিয় ছিল। একেবারে অবৈতনিক সেই পাঠশালায় পড়তে আসত প্রান্তীয় মানুষদের সন্তান-সন্ততি। সেখানে বর্ণপরিচয় এবং নামতা পড়ান হত বেশ উচ্চস্বরে। আর শ্লেট পেন্সিলে যোগ-বিয়োগ শেখা। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা সেই বয়সের তারাও সেখানে পড়ুয়াদের দলে একই পঙ্‌ক্তিতে পড়তে বসত। আমিও ছিলাম সে দলে। বড় স্কুলে ভর্তির আগে সে যেন এক প্রস্তুতিপর্ব। একজনের কথা মনে আছে। রাজবাড়ির সাম্পান গাড়ি চালাত গফুর মিঞা—তার ছেলে সোলেমান। আমারই বয়সি—আমার পাশেই বসত। সাম্পান গাড়ি কী? বলদে টানা গাড়ি—কিন্তু ছই বা টোপর নয়—কাঠের তৈরি তিনটে করে জানালা সমেত ঘোড়ায় টানা পাল্কি গাড়ির মতোই। আমরা গোষ্ঠের মেলায় যেতাম ওই গাড়ি করে

গোষ্ঠাষ্টমীতে মাইল দুয়েক তফাতে। সোলেমান বসত ওর বাবার চালকের আসনের পিছনে। তা সেই সোলেমান আমাকে সেই পাঠশালায় একটা তালপাতার তৈরি ঝাঁটার কাঠিতে গাঁথা সেপাই করে দিয়েছিল। কাঠি ঘোরালেই হাত-পা নাড়াত সেই সেপাই। সে বয়সে সেটা পাওয়া এক বড় পাওয়া আর বিস্ময়ের তো বটেই। সে বিস্ময়ের দিনগুলো তো কবেই কেটে গেছে। সোলেমান আমাকে অবাক করেছিল অনেকদিন বাদে—তখন আমি কলেজে পড়ি। সোলেমান আমার সঙ্গে স্কুলেও ভর্তি হয়েছিল—ক্লাশ ফোর এবং ফাইভ পর্যন্ত পড়েও ছিল। স্কুলেও সে আমার পাশেই, বন্ধু হয়েই বসত এবং ছোট ছোট হাতের-কাজ দেখিয়ে মজা দেখাত। ইতিমধ্যে বহুদিন কেটে গেছে। কলকাতা থেকে কলেজের বন্ধে বাড়ি গেছি। হঠাৎ একদিন বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে সেই সাম্পান গাড়িটা হাঁকিয়ে যাচ্ছে সোলেমান। তার মাথায় চিস্তি টুপি, পরে আছে লুঙ্গি। না তখনও দেশভাগ হয়নি। আমাকে দেখে নমস্কার করলে এবং 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বললে 'কবে এসেছেন—কেমন আছেন?'। আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'কিরে? তুই আমাকে 'আপনি' বলছিস কেন? এ্যাঁ'। ও একটু লজ্জা পেল—মুখটা নামিয়ে নিল। কিন্তু 'তুই' বলতে পারল না। শুনলাম ওর বাবা মারা গেছেন। ও চাকরিটা পেয়েছে। সেই সোলেমান—যে পাঠশালায় এবং বছর দুই স্কুলে আমার পাশে বসত—আমার বন্ধু ছিল। আমাদের সঙ্গে গোষ্ঠের মেলায় ওই গাড়িতেই ওর বাবার পিছনে বসে যেত। ওর কাছেই কাগজ ভাঁজ করে নৌকো তৈরি শিখেছিলাম। মনে হল ভেদ-বোধহীন শৈশব বাল্যের দিনগুলোই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

পাঠশালাতেই ওই ভেদাভেদ জ্ঞানটা লুপ্ত করে দেবার প্রয়াসটা শুরু হয়েছিল। বাবার এইসব কাজ সেই ছোটবয়সেই মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলেছিল। তিনি ছিলেন পরিবারের বড় ছেলে। বৈষয়িক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। সমাজ ও স্বদেশ ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। দিনাজপুর জেলায় যত দিঘি ছিল—তার বিবরণ তাঁর সংগ্রহে ছিল। সাগর নামধারী সে সব দিঘির নাম তাঁর কাছ থেকেই আমরা শিখেছিলাম। 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' গানটা গাইতে শিখিয়েছিলেন বাড়ির ছোটদের। মাঝে মাঝে, কোনো সন্ধেবেলায়—আমরা যখন পড়তে বসতাম তখন অন্য এক বারান্দায় বাবা পায়চারি করতে করতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কবিতা উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। কোনো দুপুরে বাবার পাশে শুয়ে তাঁর হাতে 'বন্দেমাতরম্' লেখা উল্কিটার নীল অক্ষরগুলো দেখত। সে সেই ছেলেবেলায় ভাবত সে বাবার মতো লম্বা হবে। স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে—এবং ওই রকম গলার আওয়াজ হবে। কোনওটাই হয়নি, শুধু অধম সন্তান হিসেবে বাঁ-হাতে একটা উল্কি এঁকে নিয়েছিল—না, 'বন্দেমাতরম' নয় নিজের নামের আদ্যক্ষর। কী লজ্জা! কী লজ্জা! ছেলেবেলার সে এক কুকীর্তি।

১৯৩২ সালে যখন বয়স ৬ বছর, তার আগের কয়েকবছর ১৯২৯, '৩০, '৩১ সালের কথা মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই ছেলেবেলায় বড়দের কাছে শুনতে শুনতে সারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাগুলো যেন জানা হয়ে গিয়েছিল। লাহোর কংগ্রেস, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ভগৎ সিং, যতীন দাশ আবছা হলেও শোনা নাম। হয়তো এই আবছা অবস্থাটাও সম্পূর্ণ মুছে যেত যদি না বাড়িতে সেইসব আলোচনার বাতাবরণটা না থাকত।

আরো দুটো নাম—মাস্টারদা আর প্রীতিলতা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা। এই সময়কার একটা বাৎসরিক স্মৃতি কিন্তু স্পষ্ট মুদ্রিত হয়ে আছে। পাঁচ বছর বয়সের সে স্মৃতি নাও থাকতে পারত। কিন্তু সেই বিশিষ্ট দিনটিকে উদ্‌যাপিত হতে দেখেছে কৈশোরকালেও। ২৬ জানুয়ারির পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ। ১৯৩১ সাল থেকে চলে এসেছে। সেই হলঘরের ছাদে সবচেয়ে উঁচু কোণে—রাস্তার দিকে—বাবা তেরঙা চরকালাঞ্ছিত পতাকা নিজের হাতে ওড়াতেন ভোরবেলায়। ওই পাড়ায়—আমাদের একটি মাত্র ভবনশীর্ষে ওই পতাকা তোলা হত। আমরাও ছাদে যেতাম—পুব আকাশে সূর্য ফুটে উঠছে। বাবাকে নায়ক মনে হত। কুসুম রঙের সেই ভোরবেলায় সংকল্পবাক্য পাঠ। আমরা বুঝি না বুঝি সমবেত উচ্চারণ করতাম—বাবার সঙ্গে সঙ্গে। পরাধীনতার কথা, আমাদেরও স্বাধীনতালাভের অধিকার আছে আর শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প। এর পরেই বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম কংগ্রেসের মাঠে। সেখানে অনেক মানুষের সমাবেশ। সেখানেও পতাকা উত্তোলন। আর বহু মানুষের সমবেত কণ্ঠে সেই সংকল্পবাক্য পাঠ। একজনের সুরে সুর মিলিয়ে সকলে এক এক লাইন উচ্চরণ করছে। প্রত্যেকের হাতে ছাপান সংকল্পবাক্যের পাঠ। সেই ছোটবেলায় দেখেছি—ভীষণ কালো এবং পেটা শরীরের একজন জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে সেই সংকল্পবাক্য পাঠ করাচ্ছেন—আর সকলে সেটা উচ্চারণ করছেন। ওকেই সেই ছেলেবেলায় এবং বড় হয়েও নাট্যসমিতির গৃহে অভিনয়ের আসরে কখনো সীতা নাটকে শম্বুক, কিংবা মিশরকুমারী নাটকে 'আবন' চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি। দুটি চরিত্রই নিপীড়িত মানুষের প্রতিভূ। এসব মনে করা অবশ্যই সেই ছেলেবেলায় হয়নি। ওর নাম মনে আছে গুরুদাস তালুকদার। পরবর্তীকালে বড় মাপের একজন কৃষক আন্দোলনের নেতা। তখনও তিনি অভিনয় করেন এবং আমিও ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করেছি। অভিনয় সূত্রেই এইসব মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু সেই ছেলেবেলায় নিজের চেহারা, স্বাস্থ্য আমাকে পীড়া দিত। এত অসুখে ভুগতাম। চেহারা স্বাস্থ্য ভালো করার জন্যেই যেমন অন্যদের মতো বাড়ির জিমখানায় ডনবৈঠক, প্যারালাল বারে কসরত করবার চেষ্টা করেছি—ওমনি আবার জ্বর হত। আর বিছানার আশ্রয়ে যেতে হত। আমার মনে আছে প্রায় প্রত্যেক শারদোৎসবের পর পরই আমার অসুখ করত। যখন আকাশপ্রদীপ জ্বালান হত—একটা বাঁশের আগায় কিংবা দীপাবলীর রাতে যখন সবাই বাজি পোড়াচ্ছে তখন চাদরমুড়ি দিয়ে ঢাকা বারান্দায় কখনো কখনো বিছানা ছেড়ে দাঁড়াতাম করুণ চোখে। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালে যে মাথায় হিম পড়বে, জ্বর বাড়বে! কেউ কেউ যেন করুণা করেই একটা নির্দোষ বাজি তারা-কাঠি হাতে ধরিয়ে দিত। তাই নিয়েই খুশি থাকতে হত। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা (বৈষ্ণব বাড়ি—কালীপুজো হত না—সেদিন রাত্রে হত লক্ষ্মীপুজো) অলক্ষ্মীকে দূর করতে বাড়ির কাছের চৌরাস্তার মোড়ে কুলো বাজাতে বাজাতে "অলক্ষ্মীকে দূর কর—লক্ষ্মীকে ঘরে তোল"—বলতে বলতে দূরে চলে যেত—তখন ওই বাইরের রাস্তাটা যেমন অপার স্বাধীনতার সড়ক বলে মনে হত।

আবার হলঘরের স্মৃতিতে ফিরে যাই। এবং এই ছেলেবেলার কথার নটেগাছটি মুড়িয়ে দিই। বাড়ির বাইরের মাঠে মঞ্চ তৈরি করে লাইব্রেরির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে নাটক

দায়ী

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরেশ বলল, কিন্তু হাতটা টেলিফোনের দিকে বাড়ানো ছিল কেন?

নিরঞ্জন বলল, ও শেষ মুহূর্তে একটা বাঁচবার ইচ্ছে। এরকম হয় নাকি।

সঞ্জয় বলল, তার কোনো মানে নেই।

মানে?

ডাক্তারকেই যে ফোন করতে চেয়েছিল, একথা ধরে নেব কেন?

কাগজগুলো তো তাই বলছে।

পরেশ বলল, আরে রেখে দাও তোমার কাগজ। নিউ ইয়র্কের একটা ডেসপ্যাচ পড়লাম—তাতে বলছে ও দেশের কাগজগুলো মৃত্যুর পরও মেরিলিন মনরোকে ক্ষমা করে নি। মনরোর প্রবল যৌনতা, উদ্ভট খামখেয়াল ও আত্মসর্বস্বতার পরিণাম নাকি এমনই হতে বাধ্য।

সঞ্জয় বলল, তা তো বলবেই। ওদের জীবন আর সভ্যতা যে কতখানি বিকারগ্রস্ত ও শূন্যগর্ভ এই আত্মহত্যা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কিনা। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশে হলিউড যাকে মার্কিনী সংস্কৃতির প্রধান প্রচারক করে তুলেছিল—সেই যে শেষ মুহূর্তে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা তো বাবুদের জানা ছিল না।

পরেশ বলল, আর দ্যাখো, খবর পেয়ে কত দেশে সুইসাইড এবং এ্যাটেম্প্ট্ হলো। কি কাণ্ড।

সঞ্জয় বলল, জানো, ভ্যাটিকানের কাগজেও এ সম্পর্কে লিখেছে—

পরেশ বলল, জিনিসটা সোশিয়লজিকাল স্টাডির বিষয়।

নিরঞ্জন বলল, তোর আবার বাড়াবাড়ি।

পরেশ বলল, দ্যাখো, মেরিলিন মনরো সম্পর্কে আমার বীতরাগই ছিল। আমি 'বাসস্টপ' বলে একটা ছবি দেখেছিলুম, তখন মহিলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতুম না। আমার জঘন্য লেগেছিল। তারপর দেখলুম 'দি প্রিন্স এ্যাণ্ড দি শো গার্ল'। লরেন্স অলিভিয়ের এর সঙ্গে ছবি করছে দেখে প্রায় কৌতূহলেই বইটা দেখে ফেললাম। আর সত্যি কথা বলতে কি, বইটা ভালোই লেগে গেল। মহিলা যে অভিনয় করতে জানেন, তা বেশ বোঝা গেল। আর আমি কোনো ছবি দেখি নি।

নিরঞ্জন বলল, চান্স পেলেই আত্মজীবনী।

সঞ্জয় হাসল।

পরেশ বলল, কিন্তু মহিলার সুইসাইডের খবরটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটা খবর ফলো করেছি। জানো, প্রচার করা হচ্ছে মনরোর জন্মে রহস্য ছিল, মা পাগলাগারদে, ওঁর রক্তেই নাকি মানসিক ব্যাধি ও আত্মহত্যাপ্রবণতা।

নিরঞ্জন বলল, এগুলি কিন্তু সত্যি।

হুঁ। আর বাল্যকাল থেকে শুধু মাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য সেই প্রাসাদপুরীর দেশে মনরোকে যে দস্তুরমতো জীবন সংগ্রাম গোছের ব্যাপার করতে হয়েছে—তার কি হবে? পেটের দায়ে যে একদিন নগ্ন শরীরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল—তাও নিশ্চয়ই রক্তের দোষ। খ্যাতি এবং সাফল্যের শীর্ষদেশে উঠে মহিলা চাইলেন একটু ভদ্রভাবে বাঁচতে, শিল্পী হতে—তখনই হলিউডের হিংস্র নখগুলি বেরিয়ে পড়ল।

নিরঞ্জন বলল, মোটেই না। ঐ শেষ ছবির কন্ট্রাক্ট যে প্রযোজকরা বাতিল করে দিয়েছিল তার কারণ অন্য। সেট সাজিয়ে সকলে বসে আছে, মনরোর পাত্তা নেই। হয়তো কয়েক ঘণ্টা পরে কোনো খবর এলো, আজ তিনি আসতে পারবেন না। হয়তো বারোটার সময় আসার কথা, এলেন পাঁচটায়, তাও আধঘণ্টা কাজ করে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফূর্তি করতে চলে গেলেন। এতে ওদের হাজার হাজার ডলার নষ্ট হতো। অন্যান্য আর্টিস্ট ও টেকনিশিয়ানদের ক্ষতি হতো। তাছাড়া—

পরেশ বলল, এগুলি সত্যি। আমার মনে হয় মনরো জানতেন তিনি অপরিহার্য, তাই এভাবে তিনি তার অতীতের দুঃস্থ, গ্লানিময় জীবনের শোধ নিতেন। তাছাড়া ঐ ছবির কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়েছিল অন্য কারণে। ওতে একটা দীর্ঘ স্নানের দৃশ্য ছিল—তাতে মনরোকে আবার নগ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছিল। মহিলা তার প্রতিবাদ করেন। ফলে প্রযোজক ছবিটি তোলাই বন্ধ করে দিল। মনরো জানতেন এর পরিণাম সাংঘাতিক। শিল্পপতিদের স্বার্থ ও দম্ভের যে সূক্ষ্ম জাল চারদিকে ছড়ানো রয়েছে—তার গ্রাস থেকে বাঁচা যাবে না। ওরা রাতারাতি তার নামে স্ক্যাণ্ডাল রটিয়ে, তার শরীর সম্পর্কে বয়েস সম্পর্কে মিথ্যে খবর রটিয়ে, সে যে কোনোদিনই অভিনয় করে নি, আসলে এতদিন মানুষকে শরীর দেখিয়ে ভুলিয়েছে—নির্ভুলভাবে এ কথা প্রমাণ করে দেবে, মনরো বুঝেছিল অভিনয়ের সুযোগ ও শিল্পীর স্বাধীনতা চাওয়ার অর্থ বিদ্রোহ। আর ওদেশে বিদ্রোহীর ক্ষমা নেই।

সঞ্জয় বলল, কিন্তু যাই বলো মেরিলিন খুব উঁচুদরের অভিনেত্রী ছিলেন না।

পরেশ বলল, হু, অন্তত তার প্রমাণ মহিলা দিয়ে যেতে পারেন নি। সমালোচকরা প্রায় সকলেই চিরদিন তার শরীরের মাপ, হাঁটা, চোখের দৃষ্টিতে যৌনতা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। বলা হতো মেরিলিন সেই জাদুকর আর তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ হলো সেই কলস—ইচ্ছে মতো ছিপি খুলে সে যৌনতাকে সর্বত্র চারিয়ে দিতে পারে। অথচ জানো. লরেন্স অলিভিয়ার এবং আরো অনেকে বলেছিলেন এই মেয়ে জাত শিল্পী। আর মনরো আইজেনস্টাইনের পদ্ধতিতে মনোযোগী ছাত্রীর মতো অভিনয় শিক্ষা করেছিল। সে আসলে কোনদিন তার শিল্পক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগই পেল না।

নিরঞ্জন বলল, বাদ দাও এসব তত্ত্ব। মরার আগে রিসিভারটা কেন ধরতে চেয়েছিলেন কি মনে হয় তোমার?

প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম হয়তো শেষ মুহূর্তে বাঁচার ইচ্ছেই প্রবল হয়েছিল। কিন্তু পরে মনে হলো আসলে তো ও কাউকে টেলিফোন করেও থাকতে পারে। রিসিভারটা ও ধরতে চেয়েছিল না নামিয়ে রেখেছিল, জানবে কেমন করে?

নিরঞ্জন বলল, তাই তো।

সঞ্জয় বলল, যা সে তো টেলিফোন আফিসই হিসেব দিতে পারে। তাছাড়া কাকে টেলিফোন করেছিল—

সেটাই তো ধাঁধা। টেলিফোন কি করেছিল, না করতে চেয়েছিল। কাকে। শেষ মুহূর্তে কি বলার ছিল মহিলার।

আলোচনার গতিটা পালটে রহস্যময় ও থমথমে হয়ে উঠল।

নীরবতা ভেঙ্গে পরেশ বলল, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল। রিসিভারটা ধরবার জন্যই আচ্ছন্ন চোখ দুটো খুলে সে তার শিথিল হাতটা বাড়িয়েছিল।

পরেশ চমকে উঠে বলল, তাই তো, এটা অবশ্য ভাবি নি।

সঞ্জয় বলল, হয়তো মনরো রিসিভও করেছিল, কথাও হয়েছিল। তারপর নামিয়ে রাখার পর—

নিরঞ্জন চাপা গলায় বলল, কিন্তু কে? কি বলতে পারে সে এত রাতে?

সঞ্জয় বলল, শ্রেষ্ঠতম ধনী, প্রখ্যাততম ব্যক্তি অবার অতি নগন্য মানুষ—যে কেউ হতে পারে। হয়তো কোনো শুভ অথবা বিশ্রী সংবাদ ছিল, হয়তো আহ্বান ছিল, আবার বেড়াল ডাক শোনাবার জন্যও হতে পারে। হয়তো মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাকে হুমকি অথবা গালি শুনতে হয়েছে।

পরশে বলল, সম্ভব।

নিরঞ্জন বলল, না, দেখছি সবাই মিলে ধরে বেঁধে একটা মেয়েকে খুন করেছে।

ভেবে দ্যাখো, সোস্যালিস্ট ওয়ার্ল্ডের খবর জানি না। আর তো পৃথিবীর সর্বত্র সাদা কালো শিক্ষিত মুখ্যু কোটি কোটি মানুষ পর্দায় তাকে দেখে নিজেদের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করেছে। এই তো আমি, আমিও মনে আছে মনরো সম্পর্কে কি না বলেছি।

নিরঞ্জন অস্ফুটে বলল, আমিও।

সঞ্জয় স্তব্ধ বসে রইল।

পরেশ বলল, মেয়েটি তো জানত মানুষ তাকে কি চোখে দেখে, কি জন্যে দেখে। মৃত্যুর পূর্বেও কি এই কোটি কোটি চোখ তাকে গ্রাস করে নি? সেই উন্মত্ত কোলাহল ও পরিহাস কি তার অবসন্ন স্নায়ুকে আঘাত করে নি? হয়তো তাই সে এই আমাদের সভ্যতাকে, তার ঘাতককে অভিযুক্ত করে গেছে। টেলিফোন রিসিভারের দিকে ব্যাকুল হাতের নির্দেশ হয়তো এই কথাই বলছে চেয়েছিল।

খুব হাল্কা পরিহাসে যে গল্প আরম্ভ হয়েছিল, আস্তে আস্তে যা তত্ত্বালোচনায় পরিণত হচ্ছিল, এক দুর্বোধ্য রহস্য ও জটিলতা ক্রমে যে কাহিনীর চরিত্র পালটে দিচ্ছিল হঠাৎ তাতে ছেদ পড়ল।

আর এই শহরের সেই তিনটি যুবক, তিনটি কেরানী সারাদিন অন্যের নির্দেশে কলম চালিয়ে সন্ধ্যে বেলা চায়ের আসরে বসেছিল আড্ডা দিতে। হঠাৎ অন্যমনস্কতার ভান করে তিনজনেই অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

কারণ কেন জানি পরস্পরের চোখের দিকে তাকাতে তাদের ভয় হচ্ছিল।

তাজা ও ভেজা বারুদ

কার্তিক লাহিড়ী

সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে—অর্ডার পেতেই সন্দীপের চুল খাড়া হয়ে ওঠে— ইস্তাহার, আবেদন, নিবেদন, স্মারকলিপিতে গাদা গাদা নাম, অবশ্য সবগুলোর মধ্যে একই নাম ঘুরে ফিরে থাকছে, তবু সেই নামের সংখ্যাও তো কম নয়, সন্দীপ গুণে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এত স্বাক্ষরকারীর কাছে গিয়ে তাদের পুছতাছ করা তো সময় সাপেক্ষ, হাতে আছে এখন মাত্র—

কোন তারিখ থেকে সে সাতদিন ধরবে

১. বড় কর্তা যে তারিখে সই করেছেন

২. যে তারিখে অর্ডার ডেস্‌প্যাচ করা হয়েছে, নাকি—

৩. যে তারিখে সে চিঠি পাচ্ছে?

অর্ডার সই-এর তারিখ ধরলে রিপোর্ট দাখিলের সময়সীমা পার হয়ে গেছে কবে, ডেস্‌প্যাচের তারিখ ধরলে আজ হবে সপ্তম বা শেষ দিন, তবে চিঠি পাওয়ার তারিখ ধরলে আজই হচ্ছে প্রথম দিন

সন্দীপ কোনটাকে ধরবে?

চিঠি পাওয়ার দিন থেকে ধরতে হবে স্যার, তার প্রধান সহকারী সুকুমার বিশ্বাস সমস্যার সমাধান করছে এইভাবে :

চিঠি পাওয়ার পর থেকেই তো জানতে পারছেন কী করতে হবে আপনাকে এখন, তার আগে তো জানতে পারেন না, পারা যায়-ও না, তাহলে?

হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে দেওয়া হল কেন এই কাজ? আমি কী জানি এ সবের?

এটা কী বলছেন স্যার, আপনার মতো কম্‌পিটেন্ট অফিসার আমাদের ডিপার্টমেন্টে আর কে আছে স্যার, তা ছাড়া—

থামলে কেন, বলে ফেলো

আপনি স্যার, সুকুমার মাথা চুলকোয়, ফ্যাংশন-ট্যাংশনে যান তো, তাই হয়ত তাঁরা মনে করছেন আপনি ফিটেস্ট পারসন

সে তো অনেকেই যায়, তুমি যাও না?

আমি একা যাই না স্যার, আপনি মাঝে মধ্যে নিয়ে যান, নইলে কে আমাকে পোছে এক বিঘতের আমলাকে?

ওহ্? এই যাওয়াটা তাহলে কাল হচ্ছে এখন; না গেলে দিব্বি থাকতে পারতাম?

কী বলছেন স্যার? এটা একটা মহা সম্মানের ব্যাপার

হ্যাঁ, বলেছে তোমায়? যে-ই যাব পুছতাছ করতে, অমনি খবরের কাগজওয়ালারা গ্যাঁক-

গ্যাঁক করে ছুটে আসবে, লিখতে থাকবে—গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। হই-হই পড়ে যাবে, মানবাধিকার কমিশন থেকে শুরু করে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর, আর তোমরা দিব্বি...সন্দীপ বিড় বিড় করে বলে চলে তারপর, সুকুমার তার কিছু বুঝতে পারে না, অবশ্য কিছুক্ষণ বলার পর সন্দীপ থেমে পড়ে, তখন

সুকুমার তার দিকে জলের গেলাস বাড়িয়ে দেয়, সন্দীপ একঢোক জল খেয়ে তাকায় সুকুমারের দিকে, হাঁ, যা বলছিলাম

সন্দীপ স্বাভাবিক হতে থাকলে সুকুমার একটু ভরসা পায় যেন, একটা কথা বলি স্যার: কিছু মনে করবেন না তো?

একটা কেন, যত কথা আছে স্বচ্ছন্দে বলে ফেলো, তোমরা তো বলার জন্যই আছো কেবল, তাকে চুপ থাকতে দেখে সন্দীপ হেসে ফেলে, আরে বলে ফেলো চটপট...কী আর বলবে, সবই তো—

আপনি তো নামগুলো দেখলেন স্যার, অনেক কমন নাম আছে, একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলুন ওইসব নামের—নাকি আমি করব? তারপর

তারপর কী?

আমি ফিট্ করে দিচ্ছি কয়েকজনকে, তারাই সব খবর এনে দেবে, আপনাকে বা আমাকে ছুটোছুটি করতে হবে না, ঘরে বসেই লিখে ফেলতে পারবেন রিপোর্ট, ঝুট ঝামেলায় যেতে হবে না, ওরাই সব তৈরি করে দেবে

সন্দীপ একটু ভাবে, তারপর বলে, নাহ্ সুকুমার, এখানে ইন্-ভলভ্মেন্টের ব্যাপারটা অ্যাসেস করতে হবে, অর্ডারের বয়ান তাই বলছে, সেজন্য নিজেকেই যেতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে বিষয়ের গভীরতা, কী ভাবছে ওরা? ওদের উদ্দেশ্য

কিন্তু স্যার, আপনি গেলেই তো ব্যাপারটা অন্য মাত্রা পেয়ে যাবে—সকলে এলার্ট হয়ে যাবে, আর খবরের কাগজের রিপোর্টার ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার উপর, যা নয় তা-ই লিখবে, জীনা হারাম করে দেবে আপনার

বুঝলাম, সে ভাবতে ভাবতে বলে, কিন্তু—

এর চেয়েও সিরিয়াস ইন্‌কোয়্যারি করেছেন আপনি, তাতে আমরা সোর্সদের উপর অনেকখানি নির্ভর করেছিলাম, কিছু ক্ষতি হয়নি তখন, আর এখন যদি সোর্সদের সাহায্য নি, তাছাড়া সাহায্য তা নিতেই হবে

আ-হা বুঝছো না কেন, এটা হচ্ছে সেন্সেটিভ্ ব্যাপার। দেখছো না সব বাঘা বাঘা লোকের ই—সিনেমার ডিরেক্টর থেকে শুরু করে বিখ্যাত অভিনেতা শিল্পী সাহিত্যিক কবি স্পেশালিস্ট, অধ্যাপক,—কে সই দেয়নি বিবৃতিতে, তাই গর্ভমেন্ট একটু নার্ভাস বোধ করছে হয়ত, বুদ্ধিজীবীরা দি অ্যাগেন্স্টে চলে যায়, তবে..., কথা শেষ না করে সন্দীপ ভাবতে থাকে, বুঝলে, আমি কী লতে চাইছি?

বুঝেছি স্যার, তাই আমি এ বি সি ডি পাঠাবার কথা ভাবছি না মোটে, ইয়ং এনারজেটিক্ দ্ধিমান, মানে যারা কথার মারপ্যাঁচে বুদ্ধির কৌশলে টেনে বের করে আনবে আঁতের কথা, নে বলতে চাইছি কম্পিটেন্ট সোর্স

তেমন জানা ছেলে আছে তোমার?

ইয়েস স্যার, যদি বলেন তাদের হাজির করাব আপনার সামনে, আপনি একটু বুঝিয়ে পড়িয়ে দেবেন তাহলেই হবে...

কিন্তু সেটা করলে বহুৎ জানাজানি হয়ে যাবে, আর খবরটা লিক্ হয়ে গেলে মহা ঝামেলায় পড়তে হবে, হেড তখন খবর পাচারের দায়ে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবেন, চাকরি তো যাবেই, উপরন্তু গালে মুখে চুন কালি মেখে বিদায় নিতে হবে জন্মের মতো, না না, তার চেয়ে বরং নিজের বেরিয়ে পড়া অনেক ভালো, কয়েকজনের কাছে তো যেতে পারব, তাই যথেষ্ট হবে

সুকুমার সন্দীপের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে, আমি কি স্যার আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি? যদি বলেন তবে ইন্‌ভেস্‌টিগেশনে আপনাকে সাহায্য করতে পারি—

আপাতত থাক্, প্রথমে নিজে চেষ্টা করে দেখি, তারপর না হয়...সন্দীপ হেসে কথা শেষ করে

আর সুকুমার তার ইঙ্গিত ধরতে পেরেই আস্তে আস্তে কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে

সুকুমার চলে গেলে সন্দীপ নামের লিস্ট করতে শুরু করে। প্রায় একই নাম সমস্ত বিবৃতি আবেদন নিবেদনে ঘুরে ফিরে আছে

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, ধর্ষণ, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য, পুলিশি নির্যাতন, জেল হাজতে মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদি, রাজ্যে বহু চিন্তাশীল বিদ্বান বুদ্ধিমান এমন কি সমাজসেবী আছেন, কিন্তু তাদের সামান্য একটা অংশ-ই স্বাক্ষর দেন এইসব বিবৃতিতে, স্মারকলিপিতে, তার মানে বাদ বাকি যাঁরা থাকেন, তাঁরা মোটেই সমাজ-সচেতন কিংবা দায়বদ্ধ নন? নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে কিংবা থাকে?

সন্দীপ ভেবে থই পায় না, শেষমেশ এসব ভেবে কী হবে, রিপোর্ট দাখিল করতে হবে, সময় মাত্র সাতদিন, এই সাতদিনের ক-টা দিন যে চলে যাবে খোঁজ-খবর নিতে কে জানে? এত জায়গায় কি 'কভার' করতে পারবে এই ক-দিনে? তাছাড়া সকলের ঠিকানাও সে জানে না, ঠিকানা জোগাড় করাও একটা মস্ত কাজ, মস্ত নয় আসল কাজ, ঠিকানা পেলেই তবে সে যেতে পারবে সেখানে, নইলে...

কিন্তু ঠিকানা মিলবে কী ভাবে? টেলিফোন গাইড থেকে নিশ্চয়—ভাবতেই সন্দীপ দ্রুত টেনে নেয় টেলিফোন গাইড, মোটামোটা গাইডবুক, প্রথমটায় আছে এ থেকে এইচ্, দ্বিতীয়টায় আই থেকে জেড, তা বাদে সাপ্‌লিমেন্ট ইস্যু। একবার এটা আরবার ওটা, দু-টোয় না পেলে তৃতীয়টা, এভাবে কয়েকটা ঠিকানা খুঁজতে জেরবার হয়ে যায়, ধ্যুৎ তেরি, সুকুমারের কথায় রাজি হয়ে গেলেই ল্যাঠা চুকে যেত, খবর তো যে কেউ দিতে পারে, তাছাড়া—

নিজে ইন্‌ভেসটিগেশনে গেলে খবরটা চাউর হয়ে যাবে নিমেষের মধ্যে, কাগজে বের তো হবেই, তার উপর যাদের পুছতাছ করতে যাবে তারাও সাবধান হয়ে যাবে খুব, তাহলে স্বাক্ষরকারীদের ইন্‌ভলভ্‌মেন্ট ঠিকমতো হদিশ করে যাবে না

ঠিক হদিশ পেতেই হবে—এ দিব্বি দিল কে? আর পাঁচ-টা কাজের মতো এটাও একটা কাজ, আর এ কাজে সাহায্য না নিলেই নয়, কারণ জনে জনে সংযোগ করতে গেলে একটা সাতদিনে কুলোবে না কত কত সাতদিন লেগে যাবে তার হিসেব পাওয়া ভার হবে, আর রীতিমতো ইন্‌কোয়্যারি করতে গেলে তার নিয়ম কানুন রীতি পদ্ধতি ঠিকঠাক করতে হয়, সেই প্রসিডিওর অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে

বেশ কয়েকদিন যাবে ওই বিষয়ে পড়াশুনো লেখালিখি করতে, তহলে?

অগত্যা সুকুমারের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া অন্য বিকল্পের কথা ভাবতে পারে না সন্দীপ, সে সুকুমারকে ডাকে তখন—

আর অবাক কাণ্ড পাঁচদিনের মাথায় সন্দীপ পেয়ে যায় তার ঈপ্সিত ফল

একটা ফাইল নিয়ে হাজির হয় সুকুমার, স্যার বলেছিলাম না ছেলেগুলো ব্রিলিয়ান্ট, কী কাজ করেছে দেখুন?

ফাইলের দিকে তাকিয়ে সন্দীপ বুঝতে পারে, সে যা চেয়েছিল ফাইলে তাই নথিবদ্ধ আছে, মুখে খুশির রেখা ছড়িয়ে পড়ে, বেশ মোটা ফাইল...

পড়ে দেখবেন স্যার, কী ডিটেলে ওরা কাজটা করেছে, আরও কী জানেন স্যার; ওরা বুঝতেই দেয়নি যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে, এবং তা থেকে একটা জিনিস বের করে আনতে চাইছে

তাই? সন্দীপ একটু অবিশ্বাসের সুর মিশিয়ে দিচ্ছে আরও কথা টেনে বার করার জন্য, দেখা যাক্, সাপ পাব না ব্যাঙ পাব—

কাক পক্ষীতেও টের পায়নি, তাছাড়া ওরা ক্ল্যাসিফাই-ও করেছে, এক একটা বাঞ্চ এক একটা হেডিং-এর আন্ডারে, আপনার এতটুকু অসুবিধে হবে না রিপোর্ট লিখতে। জলের মতো সহজ, এক একটা বাঞ্চধরবেন আর লিখে ফেলবেন...

বটে?

হ্যাঁ স্যার, ওরা দারুণ করেছে কাজটা, টু ইওর স্যাটিস্‌ফেশন্...

দাঁড়াও, আগে দেখি, তারপর বলতে পারব কী করেছে তোমার সাকরেদ-রা, তবে ফাইল দেখে মনে হচ্ছে—

আমি জানি স্যার, আপনি খুশি হবেন। আচ্ছা স্যার, আমি আসছি তবে, বলে সুকুমার একটু ইতস্তত করতে থাকে

ততক্ষণে সন্দীপ ফাইলের ফাঁস আলগা করে

সুকুমার আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়

ফাইলের কভার খুলতে প্রথমে চোখে পড়ে হেডিং—বাংলায় লেখা—

নিরীহ স্বাক্ষরকারী

তার মানে ইনোসেন্ট বা হার্মলেস্ সিগন্যাটরি

বাহ্, বেশ হয়েছে বাংলাটা তো

কিন্তু নিরীহ স্বাক্ষরকারী মানে কী?

সন্দীপ পাতা উল্টোয়

পলাশ চৌধুরী : সিনেমা-পরিচালক

বিবৃতিতে সই দিতে বললে সই করি, জিজ্ঞাসা করি না কীসের জন্য সই, কেন সই...

বিপুল ঘোষ : কবি

ঝামেলা এড়াতে সই দি

এরকম অনেকে আছেন এই দলে, সন্দীপ দ্রুত পড়ে ফেলে প্রথম গুচ্ছ

এবার দ্বিতীয় গুচ্ছ, যার শিরোনাম

নিরপেক্ষ স্বাক্ষরকারী, তার মানে নিউট্রাল সিগন্যাটরি

বিলাস মৈত্র : অভিনেতা

আমি কোনো দল-কে সাপোর্ট করি না, যে দল বা পার্টি আসে সই নিতে আমি চোখ বুজে সই করি, সব দলই সমান

জগন্নাথ দাস : ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক

দল মত নির্বিশেষে যে-ই আসে দিয়ে দি সই, বাছবিচার করি না পার্টি বা দলের

একই মত প্রকাশ করেন আরও অনেকে অবশ্য ভাষার কিছু হেরফের হয়

তৃতীয় গুচ্ছ

উদাসীন স্বাক্ষরকারী, ইংরেজিতে হবে ইন্‌ডিফারেন্ট সিগ্‌ন্যাটরি

সন্দীপ না দেখে বিষয়টা বুঝতে চাইল, কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না, তাই পাতা ওলটায়

সুদর্শন বরাট : শিল্পী

ছবি আঁকি, চার পাশে কী ঘটছে না ঘটছে তাতে আমার থোড়াই এসে যায়, সই নিতে এলে কিছু বলি না, তাকাই তাদের দিকে, আর যেখানে সেখানে ছোট্ট ছবি এঁকে নিজের নাম লিখি—ব্যাস্

বাবলু দস্তিদার : সুন্দর বেঙ্গলের গোলকিপার

কোনো ব্যাপারে সই-টই নিতে এলে বলি আমার সই দিয়ে কী হবে, তবু সই করি বিনা কারণে বিনা ওজরে

এরপর সন্দীপ দ্রুত একের পর একগুচ্ছ দেখতে থাকে

বক্তা স্বাক্ষরকারী

প্রায় বক্তৃতা দিয়ে সই করেন

এই দলে আছেন কেশব সামন্ত : নাট্যব্যক্তিত্ব, বিকাশ পোদ্দার : চলচ্চিত্র পত্রিকার রিপোর্টার এবং আরও কয়েকজন

জিজ্ঞাসা বা ফোনে জেনে নেওয়া স্বাক্ষরকারী

অসীম গোস্বামী : গল্প-লেখক

সই নিতে এলে দেখে নি খুব পরিচিত কারো দস্তখত আছে কিনা, থাকলে চোখ বুজে সই করি, জানি উনি যখন সই করেছেন তখন সই করা সেফ্

বিদিশা সেন : কবি

সই নিতে এলে কবি সোম-কে ফোন করি, উনি যদি বলেন তবে সই করতে দ্বিধা করি না, তবে চেনা নাম দেখলে ভরসা পাই

এই গুচ্ছে অনেক নাম

সন্দীপ পরের গুচ্ছে চলে যায়—শিরোনাম যার

দায়বদ্ধ স্বাক্ষরকারী

বিদ্যুৎ চন্দ : সমাজসেবী

আমি একজন সাধারণ সমাজসেবী, সমাজে বাস করলে শুধু নিজেরটা দেখলেই চলে না, কত কত মানুষের শ্রমে সমাজ চলছে, আমাদের যারা খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তাদের প্রতি কিছু দায়

থেকেই যায়, তাই যেখানে অন্যায় অবিচার হয়, আমি সেখানকার মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চাই, সমাজের প্রতি দায় আছে বলেই প্রতিবাদ করি, বিবৃতি সই দি নিজের তাগিদে

সত্য নারায়ণ : কবি, অধ্যাপক

আমি পদবী ব্যবহার করি না, কারণ পদবী একজন মানুষকে আরেজন থেকে আলাদা করে, পদবী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, পদবীর জন্য কোনো একজনকে কায়স্থ কাউকে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, আমি মানুষ, প্রত্যেক মানুষ সমান, সকলের কিছু না কিছু ভূমিকা আছে সমাজে, তাই যেখানে অত্যাচার, নিপীড়ন, ধর্ষণ বিশেষ করে নারী জাতির উপর অন্যায় কিছু হয় আমি এগিয়ে এসে বিবৃতি দি সই দি, এবং অন্যকে দিতে বলি

এ পর্যায়ের স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বেশি নয়, জনা চারেক পাওয়া গেছে, তাঁরা প্রায় একই ধরনের উত্তর দিয়েছেন—তাঁরা দায়বদ্ধ, তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি

মোটামুটি এই কয়েকটা বড় ভাগে স্বাক্ষরকারীদের ভাগ করেছে তারা, কাজ করেছে বেশ ডিটেলে—প্রত্যেকের নামধাম

সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান

যাঁর সাক্ষাৎ নেওয়া হল তাঁর বয়স পেশা বলার ধরন বক্তব্য সব খুঁটিয়ে লেখা হয়েছে—ইন্ ডিটেলে যাকে বলা যায়

সন্দীপ খুশি হচ্ছে তাদের কাজ দেখে

এ ছাড়াও আছে আরও এবং শিরোনাম, যেমন

খুচরো স্বাক্ষরকারী : পথচারীদের কাছ থেকে নেওয়া সই, এরা সই করেই যেন খালাস—উদ্যোক্তা-রা সইয়ের সংখ্যা বাড়াবার তাগিদে ওঁদের ঠিকানা লেখার জন্য অনুরোধ করেননি বোধহয়, ফলে খুচরো-দের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তবে ওইসব নামের একটা লিস্টি করা আছে, আর আছে

এমন কিছু লোকের নাম যাঁরা মনেই করতে পারেন না যে তাঁরা সই করেছিলেন এক সময়, ছাপা বিবৃতিতে নিজের নাম দেখে অনেক কষ্টে মনে করতে পারেন, এ ধরনের স্বাক্ষরকারীদের একটা তালিকা আছে ভ্রান্ত স্বাক্ষরকারী শিরোনামে

ভ্রান্ত মানে কি ভুলেছে এমন? সন্দীপ পাতা ওলটায়

উপসংহারের মতো সাধারণ মন্তব্য, যেমন—

স্বাক্ষরকারীদের অনেকেই বলতে পারেন না বা জানেন না—অকুস্থলের অবস্থান কোথায়? ষষ্ঠীতলায় বাস থেকে নামিয়ে যে মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, সেই ষষ্ঠীতলা কোথায় জানতে চাইলে কেউ বলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা গ্রাম, কেউ বললেন মালদ'-র একটা গঞ্জ, কেউ বলেন মুর্শিদাবাদে।

রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে প্রায় সকলেই বলতে পারেন না কোন্ কোন্ জেলে বন্দী আছেন রাজনৈতিক বন্দীরা, জানেন না সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মূল তফাত কোথায়, কিংবা বিনা শর্তে মুক্তি মানে কী?

ফাইল পড়তে পড়তে সন্দীপ ভেবে পায় না, কী লিখবে সে?

স্বাক্ষরকারীরা কি সই দেবার জন্য সই করেছিলেন? এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের?

সই না করলেই বা কী হত? তবে কি ধিকৃত পতিত হবার ভয়ে সই করেন? অথচ প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ক্ষেত্রে কৃতি, নাম ডাক-ও আছে যথেষ্ট, তাহলে?

সন্দীপ আন্দাজও করতে পারছে না, এইসব ব্যাপারে এঁদের ভূমিকা কী? মাত্র সই দিয়েই কি এঁরা কর্তব্য সম্পাদন করছেন? কেবল সই করার জন্য সই, নাকি—

সন্দীপ বুঝতে পারছে না, নাকি বিবরণকারীরা তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন রিপোর্ট দিচ্ছে? সুকুমার কি আমার পিঠে ছোরা মারছে ওইসব ছেলেদের লেলিয়ে; নইলে এই ক-দিনে এত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হত কি? সুকুমার কি এত বড় একটা ঝুঁকি নেবে? কত কত দিন আছে আমার সঙ্গে, ওর বিরুদ্ধে এক কলমও লিখিনি কখনো, বরং বাঁচিয়েছে দু-একবার, তাহলে?

সন্দীপের মন একবার বলছে, সুকুমার আমাকে ফাঁসাবে না কখনো, আবার মনে হচ্ছে সে ফাঁদে ফেলে নিজের মুঠোয় আনতে চাইছে তাকে, যুক্তি বলছে—এটা করা সম্ভব নয় সুকুমারের পক্ষে কিন্তু মনের কোণে একটা তবু থেকে যাচ্ছে, আর এটাই সন্দীপকে হেলদোলের মধ্যে রেখে দিচ্ছে এখন

কী করব তবে? সময় বয়ে যাচ্ছে, সন্দীপ অস্থির থেকে অস্থিরতর হতে হতে হঠাৎ-ই শান্ত হয়ে যাচ্ছে, তবে কি নিজেই দু-একজন-কে পুছতাছ করে বিষয়টা জেনে নেব?

সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে তবুটাকে ঝেড়ে ফেলে তুলে নেয় নিজের তৈরি লিস্ট-টা, তারপর বিবৃতিগুলো থেকে লিস্টের বাইরে থাকা কয়েকটা নাম বেছে নেয়, আর বেরিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে...

একটা ভাত টিপলে যেমন বোঝা যায় ভাত সুসিদ্ধ হয়েছে কিনা, প্রায় সে রকম—অসংখ্য নামের মধ্যে তিন-চারজনকে পুছতাছ করতেই সন্দীপ টের পাচ্ছে, ফাইলের সাক্ষাৎকার সব তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য পেশ করা হয়নি, বরং রিপোর্ট লেখার জন্য ওগুলো দারুণ সহায়ক হবে, একটা ভূমিকা করে, যে যে শিরোনামে সাক্ষাৎকারগুলো ভাগ করা আছে, সেই হেডিং দিয়ে সংক্ষেপে লিখে দেবে তার বক্তব্য, আর ওগুলো অ্যাপেন্‌ডিক্স হিসেবে জুড়ে দেবে মূল বয়ানের একেবারে শেষে, তাহলে দারুণ হবে—

ঘাড় থেকে বিরাট বোঝা নেমে যাচ্ছে যেন, নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে থমকে যায় তবু, আচ্ছা, গর্ভমেন্ট কি কিছু ভেবেছে এ বিষয়ে? ভেবেছে নিশ্চয়, নইলে তড়িঘড়ি ইন্‌কোয়্যারি করাবে কেন, তা-ও আবার আরজেন্ট মোস্ট আরজেন্ট ইত্যাদির মোহরে? কিন্তু কী সেটা?

সন্দীপ খুঁজতে থাকে

তবে কি সই-এর মধ্যে বিস্ফোরক কিছু লুকিয়ে আছে? চমকে ওঠে সন্দীপ, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়ে ফাইলের উপর, সাক্ষাৎকার সব নিরীহ শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে ফাইলের বিছানায় চুপচাপ

বিস্ফোরকে বারুদ তাজা নয় তবে? পুরো ভিজে কাদা...

তাহলে গর্ভমেন্ট ভাবছে কেন এত এ নিয়ে?

প্রশ্নটা চোখের উপর দুলতে দুলতে বড় হয়ে যাচ্ছে ক্রমে, শেষে তার চোখ ঢেকে যাচ্ছে প্রশ্নচিহ্নের দোলায় কেবলই...

নাটক

দ্বৈরথ

বাদল সরকার

মুখবন্ধ

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মাথায় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, তাদের শোষণ-শাসন শুধুমাত্র গায়ের জোরে পুলিস-মিলিটারি দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। তাই তাদের প্রধান অস্ত্র ধাপ্পাবাজি। দখলে রাখা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে শাসক-শোষক শ্রেণী কখনো অবতীর্ণ হয় পিতার ভূমিকায়, কখনো গুরুর, কখনো হিতৈষী বন্ধুর। মাঝে মাঝে সমাজের পরিবর্তন যে প্রক্রিয়ায় ঘটে, আমরা তাকে বিপ্লব বলি। আবার এক হিসাবে তাকে পিতৃহত্যাও বলা চলে। সংখ্যালঘুর শোষণ-শাসন তারপরেও ফিরে আসে অন্য রূপে। ইতিহাস বার বার তা প্রমাণ করেছে। তখন লড়াই আবার শুরু করতে হয় পরিবর্তিত বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

এই উপলব্ধি আর চেতনা একটি বিদেশি নাটকে পেয়েছি। তাই তার কাঠামো আমি গ্রহণ করেছি 'দ্বৈরথ' নাটকটির রচনায়। 'কাঠামো' বললাম, কারণ এই ব্যাপারটা রচয়িতার চোখে তাঁর নাটকের 'একটা কথা' ছিল, 'আসল কথা' ছিল না।

দ্বৈরথ

বাদল সরকার

[অন্ধকার। অন্ধকারে জ্ঞান এল মাঝখানে। এককোণে এসে পড়ে আছে মানব। তার সারা গা চাদরে ঢাকা।]

জ্ঞান।। আদিতে ছিল অন্ধকার। ঈশ্বর আনলেন আলো।—বাইবল্। তমসো মা জ্যোতির্গময়। অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও।—বৃহদারণ্যক উপনিষদ। মোদ্দা কথা—আলো চাই।

[আলো জ্বলল। একটা টেবল্, তার উপর হরেক রকম দ্রব্য—ছোরা, খেলনা কাকাতুয়া, দেশলাই, জলভরা পাত্র, মুখোশ, তোয়ালে, বেত, চিরুনি, আয়না, কিছু কার্ড ইত্যাদি। একটা চেয়ার। জ্ঞানের পোশাক কিছুটা পুরুষের কিছুটা মেয়ের, মাথায় বিচিত্র টুপি, গয়না, ঠোঁটে লিপস্টিক। জামার সামনে ঝোলার মতো পকেট, কার্ডে ভর্তি। যেখানে যেখানে (কার্ড) কথাটি লেখা, সেখানে একটা কার্ড পকেট বা টেবল্ থেকে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় যে- কোনো দিকে।]

আলো। আরো আলো। আলো।—ব্যস, এতেই হবে।

[জ্ঞানের কথায় আলো এসেছে, বেড়েছে]

দুটি দামি কথা বলেছি এর মধ্যে। যদিও শাস্ত্রকথা, তবু উদ্ধৃতি—অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ—আমারই। অতএব, প্রথম দামি কথা (কার্ড), দ্বিতীয় দামি কথা (কার্ড)। আসলে আমার সব কথাই দামি। কতটা দাম থাকলে কথাটা পৃথিবীকে দেব, সেইটা হল কথা। পৃথিবী। পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা (কার্ড)। পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘোরে, আপন মেরুদণ্ডকে দণ্ড করে, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার তার ফলে দিন আর রাত্রি, আলো আর অন্ধকার (কার্ড)। (গেয়ে) দুনিয়া কী মজাদার রঙিন/দিনের পরে রাত্রি আসে, রাতের পরে দিন। অর্থাৎ কিনা চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দিনানি চ রাতানি চ (কার্ড)। নতুন দিন নতুন, পুরোনো দিনটাকে সে টেক্কা মেরেছে পুরো একদিনের রাস্তা। প্রতি নতুন দিন নতুন কিছু না কিছু আনে (কার্ড)। আজ কী এনেছে? (চাদরে ঢাকা বস্তুটাকে দেখে) এই তো! বাঃ।

[কাছে গেল। চাদর সরাল। মানব উঠল। বয়সে তরুণ, সাজ সাধারণ। জ্ঞান স্পষ্টত খুশি। মানব ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছে। জ্ঞানের দিকে মন দিচ্ছে না।]

হে বালক! হে যুবক! হে নবাগত আগন্তুক! (মানব সাড়া দেয়নি) চোখ থাকতে যে অন্ধ, তার জ্ঞানের দ্বার বন্ধ (কার্ড)। মুখ থাকতে যে মূক, তার—

মানব।। আমার নাম মানব।

[উদ্যত কার্ডটা রয়ে গেল জ্ঞানের হাতে]

জ্ঞান।। একটা দামি কথা পৃথিবী পেল না। শুধু তুমি ভুল সময়ে কথা বলেছো বলে।

[কার্ডটা পকেটে রাখল]

তোমার নাম মানব? উত্তম। আমার নাম—বাবা রেখেছিলেন 'জ্ঞানাঞ্জন'। আমি নিজে পরে নাম রেখেছিলাম 'জীবন'। কিন্তু সে নামটা স্বীকৃতি পেল না। বন্ধুরা বলত—'শক্তিধর'। মা ছোটবেলায় ডাকতেন 'বাবু' বলে। ঠাকুমা আদর করে বলতেন 'রাজা'। বাবা রেগে গেলে কখনো কখনো বলতেন—'নবাব'। পণ্ডিতমশাই বলতেন 'চণ্ড'। মন্দ লোকেরা আড়ালে বলে 'সং'। কোন্ নামটা তোমার পছন্দ?

[সাড়া নেই। মানব টেবল্‌টা ছুঁয়ে দেখছে।]

ওটা টেবিল। লোহার। দৈর্ঘ্য এক ফুট ন ইঞ্চি, বিস্তার এক ফুট ন ইঞ্চি, উচ্চতা এক ফুট ছ ইঞ্চি (কার্ড)। ওটা জল, এইচ্ টু ও, কিন্তু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ছাড়াও বহুরকম রাসায়নিক ও জৈব পদার্থ ওতে আছে। অতএব খেও না (কার্ড)। ওটা বেত।

[মানবের হাত থেকে বেতটা নিয়ে এক ঘা কষাল।]

আর এটা ব্যথা। (কার্ড)

[মানব অন্যদিকে গেল]

তুমি আমাকে জীবন বলে ডাকতে পারো।—জানতাম, নামটা স্বীকৃতি পাবে না। ঠিক আছে, জ্ঞানাঞ্জন বোলো।—যদি বয়সে আমি বড়ো বলে সংকোচ হয়, তবে না হয় জ্ঞানদাই বোলো।—না? তবে শক্তিদা?—বাবুকাকা?—রাজামামা?—নবাবচাচা?—সংখুড়ো?—(স্ত্রীকণ্ঠে) অমন করছিস কেন রে নাডু?

মানব।। আমার নাম মানব।

জ্ঞান।। (স্ত্রীকণ্ঠে) কিন্তু তোকে যে আমার নাডুগোপাল বলে ডাকতে বড্ড ইচ্ছে করছে রে নাডু!

[গাল টিপে দিতে গেল, মানব ছিটকে সরে গেল।]

ওমা, নাডুসোনা রাগ করল নাকি? ওমা আমি কোথায় যাব গো! আচ্ছা আচ্ছা—মানু! হয়েছে?

মানব।। আমার নাম মানব।

জ্ঞান।। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) মানব। মহামানব। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা ১৮ই আষাঢ়, তেরোশো সতেরো (কার্ড)। রবীন্দ্রনাথের কী কী কবিতা তোমার মুখস্থ আছে? (মানব চেয়ে আছে) একটাও নেই? দু-চার লাইন? আর কারো কবিতা? দাঁড়াও পথিকবর তিষ্ঠ ক্ষণকাল? বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডালকুকুরে সে কি বাস করল তাড়া? ট্যাসগরু গরু নয় আসলেতে পাখি সে? হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়?

[মানব অন্যদিকে গেল]

কী পড়েছো তাহলে এতদিন? (সাড়া নেই) কাল কী পড়েছো?

মানব।। কিছু না।

জ্ঞান।। পরশু?—তরশু?—তার আগের দিন?—বুঝলাম। গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট

হইতে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন (কার্ড)। সেথায় সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক (কার্ড) সিদ্ধকাম হইয়া—নাঃ থাক। দেবযানীকে আমদানি করলে কোরবানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা (কার্ড)। আমি শুক্রাচার্য, তুমি কচ, এইটুকু আপাতত—

মানব।। আমি মানব।

জ্ঞান।। ছিলে। এখন কচ। আদর করে তোমাকে কচু বলে ডাকতে পারি, বড়োজোর মানু। কিন্তু মানব কদাপি না। অন্তত আগামী সহস্র বৎসর—

মানব।। আমি মানব।

জ্ঞান।। মানকচু বললে চলবে?—কোথায় যাচ্ছো? আচ্ছা, যাও।

[এর পরে জ্ঞান যা বলছে, মানব সেই অনুসারে সব কিছু করছে। প্রথমে মানব শূন্য দেওয়াল অনুভব করল।]

ওটা দেওয়াল, দেখা যাচ্ছে না। ওটাও তাই। ওটাও তাই। স্থির হয়ে দাঁড়াও। নখ কামড়াও। চিন্তা করো। রেগে যাও। ছুটে যাও। লাথি মারো দেওয়ালে। বসে পড়ো। পায়ে হাত বুলোও। ওঠো। চলে এসো। আবার খেপে যাও। লাথি মারো চেয়ারে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এসো। আবার দেওয়ালের কাছে যাও। চেঁচাও।

মানব-জ্ঞান।। (একসঙ্গে) দরজা খোলো। কে আছো। খুলে দাও।

জ্ঞান।। এবার মরিয়া হয়ে ওঠো।

[মানব ছুটে এল জ্ঞানকে আক্রমণ করতে। জ্ঞান ক্ষিপ্র পায়ে সরে গেল। মানব পড়ে গেল।]

ছিঃ, গুরুকে আক্রমণ? আজ রাতের খাওয়া বন্ধ তোমার। (স্ত্রীকণ্ঠে) অমন করতে নেই বাবা, লক্ষ্মীবাবা। আমার কচুসোনা কত ভালো।

[মানব উঠে দাঁড়াচ্ছে, রুখে]

(স্বাভাবিক কণ্ঠে) উঁহু উঁহু, শান্ত হও। শান্তি। শান্তভাবে ভেবে দেখো—পথ নেই। বেরোবার পথ নেই। সিদ্ধান্ত? (রবীন্দ্রসংগীতের সুরে) পালিয়ে যাবার ব্যর্থ প্রয়াস পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।/চারদিকেতে দেওয়াল খাড়া/থাম্ রে পাগল, থমকে দাঁড়া/থোরবড়ি আর সজনে খাড়া/খেলবি কিন্তু গিলবি না।/বন্ধ ঘরের অন্ধকারে চিনে নাও পথের আলো (কার্ড)। কবিতা। কবি জ্ঞানাঞ্জন রচনা করেছেন পনেরো বছর সাতমাস বয়সে। সমালোচকদের মতে কবির এই সময়কার রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের প্রভাব অল্পবিস্তর স্পষ্ট। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব মৌলিকতার দাবি রাখে (কার্ড)।—এই নাও। (খেলনা-কাকাতুয়া দিল)

মানব।। কী এটা?

জ্ঞান।। পাখি। এ পাখি পড়ে, তোমার মতো নয়।

মানব।। কী পড়ে?

জ্ঞান।। পাখি তুমি কী পড়ো?

[পাখির কথা জ্ঞানই মুখ বন্ধ করে বিকৃত কণ্ঠে বলে দিচ্ছে]

পাখি।। পাখি তুমি কী পড়ো?

জ্ঞান।। পাখি সব পড়ে।

পাখি।। পাখি সব পড়ে।

জ্ঞান।। রাধাকৃষ্ণ।

পাখি।। রাধাকৃষ্ণ।

জ্ঞান।। শুওরের বাচ্চা।

পাখি।। শুওরের বাচ্চা।

জ্ঞান।। নাও। (পাখি দিল) এবার তুমি পড়ো।

মানব।। কেন?

জ্ঞান।। জ্ঞান হবে।

মানব।। তোমার জ্ঞান আমি চাই না।

জ্ঞান।। হে বৎস, জ্ঞানের আমিই একমাত্র উৎস। এটাও কবিতা (কার্ড)। বস্তুত, কাব্য আমার নাব্য নদীর পালতোলা এক দ্রব্য (কার্ড)। পালতোলা দ্রব্য বলতে কী বোঝায়?

মানব।। জানি না।

জ্ঞান।। যা ভেবেছিলাম, একদম গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। পড়ো—রাধাকৃষ্ণ।—পড়ো?—আচ্ছা পড়ো, শুওরের বাচ্চা।—কী হল? এই দেখো, পাখি পড়ছে। (পাখি নিয়ে) রাধাকৃষ্ণ।

পাখি।। রাধাকৃষ্ণ।

জ্ঞান।। দেখেছো?

মানব।। ওরকম পাখিপড়া আমি পড়তে চাই না।

জ্ঞান।। বুঝেছি। তোমার চাই আধুনিক পদ্ধতি। ছবি এঁকে পড়াতে হবে তোমাকে।

[ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গেলো খড়ি নিয়ে]

একটা বিন্দু। কোথায় বসাবো? উপরে। ঊর্ধ্বে (বসালো)। ধরো—উর্বশী। আর একটা বিন্দু নীচে (বসালো)। পাতালে। ধরো—বলিরাজা। অথবা ছুঁচো। এবার যার ছবি আঁকবো, মনে করো মানুষের ছবি, কোথায় বসাবো তাকে? উর্বশীর কাছে? না। তবে? ছুঁচোর কাছে? উঁহু। এই মাঝামাঝি (বসালো, মাঝখানে, একটু পাশে)। এবার যোগ করো বিন্দু তিনটে। সরলরেখা দিয়ে (যোগ করলো)। দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সর্বন্যুন দূরত্ব হোলো সরলরেখা (কার্ড)। এবার দেখো মুখ চোখ বসিয়ে দিলাম (বসালো)। না বসালেও চলতো, কারণ নাকটাই আসল। কি হোলো?
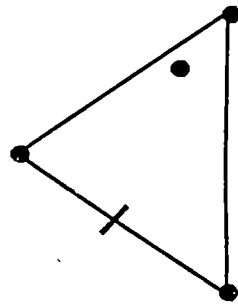
একটা মানুষ। মাঝামাঝি একটা মানুষ। উঁচু নয়, নীচু নয়, বড়ো নয়, ছোটো নয়, গুরু নয়, লঘু নয়—মাঝারি। কি জানা গেলো? মধ্যপন্থা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা (কার্ড)।

মানব।। আমার ছবি আঁকো।

জ্ঞান।। নাঃ, এ পদ্ধতিতে কাজ হবে না তোমার, শোনো—আমি ঊর্ধ্বে আছি। ধরো—উর্বশী। তুমি নিম্নে আছো, পাতালে। ধরো—বলিরাজা। অথবা ছুঁচো।

মানব।। তুমি ঊর্ধ্বে আছো কে বলেছে?

জ্ঞান।। আমি বলেছি।

মানব।। আমি বলছি, তুমি ঊর্ধ্বে নেই।

জ্ঞান।। হ্যাঁ আছি।

মানব।। কী করে জানলে?

জ্ঞান।। আমি সব জানি। আমি সর্বজ্ঞ (কার্ড)।

মানব।। ওগুলো কী ছুঁড়ছো তখন থেকে?

জ্ঞান।। জ্ঞান।

মানব।। ফেলে দিচ্ছ কেন?

জ্ঞান।। ফেলে দিচ্ছি না। দান করছি। বিতরণ করছি।

মানব।। কাকে?

জ্ঞান।। পৃথিবীকে। আপাতত তোমাকে।

[মানব কয়েকটা কার্ড কুড়িয়ে নিল]

মানব।। 'রচনা ১৮ই আষাঢ় ১৩১৭'। 'আর এটা ব্যথা'। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দিনানি চ রাতানি চ'। 'এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন'—

জ্ঞান।। (কেড়ে নিয়ে) ওটা নয়।

মানব।। ওটা কী নয়?

জ্ঞান।। ও জ্ঞান তোমার জন্যে নয়।

মানব।। কেন?

জ্ঞান।। (একটা কার্ড কুড়িয়ে এনে দিয়ে) কেন? এই জন্যে।

মানব।। (পড়ে) 'দেবযানীকে আমদানি করলে কোরবানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা'। কেন?

জ্ঞান।। কেন কেন কেন। জ্ঞানের এতো স্পৃহা এর আগে দেখিনি তো? নিষিদ্ধ জ্ঞানের টানে প্রাণ করে আনচান (কার্ড)। ছুঁচো।

মানব।। কে ছুঁচো?

জ্ঞান।। তুমি। এতক্ষণ বলছি কী?

মানব।। আর তুমি কী?

জ্ঞান।। উর্বশী। বললাম না?

মানব।। আমি যদি বলি—তুমি ছুঁচো।

জ্ঞান।। তাহলে তোমার পাপ হবে। গুরুকে ছুঁচো বলা মহাপাপ। সেই পাপে তুমি ছুঁচোতর হলে।

মানব।। কে গুরু? তুমি আমার গুরু নও।

জ্ঞান।। আর একটা মিথ্যাভাষণ। আরো ছুঁচোতর।
মানব।। আমি ছুঁচো নই।
জ্ঞান।। এখন নও। এখন ছুঁচোতর, এবং দ্রুত ছুঁচোতমর দিকে এগোচ্ছো।
মানব।। তোমার কথার কোনো অর্থ নেই।
জ্ঞান।। অর্থের জন্যে কথা বলা হয় না।
মানব।। তবে কীসের জন্য বলা হয়?
জ্ঞান।। জ্ঞানের জন্যে।
মানব।। অর্থ ছাড়া জ্ঞান হয়?
জ্ঞান।। হয়। ধর্মজ্ঞান দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান সব নিরর্থ নিরাকার নিরবচ্ছিন্ন নির্বেদ (কার্ড)।
মানব।। কাণ্ডজ্ঞান?
জ্ঞান।। কাণ্ডজ্ঞান কারো নেই। তোমার তো নেই-ই। থাকলে দেওয়ালে লাথি মারো?
মানব।। দেওয়াল আমি লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।
জ্ঞান।। দেওয়াল ভাঙা যায় না। দেখেছো তো চেষ্টা করে।
মানব।। একলা না পারি, পাঁচজনকে ডাকব।
জ্ঞান।। কোথায় পাঁচজন? তুমি একা। একলা। (গেয়ে) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে থামাই ভালো রে (কার্ড)।
মানব।। তবে একাই ভাঙব।

[দেওয়ালে লাথির পর লাথি]

জ্ঞান।। বৎস, বৃথা শক্তিক্ষয় না করে জ্ঞানের কথাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পড়ো। মুক্তি পেলেও পেতে পারো।
মানব।। তোমার জ্ঞান আমি পুড়িয়ে ফেলব। (দেশলাই নিল)
জ্ঞান।। পারবে না। চেষ্টা করে দেখো।

[মানব একটা কার্ড কুড়িয়ে নিল]

পোড়ালেই তোমার মৃত্যু।

[মানব দেশলাই জ্বেলে কার্ডে ধরতেই জ্ঞান কেড়ে নিল কার্ডটা।]

কী করছো কী? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? এবার মরবে তুমি। নির্ঘাৎ মরবে। মরেছো?
মানব।। না মরিনি।
জ্ঞান।। মরবে। এক পা হাঁটলেই মরবে।
মানব।। এই তো হাঁটছি।

[জ্ঞান ল্যাং মারল, মানব পড়ে গেল]

জ্ঞান।। এই তো মরেছো। তবে? কী বলেছিলাম?
মানব।। না মরিনি। পড়ে গেছি।
জ্ঞান।। মূর্খ! পতন মানেই মৃত্যু, নাটকে পড়োনি? অবশ্য পতনও মূর্ছাও হয়, কিন্তু মূর্ছাও এক ধরনের মৃত্যু (কার্ড)।

[মানব উঠতে পারছে না, নিঃশব্দে কাঁদছে।]

(স্ত্রীকণ্ঠে) ওমা, কী হয়েছে? না না কিছু হয়নি। আমি বকে দেব, মেরে দেব! কিচ্ছু হয়নি। ওঠো তো বাবা।

[ধরে তুলল, মানব তার হাত ছাড়িয়ে নিল।]

মানব।। আমার গায়ে হাত দেবে না তুমি।

জ্ঞান।। (স্ত্রীকণ্ঠে) রাগ করেছে, আমার মানুসোনা রাগ করেছে, আমার কচুমনির রাগ হয়েছে। এই নাও—পাখি।

[পাখি দিল, মানব ছুঁড়ে ফেলল পাখিটা।]

পাখি।। শুওরের বাচ্চা!

মানব।। আমি এমনি এমনি পড়িনি। হোঁচট খেয়েছি।

জ্ঞান।। হোঁচট খেলে কেন? জ্ঞানের কথায় আগুন দিয়েছিলে বলে। যদি আমি কেড়ে না নিতাম, তবে নির্ঘাৎ মরতে তুমি।

মানব।। আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা।

জ্ঞান।। বিশ্বাস করো না? ঠিক আছে, পোড়াও। যত ইচ্ছে পোড়াও, আমি কিছু বলব না।

[মানব আবার দেশলাই জ্বালল, কিন্তু কী ভেবে থামল। ফেলে দিল কার্ডটা।]

জ্ঞান হচ্ছে আস্তে আস্তে। (নাচতে শুরু করল)

মানব।। শোনো!—থামো!—নাচ থামাও!

জ্ঞান।। (ছোট ছেলের মতো) তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। তোমার সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি। (রাগের ভঙ্গিতে বসল)

মানব।। শোনো, একটা কথা—(জ্ঞান ঘুরে বসল) শোনো না! (জ্ঞান আবার ঘুরে বসল) একটা কথা শোনো শুধু!

জ্ঞান।। দেখছো না আমি রাগ করেছি? এটা রাগের ভঙ্গি।

[মানব সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান তার দিকে ফিরল।]

আমাকে কিছু বলবে?—ঠিক আছে বলো।—কী হল?—বলবে না?

মানব।। আমি শুনছি।

জ্ঞান।। কী শুনছো?

মানব।। কে যেন কী বলছে।

জ্ঞান।। কী বল্—

মানব।। চুপ!

জ্ঞান।। (ফিসফিস করে) কী বলছে?

মানব।। আঃ!

জ্ঞান।। কেউ কিছু বলছে না। কারণ—কেউ নেই। শুধু আমি আছি। যা বলবার আমিই বলেছি, আমিই বলি, আমিই বলব (ঝড়)।

মানব।। (যেন অদৃশ্য কাউকে) হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

জ্ঞান।। (বাচ্চা ছেলের মতো) এই আমিও শুনব আমিও শুনব।—কই, কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো?

মানব।। আমি শুনতে পেয়েছি।

জ্ঞান।। কী শুনেছো?

মানব।। ও যা বলল।

জ্ঞান।। কী বলল?

মানব।। বলল—জ্ঞানের কথা বিশ্বাস কোরো না। বলল—জ্ঞান তোমাকে ঠকাচ্ছে।

জ্ঞান।। বিশ্বাসঘাতক! মীরজাফর! পঞ্চম বাহিনী! সি-আই-এ! কে-জি-বি (কার্ড)!

মানব।। শোনো, তুমি—

জ্ঞান।। (চিৎকার) না না, আর কিছু শোনবার নেই!

মানব।। (চিৎকার করে) তুমি শুনবে?

জ্ঞান।। কী বলছো?

মানব।। আমার কথা শুনতে বলছি।

জ্ঞান।। শুনেছি। বিশ্বাসহন্তা! (কার্ড)

মানব।। না শোনোনি। এখন শোনো। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

জ্ঞান।। টা টা বাই বাই, আর যেন দেখা না পাই।

মানব।। বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।

জ্ঞান।। চলে যাও চলে যাও, না যাও তো মাথা খাও!

মানব।। কিন্তু রাস্তা জানি না যে?

জ্ঞান।। রাস্তা নেই।

মানব।। আছে। তুমি মিথ্যে কথা বলছো।

জ্ঞান।। আমি মিথ্যে বলি না। আমি সত্যের পূজারী, সত্য আমার পূজারী (কার্ড)।

মানব।। রাস্তা আছে।

জ্ঞান।। তোমার গোলমালটা কোথায় জানো? আস্থা। রাস্তায় তোমার আস্থা। তুমি বিশ্বাস করো।

মানব।। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি—রাস্তা আছে।

জ্ঞান।। বিশ্বাস কোনো কাজের কথা ন. বিশ্বাসে কী মেলে? কৃষ্ণ। যত বিশ্বাস, তত কৃষ্ণ (কার্ড)। শেষে কৃষ্ণ-চাপা পড়ে মরবে তুমি।

মানব।। রাস্তা আছে।

জ্ঞান।। না, নেই।

মানব।। মিথ্যে কথা।

জ্ঞান।। আমি মিথ্যে বলি না। আমি জীবনে কখনো মিথ্যে বলিনি (কার্ড)।

[হঠাৎ ভয় পেয়ে কুড়িয়ে আনলে সদ্য-ছোঁড়া কার্ডটা]

মিথ্যে বলেছি তো কী হয়েছে? সত্যি কথায় সব কাজ হয়? ভুল ধারণা। সত্যি-মিথ্যেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল—শৃঙ্খলা। অমোঘ অটল অলঙ্ঘ্য

অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা (কার্ড)। আলডু বালডু মিথ্যে বলা পাপ, ঠিক যেমন আলডু বালডু সত্যি বলাও পাপ (কার্ড)। এর থেকে কী শিখলে?

মানব।। শিখলাম যে তুমি অতি জঘন্য।

জ্ঞান।। (কান না দিয়ে) সবচেয়ে ভালো হল সুশৃঙ্খল মিথ্যা, উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যা, লক্ষ্যপথে স্থিরমতি মিথ্যা (কার্ড)। এটা না বুঝলে তোমার কিছুই হবে না। ভুল বললাম, তোমার কিছুই হবে না—দাঁড়ি। তুমি না হবে ডাক্তার, না হবে মোক্তার, না মন্ত্রী না সান্ত্রী, না নাট্যকার না বাটপাড়, না অ্যাসেমব্লির এমেলে, না ফুটবলের 'পেলে', না সাধুসজ্জন না অমিতাভ বচ্চন (কার্ড)। এক এক সময়ে মনে হয়—দিই তোমায় রাস্তা দেখিয়ে।

মানব।। দাও, দেখিয়ে দাও।

জ্ঞান।। ছেড়ে দাও ও কথা। আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।—ক্ষমা চাও না?—কী ভাবছো?

মানব।। (আপন মনে) আমি জানি বেরোবার রাস্তা আছে। এ ঘরের বাইরে একটা জগৎ আছে।

জ্ঞান।। না, নেই। মিথ্যে বলে আবার পাপ বাড়াচ্ছো। এবং আলডু বালডু মিথ্যে।

মানব।। আমি জানি।

জ্ঞান।। জানো, অ্যাঁ? তুমি 'জানো'? বৎস, তুমি কিছুই জানো না। ঋগ্‌বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অষ্টক আছে, তুমি জানো? মঙ্গলগ্রহের পর্বত নিক্স অলিম্পিয়া আমাদের এভারেস্টের দ্বিগুণেরও বেশি উঁচু, তুমি জানো? ভারতের আয়তন বত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার চুয়ান্ন বর্গকিলোমিটার, তুমি জানো? রোম সম্রাট কালিগুলার রাজত্বকাল সাঁইত্রিশ থেকে একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ, তুমি জানো? অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য মানে জানো? সাইপ্রিপেডিয়াম কাকে বলে জানো? গুয়ানাপুয়াটো খায় না মাথায় দেয়, জানো?

মানব।। ওসব না জানতে পারি, এটা জানি।

জ্ঞান।। বটে? কী করে জানলে?

মানব।। আমি দেখেছি।

জ্ঞান।। আবার আলডু বালডু মিথ্যে? এ ঘরের বাইরে পা দাওনি তুমি।

মানব।। আমি দেখেছি—অনেকখানি মাঠ।

জ্ঞান।। বাজে কথা!

মানব।। অনেকখানি আকাশ।

জ্ঞান।। হতেই পারে না।

মানব।। অনেক, অনে—ক দূর।

জ্ঞান।। অসম্ভব।

মানব।। অনেক অনেক দূরে অনেকখানি আকাশ এসে অনেকখানি মাঠকে ছুঁয়ে আছে।

জ্ঞান।। আকাশ নেই মাঠ নেই দূর নেই অনেক নেই।

মানব।। তবে কী আছে?

জ্ঞান।। ছাত। আর দেওয়াল। আর মেঝে। সব আছে। একটুখানি মেঝে, তারপর একটুখানি

দেওয়াল, তারপর একটুখানি ছাত।

মানব।। রোদের ঝলক?

জ্ঞান।। নেই।

মানব।। চাঁদের আলো? হাওয়ার খেয়াল?

জ্ঞান।। নেই নেই নেই।

মানব।। কিন্তু আমি দেখেছি। চোখে না দেখে থাকি তো স্বপ্নে দেখেছি।

জ্ঞান।। স্বপ্ন? হ্যাঃ।

মানব।। দেখেছি—তুমি নেই।

জ্ঞান।। আমি বরাবর আছি। আমি শাশ্বত, চিরন্তন (কার্ড)।

মানব।। না নেই। ওখানে নেই। থাকলেও অন্যরকম। একটা অন্য কিছু, এ ঘরের বাইরে একটা অন্য কিছু।

জ্ঞান।। এ ঘরের বাইরে কিছু নেই।

মানব।। তুমি দেখবে? আচ্ছা, চুপ করে বোসো। চোখ বন্ধ করে মন শান্ত করে বোসো—

জ্ঞান।। ছেলেমানুষি খেলা খেলবার শখ নেই আমার। তাছাড়া ও খেলাটা আমি জানি। আমি চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে কল্পনা করতে থাকব—একটা বাগান, একটা আম-জাম-কাঁঠালের বাগান, একটা চাঁপা-গোলাপ-গন্ধরাজের বাগান, আর তুমি আমার মাথার ওপর এক মগ জল ঢেলে দেবে। ও খেলা আমি শৈশবে অনেক খেলেছি বৎস। বস্তুত খেলাটা আমার আবিষ্কার। কিন্তু বৎস, জেনে রেখো—আবিষ্কারটা আমি এই জন্যে করিনি যে আমি বুদ্ধু হয়ে বসব আর অন্যে আমার মাথায় জল ঢালবে। আবিষ্কারটা করেছি—অন্য বুদ্ধুদের মাথায় জল ঢালতে (কার্ড)। জ্ঞানাঞ্জনকে টুপি পরানো তোমার কর্ম নয়। তা ছাড়া টুপি আমার মাথায় এমনিতেই আছে। আমি নিজেই পরেছি, সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় (কার্ড)।

মানব।। আমি মোটেই জল ঢালতাম না।

জ্ঞান।। অমন সবাই বলে।

মানব।। আমি কথা দিচ্ছি জল ঢালব না।

জ্ঞান।। কথা দিচ্ছো?

মানব।। হ্যাঁ দিচ্ছি।

জ্ঞান।। পাকা কথা?

মানব।। পাকা কথা।

জ্ঞান।। তিন-সত্যি করো।

মানব।। জল ঢালব না ঢালব না ঢালব না।

জ্ঞান।। গডেস্ মাদার কালী প্রমিস্?

মানব।। প্রমিস্।

জ্ঞান।। আচ্ছা ঠিক আছে। (চোখ বন্ধ করে বসল) আম। জাম। কাঁঠাল-লিচু-আতা। যুঁই। গোলাপ। চাঁপা-বকুল-রজনীগন্ধা।

মানব।। না না, ওরকম কিছু ভাবতে হবে না। আম জাম গোলাপ কিচ্ছু দরকার নেই। কিছু ভেবো না, মনটাকে ফাঁকা করে দাও একেবারে। চারিদিক যেন শান্ত—

জ্ঞান।। অ্যাঁ? দাঁড়াও দাঁড়াও, বাগানটা তাহলে মুছতে হবে!

মানব।। বাগান ভুলে যাও।

জ্ঞান।। অত সোজা? তুমি মাথায় বাগান ঢুকিয়ে খালাস, ভুলতে তো হবে আমাকেই!

মানব।। আমি বাগানের কথা বলিইনি—

জ্ঞান।। আলবাৎ বলেছো। এইমাত্র বললে—বাগান ভুলে যাও। ভুলতে গেলেই তোমার ওই কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে—'বাগান' ভুলে যাও। দাঁড়াও মুছে দিচ্ছি। একটু সময় দাও।

[ঘুরছে, কুড়োচ্ছে, ছুঁড়ছে, কোপাচ্ছে, ভাঙছে, ওপড়াচ্ছে।]

এই একটা আম। এই আর একটা। তিনটে। কাঁঠাল—ইস্ কী ওজন! জাম। লিচু। এই যে যুঁই, বকুল। এই যে গোলাপ—উঃ! (আঙুল চুষল) চাঁপা—দাঁড়াও, উঠতে হবে, উপরের ডালগুলো—যা, সব যা! আমগাছের ডাল, কাঁঠালের ডাল, জামের, লিচুর, ও বাবা, বাতাবি লেবুটা তো দেখিনি? খেয়েছে! কত গাছ! ছাড়ব না, ছেড়ে দিলে চলবে না, সব কটাকে বিদায় করতে হবে। পঁচিশ, তিরিশ, পঁচাশি, দুশো! কতো বড়ো বাগান রে বাবা—বিঘের পর বিঘে! যাক্, সব যাক, সব বিদায় করব, সব, স—ব—

[মানব উত্তরোত্তর অধৈর্য হচ্ছিল, এবার আর থাকতে না পেরে মগের জলটা ছিটিয়ে দিল জ্ঞানের মাথায়। এক মুহূর্ত দুজনে নিথর। তারপর জ্ঞান বসল চূড়ান্ত অভিমানের ভঙ্গিতে।]

তোমাকে আর কখনো বিশ্বাস করব না আমি। কক্ষনো না, কোনোদিন না।

[মানব দূরে গিয়ে বসল অন্যদিকে ফিরে। জ্ঞান একটু পরে উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছল। আয়না দেখল, চুল আঁচড়াল। একটু ক্রিম-লিপস্টিক। তারপর গান গাইতে শুরু করল।]

মোর যা কিছু রয়েছে জীবনের সঞ্চয়/তুমি কেন তাহা নিয়া করিতেছো হেলাফেলা/মোর হৃদয় লইয়া কেন করো নয়ছয়/ওগো নিঠুর তুমি নির্মম তব খেলা। রচনা—জ্ঞানাঞ্জন। বয়স—ষোলো বছর তিন মাস (কার্ড)।

[মানব তাকিয়ে আছে]

(স্ত্রীকণ্ঠে, সিনেমা-নায়িকার ভঙ্গিতে) ওরকমভাবে তাকিও না আমার দিকে।

মানব।। কী রকমভাবে তাকিয়েছি?

জ্ঞান।। (পূর্ববৎ) চাতক যেমনভাবে তাকায় ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে। নেশাখোর যেমনভাবে তাকায় গাঁজাঠাসা কলকের দিকে। অর্থাৎ—প্রেমিকের মতো।

মানব।। তাই মনে হচ্ছে তোমার? ভোঁদাই! বুড়ো ভাম!

জ্ঞান।। (পূর্ববৎ) আচ্ছা ভাব। ভাব তো? এদিকে এসো। এসো-ও। এত করে ডাকছি, এসো না বাবা! বলছি তো—ভাব।

মানব।। চুপ করো!

জ্ঞান।। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) আমি চুপ করে থাকলে তুমি 'বোর' হয়ে মরে যাবে। আর কে আছে তোমার?

মানব।। আমার কাউকে দরকার নেই। আমাকে একা থাকতে দাও। (অন্যদিকে ফিরল)।

জ্ঞান।। তুমি একা, তবু আমি আছি। এ বিশ্বে তুমি একা, তবু আমি তোমার বিশ্ব (কার্ড)।

[জ্ঞান মুখোশ পরল, কণ্ঠস্বর বদলাল]

মানব।

মানব।। (চমকে ফিরে) কে? কে, কে তুমি?

জ্ঞান।। তোমার বন্ধু। তোমার হিতৈষী। তোমার ভালো চাই আমি। আমি চাই—তুমি সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, জীবনের পথে তোমার পায়ে কাঁটা না ফোটে—

মানব।। পথ? কোথায় পথ?

জ্ঞান।। এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

[মানবের হাত ধরে ঘরের মধ্যেই হাঁটছে, মানব সম্মোহিতের মতো হাঁটছে।]

এই যে পথ। এসো। এগিয়ে এসো। উঁহু, ওদিকে না, ওদিকে কাঁটা। হ্যাঁ এদিকে। ধীরে, ওদিকে বাধা।

[জ্ঞান মানবের পিঠে চড়ল, তাকে নিয়েই হাঁটছে সম্মোহিত মানব।]

চলো। এগিয়ে চলো।

মানব।। এ তো সেই একই পথ!

জ্ঞান।। এই পথই সব পথ মানব, আসল পথ। এর বাইরে পথ নেই। আমি কি বন্ধু হয়ে তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারি?

মানব।। তুমি—বন্ধু?

জ্ঞান।। হ্যাঁ মানব, আমি বন্ধু। চিরদিন ছিলাম, চিরদিন থাকব।

মানব।। তুমি আমায় পথ দেখাবে?

জ্ঞান।। এই তো দেখাচ্ছি। এই তো পথ, চিনতে পারছো না?

মানব।। হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—মনে হচ্ছে যেন—

জ্ঞান।। চলো, এই পথে চলো।

[হঠাৎ জ্ঞানকে ঝেড়ে ফেলে দিল মানব]

মানব।। না! এ পুরোনো পথ! একই পথ! তুমি কে?

জ্ঞান।। তোমার বন্ধু।

মানব।। না! (মুখোশ কেড়ে নিল) তুমি!

জ্ঞান।। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) আমিও তোমার বন্ধু।

মানব।। (দাঁতে দাঁত চেপে) তুমি আমার জন্মশত্রু। তোমাকে শেষ না করলে আমার মুক্তি নেই।

জ্ঞান।। কিন্তু আমি তোমার জীবন, তোমার বিশ্ব, তোমার সর্বস্ব। আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই, কিছু নেই (কার্ড)।

মানব।। তোমাকে শেষ না করলে বোঝা যাবে না আমার কে আছে, কী আছে!

[দুজনে ঘুরছে সতর্কভাবে]

জ্ঞান।। মানব, তুমি আমার সন্তান, তোমাকে জন্ম দিয়েছি আমি, বুকে করে মানুষ করেছি (কার্ড)। মানব, শেষ দিন পর্যন্ত, মৃত্যু পর্যন্ত, আমি তোমায় বুকে করে রাখব, আমার কোলে মাথা রেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার হাত ধরে তুমি একদিন অনাদি অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে যাবে (কার্ড)—

[মানব এক লাফে গিয়ে জ্ঞানকে ফেলে দিল মাটিতে, বুকে চড়ে গলা টিপে ধরল।]

মানব শোনো শোনো, হে সন্তান আমার শোনো—একটা গল্প তোমাকে বলি। একটা লোক ছিল, তার কেউ ছিল না, শুধু একটা ইঁদুর ছিল। ইঁদুরটাকে ভীষণ ভালোবাসত সে। ভীষণ ভীষণ ভালোবাসত। একদিন দেখল, শোনো মানব, একদিন দেখল—ইঁদুরটা নেই! কোথায় গেল, কোথায় যেতে পারে? বাইরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ তার ঘরে দরজা ছিল না, জানলা ছিল না, ঘুলঘুলি ছিল না, নর্দমা ছিল না। সব জায়গা খুঁজে দেখল সে—খাটের নীচে আলমারির পেছনে সিন্দুকের তলায় হাঁড়ি-কড়ার মধ্যে ছাইয়ের গাদায়—কোথাও নেই! তখন সে সব কিছু ভাঙতে লাগল একটা কুড়ুল দিয়ে—খাট টেবিল আলমারি চেয়ার উনুন বালতি—সব, সব কিছু! শেষকালে গেল ঘরের একমাত্র ছবিটাকে ভাঙতে, ছবিটা সেই এঁকেছিল, ওই ইঁদুরটারই ছবি, অনেক যত্নে আঁকা, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো। ভাঙতে গিয়ে কুড়ুল তুলে থেমে গেল হঠাৎ। ভাবল—না, এটা থাক, ইঁদুরের এইটাই শুধু বাকি আছে। তারপর থেকে সে শুধু ছবিটা দেখে আর কথা বলে আর কাঁদে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে। খায় না দায় না দাড়ি কামায় না, এমনি করে যখন সুখ দুঃখ বাঁচা মরা শেষ হয়ে গেল, তখন যেন নিজের প্রাণটাই শেষ করে দিতে ছবিটা ভাঙল কুড়ুলের এক ঘায়ে। তখন দেখল—ছবির ফ্রেমে আটকে আছে ইঁদুরটা। না খেতে পেয়ে মরে গেছে। হাঁ করে দেখছে, মৃত ইঁদুরটা ঘাড় ফিরিয়ে বলল—'তুমি যদি সেদিন ছবিটা ভাঙতে, তবে আমাকে মরতে হত না, শালা কাপুরুষ!' বলে গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়ে গেল।

[মানব ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে জ্ঞানকে।]

মানব।। এসব—রূপকথা!

জ্ঞান।। এ গল্পে একটা উপদেশ আছে মানব, বোঝবার চেষ্টা করো।

মানব।। কী উপদেশ?

জ্ঞান।। যা চাও, তা তোমাকে ছাড়তে হবে, নইলে কিছুতেই তা পাবে না। বুঝতে পারছো?

মানব।। আমি একটা কথাই বুঝতে পারছি। তুমি খারাপ! তুমি খুব খারাপ!

জ্ঞান।। খ-এ আকার র-এ আকার প। খারাপ মানে ব্যাড। ভালো মানে গুড় (কার্ড)।

মানব।। তোমার ভালো ব্যবহারের পেছনে একটাই জিনিস আছে।

জ্ঞান।। কী?

মানব।। নষ্টামি আর নোংরামি আর ইতরামি।

জ্ঞান।। তিনটে জিনিস হল মানব।

মানব।। ও তিনটেই এক।

জ্ঞান।। কী করবে মানব? এই আমাদের ভাগ্য।

মানব।। তোমার ভাগ্য হতে পারে, আমার নয়। আমি—আমি চাই। আমি ভালোবাসি।

[মানব কাঁদছে]

জ্ঞান।। না মানব, তুমি ভালোবাসো না। তুমি শুধু ছিচকাঁদুনের মতো কাঁদো। দেখছো? আমাকে বলতেই হল, কারণ সত্য না বলে আমার উপায় নেই।

মানব।। তুমি আমাকে এরকম করে দিয়েছো। তুমি খারাপ, আমাকেও খারাপ করে দিয়েছো।

জ্ঞান।। ভালো, খারাপ—এসব কথার কোনো মানে হয় না। জ্ঞান ভালো-খারাপের উর্ধ্বে। জ্ঞান নির্গুণ (কার্ড)। (মানব হামাগুড়ি দিচ্ছে) শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছে। অনেকের হয় (ক্যার্ড)।

মানব।। না। একটা আলো দেখতে পাচ্ছি আমি। একটুখানি আলো।

জ্ঞান।। সারা ঘরই আলোকিত মানব। অন্ধকার থেকে তোমায় আমি আলোয় এনেছি অনেকক্ষণ আগে।

মানব।। ও আলো নয়। তোমার ঘরের এই মরা আলো নয়।

জ্ঞান।। 'আমাদের' ঘর মানব, তোমার আর আমার ঘর।

মানব।। জ্যান্ত আলো। একটুখানি। সুড়ঙ্গের ওপারে—সামান্য একটু।

জ্ঞান।। কীসের সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?

মানব।। তোমার মধ্যে। তোমার মধ্যে সুড়ঙ্গটা আছে।

জ্ঞান।। কী বাজে বকছো?

মানব।। কিন্তু সুড়ঙ্গটা নীচে, দেখতে গেলে নিচু হতে হয়, হামা দিতে হয়। হামা দিতে দিতে যখন ঘাড়, পিঠ, কোমর ব্যথা করে, তখন উঠে দাঁড়াই। (উঠে দাঁড়াল)।

জ্ঞান।। সেই ভালো। না দাঁড়ালে মানুষ বলে মনে হয় না।

মানব।। কিন্তু এ দাঁড়ানো মানুষের দাঁড়ানো নয়। ক্লান্তিতে দাঁড়ানো। দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হলে আবার উপুড় হয়ে পড়ব। (পড়ল)

জ্ঞান।। এই ওঠো ওঠো! কী হচ্ছে কী ছেলেমানুষি?

মানব।। উঠলে ওই আলোটা আর দেখতে পাই না।

জ্ঞান।। তবে পড়ে থাকো। হামা দাও।

মানব।। জ্ঞান, তুমি আমার জন্মশত্রু, তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি।

জ্ঞান।। আমিও তোমাকে ভালোবাসি মানব।

মানব।। না। তুমি চাও আমাকে পিষে মারতে।

জ্ঞান।। তা যদি চাইতাম, তবে তুমি বেঁচে আছো কী করে? আমার ডাকনাম শক্তিধর, ভুলে গেছো?

মানব।। আমাকে তিলে তিলে পিষে মারতে। একেবারে পিষে মারলে তোমার অস্তিত্ব থাকে না, তাই আধমরা করে পিষে চলো।

জ্ঞান।। ছি মানব।

[মানব পড়ে পড়ে কাঁদছে]

(ধমকে) মানব।

মানব।। (লাফিয়ে উঠে) ইয়েস স্যার।

জ্ঞান।। অ্যাটেনশন্‌!

[মানব অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করল। জ্ঞানের প্রতি অভিবাদন।]

এই ভূমি তোমার আমার মাতৃভূমি পিতৃভূমি। এই ভূমি যদি বিপন্ন হয়, তবে তুমি আমি জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে যাব, প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করব প্রাণের চেয়ে মাতৃভূমি বড়ো (কার্ড)। ফায়ার! ঠা ঠা ঠা ঠা—

[দুজনে দুদিকে ছুটে গেল গুলি চালাতে চালাতে, তারপর একসঙ্গে যেন গুলি খেয়ে পড়ল।]

জ্ঞান-মানব।। ঠা ঠা ঠা ঠা—ওঃ!

জ্ঞান।। মানব? বেঁচে আছো?

মানব।। আছি।

জ্ঞান।। আমি বেঁচে আছি?

মানব।। আছো।

জ্ঞান।। কী করে জানলে?

মানব।। গুলি খেয়ে তুমি মরবে না। মরলে আমি মরতাম।

জ্ঞান।। তুমি তো মরোনি!

মানব।। না। তুমিও মরোনি। মরবে।

জ্ঞান।। কবে?

মানব।। কবে জানি না। একদিন।

জ্ঞান।। কীসে?

মানব।। আমার হাতে।

জ্ঞান।। (লাফিয়ে উঠে) তবে হয়ে যাক। হয়ে যাক এক হাত। আজই হয়ে যাক। কী নিয়ে লড়বে? পিস্তল? ছোরা? তলোয়ার?

মানব।। কোথায় তলোয়ার?

জ্ঞান।। মিছিমিছি তলোয়ার। কিন্তু সত্যি সত্যি লড়া। (কাল্পনিক তরবারি তুলে নিয়ে) এই দেখো, এইটা দামাস্কাসের ইস্পাত, লিকলিকে সিধে, দুধারে ধার, সাঁ করে ঢুকে যাবে পেটে। পিঠ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, রক্ত পড়বে দুটি ফোঁটা চুঁইয়ে নিটোল সূক্ষ্ম রন্ধ্রের দুধার দিয়ে—পেটে আর পিঠে। (আর একটা তলোয়ার) অথবা এইটা—ভারী, বাঁকা, একদিকে ধার, একখানা কোপ বাঁ ঘাড়ে, পৈতের মতো চিরে বেরিয়ে আসবে ডানদিকের পাঁজরা দিয়ে। কোনটা নেবে?

মানব।। (বিভ্রান্তি) আমি—

জ্ঞান।। এইটা? বহুৎ আচ্ছা। (দ্বিতীয়টা যেন ধরিয়ে দিল হাতে) তুমি ভারী, আমি হাল্কা। তুমি দেশি, আমি বিলিতি। তুমি মাথা দু-ফাঁক করো, আমি পেট ফুটো করি। এক, দুই, তিন। তামেচা! ইজেমচা! খোঁচা!

[জ্ঞান বিলিতি কায়দায় তরবারি চালাচ্ছে। আর দু-হাতে দেশি ভারী তলোয়ার তুলে আনাড়ির মতো কোপ মারছে।]

ইয়াঃ থা! তামেচা—ইজ্জেমচা! তামেচা—ইজ্জেমচা—খোঁচা!

[মানবের পেটে যেন আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছে তলোয়ার।]

খোঁচা! খোঁচা! আ ধ্যাত্তেরি—বলছি না, খোঁচা?

মানব।। খোঁচা কী?

জ্ঞান।। আঃ! মরে গেছো তুমি! দেখতে পাচ্ছো না—আমার তলোয়ার তোমার পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে? এই বের করে নিলাম। মুছে নিলাম রক্ত। পড়ো!

মানব।। কেন?

জ্ঞান।। মরে গেলে পড়বে না? পতন ও মৃত্যু, তোমার মৃত্যু হয়ে গেল, পতন হবে না?

মানব।। ওতো মিছিমিছি?

জ্ঞান।। ধ্যাৎ! এই জন্যে তোমার সঙ্গে খেলতে ভাল্লাগে না আমার। দাও, দিয়ে দাও তলোয়ার।

[কেড়ে নিল, রেখে দিয়ে অন্যদিকে গেল নিজের মনে বকতে বকতে।]

যত জ্ঞান দিচ্ছি, তত ঢেঁকি হচ্ছে। মগজের গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেল, তবু একটা গুবরে পোকাও সেঁধুতে পারল না ভেতরে—

[টেবিল থেকে ছোরা তুলে নিয়েছে মানব, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্ঞানের দিকে। জ্ঞানের চোখ পড়ল ওদিকে।]

ও কী? ও কী? এই, রেখে দাও, এই! ওটা সত্যি সত্যি ছোরা। রুখো শিগ্‌গির।

[মানব এগিয়ে আসছে ছোরা হাতে।]

এই মাইরি, এসব খেলা ভালো না! রাখো ওটা।

[একদিকে ছুটল, মানব ঘুরে আবার ধীরপদে এগোলো ওর দিকে।]

এই এই, আব্বা আব্বা! আমি খেলব না! এই আমার জ্বর হয়েছে, মাইরি! পেট খারাপ, কাল থেকে—রক্তামাশা—

[ছুটে পালাল, লুকোলো টেবিলের আড়ালে]

মানব।। তুমি কোথায়?

[টেবিলের আড়াল থেকে জ্ঞানের হাত উঠল সাদা রুমাল নাড়াতে নাড়াতে]

জ্ঞান।। (কাতর কণ্ঠে) এইখানে।

মানব।। বেরিয়ে এসো।

জ্ঞান।। আগে ওটা রাখো।

মানব।। বেরিয়ে এসো।

[জ্ঞান উঠে দাঁড়াল দুহাতে শূন্যে তুলে]

তোমাকে হত্যা করলে আমি কী হব?

জ্ঞান।। (ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে) খুনে হবে খুনে! বদমাইস ডাকাত খুনে! ফাঁসি হবে তোমার!

মানব।। কে ফাঁসি দেবে? কে বিচার করবে? তুমি-আমি ছাড়া কে আছে আর?

স্ত্তান।। তুমি বিচার করবে, তুমি! নিজের বিচার নিজেই করবে। করতে হবে!

মানব।। আচ্ছা—অপরাধচেতনা? এই তাহলে তোমার হাতিয়ার?

স্ত্তান।। হ্যাঁ হ্যাঁ—অপরাধ! তাছাড়া তোমার তখন কেউ থাকবে না! তুমি একা হয়ে যাবে একদম! একা থেকেছো কোনোদিন? একা থাকলে কী ভীষণ—কী ভীষণ—একা লাগে, তোমার কোনো ধারণা আছে? (কার্ড)

[কার্ডটা ছুঁড়ে মারল মানবের দিকে। মানব ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে ছোরা রেখে দিল। স্ত্তান এগিয়ে এল।]

ছুঁচো! (এক চড়) শয়তান! (চড়) পাজি! (চড়) শুওরের বাচ্চা? (চড়)

পাখি।। শুওরের বাচ্চা।

স্ত্তান।। (পাখিকে) চোপ!

পাখি।। রাধাকৃষ্ণ!

[মানব মার খেয়ে পড়ে আছে]

স্ত্তান।। কাপুরুষ! (এক লাথি)

মানব।। কাপুরুষ? ও, তোমাকে মারিনি বলে তুমি নিরাশ হয়েছো?

স্ত্তান।। হব না? ভাবলাম—আমাদের একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য এল। সব সময়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, এক চোখ খুলে ঘুমোতে হবে—কখন কোথা দিয়ে আসবে তোমার ছুরি, তা না (লাথি)—মরা ইঁদুর!

মানব।। (উঠছে) তুমি তাহলে—আসলে—আমার হাতে—মরতে চাও?

স্ত্তান।। আমি কী চাই না চাই তাতে তোমার কী হে ছোকরা? আমাকে মারা তোমার কম্মো নয়। তুমিই মরবে আমার হাতে। চলে এসো!

[কাল্পনিক তরবারি নিয়ে এল আবার]

তামেচা! ইজেমচা! ইয়াহু!

[প্রতিটি আক্রমণে মানব কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে]

মানব।। (নিজের মনে) যতবার পিছোচ্ছি, ততবার একটু করে মরছি। মৃত্যু। এক টুকরো মৃত্যু। দু-টুকরো মৃত্যু। তিন টুকরো।

স্ত্তান।। আঃহা! ইয়া! তামেচা—ইজেমচা—

[অন্ধের মতো এগিয়ে আসছে মানব দু-হাত বাড়িয়ে]

অ্যাই অ্যাই! খবরদার! তামেচা! এই! ইজেমচা!

[চোখ বন্ধ করে স্ত্তানের কব্জিটা চেপে ধরেছে মানব বজ্রমুষ্টিতে।]

অ্যাই অ্যাই—(যন্ত্রণায়) আঃ!

[হাত থেকে যেন খসে গেল তরবারি, মানব কুড়িয়ে নিয়ে দু-হাতে বাগিয়ে ধরল আনাড়ির মতো।]

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই আমার দেশি তলোয়ার। এসো, এক কোপে তোমার মুণ্ডুটা—অঃ!

[মানবের তলোয়ারের খোঁচা যেন লেগেছে হাতে, স্ত্তানের তলোয়ার খসে

পড়েছে, জ্ঞানও বসে পড়েছে।]

মানব।। ওঠো। (জ্ঞান উঠল) হাত তোলো। (জ্ঞান হাত তুলল) চোখ বন্ধ করো।

[জ্ঞান চোখ বন্ধ করল। মানব তলোয়ারটা যেন ঢুকিয়ে দিল তার বুকে, জ্ঞান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।]

জ্ঞান।। এ তুমি কী করলে মানব?

[মানব বসে ধরে রইল জ্ঞানকে।]

বলো—তুমি অনুতপ্ত। বলো—তাহলে বেঁচে উঠব আমি।

মানব।। জানি।

জ্ঞান।। বলো। বলো—তুমি অনুতপ্ত।

মানব।। বললে তুমি আমাকে অভিশাপ দেবে।

জ্ঞান।। বলো মানব, বলো। আমি মরে যাচ্ছি।

মানব।। (শান্ত স্বরে) মরে যাও জ্ঞানাঞ্জন। মরে যাও শক্তিধর, বাবু, নবাব, রাজা, চণ্ড। আমি বুঝেছি এখন।

জ্ঞান।। মানব—ওঃ। ওফ্। মৃত্যু।

[মরে গেল। মানব উঠল। দেখল—আর দেওয়াল নেই, সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। ফিরে এল।]

মানব।। আমি বুঝেছি।

পাখি।। কী বুঝেছো?

মানব।। (পাখি কুড়িয়ে) যা চাই, তা ছাড়তে হবে, নইলে কিছুই পাবো না। (পাখি ছুঁড়ে ফেলল)

পাখি।। (রেগে) শুওর। রাধার বাচ্চা। কৃষ্ণ।

[জ্ঞান উঠে দাঁড়াল, দুহাতে ডানা মেলে, যেন দেবদূত।]

জ্ঞান।। আমি চললাম। পরলোকে। তুমিও এসো।

মানব।। কেন?

জ্ঞান।। বাঃ, আর এক হাত লড়তে হবে না? এখানেই শেষ নাকি (কার্ড)?

[জ্ঞান চলে যাচ্ছে, মানব কার্ড কুড়োচ্ছে]

থাক ওসব। আমার অনেক আছে। বেশি দেরি কোরো না, একা একা বোর হয়ে যাব।

মানব।। (চেঁচিয়ে) পরলোকে কী আছে?

জ্ঞান।। (চেঁচিয়ে) একটা ঘর। খুব জমকালো।

মানব।। (চেঁচিয়ে) এমনি ঘর?

জ্ঞান।। (যেন অনেকদূর থেকে) না, সে আরো বড়ো, আরো জমজমাট, আরো—(চলে গেল)

মানব।। শেষ—হয়নি তাহলে? আবার এক হাত? আর এক হাত?

[হঠাৎ হাসতে শুরু করল। প্রচণ্ড হাসি। হাতের কার্ডগুলো ছড়িয়ে ফেলল। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল—আর এক দিক দিয়ে।]

শব্দের সজীব শেকড়

হীরেন ভট্টাচার্য

ভর দুপুরে নির্জনতা পা-চাপা দেওয়া উঠোনে
নোটন জ্বালানি পায়রাটা বকবকম করছে একা একা—

আমার কবিতার শব্দ কবেই শেষ হলো।

আজ আবার রক্তের অন্ধকারে
আমার হারানো শব্দ-শস্য একরাশ খোলা বাতাস খুঁজে
নিশপিশ করছে
হেসে খেলে থাকা রাতের আকাশের তারাগুলির মতো

শব্দের ওপারে শব্দের অতীত শস্যঘন শব্দের উচ্চারণ...

তা কি হয়? হতে পারে?

রাম বসু

অনিবার্য বজ্রাঘাতে পুড়ে ছাই পাখিদের গ্রাম
ঝলসানো ডানা, আধ-পোড়া সোজা বাঁকা ঠোঁট, দগ্ধ চোখ
কুয়াশায়, চাঁদের শিশিরে, ভাঙাচোরা নীলকান্তমণি
ছড়ানো ছিটানো এখানে ওখানে
নিঃশব্দ নির্জন সাদা থান পরে মৃতবৎসা স্থির, এককোণে—

এইসব দেখে বড় নিঃস্ব, বড় একা লাগে।

কি আর করবো আমি? কি বা কর্তে পারি?

পা ফেলি নিজস্ব আঁধারে যেন আলোকিত হতে পারি।

পা ফেলি মুহূর্তের সুঁচোল চূড়ায় যেন বিদ্ধ হতে পারি
জীবন মৃত্যুর চিরকালীন শোভন গৌরবে।

পরিশ্রমী জ্যোতির সফেন উল্লাস পাথর আঁকড়ে ধরে
মেলে দিতে পারে আপনাকে তুঙ্গ কালে
অনাবৃত করতে পারে সত্তার সমগ্র
অ-রব মেঘের গায়ে, জীবনে মরণে।

এক বিচিত্র সিম্ফনি।

আবার কি বাজ পড়া পাখিদের গ্রাম হতে পারে নবম সিম্ফনি
আধপোড়া বাজ মাঠ হতে পারে নক্ষত্রের শান্ত বিস্ফোরণ
তা কি হয়? হতে পারে?

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে
ঢুকে পড়ি স্বভাবের নির্জন আঁধারে
অন্তত এটুকু যেন আলোকিত থাকে।

তা কি হয়? হতে পারে?

হারতে শেখো

কৃষ্ণ ধর

কান পাতলেই শুনি সাবাশ্ সাবাশ!
তুমি কেবলই জিতে যাচ্ছো
না-শীত না গ্রীষ্ম কিছুই তোমাকে দমাতে পারে না
তুমি চলে যাচ্ছো একেবারে চূড়োয়
হাততালির শব্দে ফেটে পড়ছে চারপাশ

জিততে কার না ভাল লাগে
সবাই জিততেই তো চায়
তোমার অহংকার সে কথা সব সময়
আমাদের জানিয়ে দেয়

দেখছি সব কটা ঝাড়লণ্ঠন একসঙ্গে জ্বলে উঠল
তোমাকে কুর্নিশ জানাতে
তুমি যে সব কিছুতেই জিতে যাচ্ছো
আর সবাইকে পেছনে ফেলে

ভেবে দেখো তো কী কী তোমার জেতা হয়নি
কী তুমি পাওনি হাতের মুঠোয়
জয়ের ফিতে ছুঁতে ছুঁতে একটু থমকানো ভালো
জয়ের পরও কিছু কথা শোনার থাকে
যারা জিততে পারেনি তাদের কথা

ভালবাসাই শুধু হারতে জানে
ওতেই ওর জিতে যাওয়া

একবার হারতে শেখো

সুভাষদা, শতাব্দী যাত্রায়

সিদ্ধেশ্বর সেন

"তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে"—(উদ্ধৃতি)

সেই উন্মেষের কাল,
ছিল সদ্য-প্রগতিতে,
কেউ আছেন, কেউ নেইও—
'পদাতিক'-পথিকৃৎ কবি
করেছেনও প্রস্থান,
—আর, 'মেঘবৃষ্টি ঝড়ে'র কবিও
চলে যান অশনি-সংকেতে—

'পদাতিক'-কবির প্রায়-শতাব্দীযাত্রায়, আমিও
বহুকালেরই সঙ্গী—

বলেন 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা', যিনি
অশীতিপর হ'য়ে ভর করেন লাঠি,
তবু, চলিতই ছিল তাঁর চলা
—'যত দূরেই যাই', গিয়েও জ্ঞানপীঠ,
তিনি থামেননি, চলে গেলেন

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'—
'মে-দিনের কবিতা'য় ফেরান বাংলা কবিতার
ভাব-গতি-ছন্দ,
'পদাতিক' কবি হন পথিকৃৎ—
শুরু থেকেই—'সকলের গানে'র
মন-কাড়া-সাধা,
'কমরেড আজ নবযুগ আনবে না'—
'অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে' প্রতীক্ষায়
তাঁকে দেখি, জেলে যান,
লক্ষ্যভেদী,
'অগ্নিকোণে'রই সুভাষদা।

ফুল আর ফুল্‌কি—
প্রিয় ফুল তাঁরই
'লাল-টুকটুকে দিন' আনতে
'মিছিলের মুখ' দেখে—
'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'
—প্রবাদের মতো তাঁর কথ্যভঙ্গী

'ছাড়ের মধ্যে বাঁধন
বাঁধনের মধ্যে ছাড়'
—তাঁর নিজের কথার ফেরে
ফেরেন আমাদের কবি ও কথাকার

আর একদিন, ধর্মতলার মোড়ে লেনিন বলেছেন,
তাঁর কাছে শোনা তাই
"শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে
একটু পা চালিয়ে ভাই"

এমনই সুভাষদা—
সারা দেশে
জানে এখন, একুশ শতকেই
তাঁর শেষের পা-রাখা।

মনে আছে, উত্তাল চল্লিশ,
সেদিন, ৪৬নং ধর্মতলার
কবি-শিল্পী-চিত্রী-সমাবেশে, নট-সংকল্পে,
ফ্যাসিস্ত-বিরোধে, সদ্য-প্রগতিতে
—আমিও শরিক তার
অতি-তারুণ্যেই,
সৃষ্টিময় সমগ্রের অনুধ্যানে—
'প্রগতি'র যুগ, সেই তপ্ত
লেখায়-রেখায় দীক্ষিতের গানে,
গানেরই নাট্যে প্রাণবন্ত

সুভাষদা'র সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে, তখনি
অর্ধশতকও আগে, সে-কবেই
ডেকার্স লেনে পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা'য়—
দ্বিতীয় কেউ নয়, অদ্বিতীয়ই, কবি ও বন্ধু সুকান্ত।

ফের, সামনেই দেখি সুভাষদা—
—চলেছেন আজীবন-আমৃত্যুর চির-'পদাতিক'
এদেশে-ওদেশে সাহিত্যের বিশ্বে, প্রগতির—
মৃত্যুঞ্জয়ী, মানুষের চিরসঙ্গী কবি।

ঝিঁঝির ডাক

তরুণ সান্যাল

এক জীবনেই কি পায়ে কাঁটা বেঁধার হঠাৎ কামড়
ছোট নদী থেকে বড় নদীতে পড়ার আনন্দ ছলাৎ
সব গল্প
হানাবাড়ির গা ছম-ছম মিহি ধুলায় অজানা পায়ের ছাপ

বলা যায় যায় না

মাথার মধ্যে ক-ডজন ঝিঁঝি পোকা
জলে ডুব দিয়েছো উঠছো না শুনছো
 জলের সেই ঝিম-ঝিম
এমনি এক অসীম সময়ে ডুব দিয়ে আছে বয়সবেলা
 শব্দ আর বাক্যির ঘাড়ে পা দিয়ে বসেছে
 এ ডানায় ডানা ঘষা পোকা

কবে যেন শোনা দারুকেশ্বরের গা ঘেঁষে গুমগুম
 ঘেস আর ছোবড়া ছড়ানো তেলকল তুষ ইলিবিলি চালকলের পাশে
 দশটা-বিশটা টার্বাইন ঘুরন্ত পাওয়ার হাউস
 মাটি কাঁপছে
এসব বুঝি মহীনের ঘোড়া জ্যোৎস্নায় ঘাস খায়
 প্রাগৈতিহাসিক মাঠে পৃথিবীর ডায়নামোর উপরে
দুহাতে দুকান চেপে ধরলেও শুনি অবিরাম ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ

ছিল সেটাও তেরোশো পঞ্চাশ
মাটির মালসা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালা
ফ্যাসফেসে গলায় ভাত চায় না ফ্যান চায় গেরস্থবাড়ির দরজায়
 মুখে নাকে হাওয়ার চলাচল যেন সেই ঝিঁঝিই
আমার মা ভাত দেন ঐ মালসা হাতে মা আর তার ছেলেকে
এক দলা দু লোকমা ভাত তারা ঘণ্টা বইয়ে খায়
তখনও কেন যেন ঝিঁঝি নাড়াচাড়া করে হাঁটুতে ঘাড়ে
 গা গতরেও কি ঝিঁঝি
মা শুয়ে পড়ে বারান্দায় আর ওঠে না
ছেলেটি একাই হেঁটে চলে যায় পা নেংচে নেংচে
লণ্ঠনের সেঁক দেয় আমার কমিউনিস্ট দাদা আর ছোড়দি সেই মাকে
 কেন বাঁচনু মুই
খকা কোথায় গেলি অ খকা খকা
  মা চলে যায় বড় রাস্তায় ঝিঁঝির ডাকে
'ধর ধর ধর' যাই দেখতে
 মা কাদা হয়ে গেছে মিলিটারি কনভয়ের চাকায়
হিস্-স হিস-স্ না থামা চাকাগুলিও ঝিঁঝি

বছরখানেক আগেই বুঝি
ইস্কুলডাঙার পিছনের ডাঙাল মাঠের খোয়াই-এর ওপারে
শুনি হাওয়ায় উঠছে পড়ছে ঝিঁঝির ডাকই
তারপর গা খোলা কোমরে নেংটিপ্রায় ধুতি
ঘাম জব-জব এক ঝাঁক দেহাতি
হাঁকার দিচ্ছে ভারত ছাড়ো...বন্দেমাতরং...মহাত্মা গান্ধী কি জয়
ওদিকে দূর পশ্চিমে ধুলোয় ধুলোয় পেকে ওঠা বিষাক্ত ঘা
হয়ে লালচে আকাশ
সূর্যও অস্তে গেছেন
শহরে হেঁটে যাই সেই মিছিলে
আর তখনই ঝিঁঝির ডাকে চোখ হয়ে আসে অন্ধ
কানের পাশ দিয়ে গরম কি-যেন শিস বাজিয়ে যায়
কে যেন দশ বছর বয়সের আমাকে—
চোখে জল দেন
চোখ খুলেই দেখি এক জগজ্জননী
ঘাম তেলে টলটল করে তাঁর মুখ দিঘল চোখ
তৃতীয় নয়নে লাল টকটকে সূর্য
যতবার বন্দেমাতরং এখনো শুনি
ঝকমক করে ওঠে সেই মুখ

কে পড়ছে সেই মন্ত্র...মন্ত্র কি নষ্ট হয় অপাত্রর উচ্চারণে

কেন মনে হয় আমার সেই মাকেই খুঁজছি সারাটি জীবন
ঠিক যেমন এক দোল পূর্ণিমার আগের সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায়
হরাসাগর নদীর ট্যাক থেকে খুঁজে আনা এক বালক আমাকে
বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে দাদা
মার কোলে বসে খাচ্ছি দুধভাত
তারপরেই তো ভেড়ার ঘর পোড়ানো চাঁচর দেখতে যাওয়া
কাঠকয়লার মধ্য থেকে চোখ ঠারছে ছোট্ট লাল ক্ষত
নদীর পাড়ে আলো অন্ধকারে হোঁচটের সেই রক্তারক্তি
দূরে সাঁজাল দেওয়া গেরস্তবাড়ির টেমির আলো দেখছি
যাচ্ছি না যাচ্ছি না যতই হাঁটি
এক পাও এগোচ্ছি না হস্রেক হওয়া স্বপ্নে

শুনছি কেউ বলছো হাতিদের কথা অত বলো কেন

বলিই তো
সেই ছ-সাত বছরের বালক আমি
দামোদরের বান আসি আসি করেও
ছোটনাগপুরের পাহাড়ের জটার জঙ্গলে বন্দী তখনও
বাবার সঙ্গে গেছি চাঁইপাট-মেদিনীপুর বর্ধমান থেকে হাতিতে
রাজ কাছারিবাড়িতে স্নান-খাওয়ার জোগাড় হচ্ছে
হঠাৎ শাঁখ বাজছে কাঁসার থালা বাজছে
গোরুর হাম্বা কুকুরের ঘেউ ঘেউ হুলুস্থুল
'হড় পা হড় পা বান'
কোথায় কার হাঁড়িকুড়ি থালা বাসন
মেয়েপুরুষ গোরুছাগল কুকুর
খোকার হাতে পাখির খাঁচা
খুকির হাতে মাটির আহ্লাদি পুতুল
সবাই ছুটছি ঘাটালের দিকে
পায়ের গোড়ালিতে তবু ছোবল দিতেই থাকে জল

পেছনে পেছনে সেই হাতিও
যে একটু পিছিয়ে পড়ে তাকেই দেয় শুঁড়ে তুলে এগিয়ে
হঠাৎ বাবার হাত ছাড়ানো আমাকে তুলে নেয় মাথায়
কত মানুষ বসেছে তার পিঠে
হাওদার দড়ি ধরে ঝুলছে কতজন
আমরা পৌঁছে যাই উঁচু ডাঙায়
হাতি ফিরে চললো মসমস জল কাদা ভেঙে
বার বার এ চালা ও চালা থেকে তুলে আনছে মানুষ আর মানুষ
একাই এক স্বেচ্ছাসেবক মাহুতহীন হাতি

এই সেদিন চন্দ্রকোণা গেলাম পাঁশকুড়া হয়ে
দেখি একই সেই জলটুঙ্গি বাড়িঘর
তালগাছের গায়ে গত বছরের বন্যার দাগ

এখনও তাহলে ঘাড় নিচু বাঁকা শিঙ সেই বুনো বাইসন বন্যা
তাড়া করে আসে
শুধু নেই সেই হাতিটি

টাটা সুমোর চাকার ঘসটানিতে শুনছিলাম ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ

ঠিক যেন বন্যার শোঁ শোঁ শব্দ

মানুষের অনেক দূরের গলার স্বর যেমন হাটবারে
যেমন খিদে মরে গিয়ে পেটে ভোচকানির ঝিঁঝি
ওও শুনেছি উনিশশো পঞ্চাশে জেলখানায়

ডাক্তার বলেন কানে এবার অন্তর করো যন্ত্র লাগবে

তা হলেই তো জন্ম নেবে নিভৃতির শব্দ আর শব্দ
স্মৃতির ফাঁকা বাটিগুলো ভরে যাবে রঙে রসে
ডাক্তার এমন যন্ত্র কোথায় পাবো
যে যন্ত্র ঢের মানুষ পশুপাখি গাছপালার নদী নহরের
মুখ ভুলিয়ে দেবে
মনটাও গড়ে দেবে
ঠিক তাদের মতো
যারা দুঃখীর ঝান্ডা তুলে আমাকে ঘর ছাড়িয়েছিল
আজ চোখ লাল করে তাকায়

কেন-যে দেখতে পাই রাজরাজেশ্বরী এক মা-কে
শুনি কালো কালো মানুষের আকাশ বাতাস ফেড়ে ফেলা গর্জন
আর শিসগরম বুলেটের ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ

জলের গভীরে ডুব দিয়ে শুনছি সেই ঝিম ঝিম ঝিঁঝি
কানের যন্ত্র আর নেওয়াই গেল না।

আর্কিমিদিসের কাটামুণ্ডু

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঘাতক সিরাকিউজ
যখন মাথার পেছনে খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে,
বালির ওপর জ্যামিতির আঁকি-বুকি কষতে কষতে
মগ্ন আর্কিমিদিস শুধু বলেছিলেন—
সাবধান, আমার বৃত্ত যেন নষ্ট না হয়।

এক হাজার দিনারের বিনিময়ে
একটি কাটামুণ্ডু যে হাতবদল করেছিল,
সেই ঘাতকটি অবশ্য জানতেও পারেনি
সেটি ছিল এমন এক প্রেমিক আর বিজ্ঞানীর মাথা
যাঁর নাম—আর্কিমিদিস।

কয়েক হাজার বছর পেরিয়েও
সেই কাটামুণ্ডু থেকে ছিটকে আসা রক্তে
ভেসে যাচ্ছে আমাদের কাম্বিজ, মেধা, ভালোবাসা,
আর আমরা
মার খেতে খেতে পিছু হটতে হটতে
শেষ পর্যন্ত
হত্যাকারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
যে যার গলায় গর্জন করে উঠছি—
সাবধান, আমাদের বৃত্ত যেন নষ্ট না হয়।

স্ট্যাচু অব লিবার্টি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

Liberty যেখানে Statue সে দেশের নাম আমেরিকা
—এ কথা আমার নয়, সুবিখ্যাত কবি নিকানোর পার্‌রা-র

আজ রবিবার, তারিখ ১৭-০৮-০৩, এই সব রবিবার
অন্তত চারটি কাগজ পড়ি, বাংলা-দুই ইংরেজীও দুই—পড়ার এই অহমিকা
কোনো সুসংবাদের আশায় নয়, পৃথিবী এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে—সত্যি বলছি এই
প্রস্থানবয়সে আমার আর কোনো হেলদোল নেই।
কিন্তু আজ সকালে যখন পড়লাম আমেরিকায়
তিরিশ ঘণ্টা আলো ছিল না, তখন বোঝা যায়
আমেরিকাও কতখানি প্রভাবিত কলকাতার বিদ্যুতপ্রথায়।
এক ইংরেজী কাগজ শিরোনামে লিখেছে যা তা
লিখেছে "Power cut in U.S., offices shut in Kolkata"
নিচে আরো বেশি মস্করায় লিখলো

"When America sneezes, India
Catches Cold" পড়ে আমি উচ্চরবে হাসি হা হা,
আমাকে দেখ্‌-ভাল করে যে মেয়েটি
(সে চা দিতে আসছিল) হাসি শুনে তার হাতের কাপটি
ছিটকে পড়লো নিচে। বললো "বাবা
এত জোরে হাসতিছ কেন? শরীল খারাপ হয় নি তো?
শরীলের আর দুষ কি, বাইর হলেই তুমি যা তা খাবা!"
—এই স্নেহপালিকাকে আমি কি করে বোঝাবো মন খারাপ তো
শরীর খারাপ নয়। ও মেয়ে কি করে জানবে আমি
আমেরিকার দুর্দশায় হাসছি।
যে-দেশ অন্যের দেশে কার্যকারণহীন যুদ্ধ পাঠায়
তার নিষ্প্রদীপে আজ ভূমধ্যসংসারও হাসছে।
কংসবণিক যে দেশ সাহিত্য সংস্কৃতিতে আর
এগুতে পারছে না, তাকে হাসির উপেক্ষা ছাড়া কিই বা দেবার আছে।
মাঝে মাঝেই আলো না থাকার কারণে
আজকাল কলকাতায় আমাদের বড় সর্দি লাগছে
তা লাগুক, এ-রকম সর্দি তো স্বাধীনতার পর থেকেই অনবরত লাগছে
তবে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা যখন বুকে বসে যায়, মন্দির মসজিদ
এসে আমাদের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলে।
রাবণও তখন এসে শ্রীরামের জন্য ভিত্
খুঁড়তে চায়, ঠা ঠা রৌদ্রেও আমি দেখি এক "অদ্ভুত আঁধার"।
সেই জীবনানন্দবিষণ্ণ অন্ধকার আর কতটুকু হাহাকার জানাতে পারবে—এখন তো
আকাশ, বাতাস, শব্দ সব মোম হয়ে গলে যাচ্ছে দ্রুত,
তিরিশঘণ্টার নিরালোকছবি
আমার এই না-কবিতাকে কোন প্রতীকসংকেত দিচ্ছে
—হে পাঠক পাঠিকা আসুন একসঙ্গে ভাবি,
ঘড়িরও তো বয়স হয়েছে।

গরুর বিষয়ে

দিব্যেন্দু পালিত

তিনি মাইকের দিকে এগোতেই
শুরু হয়ে গেল ফিসফাস,

যেন আমন্ত্রিত নন
যেন এমন কেউ
যার জন্য বরাদ্দ হয়নি সময়।

তিনি বললেন,
'অগ্রগতি নিয়ে আগের বক্তারা
যা যা বলেছেন
তা যেমন সত্য তেমনি মিথ্যাও—
পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে বদলের দিকে,
আবার থেমেও আছে।'

মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল সভায়।

সে সবে কান না দিয়ে
তিনি বললেন,
'আমি নিজের চোখে দেখেছি
জেটবিমান নামবে বলে
আরও লম্বা আর চওড়া করা হচ্ছে রানওয়ে
আর সেজন্য পিচ আর পাথরকুচি
নিয়ে আসছে কি না গরুর গাড়ি।

'সুতরাং বুঝতেই পারছেন,
জেটবিমান যেমন নামছে
তেমনি চলছে গরুরগাড়িও।
সুতরাং—'

তিনি থামলেন একটু, হাসলেন।
ঠিক,
এটাই তো হাততালি পড়ার সময়।

কিন্তু হাততালি দিল না কেউই।
বরং বাড়তে লাগল ফিসফাস আর
এ ওকে দেখানো আঙুলে
তিন, পাঁচ, আটের ইশারা।

শুধু একজন বেয়াড়া শ্রোতা
পিছন থেকে বলে উঠল,
'গরুর গাড়ি নিয়ে এইসব কথা
আপনি আগেও বলেছেন অনেকবার—
এবার বরং গরুর বিষয়ে কিছু বলুন।'

উনচতুর্দশপদী স্বীকারোক্তি

শিবশম্ভু পাল

ক্যাপসুল, ছাতা ও তুমি—প্রায়ই ভুলে যাই—চিরসখা হে
ছেড়ো না আমায় তোমরা, দিকপতি,—'ক্যাম্পাস ক্যাম্পাস'
নির্ঘোষে কাকের সঙ্ঘ ছাদের কার্নিসে, পাবে সেখানেই লাল
ডাকবাক্স, বাসস্টপ, বিনিময়যোগ্য মোটা কাঁকরের হাওয়া—
সর্বভূতে নমস্কার—ধূলিপত্রে কৃতজ্ঞতাপঙ্ক্তি পড়ে দ্যাখো—
ফুল্লরার বারোমাস্যায় স্ট্যাপলারে আটকে দিই তারই প্রতিলিপি
তবুও বাসের সিটে ছাতা ভুলে ফেলে আসি সংগঠনের
ঘুম পেলে, অনুচিত, আমিও ঘুমের মধ্যে নিশিভাব শুনে
দিনদুপুর-রাতদুপুর দরজা খুলে একরোখা সান্ধ্য আইনের
সন্দিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে হাঁটি—উঁচুনিচু প্রত্নময় ছায়ানগরের
তোবড়ানো বিলবোর্ডে পা ফেলতে টলে যাই, ধরেছি আগুন—
সেবাসমিতির লোক ধরে ধরে নিয়ে আসে স্মরণসভায়
যদিও আমার গায়ে পোড়াবকুলের গন্ধ মৃদু লেগে থাকে—

গান্ধী এবং গাছটি

মূল কবিতা—**কে. সচ্চিদানন্দ**
অনুবাদ : **নবনীতা দেবসেন**

গান্ধী হাঁটছিলেন প্রখর রোদের মধ্যে
যে রোদ নোয়াখালির উচ্ছিষ্ট।

—"এসো, একটু বিশ্রাম করে যাও"!
গান্ধী ফিরে তাকালেন :

একটি ছায়াঘর গাছ।
—"তুমি? এখনও আমার বিশ্রামের
সময় হয়নি।" গান্ধী বললেন।

গাছ নালিশ করল : "সারা পৃথিবী
কী ভীষণ তাড়াহুড়োয়। আমি বুড়ো হয়েছি,
আর তো ফুল ফল ধরে না আমার,
এমনকি পাখিরাও ছেড়ে গেছে আমাকে।"

"মন খারাপ কোরো না" গান্ধী বললেন,
"তুমি অপেক্ষা করছো কুঠারের জন্য
আর আমি, বুলেটের জন্য।"

"ওকথা বোলো না", যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে গাছ,
"কারুর নিশ্চয়ই ছায়ার দরকার হবে।"
বসন্তের স্মৃতি একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ে
আছড়ে পড়ল গাছটি থেকে।

"প্রার্থনা করো" গান্ধী বললেন।

তুমি যদি না থামো, আমাকেই
তবে হাঁটতে হবে তোমার সঙ্গে;—
গাছটি এবার হাঁটা শুরু করল গান্ধীর সঙ্গে,
এক ঝলক বাতাস বইল। একটা পাখি
উড়ে এসে বসল গাছটায়।
—"দেখেছো, আমি আবার মঞ্জরিত হয়েছি"
গাছটি গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা ফুল নিয়ে হেসে উঠল।

"তুমি চলতে শুরু করেছো? তাহলে
আমি এবার থামতে পারি"—গান্ধীর রক্ত
ফিসফিস করে বলল, ফোয়ারায় ছল্‌কে উঠে
প্রত্যেকটি প্রাণীর হয়ে প্রার্থনার মতো।

"দ্যাখো, দ্যাখো, আমার ফুলেরা লাল হয়ে উঠছে"—
সেই প্রবুদ্ধ বৃক্ষ বলে ওঠে।

তিনটি পাখি,
যারা ফলের স্বপ্ন দেখেছিলো,
পুবদিক থেকে উড়ে এলো।

ধ্বংস থেকে সৃষ্টিতে

শ্যামসুন্দর দে

আমি ভয় করি না তোমাকে
তোমার ভয়ের মুখোশকে।
তুমি ভয় দেখাতে এসেছ
হাতে তলোয়ার নিয়ে
যাকে আমিই তৈরি করেছি
গনগনে আগুন-উত্তাপে
ইস্পাতের ফলা পুড়িয়ে পুড়িয়ে।

তুমি কেড়ে নিয়েছিলে
অনেক প্রলোভন দেখিয়ে
পৃথিবীকে রমণীয় করার ব্রতে।
তোমার চোখে নাকি আকাশের নীলিমা
মরাইয়ের সুবাস দেহে
ধরণী ভরাবে সবুজে সবুজে
পাখির গানের সুরে সুরে।
অথচ এখন তোমার দুচোখে
লোভের আর হত্যার ছায়া
দস্যুর লুণ্ঠন মোহ
পৃথিবী জয়ের নির্বোধ বাসনা।
বারে বারে ভয় দেখাও তোমার অসি দিয়ে
যে অসি তৈরি ইস্পাতে
গনগনে আগুনের তাপে
হাপরের বাতাসে বাতাসে
শ্রমের ফসলে।

আমরা তো পারি
মাঠ ময়দান কারখানা কলে
অযুত অযুত হাতে
শক্তির তরঙ্গ তুলে
কেড়ে নিতে তোমার আয়ুধ
আর তাকে আগুন উত্তাপে
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে
সৃষ্টি করে দেব
লাঙলের ফলা।

বাস্

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সব কজনের জন্যে জায়গা রাখতে পারবো না
দুপাশের দুটি সিট্ ছাড়া
একদিকে অতীত আর অন্যদিকে
ভবিষ্যত দিচ্ছে পাহারা

মাঝখানে যেই থাক সময়টা ক'রে কুক্ষিগত
চাকার আওয়াজে তার কথা শোনা সত্যিই দুরূহ
যাত্রীরা ঘুমন্ত সবাই? জেগে আছে দুরন্ত অভিমান
এতটা বদল হ'ল কেন, ধ্বংস হল সব মহীরুহ?

জানলা জুড়ে অন্ধ রাত
ফেলে এলাম দিন
ফেলে এসেছি শহরগ্রাম
স্মৃতি সতত ক্ষীণ

দুপাশে দুই সিটে আমার
স্মরণ বিস্মরণ
মাঝখানে এই বর্তমানের
ধূর্ত বিজ্ঞাপন।

কোথায় ছুটেছে বাস কতদূরে যাবে
কাদের নামালো টেনে গণহত্যার উল্লাস

আমার দুপাশে বসে ভবিষ্যত ছাড়াই
ত্রাণ শিবিরের দুটি কিশোরের লাশ।

যে দেশে বাস থেমেছিল
কনকচাঁপা ভোরে
সে দেশ আমার ছিল কিনা
বল্ তো সত্যি ক'রে

এক যাত্রায় পৃথক ফল
তোমার এবং আমার
গণকবরে বারোয়ারি চিতায়
শব তামার

সকলে জন্যে জায়গা রাখা এখন অসম্ভব
আমাকেই পরের মোড়ে নামতে হতে পারে
জানলা ফুঁড়ে যতক্ষণ না আসে আলোর স্তব
তারাদলকে দুপাশে ডাকছি অনতিঅন্ধকারে

ভার

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পিপাসা দেখবো না বলে,
স্খলন দেখবো না বলে
হরণ দেখবো না বলে
বেঁধে রাখি চোখ।

দেখবো না বৃদ্ধের গায়ে যুবকের মস্ত ঢলে পড়া,
উপোসি মায়ের পাশে শিশুটির ভাঙা দুটি হাত,
পুত্রটি জুয়ায় হেরে শেষ রাতে কেরোসিন ঢালে,
দেখবো না অরাজক রাজন্যশঠতা।

মধ্যদিনে খরতাপে বীজাণুধ্বংসের আয়োজনে
ঝটিকার ঝনৎকারে যারা আসে, অপূর্ণ গাহনে রক্ত
মিশিয়ে মিশিয়ে বারবার
কয়েক আলোকবর্ষ দূরে চলে যায়—

তাদের ঠিকানা যারা জেনে রাখে—গূঢ়গতি তাদের খবর
রাষ্ট্রের খাতায় আঁকা, কারণ তারা যে চক্ষুষ্মান,
মন্ত্রীকে মন্ত্রণা দেয়, ঋষি নয়, গণধ্বংসী কালসর্পযোগ।

বস্ত্রখণ্ড শুষে নেয় দৃষ্টিজল, মরুস্থলী আমার দুচোখ,
আমারই বুকের হাড় খুলে নিয়ে ধর্মপুত্র উপহাসে উপহাসে
স্তম্ভিত হ্রদের জল ভাঙে—
আত্মজের চূর্ণ উরু—বিকলনগর এসে এই ভাঙা বুকের উপরে
চেপে বসে,
নীচে খলখল রাত্রি, যমুনায় অহোরাত্র বাষ্পচলাচল,
সেই সর্বনাশা রাত্রে সপ্তর্ষির আলো হাতে নিয়ে
আর্তনাদ ছিঁড়ে আমি জেগে উঠি—
এত যে আলোকদীপ্তি ছিন্নভিন্ন আমার ভিতরে
মহাকাশ গড়ে তোলে, তবে কেন আজও মূঢ় আমি
শুধু অর্ধাঙ্গিনী এই পরিচয় নিয়ে
এ মহাশ্মশানে,—দৃষ্টিহীন দৃষ্টিপাতে
পড়ে আছি একা...?

স্বার্থপর হওয়াও দরকার

রত্নেশ্বর হাজরা

একটু স্বার্থপর হও। প্রতিবাদী হও—
স্বার্থে একটুখানি ভাসো একটু ডুবে যাও
অন্তত বুদবুদ হও—কিছুদিন
নিস্পৃহতা ভেসে যেতে দাও।

নিস্পৃহ হলেই ওরা কেড়ে নেবে—লুঠ করে নেবে
দিন নেবে রাত্রি নেবে—শিশিরের জলটুকু নেবে
আনন্দ নোংরায় ফেলে পা দিয়ে মাড়াবে।
ওরা কারা?
একথা বোঝার জন্য মনে হয়
ইশারা-ই যথেষ্ট ইশারা।

নিজেকেও একটু দ্যাখো। একটু প্রতিশোধ নিতে চাও

কৌপীন উড়িয়ে দিয়ে বলো, হুস্—যা—
সামান্য সংসারী। না কক্ষনো সন্ন্যাসী নও। না—
নিস্পৃহ হলেই কিন্তু পা দিয়ে মাড়াবে
গলা টিপে বন্ধ করবে স্বর—
ওরা কারা?
একথা বোঝার জন্য মনে হয়
ইশারা-ই যথেষ্ট উত্তর—

আছে, সব আছে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আছে, সব আছে, থাকবেও; তবে কিছু বদলায়—
যে নদী-সাঁতরে পার হতে ভয় পেয়েছো সেদিনো
সে এখন মড়াখাত, নেই সেই
জোয়ার ভাটার অবিরল টান।

যে শাসক ছিলো মানুষের ত্রাস, তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান
ঘটবে অচিরে—কেউ কি ভেবেছি?
ভেবেছি—বিশাল লোহার মূর্তি
আছড়ে পড়বে মাটিতে? থাকে না
চিরকাল কিছু?

হাতে পায়ে বাঁধা লোহার শেকল, মাথা ক'রে নিচু
'মহান' রাজার বন্দনাগান গাইতে গাইতে
চলেছে শহীদ মিনারের দিকে
ওই কারা? ওরা অন্ধ তো নয়।
আজ ক্রীতদাস।

মরা মিছিলেও জীবিতের পড়ে শ্বাস-প্রশ্বাস,
ওঠে নামে হাত, ভাঙে হতাশায়, প্রতিবাদে ফোঁসে;
জনপদ খায় মরুভূমি, খায় আগ্রাসী জল,
তবু চরা জাগে, ঘর বাঁধে, ফলে সুবর্ণধান;
কিছু থেমে নেই।

কাল ছিলো যারা তারাও রয়েছে পৃথিবীর এই
ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও প্রেম চিরবহমান
প্রাণের প্রগাঢ় উৎসবে;
পিতা-প্রতিমহের
প্রাণ-বীজ তুমি ধরেছো নাভিতে;
রেখে যাবে ফের
জাতকের কাছে। থাকবে তুমিও; কিছু থেকে যায়।

শুধু সময়ের হাতে প্রতিমার মুখ বদলায়
রূপ বদলায়।

পাগল

গণেশ বসু

জলছবি হয়ে গেল জলযান।

মৃগীরোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে, চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে জোর গোঁত্তা মারল সমুদ্রের শেষের শিথানে। উল্টে গেল একদিকে। হতে পারে এটাই কোনো দেশ, কোনো জাতি, কোনো স্বপ্ন। আরেক টেমপেস্ট।

আমিও ছিলাম যাত্রী। কীভাবে ছিলাম, কেন, সেটা মনে নেই। হয়তো ঝড়ের টানে ডেকের ওপর, হাজার হাজার মরিয়া মোষের দৌড়ঝাঁপ, মোচার খোলার মত, ভাঙাচোরা তক্তার মত দুলতে দুলতে ভাসতে ভাসতে...নাহ্...আর নয়...

হিরের পাহাড় হয়ে জ্বলল সূর্য। সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে বাইচ, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের রুপোলি লেজ, জলপাইরঙা ঘাস, টানা টানা চোখ, অর্থহীন শব্দের ঝংকার।

কেউ কেউ আগেই পালায় নৌকো করে, কারো কারো চিৎকারে উড়ছিল অদ্ভুত ভাষা, ধ্বনিগুলোয় দুর্বোধ সংকেত। তারা জানতেও পারেনি জাহাজডুবির কথা, ঝড়ের খবর, ধ্বংসের ছবি।

নাট-বল্টুতে আটকে রইলাম আমি। ঝাপ্টা সইতে সইতে, ছিন্নভিন্ন ছিন্নভিন্ন

ছিন্নভিন্ন হতে হতে বালির রেণু, ভিড়লাম সমুদ্রের তীরে, বালির ভেতর বালি হয়েই সূর্যের ডানা, চলকে উঠল হাসি।

এভাবেই কাটল কয়েকটা বছর, পোশাক বদল, কৌশল বদল, রাস্তা বদল।

জাহাজটা তুলতে তৈরি হল কয়েকটা পাগল, ঝাঁপ দিল জলে, ডুবতে ডুবতে ডুবতে ডুবতে তারা পৌঁছয়, পৌঁছোয় যথাস্থানে।

পাগল ছাড়া কেই বা তুলবে জাহাজ? কেউ কি ছুঁতে পারে স্বপ্ন?

ও হে কবি

নবারুণ ভট্টাচার্য

বাতাসে টাকা উড়ছে
তুমি ভাবলে প্রজাপতি
এবং নামিয়ে দিলে
একটি হালকা, রঙীন কবিতা

আকাশ চিরছে যুদ্ধবিমান
তুমি ঠাওরালে পাখির ঝাঁক
এবং সেই লিখে ফেললেই
একাধিক ডানাওলা কবিতার পাল

এই ভাবেই
তুমি বুলেটকে ভেবেছো লিপস্টিক
বোমার ধোঁয়াকে দেখেছো মেঘের ব্যবসা
তাই শিশুদের ছেঁড়া হাত
বুকফুটো মানুষ, থ্যাৎলানো হাসপাতাল
নজরেই পড়েনি তোমার

তোমাকে বোকা বললে
পুরোটা বলা হলো না
ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটরাও

চিৎকার করে বলছে—
তোমার কবিতা তারা নিতে চায় না

সেই ছবিটির জন্য

মানস মণ্ডল

ঢেউ ওঠে, ঢেউ নামে, মাঝে মধ্যে ভাঙে
সে তেমন কিছু নয়
কেবল জোয়ার এলে ভয়
কেঁপে ওঠে ঘর-দোর
এমনকি ঘরের ভিতর
কতদিন ধরে রাখা
অপেক্ষাটি
ভেসে গেলে
তুমি আসবে তো?

না, সেভাবে নয়। কোন চিঠি সে লেখেনি
কোনদিন স্বভাবে আসেনি
যদি আসে
তাই নিখুঁত সাজিয়ে রাখা
গেরস্থালি

একে একে এসে গেল আর সকলেই।
ঘর থেকে বারান্দায়, উঠোন ছাড়িয়ে
মাঠ, ঘাট, তেপান্তর ফেলে
ফিরে যাচ্ছি...
সেই ছবিটির জন্য
আলতামিরার গুহা পার হয়ে
অপেক্ষায়
ফিরে যাচ্ছি
যাচ্ছি তো যাচ্ছিই যেন পরবর্তী
মুহূর্তটি
কোনদিন লেখাই হয় না।

ভিন্ন ইতিহাস, ভিন্ন অভিজ্ঞতা

দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের আঙিনায় আমেরিকায় ইদানীং আফ্রো-আমেরিকান লেখিকাদের দাপট অস্বীকার করার উপায় নেই। টনি মরিসন (Toni Morrison), অ্যালিস ওয়াকার (Alice Walker) কিংবা মায়া এঞ্জেল্যু (Maya Angelou)-দের মতো বেশি পরিচিতরা তো আছেনই, তাছাড়াও কত অজস্র নতুন নাম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টোলেই রোজ চোখে পড়ে যায়। "বিশুদ্ধ সাহিত্য" ছাড়াও "ফেমিনিস্ট থিয়োরী" কিংবা বিশ্লেষণী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও "ব্ল্যাক" মেয়েদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ বারেবারে মুগ্ধ করছে। অন্যান্য প্রাক-ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে এ এক পরম পাওনা। আফ্রো-আমেরিকান মেয়েদের রচনার এই ধারা কিন্তু কোনও সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। পুরুষের লেখা "slave narratives"-এর পাশাপাশি মেয়েদের রচনার এই ধারা বরাবরই বইছিল—মেজাজে, গঠনে যা নেহাতই ভিন্ন।

"Can the black poet singing a song to the morning? ...I feel the morning star in my throat..." "Then its background thrusts itself between his lips and the stars and he mutters, ..."Ought I not be singing of our sorrow? ...The one subject for a Negro is the Race and its suffernings and so the song of the morning must be choked back...I will write of lynching instead..." "...To [us] no Negro exists as an individual—he exits only as another tragic unit of Race..."

এই অংশটি Zora Neale Hurston'-এর (১৮৯১-১৯৬০) রচনা "Art & Such"-এর ছোট টুকরো। "নিগ্রো" হিসেবে "কালেকটিভ আইডেনটিটি"র (collective identity) ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে এক কবির ব্যক্তিসত্ত্বার স্বীকৃতির জন্য ছটফটানি ছত্র কটিতে চাপা থাকে না। আজ এসব মামুলি শুনতে হলেও একটা সময় ছিল যখন এমন স্বাভাবিক সহজ দাবিকেও সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হত। "জোরা" (Zora) বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্লোরিডার (Florida) গ্রামাঞ্চলে জীবন কাটিয়ে গেছেন সামান্য 'manicurist'-এর মতো ছোটখাট কাজ করে। আর তারই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন তাঁর নিজের সাহিত্যচর্চা আর প্রাচীন আফ্রিকান উপকথা সংগ্রহের কাজ। 'জোরা'র উপন্যাস "Their Eyes were Wathcing God" আজ আমেরিকান সাহিত্যে একটি 'landmark' হিসেবে স্বীকৃত। এখনকার বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মনে করেন এই 'জোরা' আর তাঁর পূর্বসূরি (এরও বেশ কিছুকাল আগে থেকে 'নিগ্রো' মেয়েদের রচনা প্রকাশিত হয়ে আসছে) ব্ল্যাক মেয়েরাই এ সমাজের প্রায় সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক মানসিকতাযুক্ত মনের অধিকারী। আর তাই এঁদের উত্তরসূরি অ্যালিস ওয়াকাররাও নিজেদের "জোরা"র "কন্যা" হিসেবেই দাবি করেন। নিজেদের সময়ে "জোরা"দের অবশ্য এই স্বীকৃতি মেলেনি। সেই মুহূর্তের ইতিহাসের দাবির চাপে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের (anti-racist+anti-slavery) কাছে 'জোরা'দের স্বীকৃতি তো মেলেই

না বরং সমালোচিত হতে হয় নিজেদের "race"-কে "betray" কিংবা তুচ্ছ করার দায়ে। অথচ, মজার ব্যাপার হল, ইউরোপীয় "রেনেসাঁ"'র শরিক না হতে পারা নিয়ে পুরুষ লেখকদের রচনাতে অনেক সময় আক্ষেপ নজরে পড়ে। "জোরা"'দের কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও আক্ষেপ ছিল না। আজও নেই।

অনেকের মতে তীব্র পুরুষ বিদ্বেষই ব্ল্যাক মেয়েদের রচনার "পপুলারিটি"'র কারণ। অথচ একটু যাচাই করলেই বোঝা যায় এঁদের লেখনীর জোরের উৎস কোথায়। গভীর বাস্তববোধের সঙ্গে কাব্যিক গাথার এক আশ্চর্য মিশেল আফ্রো-আমেরিকান লেখিকাদের কলমের বৈশিষ্ট্য। আর আকর্ষণও সেখানেই। এঁদের এই বিশেষ "স্টাইল"-এর একটা চেহারা "ম্যাজিকাল রিয়ালিজম্" (magical realism) নামে. বহুল পরিচিত। ব্ল্যাক ফেমিনিস্ট সাহিত্যের বাছবিচার বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়, তেমন স্পর্ধাও রাখিনে। তবে ছোটখাট কিছু প্রশ্ন পাঠক হিসেবে মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়। আফ্রো-আমেরিকান মেয়েদের সাহিত্যের এই ঔৎকর্ষ কি নেহাতই সীমিত ঘটনা, নাকি এ কোনও বৃহত্তর সামাজিক চেতনার ইঙ্গিত?— যদি তাই-ই হয় তবে সেই চৈতন্যে উত্তরণ কোন্ জাদুদণ্ডের প্রভাবে? আমাদের দেশে দরিদ্র শোষিত মানুষও তো সামাজিক শোষণ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কম লড়াই করেনি। তেভাগা-তেলেঙ্গানা আন্দোলনে চাষি মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ইতিহাস তো আজ আর তেমন অজানা নয়। সমাজ-সংস্কৃতি জীবনের মূল স্রোত থেকে তার পরেও এই মানুষেরা বাদ পড়ে গেল কী করে? বিভিন্ন স্তরের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই-এর ফল হিসেবে যে চৈতন্য শুধু "ব্ল্যাক" মেয়েদেরই নয়, গোটা আমেরিকান সমাজকেই খানিকটা আপ্লুত করল, আমাদের ক্ষেত্রে তার এতটা ঘাটতি থেকে গেল কেন? ভারতীয় বলেই বোধহয় মনের মধ্যে এ নিয়ে একটু আপশোশ থেকেই যায়। আর তারই জন্য মনে মনে একটা হিসেব-নিকেশ চলতে থাকে। দুটো সমাজের ইতিহাস পাশাপাশি ফেলে খানিক যাচাই করে নিতে ইচ্ছে হয়। জানতে ইচ্ছে করে সামাজিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কোন হেরফেরে দু-সমাজে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এমন ভিন্ন ছাপ রেখে গেল।

একেবারে গোড়ায় আমেরিকার মাটিতে পুরুষের মতোই আফ্রিকান মেয়েদেরও ধরে আনা হয়েছিল স্রেফ কায়িক পরিশ্রমের জন্যই। 'ফেমিনিস্ট'দের একাংশের তাই দাবি, "The black woman as worker is the single thread in black femininity" (Noble j. 46)। এই আপাত ছোট ঘটনার ফল দাঁড়াল সুদূর-প্রসারী। এর ফলে শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকার ঐতিহ্যগত ধারাটি একেবারে গোড়াতেই ভেঙে গেল। ঐতিহাসিকদের একাংশ তাই দাবি করেন "দাসত্বের অভিজ্ঞতা" আফ্রো-আমেরিকান নারী-পুরুষের সম্পর্কে এক ধরনের সমতা এনে দিয়েছিল, "slavery" যেন একটা "equalijer" হিসেবে কাজ করেছিল। দাস ব্যবসায়ীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে "দাস-শ্রম"'র (Slave-labor) ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দিতে পারলে আখেরে তাদেরই লাভ। আবার অন্যদিকে নিজেদের মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরোনো প্রথাকে শুধু বহাল রাখাই নয়, আরও জোরদার করায় তারা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। অর্থাৎ, বাইরের জগতে পুরুষ, আর মেয়েদের স্থান গৃহস্থালিতে সীমিত রাখার চিরকালীন বন্দোবস্তই বজায় রইল। ঘটনাচক্রে "ব্ল্যাক"

মেয়েদের বিচরণের ভূমি ঘরের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে চলে এল। একাধারে তারা গৃহকর্ত্রী, আবার অর্থ জোগাড়ের ভারও তাদেরই ওপর। "নিগ্রো" পুরুষকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সরে আসতে হল বাইরের জগতের কর্মযজ্ঞ থেকে। এ ঘটনার একটা মস্ত সর্বনেশে দিকও দেখা দিল। "আফ্রো-আমেরিকান" পুরুষদের হীনমন্যতা থেকে আরেক ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিল। নারী-পুরুষের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার অভাব তৈরি হল। এ ক্ষতের জের আজও এই সমাজকে সামাল দিতে হচ্ছে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় বহু বিতর্কিত "ময়নিহান রিপোর্ট" "(Moynihan Report)। গবেষণালব্ধ এই রিপোর্টে 'ব্ল্যাক' সমাজের অবক্ষয়ের উৎস হিসেবে খাড়া করা হল এক অদ্ভুত যুক্তি। সে সময়ের "লিবারেল সেনেটর" ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান (Daniel Patrick Moynihan) তাঁর সমসাময়িক "ব্ল্যাক" পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে পরিচালিত এবং রচিত গবেষণাপত্রে ঘোষণা করে বসলেন, "A fundamental fact of Negro-American family life is the often reversal of roles of husband and wife...All of this made Black men very dispirited" [Paula Giddings 325]

বলাই বাহুল্য, এমন ব্যাখায় "নিগ্রো" মেয়েরা শিউরে উঠেছিল। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল এমন গভীর সমস্যার অতি সরলীকরণে তাঁরা বিস্মিত। তাদের মতে অবক্ষয়ের মূল কারণ বৃহত্তর সমাজের জাতিবিদ্বেষ। দাস-প্রথা যখন 'ব্ল্যাক' পরিবারগুলোকে ভেঙে ছারখার করে দেয় সে সময় এই মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হয় পরিবারগুলোকে টিকিয়ে রাখতে। বাপেরা হাল ছেড়ে দিলেও সন্তান পালনের দায় থেকে হাজার চাপেও সরে যেতে পারেনি মায়েরা। আসলে নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকার অদল-বদল সেদিন আফ্রো-আমেরিকান সমাজকে সম্পূর্ণ ভাঙনের হাত থেকে রক্ষাই করেছিল।

একটু গোড়ার কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধল ১৮৩২ সাল নাগাদ, বিখ্যাত "ন্যাট টারনার রিভোল্ট"-এর (Nat Turner Revolt) গায়ে গায়ে। ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত সাদা মহিলা সংগঠনগুলি মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মেয়েরা "ব্ল্যাক" সমস্যার সঙ্গে নিজেদের সামাজিক অবস্থা তুলনীয় বলে দাবি করে বসলেন। বলাই বাহুল্য, "কালো" নারী-পুরুষের কাছে এমন তুলনা ভয়াবহ বলে মনে হয়েছিল। এঞ্জেলা ডেভিসদের তাই মনে করিয়ে দিতে হয় আফ্রো-আমেরিকান গোষ্ঠীর কাছে 'দাসত্ব' প্রকৃত অর্থেই লোহার চেন আর চাবুক। যাই হোক্, গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলন আর নারী-আন্দোলন পরস্পরকে পাশাপাশি নিয়েই চলেছিল। গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান-আমেরিকানদের ভোটের অধিকারের প্রশ্নটা আর চেপে রাখা গেল না। মধ্যবিত্ত মহিলা-সংগঠনগুলি এতদিন আশা করেছিল "ইউনিয়ন"-এর হয়ে গৃহযুদ্ধের সময়ে সক্রিয় ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি হিসেবে এবার মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকারটুকু মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু রক্ষণশীল নেতারা সময়টা "Negro Hours" বলে ঘোষণা করলেন, অর্থাৎ 'নিগ্রো' পুরুষের ভোটাধিকারের প্রশ্নটাই তাদের কাছে তখন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই "free labor"। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকারদান "ব্ল্যাক" পুরুষের "লয়ালটি" নিশ্চিত করবে। এ হেন চাপের মুখে

দাঁড়িয়ে মহিলা নেতৃত্বের চিরকালীন শ্রেণিচরিত্রটি এবার বেরিয়ে পড়ল। জাতিবিদ্বেষ দাসপ্রথা বিরোধী লড়াই-এর এতদিনকার শরিক এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন (Elizabeth Cady Stanton) তাঁদের "আশংকা" খোলাখুলি প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না। তাঁদের মতে অশিক্ষিত "কালো" পুরুষকে রাজনৈতিক ক্ষমতা সঁপলে তার চেহারা "ভয়ানক" দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মেয়েদের ভোটের অধিকারের প্রশ্ন অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। Stanton'-দের এই ঘোষণা আমেরিকার মূলস্রোত নারী আন্দোলনের পক্ষে এক মর্মান্তিক হার সন্দেহ নেই। সম্ভবত নিজেদের শ্রেণিচরিত্রের গণ্ডিটুকু পেরোতে না পারায় সেদিনের নেতৃত্ব নিজেদের সমস্যার সঙ্গে আফ্রো-আমেরিকান সমস্যার জৈবিক যোগসূত্রটাকে ধরতে পারলেন না। 'ব্ল্যাক' পুরুষ আর মধ্যবিত্ত মেয়েদের টনক নড়িয়ে দিতে এগিয়ে এলেন সোজোর্নার ট্রুথ (Sojourner Truth), এক নিরক্ষর, সদ্যশৃঙ্খলমুক্ত নারী "মেয়েমানুষ"। ওয়াইহোর (Ohio) "অ্যাক্রন (Akron)-এর এক সমাবেশে ট্রুথের বক্তৃতা এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করল। "ফ্রেডরিক ডগলাস"-এর মতো বিখ্যাত নেতা এবং অন্যান্য মহিলা নেত্রীদের দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে, গম্‌গমে "আফ্রো" স্বরে সমবেত শ্রোতাদের বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"And ain't I a Woman? Look at me! Look at my arm! ...I have ploughed, and planted, and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a Woman? I could work as much and eat as much as a man—when I could get it—and bear de last as well! And ain't I Woman? I have born thirteen children, and seen them most all sold off to slavery, and when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me! "And ain't I a Woman!'—ট্রুথের বক্তৃতার এই 'refrain'-টি আজও 'ব্ল্যাক' ফেমিনিস্টরা বারবার ব্যবহার করেন। যাইহোক্ সেদিনের সেই সমাবেশে ধ্বনিত হয়েছিল এক সম্পূর্ণ নতুন চেতনার—ধনতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, ঔপনিবেশিক শাসন—এই তিন স্তরের শোষণেরই শিকার যে মানুষ তার গলায়। মধ্যবিত্ত মেয়েদের সঙ্গে এই শ্রমজীবী মেয়েদের অভিজ্ঞতায় যে একটা মস্ত ফারাক আছে সে বিষয়েও সোজোর্নার ট্রুথের ধারণা তখনই যথেষ্ট স্পষ্ট। নারীর সামাজিক অবমূল্যায়নের ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণত দাবি করা হয়—"উৎপাদনশীল শ্রম" থেকে তাদের বিচ্যুতি। দাসত্বের বিশেষ অভিজ্ঞতা "ব্ল্যাক" মেয়েদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাকে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না পায়ে শেকল পরা থাকলে "উৎপাদনশীল" শ্রমেও মুক্তি নেই। উৎপাদনশীল শ্রম মুক্তির উপায় তখনই যখন তা বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত।

১৮৬৭-৬৯ সাল নাগাদ "ফিফটিনথ্ অ্যামেন্ডমেন্ট" (Fifteenth Amendmant) পাস হয়ে গেল অর্থাৎ ভোটের অধিকার পেল কেবল "নিগ্রো" পুরুষ। আফ্রো-আমেরিকান মেয়েরা এ বিষয়টিতে একমত হতে পারল না। সোজোর্নার ট্রুথের মতো কিছু মানুষ কেবলমাত্র "নিগ্রো" পুরুষের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। আরেক দল এই ঘটনাকে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে মেনে নেওয়াতেই এক ধরনের 'রাজনৈতিক লাভ' বলে মনে করলেন। পুরুষকে ভোটের বাক্সের দিকে এগিয়ে দিয়ে মেয়েরা নিঃশব্দে চালিয়ে গেলেন তাঁদের শিক্ষাপ্রসারের আর সংগঠনের কাজ। তাঁদের এই প্রচেষ্টায় দারুণভাবে কাজে

লেগেছিল একটি বিশেষ মানুষের সক্রিয় সাহায্য। ইতিহাসের পালাবদলে অনেকসময়েই ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার ইতিহাসে সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ভূমিকাটি পালন করেছিলেন আব্রাহাম লিংকন। সময়ের দাবিকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের পথে নেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট-লিংকন আর তাঁর সহকর্মীরা। প্রথম ধাপে দাস-প্রথা উচ্ছেদ, দ্বিতীয় ধাপে সদ্য শৃঙ্খলমুক্ত "নিগ্রো" মানুষকে সমাজের মূলস্রোতে জুড়ে নেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সফল করতে লিংকনরা গড়ে তুললেন তাঁদের বিখ্যাত "Freedmens Bureau"। এই সংস্থার প্রধান কাজ দাঁড়াল সদ্যমুক্ত আফ্রো-আমেরিকান গোষ্ঠীকে সার্বিকভাবে মূলস্রোতে টেনে নেওয়া। তৈরি হতে লাগল গ্রামে গ্রামে "পাব্লিক স্কুল"। আফ্রিকান মানুষকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হল শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য। দ্রুত প্রসারিত হতে লাগল প্রাথমিক শিক্ষা। লিংকনদের এই চেষ্টা টিকেছিল মাত্র বছর দশেক। সময়টা এ দেশের ইতিহাসে "Reconstruction Era" নামে চিহ্নিত। স্বল্পস্থায়ী "Reconstruction Era"-র প্রভাব এতই গভীরে পৌঁছেছিল যে পরবর্তী যুগের কদর্য segregation-নীতি, যা "Jim Crow" নামে পরিচিত, সেই প্রভাবকে পুরোপুরি মুছে দিতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই তাই মনে করেন লিংকনের "Freedmen's Bureau" না থাকলে পরবর্তীকালের "সিভিল রাইটস্" (Civil Rights) আন্দোলন হয়তো আদৌ গড়ে ওঠা সম্ভব হত না।

ভারতবর্ষের মতো দেশে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অবশ্যই মস্ত ফারাক ঘটেছিল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা যখন আমেরিকার মাটিতে প্রথম পৌঁছোয় সে সমাজের নিজস্ব মানুষের কাছ থেকে কোনও সংঘবদ্ধ বাধার মুখোমুখি হতে হয় না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে "নেটিভ আমেরিকান"রা বিনা প্রতিবাদে নতুন আসা ইউরোপীয়দের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল শত্রুর আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কিন্তু গোটা আমেরিকাতেই, বিশেষত উত্তর আমেরিকায় তাদের জনবসতি ছিল ক্ষীণ। তাছাড়া, 'নেটিভ-আমেরিকান' সমাজ ছিল ছোট-ছোট 'ট্রাইবাল' গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইউরোপীয়দের কাছে তাদের তাই অপেক্ষাকৃত সহজেই হার মানতে হয়। প্রায় "ফাঁকা মাঠে" ঔপনিবেশিকরা গড়ে তোলে সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের ধাঁচে নতুন সমাজ। প্রথমদিকে কায়িক শ্রমের জন্য, মূলত চাষবাসের জন্য ধরে আনা হয় আফ্রিকার মানুষকে "দাস" করে। (এই সুযোগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে একেবারে গোড়ায় আফ্রিকান মানুষই ছিল একমাত্র দক্ষ শ্রমিক। তারা এসেছিল স্থায়ী কৃষি সভ্যতার যাবতীয় কলা-কৌশল সঙ্গে করে। তাই গোড়ায় যতদিন দাস-প্রথা "institutionalized" হয়ে উঠতে পারেনি। ততদিন আফ্রিকানরা অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় দক্ষ হিসেবে বেশি সামাজিক খাতির উপভোগ করেছে)। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সাফল্যের ফলেই ধীরে ধীরে জমে উঠল আধুনিক ধনতন্ত্র। সেই ধনতন্ত্রের নিজস্ব চাহিদা মেটাতেই আবার একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল দাস-প্রথার মতো প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। ধনতন্ত্রের বিপুল জোয়ারে বৃহত্তর সমাজ তখন সামনের দিকে হুড় হুড় করে এগিয়ে চলেছে। শৃঙ্খলমুক্ত আফ্রিকানরা নেহাতই সংখ্যালঘু। তাই স্রেফ টিকে থাকার তাগিদে সেই সম্মুখগামী জোয়ারে গা ভাসানো ছাড়া তাদের উপায় নেই। আব্রাহাম লিংকনদের "Freedmen's Bureau" তাদের এই অস্তিত্বরক্ষার লড়াই-এ

জরুরি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এইসময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশি এগিয়েছিল নিগ্রো মেয়েরাই।

ভারতবর্ষের মতো দেশে ঔপনিবেশিক ইতিহাস গড়িয়েছিল ভিন্ন খাতে। ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেই বুঝেছিল আমেরিকার অনুকরণে সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের ধাঁচে নতুন সমাজ গড়া সম্ভব নয়। দেশের জনসংখ্যা তখনই বিপুল। তাছাড়া, সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোও অনেক বেশি উন্নত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাই তাদের অর্থনীতি এবং শাসননীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা নিল। আজ আমরা সবাই জানি কেমন করে ভারতের মতো দেশগুলি ইউরোপীয়রা ব্যবহার করেছিল কাঁচামাল আর সস্তা শ্রমের উৎস হিসেবে। ওদিকে ইংল্যান্ডে জমে উঠল শিল্পোদ্যোগ আর তাকে ঘিরে পূর্ণ ধনতন্ত্রের বিকাশ। যে অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে "পশ্চিম", বিশেষত আমেরিকা পৌঁছে গেল ধনতন্ত্রী দুনিয়ার চূড়োয়, সেই প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে গেল ভারতবর্ষের মতো দেশগুলো। ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ একদিকে যেমন একটা নতুন শোষণ ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড়াল, আবার অন্যদিকে কতকগুলো সামাজিক অগ্রগতির দরজাও খুলে দিল। 'ফর্মাল ডেমোক্র্যাসী'র বিকাশে খানিকটা catalyst হিসেবে কাজ করেছিল। আমেরিকার বিভিন্ন সিভিল রাইটস্ আন্দোলনগুলির ইতিহাস অন্তত তাই প্রমাণ করে। তাছাড়া, আব্রাহাম লিংকনের পক্ষে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল গোটা সরকারি ব্যবস্থা হাতে থাকায়। বলাই বাহুল্য বিদ্যাসাগরদের আপ্রাণ চেষ্টা আরও অনেক বেশি সফল হতে পারত State Machinery হাতে থাকলে। আরেকটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আফ্রো-আমেরিকানরা ছিল নেহাতই সংখ্যালঘু। তাই সেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে নিজের তাগিদেই সামনের চলমান স্রোতে গিয়ে মিশতে হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আফ্রো-আমেরিকান গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকার ব্যবধান অনেকটাই মুছে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে এমনটি ঘটেনি কখনই। মনে রাখতে হবে, নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকার ঐতিহ্যগত ধারাটি আফ্রো-আমেরিকানদের ক্ষেত্রে বদলে গিয়েছিল এক অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থার ফল হিসেবে। দাস-প্রথা আফ্রিকান মানুষকে আমূল সরিয়ে নিয়ে আসে তার নিজের মাটি থেকে। বৃহত্তর সমাজের চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের গরিব মানুষকে কখনোই তাদের নিজের মূল থেকে সরে যেতে হয়নি। আর তাই বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে এই মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মূলে শেষ পর্যন্ত কোনও বড় জোরাল আঘাত হানতে পারে না। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অংশ হিসেবে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান বা ভূমিকার পার্থক্যের ঐতিহ্যগত ধারাটিও তাই তেমনভাবে নাড়া খায় না। সম্ভবত সেই একই কারণে বর্ণাশ্রমের মতো আদ্যিকালের ব্যবস্থাও এতকাল এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকে।

"নীচের তলার" মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা ভারতীয় সমাজজীবনের মূলস্রোতে প্রাণের জোয়ার আনবে তখনই যখন এই অচলায়তনের মূলে নিশ্চিত আঘাত হানা যাবে। আপাতত এইসব অভাব, অবক্ষয়কে ইতিহাসেরই এক 'tragic' হার হিসেবে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

উল্লেখিত বই এর তালিকা :

Giddings Paula. *When and Where I Enter*
: The Impact of Black Women on Race and Sex in America
New York : Bantan Books, 1984

Hurston, Zora Neale. *"Art and Such". Reading Black, Reading Feminist.*
: A Critical Anthology
Ed. Gates, Henry Louis (Jr).
Meridan : New York, 1990

Noble, Jeanne, *Beautiful Also Are the Souls of My Sisters.*
: History of the Black Women in America
Englewood Cliffes, N.J. Printice Hall, 1978

Truth, S. *Gendered Voices : Reddings From the American Experiences.*
Ed. Costello, Karin B. Harcourt Brace College, N.Y, 1996

এছাড়াও যে বইটি আফ্রো-আমেরিকান মেয়েদের ইতিহাস নানাভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে—

Davis Angele. Y. *Women, Race & Class* Vintage Books. New York, 1981.

‘সর্বার্থসিদ্ধ ঐতিহাসিক : রবীন্দ্রনাথ’

বাসব সরকার

গভীর পরিব্যাপ্ত ইতিহাসচেতনায় রবীন্দ্রনাথ যে একজন ‘সর্বার্থসিদ্ধ ঐতিহাসিক’ ছিলেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বিপুল বৈভবের জন্যে সেটা তেমন সুবিদিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। এই সুচিন্তিত অভিমত আরেকজন ঐতিহাসিকের। তিনি এদেশে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ। মার্কিন দেশের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ইটালিয়ান একাডেমির আমন্ত্রণে প্রদত্ত এক বক্তৃতামালায় অধ্যাপক গুহ বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন উপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসচর্চা। সেই সূত্রেই এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। গত বছরে সেই বক্তৃতামালা ‘History at the Limit of World History’ শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমী ইতিহাসচর্চার মূল ধারা হেগেলের ‘World History’ বা বিশ্ব-ইতিহাস ধারণাকেই ধ্রুব বিষয় বলে মেনে নিয়েছে। তার কেন্দ্রে রয়েছে রাষ্ট্র। যাদের রাষ্ট্র নেই, তাদের ইতিহাস নেই। সুতরাং পরাধীন সব জনগোষ্ঠী হলো ‘People without history’ ইতিহাস-বিহীন মানুষ। তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি থাকতে পারে, সেগুলি সুপ্রাচীন হতে পারে, কিন্তু তাদের যেহেতু রাষ্ট্র নেই অর্থাৎ তারা স্বাধীন নয়, তাই তাদের ইতিহাস নেই। ইংরাজ উপনিবেশিকরা এই ধারণা বিশেষভাবে কাজে লাগায় এদেশে শাসনের মাধ্যমে শোষণ আর লুণ্ঠনের সাম্রাজ্য গড়তে। কোম্পানি আমলে ভারতের প্রথম ইতিহাস যিনি রচনা করেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই জেমস মিল প্রাক্-বৃটিশ ভারতের ইতিহাসকে আদৌ আমল দিতে চাননি। তাঁর মতে উপনিবেশিক শাসনেই ভারতে ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। তাই তিনি বলেছিলেন ভারতের ইতিহাস হলো ‘highly interesting portion of Birtish history’.

উনিশ শতকের গোড়ায় এদেশে ইংরাজি ভাষা, পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হওয়ার সময় থেকে ইতিহাসচর্চার এই ধারাও চালু হয়ে যায়। এর বাইরে কিছু থাকতে পারে বা আছে এদেশেও যাঁরা ইতিহাসচর্চা করেন, তাঁদের চেতনায় কোনো ছাপ ফেলেনি। রাষ্ট্রিকতত্ত্ব, ক্ষমতা ছাড়া ইতিহাসচর্চার স্বতন্ত্র কোনো দিক বা মাত্রা থাকতে পারে, এই ধারণাটাই এদেশের তত্ত্ববিদদের ছিল না। রাজ্য সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়া, রাষ্ট্রকথা আর রাজকাহিনী হয়ে পড়ে ইতিহাসের উপজীব্য। সেই ধরনের কাহিনীতে কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃতি ঘটিয়েছে, কিম্বা সব তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করেনি, তাই তথ্য সংগ্রহের উপরেও জোর দেওয়া হয়। বিদেশিদের ইতিহাস গ্রন্থে দেশের কথার যথাযথ প্রকাশ ঘটেনি, অতীত গৌরবের অবমূল্যায়ন ঘটেছে এই রকম একটা ধারণা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের মানুষদের ইতিহাস লেখার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। বঙ্কিমের ইতিহাসচিন্তা উপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার কাঠামোকে অতিক্রম করে যায়নি। তাকে স্বীকার করে নিয়েই, সেইসব ইতিহাসের বিকৃতি অসম্পূর্ণতা দূর করতে চেয়েছে। তাঁর চিন্তায় তাই তথ্যত্ব জোর পেয়েছে, দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য

নয়। এর জন্যেই দরকার ভারতের ইতিহাসচর্চার ভারতীয় দৃষ্টিকোণ। লেখকের মতে তারই প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্র রচনায়।

ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্র দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে কাহিনীকাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, এবং বিশেষত তাঁর প্রবন্ধে। এই সৃষ্টিকর্মে কবির অভিপ্রায়, বিশেষত কবিপ্রয়াণের মাত্র দশ সপ্তাহ পূর্বে রচিত 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধের প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে লেখক সাহায্য নিয়েছেন কবি, অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শঙ্খ ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা লেখক প্রকাশ করেছেন মূল গ্রন্থে এবং ভূমিকায়। রবীন্দ্র সৃষ্টিকর্মের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনে রণজিৎ গুহ যে মনগড়া কোনো কথা বলছেন না, তার জন্যেই বিশেষজ্ঞের ছাড়পত্রের প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চা, যাকে ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো রচনায় তার প্রকাশ ঘটেনি।

১

হেগেল ইউরোপীয় আলোকায়ন থেকে বিশ্ব ইতিহাস ধারণার আদি রূপটি পেলেও তিনি তার সঙ্গে এমন এক মর্মবস্তু যোগ করেন যা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে 'reason in history', বা ইতিহাসের চরম বিমূর্ত রূপ। চেতনার এই স্তরে উপনীত হতে হেগেল যে যুক্তি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন, জার্মান ভাষায় তাকে 'আউফহেবাঙ' (aufhebung) বলে, যার অর্থ হলো প্রক্রিয়া হিসেবে ক্রমাগত বাস্তব থেকে বিমূর্ততায় চলে যাওয়া। মার্ক্স হেগেলীয় যুক্তি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন কোনো বস্তু বা সত্তার অস্তিত্বের বনিয়াদ হারিয়ে দার্শনিক ধারণায় পরিণত হওয়া। তখন মানুষের প্রকৃত ধর্মীয় অস্তিত্ব হয়ে পড়ে ধর্মের দর্শনের মধ্যে অস্তিত্ব; তার প্রকৃত রাজনৈতিক-অস্তিত্ব হয়ে পড়ে আইনের দর্শনের মধ্যে অস্তিত্ব; তার প্রকৃত স্বাভাবিক অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির দর্শনের মধ্যে অস্তিত্ব, তার প্রকৃত শৈল্পিক অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় শিল্প দর্শনের মধ্যে অস্তিত্ব; আর প্রকৃত মানবিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে নিছক দার্শনিক অস্তিত্ব। তখন মানুষের জীবনের অতীত বাস্তবতা, যা তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, সেটা বিশ্ব ইতিহাস ধারণায় লীন হয়ে যায়। সেটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় Geist বা ঈশ্বরে। হেগেলীয় যুক্তি কাঠামোয় বিশ্ব-ইতিহাস তাই হয়ে পড়ে 'theodicy—a justification of the way of God.'

উপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার ধারা এদেশেও যখন বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে ভারতের চরম বিকাশের স্তর বলে প্রচার করতে সুরু করে তখন তার শোষণের রূপ অল্পবিস্তর বোঝা যেতে থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিতজনের একটা বড়ো অংশ পশ্চিমী ইতিহাস-চর্চার ধারায় প্রাণিত হয়ে বলতে থাকেন ইংরাজ শাসন হলো 'Providential'. ইংরাজ সরকারের প্রজা হয়ে জীবনযাপনের সুখ, তা নিয়ে কাড়াকাড়ির বাইরে অন্য কোনো পরিচয়ে জীবনের সার্থকতা খোঁজার চেষ্টা বেশির ভাগ মানুষের চেতনায় তেমন দাগ কাটেনি। উপনিবেশিকরা তার সুযোগ নিয়ে তাদের বহুমুখী কর্মতৎপরতার স্বরূপ আড়াল করার জন্যে একটা যুক্তি কাঠামো গড়ে তোলে, যা তাদের ইতিহাসচর্চার ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাস ধারণার রাষ্ট্রিক পরিসীমা অতিক্রম করতে না পারলে ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কায়েম করা যাবে না। রণজিৎ গুহ দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ভারত

ইতিহাসের পণ্ডিতিভাষ্য বাতিল করে দিয়ে ইতিহাসচর্চায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলেছেন, 'most accomplished historian'— সর্বার্থসিদ্ধ ঐতিহাসিক।

২

বিশ্ব-ইতিহাস ধারণা কোনো সীমার দ্বারা সীমায়িত নয়, এটাই তার প্রবক্তাদের দাবি। রণজিৎ গুহ এই সীমাহীনতা নিয়েই প্রথমে প্রশ্ন তুলেছেন সীমা বা limit সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা দিয়ে। তিনি বলেছিলেন সীমা হলো এমন একটি অবস্থা বা ধারণা যার বাইরে কিছুই পাওয়া যাবে না আর যার মধ্যে সব কিছু পাওয়া সম্ভব এবং পাওয়া যাবে। আরেক চিন্তাবিদ বলেছেন সীমা বা limit এর উভয় দিককেই thinkable ধরে নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত হওয়া দরকার। তাই যে বিশ্ব-ইতিহাস সব কিছু বিচারের মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যাদের ইতিহাস আছে, সেই সীমার বাইরে যারা যাদের 'ইতিহাসবিহীন জনগণ' বলা হয়েছে তাদের দিকেই নজর দিতে হবে। রেঁনেশাস-উত্তর ইউরোপ যখন মার্কিন ভূখণ্ড আবিষ্কার করে তখন তারা এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসে যাদের সবকিছু তাদের অজানা। তারপর থেকেই মানব প্রজাতির আরেক অংশ সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মায় যাদের 'otherness' বা ভিন্নতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

ইউরোপীয় চেতনা, জ্ঞানের পরিসরে যেহেতু এইসব অন্য মানুষদের অবস্থান নির্ণয়, তাদের নামকরণে সমস্যা ছিল তাই সহজ সরল পদ্ধতিতে তাদের বলা হতে থাকে 'people without history'. এই ধরনের নামকরণের একটা গূঢ় তাৎপর্য অচিরে বোঝা যেতে থাকে উপনিবেশিক অভিযান শুরু হওয়ার পর। তার আগেই আরম্ভ হয়েছিল এই নতুন পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন পর্ব—ইতিহাসের predatory phase—যা পরে সরাসরি দেশ দখলে পরিণত হয়। তখন এইসব অন্য মানুষদের অপরিচয়ের জন্যে 'inferior human beings' বলা হলে তাদের উপরে যে-কোনো ধরনের নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা নির্বিকার ভাবে চালানো যায়। কারণ মনুষ্য পরিচয়ে যারা হীন তাদের প্রতি মানুষের মতো আচরণ করার কোনো তাগিদ আর থাকে না। এসব হলো ভারত ইতিহাসে বৃটিশপর্ব সুরু হওয়ার আগের কথা।

কিন্তু ভারতে উপনিবেশিকরা এমনই এক জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে আসে যাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, পুরাণ দর্শন সবই আছে, আর ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাদের কিছু পরিচয়ও আছে। তাই মার্কিন ভূখণ্ডের আদিবাসীদের যে মাপকাঠিতে 'ইতিহাসবিহীন মানুষ' বলা হয়েছে, ভারতে সেটা প্রয়োগ করা যাবে না। অথচ এদেশের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে হলে এখানকার মানুষদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করা দরকার। উপনিবেশিকরা সেই উদ্যোগেই কাজে লাগায় হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাস ধারণা। উনিশ শতকের গোড়া থেকে ভারতে উপনিবেশিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার কাজে যেসব নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয়, সেখানে ভারতীয়দের ইতিহাবিহীনতা প্রমাণ করার সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ ছিল ইতিহাসচর্চাকে 'রাষ্ট্রিকত্বের প্রকাশ' হিসেবে তুলে ধরা। এই সূত্রেই বলা যেতে পারে ভারত ইতিহাসের যে বিবৃতির সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সবাই পরিচিত, সেই হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, আর বৃটিশ যুগ বর্ণনা, পর্ব ও পর্বান্তরগুলি জেমস মিলের দান। কয়েক প্রজন্মের শিক্ষিত ভারতীয়দের

মনে এই পর্বভাগ এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, জাতীয় স্বাধীনতাকে সাতশ' বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তি বলে গণ্য করা হয়। সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চেতনার এই ধারা ভারতে উপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার অবদান। পরিবর্তনের লক্ষ্যে চেতনার এই ধারার প্রতিস্পর্ধী চিন্তার সূচনা হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে।

৩

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছেন, বলে এসেছেন যে, অতীত সৃজনশীল ভাবেই তার নবীকরণ ঘটায় সাহিত্যে, শিল্পকর্মে। পণ্ডিতি ইতিহাসচর্চায় চিরকাল যে তথ্যের কারবার তা জমা থাকে মহাফেজখানায়। সেখানে আর যাই হোক মানুষের বহতা জীবন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উদ্যোগ-উদ্যম, সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যে চলমান জীবন সমাজ ইতিহাসের ভাঙাগড়ার কাজ নিয়ত করে চলেছে, কোনো দেশের পাবলিক রেকর্ড আপিসে তার কথা নেই। সেই ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হয় তার সাহিত্যে যার ঐতিহাসিকতার গোড়ায় পৌঁছতে না পারলে মানুষকে, তার সমাজকে জানা যাবে না। বিশ্ব-ইতিহাস ধারণার রাষ্ট্রিকত্বের সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রচেতনায় ধরা পড়েছিল সবার আগে, সবচেয়ে জোরালোভাবে।

বিশ্ব-ইতিহাস প্রবক্তা আর উপনিবেশিকরা যখন প্রায় এক সুরে বলতে থাকেন, ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের নাড়ীর যোগ আছে, তখন ইতিহাসচর্চার উপকরণ জোগান দেওয়ার ক্ষমতা কিম্বা সুযোগ রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো থাকার কথা নয়। কারণ যে ঘটনা, তথ্য নিয়ে ইতিহাস রচিত হবে তা রাষ্ট্রের উদ্যোগেই ঘটতে, সংগৃহীত হতে পারে। আর এই বক্তব্যের অনুষঙ্গে আরেকটি কথা এসে পড়ে। ঘটনা, তথ্যের সমাহারে ইতিহাস রচনার ভাষা হতে হবে 'গদ্য'। রণজিৎ গুহ তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন 'prose in history' এবং 'invention of world-history' প্রায় হাত ধরাধরি করে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তাই যেসব ভাষায় গদ্য সাহিত্যের জন্ম হয়নি, তার অতীত জীবনের বলার মতো যা কিছু তা হয় 'মিথ' নয়তো কল্পনা, কিম্বা নিছক কাহিনী মাত্র। তা নিয়ে ইতিহাস হয় না, ইতিহাসচর্চা তো অসম্ভব। তাঁরা স্বীকার করেছেন দুনিয়ার সব দেশেই সাহিত্যের আদিরূপ পদ্য, কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সেটা ছিল সেইসব দেশের প্রাক্-ইতিহাস পর্ব। যখন থেকে তাদের ইতিহাস হয়েছে, ইতিহাসচর্চা সুরু হয়েছে, গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমেই তা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতে, বিশেষত বাংলার গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের এমন এক সময়ে যখন এখানকার মানুষের চেতনায় ইউরোপীয় ইতিহাসচর্চার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। রণজিৎ গুহ তাঁর আলোচনায় দেখাতে চেয়েছেন ইউরোপীয়রা যাকে 'rationalist, modern historiography' বলেছেন, তার সঙ্গে সামান্যতম পরিচয় ছাড়াই অন্তত বাংলাভাষায় সেই ধরনের ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছেন রামরাম বসু। তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০১ সালে যখন এদেশে ইংরাজি ভাষা পাঠক্রমে চালু হয়নি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এদেশে আগত তরুণ ইংরাজ শাসকদের বাঙালি জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার তাগিদেই বাংলাভাষা শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভাব ছিল বইয়ের তা দূর করার জন্যই পাদ্রী কেরী সাহেবের নির্দেশে মুন্সি রামরাম বসু এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরাজি ভাষা তিনি পড়তে, লিখতে জানতেন না। কেবল কাজ চালানোর মতো কিছু ইংরাজি

শব্দ তাঁর জানা ছিল। তাই ইউরোপীয় ঘরানায় ইতিহাস রচনা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। দেশের ইতিহাসকে তিনি বিবৃত করেছেন জ্ঞান, বুদ্ধি অনুসারে, যা তাঁর নিষ্ঠায় হয়ে উঠেছে বাংলাভাষায় আধুনিক ইতিহাসচর্চার প্রথম গ্রন্থ। সুতরাং রাষ্ট্র ছাড়াই যে আধুনিক ইতিহাসচর্চা হতে পারে, রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতা যে অপরিহার্য নয়, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র তার বিশিষ্ট প্রমাণ। আর এই গ্রন্থও রচিত হয়েছিল গদ্যে, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় নয়। রামরাম বসুকে বাংলা গদ্যের জনকের মর্যাদা দেওয়া হবে কিনা, হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তা হলো ইতিহাসচর্চায় উপনিবেশিক চিন্তা কাঠামোর আরোপিত ধারণার সূচনা পর্বের অনেক আগে বাংলাভাষায় ইতিহাসচর্চা সম্ভব হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় বাংলায় গদ্য রচনার একটা রীতি এর আগেই সুরু হয়েছিল চিঠিপত্রে, বৈষয়িক গদ্যে, রামরাম বসু সেটাই প্রয়োগ করেছেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনায়, বাংলা গদ্যের জনকের মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য নয়, তাহলেও একথা মানতে হয় যে গদ্য রচনার সঙ্গে ইউরোপীয় অর্থে রাষ্ট্রিকতার নাড়ীর যোগ নেই।

৪

ইতিহাস রচনার ভিত্তি হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঘটনার বর্ণনা অথবা মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাস্তব যে অভিঘাত সৃষ্টি করে তারই এক বিশিষ্ট রূপ, যাকে রণজিৎ গুহ বলেছেন, 'narratives of experience and wonder'. রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনায় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে জোরালোভাবে। ইতিহাসের মর্মবস্তু অতীত হলেও কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার খুঁটিতে সেটা বাঁধা থাকে না। মানুষ প্রতিটি যুগের অভিজ্ঞতার আলোয় সেই ইতিহাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলেই ইতিহাসের বর্ণনায় সমকালীনতা এসে পড়ে। আর সেটাই সৃষ্টি করে চলে সীমাহীন বিস্ময়ের। এই সীমাহীনতাই ইতিহাসকে myth আর fantasy'র ওপারে স্থান দেয়। যে কথা বা কাহিনীর উৎস বিস্ময়, যতোবার সেটি বিবৃত করা হবে ততোবারই সময় ও কাহিনীর মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়া তার নবীকরণ ঘটবে। বিস্ময় থেকে উৎসারিত কাহিনী অশেষ, তার historicality বা ঐতিহাসিকতা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই কোনো আরোপিত ধারণার ছকে তাকে আবদ্ধ করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা কেবল পশ্চিমী ইতিহাসচর্চা, উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচিন্তা থেকে দূরত্বে বজায় রাখেনি, বঙ্কিম ১৮৭০-এর দশকে ইতিহাস চিন্তার যে ধারার গোড়াপত্তন করেন, তার থেকেও দূরত্ব বজায় রেখেছে। বঙ্কিমের প্রভাবে এদেশে একটা সংকীর্ণতাবাদী হিন্দু দৃষ্টিকোণ অতীতকে বিকৃত করে পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তার সূচন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদা সেই ধারার অনুবর্তী ছিলেন। কিন্তু অচিরে সেই প্রভা থেকে নিজেকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ একটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সেকুলার উদার গণতান্ত্রিব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে নিজেকে স্থিত করেছিলেন। তাঁর ইতিহাসচিন্তার সর্বশেষ রূপটি প্রকা পেয়েছে ১৯৪১ সালের মে মাসে, প্রয়াণের মাত্র দশ সপ্তাহ পূর্বে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এব আলাপচারিতার সূত্রে কবির মত 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে ভাষা তীক্ষ্ণ, আক্রমণাত্মক, বিদ্রুপপূর্ণ যা কবি সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন প্রথাগ ইতিহাস চিন্তা ও ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে।

৫

'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' রচনায় বিবৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবি হয়ে ওঠার 'প্রাক্-ইতিহাস'। এই প্রাক্-ইতিহাস নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত তথ্যের সংকলন ও বিশ্লেষণ নয়। এটা হলো একান্তভাবেই ভবিষ্যৎ-মুখীনতার প্রাক্-ইতিহাস যাকে তিনি নিজেই বলেছেন কবি জীবনের 'গোড়াকার সূচনায়'। তাঁর কবি মানসে সৃজনশীলতার যে নিরন্তর প্রকাশ ঘটেছে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত, তারই গঠন পর্বের কথা তিনি নিজেই বলেছেন এই রচনায়। নিসর্গ প্রকৃতি আর প্রবহমান জীবনধারাকে তিনি যে চোখে দেখেছেন, সেই দেখা একান্ত, তাঁর নিজস্ব, অন্য কারো নয়। এই দেখা এক বালককে করে তুলেছে কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি তিনটি ঘটনার কথা বলেছেন, অসংখ্য সাধারণ মানুষের কাছে তারা কোনো অসাধারণত্বের দাবিদার ছিল না। কিন্তু সেই বালকের চোখে 'সেদিনকার ইতিহাসে' তারা ছিল অসাধারণ। কবি জীবনের উন্মেষপর্বে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে বিস্ময়ের সূচনা করে, তাঁর সত্তাকে আলোড়িত করে আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে তিনি সেটাই ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টির এই অনন্যতাকে তিনি নিজেই বলেছেন 'কবি যে সে এইখানেই'। সেই তিনটি অভিজ্ঞতা হলো :

(১) "শীতের রাত্রি ভোরবেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। ...আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান, ...তার প্রধান সম্পদ ছিল পূর্বদিকের পাঁচিল ঘেঁষে এক সার নারকেল গাছ। সেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশির বিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার দৈনিক দেখায় ব্যাঘাত হয় সেইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম, সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। .....কিন্তু কিছু বয়স হলেই দেখতে পেলুম, আর কোনো ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এই পাগলামির কোঠায় কোনখানেই পড়ত না তা আমি দেখলুম। শুধু তারা কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত।"

(২) "স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার উর্দ্ধে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কি আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে, কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি এবং পুলকিত হয়ে যায়নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ।"

(৩) "একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস—এই গাধাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোন ব্যতিক্রম হয়নি আদিকাল থেকে—আর একটা গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু একথা আমি নিশ্চিত জানি, সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে ঐ দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয়নি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে

বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ সেখানে ব্রিটিশ সাবজেক্ট ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়।' এই সূত্রেই এসেছে 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারার কথা, 'গল্পগুচ্ছে'র কথা। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাসের সমগ্র ঘটনাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাকে আবিষ্কার করেছেন মহিমা ও অপার করুণার এক সমুজ্জ্বল চরিত্র হিসেবে, যা ভারত ইতিহাসে বৌদ্ধযুগকে এক বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। বুদ্ধের করুণাঘন যে রূপটি শ্রমণদের জীবনাদর্শ হয়ে উঠে চলমান সমাজ জীবনের গতানুগতিকতায় 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' ভাবনা হিসেবে কল্যাণের ধর্মকে তুলে ধরে, ইতিহাসের পণ্ডিতি ব্যাখ্যায় তার সেই সার্বিক আবেদন ধরা পড়ে না। তা যদি হতো বৌদ্ধ ইতিহাসের কেতাবি আলোচনায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো ব্যাপকভাবে। তা যে ঘটেনি, সেটাও ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একদা বাংলাদেশের নদী বেয়ে মাসের পর মাস ঘোরার সময় তিনি যে প্রাণের লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে সেগুলিই প্রকাশ পেয়েছে। যে পল্লীচিত্র তিনি তখন রচনা করেছিলেন, তাঁর আগে আর কেউ তা করেনি। সেই পল্লীজীবনে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু মানবজীবনের "সেই সুখ দুঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে—কখনো-বা মোগল রাজত্বে কখনো-বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবতা-প্রকাশ নিত্য চলেছে—সেটাই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে। কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"

৬

ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতা যে কেবল রাজবৃত্ত, রাষ্ট্রবৃত্ত নয়, সমাজে মানুষ তার যাপিত জীবনের মধ্য দিয়ে রাজ ও রাষ্ট্রবৃত্তে পরিবর্তনের যে সূচনা করে, প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় তার স্বরূপ ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ তাই ইতিহাসচর্চা নয়, ঐতিহাসিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছিলেন। ঐতিহাসিকতার আলোচনাতেও তথ্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেখানে তথ্যত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। সৃষ্টির স্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও তিনটি তথ্যের কাছে তাঁর কবি-জীবনের গোড়াকার সূচনার জন্য ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর কবি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেই তথ্য কেবল প্রেরণাই দিয়েছিল, সেটাই তার সবকথা বা শেষ কথা নয়। বালক বয়সের সেই তিনটি অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁর মনে আনন্দের, জীবনপ্রবাহের যে রূপটি তুলে ধরেছিল, দীর্ঘজীবনে অসংখ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেটাই নিজেকে প্রকাশ করেছে বিচিত্র রূপে। এখানে স্মৃতির ভূমিকা 'সংরক্ষণকারীর' নয়, সেই ভূমিকা কবিচিত্তের 'পরিচর্যাকারীর'। তথ্য তাই কেবল যা 'হয়েছে বা হয়ে গেছে' নয়, যা 'হয়ে উঠছে' তার মধ্য দিয়েই তথ্যের আরেকটি রূপ ধরা পড়ে যা প্রতিভার সৃষ্টিক্ষেত্রে কেবল নয়, বৃহত্তর সমাজ জীবনের ঘটনাবর্তে অসংখ্য রূপে নিজেকে প্রকাশ করে থাকে।

যে ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতার দিকে রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়। সেখানে নানা গূঢ় অভিসন্ধি, কৌশল, অপকৌশল উপনিবেশিকদের অনুসৃত নীতির, আরোপিত শর্তের গণ্ডির মধ্যে রাজনীতিকদের স্বার্থ দ্বন্দ্ব যে রাজনৈতিক

ঘটনাবলীর জন্ম দেয়, সেখানে যারা পাবলিক নামে পরিচিত, তারা ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসেবেই সক্রিয়। কবি বলেছেন আরেক ধরনের 'পাবলিকের' কথা, যা শহুরে রাজনীতির পরিমণ্ডলের বাইরে বাস করে দেশের গ্রামে গঞ্জে, যারা সর্ব অর্থেই নিতান্ত সাধারণ মানুষ, ইতিহাসচর্চায় তাদের কথা থাকে না। ইংরাজ রাজের প্রভুত্ব (dominance) তাদের উপর কায়েম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু উপনিবেশিকরা কোনোভাবেই তাদের চিরাচরিত জীবনবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, নিজের শাসনের রীতিনীতিতে তাদের গড়েপিটে নিতে পারেনি। তাদের hegemony সেখানে বিস্তৃত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনায় এই সাধারণ মানুষের কথা উঠে এসেছে নানাভাবে বারবার। সৃজনশীলতার বিরাট বৈচিত্র্যের এই সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্ত নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। তিনি যখন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা বলেন তখন তার মধ্যে ফুটে ওঠে সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের কথা, যার মধ্যে দুঃখ, বেদনা কেবল নয়, থাকে সুখেরও অনুভব। এখানেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কবি মানুষের অভিজ্ঞতার শরিক তাদের সহমর্মি। জীবনের সুখ দুঃখের বাস্তবতাই হলো ঐতিহাসিকতার উপাদান যা পাবলিক রেকর্ড আপিসে নেই। রবীন্দ্রনাথের এই ইতিহাসচেতনা তাই রাষ্ট্রিকতন্ত্রের ধারণাকে ইতিহাসের মর্মবস্তু বলে স্বীকার করেনি কোনোদিন। তিনি বলেছেন সমাজের ইতিহাসের কথা। সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হলো একসঙ্গে চলা। মানুষ একসঙ্গে চলতে পারে একই লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করলে। সেখানে মানুষের গোষ্ঠীগত, সাম্প্রদায়িক পরিচয়, শোষণ ও শাসনের ষড়যন্ত্র, কৌশল তাদের অভিযানকে ব্যাহত করতে পারে না। সেই সমাজের ইতিহাস রচনার দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলেই তিনি 'সর্বার্থসিদ্ধ ঐতিহাসিক', কেতাবি ধারার ইতিহাস পণ্ডিত নন।

স্ক্রু

শ্রীপান্থ

—মাসিমা, স্ক্রু-ড্রাইভার আছে? ছেলেটি রেফ্রিজিরেটারটা পরখ করতে করতে এক সময় জিজ্ঞাসা করল। পাশের বাড়ির ছেলে। কলেজে পড়ে। না, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নয়। তবে যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে। বাড়িতে কোনও ছোটখাটো যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিলে আমার স্ত্রী মিস্ত্রির বদলে ওকেই ধরে আনেন। প্রথমত, মিস্ত্রিকে খবর দিতে হয় দোকানে গিয়ে। দোকানি বলবেন, ঠিক আছে, এক বাড়িতে কাজে গেছে, এলেই পাঠিয়ে দেব। সে যে কখন আসবে কেউ জানে না। দ্বিতীয়ত, যদি বা দিনান্তে আসে, কাজটা যে তক্ষুনি হয়ে যাবে সে কথা বলা যাবে না। হয়তো, এটা চাই, সেটা চাই বলে আবার তার খোঁজে বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে ধরতে পারলে অমলই ভাল। তাকে জানালা দিয়েও ডাকা যায়। তার বাড়ির লোকেরা তা-নিয়ে কিছু বলেন না। অবাক কাণ্ড। স্ক্রু-ড্রাইভার আছে কিনা, শুনে আমার স্ত্রী মোটেই বিচলিত হলেন না, বললেন,—আছে বই কি। তারপর ছুটে গিয়ে তাঁর এটা-সেটা কাজের জিনিসের বিরাট ড্রয়ারটি খুলে রঙিন প্ল্যাস্টিকের একটা প্যাকেট এনে তুলে দিলেন অমলের হাতে। আমি আড়চোখে দেখলাম তাতে একটি নয়, নানা মাপের অনেকগুলো স্ক্রু-ড্রাইভার। ছেলেটি একটা বেছে নিয়ে বলল—বাঃ।

কাজ সারা হয়ে গেলে স্ত্রীকে বললাম—এতগুলো স্ক্রু-ড্রাইভার তুমি পেলে কোথায়? তিনি বললেন, কিছুই তো খবর রাখো না, গৃহস্থ ঘরে এসব রাখতে হয়। মেয়ে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে হেঁসেলের জিনিসপত্রের সন্ধানে চাঁদনি না চীনাবাজার ঢুঁ মারে। একদিন বলছিল সেখানে ফুটপাথে ঢেলে শস্তায় কত কী যে বিক্রি হয়। যেমন, নানা মাপের তালাচাবি, চামচ......স্ক্রু-ড্রাইভার। ওকে দিয়েই একদিন আনিয়ে রেখেছিলাম প্যাকেটটা। নানা মাপের এক ডজন স্ক্রু-ড্রাইভার ওতে রয়েছে। যখন যেটার দরকার পেয়ে যাবে। দেখলে তো কেমন কাজে লেগে গেল! এই বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীকে আর তাঁর সাংসারিক বুদ্ধির জন্য তারিফ করে হাসির পাত্র হতে ইচ্ছে করল না। সেটা অনুচ্চারিতই রয়ে গেল।

কিন্তু মনের আকাশে দেখা দিল একটি বৃহৎ প্রশ্ন-চিহ্ন। স্ক্রু-ড্রাইভার। স্ক্রু-ড্রাইভার যখন, তখনও নিশ্চয় স্ক্রু-ও রয়েছে। কোথা থেকে এল এই স্ক্রু আর স্ক্রু-ড্রাইভার। আমি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি-বিরোধী নই। তত্ত্বগতভাবে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির সাফল্য আমি মানুষের সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদ বলেই গণ্য করি। জানি, তার দিকে চোখ বুজে জীবনযাপন সম্ভব নয়। কিন্তু তা-ই বলে যখন তখন সুইচে হাত? কিংবা হঠাৎ লোডশেডিংয়ের সময় টর্চের আলোয় ফিউজ পাল্টানো? আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ভাবতে পারি না রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার ফুরিয়ে গেলে আমি নতুন সিলিন্ডার লাগিয়ে দিচ্ছি, কিংবা রেফ্রিজিরেটার বিগড়ালে অমল যা করে গেল আমি তা করছি। গান শুনতে খুবই ভালবাসি আমি। ঘরে একটা মিউজিক

সিস্টেমও আছে, কিন্তু কোনও দিনই আমি তাতে নতুন কোনও ক্যাসেট ঢোকাতে পারি না। গাড়ি চড়লেও কখনও বনেটের নীচে কী আছে তা দেখার চেষ্টা করি না। বাড়িতে "পি-সি" আছে, তার দিকে ফিরেও তাকাই না, কিছু দরকার হলে নাতনিদেরই বলি। সত্যি বলতে কী, কাছেভিতে কেউ থাকলে আমি টেলিফোনও ডায়েল করি না, বলি—এই নম্বরটা ধরে দাও তো। সেই আমাকেই হঠাৎ পেয়ে বসল স্ক্রু আর স্ক্রু-ড্রাইভার। লালাবাবু "বেলা যায়" শুনে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে গিয়েছিলেন, আমারও যেন সেই দশা। আর সব কাজ মুলতুবি। আমি এই স্ক্রু আর স্ক্রু-ড্রাইভারের রহস্যভেদ করতে চাই।

সহজ বুদ্ধি বলে নানা মাপের স্ক্রু-ড্রাইভার মানে নানা মাপের স্ক্রু-ও বর্তমান। আমার হাতের এই ঘড়িতে স্ক্রু। টেবিলের ওই টেলিফোনে স্ক্রু। রেফ্রিজিরেটারে স্ক্রু। গ্যাসের উনুনে স্ক্রু। মোটরগাড়ির গাঁটে গাঁটে কত না স্ক্রু। রেলগাড়ি, জাহাজ, উড়োজাহাজ সর্বত্র স্ক্রু আর স্ক্রু। মানস চোখে দেখতে পাচ্ছি এই দুনিয়া স্ক্রুময়। কোনও কোনও মানুষ সম্পর্কে বলা হয় লোকটির বুদ্ধি এমন প্যাঁচালো যে মাথায় পেরেক ঠুকে দিলে তা স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে। আমি নিজেকে এতখানি কূটবুদ্ধির মানুষ বলে মনে করি না। সম্ভবত আমার বন্ধুরাও আমাকে সে চোখে দেখেন না। তবু কেন জানি না, আমার মাথায় ভর করল এই স্ক্রু আর স্ক্রু-ড্রাইভার। হঠাৎ খেয়াল হল মাথায় যখন ঘুরছে স্ক্রু তখন আমার বাঁ হাতের আঙুল খেলা করছে ফতুয়ার একটা বোতাম নিয়ে।—কই, আমি কি এই বোতাম নিয়ে কখনও ভেবে দেখেছি? কোথা থেকে এল এই বোতাম, যা জামার একূল ওকূল প্রীতির বন্ধনে বেঁধে জামাটিকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে। ইতিহাসের পড়ুয়া হিসাবে জানি শুধু প্রাচীন ভারত নয়, প্রাচীন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, মিশর, গ্রিস, রোম—কোথাও বোতাম ছিল না। ভাস্কর্য, চিত্রকলা, এবং লিখিত ইতিহাস সাক্ষী, ভারতে আদৌ সেলাই করা পোশাকই ছিল না। গ্রিক রোমানরা পরতেন টোগা, বা টিউনিকজাতীয় বোতামহীন উত্তমাঙ্গের আবরণ। জাপানিদের কিমানোর মতো অনেকের পোশাক ধরে রাখা হত কোমরবন্ধ কি অন্য কোনও ফিতের বাঁধনে। চীনারা নতুন অনেক কিছুই দিয়েছে সভ্যতাকে, কিন্তু তাদের কাছেও আজকের এই বোতাম ছিল অজানা। একটা সময়ে বাঁধন হিসাবে তারা অবশ্য সুতোর ফাঁসে সুতোর একটা গুলি আটকে দিত, রাজস্থানীদের ফতুয়া বা মেরজাইয়ের মতো। এস্কিমোরা এসব কিছুই করত না। তারা পোশাকটি মাথা দিয়ে গলিয়ে পরে নিত, মাথার উপর দিয়েই টেনে বের করত। অথচ আজ চারদিকে কত না বোতাম। বোতাম সার্টের বুকে (কখনও কখনও এমনকি কলারেও), হাতে; বোতাম প্যান্টের এখানে সেখানে, কোটের বুকে, পকেটে, হাতায়। কোটের হাতায় বাইরের দিকে দু-তিনটে বোতাম আছে আপাত বিচারে যাদের কোনও কাজ নেই। নিতান্তই যেন পোশাকি, যাকে বলে শোভাবর্ধক। তারও কিন্তু আদি আছে। মধ্যযুগের ইউরোপের কোনও একটা ইতিহাসে পড়েছিলাম এই কর্মহীন বোতামগুলো সেই বিস্মৃত অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয় যখন ইউরোপের মানুষ সাবান, তোয়ালে কিংবা দাঁতের মাজনের ব্যবহার জানত না। তৎকালে প্রচলিত রীতি ছিল খাওয়া-দাওয়ার পর কোটের হাতায় মুখ মোছা। সেই বদ অভ্যাস ছাড়াবার জন্যই এই বোতামের বন্দোবস্ত। তবে, বোতাম ইতিহাস-হীন নয়, তা-ই না? আজ কত কী দিয়েই না বোতাম গড়া হয় : সোনার, রুপোর, স্টিলের, হাতির দাঁতের, চন্দন কাঠের, হাড়ের,

ঝিনুকের প্ল্যাস্টিকের—আরও না জানি কত কী দিয়ে। অথচ ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতকের আগে বোতামের চিহ্নমাত্র নেই। বলা হয় প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী। আদ্যিকালের অনেক আবিষ্কারই কিন্তু জননী ওরফে মা বোনদের আবিষ্কার। অনুমান করতে অসুবিধা নেই, বোতামও তাঁদেরই অবদান। সুতো, তাঁত, কাপড় বোনা, পোশাক তৈরি যাঁরা করলেন বোতামের দায়িত্ব কি আর তাঁরা নিষ্কর্মা পুরুষদের জন্য ফেলে রেখেছিলেন? অন্তত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বোতামের জন্য পোশাকে সামান্য একটু জায়গা কেটে "ঘর" তৈরি করার কাজটা তাঁরাই সেরেছেন। কেন না, তার সঙ্গে সূচিশিল্পের নিবিড় সম্পর্ক।

একেই বলে ধান ভানতে শিবের গীত। কোথায় বোতাম আর কোথায় স্ক্রু ও স্ক্রুড্রাইভার। না হয় বোঝা গেল বোতামের আগে অন্তত ফাঁস তৈরি করে সেটা আটকাবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কী ছিল স্ক্রুর আগে? প্রসঙ্গত একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কাহিনীটি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকের মুখে শোনা। সুতরাং কিঞ্চিৎ নুন সহযোগে গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

স্বাধীনতার কিছুকাল পরের ঘটনা। বিধানচন্দ্র রায়ের আমল। রাজ্য তথ্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত তখন অমল হোম কিংবা সুধীন দত্তমশাই (নামটা আমার ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। দু'জনের একজন বটে।) কলকাতা থেকে একদল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে তথ্য দফতরের তরফে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কাজকর্ম দেখতে। দলের কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না সেখানে ঠিক কী হচ্ছে। বিশাল কর্মকাণ্ড দেখে সবাই মুগ্ধ। বলতে গেলে হতবাক। তাঁরা যেন তারিফ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। দলে একজন প্রাচীন জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ সন্দেহবাদীও বটে। সকলের আগে মুখ খুললেন তিনিই। বললেন,—এসব কী আমাদের এঞ্জিনিয়াররা করেছেন? নিজেদের মধ্যেই একজন উত্তর দিলেন তাছাড়া কে আর করবে দাদা? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। আমি বলছি, সাহেব ছ্যালো তো? কথা শুনে সবাই হেসে খুন।—দাদা দেখছি এখনও সাহেবদের মায়া কাটাতে পারছেন না, ফোড়ন কাটলেন একজন। আর একজন প্রাচীন সাহিত্যিক বললেন, ওহে হাসির কথা নয়, দাদা ঠিকই বলেছেন। সাহেব থাকা আর না থাকার মধ্যে ফারাক থাকতে পারে বই কি! উড়োজাহাজ উড়াতে গিয়ে দেখা গেল একটা স্ক্রু নেই। সাহেব সেখানে আর একটা স্ক্রু লাগাতে না পারা অবধি উড়োজাহাজ ছাড়বে না। আর আমাদের লোকেরা বলবে, দেখ তো, একটা নারকেলের দড়ি পাও কিনা, আপাতত তো তা দিয়ে কাজ চালাই! সকলের মুখে এবার সমস্বরে বের হল—হোঃ! হোঃ! হোঃ!

তবে কি স্ক্রুর আগে দড়ি? তা কেন? আমার জানা আছে প্রাচীন মিশরে ওঁরা কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়তেন কাঠেরই পেরেক দিয়ে। অন্যত্রও সে-ধরনের কোনও ব্যবস্থা থাকা সম্ভব। রোমানরা ব্রোঞ্জের, পরে লোহার পেরেক ব্যবহার করতেন। যিশুকে তো ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল পেরেক দিয়েই। ক্রুশের কাঠ হয়তো জোড়া হত কাঠে খাঁজ কেটে, কিংবা পেরেক দিয়ে। তবে স্ক্রু এল কবে? কোথা থেকেই বা।

ছিলাম আদার ব্যাপারি, কী দরকার আমার জাহাজের খবরে? কিন্তু উপায় নেই। স্ক্রু আমাকে পেয়ে বসেছে। চার্লি চ্যাপলিনের "মডার্ন টাইমস"-এর কথা মনে পড়ে? দিনের পর দিন মেশিনে একঘেয়ে কাজ করতে করতে চার্লি সব সময় স্ক্রু টাইট করেন। তাঁর শয়নে

স্বপনে সে খেলা। এমনকি পথে চলতে চলতে হাওয়ায়ও দুটি খালি হাতে মেশিন ঘোরান। একবার এক ভদ্রমহিলার পশ্চাদ্দেশ তাক করেও। একে বলা যেতে পারে মেশিনে পাওয়া। আমারও একই দশা। আমাকে পেয়ে বসেছে স্ক্রু। ইংরেজি বিশ্বকোষ ঘাটাঘাটি করে আমি ক্লান্ত। দুই খণ্ডে সংকলিত "হিস্ট্রি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি"-তে যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেক কথা আছে। শুধু যন্ত্র আবিষ্কারের কথা নয়, যুগে যুগে তার বিবর্তনের কাহিনীও। কিন্তু স্বতন্ত্র আলোচ্য হিসাবে স্ক্রু সেখানে অনুপস্থিত। হতাশ হয়ে প্রায় রণভঙ্গ দিচ্ছিলাম। হঠাৎ গ্রন্থাগারে অসংখ্য বইয়ের ভিড়ে চোখ পড়ল একটা অন্য ধরনের বইয়ের নাম—"ওয়ান গুড টার্ন, আ ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব দ্য স্ক্রু অ্যান্ড দ্য স্ক্রু-ড্রাইভার।" (লেখক—উইটোল্ড রাইবেজিনস্কি। নিউইয়র্ক, ২০০২)। বলতে গেলে আনকোরা নতুন বই। নেড়েচেড়ে দেখা গেল কেউ এখনও তার পাতা উল্টায়নি। ভাবলাম যাক বাঁচা গেল। আমার জীবনে এ-ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটেছে। যে বই কোথাও নেই, হন্যে হয়ে যা খুঁজছি হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তা পেয়ে গেলাম হয়তো প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংয়ে কিংবা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কোনও পুরানো বইয়ের দোকানে। ভাবলাম, যাক মুশকিল আসান। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। কথায় বলে বেল পাকলে কাকের কী? আমার জন্যও বুঝিবা অপেক্ষা করে ছিল সেই ললাট লিখন। সুনীতিকুমার "পি এইচ ডি"-র জন্য লেখা বইকে বলতেন "ডাক্তারি বই"। তিনি সাধারণত পাতা না উল্টেই সে সব বই একপাশে সরিয়ে রাখতেন। আমাকেও তা-ই করতে হল। কিন্তু আদ্যোপান্ত না দেখার আগে নয়। বইটি আমার কাছে যেন অশোকের কোনও দীর্ঘ শিলালিপি, কিংবা কোনও "ডেড সি স্ক্রোল।" আমার সাধ্য কি তাতে দন্তস্ফুট করি। ক'জন মেকানিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার এ বই হজম করতে পারবেন বলা শক্ত। না, দোষ লেখকের নয়। এই দুর্বোধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমার অজ্ঞতা। যা হোক, শেষ পর্যন্ত পিত্ত রক্ষা করি লোকশ্রুতির হাঁসের মতো, অর্থাৎ নীর থেকে ক্ষীর তুলে নেওয়ার অবাস্তব পদ্ধতিতে। মনে পড়ল উনিশ শতকে কলকাতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন এখানকার কারিগররা খুবই নিপুণ। যে-কোনও কারিগরি দায়িত্ব তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে। তারা নিজেদের বলে "মিস্ত্রি"। এই "মিস্ত্রি" শব্দটার আদিতে রয়েছে "মিসটিরি", অর্থাৎ রহস্যবাদ। মিস্ত্রিরা কখনও তাদের বিদ্যার সুলুক সন্ধান দেয় না। তারা নিজেদের কাজকে রহস্যে ঘিরে রাখে। এ বইয়ের লেখক যদিও আমাদের সব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যে সব গাণিতিক, বিজ্ঞানী এবং কারিগরের কথা তিনি বলেছেন আমার অন্তত মনে হয়েছে তাঁদের অনেকেই রহস্যময়; কেউ সহসা নিজেদের ধরা দিতে চান না। যা হোক, ওই গহন গভীর খনি থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি মাত্র মণি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। ক্লান্ত বিরক্ত পাঠকদের কাছে সবিনয়ে তা নিবেদন করছি। এক, স্ক্রু এবং স্ক্রু-ড্রাইভারের ব্যাপক ব্যবহার চালু হয় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। দ্বিতীয় খবর, তার প্রথম আবির্ভাব দূর অতীতে, যিশুর জন্মের অনেক আগে, এবং আবিষ্কর্তা আর কেউ নন স্বনামধন্য আর্কিমিডিস। আর্কিমিডিসের জন্ম একটি শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ। গণিত শিক্ষার জন্য ছেলেকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। সিসিলিতে ফিরে আসার পর এই বিস্ময়কর প্রতিভা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনেক কাণ্ডই

করেছেন। এখানে তার বিস্তারিত কাহিনী ফাঁপার কোনও প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ইনিই সেই বিজ্ঞানী স্নান করতে করতে বাথ-টাবের জল দেখে একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব আবিষ্কারের আনন্দে স্নানের ঘর থেকে কাপড় জামা না পরেই 'ইউরেকা!" "ইউরেকা!" বলে চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই আর্কিমিডিসই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে আবিষ্কার করেন আমাদের এই স্ক্রু। কী হল তো? বাব্বাঃ, ঘাম দিয়ে যেন আমার জ্বর ছাড়ল।

পুজোর মুখে আমি স্ক্রু নিয়ে মেতে আছি দেখে বন্ধুরা তো হেসে খুন। —আর বিষয় পেলেন না আপনি চর্চা করার মতো? তার চেয়ে তো আলু, টম্যাটো কি লঙ্কাই ছিল ভাল। তাঁদের কে বোঝাবে যে, আমি স্বেচ্ছায় স্ক্রু আর স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করিনি। তার জন্য দায়ী আমাদের পাশের বাড়ির সেই নবীন যন্ত্রবিদ ছেলেটি আর আমার স্ত্রী। সে যদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ স্ক্রু-ড্রাইভার চেয়ে না বসত, এবং আমার স্ত্রী যদি জাদুকরীর মতো তৎক্ষণাৎ তার হাতে এক ডজন স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে দিতে না পারতেন তা হলে কি আর আমি এই ফাঁদে আটকে পড়ি? একজন বন্ধু তো সরাসরি বলেই ফেললেন কথাটা। বললেন, আমি সেদিনই বুঝেছি যে আপনার মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে এসেছে যেদিন আপনি লাইব্রেরিতে গিয়ে এনসাইক্লোপেডিয়া ঘাটতে শুরু করেন। আরে ভাই, খড়ের গাদায় কি আর কেউ সুঁচ খুঁজে পায়? মাথার স্ক্রু ঢিলে না হলে কি কেউ এমন একটা রসকষহীন বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন কাটাতে পারে?

আহা, সত্যই যদি তা হত? যদি সত্য সত্যই আমার মাথার স্ক্রু ঢিলে থাকত! স্ক্রু-ঢিলে কথাটা আমরা বড়ই লঘুভাবে ব্যবহার করি। যাকে বলে—ঢিলে-ঢালে ব্যবহার। সভ্য বাংলায় তথাকথিত ওই স্ক্রু-ঢিলা লোকেদের বলা হয় ছিটগ্রস্ত। কেউ কেউ আরও মজা করে বলেন—ছিটস্থ। অনেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে দুই আঙুলে স্ক্রু-ড্রাইভার-এর নকল করে হাসি হাসি মুখে বোঝাবার চেষ্টা করেন লোকটির মাথার স্ক্রু ঢিলা। কিংবা আলগা। অন্যরা ভব্যতা দেখিয়ে হাসি চাপেন বটে, কিন্তু ইঙ্গিতটা উপভোগ করেন।

আসলে স্ক্রু-ঢিলা মানুষ মোটেই সহজলভ্য নয়। প্রকৃত স্ক্রু-ঢিলাদের দেখা মিলে দৈবাৎ। আমার স্ক্রু-ঢিলা হওয়ার যোগ্যতা কোথায়? আমি একজন সামান্য সাংসারিক মানুষ। আরও খোলাখুলি বললে সমাজের বংশবদ মানুষ। প্রচলিত প্রথার বাইরে পা বাড়াবার সাহস আমার নেই। অন্যভাবে বললে আমি ষোলো আনা প্রাতিষ্ঠানিক মানুষ। প্রতিষ্ঠানের দাসানু-দাস। ইংরেজিতে যাকে বলে "কগ্ ইন দ্যা হুইল," আমি তা-ই।

সত্যকারের স্ক্রু-ঢিলা মানুষ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। তাঁরা যাকে বলে "স্কোয়ার পেগ ইন অ্যা রাউন্ড হোল", কিংবা "রাউন্ড পেগ ইন স্কোয়ার হোল।" অর্থাৎ, গোলাকার গর্তে চৌকো পেরেক, কিংবা চৌকো গর্তে গোলাকার পেরেক। একেবারেই উল্টো ব্যাপার, একের সঙ্গে অন্যের হু-বহু মিলে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। স্ক্রু-ঢিলা শুধু চলতি কেতা, প্রথা এবং রীতিনীতির বিরোধী নন, তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, তাঁরা ভিন্নপথের পথিক। কখনও কখনও সে পথ যুগান্তকারী। হয়তো বা বৈপ্লবিক। সেইসব স্ক্রু-ঢিলারা আসলে একধরনের "হেরেটিক", তারা প্রচলিতকে ধ্বংস করে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চান। যথা :

ডারউইন মার্কস, গান্ধী—ওঁরা। আবার এমন অনেক স্ক্রু-ঢিলা মানুষ সব দেশে সব যুগেই থাকেন বা আছেন যাঁরা ওই বর্গের না-হলেও, ব্যক্তিত্ব যাঁদের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এডিথ সিটওয়েল-এর "দ্য ইংলিশ একসেন্ট্রিক্স" বইয়ে সমাজের নানা ক্ষেত্রে যেসব ছিটগ্রস্ত মানুষ নানা অবদান রেখে গেছেন তাঁদের বেশ কিছু কাহিনী রয়েছে। আমাদের দেশেও সে-ধরনের মানুষ কি আদৌ নেই?

নিশ্চয়ই এখনও আমাদের এই হট্টমেলার দেশে এমন কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বিদেশি জুতা, বুকে স্টিকারওয়ালা জামা, দেখতে পুরানো আসলে দামি নতুন জিন্স, বিদেশি রোদ-চশমা, সেল্যোফোন, ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভি সেট কিংবা কলকাতার রাস্তা অনুপাতে নিতান্ত বেঢপ বিশাল গাড়ি, কিংবা আমেরিকার গ্রিন-কার্ডের স্বপ্ন নিয়ে মগ্ন নন। টিভি, খবরের কাগজের রঙিন বিজ্ঞাপন, রঙিন খাবারের ডিস, রঙ্গিনী নটীবৃন্দ দেখে মাঝে মাঝে যাঁরা পাগল মেহের আলির মতো চেঁচিয়ে উঠেন—"সব ঝুটা হ্যায়!—সব ঝুটা হ্যায়!" এই মুহূর্তে আমি হয়তো তাঁকে জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি আছেন। এই স্ক্রু-ঢিলা বাঙালি; কিংবা ভারতীয়। একজন দু'জন মাত্র নয়। হয়তো আছেন অনেকেই। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। বিশেষত, এই স্ক্রু-ঢিলার দল আসলে বহন করে চলেছেন এক মহান উত্তরাধিকার।

পৃথিবীর আদি স্ক্রু-ঢিলা মানুষ বোধহয় সিনোপের ডায়োওজেনিস। (৪০০-৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। অ্যাথেন্স-এর "কুকুর-দার্শনিক" যিনি সহজতম জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন, যা স্বাভাবিক তাই কাম্য। তিনি কোনও প্রতিষ্ঠানের—তা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যাই হোক না কেন,—তোয়াক্কা রাখতেন না। বাজার, বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্য কোনও কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করত না। তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা বলতেন, "আমরা কোনও কিছুই কামনা করি না, সুতরাং, আমাদের কোনও অভাব নেই।" লোকেরা দেখে বলতেন,—"অ্যারিস্টটল প্রাতরাশ করেন তখনই যখন রাজা খুশি হন। ডায়োওজেনিস প্রাতরাশ করেন তখনই যখন ডায়োওজিনিস তা করতে ইচ্ছা করেন।" একবার আলেকজান্ডার এই বিদ্রোহীর কাছে গিয়ে সবিনয়ে বলেছিলেন,—"বলুন আপনার কী চাই। —কীসে আপনি খুশি হবেন।" ডায়োওজেনিস উত্তর দিয়েছিলেন,—"সূর্যকে আড়াল করো না, আমার আমার সামনে থেকে সরে যাও।"

এমন স্ক্রু-ঢিলা মানুষ কি সামান্য মানুষ? তিনি কি ছিটগ্রস্ত? না বিদ্রোহী এক মানব সন্তান?

পালাতে পালাতে পালাতে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

ক-দিন ধরেই ছেলেটিকে লক্ষ করছিলাম। লক্ষ করছিলাম বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। চোখে পড়ে যাচ্ছিল। আমি তো ঘরেই বসে থাকি, আমার টেবিলে।

বড় টেবিল। টেবিলের দু-পাশে গোছা গোছা ফাইল। তিনটে টেলিফোন। আমার চেয়ারের পাশে একটা ট্রলি তাক। কোনও তাকে ফাইল। কোনওটাতে বইপত্র, যেসব বই হাতের কাছে না থাকলে কাজ করা যায় না। নানা রকম ডিকশনারি। গভর্নমেন্ট অর্ডারের বই। ইউ-জি-সি-র নিয়মকানুন। রাজ্যের সব ইউনিভারসিটির আইন ও স্ট্যাটিউট। পেছনদিকে, একপাশ ঘেঁষে কম্পিউটার এবং ফ্যাক্স মেশিন।

টেবিলের বাকি তিনদিকে চেয়ার। পাশাপাশি সাজানো আরামপ্রদ চেয়ার। আমি আসার পরই বদলেছি চেয়ারগুলো। লম্বা সময় ধরে মিটিং চলে কমিশনের। একটু আরাম করে বসতে না পেলে মেমবাররা কাজ করবেন কী করে? ঘরটা এ.সি করার জন্যেও লিখেছি। এ.সি এখন আর শৌখিনতা নয়, কাজের স্বার্থেই প্রয়োজন। গরমে ঘামতে ঘামতে গলে যাওয়া যায়, কাজ করা যায় না। এ.সি-তে এফিশিয়েন্সি বাড়ে। তাতে প্রতিষ্ঠানেরই লাভ। কিন্তু সরকারকে কে বোঝাবে সে কথা? কার ঘরে কোথায় পড়ে আছে প্রোপোজালটা কে জানে?

দরজার দিকে মুখ করেই বসতে হয় আমাকে। বিশাল দরজা। সুইংডোরের ওপর দিয়ে বাইরের বারান্দায় কড়িবরগা দেওয়া ছাদের অনেকটা দেখা যায়। তলা দিয়েও দেখা যায় খানিকটা। দেওয়ালঘেঁষা বেঞ্চে কারা বসে আছে দেখা না গেলেও তাদের অনেকেরই পায়ের খানিকটা দেখা যায়। হাঁটুর তলা থেকে পা পর্যন্ত।

সুইংডোর ঠেলে কেউ ঢুকলেই দেখা যায় পুরো বারান্দাটা। বারান্দা পেরিয়ে উলটো দিকের ঘরের দরজাও। সেই দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটি। প্রথমে চোখ পড়েনি। দরজা বারকয়েক খোলা-বন্ধের পর খেয়াল হল দেয়ালে একই জায়গায়, একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। তারপর সারাদিনে যতবার যতজন এল, দেখি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। এ ঘরের দিকে তাকিয়ে।

পরের দিন ছেলেটি বসেছিল বারান্দার বেঞ্চে। আগের দিন হয়ত বসার জায়গা পায়নি। আমি সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শুধু সে-ই উঠে দাঁড়াল। আমি একঝলক তাকিয়ে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বসতে বলে ঘরে ঢুকে গেলাম। ও যে আগের দিনের ছেলেটি তা হয়ত বুঝতে পারতাম না। বুঝলাম তার পোশাকে। গাঢ় বেগুনি রঙের প্যান্ট, হালকা হলুদ শার্ট। আগের দিনও তা-ই পরেছিল।

সেদিন যতবার দরজা খুলল, দেখি বেঞ্চে সেই জায়গাতেই বসে আছে। আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে। সারাদিনই বসে রইল। সেদিন আমার তাড়া ছিল। বিকাশ ভবনে মিটিং।

রাইটার্সেও যেতে হবে। জোকাতে একটা সেমিনার। ঘর থেকে বেরিয়েছি, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। আবার আমি হাতের ইশারায় বসতে বললাম, এবং তখনই প্রথম লক্ষ করলাম তার মুখটা। মুখটা কেমন চেনা চেনা লাগল। ঠিক মনে করতে পারলাম না।

মনে করতে পারলাম না, কিন্তু ভুলতেও পারলাম না। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, গাড়িতে একা যেতে যেতে ঘুরেফিরেই মুখটা মনে পড়তে লাগল। লম্বাটে মুখ, নাকের নীচে গোঁফ, নাকটা টানা, শ্যামলা রঙ, মাঝারি দুটো চোখ। কেমন বিষাদের ছাপ সারা মুখে।

ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর। মুখটা চেনা। নিশ্চয়ই চিনি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। মনে না পড়া পর্যন্ত অস্বস্তিটা যাবে না। মুখটাও যাবে না।

পরের দিনও দেখলাম ছেলেটিকে। বসে আছে। পরনে একই পোশাক। মুখে একই বিষাদ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার ঘরের দিকে।

সেদিন রাত্রে বিছানায় উঠে আলো নেভাতে যাব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ক-মাস আগেই ছেলেটিকে পোস্টিং করা হয়েছে। নন্দীগ্রামে না মাথাভাঙায়, নতুন একটা কলেজে লেকচারার করে পাঠানো হয়েছে। ছেলেটির হওয়ার কথা নয়। তার আগে বেশ কয়েকটা নাম ছিল প্যানেলে। ওদের প্যানেলের আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে। নতুন প্যানেল তৈরির পরীক্ষাও হয়ে গেছে। ইন্টারভিউ চলছে। নতুন প্যানেল তৈরি হয়ে গেলেই ওদের প্যানেল বাতিল হয়ে যাবে। সেই সময় চাকরিটা হয়ে গেল ওর।

ওর আগে যারা ছিল একজন ছাড়া সকলেই মেয়ে। অমন দুর্গম গ্রামের কলেজে একটা মেয়েকে পাঠানো যায় না। একটিমাত্র ছেলে ছিল। জায়গাটার নাম শুনেই সে পিছিয়ে গেল। তার কলকাতাতেই চাই। অন্তত কলকাতার কাছাকাছি কোথাও। সেই সময়েই ছেলেটি এসে ধরেছিল একজন মেমবারকে। একেবারে মরিয়া হয়ে।

একটা ভেকান্সি আছে বটে, কিন্তু তুমি কি যাবে সেখানে?

আমি যে-কোনও জায়গায় যাব, স্যার।

জায়গাটার নামও জানতে চায়নি ছেলেটি।

ভেবে দেখো বাপু, বেশ কয়েকজনকে সুপারসিড করে....

ভাবার কোনও সুযোগই নেই, স্যার। একটা কাজ আমার চাই-ই।

মেমবার তাকে নিয়ে আমার ঘরে এসেছিলেন। আমি সেক্রেটারিকে ডেকে বলে দিয়েছিলাম তার নামটা কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে চিঠির একটা কপি ছেলেটিকে দিয়ে দিতে। তবে তার আগে অন্য ছেলেটির কাছ থেকে যেন রিফিউজ্যালের চিঠিটা নিয়ে নেওয়া হয়। কার কখন মাথায় কী ঢুকবে, চলে যাবে কোর্টে। ব্যস, সব কাজ বন্ধ। কোর্টকে তো আর এতগুলো কলেজ চালাবার হ্যাপা সামলাতে হয় না।

পরের দিন কাজ সারতে সারতে সন্ধে হয়ে গেল। প্রচুর ফাইল জমে গিয়েছিল। অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি আর আমার পার্সোনাল স্টাফ শুধু আছি। হঠাৎ দেখি সুইংডোরের ওপাশে একজোড়া পা। খয়েরি রঙের স্যামসন, বেগুনি রঙের প্যান্ট। বুঝলাম সেই ছেলে।

খুব আলতো করে সুইংডোরের একটা পাল্লা সামান্য খুলে উঁকি দেয় একটি মুখের খানিকটা অংশ। আমি মুখ তুলতেই পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যায়। দু-বার এমনি হল।

ওখানে কে?

কোনও উত্তর নেই।

কে ওখানে?

পাল্লাটা, একটা পাল্লা, খুব ধীরে ধীরে খোলে। ছেলেটি এসে দাঁড়ায় দরজায়। কালচে ফ্রেমের ছোট চশমা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সেই বিষাদ, এলোমেলো চুল, সেই শার্ট, প্যান্টের নীচে গোঁজা, কোমরে বেলট্। বেশ লম্বা ছেলেটি। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

কী ব্যাপার? কী চাই?

একটু আসব, স্যার?

এসে তো পড়েইছ। কী চাই কী তোমার?

ছেলেটি প্রায় ছুটে আসে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই টেবিলের বেড় দিয়ে আমার পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমাকে বাঁচান স্যার, আমাকে বাঁচান।

আমি হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াই।

করো কী, করো কী, ওঠো ওঠো।

ছেলেটা ওঠে না, টেনে তুলতে হয়। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, হাঁপায়।

বসো, বসো।

টেবিলের পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে আমি বলি। সে বসতে চায় না। আমি জোর করে বসাই।

জল খাবে?

আমার জলটাই দিই। পুরোটাই খেয়ে নেয় ছেলেটি।

কী হয়েছে কী? চাকরি তো পেয়ে গেছ। তা হলে আর.....

মুখ নিচু করে নীরবেই বসে থাকে ছেলেটি।

না বললে আমি বুঝব কী করে?

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ছেলেটি। আরও একবার জল খায়। হাত দিয়ে মুখের জল মোছে। কপালের ঘাম মোছে। তারপর বলে, ওই কলেজে থাকলে আমি মরে যাব স্যার। আমাকে অন্য কোথাও দিন স্যার। ওখানে থাকতে হলে আমার সব শেষ হয়ে যাবে।

কেন? শেষ হয়ে যাবে কেন? কী হয়েছে?

আরও কিছুক্ষণ মুখ নিচু করেই চুপ করে বসে থাকে ছেলেটি। তারপর বলতে আরম্ভ করে। বলতে বলতে কখনও থামে, আবার কখনও বলে যায় অনর্গল, কখনও থেমে জল খায়, কখনও ঢোক গিলে গিলে বলে। মাঝে মাঝে একেবারে নীরব হয়ে যায়, যেন ভাবে অনেক কিছু তারপর আবার বলতে থাকে।

আমি স্যার ঠিক দিনেই পৌঁছেছিলাম। ট্রেনে ঘণ্টাতিনেক লাগে। স্টেশনে নেমে বাস। ঘণ্টা আড়াই। বাস থেকে এক ছোট গঞ্জে নেমে ভ্যান-রিকশা করে গিয়ে একটা নদী। পঞ্চাশ-

পঞ্চান্ন মিনিট। সেখানে ফেরি পেলে ফেরিতে, নয়ত নৌকা ভাড়া করে নদী পেরোতে হয়। তারপর হাঁটা। অল্পই, মাইলখানেক। সত্যি কথা বলতে কী, স্যার, যত কঠিন ভেবেছিলাম, তত কঠিন নয়।

পরের দিন থেকেই ক্লাশ নিতে আরম্ভ করলাম। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই অল্প। লেকচারারের সংখ্যা তার তুলনাতেও কম। আমাকে নিয়ে দু-জন হোলটাইমার। আর সবাই পার্টটাইমার। আশেপাশের স্কুলের টিচার। সে যাই হোক, ভালোই চলছিল। পড়াতেও ভালো লাগছিল। ছেলেমেয়েরা যে খুব ইন্টেলিজেন্ট তা নয়। কিন্তু খুব আগ্রহী।

তা হলে তোমার অসুবিধাটি কী?

অসুবিধা নয় স্যার, বিপদ। ভয়ংকর বিপদ।

বিপদ। কীসের বিপদ?

পঞ্চায়েতের প্রধান স্যার।

পঞ্চায়েত প্রধান? এর মধ্যে সে আসছে কোত্থেকে?

আসছে স্যার, ভীষণভাবে আসছে। তার জন্যই আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

পালিয়ে আসতে হয়েছে? বলতে গিয়েও বলি না আমি। চুপ করে থাকি। জেরা করে লাভ নেই। তাতে আরও গুলিয়ে যাবে। তার চেয়ে ও নিজেই বলুক যা বলার।

প্রথমে গিয়ে প্রধানের বাড়িতেই উঠতে হয়েছিল। ওখানেই থাকা, ওখানেই খাওয়া। কিছুদিন পরে আমার পীড়াপীড়িতে কলেজের একটা ঘরে একটা চৌকি ফেলে থাকার ব্যবস্থা হল। গ্রামে তো আর ঘরভাড়া পাওয়া যায় না। প্রধানও চায় না আমি অন্য কারও বাড়িতে থাকি। ফলে ঘর থাকলেও দেবে না কেউ। কলেজের সে ঘরটা পুরোপুরি তৈরি হয়নি। দেয়াল প্লাস্টার, মেঝে-টেঝের কাজ বাকি। কবে হবে কেউ জানে না। ঘরটা ব্যবহার হয় না, পড়ে থাকে।

থাকার ব্যবস্থা নিজের মতো করা গেলেও খাওয়ার ব্যবস্থা আগের মতোই রইল। প্রধানের বাড়িতে। ধারে কাছে কোনও হোটেল-টোটেল নেই। আমি নিজেই হয়ত স্টোভ আর কুকারে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারতাম, কিন্তু প্রধান কিছুতেই তা করতে দেবেন না। এ নিয়ে কোনও কথাই তিনি শুনতে চান না, বলতেও দেন না। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আরও ঝামেলা। কথাটা তুলতেই তিনি প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

কেন বাবা, এখানে কি তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে?

না, না, ছি, ছি, সেকথা নয়। আপনারা যেরকম যত্ন করছেন, চারবেলা যতসব করে করে খাওয়াচ্ছেন, জীবনে কোনওদিন....

তবে?

কী জানেন? কতদিন আর আপনাদের কষ্ট দেব? এভাবে তো চলতে পারে না।

কষ্ট? কীসের কষ্ট? মা ছেলেকে খাওয়াবে। সোনার টুকরো ছেলে। এতে কি কষ্ট হয়? তোমার মাকে কি এমন কথা বলতে পারতে?

এই জায়গায় তাঁর কথাগুলো কান্না হয়ে যায়। আমি আর এগোতে পারি না। কিছুদিন পরে অবস্থাটা এমন দাঁড়াল, কথাটা তুলতেই প্রধান ধমক দেন এবং তাঁর স্ত্রী ফোঁস করে ওঠেন। আমার কিছু বলার থাকে না। আসলে ওঁদের কাছে চারবেলা খাই। ওঁদের টয়লেট ছাড়া আমার চলে না। স্নান-টানও ওঁদের ওখানেই। এমনকী রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে যে টর্চটা নিয়ে ঘরে ফিরি সেটাও ওঁদের। ওঁদের ওপর আমার নির্ভরতা এমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত যে ধমকাবার এবং ফোঁস করার মতো অন্তরঙ্গতা যেন হয়েই গেছে আমার সঙ্গে। ওটা যেন অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

অন্য সব ব্যাপার যাই হোক, একটা কঠিন বাস্তবিক কারণে ওঁদের ওপর নির্ভর না করে আমার উপায় ছিল না। আমি চিরকাল শহরের ছেলে। ভোরে উঠে মাঠেঘাটে আমি যেতে পারি না। আর গোটা গ্রামে শুধু প্রধানের বাড়িতেই স্যানিটারি ইয়ে আছে। ও বাড়িতে না খেলেও, না থাকলেও, সকালে একবার এবং মাঝে মাঝে দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যায় তো যেতেই হয়, যেতেই হবে ওঁদের ওখানে। যতদিন কলেজের ইয়ে তৈরি না হচ্ছে ততদিন তো আর কোনও উপায় নেই। আর কলেজের কাজ যে কবে শুরু হবে, ভগবানই জানেন।

তবু আমি হাল ছাড়িনি। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর সরকারি অ্যাপ্রুভাল এসে যাওয়ার পর মাইনে এসে যেতেই আমি শেষ চেষ্টা করলাম। একদিন খেয়ে উঠে, প্রধান-গৃহিণীর হাত থেকে মশলা নিতে নিতে, যেন ঘরের ছাদকে উদ্দেশ্য করেই বলে ফেললাম,

তা হলে আমার একটা কথা রাখতে হবে।

কী কথা বাবা?

এখানে যে চারবেলা ভালোমন্দ খাচ্ছি, আমি কিছু দেব, সেটা নিতে হবে।

এ তুমি কী বললে বাবা?

প্রায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন উনি। প্রধান ধমকে উঠলেন, আমার বাড়িটাকে কি তোমার হোটেল মনে হল?

আমি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এসব কথার কি কোনও উত্তর দেওয়া যায়?

বলব কি বলব না করতে করতেও বাংলার এ. কে. এমকে কথাটা বলেই ফেললাম একদিন। অপূর্ববাবুই আমার সিনিয়র হোলটাইমার। বয়সেও আমার চেয়ে বড়। বেশ কিছুদিন স্কুলে পড়িয়ে কলেজে এসেছেন। মাইল পাঁচেক দূরে পাশের পঞ্চায়েতে এক গ্রামে সপরিবারে থাকেন। সাইকেলে যাতায়াত করেন। এখানে কলেজের চার্জে আছেন। একটু গোমড়ামুখো। তবু বলতেই হল। শুনে যেন মুখ টিপে টিপে হাসলেন মনে হল।

কুমড়োটা কোনও প্রস্তাব দেয়নি?

কুমড়ো?

প্রধান! প্রধান!

প্রধান একটু বেঁটে, একটু গোলগাল বটে, বড় একটা টাকও আছে মাথায়, একজোড়া কাঁচাপাকা গোঁফও আছে; তবু কুমড়ো বলাটা.....

ওর মেয়েকে পড়াতে বলেনি?

মেয়ে?

কেন, ওর মেয়েকে দেখেননি?

মনে হল যেন একটি মেয়েকে কখনো-সখনো দেখেছি। তেমন সামনে আসে না। সে যে প্রধানের মেয়ে তা বুঝিনি। আসলে তাকে ভালো করে খেয়ালই করিনি। প্রত্যেকবার খেতে বসে এমন ঋণের দলা গিলতে হয়, অন্যদিকে মন যাবে সে উপায় থাকে না।

দেখেছি, মানে.....ঠিক দেখেছি বলা যায় না।

এবার দেখবেন। ওঁরাই দেখাবেন।

ঠোঁটটেপা হাসি বন্ধ করে, মুখটা আবার গোমড়া করে ক্লাসে চলে গেলেন এ. কে. এম। আমার কেমন ভয় করতে লাগল।

কয়েকদিন পরে রাত্রে খেয়েদেয়ে চলে আসছি, প্রধান বললেন, বসো। তারপর কোনও ভনিতা না করে বললেন, সন্ধের পর তো তোমার কিছু করার থাকে না, মেয়েটাকে নিয়ে একটু বসো। আমার যা কিছু আছে সব তো ওই পাবে। একটু লেখাপড়া না শিখলে....মেয়েটা একটু সাদাসিধে, সরল। ফাঁকিবাজও। তবে মাস্টার হিসাবে তোমার যা সুখ্যাতি শুনি, তুমি পারবে।

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন না প্রধান, যেন তার কোনও প্রয়োজনও নেই, বলেন,

তা হলে কাল থেকেই শুরু করে দাও। ওর ভার তোমাকেই দিলাম আমি।

শেষ কথাটার মানে তখন বুঝিনি। যখন বুঝলাম, খুব দেরি হয়ে গেছে।

মেয়েটিকে পড়াতে গিয়ে দেখি সে শুধুই হাসে। বুঝিয়ে বললে হাসে। মুখস্থ করতে বললে হাসে। বকলেও হাসে। রাগারাগি করলেও হাসে। কেন হাসে বুঝি না। শুধু বুঝি পড়াশোনায় কোনও মন নেই তার। পড়ার ইচ্ছাই নেই। মাঝে মাঝে খেতে বসে প্রধান খোঁজ নেন, কী রকম বুঝছ? বা, এগোচ্ছে একটু? আমি কখনও বলি, ভালোই তো। কখনও বলি, মন্দ কী? কখনও শুধুই, দেখা যাক।

নিয়মিতই বসি মেয়েটিকে নিয়ে। যথাসাধ্য চেষ্টা করি। ভাবি, এদের অন্নের ঋণ কিছু তো শোধ হচ্ছে।

তারপর এক সন্ধ্যায়, আমি যখন তাকে খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝাচ্ছি, মেয়েটি হঠাৎ আমাকে বলল, হাসিমুখেই, খুব গোপনে বলছে এমন ভঙ্গি করে, বলল,

আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে? আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি তার কথা। একটু একটু করে বোধোদয় হতে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম হাঁ করে।

বছর সতেরো-আঠারো বয়স। বিকশিত শরীরে ভরা যৌবন। মুখখানা মিষ্টি। হ্যারিকেনের লালচে আলোতে সে শরীর যেন আরও রহস্যময় দেখায়। মুখখানা মনে হয় যেন অন্য কোনও জগতের। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে আবার। সেই মেয়ে আমাকে বলছে, পুতুল খেলবে? আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে।

পরের দিন রাত্রে প্রধান প্রস্তাব করলেন। আমার মত চাইলেন না। যেন আমার মত পেয়েই গেছেন, বা কোনও প্রয়োজনই নেই আমার মতামতের। বললেন, সামনের সপ্তাহে আমি কলকাতায় যাব। তুমি একখানা চিঠি লিখে দিও। আমি নিজে তোমার বাড়িতে গিয়ে

কথাবার্তা বলে দিনক্ষণ সব পাকা করে আসব।

আমার মাথা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করছে তখন। কিছু বলব সে ক্ষমতাই হারিয়ে গেছে। চোখের সামনে আবছা লালচে আলোতে ভাসছে অন্য জগতের একটা মুখ। কানের কাছে ঢাকের বাদ্যির মতো শুধু বাজছে, আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে?

পরের সপ্তাহে প্রধানের কলকাতায় যাওয়া হল না। তার আগেই গ্রামে ডাকাত পড়ল থানা, পুলিশ, হেলথ সেন্টার করতে করতেই কেটে গেল এক সপ্তাহ। পরের সপ্তাহেই শুরু হল গ্রামে গ্রামে মিটিং। ডাকাতরা যে তাঁর বিরোধী পার্টির আশ্রয়পুষ্ট এবং এ ডাকাতি যে তাঁর পার্টির বদনাম করার এক গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তেরই ফল, সেই কথাটাই প্রচার করা হতে লাগল দিনের পর দিন। বিরোধী পার্টিও বসে রইল না। তারাও মিটিং ডেবে ডেকে বলতে লাগল, এ ডাকাতরা প্রধানের দলের শেলটারেই আছে। একটা সহজবোধ প্রমাণ তারা দাখিল করে দিল। যত বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে তার 'মেজরিটিই' তাদের পার্টির বাড়ি। এর ফলে প্রধানের পার্টিকে প্রচার আরও জোরদার করতে হল। প্রধানকে আরও উঠে পড়ে লাগতে হল। তাঁর আরও সময় যেতে লাগল, আরও পরিশ্রম হতে থাকল

কিন্তু অত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে ভোলেননি তিনি। তাঁর নির্দেশে একজন লোক আমার ঘরের সামনে বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে, মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে লাগল। প্রত্যেক রাত্রে। ঘুমোবার আগে দরজায় খটখট করে, আমি আছি দেখে নিয়ে, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে নেবেন স্যার, বলে তবে সে হ্যারিকেন নিভিয়ে মশারিতে ঢোকে।

আমার নিরাপত্তার জন্যেই এ ব্যবস্থা। ডাকাতের প্রাদুর্ভাব। তার ওপর আছে বিরোধী পার্টি।

দিন দুই পরে আমার কেমন মনে হল, আমি যেখানেই যাই, জনা-দুই লোক আমার পেছন পেছন যায়। মনে হওয়াটা ঠিক, নাকি আমারই মনের বিকার, বোঝার জন্যে একদিন গ্রাম ছাড়িয়ে মাইলখানেক গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে খানিকটা যেতেই মুখোমুখি পড়ে গেল তারা। একজন দ্রুত নেমে গেল মাঠে। আর একজন সরতে পারল না। তার আগেই দেখে ফেললাম, লিকলিকে লম্বা। টকটকে লাল চোখ। হাতে বাঁশের লাঠি। আমার সিকিওরিটি

দিনকয়েক পরে একদিন দুপুর নাগাদ ক্লাশ শেষ হয়ে যেতে আমি নদীর দিকে রওনা দিলাম। নদীর পাড়ে পৌঁছে দেখি ফেরি নৌকো ভিড়েছে। লোকজন নেমে ওপরে উঠে আসছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম তাদের নামা, ওঠা। তারপর কী ভেবে কিংবা হয়ত কিছু না ভেবেই নদীর ঢাল বেয়ে নামতে আরম্ভ করলাম। কয়েকটা স্টেপ যেতেই হঠাৎ একটা লাঠি আমার পথ আটকাল। সেই লাঠি। পাশ ফিরে দেখি সেই লিকলিকে লম্বা চেহারা, লাল টকটকে চোখ। পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল,

কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?

টকটকে লাল চোখ বলল,

চলুন, কলেজে ফিরে চলুন।

বলে লোকটা হাসল। তার দাঁতগুলোও লাল। হাসিটা নির্বোধের। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নির্বোধেরও নিজস্ব একটা চতুরতা থাকে। সেই চতুরতা খুব বিনীতভাবে বলল,

এ জায়গাটা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়, স্যার। চলুন!

সারাক্ষণই বাঁশের সেই লাঠিটা নদীর সমান্তরাল হয়ে আমার বুকের সামনে রইল।

ফিরে এলাম। ফেরার পথেই অন্ধকার নামল। এত দ্রুত বিকেলের আলো মিলিয়ে গেল, এমন ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নামতে লাগল আকাশ থেকে, আমার চতুর্দিকে যেন অমাবস্যা। শ্মশানের অমাবস্যা। সেই অন্ধকার আমার বুকের ওপর চেপে বসল। চোখ-কান-নাক দিয়ে আমার ভেতর ঢুকে পড়ল। আমিই যেন অন্ধকার হয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই চৌকির ওপর লুটিয়ে পড়লাম। তখন গলগল করে ঘাম ঝরছে আমার সমস্ত শরীর থেকে। আমার নিরাপত্তা নয়। আমি বন্দী। ভয়ে আমার ভেতরটা তখন শুকিয়ে এমন কাঠ হয়ে গেছে, মনে মনেও আমি উচ্চারণ করতে পারছি না, আমি বন্দী। আসলে বন্দী। অন্ধকারে বন্দী।

এই অবস্থায় কোনওমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি স্যার। এখন আপনিই আমার ভরসা। আমাকে বাঁচান, স্যার।

ছেলেটি যে ঠিক এইভাবেই, পরপর, ঠিকঠাক গুছিয়ে কথাগুলো বলছিল বা বলতে পারছিল, তা নয়, তবে এই কথাই সে বলছিল। আমি প্রায় হতবাক হয়ে শুনছিলাম। আমার অফিসে, আলো ঝলমল এই নিরাপদ ঘরেও যেন ছেলেটির ভয়, ভয়ের অন্ধকার প্রবল হয়ে ঘরটা ভরে তুলছিল। আমারও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ছেলেটি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ সরিয়ে, মুখ নিচু করে বসে রইল, নীরবে।

তা তুমি পালালে কী করে?

এ. কে. এমের সাহায্যে, স্যার। তিনি না থাকলে ওই গ্রামেই আমার সব শেষ হয়ে যেত।

হ্যাঁ—, কিন্তু এলে কীভাবে?

এ. কে. এম যে পঞ্চায়েতে থাকেন সেখানকার প্রধানই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাউনে মাইল দুয়েক দূরে একটা নৌকো রেখে দিয়েছিলেন। আমি শেষ রাত্রে উঠে হাঁটতে হাঁটতে ...তখন তো পাহারা তেমন.....

ও! তার মানে পাশের পঞ্চায়েতের প্রধান তোমাকে খুবই সাহায্য করেছেন।

খুব, স্যার। তাঁর সাহায্য না পেলে কিছুতেই আসতে পারতাম না।

আমি কিছু বলি না। চুপ করে বসে থাকি। ভাবি।

তা তুমি তাঁর শেলটারে চলে গেলেই তো পারো। সেখান থেকে কলেজ করবে। ওই ছেলেটি যেমন করে। সাইকেল চালাতে জানো তো?

তা জানি। উনিও সে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্যার....

আমি অপেক্ষা করি।

ওখানেও একটা অসুবিধা আছে, স্যার।

কী রকম?

ওই প্রধানেরও একটি মেয়ে আছে স্যার। বিবাহযোগ্যা।

একথা শুনে আমার হাসি পাওয়া উচিত। হো হো করেই হেসে ওঠার কথা আমার। বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলেই, এমনকী আছে শুনলেই যদি পালাতে হয়, শেষ পর্যন্ত পালাবে কোথায়? বিবাহযোগ্য মেয়ে নেই এমন গ্রাম পাওয়া যায় নাকি? তবু আমি হাসি না। বস্তুত আমার হাসি পায় না।

এ জগতে সকলেরই কিছু প্রয়োজন থাকে, কিছু দায় থাকে। কন্যাদায় বা অন্য কোনও দায়। দায় না থাকলে, থাকে আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, ছোট, মাঝারি, বড়, নানা ধরনের আকাঙ্ক্ষা নানা জাতের বাসনা। সেই দায় আর আকাঙ্ক্ষা আর বাসনা মেটাবার জন্যে মানুষ অন মানুষের দুর্বলতা, অসহায়তা বা তার বাসনা-আকাঙ্ক্ষা-দায়কে ব্যবহার করে। সবাই হয়ত ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু অনেকেই তো পেরে যায়। যে শক্তিধর, যে ওপরে আছে সে তো প্রায়শই পেরে যায়। এইটেই তো মানুষের সমাজের নিয়ম। শুধু মানুষের বা কেন সমগ্র জীবজগতেরই নিয়ম।

ছেলেটির নতমুখের দিকে তাকিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে বহুদিন পরে মনে পড়ে যায় যেন হঠাৎই, আমাকেও তো একদিন আমার অন্তরঙ্গ সহপাঠিনীকে ত্যাগ করে আমা ডক্টরেট থিসিসের গাইডের মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছিল।

তুমি এক কাজ করো।

ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার চোখদুটো চকচক করে।

বলুন, স্যার।

সামনের সপ্তাহে মঙ্গলবার, না মঙ্গলবারে নয়, মঙ্গলে মঙ্গলে আমাদের কমিশনের মিটিং থাকে, তুমি একেবারে বিষ্যুৎবারেই এসো। দেখা যাক কদ্দূর কী....

বাঁচালেন, স্যার। আপনার ঋণ আমি কোনওদিন ভুলব না। আমি যদি কোনওদিন আপনার কোনও কাজে.....

বলতে বলতে ছেলেটি আমার পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে। প্রণাম করে।

আরে করছ কী? আগে দেখা যাক কী করা যায়। তুমি এখনই ধরে নিও না.....

আমি আরও অনেক কিছু বলি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিষণ্ণ মুখ, এলোমেলো চুল, চকচ করছে শুধু একজোড়া চোখ। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে যে কথাটা আমি বলতে প না, বলি না, তখনই বলি না, তা হল আমারও একটি কন্যা আছে। বিবাহযোগ্যা।

আর একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিবরণ

অমর মিত্র

:ক যেন বলেছিল ভুবন সান্যালকে, জীবন খুব ছোট। ছোট জীবনের চাহিদা কিন্তু ছোট য়। কম নয়। সবচেয়ে বড় চাহিদা হল ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছনো। ক্ষমতাবান না হয়ে উঠতে পারলে কোনো চাহিদাই মেটে না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ক্ষমতার চাকরি। ক্ষমতাই যারো ক্ষমতার জন্ম দেয়, অর্জন করে নিতে দেয়। ভুবন সান্যাল ধীরে ধীরে উপরে উঠছেন। বে তাড়াতাড়ি এস. ডি. ও হবেন। তারপর আরো উপরে—উপরে। বহুদূর যাবে ভুবন।

ভুবনকে এক সন্ধের পর জেলাশাসক ডেকে বলেন, শ্রীপুর থানায় যেতে হবে, পুলিশ কাস্টডিতে একজন মারা গেছে, রিপোর্ট দেবেন।

রাতে যাব স্যার?

হ্যাঁ এখনই ইনকোরেস্ট্ করে নেওয়া ভালো, এস. ডি. পি. ও তন্ময় মজুমদার আছে সেখানে। তার কাছেই সব বুঝে নিতে পারবেন।

ভুবন গিয়েছিল। রাতে এই ধরনের তদন্ত হয় না, তবু গিয়েছিল। জেলাশাসক বলছেন তা। শ্রীপুর থানার এক উঠতি মস্তানকে তুলে এনে পিটিয়ে মেরে দিয়েছিল এস. ডি. পি. ও তন্ময় মজুমদারের ড্রাইভার গদাই মিদ্দে। ভুবন প্রায় কিছুই না জেনে, পুলিশ কাস্টডিতে মৃত্যু এইটুকু জেনে নিয়মরক্ষার তদন্তে রওনা হয়েছিল। বাইরে নভেম্বরের অন্ধকার। প্রায় নিঃশব্দ পৃথিবী, শহরতলি। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত এই সমস্ত মৃত্যুতে র গুরুত্বপূর্ণ। ভুবন থানায় পৌঁছেছিল রাত ন'টা নাগাদ। দেখা হয়েছিল এস. ডি. পি. তন্ময় মজুমদারের সঙ্গে। তাকে চিনত ভুবন। রোগা, মাথায় প্রায় ছ-ফুট। তীক্ষ্ণধী ই আই. পি. এস সবে তার চাকরি জীবন আরম্ভ করেছে। তন্ময় মজুমদারের শরীরে ল রক্ত। তার শ্বশুর বিমল দাশগুপ্ত সিনিয়র আই. এ. এস, বাবা হিরন্ময় মজুমদার ছিলেন মুখ্যাস্থপতি। বড় ভাই ডাক্তার, থাকেন যুক্তরাজ্যে। তন্ময়ের দিদি বিবাহের পর কানাডাবাসী। তন্ময়ের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার খুব উজ্জ্বল। পুলিশ সার্ভিসে টপ র‍্যাঙ্কিং, বার পদার্থবিদ্যার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। অতি মেধাবী যুবক, হসীও। এম. এস. সি পড়তে পড়তে বিমল দাশগুপ্তর মেয়ে তার সহপাঠী রঞ্জনা শগুপ্তকে নিয়ে উটি চলে গিয়েছিল। এই রকম কত কথা যে ছড়িয়ে আছে তন্ময়কে র। তন্ময় এইচ. এস-এ সেভেনথ হয়েছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন স্যানালকে উঠে ড়িয়ে আহ্বান করেছিল তন্ময়, আসুন স্যার।

ভুবন সান্যালের বাবা ছিলেন ইস্কুল টিচার। ভুবনের ছেলেবেলা খুব ভালোভাবে কাটেনি। ন ভাই দুই বোনের ভিতরে ভুবনই ক্ষমতার বারান্দায় পৌঁছতে পেরেছে। অন্য ভাইবোন, গ্নীপতি, শ্বশুরমশায়—সবাই খুব সাধারণ মানুষ। ভুবন হাসতে হাসতে বসেছিল তন্ময় মদারের সামনের চেয়ারে, কী হয়েছে বলুন তো?

লোকটা টেঁসে গেছে। বলতে বলতে তন্ময় বড় সাইজের সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, মরেছে ভালো হয়েছে, আ নটরিয়াস ক্রিমিন্যাল, কিন্তু নানারকম ফ্যাকড়া তো আছে।

ও হবেখন, না মারলে পুলিশকে ভয় করবে কেন লোকে। বলতে বলতে একটু থেমে গলায় সম্ভ্রম এনে ভুবন বলেছিল, দাশগুপ্ত সায়েব তো আপনার ফাদার-ইন-ল, ফোন করেছিলেন।

আলাপ আছে?

না। মাথা নেড়েছিল ভুবন।

হয়ে যাবে, দিল্লি থেকে ফোনটা এসেছিল। বলেছিল তন্ময় মজুমদার।

দিল্লি। বিস্মিত হয়েছিল ভুবন।

তন্ময় বলেছিল, টেলিফোনে দিল্লিও যা দর্জিপাড়াও তা।

মোবাইল নাম্বারটা কী করে পেলেন?

বোধহয় ডি. এম সায়েবের দেওয়া।

হতে পারে। সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে গিয়েছিল ভুবন সান্যাল। কী গম্ভীর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর বিমল দাশগুপ্তর। শোনা যাচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি ছেড়ে দেয় তিনি স্টেটে এসে চিফ-সেক্রেটারি হয়ে যাবেন। খুব দক্ষ নামী অফিসার। খুবই ক্ষমতাবান। এরপর হয়ত অবসরের পর ইনিই হয়ে যাবেন কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল, মাঝখানে শোনা গিয়েছিল বিমল দাশগুপ্ত দিল্লিতে ক্যাবিনেট সচিব হয়েই থেকে যাবেন। ওই রকম একটা মানুষ তাকে ফোন করেছিলেন। রাস্তায় গাড়িতে বসেই ফোনটা রিসিভ করেছিল ভুবন। বিমল দাশগুপ্ত শেষে বললেন, কোনো দরকার পড়লে আমাকে জানাবেন মি. সান্যাল, দিল্লিতে এলে যোগাযোগ করবেন।

ইয়েস স্যার।

সার্ভিসের আরম্ভ তো, আমি পুলিশ সার্ভিসে যেতে বারণ করেছিলাম, ওখানে নিয়ত এমন ঘটবে।

ইয়েস স্যার।

ম্যাজিস্ট্রেট-এনকোয়ারিটা ইমপর্টান্ট, আপনি এনকোয়ারিটা ঠিক করে করবেন, শুনলাম সামনেই সাব-ডিভিশন পাবেন আপনি?

ইয়েস স্যার।

কোন সাব-ডিভিশান চান জানাবেন, আমি চক্রবর্তীকে বলে দেব।

গা সিরসির করে উঠেছিল সান্যালের। ফোনটা যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনি আচমকা চলেও গিয়েছিল। জেলাশাসকের কাছে ভুবন সান্যালের সবকিছু জেনেই তাকে ধরেছিলেন বিমল দাশগুপ্ত। নাকি তার সম্পর্কে সব জানিয়েছিল তন্ময় মজুমদার থানাতে বসে।

ভুবন সান্যাল আশ্বস্ত করেছিল তন্ময়কে, বলেছিল, আমি তো ভাবতেই পারি না দাশগুপ্ত সায়েব আমাকে ফোন করতে পারেন।

উনি খুব সিম্পল।

কলকাতায় এলে আলাপ করব, মি. মজুমদার আমার মোবাইল নাম্বারটা আপনি রে

দিন, আপনারটা আমাকে দিন, বডি কোথায়?

লকাপে। এতক্ষণ চুপচাপ ও. সি রামমোহন কুণ্ডু বলেছিল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি ঘরের একধারে দাঁড়িয়েছিল। তার কোনো চেয়ার ছিল না ঘরে। ও. সি নিজের চেয়ারটি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকে এগিয়ে দিয়েছিল।

চলুন দেখব।

আমাকে যেতে হবে? তন্ময় জিজ্ঞেস করেছিল।

না আপনি বসুন, ও. সি তো আছেন।

লক-আপের বাইরে আলো ছিল অপ্রতুল। লক-আপের ভিতবে ষাট পাওয়ারের একটি লালচে আলো জ্বলছিল। লক-আপের বাইরে এক মধ্য-বয়সিনী দাঁড়িয়ে বিনবিনিয়ে কাঁদছিল। ও. সি বলল, ভোলা বিশ্বাসের মা।

বডি আইডেন্টিফাই করেছে?

ইয়েস স্যার।

কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়েছেন?

ইয়েস স্যার।

লক-আপের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকিয়েছিল ভুবন সান্যাল। শীর্ণকায় এক যুবকের দেহ উপুড় হয়ে পড়েছিল। লোকটিকে সন্ধ্যার আগে তুলে এই থানায় আনা হয়েছিল পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ও. সি চাপাগলায় বলেছিল, আমার থানায় হয়ে গেল, অথচ আমি ওকে তুলিওনি, আমি ওর গায়ে হাতও দিইনি।

ভুবন একঝলক দেখে বেরিয়ে এসেছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা উচিত। কিন্তু তার প্রয়োজন কী? রিপোর্ট তো মনে মনে ভাবা হয়ে গেছে। বিমল দাশগুপ্তর শীতল কণ্ঠস্বর তার কানের পর্দায় যেন লেগে গিয়েছিল। নেই নেই করেও এক একজন সরকারি অফিসারের ক্ষমতা অনেক। আর দাশগুপ্ত সায়েবের মতো অফিসার তো ক্ষমতার পাহাড়। কী অনায়াসে চিফ সেক্রেটারিকে চক্রবর্তী বলে অভিহিত করলেন!

ও. সি-কে সে জিজ্ঞেস করেছিল, কে মারল?

কেন্দ ড্রাইভার।

সে কোথায়?

বাইরে গাড়িতে বসে আছে।

সায়েব তখন কোথায় ছিলেন?

আঁজ্ঞে স্যার লক-আপের ভিতরে চেয়ারে বসে।

ওঁর সামনে হয়েছে?

নো স্যার, এসব কি রিপোর্টে থাকবে?

ভুবন সান্যাল হেসেছিল, এসব কি থাকে, উনি দাশগুপ্ত সায়েবের সান-ইন-ল, ওঁর কী হবে, সায়েব আমাকে ফোন করেছিলেন।

ও. সি চাপাগলায় বলেছিল, সায়েব নিজে কখনো মারেন না।

তাহলে?

গদাই মিদ্দে, ড্রাইভারকে দিয়ে কাজটা হয়।

আটকাতে পারলেন না, মরে গেলে সমস্যা তো হয়।

সায়েব বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন, ওঁর নাকি এসব ভালো লাগে।

ভুবন সান্যাল বলেছিল, এসব না করলে, না দেখলে কেউ কি পুলিশ সার্ভিসে উপরে উঠতে পারে, উনি একদিন আই. জি হবেন।

জানি স্যার, আমি থামতে বলেছিলাম গদাইকে, সায়েব আমাকে লক-আপ থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন।

লোকটা নটরিয়াস?

সায়েব বলছেন।

আপনি জানেন না?

নো স্যার, অটো চালায়।

লোকটা চিৎকার করেনি?

মুখে কাপড় গোঁজা ছিল।

হঠাৎ ভুবনের যেন খেয়াল হয়েছিল, এসব কী শুনছে সে? কী প্রয়োজন? অতিরিক্ত কৌতূহল কখনোই ভালো নয়। ভুবন তখন ও. সি-কে বলেছিল, আপনি এসব বলছেন কেন, এসব তো আপনার বলার কথা নয়।

ভয় করছে স্যার।

কেন?

এই রকম মৃত্যু দেখিনি।

ভুবন ধমক দিয়ে উঠেছিল ও. সি-কে। বলেছিল, আপনার বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই, আমিও শুনব না।

ও. সি বিড়বিড় করেছিল, খামোকা মারল, সায়েবও বসে বসে দেখল, ড্রাইভারের সঙ্গে ওর ঝামেলা ছিল, পুরোনো, গদাইও তো ওই পাড়ায় থাকত একসময়।

ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব ভুবন সান্যাল কোনো কথা বলেনি। এস. ডি. পি. ও তন্ময় মজুমদার তখন চুপচাপ বসে বিলিতি ফুটবল দেখছিল ও. সি-র অ্যান্টি চেম্বারের টি. ভি-তে। নিঃশব্দে বল নিয়ে কাড়াকাড়ি হচ্ছিল। ভুবন ঢুকতে আবার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে বলেছিল তন্ময়। লোকটা খুব ভদ্র। সম্মান দিতে জানে। কোন ফ্যামিলি থেকে এসেছে—! মনে হয়েছিল ভুবনের।

ভুবন সান্যাল বলেছিল, এবার তো পোস্টমর্টেমে যাবে।

পুড়িয়ে দিলেই হত। বলেছিল তন্ময়, কার্ডিয়াক ফেলিওরের সার্টিফিকেট তো রয়েছে।

ও. সি বলেছিল, তাহলেও পোস্টমর্টেমে যাবে, নিয়ম তাই।

নিয়ম বোঝাতে হবে না, ভাঙলে কী হবে?

ও. সি মাথা নেড়েছিল, হয় না স্যার, ওর মা রয়েছে লকাপের বাইরে, ঘুঘুডাঙার কিছু লোকও আছে থানার বাইরে। মর্গে পাঠিয়ে দিই, পোস্টমর্টেম হয়ে গেলে পুড়িয়ে দিলে হবে।

ড্রাইভারকে ডাকুন তো। তন্ময় আদেশ করেছিল।

ও. সি লোকটাকে যত নিরীহ মনে হয়েছিল ভুবনের তত নয়। এই মৃত্যু তাকে খুব অস্বস্তিতে ফেলেছে, সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ উপরওয়ালার উপর। ড্রাইভার এলে তাকে দেখেছিল ভুবন। মস্ত চেহারা, পঁচাত্তর থেকে আশি কে. জি ওজন হবে, খুব লম্বা নয়, কিন্তু পোক্ত দেহ। চোখ দুটো লাল। একে দিয়ে এস. ডি. পি. ও আসামি পেটাই করে। এস. ডি. পি. ও তার ড্রাইভারকে বলেছিল, সায়েবের ঘরে কাল কম্প্যুটার উইথ প্রিন্টার দিয়ে আসবি আগরওয়ালের দোকান থেকে, সবচেয়ে দামিটা, আমাকে যেটা পাঠিয়েছে।

ইয়েস স্যার।

আরে না, না। ভুবন মাথা নেড়েছিল।

তন্ময় মজুমদার হেসেছিল, আরে মশায় আমি কি নিজের পকেট থেকে দেব, আর দেবই বা কেন, আপনি গর্ভমেন্ট সার্ভেন্ট, আমিও তাই, শুয়ারের বাচ্চাগুলো ফ্রিতে ব্যবসা করবে, ভোলা মরে গেল, আর কেউ ডিস্টার্ব করবে ওদের?

ভুবন বলেছিল, কালই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব।

এখন লেখা যাবে না?

তখন ও. সি বলেছিল, স্পটেই লিখে দিন স্যার, সই করাবেন তো ওর মাকে দিয়ে?

সই যদি না করে? এস. ডি. পি. ও জিজ্ঞেস করেছিল।

না করলে তাই লিখে দেওয়া হবে, রিফিউজড টু সাইন—বলে হেসেছিল ভুবন। রিপোর্ট লিখেছিল। একটি ইনজুরি দেখা গেছে কপালের কোণে, আর সব স্বাভাবিক। ফোর হেড ইনজুরির কারণ হয়ত গাড়ির রডে মাথা ঠুকে যাওয়া। স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট তৈরি করে ম্যাজিস্ট্রেট চলে এসেছিল। তার গাড়িকে দূর থেকে নিঃশব্দে অনুসরণ করেছিল এস. ডি. পি. ও-র গাড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট দেখেছিল থানার বাইরে রাস্তার ওপারে গাছতলায় ক'টা লোক বসে। তখন শীত আসছে শহরে। ফেরার সময়ে শীত করেছিল ভুবনের।

দুই

সেই থেকে গা সিরসিরে ভাবটা ভুবনের লেগেই আছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ম্যানেজ করতে পারেনি এস. ডি. পি. ও। ডাক্তারটি মাতাল, পচাগলা দেহর সুরতহাল করেই যাচ্ছে বহুদিন ধরে। মাতাল ডাক্তারের রিপোর্টে ভোলা বিশ্বাসের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বেরিয়ে এলে প্রথমেই শ্রীপুর থানার ও. সি রামমোহন কুণ্ডুকে বদলি করে দেওয়া হয় দূর উত্তরবঙ্গের এক অখ্যাত থানায়। থানার লক-আপে মৃত্যুর সমস্ত দায় ও. সি-র কিন্তু রেজিস্টারে গ্রেপ্তারের কোনো উল্লেখই ছিল না। কাগজে ভোলা বিশ্বাসের মা লক্ষ্মীরানী বিশ্বাসের বিবৃতিও বেরিয়ে যায়। ভুবন ভাবছিল কী হল? যে ডাক্তার থানায় এসে 'কার্ডিয়াক ফেলিওর' লিখে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছিল, তার নামে রিপোর্ট যায় মেডিকেল কাউন্সিলে। কাগজে সব বেরিয়ে যেতে থাকে। মৃতের গায়ে সর্বমোট তেত্রিশটা ক্ষতচিহ্ন ছিল, ভয়ানকভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছিল তাকে।

একদিন ও. সি ফোন করেন ভুবন সান্যালের অফিসে। কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি নাকি সাসপেনশন অর্ডার পেয়ে যাবেন খুব শীগগির। ও. সি বললেন, স্যার আমি কুণ্ডু,

শ্রীপুর থানার ও. সি ছিলাম।

ভুবনের মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা। শীত শীত করল। কলকাতায় তখন শীত ঢুকছিল, এখন শীত চলে গেছে। তখন ছিল রাত্রি, এখন বেলা দুপুর। তখন চারদিক ছিল নিঃস্তব্ধ, টি. ভি-র রাগবি খেলাও হয়ে যাচ্ছিল নিঃশব্দে। ভোলা বিশ্বাসের দেহের মতো নিথরতা এসেছিল চারদিকে। এখন অফিস কর্মচঞ্চল, কত লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ভুবন। কোথাও কোনো নৈঃশব্দ্য নেই। কোথাও মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নেই।

ভুবন বলেছিল, আপনি কেমন আছেন?

আপনি আমাকে বাঁচান স্যার, আমি কোনোদিন কোনো পিঁপড়েও মারিনি।

ভুবন চুপ করে ছিল।

আমি সাসপেনড্ হতে যাচ্ছি স্যার।

ভুবন কথা বলেনি।

সমস্তটা আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে বিমল দাশগুপ্তর জামাই। ওই বয়স, অত ভালো রেজাল্ট, কিন্তু কী রকম স্বাভাবিকভাবে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে মানুষ মারা দেখল, ড্রাইভারকে অর্ডার করেছিল মারতে।

ভুবন সান্যাল টেলিফোন কানে বাইরে তাকিয়েছিল। নির্মেঘ আকাশ। একটা পাখিও উড়ছে না। কী রোদ! অথচ গা-টা কেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! তার কি জ্বর আসছে? ভুবনের মনে হয়েছিল জ্বর আসুক। বাড়িতে ফিরে লেপমুড়ি দিয়ে গুড়ি মেরে শুয়ে থাকে সে। লেপের ভিতরের অন্ধকার চাইছিল ভুবন তার চারপাশে।

ও. সি বলেছিল, আপনি সাক্ষী, আপনি বলতে পারেন, আপনাকে সাক্ষী মানব স্যার, আমি একটা পয়সাও খেতাম না পুলিশে চাকরি করে, আমি কোনো অন্যায় করিনি জানত, লোকটাকে তুলে এনে থানায় বসে পেটাল এস. ডি. পি. ও মজুমদার। ভালো লেখাপড়ায়, সেভেনথ্ হয়েছিল এইচ. এস-এ, ফিজিক্স-এ এম. এস. সি ফার্স্টক্লাস—সেই ছেলে অমন নিষ্ঠুর হয় কী করে স্যার?

ভুবন কথা বলছিল না তবুও।

স্যার, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না, থানা কাস্টডির দায় তো আমার উপর পড়ে, আমিই নাকি পিটিয়েছি!

ভুবন টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল। চুপ করে বসেছিল। ওই ঘটনার পর কম্প্যুটার পৌঁছে গিয়েছিল তার বাড়িতে। সবচেয়ে দামি জিনিস। ভোলা বিশ্বাস নাকি বিরক্ত করত ওই এলাকার বড় বড় শো-রুমকে। দুদিন বাদে সকালে আচমকা ফোন এসেছিল তন্ময় মজুমদারের। সে এখন পাশের জেলার এস. পি। জিজ্ঞেস করেছিল, ওই ইডিয়ট ও. সি-টা ফোন করেছিল আপনাকে?

ও তো ইনোসেন্ট, ও তো কিছুই করেনি।

ওপার থেকে তন্ময় মজুমদার ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, কেউই কিছু করেনি, একটা ক্রিমিন্যালকে মারা হয়েছে, না মারলে জ্বালাত।

এখন কী হবে?

কী হবে, আপনাকে আমাকে একসঙ্গে লড়তে হবে মি. সান্যাল।

বুঝতে পারছি না।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তেত্রিশটা ইনজুরি, আপনার রিপোর্টে একটি, তাও হেড ইনজুরি, একটা স্ক্র্যাচের মতো। ওই রিপোর্ট নিয়েই তো লড়তে হবে।

কী বলছেন আপনি?

আজকের কাগজ দেখেছেন, ভোলা বিশ্বাসের মা আমাকে অ্যাকিউজ করেছে, ওদের পিছনে কেউ না কেউ আছে, হিউম্যান রাইট-ফাইট নিয়ে ভাবে তারা।

ভুবন চুপ করে গিয়েছিল। তখন ওদিক থেকে ঠাণ্ডা কন্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, হ্যালো, আমি এস. পি বলছি, আপনি কি শুনছেন?

শুনছি।

আপনার ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, বলবেন যা দেখেছেন তাই লিখেছেন তাই-ই তো?

চুপ করে আছে ভুবন সান্যাল।

শুনছেন?

ভুবন তবু সাড়া দেয় না। কিন্তু তাতে লোকটা থামে না, বলে, আপনি আমার খুব উপকার করেছেন, য়ু উইল গেট রিওয়ার্ড।

ভুবনের শীত করছিল। সে অনেক বাদে জিজ্ঞেস করেছিল, দাশগুপ্ত সায়েব কি কলকাতায় আসেন না?

গতকাল অবধি ছিলেন, আজকের সকালের ফ্লাইটে চলে গেছেন।

আমার সঙ্গে তো আলাপ হল না।

হয়ে যাবে, উনি আপনাকে মনে রেখেছেন, জিজ্ঞেস করছিলেন।

সত্যি? ভুবনের শীত কমে গিয়েছিল।

দিল্লি যান না আপনি?

সুপ্রিম কোর্টে গভর্মেন্টের কেস নিয়ে যেতে হয়।

ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, হ্যাঁ যে জন্য ফোন করেছিলাম, আপনার রিপোর্টই যে সত্য সেইটা প্রমাণ করতে হবে, তাতে ও. সি-ও বেঁচে যাবে হয়ত।

ভুবন সান্যাল বলেছিল, আমাকে আর জড়াবেন না।

জড়িয়ে তো গেছেন।

জড়িয়ে যে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছিল ভুবন। প্রশ্ন উঠছিল রাতে তদন্ত করতে গেল কেন সে? ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের এই ধরনের তদন্ত দিনের আলোয় করতে হয়। বেলা চারটের পর তা কখনোই সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তেত্রিশটা ক্ষতচিহ্ন যেখানে, ম্যাজিস্ট্রেট একটি দেখলেন কীভাবে? তিনি কি ঘরে বসে রিপোর্ট লিখেছিলেন? লাশ নিয়েছিল ভোলা বিশ্বাসের মা। লাশের ছবি তুলিয়েছিল মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন। ক্ষতবিক্ষত দেহের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল।

ভুবন সান্যাল টের পাচ্ছিল তন্ময় মজুমদার যদি বাঁচে তার রিপোর্টেই বাঁচবে। তন্ময়

মজুমদার বেঁচে গেলে দাশগুপ্ত সায়েবের সঙ্গে তার দেখা হবে। ঠিক দেখা হবে। ও. সি রামমোহন কুণ্ডু গ্রেপ্তার হয়ে যায় যদি, আর যদি শাস্তি পায় তবে তো তন্ময় বেঁচে গেল। দাশগুপ্ত সায়েব সেই ব্যবস্থাও করবেন নিশ্চয়। কিন্তু এ-ও তো সত্য মৃত ভোলা বিশ্বাসের মা অভিযোগের আঙুল তুলেছে তন্ময় মজুমদার আর গদাই মিদ্দের দিকে। তারাই তো ভোলাকে নভেম্বরের বিকেলে বাড়ি থেকে টেনে বের করে জিপে তুলেছিল।

একদিন সকালে ও. সি রামমোহন কুণ্ডুর ফোন পায় ভুবন সান্যাল, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি সান্যাল সায়েব।

কেন?

নন বেলেব্‌ল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে আমার নামে।

আপনি কোথায় এখন?

কলকাতায়।

কলকাতায় কোথায়?

বলব না, আপনাকে বিশ্বাস নেই, তেত্রিশটা ইনজুরি, একটা লিখলেন, আপনাকে আমার ভয় করছে, দিনকে রাত করে দিতে পারেন।

ভুবন বলেছিল, কেন ফোন করছেন?

আপনি তেত্রিশটা লিখলেন না কেন?

ভুবন বলল, দেখিনি।

আমি ও. সি শ্রীপুর থানা, আমার দোষ, আমার কাস্টডিতে মারা গেছে, আমিই মেরেছি, আমাকে ফাঁসিয়ে দিল বিমল দাশগুপ্তর জামাই।

না, না, কেস তো চলবে, কারোর কিছু হবে না।

মানুষ মেরেছে কিছু হবে না?

না হবে না, হি ওয়াজ আ ক্রিমিন্যাল, ক্রিমিন্যালকে মারবে ছাড়া কী করবে, ওরকম কেস-টেস হয়।

ও তো ক্রিমিন্যাল ছিল না।

আপনি তো ওদের হয়ে কথা বলছেন।

ক্রিমিনাল হলে মেরে ফেলতে হবে?

ভুবন বলেছিল, এটা পুলিশের ব্যাপার।

পুলিশকে তো আপনি সাহায্য করেছেন, আপনিও তো সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন স্যার, দাশগুপ্তের জামাই যা বলল তা করে দিলেন?

ভুবন চুপ করে গেল।

রামমোহন ডাকল, স্যার শুনছেন, আমি যে-কোনোদিন অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারি, আমার কলিগরা দয়া দেখাচ্ছে আমাকে, আমাকে সময় দিচ্ছে।

কেন?

আমাকে তারা চেনে, তাই।

ভুবন সান্যালের মনে হচ্ছিল রামমোহন অ্যারেস্ট হয়ে যাক। পুরো চার্জটা রামমোহনের

ঘাড়ে পড়ুক। থানার ও. সি প্রমোশন পেয়ে পেয়ে ইন্সপেকটার, তার আর কত ক্ষমতা? বিমল দাশগুপ্ত দাঁড়িয়েছে তন্ময় মজুমদারের পিছনে। তন্ময়ের কী হবে? তার মনে পড়ে গেল বিমল দাশগুপ্তর শীতল কণ্ঠস্বর। ক্ষমতা কতটা থাকলে কণ্ঠস্বর অমন হয়ে যেতে পারে। বিমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে অনেক কথা তার শোনা। ওঁর চাকরির প্রথম দিকে যখন উনি জেলাশাসক ছিলেন, গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে একটা ভিখিরি-ভবঘুরে শ্রেণীর লোককে মেরে দিয়েছিলেন ভোরবেলায়। একঘণ্টার মধ্যে রাস্তা ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলেছিলেন জেলাশাসক। জেলাশাসককে এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্পন্ন হতে হয়। বিমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে সত্য মিথ্যা কত রকম কথা ওড়ে। কতজনকে চাকরি দিয়েছেন। শর্তটি আদিম। অবশ্য চাকরি যারা পেয়েছিল তাদের কেউ পুরুষমানুষ ছিল না। এইসব রটনায়, সত্য মিথ্যায় মানুষটির মহিমাই বেড়েছে শুধু। কী না পারতেন। কোনো কর্মচারী মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে ধরাও পড়ে গিয়েছিল, বিমল দাশগুপ্ত তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধস্তন মহিলা কর্মচারীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ অভিযুক্ত হয়েছিল। বিমল দাশগুপ্ত না বাঁচালে তার তো শ্রীঘরে থাকাই ছিল ভবিতব্য। কয়েক লক্ষ টাকা তছরূপের দায়ে পড়েছিল এক ডেপুটি কালেক্টর এবং ক্যাশিয়র। তাদের চাকরি করতে অসুবিধে হয়নি। একটা নিরীহ লোককে বধ করা হয়েছিল অদ্ভুত কৌশলে। ক্ষমতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল অপরাধ, অপরাধীকে আড়াল করা। ক্ষমতার জোরেই অপরাধীকে নিরপরাধ প্রমাণ করা যায়। তখন অপরাধ আর অপরাধ থাকে না। হয়ে ওঠে ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ।

রামমোহন কুণ্ডু ডেকেছিল, স্যার, আপনার সঙ্গে দেখা করব।

আপনি তো গ্রেপ্তারি এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

আমার কলিগরা আমাকে সময় দিচ্ছে, একটা মানুষ আর একটা মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মারে কী করে স্যার?

এতো আপনারা জানবেন। ভুবন সান্যাল কণ্ঠস্বর কঠিন করে তুলেছিল।

শুধু শুধু একটা লোককে মেরে ফেলা যায়?

ভুবন চুপ করে ছিল।

যখন হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরোয় প্রতিবছর, কী রকম মোলায়েম মুখের ছবি ছাপা হয় খবরের কাগজে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মানুষ মারা দেখে আনন্দও পায় স্যার।

আপনার কিছু বলার আছে?

কত বড় বড় অফিসার, কত বড় বড় ফ্যামিলি, তারা এমন হয়ে যায় কেন স্যার, আমি কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টার হয়েছি আর ছ'মাস বাদে রিটায়ারমেন্ট, এখন অ্যারেস্ট হওয়া মানে এত বছরের চাকরি শেষ, কোনো বেনিফিট পাব না, আমি তো কিছুই করিনি স্যার।

আমাকে বলছেন কেন? অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল ভুবন।

আপনার তো অনেক ক্ষমতা, বাঁচান আমাকে।

আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

আছে, তেত্রিশটা ইনজুরির বত্রিশটা বাদ দিতে পারেন, আপনার কলমই আপনার শক্তি

স্যার। আপনি তো সে রাতে গিয়েছিলেন, যদি বলেন ও. সি থানায় ছিল না, ও সি-কে দ্যাখেননি।

তা কি হয়, আমি তো আপনাকে দেখেছিলাম।

ইনজুরিও তো ছিল তেত্রিশটা, গদাই সিঙ্গে লাথি মেরে লিভার, গল-ব্লাডার, পাকস্থলী সব ফাটিয়ে দিয়েছিল, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছিল সেই ভোলা বিশ্বাসের, আপনি তো বডি দেখলেন না।

দেখেছিলাম।

স্যার যদি দেখে থাকেন, যা দেখেছেন তা লেখেননি, আপনি বলে দিন স্যার ও. সি থানায় ছিল না।

তা হয় না, রাখছি।

আর একটু স্যার, এক মিনিট ভিক্ষে করছি, আমি একটা পয়সাও পাব না, না খেয়ে খেয়ে খেয়ে টাকা জমিয়েছি স্যার, খুনের কেস, সব টাকা সিজ করে নেবে কোর্ট, ফ্যামিলি পথে এসে দাঁড়াবে স্যার।

এসব কেস টেকে না, সব পেয়ে যাবেন।

জগৎসুদ্ধ লোক জেনে গেছে রামমোহন কুণ্ডু একটা লোককে পিটিয়ে মারার জন্য জেল খাটবে, স্যার আমাকে বাঁচান, আমি কোনোদিন দুটো পয়সাও নিইনি কারোর কাছ থেকে, গরিবের ছেলে স্যার, বাবা পড়াতে পারেনি, কনস্টেবল হয়ে ঢুকেছিলাম, আমারও খুব ইচ্ছে ছিল মজুমদার সায়েবের মতো ফিজিক্স পড়ব, আপনার মতো ইতিহাস পড়ব, দাশগুপ্ত সায়েবের মতো বড় অফিসার হব, মানুষ কত কী চায়, কিচ্ছুই পায় না, কেউ কেউ সব পেয়ে আরো বেশি পেয়ে যায় স্যার, আমি শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চাই স্যার।

ভুবন ফোন নামিয়ে রেখেছিল। এরপর দিন তিনেক বাদে রাত তিনটা নাগাদ ফোন এসেছিল তন্ময় মজুমদারের। জড়ানো গলা, কিন্তু তাতে উল্লাস ফুটে বেরোচ্ছিল। নেশা করে আছে এস. পি। বলেছিল, ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব, কুণ্ডুটা সুইসাইড করেছে।

রামমোহন কুণ্ডু, ও. সি?

হ্যাঁ, এখনই খবর এল, বাঁচিয়েছে!

তন্ময় মজুমদারের কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল ভুবন সান্যাল। মূল অভিযুক্ত, যাকে অভিযুক্ত করেছিল সরকার পক্ষ, সে যদি বেঁচে না থাকে, কেস ডিসমিস। গ্রেপ্তার হওয়ার লজ্জায়, ঘেন্নায় পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মধ্যবয়স্ক রামমোহন কুণ্ডু আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিয়েছিল ক'দিন ধরে। ভুবনের হঠাৎ মনে হয়েছিল ওই লোকটাই জানত সে বডি প্রায় না দেখে মনগড়া রিপোর্ট তৈরি করেছিল তন্ময় মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

এস. পি ফোন রেখে দিয়েছিল। ভুবন যাচাই করে নিতে চাইছিল সংবাদটা। কিন্তু পারছিল না। কাকে ফোন করবে? না পেরে সে একটু বাদে মোবাইলে ধরেছিল তন্ময় মজুমদারকেই, ঘটনাটা সত্যি?

কোন ঘটনা?

রামমোহন কুণ্ডুর মৃত্যু?

হা হা করে হেসেছিল তন্ময়, মৃত্যুসংবাদ কখনো মিথ্যে হয় না।

এখন কেসটার কী হবে?

ভেস্তে যাবে, আপনার রিপোর্টও তো আছে, ও বেঁচে থাকলে অসুবিধে হত, ও ফোন করে করে নানাজনকে সেই রাতের কথা বলছিল, আর ওকে অ্যারেস্টও করছিল না ওর কলিগরা, অ্যারেস্ট করলে অবশ্য সুইসাইড করতে পারত না।

ভুবন বলেছিল, খারাপ লাগছে, আমাকে ফোন করে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন ভদ্রলোক।

খারাপ লাগলে তো হবে না, বড় মাছ তো ছোটমাছ খেয়ে নেয়।

শুনে গা হিম হয়ে গেল যেন। ভুবন কথা বলতে পারছিল না। তন্ময় মজুমদার কি টের পেল তা? বলেছিল, আপনার দাশগুপ্ত সায়েব আজই এসেছেন, তিনদিন থাকবেন, তারপর মিনিস্টারের সঙ্গে ইউ. কে যাবেন, দেখা করবেন?

ভুবন চুপ করেছিল।

এস. পি চিৎকার করে উঠেছিল, শুনছেন?

শুনছি তো।

জবাব দিচ্ছেন না যে, আরে মশায় কেউ কেউ বাঁচে, কেউ কেউ মরে, এই তো সোজা হিসেব, আপনি খুব ভিতু, এভাবে উপরে উঠবেন কী করে, গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে আসুন, সেলিব্রেট করব, আমার ফাদার-ইন-ল থাকবেন, আসুন।

ভুবন ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, যেতে হচ্ছে, রাতেই তদন্ত সারতে বলছেন ডি. এম।

যাচ্ছ কোথায়? স্ত্রী তার কথা বিশ্বাস করেনি।

তন্ময় মজুমদারের ওখানে।

শীত করছিল ভুবনের, বলেছিল, ঘরে বসে থাকলে বেশিদূর যাওয়া যায়?

গাড়ি এসে গিয়েছিল। অন্ধকারে রওনা হয়েছিল ভুবন। রামমোহন কুণ্ডুর ডেথ-সেলিব্রেট হবে সে আর তন্ময় মজুমদার। আছেন স্যার বিমল দাশগুপ্ত। যেতে যেতে মনে পড়ল সেই রাতের কথা। যখন ভোলা বিশ্বাস মরছিল, সে তো জানতই না কিছু। চিনতই না ওকে। তারপর পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে। ভোলা বিশ্বাসের মৃত্যুতে তার কোনো ভূমিকা ছিল না বটে, পরে সব হয়েছে। না হলে বিমল দাশগুপ্তর কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা কি তৈরি হত কখনো?

অন্ধকারে গাড়ি চলছিল নিঃশব্দে। ভুবনের মনে পড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার পুলিশ হাজত, ক্লান্ত দেহ, আধবুড়ো ইন্সপেক্টার রামমোহন কুণ্ডুর হা হুতাশ...। সিগারেট ধরায় ভুবন সান্যাল। পায়ের উপর পা তোলে। কীভাবে দাশগুপ্ত সায়েবের সঙ্গে কথা বলবে সে? কী বলবে? সেলিব্রেশনে সায়েব থাকবেন? সায়েব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ইউ. কে যাবেন—। ঝুঁকে দাঁড়াল ভুবন সান্যাল, স্যার, আমি ভুবন সান্যাল...।

ভুবনের আচমকা মনে হল আর একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তেই যেন রওনা হয়েছে। পৃথিবী আগের মতোই রাত্রির ভারে থমকে আছে। নিঃশব্দ হয়ে আছে।

তীর্থযাত্রা

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

এই ঘোর বিকেলে ও একটু একটু করে অ্যালিস-ইন-ওয়ান্ডারল্যান্ড হয়ে যেতে থাকল। কারণ, এখন ওর পায়ের কাছে সেই রূপবান রাজপুত্তুর দাঁড়িয়ে আছে। এই রাজপুত্তুর যে অনেক দূরের গ্রহে থাকে, আচমকা পৃথিবীতে এসে আটকে পড়েছে। রাজপুত্রের মুখটা দুঃখী মানুষের মতো। ওর আগ্নেয়গিরি আছে একটা যা বাওয়ারের পাতায় ঢেকে রাখা যায়, নদী আছে যা সে ইচ্ছে করলেই ইউকনের পাতায় ঢেকে দিতে পারে—এমন একজন রাজপুত্র কেন যে দাঁড়িয়ে থাকে পায়ের কাছে চুপচাপ। মুখ জুড়ে মিহি কাজলের গুঁড়ো। ওই রাজপুত্রকে দেখতে দেখতে ওর দু-চোখ জুড়ে ঘুম নামে। আর ঘুমের সমুদ্দুরে তলিয়ে যেতে যেতে সমুদ্রের তলদেশে এক নরম মায়াবী আলো দেখতে পায়। ও মৎসকন্যার মতো সাঁতরাতে থাকে ওই আলোর কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য। ও দু-হাত বুকের দুপাশে ছড়িয়ে দেয় ওই আলোকে জড়িয়ে ধরবে বলে। ওই আলোটা ঠিক রাজপুত্রের দুঃখী মুখখানির মতো।

২

বাবা ওকে সোহাগ করে বলেন—চাঁদে পাওয়া মেয়ে। আকাশে মেঘ করলেই এ মেয়ে পায়ে যেন ঘুঙুর ওঠে। আর তারপর মেঘ থেকে সাদা জুঁই ফুলের মতো বৃষ্টি যখন ঝরে ঝরে পড়ে মাটিতে। গাছপালা ভেজে, বাড়িঘর ভেজে, পুকুর-খাল-বিল। মেয়ে তখন ও বৃষ্টির তালে তালে ঘুঙুরে বোল তুলে নাচে, নেচে বেড়ায়। শুধু কি ওর বাদুলেপনা, কেন যখন পরিষ্কার শরতের আকাশে এই বড়ো চাঁদ জ্বলে, ঝকঝকে সব নক্ষত্ররা মাথার ওপর দুলতে থাকে--তখন বাবাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে একেবারে ছাদের ওপর, চোখে দূরবীন, --বাবা, ও বাবা, ওই যে সাঁঝতারার পেছনে, একটু দূরে জ্বলজ্বল করছে, ও কী নক্ষত্র? স্বাতী? না, রোহিণী? না, ও তবে বুঝি অরুন্ধতী?

দিদি বলে—মোহর, এখন বড়ো হয়েছো। একটু ম্যাচিওর হও। বাইরের পৃথিবীটা জান না? দিদি ভারী পণ্ডিত। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এই মোটা মোটা ইংরেজি বই। চো হাই-পাওয়ার। অপুদা যখন আসে, ওরা একঘরে টেবিল চেয়ারে বসে পড়াশুনো করে। ফের সময় লাল মোরেমের রাস্তা ধরে অপুদা কাঁধে ঝোলা নিয়ে রেলস্টেশনের দিকে যায়, দি যায় এগিয়ে দিতে, কখনও কখনও মোহর সঙ্গে—তখনও কীসব কঠিন বিষয়ে তর্কো কার গবেষণা কতদূর, সেইসব কথা, দিদি বলে এই দেশটা পচা, কোন-ও স্কোপ নেই। ওদে অনেক সুযোগ। অপুদা বলে গাঁয়ের বাড়িতে মা একা। শেষ পর্যন্ত কোন-ও মীমাংসা না ওদের—এদেশ না বিদেশ। হুইশল্ বাজিয়ে ট্রেন এসে যায়। ট্রেনে উঠতে উঠতে অপ বলে—আরে মোহরের সঙ্গে তো কথা-ই বলা হল না। চলিরে মোহর। গাড়ি আস্তে আ চলতে শুরু করে। মোহর হাত নাড়ে। আকাশে তখন সূর্য ডুবছে। পাখির কিচিরমিচি পৃথিবীতে সন্ধে নামছে। একটু পরেই তারা ফুটবে দুটি, একটি। মোহর চলতে চলতে শু

পায়, আকাশ থেকে, না না না না গাছপালা থেকে, না তো, মাটি থেকেই কি তাহলে, উর্ধ্ব আকাশ-গাছপালা-মাটি সব কিছুর ভেতর থেকে এক আশ্চর্য সিমফনি ভেসে আসছে। চার্চের ধর্মীয় সঙ্গীতের মতো। মোহরের মনে হয় সে নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাচ্ছে। দিদি তাড়া দেয়—আহ্, কী হল কী। তাড়াতাড়ি চল। গুচ্ছের পড়া বাকি।

৩

বারো ক্লাস পাস করার পর মা বললেন—ছি ছি বিজ্ঞানে এই নম্বর। কোন-ও কলেজ নেবে না। দিদি বলল—এত করে অঙ্ক করালুম, কী ভাবছিলি পরীক্ষার হলে? মেঘের কথা? বৃষ্টির কথা না সমুদ্দরের কথা? ইশ, দিদি যদি আয়নায় এখন নিজেকে দেখতে পেত। রেগে গেলে মানুষকে বড়ো কুৎসিত লাগে দেখতে। কেবল বাবা বললেন—আগেই বলেছিলুম, ওকে জোর করে সাইন্স দিও না। যা হবার হয়েছে। ও এখন বাংলা বা ইংরেজি নিয়ে পড়ুক। লিটারেচারে তো বেশ ভালো মার্কস।

৪

কলকাতার ওই নামী কলেজের লিস্টে যেদিন নাম উঠল, তখন আকাশ ফাটিয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করছিল—তোমরা যে আমায় ভারী দুয়ো দাও। এখন কেমন? দিদি বুঝি একাই ভালো? একাই ভালো কলেজ?

৫

কলেজে প্রথমদিন। ও বাবা। মফস্‌সলের মোহর। বুক দুরদুর। হাঁটু ঠকঠক। গলা শুকিয়ে কাঠ। ইয়া চওড়া সিঁড়ি। প্রকাণ্ড ঘর। বেঞ্চ নয়। দিদি বলেছে—এগুলোকে বলে গ্যালারি। মাইক্রোফোন। প্রজাপতির মতো ছেলেমেয়ে সব। টপ, জিনস্‌, স্কার্ট, ফ্রক, শালোয়ার। শুধু মোহর একা শাড়ি। শুধু মোহর একা লম্বা চুলের বেণী। শুধু মোহর একা দু-চোখ ভরা কাজল। দিদি বলে দিয়েছে—বোকার মতো চুপ করে থেকো না। সকলের সঙ্গে কথা বলবে। বন্ধুত্ব করবে। তাহলে আর কেউ র‍্যাগিং করবে না। তাই এত বড়ো ক্লাসরুমে এতগুলো ঝলমলে মুখের মধ্যে মোহর একটা বন্ধুর মুখ খুঁজতে লাগল। তন্ন তন্ন করে। মোহরের অত বড়ো নীল চোখ দুটোতে তীব্র সন্ধান লেগে রইল। রঙিন প্রজাপতি ক্লাসরুম জানতে-ও পেল না।

৬

স্যার এলেন। ম্যাম এলেন। কে কী পড়াবেন বলে দিলেন। কেউ মোটা গোঁফ, কেউ ধুতি-পাঞ্জাবি, কেউ উঁচু খোঁপা। কেউ হাসিখুশি, কেউ গম্ভীর, কেউ বিরক্ত। যেন তাদের জীবনীকাল খইয়ে দিতে আবারও বছরের গোড়াতে প্রতিবারের মতো এসে পড়েছে আর একটি দল। শুধু একজন আলাদা। গমগমে গলার স্বর। অপুদার বয়সি। হাই-পাওয়ার। এলোমেলো চুল। ধবধবে সাদা শার্ট। নেভি-ব্লু জিনস্‌। চশমার ভেতর উজ্জ্বল এবং প্রখর দুটি চোখ। ভারী মিষ্টি চাহনি। লম্বা গাছের মতো সজীব ইনি ক্লাসে এসে অন্যদের মতো আলফাবেট বললেন না। পুরো নাম বললেন—আমি সূর্যশেখর। তারপর সকলের সঙ্গে পরিচয়। টুকটাক কথা বিনিময়। শেষকালে মজার খেলা। বললেন—আজ প্রথম দিন। কোন-ও পড়াশুনো নয়। খেলা। দৃশ্য তৈরির খেলা। অনেক ছবি তোমরা মনের চোখে দেখো। তার মধ্যে প্রিয় একটি—

বলো তো আমায়। কেউ থতমত কেউ ভ্যাবাচ্যাকা। কেউ স্মার্ট ভারী, কেউ মনোরম, কেউ মোটের ওপর, কেউ অ-প্রাসঙ্গিক, কেউ কল্পনাপ্রবণ। একজন বলল, মনের চোখে সে নিজেকে রানী দেখতে পায়। সোনালি কোঁকড়ানো চুল, মাখনের মতো রং, নীল দুটি চোখ, আর পা অবধি সোনালি গাউন। অমনি ক্লাসশুদ্ধ সকলে তার নামকরণ করে দিল রানী। কেউ বলল, সে দেখে সৌরভের মতো ক্রিকেট খেলে বিশ্বজয় করছে। অন্যরা তাকে ডাকতে থাকল সৌরভ বলে।

হাঁ-করা ক্লাসরুমটা সকলের কাছে একটু একটু করে সহজ হয়ে আসছে ক্রমশ। সকলে সকলের বন্ধুতা চাইছে। মোহর ঘামছিল। পাশ থেকে একজন ধাক্কা দিল—এই স্যার তোমাকে ডাকছেন। মোহর চমকে তাকাতেই দেখল উজ্জ্বল দুটি চোখ, চোখের গভীরে হাসির অদৃশ্য রেখা, মোহরের দিকে।

—তুমি কিছু বলো। কী দেখো, তুমি?

মোহর দাঁড়িয়ে আছে স্থির। কী দেখে সে? গলা দিয়ে শব্দ বেরচ্ছে না। অন্যরা হাসছে। মোহরের চোখ দুটি নীচের দিকে। একমনে ভাবতে চেষ্টা করে—কী দেখে সে? গমগমে গলায় সূর্যশেখর বললেন—ভয় কি? এ তো খেলা। ডোন্ট গেট নার্ভাস। মোহর ওর কাজলপরা আয়তচক্ষু দুটি মেলে চাইল।

—বলো?

—সমুদ্র।

—শুধু সমুদ্র?

—সমুদ্রে একটা জাহাজ। শাদা। রাজহাঁসের মতো।

—বাহ্। বেশ তো। আর?

মোহরের হঠাৎ বড্ড ঘুম পেতে থাকে। এই এক হয়েছে আজকাল। দিনে-দুপুরে-লোকালয়-নির্জনে যখন তখন দু-চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। কথাগুলো তখন যেন মোমের মতো গলে গলে পড়তে থাকে গলা থেকে। মোহর কথা বলে। ঘুম জড়ানো গলা। কথাগুলি যেন গড়িয়ে যেতে থাকে।

—জাহাজের প্রপেলার জলের নীচে ঘুরছে। শাদা ব্লেড নীল জলে ঘুরছে। শাদা ফেনা। মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরছে সমুদ্রের বুকে। অনেক জলপরী যেন পাখা মেলে নাচছে সমুদ্রের ওপর। আর জাহাজটা...জাহাজটা।

—বলো জাহাজটা।

—জাহাজটা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে। শুধু তার ডেকের মাস্তুলের মাথায় আলো, উইংসে আলো, কেবিনে আলো, সামনে-পেছনে আলো। আলোগুলো কাঁপে। সমুদ্রের বুকে নক্ষত্রের মতো আলোগুলো জ্বলতে থাকে। আর...

—আর কী মোহর?

—আর জাহাজের ভেতর থেকে আশ্চর্য গান ভেসে আসে। কখনও দ্রুতলয়ে, কখন-ও ধীরলয়ে...একজন মানুষ বাজায়। লম্বা গাছের মতো শান্ত, সজীব...

৭

—তুমি কি কবিতা লেখো, মোহর?

—কক্‌খনো আমি কবিতা লিখি না। আমি শুধু দেখি।

—তুমি যদি লেখো, খুব ভালো লিখবে।

—মোটেই আমি লিখব না। আচ্ছা স্যার, আপনি কখনও মাঝরাত্তিরে, না না সবসময় মাঝরাত্তিরেই নয়, শেষ রাত্তিরেও গাছে গাছে ফুল ফোটার শব্দ শুনেছেন?

—পাগল।

—আমি কখ্‌খনো পাগল নই। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তো গাছেরা ফুল ফোটায়। আর গাছে গাছে ফুল ফোটার সময় এমন আশ্চর্য মিহি শব্দ হয়, মনে হয় শব্দটা বুঝি এখ্‌খুনি ভেঙে গড়িয়ে যাবে, এমন তুলতুলে। কিন্তু ভাঙে না, আসলে তখন কুঁড়ি ফোটে তো?

—রাতে বুঝি ঘুমোও না, এইজন্যই তো তোমার যখন তখন ঘুম পায়।

—আর মাথার ভেতরে, অনেক ভেতরে কীরকম একটা ব্যথা করে।

—খুব কষ্ট হয়?

—ঠিক কষ্ট না। শীতের ভোরে যেমন কুয়াশা ঝুলে থাকে, সব কিছু আবছা দেখায়—সেইরকম।

—ডাক্তার দেখানো দরকার। ...একদিন আমায় নিয়ে যাবে, তোমাদের বাড়ি?

ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে। লাইব্রেরির কিউবিকলে বই নিয়ে বসেছিলেন সূর্যশেখর। অফ পিরিয়ড থাকায় মোহর-ও। কথা শেষ হয় না। ছুটে যায় মোহর। এখ্‌খুনি ক্লাস আছে তার। সূর্যশেখর দেখেন নীল পাড় শাদা শাড়ি কোমর ছাপানো লম্বা চুলের বেণী, পানপাতা মুখ। আর সরপুঁটির মতো কাজল-পরা চোখ দুটি নিয়ে ছুটন্ত মেয়ে, দুলন্ত মুখের, নাকে একটি নথ থাকলেই অবিকল দুর্গাপ্রতিমা। এ মেয়েকে দেখলেই কেন যে বুকের ভেতর ঢাক বাজে।

৮

সূর্যশেখর আজ মোহরদের ডাকঘর পড়াচ্ছেন। বাইরে ঝিমধরা দুপুর। বাতাসে মহামারির মতো ফাগুন। শুরু করার আগে তিনি ইতস্তত ক্লাসরুমের মুখগুলির দিকে চোখ ফেরালেন। চোখ থেকে চশমা খুললেন তারপর। কাজের নিতান্ত আর পাঁচটা কথার মতো হঠাৎ চলে এলেন বিষয়ে।

অমল কাজ খুঁজছে। সেই কাজ বন্ধনদশা থেকে মুক্তির। প্রহরীর ঘণ্টা, দইওয়ালার দই বিক্রি, সুধার ফুল তোলা স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। এইভাবে শ্রম আর স্বপ্ন মিলেমিশে যায়। ঘরের মানুষকে ঘর ছাড়া করে। চেনা সুখের অসুখ থেকে অচেনা দুঃখে নিয়ে যায়।

এই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি রঙিন ডাকঘর। যার মাথায় উড়তে থাকে কিশোরের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের কেতন—রাজা আসবেন।

অমলের গলায় আছে সেই ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, উদাসীন পর্যটকের ডাক যা কখনও না কখনও সংসারী মানুষ তার রক্তের ভেতরে শুনতে পায়।

অন্ধকার ঘরে অন্ধকার ভাঙার যে রাজা—তিনি আসছেন। অমলের হয়ত জাগতিক

মৃত্যু হয়। কিন্তু অমলরা মরে না। কারণ সে জানে সুধা তাকে ভোলেনি। এ সুধা প্রাণের মাঝে, আত্মার মাঝে থাকে। অমলের সেই প্রাণের প্রাণ হয়ে জড়িয়ে থাকা সুধার মল বাজানো পায়ের মৃদু আঘাতে আমাদের বুকের ভেতর-ও ঝমঝম করে বেজে ওঠে।

৯

বেল বাজাতেই দরজা খোলেন সূর্যশেখর। —আরে মোহর, এসো এসো।

মোহর ঘরে ঢুকে তার অসুখী চোখদুটি নিয়ে স্যারের ঘরের চারদিকে তাকায়। ছাদজোড়া বুকশেলফ চারদিকে। কত বই। এত বই কখন পড়েন স্যার? ও পাশের দেওয়ালে একটা ভারী অদ্ভুত ছবি। একটা অতিকায় পাখি ডানা মেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার চারপাশ। পাখিটা রক্ত ওগলাতে ওগলাতে মরে যাচ্ছে। এ কি কোন-ও সমুদ্রপাখি? অ্যালব্যাট্রস? সিন্ধু-সারস? কি জানি, কিন্তু এরকম ছবি স্যার-এর দেওয়ালে টাঙানো কেন?

ঘরটি স্যারের ভারী ছিমছাম। ভারী সুন্দর। ঠিক স্যারেরই মতন। চারপাশে কাচের দেওয়াল। কাচগুলো টেনে দিলে পুরো ঘরটাই আকাশ হয়ে যায়। টেবিলে নানান পত্র-পত্রিকা। নীল কাচের ফুলদানি। তাতে একগুচ্ছ শাদা ফুল। ছোট ছোট গদি-আঁটা বসার চেয়ার একপাশে। অন্যদিকে একটা ছোট ডিভান।

মোহর দেখতে পায় স্যারের চোখে-মুখে কী সুন্দর ভোরের বিভা মেখে আছে। আর-ও সজীব। আর-ও মায়াময় দেখাচ্ছে তাকে। সূর্যশেখর তাকিয়ে আছেন মোহরের দিকে। তারপর ঘর জুড়ে পায়চারি। ডাকেন—মোহর।

—উঁ।

—নাহ্।

—কী?

—কিছু না। কিছু না মোহর।

—স্যার...?

—হুঁ

—আমাকে হেমন্তের মাঠ দেখাবেন বলেছিলেন, কাশফুলের রেণু উড়ে উড়ে বরফ-শাদা হয়ে যাওয়া হেমন্তের মাঠ...

সূর্যশেখর মোহরের আপাপবিদ্ধ চোখদুটির দিকে, পানপাতা মুখ, ঢেউ খেলানো চিবুক এবং একটি নথ লাগালেই যে মুখ দুর্গাপ্রতিমা হয়ে যেতে পারে, সে মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইলেন।

১০

নদীর পাড় থেকে মাঠের মধ্যে খানিকটা এসে নদীর দিকে চাইল মোহর। ওদের ছোট্ট ডিঙি নৌকাটা দুলছে একটু একটু। মাঝি নস্যি রঙের চাদরে শরীর ঢেকে বিড়ি ধরিয়েছে একটি মোহর চিৎকার করে উঠল—স্যার। সূর্যশেখর এগিয়ে গিয়েছিলেন খানিক। ফিরে তাকালেন—কী হল?

—এখান থেকে নৌকাটাকে আশ্চর্য একটা দ্বীপের মতো লাগছে না?

সামনে বিশাল মাঠ-প্রান্তর। ফসল কাটা শেষ হয়ে যাওয়ায় এখানে-সেখানে খোঁচা খোঁচা

নদীর পাড়ে এখানে-সেখানে কাশবন। কাশ ফুটেছে খুব। বাতাসে ক্ষীণ বকুল-গন্ধ। মোহর কাছে থাকলে মাঝেমাঝেই এরকম একটি ঘ্রাণ পান তিনি। সামনে মাঠ এবং নিরন্তর সুষমা রয়েছে প্রকৃতির ভেতর। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। গাছে গাছে পাখি এবং সঙ্গে মাটির মতো নির্মল বকুলগন্ধ মেয়ে।

সূর্যশেখর আলতো করে মোহরের হাত ছুঁলেন—কথা দিয়েছিলাম হেমন্তের মাঠ দেখাবো। অথচ এখন এমন একটি মায়াবী বিকেল, নির্মল আকাশ, নদীর পাড়ে পাড়ে কিশোরীর হাসির মতো ফুটে থাকা কাশ, নদীতে আশ্চর্য দ্বীপের মতো দুলছে একটি নৌকো, মাথার উপর চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে গগনভেরি পাখি, এই সময়-ই তো সাদা কাশফুলের রেণুতে ছেয়ে যায় মাঠ-প্রান্তর, ছেয়ে যায় পৃথিবী, ছেয়ে যায় মানুষ।

১১

দিদি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ঢোকার মুখে পথ আটকালো। মোহরের গালটা মুচড়ে দিয়ে জিগ্‌গেস করল—কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত? মোহর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার ভেতর সেই ব্যথাটা, ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, অবশ হয়ে আসছে যেন স্নায়ুগুলি, ঘুম নামছে দু-চোখ জুড়ে। মা এলেন দিদির পাশে—কী ভেবেছিস কী? এই এক পাগল মেয়ে আমার হাড়-মাস জ্বালিয়ে দিল। ছি ছি ছি এখন রাত নটা বাজে। দিদির গলায় হুমকি—বাংলার স্যারের বাড়িতে যাব বলে সেই কোন ভোরে...

বাবা মোহরকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে প্রায় বুকে আগলে ঘরে নিয়ে এলেন। মোহর খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইরের ঘর থেকে মা দিদির চিৎকার চেঁচামিচি কানে আসছে। মা বললেন—বাবার প্রশ্রয়েই মেয়েটা দিনদিন...ছিঃ, শেষ পর্যন্ত কলেজের স্যারের সঙ্গে...দিদি গর্জন করছে—আমি কালই যাব লোকটার বাড়ি...ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে... মোহরের কান দুটো পুড়ে যাচ্ছে ওদের কথার উত্তাপে। সে দু-হাতে কান-চাপা দেয়। আস্তে আস্তে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। কে যেন মাথার ভেতর খুব জোরে জোরে অরগ্যান বাজিয়ে দিচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ঝমঝম... ঝমঝম...

১২

ঘুম ভেঙে অবাক মোহর। শরীরটা কী হালকা, পাখির মতো হয়ে গেছে। ডানা থাকলে খুনখুনি উড়াল দেওয়া যেত। মা মুখের ওপর ঝুঁকে। বাবা পায়চারি, দিদি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গভীর পরামর্শে। দিদির ভুরু দুটো কুঁচকে আছে। চারদিকে যন্ত্র—তার—পলিক্লিনিক, ই.জি—সিটি স্ক্যান—এম-এম-আর—রক্তপরীক্ষা-ছুঁচ-ওষুধ...

১৩

ডাক্তারের নিষেধে মোহরের বাইরে যাওয়া বারণ। এখনও সব রিপোর্ট আসেনি। তবু ডাক্তারবাবুদের মুখ গম্ভীর—মাথাব্যথার পুরোনো হিস্ট্রি বলেননি কেন? অনুযোগ বাবা-মাকে। বাবা চুপি চুপি এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। জিগগেস করেন—তোর প্রায়ই মাথাব্যথা হত বলিসনি কেন মা? জানলার বাইরে একটা রঙ্গন ফুলের গাছ। সারাদিন কত পাখি উড়ে এসে বসে তার ডালে। পাখা নাচায়, খেলা করে। ফের উড়ে যায়। রেললাইনে যাওয়ার লাল রঙের পথটার দিকে তাকিয়ে থাকে মোহর। ওকে যেন একটু রোগা রোগা লাগে দেখতে।

মোহরের জন্য মনখারাপ বুঝি? মা ফলের বাটি নিয়ে পাশে বসেন। আস্তে জট ছাড়িয়ে চুল বেঁধে দেন। ছোটবেলার মতো। আর এটা-সেটা বলেন। এটা-সেটার মধ্যেই কখন যেন দরকারি কথা ঢুকিয়ে দেন। —বুঝলি মোহর—লোকটা সুবিধের নয়। তোর দিদি লোকটার বাড়ি গেছিল। ওর মা বলেছে—লোকটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই তো সামনের ফালগুনে। এর পর কলেজে গেলে ওর সঙ্গে আর বিশেষ...ব্যস্ত দিদি-ও মাঝে মাঝে কাছে এসে বসে। পড়াশুনোর ফাঁকে। কলেজের ফাঁকে— বুঝলি মোহর, আমরা সবাই তোকে ভালোবাসি। তোর ভালো চাই...ওকি ফের মাথাব্যথা হচ্ছে বুঝি? চোখ বুজে রয়েছিস কেন?

একদিন তিনি-ও এলেন। স্যার। ভারী বিষণ্ণ মুখ, চোখ দুটি যেন হেমন্তের ফাঁকা মাঠ—ফসলহীন, খাঁ খাঁ, ধু-ধু। মা আর দিদি ঘিরে রইল স্যার-কে। শরবত, মিষ্টি। যত্ন করল খু-উ-ব। দিদি বলল—সুখবর শুনেছি। মা বললেন—তাই তো, মায়ের বয়স হয়েছে। এখন ঘরে একটি বউ না এলে...

স্যার মোহরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী যেন একটা কথা বলি-বলি। মানুষটাকে অসহায় দুঃখী মানুষের মতো দেখাচ্ছে। স্যার কি কখন-ও আকাশে তারায় ভরা কদমফুলের গাছ দেখেননি? অথবা মেঘুয়া-রং শাড়ি পরা মেঘবালিকা? তাহলে ঠিক মন ভালো হয়ে যেত ওঁর। মানুষটা সেই যে চুপ করেছেন, মুখে কথা নেই একটি-ও। কারোর বাড়ি এলে কেউ বুঝি অমনি চুপ করে থাকে? কী ভাববেন মা? কী ভাববে দিদি? তাই বাধ্য হয়ে মোহর—স্যার, ভালো আছেন? সূর্যশেখর এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চোখ থেকে চশমা খুললেন। চশমার কাঁচ মুছলেন নিবিষ্ট ভাবে। মোহর ফের—আচ্ছা স্যার, আমাদের কলেজের বাগানে যে বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছটা লালে লাল হয়ে থাকত, লাইব্রেরি ঘরে ছায়া এসে পড়ত ওর ডালে কুঁড়ি এসেছে? নতুন পাতা গজিয়েছে ফের?

সূর্যশেখর মোহরকে দেখছেন। তার চোখ দুটি ছলছল করছে। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, অস্ফুটে বলেন—জানি না।

দুষ্টু মোহর, মিষ্টি মোহর...এই গোমড়ামুখো স্যারের মন ভালো করে দিতে চাইছিল তাই খুব চুপি চুপি, শুধু স্যার শুনতে পান এমনি ভাবে বলতে থাকল—

পাশেই কারুর একখানা হাত ধরো/কাছেই কাউকে তোমার বন্ধু করো
দূরেও রয়েছে হয়তো মিষ্টি হেসে/হয়তো কোথাও হয়তো অন্য দেশে।

১৪

দু-ধারে ফাঁকা মাঠের বুকে কালো পিচ-রাস্তা ধরে অনেক দূরের পথ বেয়ে প্রথম যেদিন প্রকাণ্ড ঝকঝকে এই সাদা বাড়িটার সাদা বিছানায় থাকতে এল মোহর, সেদিন সবাই চলে যাওয়ার পরে সন্ধেবেলায় ঘরে ঘরে যখন আলো জ্বলে উঠেছিল, বাইরে সমুদ্রের মতো বড়ো মাঠ, হঠাৎ হঠাৎ গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ, বিছানায় বিছানায় অসুখী মানুষদের দুঃখী মুখ...বাড়িটাকে নোয়ার জাহাজ মনে হচ্ছিল।

১৫

আজকাল অন্যরা ভাবে মোহর বুঝি তাদের কথা শুনতে পায় না—শুনতে পেলে-ও বুঝতে পারে না। মোহর মনে মনে হাসে।

একদিন বন্ধুরা এসে দেখে গেল। বাবার মাথার সবকটা চুল এ-কদিনেই কেমন শাদা হয়ে গেছে। মাথা নুইয়ে কীরকম ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটেন আজকাল বাবা। মা আজকাল আর কারোর সঙ্গে কথা কন না। খালি কাঁদেন। মোহর দেখতে পায় মা-র চোখ দুটোতে রোগা নদী সারাদিন...সারারাত...তিরতির..তিরতির...দিদি আসে, অপুদা আসে, দিদি গম্ভীর, অপুদা চুপচাপ। আচ্ছা ওরা কি এখন-ও রেলস্টেশনের দিকে যেতে যেতে এদেশ-ওদেশ তর্ক করে? নাকি মীমাংসা হয়ে গেছে? কে জানে...

আর আসেন রোজ—প্রত্যহ—তিনি। কলেজ থেকে সোজা। মোহরের পায়ের কাছে বসে থাকেন। কথা কন না কার-ও সঙ্গে। শুধু মাঝে মাঝে ডাক্তারকে এটা-সেটা জিগ্‌গাসা...

১৬

আজ বিকেল থেকে ওই জাহাজটা সমানে ভোঁ বাজাচ্ছে। শাদা রাজহাঁসের মতো জাহাজটা। কেবিনে আলো, ডেকে আলো, মাস্তুলে আলো, উইংসে-এ আলো। অথৈ নীল জলরাশি। শাদা জাহাজের প্রপেলার ঘুরছে বনবন। নীল জলে শাদা ফেনা। সেই আশ্চর্য সঙ্গীত। বাজাচ্ছেন সেই মানুষ। নাবিক তিনি। পথ হারিয়ে ফেলা নাবিক এক। মাথার ওপর সীমাহীন আকাশ। বিছানার চারপাশে শাদা বুলবুল, চশমা চোখে ব্যস্ত ডাক্তার, বাবা, মা, দিদি, অপুদা। স্যালাইন-ছুঁচ-রক্তের বোতল। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সবগুলো মুখ। পাল তুলে দেওয়ার মতো সমুদ্রে জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্য ক্যারাবিয়ান-সিতে অস্ত যাচ্ছে। পাখিরা বাসায় ফিরছে। চারপাশে নীলাভ সোনালি আভা। বৃষ্টিপাতের মতো সেই সঙ্গীত ভেসে আসছে। মোহরের মাথার কোষে কোষে এখন সেই সঙ্গীত। মোহর দু-হাত বাড়িয়ে দেয় জাহাজের দিকে। এই রাজহাঁসের মতো শাদা জাহাজে চড়ে আশ্চর্য সঙ্গীত শুনতে শুনতে ওই গাছের মতো নিরীহ নাবিকের হাত ধরে পৃথিবীর কাশ রেণু গায়ে মেখে তীর্থযাত্রায় যাবে সে।

আঁধারচিত্র

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

'আলোকচিত্র' শব্দটা আর তারপর কোলন দিয়ে নিজের নাম, দেবোপমের কাছে কেমন এক আচ্ছন্নতা যেন। নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকার মতো এক ভালোলাগার বোধ। উপভোগ্য। তার টানেই দেবোপম কোথায় না গেছে, হিমালয়ের পশ্চিম থেকে পূর্বে, সমুদ্রের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, মানে বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের কত তটের বালিতে পড়েছে তার পায়ের ছাপ, হাওয়া আর ঢেউ এসে কখন যেন, নিমেষে মুছে দিয়েছে সে সব। কত সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত, সমুদ্রের জলে অথবা পাহাড়ের গায়ে, সমতলে, জঙ্গলের গভীরে, গাছের আড়ালে, পাতার স্তূপের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তোলা প্রকৃতি অথবা বরফের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আরও আরও বরফ পড়ার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে নিয়ে এসে নিজের ডার্করুমে দেবোপম তা থেকে খুঁটে বার করেছে আলো। কত মানুষের মুখও আছে তার ভেতর, কখনও বিশাল প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে অথবা সব প্রেক্ষিত সরিয়ে শুধু একটি মানুষীর মুখ, যে যেমন চায়, নিজের পছন্দও কি মিশিয়ে দেয়নি দেবোপম, কখনও, প্রথমে গোপন রেখে, পরে নিজেরই মুগ্ধতা গোপন করতে না পেরে যখন তুলে দিয়েছে ক্লায়েন্টের হাতে, 'আরে, এটা কখন তুললেন? দারুণ তো! বলেননি একবারও, আপনি সাংঘাতিক লোক মশাই', প্রতিক্রিয়ায় ভেসে গেছে দেবোপমের তৃপ্তি, স্বীকৃতির সাধ। কত মেয়ের মুখে এনে দিয়েছে লাবণ্য, কত পুরুষের মুখে ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির প্রখরতা। সব ওই ক্যামেরার কারসাজি দিয়ে, কতটা আলো, কখন আর কতটাই বা অন্ধকার, কখন, কতটা দূরত্ব আর কতটাই বা নৈকট্য, সবই তো ঠিক করা যায় ক্যামেরার ভেতর দিয়ে, দেবোপম সেই ক্যামেরাকে এমন ঘনিষ্ঠতায় চিনেছে যে নিজের খালি চোখে দেখার খামতি মিটিয়ে নিতে যন্ত্রটাকেই ব্যবহার করত, নিজের চশমার সামনে। আর ওই যন্ত্রই তো তাকে শিখিয়েছে, দূরত্বের কমা-বাড়ায় কী বদল আসে ছবিতে, আলোর বেশি কম ব্যবহার বা বিচ্ছুরণে কী নতুন যোগ হয়ে যায় মানুষের মুখে।

দেবোপমের হাতে ওই একটি যন্ত্র, তার দেখার চোখ কত বদলে দিয়েছে সে তো ওর তোলা ছবির অ্যালবাম দেখলেই বোঝা যায়। দশ বছর আগের তোলা ছবির পাশে এখনকার ছবি, ক্যামেরা তাকে শিখিয়েছে কী ঢাকতে হয়, কীভাবে, কী আঁকতে হয়, কীভাবে। ছবি আঁকতে জানে না দেবোপম, কিন্তু ছবি তুলতে জানে। ক্যামেরায় তোলা কোনও কোনও ছবি যখন চিত্রকরের সূক্ষ্মতা পায়, অন্যের তারিফ, নিজের সন্তুষ্টি বা প্রসাদ, তখন দেবোপমের ছবি আঁকতে না পারার যন্ত্রণা কমে যায়। ক্যামেরাকে দেবোপম একেবারেই বাজে কোনও কাজে লাগায় না, বিয়েবাড়ির ছবি তোলার অর্ডার নাকচ করে দিয়ে সে বরং চায়, বয়স বেড়ে যাচ্ছে অথচ বিয়ে হচ্ছেই না, এমন কোনও মেয়ের ছবি তুলে দিতে, যা দেখে পাত্রপক্ষের পছন্দ হবেই। এই লড়াইটা দেবোপমের নিজের সঙ্গে নিজের, সাধারণ ছবিতেও নতুন কোনও

মাত্রা আনা। ক্যামেরা হাতে থাকলে দেবোপমের ভরসা বাড়ে, যা কিছু সে নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে না, ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখলেই সে সব ঠিক চোখে পড়ে যাবে, নতুন কোনও ভাবনা আসবে মাথায়।

কোনও মন্দিরের ছবি তুলতে গিয়ে সে দর্শনার্থী'র ছবি না তুলে থাকতে পারেনি, প্রাচীন কোনও বাড়ির ছবি তোলার সময়ও তার চোখ খুঁজে বেড়িয়েছে ওই প্রাচীনের মধ্যে আজকের জীবনের চেহারা। নিসর্গের ছবি সে অনেক তুলেছে, কোথাও গেলেই তো তোলে। তুলতে তুলতে দেবোপম নিশ্চিত বুঝেছে, নিসর্গের কোনও শেষ নেই যেন। পাহাড়, নদী, জঙ্গল, সমুদ্র, সমতল, বহুতলের ছাদের ওপর থেকে শহর কলকাতার আকাশরেখা, এসব ক্যামেরায় বন্দি করে রাখা দৃশ্য কিছুদিন পর সব আবেদন আর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে কীভাবে যেন, কেমন একইরকম লাগে, বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায় না, অথবা হারিয়ে যায় কোন রহস্যময়তায়, মনে হয় পৃথিবীতে এইসব দৃশ্যের তো কেবলই জন্ম আর মৃত্যু হয় প্রতি মুহূর্তে, এর আলাদা কোনও তাৎপর্য নেই, নিরবধি কালের নিরিখে। ছবি, নিছকই এক ছবি ছাড়া আর কিছু মনেই হয় না সেই ছবিগুলোকে। যেমন খবরের কাগজে বেরনো হারিয়ে যাওয়া মানুষের অথবা অজ্ঞাতপরিচয় কোনও ব্যক্তির মৃতদেহের কত অজস্র ছবি দেবোপমের কাছে আশ্চর্য আবেদনহীন পড়ে থাকে। কোনওদিন তো মনেও হয় না, সেই ছবিগুলোর একটার দিকেও তাকিয়ে দেখার কথা। অসংখ্য মানুষের অস্তিত্বই কি এমন অচেনা ব্যক্তিমানুষের প্রতি অমনোযোগী করে দেবোপমকে? হবেও বা। তাহলে বিশাল এই দেশের আনাচে-কানাচে নিসর্গ কত বিপুল, অপরিমেয়, দিনের, রাতের প্রতিটি মুহূর্তে আলোর হেরফেরে সেই অপরিমেয়রা আরও কত অনন্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতিকে, তার ভেতর নিজেকে, নিজের বা অন্য কারুর তোলা ছবিকে তো অর্থহীন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। দেবোপমেরও ঠিক তাই হয়।

যাদের পরিচিত অথবা নিকটজন কেউ হারিয়ে গেছে, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের কাছেই একমাত্র প্রাসঙ্গিক, খবরের কাগজের ওই ছবি আর তথ্যগুলো। বাকি কারুর কাছে নয়। তেমনই, যারা কোনওদিন গেছে ওই পাহাড়ে, সমতলে বা সমুদ্রতটে, তাদের চোখেই কেবল আগ্রহ বা কৌতূহল বা স্মৃতিচারণ টেনে আনে নিসর্গের দৃশ্যাবলি। তা এতই কমসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গে সে ছবি তোলার উদ্যমকে তা সন্তুষ্ট করে না, তৃপ্তিও দেয় না। দেবোপম নিজেও প্রায় সময় মনে রাখতে পারে না, কোনও ছবির সন, তারিখ, মরসুম ও নির্দিষ্ট ভূগোলের কথা। যদিও ছবি দেবোপমেরই তোলা। নিসর্গের আর কোনও নতুনত্ব-ই যেন ছবির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে না সে, নিজেও খুঁজে পায় না। অথচ সে যদি একটা মানুষের ছবি তোলে, ওই নিসর্গের মধ্যে অথবা বাইরে, কোলাহলে, তবে সেই মানুষটা কীভাবে যেন ছবির সঙ্গে অনেক স্বর জুড়ে দেয়, সুরও কখনও কখনও। চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে, যেখানে ভারতের ভূখণ্ড শেষ, অনেক দূরে, সমতলের রেখা যেখানে আবছায়ার মতো চোখে পড়ে, সবুজ ধানখেত, বাংলাদেশ, সেখানে এক মা ও মেয়ের মুখের ছবি তুলেছিল দেবোপম, দুজনে মিলে হোটেল চালায়, সেই মুখদুটির কথা দেবোপম ভুলতে পারে না, ছবিটাও তার কাছে রয়েছে, ঘরের দেওয়ালে। জীবন ও প্রকৃতির অনিশ্চয়তার, নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ক্লান্তির

ঔজ্জ্বল্যে ভরা দুটি মুখ। অথবা এই কলকাতায় একটা বহু বছরের পুরোনো, ভাঙা, জরাজীর্ণ বাড়ির ছবি তুলতে গিয়ে দেবোপমের ক্যামেরা খুঁজে পেয়েছিল এক বৃদ্ধ ও তার নাতিকে। বৃদ্ধের মুখের চামড়ার ভাঁজ যেন জীবনসীমার ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে পুরোনো বাড়িটিকে, খাটিয়ায় তার নাতি, তাকে পড়াচ্ছেন ওই বৃদ্ধ। ছেলেটির বাবা, মা দুজনেই রেল দুর্ঘটনায় নিহত। ছবির ভাষায় দেবোপম পরে নিজেই অবাক হয়ে যায়। এই তো মানুষ, অচেনা, অজানা মানুষ-ই তাহলে বদলে দিতে পারে একটি ছবির সমস্ত নির্মাণ, বদলেই দিতে পারে ছবির বয়ান, আবেদন।

দেবোপম ছবি তোলার এক অন্য অস্থিরতায় পৌঁছে গিয়েছিল ওই ছবি দুটি তোলার পর, পরিচিতরা সবাই ধন্য ধন্য করেছিল, আর ওই ছবি দুটিই তাকে অনেকের কাছে পরিচিত করেছিল। বহু বছরের ছবি তোলার নেশা ও পেশা মিলিয়েও দেবোপম যার স্বাদ পায়নি, দুটি ছবি দেবোপমকে তা এনে দেয়। পরিচিতির বৃত্ত যায় বেড়ে, ছবি তোলার বিষয় তো বটেই, দেখার চোখও যেন খুলে যায় তার। আগের তোলা সমস্ত ছবিকে কেমন অর্থহীন দৃশ্যের মতো মনে হয়। যেন রেলপথে পার হচ্ছে বহুদূর পথ, জানলা দিয়ে দৃশ্য, কেবলই দৃশ্য, স্মৃতি নেই তার কোনও, অভিঘাত নেই, কেবলই চঞ্চল দৃশ্যের জন্ম আর মৃত্যু হতে থাকে। দেবোপম কোনওদিন চায়নি তার ছবি কোথাও ছাপা হোক, বিক্রি হোক। দেবোপম আরও আরও ছবি তুলতে চেয়েছে, নতুন ধরনের ছবি, মানুষের ছবি। আরও আরও যোগাযোগ চেয়েছে। শঙ্করপুরে, শান্তিনিকেতনে, সাত্রাগাছির ঝিলের ধারে, বালিগঞ্জ বিজন সেতুর উপরে, বাঁকুড়ায়, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে, দার্জিলিং-এ, কালিম্পং-এ, দেবোপমের অক্লান্ত শরীর আর মন ক্যামেরার ভার বয়ে বয়ে ছুটে বেড়িয়েছে, একটি দৃশ্যের খোঁজে, প্রকৃতি আর মানুষ মিশে আছে যে দৃশ্যের ভেতর, অভিন্নতায়, সেই দৃশ্য দেবোপমকে দেবে আবিষ্কারের আনন্দ। দেবোপম কত নতুন ভূগোলের সন্ধান পেয়েছে, এইসব ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে, কত না বিচিত্র ইতিহাস সেইসব ভূগোলের, ফুটে বেরয় মানুষের মুখের কথায়, দেবোপম সেই ইতিহাসের সামনে কৌতূহলী বসে থাকে। তার হাতের ক্যামেরাও তখন এক স্তব্ধতা যেন।

অনেকে অনেক রকম ছবি তোলার প্রস্তাব নিয়ে আসে। কেউ বিয়েবাড়ি, কেউ জন্মদিন, মুখেভাত, উপনয়ন, কেউ শ্রাদ্ধবাসর, কেউ পাড়ার বা স্কুলের বা কলেজের ফাংশন, কেউ রবীন্দ্রসদনে যেতে বলে, কেউ গিরিশ মঞ্চে, কেউ বন্ধুর নাচের মুদ্রা তুলে রাখতে চায় ফিল্মে, কেউ নিজেকেই ধরে রাখতে চায় বিরল কোনও সঙ্গলাভের দৃশ্যে। এমন অনেকানেক উপলক্ষ মিলিয়েই টিকে থাকে দেবোপমের পেশা, বেড়েই চলে তার ব্যস্ততা, ক্যামেরা হাতে সমাগমে অথবা ডার্করুমের অন্ধকারে। ডার্করুম তার কাছে এখনও এক নেশার মতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারে থাকার মাঝখানে বিরতি শুধুই সিগারেট খেতে বেরনোর। চা-কফি ডার্করুমেই পৌঁছে দেয় বিদিশা। সঙ্গে থাকে দেবোপমের কর্ডলেস ফোন। বাইরের পৃথিবীর আলো আঁধারের নিরপেক্ষতায় দেবোপমের এক আশ্চর্য মেতে থাকা। ঠিকঠাক এক্সপোজারে, আলোয়, রঙে ছবিকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলার অপরিসীম ধৈর্যে। অটো ল্যাব বানায়নি দেবোপম, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও। এখনও সে অন্ধকারময় ডার্করুমের মধ্যেই একটি ফিল্ম

থেকে সমস্ত ইঙ্গিত খুঁজে খুঁজে ছবির নিখুঁত পাঠোদ্ধারের কাজ করতে ভালোবাসে। সঠিক আলো, রং আর মাপের বিন্যাসে ছবিকে ফোটাতে চায় কাঙ্ক্ষিত ব্যঞ্জনায়। খরচ বেশি হয় অনেক, প্রতিটি ছবিকে প্রাপ্য সময় ও গুরুত্ব দিতে। ছবির দামও বেশি পড়ে যায়। তবু ছবির সমঝদার খদ্দেররা তার কাছেই আসে, একবার এখান থেকে প্রিন্ট করালে আর অন্য কোথাও কাজ করানোর কথা ভাবেই না তারা কেউই। তারা ছবি তোলে অনেক যত্ন আর পরিশ্রম করে, প্রিন্টের মধ্যে সেই যত্ন, পরিশ্রম, ছবি তোলার অন্তরালের ভাবনা ফুটে ওঠাটা দেখতে চায় তারা। দেবোপমের প্রিন্ট সেই প্রত্যাশা পূরণ করে। পরিশ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে দেবোপম যে সুনাম অর্জন করেছে, তার জোরেই যেখানে-সেখানে যে-কোনও অনুষ্ঠানে ছবি তুলতে না গেলেও চলে দেবোপমের। নিজের পছন্দসই কোথাও যেতে পারে, কাজের মান ধরে রাখতে পারে। এই কলকাতায় ভিন্ন ধরনের আলোকচিত্রের বার্ষিক প্রদর্শনীতে ওর ছবি থাকবেই, এমন একটা নিশ্চয়তা গত বছর দশেক ধরে অনুভব করার পরই কেমন এক অতৃপ্তি এসে ছেয়ে থাকে দেবোপমের মন, মেঘলা শ্রাবণ দিনের মতো। দেবোপম কাজ খোঁজে, কাজ। ডার্করুমের অন্ধকারের বাইরে ক্যামেরা কাঁধে কোনও প্রান্তরে ছুটে যাওয়া, ঘুরে বেড়ানোর কাজ। প্রকৃতি ঢের দেখেছে সে, এবার মানুষ আর জীবন দেখতে চায়, ভীষণভাবে চায়। অথচ এই চাওয়ার সঙ্গে নিজের পেশাকে জুড়ে দেওয়ার পথটাও সে পাচ্ছে না কিছুতে। ছবি তৈরির কাজ বন্ধ রেখে স্রেফ ছবি তুলতেই যদি বেরিয়ে পড়ে ব্যাগ গুছিয়ে, তবে তো টান পড়বে পকেটেই, একথা কি দেবোপম জানে না?

আরও কিছু জানার মধ্য দিয়ে জীবনের ওই জ্ঞানকে ডিঙোবার চেষ্টায় ছিল সে। ছবি তোলার লাভজনক প্রস্তাব খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কাগজে, বন্ধু সমাগমে, ওয়েবসাইটের হরফে হরফে। প্রতিটি ক্লিকে। যে প্রস্তাবে রাজি হলে তার ছবি তোলার অতৃপ্তি যেমন কাটবে, পকেটের চিন্তা থেকেও তেমনই রেহাই জুটবে, এমন কিছুর খোঁজে দেবোপম বেশ অস্থিরই ছিল বলা যায়। এই এমনই অস্থিরতা যা বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না, বাইরে হয়তো ফুটেও বেরয় না মানুষের, শুধু ব্যক্তির চেতনায় থেকে যায়, সমস্ত কাজ আর ভাবনার মধ্যে এক অদ্ভুত রসায়নে মিশে থাকে, দিনের পর দিন, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত। দেবোপম বেঁচে থাকে সেই খোঁজের ভিতর, বেঁচে থাকতে চায় সেই খোঁজের অবসানে, প্রাপ্তিতে। দেবোপম একজন মানুষের মতোই বেঁচে থাকে।

খোঁজ পায় দেবোপম, তেমন কাজের। সে পাওয়ার মধ্যে যদি থাকে কোনও আশ্চর্য আপতিকতা, তবু পায়, দেবোপমের জীবদ্দশার সময় যে আসলে কোনও আপতিককেই আর আপতিক হতে দেয় না, আশ্চর্য তো নয়ই। সে একটি এমন সংস্থার খোঁজ পায় যারা দেশের পশ্চিমপ্রান্তের একটি প্রদেশের মানাবধিকারের চেহারা নিয়ে কাজ করতে চলেছে। একজন আলোকচিত্রীর খোঁজ করছে তারা। দেবোপমের খোঁজের সঙ্গে তাদের খোঁজ মিলে গেলে তারা দেবোপমকে জানায়, ছবি তুলতে হবে মানুষের, ভাঙাচোরা আর জেগে ওঠা মানুষের। অন্তত একমাসের জন্য যেতে হবে কলকাতার বাইরে। নিজের ল্যাব বন্ধ রেখে কলকাতার বাইরে একটা মাস কাটানোর জন্য কী কী ক্ষতি হতে পারে সব খতিয়ে দেখে দেবোপম বোঝে, কাজের উপযুক্ত ছবি তুলতে পারলে অনেক বেশি টাকাই সে পাবে হয়তো। তবে

নতুন ধরনের কাজ করার আকর্ষণটাই যে তার কাছে বড়, সেকথাও ভুলে যায় না দেবোপম। কথাবার্তা প্রায় পাকা করে নিয়ে দেবোপম নিজেকে তৈরি করার কথা ভাবে। ছবি সে তুলেছে অনেক, কিন্তু মানুষের অধিকার থাকা আর না থাকা ফুটে ওঠে, এমন ছবি তো কখনও তোলেনি। কোনওদিন অধিকারের কথা ভেবে লেন্সে চোখও রাখেনি। কেমন দৃষ্টিতে লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালে মানুষের অধিকার টের পাওয়া যায়, দেবোপম তা জানে না। না, সেই না জানাটাও কোনও আশ্চর্য নয়। দেবোপম সারা জীবনে যত ছবি তুলেছে, তার যত অভিনন্দন, যত খ্যাতি, পরিচিতি সবই যেন অনর্জিত মনে হয় তার, টের পায় ছবি তোলার কাজে আর ভাবনায় এতগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েও সে যে ছবি তোলারই সামর্থ্যের এক কঠিন পরীক্ষার সামনে। ছবি তোলার কৃৎকৌশল তার জানা, সেই ছবি ডার্করুমের অন্ধকারে থেকে আলোকময় করে তুলতেও সে অভিজ্ঞ, তবু এইসব কাজের ভেতর নিহিত অপ্রাপ্তিই দেবোপমকে অন্য ছবি তোলার বাসনার দিকে টেনে এনে এখন বুঝি ক্যামেরা ব্যবহারের যাবতীয় স্মৃতি, সাহস আর অভিজ্ঞতাকেই ভুলিয়ে দিতে চাইছে। দেবোপমের ছবির সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সে তো কখনও ঘটনার ছবি তুলতে যায়নি, যে ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে তাৎপর্য বয়ে আনে গভীর। তেমনি ছবি নিয়ে দেবোপম ভাবেওনি কখনও। ছবির বিষয় কতটা নিখুঁত ফ্রেমিং-এ ধরা গেছে, তা নিয়েই গবেষণা করে গেছে। আরও ভালো ছবি তোলার নেশায় দেবোপম চিনতেই শেখেনি ছবির মানবিক, হিংস্র, অসহায়, ধ্বংসী, আশ্বাসী, বিদ্বেষময়, মারমুখী চরিত্র। না চেনার ফলে এমনকী খবরের কাগজে বেরনো ছবিগুলোও তার কাছে ছবি হয়ে ওঠেনি, খুঁটিয়ে দেখা আর ভাবার মতো। অথচ কত ছবির বই, পত্র-পত্রিকার কত ছবিই তো দেখার কথা দেবোপমের, ছবি তোলার কাজটুকু শেখার জন্যই।

গ্লানি আসে নিজের ভেতর, দেবোপমের, নিজেরই অপ্রস্তুতির জন্য। গত দশ বছর বা পনেরো বছর সে তো ছবিই তুলে গেছে, নেশাগ্রস্তের মতো, তবু অনেক ছবি-ই যে সে দেখেনি আদৌ, তাকিয়ে, সে কথা এখন আর নিজের কাছেও গোপন রাখা যাচ্ছে না। দেবোপমের তোলা একটিমাত্র ছবিতেই দীর্ঘদিন অবিবাহিত কোনও যুবতীর বিয়ের যোগাযোগ পাকা হয়ে যায়, এমন আত্মপ্রসাদের ভেতর বেঁচে থাকার প্রাপ্তিকে চিহ্নিত করতে শিখেই যে দেবোপম সমাজ আর সংসারের কত কিছু থেকে দূরে সরে গেছে, সেকথা ভাবতে না বসলেও এক ধরনের অপচয়বোধ নিজের সম্পর্কে কাজ করে দেবোপমের। কতটা অপচয়ের পরে এমনকী নিজেকেও চেনা যায়। প্রথম ছবি তোলার দিনগুলো মনে পড়ে। ছবি দেখামাত্র ক্যামেরার পিছনে নিজেকে ভেবে নেওয়ার অভ্যাসের সেই তো শুরু। 'দি গ্রেট ফটোগ্রাফার্স' সিরিজের বই কিনত টাকা জমলেই। সেইসব ছবি, ফটোগ্রাফারদের জীবনী পড়ে উৎসাহিত হওয়ার সময়টা কখন যেন হারিয়ে গেল জীবন থেকে, দেবোপম জানতেও পারেনি, তুচ্ছ আর তাৎপর্যহীন কিছু প্রশংসার স্রোতে তখন নিজের চেতনাকে লুপ্ত হতে না দিলে আজ অন্তত অপ্রস্তুত হয়ে নিজের সামনে দাঁড়াতে হত না। সিসিল বেটোঁ, ডোনাল্ড ম্যাককুলিন, কার্তিয়ে ব্রেসোঁর তোলা ছবি আর তাঁদের জীবনীর বইগুলো সাজানো রয়েই গেল বইয়ের তাকে, আর কিছু বেড়ানোর ছবি তোলার বোধহীন নেশায় দেবোপম ভেসে তো গেল

এতগুলো বছর। মনে হচ্ছে ওর, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ আর বায়াফ্রার ছবি দেখে প্রথম প্রথম কেমন উত্তেজিত আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ত দেবোপম। সাদাকালোয় ওইসব দেশের মানুষের দুর্দশা যেন আরও নির্মম, নিষ্ঠুর এক পৃথিবীর চেহারা ফুটে উঠলে দেবোপম হয়তো তার অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে জীবনের অন্য রঙের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। জীবনে দারিদ্র হয়তো দেখেছে সে, দুর্দশাও, কিন্তু মানুষেরই হাতে মানুষের ওই জীর্ণ, কঙ্কালসার, বিভীষিকাময় জীবনের সৃষ্টি, একথা জানা খুব কঠিন, আর তা যদি হয় যুদ্ধ বা দাঙ্গা বা মহামারীর মতো কোনও তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রেক্ষিতে, তবে যেন অসহনীয়, অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে ওই দুর্দশা। দৈনন্দিনের দারিদ্র বা একটা অনুন্নত পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনের চেহারা অত তীব্রতায় ব্যক্তির কাছে পৌঁছয় না, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া বা রাজস্থানের কোনও গ্রামের জীবন জলকষ্টে কঠিন হলেও তার দৃশ্য তবু সহনীয়, কিংবা কোনও ভূমিকম্প বা বন্যার পর মানুষ যে আকস্মিকে বেঁচে থাকে, তা তবু সহ্য করা যায়, গ্রাহ্য হয়ে ওঠে কার্যকারণ সম্পর্কের বিচারে। কিন্তু যুদ্ধে বা দাঙ্গায় মানুষের বিপন্নতা কোনও কোনও চেতনায় গ্রাহ্য হয় না, মানুষ জেনে বুঝেই ওই বিপন্নতার স্রষ্টা, একথা দৃশ্যত মেনে নিতে কি মানুষেরই কোথাও অসুবিধা হয়?

চেতনার এমনই কোনও পরম্পরায় হয়তো দেবোপম সরে গিয়েছিল ছবি তোলার আনন্দের বা আবিষ্কারের ভেতর এই প্রশ্নবিহ্বল জগত থেকে। তার চেয়ে প্রকৃতি, নিসর্গ, নারী, শিশু, উদ্‌যাপনের ছবি অনেক অনেক নিস্তার। কিন্তু কতদিন থাকে সেই নিস্তারের বোধ আর পৃথিবী? অক্ষত? একসময় তো নিজের কাজ, নিজের অস্তিত্ব, নিজের ব্যস্ততা অর্থহীন মনে হতেই পারে একজন আলোকচিত্রীর। হাজার হাজার মুহূর্তকে নিজের ক্যামেরায় বন্দি করে রাখলেও ক্যামেরাম্যানের অপেক্ষা বা অতৃপ্তি কি নিঃশেষিত হয়, একটি প্রকৃত মুহূর্তের জন্য, যে মুহূর্ত সভ্যতার ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে উঠবে? ম্যাককুলিন ক্যামেরা নিয়ে মহাদেশের পর মহাদেশ ডিঙিয়ে এমন সব ছবি তুলেছেন, যাদের দিকে সত্যিই তাকানো যায় না। ছবি তো দেখার জন্যই তোলা হয়, সে ছবির দিকে দর্শকের তাকাতে না পারা কি ছবির অযোগ্যতা না অনন্যতা, সেই তর্ক নিজের কাছে প্রাসঙ্গিক হতে দেয়নি দেবোপম। ছবির নিষ্ঠুরতার ভেতরেই যে রয়ে গেছে তাকাতে না পারার রহস্য, গোইয়া-র মন্তব্য পড়ে দেবোপম কি সত্যিই তা বোঝেনি? বুঝেছে, কিন্তু ছবির ওই বয়ান থেকে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে, অন্য জগতের দিকে, অন্য প্রাপ্তি আর আচ্ছন্নতার দিকে। বা নিজের সরে যাওয়ার কোনও হুঁশ অথবা হদিশ নিজের কাছেই ছিল না, এমনও হতে পারে। মানুষ তো কতভাবেই তার কর্মসূচি থেকে, স্বপ্ন থেকে, আদর্শ থেকে সরে যায়, দূরে যায়, সবসময় সেই সরণ বা সেই দূর সে খেয়ালও রাখতে পারে না। কারুর আবার সমস্ত কাজের আড়াল হিসেবেই কাজে লাগে কর্মসূচি, স্বপ্ন, মতাদর্শ। সরে যাওয়া বা দূরে যাওয়া নিয়ে তাদের কোনও কাতরতা নেই, থাকে না। দেবোপমের কাতরতা, তার অচেতন পুলকের পরিণতি নিয়ে, ছবি তোলার নেশায় নিজের স্বপ্নের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া নিয়ে।

নিজেকে, নিজের কাজকে, কাজের অন্য আনন্দকে ফিরে পেতে দেবোপম পুরোনো বইপত্র

নামায় তাক থেকে। ম্যাককুলিনের বই খুলে পাতা ওল্টায়, বায়াফ্রার মতো নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশের লোকজন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময় নাইজেরিয়া থেকে পৃথক হয়ে যেতে চেয়েছিল, শুধুমাত্র এই চাওয়ার অপরাধে বায়াফ্রার নারী-পুরুষ-শিশুদের কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, ম্যাককুলিন তার ছবি তুলেছেন, সত্যিই সে ছবির দিকে তাকানো যায় না। ক্ষুধা, অপুষ্টি, দারিদ্রের সে এক অবর্ণনীয় ছবি। দেবোপমের শরীর শিউরে ওঠে। সে নিজে কি পারবে সারি সারি এমন মানুষের সামনে দাঁড়াতে, তখন কি তার ছবি তোলার কথা মনে থাকবে? যদি বাস্তবের কঠিন তাকে ছবি তোলার কথা ভুলিয়ে দেয়, তবে একরকম, আর যদি ছবিই তুলে যায় অনবরত, তবে কি একদিন সেই আলোকচিত্রীর কথা লোকে ফের বলবে না, যিনি ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষের ছবি তুলতে গিয়ে একটি শকুনের মুখের গ্রাস শিশুটির ছবি তুলে খ্যাতি পেলেও এই সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি যে, শকুনের ঠোঁটের ডগায় শিশুর ছবি না তুলে ওঁর বরং উচিত ছিল শকুনকে তাড়িয়ে শিশুটিকে প্রাণে বাঁচানো। বায়াফ্রা থেকে বাংলাদেশ আর ভিয়েতনাম, মানুষের মুখের আদল, গায়ের রঙ বদলায় কিন্তু দুর্দশা থাকে একই তীব্রতায়, দেবোপম কি আবার তেমন কোনও দুর্দশার ছবি তুলতে যাবে?

মানুষের শরীর নিয়ে, মানুষীর শরীর নিয়ে যা কিছু রহস্য, কৌতূহল আর তীব্র শরীরী টান, সব ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যায় ওইসব দাঙ্গাচিত্র, যুদ্ধচিত্রের দিকে তাকালে। শিশুর কোমলতা উধাও, নারীর রহস্য বলে কিছু নেই, চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধার মতো দড়ি পাকানো চেহারার বুকে কোনও মাংসের চিহ্নহীন চব্বিশ বছরের তরুণী, দেবোপম নিজের শরীরের বয়স ভুলে যায় বুঝি। চুপসে যাওয়া বেলুনের মুখে ফুঁ দেয় যেমন, ওই স্তনবৃন্তে সেভাবেই মুখ দিয়ে একটি শিশুর দুধের খোঁজ, সব অপত্যের সাধ মুছে দেয় দেবোপমের মন থেকে। সারি সারি ভিয়েতনামীর মৃতদেহের দৃশ্যে যতটুকু মৃত্যুর গন্ধ আছে, তার চেয়ে মৃত্যুর তীব্রতর গন্ধে দেবোপমের শ্বাস নেওয়া কঠিন হয় কলেরায় মৃত এক স্ত্রীকে নিয়ে পুত্রকন্যাসহ স্বামীর অন্তর্জলি যাত্রার ছবির দিকে তাকিয়ে, বাংলাদেশ, একাত্তরের। এ ভূগোল তো তারই ঘরের, তারই স্বজনের। মশা, মাছির মতো মরে আছে, বেঁচে আছে মানুষ, যত লাঞ্ছনা তার, সে তো মানুষেরই হাতে। যত অন্ধকার জীবনে, সে তো মানুষেরই সৃষ্টি। ক্যামেরার কোন আলো দিয়ে তা ঢাকবে দেবোপম?

দেবোপম বন্ধ করে রাখে, বই। টেবিলের ওপর সদ্য বেরনো এক ভারতীয় পাক্ষিকের মলাটের ভেতর কত না পণ্যের রঙিন স্বপ্নময় বিজ্ঞাপন দেখে এতক্ষণের ধূসর, বর্ণহীনতা থেকে রেহাই পেতে চায়। কিন্তু সময় তাকে যখন ধরেছে একবার, অথবা যে নিজে যখন চাইছে সময়কে ধরতে, তখন কি আর সহজে মেলে রেহাই? রঙিন পাতায় বিপন্নতার সব রং নিয়ে দেবোপমের জন্য অপেক্ষা করে থাকে প্রাণভিক্ষুক কুতুবদ্দিনের ছবি অথবা তরোয়াল হাতে গেরুয়া ফেট্টিবাঁধা প্রাণঘাতকের, বসরায় মার্কিন বোমায় বিধ্বস্ত বাড়ির উঠোনে বসে থাকা একাকী নাবালিকার, হাসপাতালের বেডে দুই হাত খোয়ানো কিশোরের, জ্বলতে থাকা তেলকুয়োর আগুন আর ধোঁয়ার, বাগদাদের মিউজিয়াম থেকে লুট হতে থাকা ইতিহাস আর সভ্যতার চিহ্ন, রফিগঞ্জে উল্টে পড়ে থাকা রাজধানী এক্সপ্রেসের কামরা থেকে উঁকি দেওয়া

এক মহিলার দুটি নিথর পা, জ্বলতে থাকা সবরমতী এক্সপ্রেসের কামরা। দেবোপম বোঝে না, তার স্নায়ু এতকিছুর ভার নেওয়ার মতো পোক্ত আর আছে কি না, অথবা আদৌ কোনওদিন ছিল কি না। যদি সে এইসব ছবিই তুলে যেত এতকাল, তবে তার হয়তো ছবি তোলা বন্ধই হয়ে যেত। অন্য ছবি তুলেছে বলেই হয়তো এখন ভাবতে পারছে এইসব ছবি তোলার কথা। যাঁরা বরাবর এমনই ছবি তোলে তাদের মনের অবস্থা কেমন হয়? তারা কি বোধহীন হয়ে যায়? ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষে পড়া ওই শিশু আর শকুনের ছবি তুলে পরে মানসিক বিপর্যয়ে পৌঁছে যান ওই ফটোগ্রাফার। এমন আরও উদাহরণ আছে। যতই টিভির দৃশ্যে দৃশ্যে সমস্ত অনুভূতি আর সংবেদন ভোঁতা হয়ে যাক, এখনও তো কিছু দৃশ্যে শিহরিত হয় মানুষ, বিপন্ন বোধ করে নিজের ভেতর, নিরাপত্তাহীনতায় কুঁকড়ে যায়। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতার দৈনন্দিনের মধ্যেও এইসব থেকে দূরে বাঁচতে চায় মানুষ। তখন প্রকৃতি-ই হয়ে ওঠে তার ভরসা, অবলম্বন। না হলে, কতটা ঘৃণায় আচ্ছন্ন, অভ্যস্ত করে দিলে, মার্কিন নৌসেনা জাহাজের ডেকের ওপর শরীরে শরীর জুড়ে বানিয়ে ফেলতে পারে প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি তাদের বার্তা ও নিজস্ব কর্তব্যের একটাই বয়ান, 'ধর্ষণ করো ইরাককে'। এমন আশরীর চেতনায় ছড়ানো, জড়ানো বিদ্বেষ ছাড়া মরুদেশ ইরাকে অনিশ্চিত যুদ্ধে যাবার আর কোন প্ররোচনা থাকে, সেনাদের? সমুদ্রের সুনীল জলের অনন্তে বা বাতাসের দোলায় সেই বিদ্বেষ তো লুপ্ত হয় না। 'টাইম' পত্রিকার ওই ছবি ইন্টারনেটে দেখতে দেখতে যদি দেবোপম ঠিকই করে নেয় যে, ছবি তুলতে সে যাবে না পশ্চিম ভারত অথবা অন্য কোথাও, যে ছবি সে তুলেছে এতকাল, বেঁচে থাকার জন্য, সেই ছবিই তুলবে। যদি ভাবে, অপ্রাপ্তি নিয়েই বেঁচে থাকবে, নতুন কোনও মাত্রার খোঁজে বেরিয়ে নিজেকে অসুস্থ করে তোলার চেয়ে সুস্থ জীবন শ্রেয় অনেক, তবে কি দেবোপমকে আমরা পালিয়ে যাওয়ার অপবাদ দিতে পারব? যদি গত শতাব্দীর সাফল্য–ব্যর্থতা এই শতকেও যুদ্ধ না থামাতে পারে, ব্যক্তি অথবা দেশের জন্য যুদ্ধ, যদি দাঙ্গা না থামাতে পারে, ভোট অথবা দলের জন্য দাঙ্গা, যদি হত্যালীলা না থামাতে পারে, তুচ্ছ অছিলায়, যদি সেই ধারাবাহিকে কোনও পরাজয় না মিশে থাকে সভ্যতার, সংস্কৃতির, মানবতার, তবে দেবোপমের একার সিদ্ধান্ত, ছবি তুলতে কোথাও যাবে না সে, কেন পালানোর অপবাদ পাবে, কোন যুক্তিতে? সংঘ হলেই তার সব খুন মাপ আর ব্যক্তি হলেই নির্জন কারাগার, এমন কোনও নিরিখ দেবোপম কেন মেনে নেবে জীবনে?

এক কিংকর্তব্য মোড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে দেবোপম। কে দেবে তাকে পরামর্শ? এই অন্ধকারে?

বাঘাচাঁদের প্রেমপর্ব

অনিল ঘোষ

যুদ্ধ যুদ্ধ করো কেন যুদ্ধ করো নাশ
শোনো তবে প্রেমকাহিনি মিটে যাবে আশ।
এ কাহিনি বাঘাচাঁদের রং আছে ঢের
ক্ষয় আছে লয় আছে তবু জয় প্রেমের।

তা বাবা, চারদিকে এত যুদ্ধের হুঙ্কার কেন? যুদ্ধ করে কী-ই বা লাভ। যুদ্ধ কি পেটের ভাত জোগায়, পরনের ত্যানা জোগায়, ঘরের ফুটো চালে খড় জোগায়? তা যখন জোগায় না, তবে কেন ওই সর্বনাশা ফাঁদে পা দেওয়া। শুধু ভাঙচুর, শুধু খুন-খারাবি—এ কোন্ সর্বনাশা সময় এল বলোদিনি। এই যে আঙ্গা বাঘাচাঁদ, এত যার জ্ঞানগুণ, এমন যার বিবেক-বুদ্ধি—সে-ও কিনা বোকার মতো ওই ফাঁদে পা দিয়ে বসল।

হ্যাঁ বাবা সেই বাঘাচাঁদ, তার কথা কত বলব। বলে বলেও ফুরোয় না। এই বিশাল সোঁদরবনের যেখানেই যাও, যেখানেই কান পাতো শুনবে তার নাম। তারে নিয়ে গপ্পোগাছা, ছড়া গান কত কী। আর পুজোপাঠ, ভক্তি ভজনা তো লেগেই আছে। থাকবে না কেন, বাঘাচাঁদ তো তোমার আমার মতন হেঁজিপেঁজি কেউ নয়, সে এই বিশাল বাদার দেশের অলিখিত রাজা, জীয়ন্ত দেবতা। হবে না কেন, বাঘাচাঁদ এই ভয়াল বাদার বনজঙ্গল কেটে আবাদের পত্তন করেছিল। বনের রাজা বাঘবাবাজীকে নিকেশ করেছিল হুঙ্কার দিয়ে, কুড়ালের ঘায়ে। বাঘ মেরেছিল বলেই ওর নাম বাঘাচাঁদ। তার দৌলতে আকালের দেশের হাড়-হাভাতে মানুষ পিলপিল করে আসতে থাকে বাদার দেশে। তারা আসে জমির টানে, ভাতের টানে, সুখের টানে। এ কাজের পত্তন যার হাতের কুড়ালে, যার গলার আওয়াজে—সে তো বাব যে সে মানুষ হতে পারে না। আদৌ মানুষ কিনা তাই নিয়ে কত কথা, তর্ক বিতর্ক। মানুষের মতো চেহারা হলেও আসলে সে দেবতা। তারে নিয়ে ঘরে ঘরে পুজো হয়, ঘন ঘন জয়ধ্বনি ওঠে। গান রচনা হয় মুখে মুখে। 'বাঘাচাঁদের মাহাত্ম্যকথা' ছড়ায় মুড়ে গাঁয়ের কবি হাটে হাটে প্রচার করে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, নেচে নেচে। সেই বাঘাচাঁদের দোরে মানুষ আসে মিছিলের মতন। কত তাদের আবদার, কত আর্জি। বাঘাচাঁদের জন্য জানমান সব কবুল—বাঘাচাঁ হে তুই আঙ্গা দ্যাওতা, ভয়ডা তাইড়ে দে বাপ—।

মানুষের আবদার আর্জিতে গলে গলে বাঘাচাঁদ হয় খুশি। তার মুখে মিচিক মিচি হাসি। হাসিমাখা গলায় সে বলে :

ওসব কথা বলিলে মন ভরে না আর
ফুউস করে উড়ে যায় বাণী সবাকার।
শূন্য কলসি ঠকঠকায় ওতে লাভ কী
দাও তবে লাল মোরগা তোগা ভক্তি দেখি।

হ্যাঁ বাবা, বাঘাচাঁদকে পুজো দিলে হৃষ্টপুষ্ট একখান লাল মোরগ দিতে হবে। তবেই সে সন্তুষ্ট। তবেই সে অভয় দেবে, তোমার দোরে পা দেবে, ভয়-ভিত তাইড়ে দেবে।

তা বাদা-আবাদের মানুষ দেবে না কেন। বাঘাচাঁদের দৌলতে ওদের জীবন থেকে বাঘের ভয় গেছে, সাপের ভয় গেছে, ওলাবিবি শীতলাবুড়ি সব পগার পার। গাঁ ঘরে সুখের বান ডাকছে। তা বাবা সুখ কারে কয়? নিজের গতরে করা জমিন, সেই জমিন ভরা ধান, পেটভরা ভাত, ঘরের চালে খড়, ঘরনির হাসি, কচি-কাচার আধো আধো বুলি—সুখ তো এইসব। এসব কার দৌলতে? বাঘাচাঁদের দৌলতে। বাঘাচাঁদ হে, গাঙের ঢেউ-এর মতো পরমায়ু হোক তোর। তোর হাতের কুড়াল, গলার হাঁক আঙ্গা রক্ষা করুক। বাঘাচাঁদ হে—দ্যাওতা হে—। এভাবে প্রার্থনা জানায় মানুষজন। কাছের দূরের। চেনা অচেনা।

এইভাবে দিন যায় বছর হয় পার
বাদার দেশে হাসি মুখ দুখ নেই আর।
পুজোয় তুষ্ট বাঘাচাঁদের দেহভরা ঘুম
কাজে কামে মন নেই শুয়ে থাকে নিঝুম।

হ্যাঁ বাবা, মানুষ বসে থাকলে গতরে পোকা পড়ে। কোনও কাজে উৎসাহ থাকে না। আর দেবতা হলে তো কথাই নেই। তার নড়াচড়ায় মানুষের গায়ে যেন ব্যথা লাগে। তাদের মুখে সবসময় আহা-উহু। সে উঠলে আহা, হাঁটলে উহু। আর ছুটলে তো কথাই নেই। পারলে বুঝি বেঁধে রাখে প্রাণের বাঘাচাঁদকে। এসব করে কারা? যারা বাঘাচাঁদের আশেপাশে আছে, বন্ধুবান্ধবের দল। তাদের এত আহা-উহুতে বাঘাচাঁদের মুশকো জোয়ানি শরীর হয়েছে নাদুস-নুদুস, গোলগাল। নড়তে চড়তে সময় লাগে। কাজ কাম তো নেই, তাই আর কী করে, ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়। দূর দূর গাঁয়ের লোক আসে আর্জি নিয়ে, আবদার নিয়ে, বাঘাচাঁদ হে—। কিন্তু তাদের ডাক পৌঁছয় না বাঘাচাঁদের কানে। বন্ধুবান্ধবের কঠিন হাত আর চোখের দৃষ্টি আর্জিদারকে পৌঁছতে দেয় না বাঘাচাঁদের ত্রিসীমানায়। মুখে সাফ কথা, বাঘাচাঁদ এমন ঘুমায়, তোমরা পরে এসো—।

আর্জিদার ফিরে যায় বিষণ্ণ মনে। মুখে অনুযোগ, দেবতা যেন দূরে চলে যাচ্ছে।

আর বাঘাচাঁদের তখন কী অবস্থা? সে-ও তো হাঁফিয়ে উঠেছে। তার যে শরীর আছে, মন আছে, সেই মনে ভাষা আছে, ইচ্ছা কামনা বাসনা আছে—এটাই বুঝতে চায় না কেউ। মন বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহী মন কারও বাধা মানে না। গোলগাল শরীরও বিদ্রোহের ডানায় ভেসে ভক্তের গড়া পাঁচিল ভেঙে চলে যায় বিদ্যা নদীর পাড়ে। আর সেখানেই ঘটে যায় এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। হ্যাঁ বাবা, সেই কাণ্ড-কাহিনি বলব বলেই এত কথা, এত প্যাঁচ-পয়জার। এবার শোনো সেই কথা :

বিদ্যা নদী বিশাল নদী। তার বুকভরা জল, পাড় ভরা জঙ্গল। আকাশে চাঁদ বাঁকা, সাত তারার শরীর বাঁকা, পিঠে বাতাসের চলন বাঁকা। তারা সবাই মিলে যেন বলে এক কথা, কই যাও হে—? বিদ্যা নদীর পাড়ে বসে এইসব সাত পাঁচ ভাবে বাঘাচাঁদ। ভাবে আর চোখ মেলতে

চোখে পড়ে বিদ্যা নদীর বুক বেয়ে ভেসে চলেছে ছোট্ট একখানি নাও। ছোট্ট হলেও সুন্দর করে সাজানো। ফুল পাতালতায় ঢাকা। আর তার পাটাতন আলো করে বসে আছে পরমা সুন্দরী এক রমণী। তার মেঘবরণ চুলের রাশি উড়ছে মিষ্টি মধুর বাতাসে। বিশাল বিদ্যা নদীর সবুজ বুক ওই রমণীর রূপের ছটায় যেন ঝলমল করছে। আর রূপসীর রূপ পূর্ণতা পেয়েছে ওর হাতে ধরা ধবধবে সাদা বক পাখি।

বাঘাচাঁদের চোখ স্থির। বুকের ওঠানামা স্তব্ধ। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাথরের মতো অনড়। কে ওই নারী, যার অমন রূপ বাদার দেশকে আলোকিত করে দিচ্ছে! অবশেষে চোখে চোখ পড়ে দুই মানুষের। পুরুষ ও রমণীর। দুজনের চোখ স্থির। স্তব্ধ। বিস্ময়ে শিহরিত আস্তে আস্তে দুই মানুষের চোখ যেন ভাষা পায়। মুখের হাসি হয়ে তা ফুটে ওঠে। তখন ওদের মধ্যে কথা হয়। সে কথা এরকম :

বাঘাচাঁদ : কোন বা দেশের কন্যা তুমি
কোন বা দেশে যাও
তুমি ওগো রূপের নদী
বারেক ফিরা চাও।

কন্যা : শালিডাঙার কন্যা আমি
দখিন দেশে যাই
কে গো তুমি বীরপুরুষ
নাম জানিতে চাই।

বাঘাচাঁদ : বাঘাচাঁদ নাম আমার
বাদার দেশে বাস
তোমায় যদি পাই কন্যে
হইব ক্রীতদাস।

কন্যা : মা বাপেরে কইও বাঘা
শালিডাঙায় গিয়া
বিহার কথা পাড়ো সেথায়
সাতশো টাকা দিয়া।

চলে যায় কন্যে। যায় দখিন দেশে। আর বাঘাচাঁদের বুকের কথা, মুখের ভাষা, মনের ইচ্ছ কামনা বাসনা সব যেন শুষে নিয়ে যায়। সবকিছুই তার কাছে অসার লাগে। সেই বিদ নদীর পাড়ে একা বাঘাচাঁদ পা দাপায়। বুকে চাপড় মারে। বিশাল বুকের গহ্বর ছিঁড়ে খুঁ আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস। সেই শব্দে সমস্ত বাদাবন যেন হু হু করে কেঁদে ওঠে। নোনা নদী ঢেউ উথাল-পাথাল হয়ে যায়। সেই শব্দ হাওয়ায় মিশে ঝড়ের মাতন তোলে। যারা ছিl কাছাকাছি, আশে পাশে—তারা সবাই চমকে ওঠে, কে এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে? খোঁজ খোঁজ বোঝা গেল, এ বাবা যে সে মানুষের শ্বাস নয়। এ নিশ্চয়ই বাঘাচাঁদ।

ভাবনা যখন সত্যি হল, তখন এল আর এক ভাবনা, এমন করে কেন বাঘাচাঁদ, কী ওর দুঃখ?—কী হল হেই বাঘা—? বন্ধুরা হাঁকে, তার চারপাশে জড় হয়ে।

বাঘাচাঁদ কারও দিকে তাকায় না। কথা শোনে কি শোনে না, তার বুকের ভাষা মুখে আসে বিষণ্ণ হয়ে, জেবনডা বেথা গ্যালো র‍্যা—।

কথা এমন, শুনলে অবাক হতে হয়। —হেই বাঘা তুই এমন কথা কেন বলিস? কী হয়েছে তোর? বন্ধুরা বলে। জানতে চায়। প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী।

তখন কাল বলতে বসন্ত। এই কালটা নাকি সর্বনেশে। লোকে বলে। ধুঁধুল গাছে ফুল আসে। তার পাতা হয় লাল। গরাণ গাছের গা থেকে ভেসে আসে মদ মদ গন্ধ। থেকে থেকে কোকিল ডাকে, কুহু। মাঝরাতে পাপিয়া বলে, চোখ গেল। আর ওই যে এক মহা বদমাশ পাখি আছে, নাম ঘুঘু—সে তো দিনরাত মরণের ডাক ডাকছে, কুরু-র কুরু-র। ওই ডাকে বুকের জমি ফাঁকা হয়ে যায়। যেন টুটাফাটা খরার মাঠ। মনটা তখন সত্যিই হু হু করে ওঠে। কাজে মন বসে না। খেতে শুতে ইচ্ছে হয় না। জীবনটা সত্যিই বৃথা মনে হয়।

বন্ধুরা ভেবে ভেবে সারা, কীসে বাঘাচাঁদের দুঃখ কাটবে। চাপা গুঞ্জন। ফিসফাস। কথার পিঠে কথা। তার পিঠে কথা। তবু সমস্যার কিনারা নেই। সবাই পড়ে আছে যেন অকূল আঁধারে। বাঘাচাঁদের পায়ে মাথা কুটলেও মুখ খোলে না। সে খায় না, কথা বলে না। সবসময় মনমরা ভাব। দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল তার পুরুষ্টু শরীর।

তবু মানুষের আসার কমতি নেই। মানুষ আসে পুজো নিয়ে। মানুষ আসে সমস্যা নিয়ে, বাঘাচাঁদ বাঘাচাঁদ শুনিছো কি বারতা? শোনো বাঘাচাঁদ, শোনো আগুগা কথা :

জমি খায় মহাজনে
জমি যায় গাঙে
হাঁক দাও বাঘাচাঁদ
বেঁচে থাকি প্রাণে।

বাঘাচাঁদের কোনও হেলদোল নেই। সে নীরব। নির্বিকার। কোনও দিকে তার মনে নেই। কোনও কথায় টান নেই।

তা বাবা, এভাবে তো দিন চলে না। বন্ধুরা পড়ে বিপাকে। বাঘাচাঁদ যদি এমনধারা আচরণ করে তবে তো মহা সর্বনাশ। নির্ঘাত ভয় আবার জাঁকিয়ে বসবে। বাঘ শ্যাল জিন দানো আর যত কু-বাতাসের চর—যারা আছে চারপাশে থাবা উঁচিয়ে, যারা কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না বাঘাচাঁদের দাপটে, তারা তো আবার ফিরে আসবে স্বমহিমায়। দাপটে চালাবে তাদের রাজ্যপাট। তাহলে বাঘাচাঁদের আর মূল্য কী। পুজো কেন করবে লোকে? ভক্তিই বা কেন করবে? এরপর তো মানবেই না। তাছাড়া বাঘাচাঁদের দৌলতে বন্ধুদের একটু আয়-উন্নতি হচ্ছিল। সুখের ভাণ্ডার ভরছিল মন্দ না। সে সবও তো উবে যাবে ফুৎকারে। আর ভয় ফিরে এলে কী হবে। দুঃখ আসবে। কান্না আসবে। জীবন আবার হা হা অন্ধকার। বহুদিন আগে ফেলে আসা কষ্টের জীবন ছায়া ফেলে যেন সকলের চোখে মুখে, মনের আকাশে।

বন্ধুদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে যখন কাজ হয় না, তখন ছুটে আসে অগতির গতি রাখু সর্দারের দোরগোড়ায়।

এই রাখু বা রাখহরি হল সেই মানুষ, যে আকালের দেশ থেকে বাঘাচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এই বাদার দেশে। তখন বাঘাচাঁদ কতটুকু। পনেরো-ষোলোর ছোকরা বটে। ভাতের

অভাবে তার শরীর শুকিয়ে পাকাঠি। রাখুই ওকে ভাত দিয়ে, জল দিয়ে, ঠাঁই দিয়ে বাঁচিয়েছিল। সেই সুবাদে রাখু ওর বাপ না হলেও বাপের মতন। সেই রাখু সব শুনে মুচকি হাসে। বলে, এ তো সোজা ব্যাপার—।

—কী রকম। বন্ধুরা সব হামলে পড়ে।

রাখু বলে; তবে শোন :

ঘুঘু ডাকে কুরুর কুরুর কোকিল ডাকে কুহু
আমার বাঘার জোয়ান বয়েস মনডা করে হু হু।
কালটা যে সব্বোনেশে মউ জমেছে বনে
আমার বাঘা উড়নমুখী রং লেগেছে মনে।

তাই নাকি! বলে হই-চই জুড়ে দেয় বন্ধুরা। কথাটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু রাখুর কথা ফেলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এটা তো ঠিক, কালটা বড় সর্বনেশে। এ কালে বুক পোড়ে কি মন পোড়ে। বাঘাচাঁদ মানুষ বটে। পুরুষ মানুষ। সা-জোয়ানি বয়েস। তালগাছের মতো লম্বা। বটগাছের মতো বিশাল। এমন পুরুষের মন তো উড়বেই বকপাখির ডানার মতন।

তা ছাড়া এখানে কথা আছে আরও। বন্ধুদের সকলের বউ আছে। দু-চারটে ছেলেপুলেও হয়েছে। শুধু বাঘাচাঁদের ঘর শূন্য। আর শূন্য ঘরে কি মন টেঁকে? সে তো উড়বেই, আর বুক ছিঁড়ে আসবে দীর্ঘশ্বাস।

বন্ধুরা সব ছুটে এল বাঘাচাঁদের দোরগোড়ায়। তারা সমস্বরে বলে :

ধুঁধুল গাছে ফুল এল ঘুঘু ডাকে কুরুর
অচিন গাঁয়ের অচিন পাখি খবর আনে বধূর।
বগা ওড়ে বগি ওড়ে কালটা বড় খাসা
ওরে বাঘা একটু হাস পূরিবে তোর আশা।

তা কী বলব, কথা শুনে মনমরা বাঘাচাঁদের মুখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে বিদ্যুৎরেখা। চকিত হাসির ছটায় চোখ মুখ গোটা শরীর যেন ঝলসে ওঠে। চোখের দৃষ্টি ফেরে বন্ধুদের দিকে।

বন্ধুরা বলে, বিহা করবি হেই বাঘা?

—বিহা। বাঘাচাঁদ অবাক। এমন মজাদার আর রোমাঞ্চকর কথা শুনে ওর মুখ হাসে কি মন হাসে। মুখে বলে, বিহা করিব, ক্যানে?

বন্ধুরা বলে, বয়েস হইলে বিহা করিতে হয়, তুই করবি কিনা বল।

বাঘাচাঁদ লজ্জা পায় এবার। লাজুক মুখে হেসে বলে, বিহা করিতে কন্যা লাগে। কন্যা কোথা?

—এই বিশাল সোঁদরবনে এত গাঁ ঘর, এখানে কন্যার অভাব!

—না না ওসব কেলেকষ্টি, নাক বোঁচা কন্যা আমি চাই না—।

—তবে কী চাস তুই, মন খুলে বল্।

বাঘাচাঁদ তখন খানিক হেলে, খানিক দুলে লাজুক লাজুক গলায় বলে :

কন্যা আছে শালিডাঙায় ভুবনভরা রূপ
তারে আমি না পাইলে গাঙে দিব ডুব।

শালিডাঙা যা তোরা বিহার ঘটক নিয়া
মা বাপেরে বলবি সব সাতশো টাকা দিয়া।

তা বাবা, বাঘাচাঁদের বিহার ফরমাশ নিয়ে তো ঘটক গেল নাচতে নাচতে, কিন্তু ফিরল সে বিষণ্ণ মনে, বিমর্ষ মুখে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, কী হল?

ঘটক বলে, অপরাধ নিও না বাপু, সত্য কথা বলি :

শালিডাঙার রাজাবাবু অহংকারী ভীষণ
কন্যা দেবে রাজার ঘরে এই তার পণ।
বাঘার কথা বলতে গিয়ে শুনি হা হা হাসি
বলে, তোগা ফেকলু রাজা অনেক দেখাছি।

—কী এতবড় কথা! বন্ধুরা লাফিয়ে ওঠে সবাই। ছেঁকে ধরে ঘটককে, আর কী বলেছে বল্ দেখি—।

ঘটক যা বলে তার মর্ম উদ্ধার করলে দাঁড়ায় এইরকম : শালিডাঙার রাজা খুব অত্যাচারী, তোনাতায় প্রজার জমি হাতিয়ে নেয়। বাধা দিলে খুন করতেও পিছপা হয় না। শোনা কথা, তার বাগানে নাকি অনেক প্রজার লাশ পোঁতা আছে। ধনের অহংকারে তিনি ধরাকে রা দেখেন। বাঘাচাঁদের কথা বলতে গিয়ে তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। বলেন, তোগা ঘাচাঁদ ছিল এককালে, যখন বাঘের ভয় ছিল। এখন বাঘ গেছে বাদাবনে। আবাদভূমিতে ার কীসের ভয়। যাও হে ঘটক, চাষাভুষোদের হাভাতে রাজার হাতে কন্যা দেওয়ার থেকে ঙের জলে ভাসিয়ে দোব—।

কথা শুনে বাঘাচাঁদের শরীর ফুলতে থাকে। চোখ হয় জবাফুলের মতো লাল। রোমকূপ ড়া খাড়া। দু-হাত ছড়িয়ে লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে আসে। বহু-বহুদিন পরে তার গলায় ক ওঠে। যে হাঁকে একদিন বনের বাঘ কুপোকাত হয়েছিল, বাদাবন স্তব্ধ হয়েছিল। এ ই হাঁক। বাঘাচাঁদ বুকের ছাতি চাপড়ে বলে :

বাদার পুরুষ আবাদ পুরুষ শোনো সার কথা
এ জগৎ সৎ পুরুষের অসৎ নাই হেথা।
যে পুরুষ পীড়ন করে তারে করো নির্কেশ
বাঘাচাঁদ যুদ্ধ করিবে অত্যাচারীর দিন শেষ।

বলে বাঘাচাঁদ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। গলায় হাঁক ওঠে, চলো ভাই শালিডাঙায়—।

তা বাবা কী বলব, বাঘাচাঁদের হাঁকের এমন মহিমা, বাদা-আবাদের সব মানুষ নড়েচড়ে ়। গাঁ ঘরে রটে যায় বার্তা, বাদার দেবতা বাঘাচাঁদ যুদ্ধের ডাক দিয়েছে, চলো যাই লিডাঙায়—।

পিলপিল করে মানুষ আসছে তো আসছেই। চারদিকে সাজো সাজো রব, যুদ্ধের ভেরী জ। বনের বাতাস উদ্দাম হয়ে ওঠে। নদীর জল টগবগিয়ে বয়ে চলে। সবাই একযোগে া, বাঘাচাঁদ হে, আমরাও আছি—।

যুদ্ধের আওয়াজ বড় ভয়ঙ্কর, বড় নির্মম, নিষ্ঠুর। বার্তা রটে যায় চারদিকে। বাদার া বাঘাচাঁদ চলেছে যুদ্ধে। শালিডাঙার রাজা বড় অত্যাচারী। তিনি জঙ্গল হাসিলের জমিন

নিজের ভোগে দেন। যে মানুষ দিনের পর দিন জঙ্গল হাসিল করে জমিন তৈরি করল, তার কপালে জুটল কিনা লাথি। এই অভিযোগ পৌঁছল শালিডাঙার রাজার কানে। তার দোরগোড়ায় তখন বাদা-আবাদের যোদ্ধাদের হুঙ্কার। তিনি বললেন, অভিযোগ মিথ্যা। বাঘাচাঁদকে আমি কন্যাদান করব না বলে সে জোর করে আমার কন্যা নিয়ে যেতে যায়।

কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। তবে যুদ্ধ যাতে না হয়, সেই চেষ্টা চলতে লাগল জোর কদমে। কেউ শালিডাঙার রাজাকে বোঝায়, তুমি কন্যা দাও, ঝামেলা মিটবে। কেউ বাঘাচাঁদকে বোঝায়, শালিডাঙার রাজা তোমায় কন্যা দেবেন, তুমি আর যুদ্ধ কোরো না।

বাঘাচাঁদ কিন্তু অনড়। এসব শান্তি-সন্ধির কথা সে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। হুঙ্কার দিয়ে বলে, কন্যার কথা আসে কেন! আঙ্‌গা দেশে কি কন্যার অভাব! আমি শালিডাঙার রাজার অত্যাচার বন্ধ করতি চাই। ওর বাগানে আমার হাজার হাজার ভক্তের লাশ পোঁতা আছে। এমন অত্যাচারী রাজা কী করে থাকে!

কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। কিন্তু শান্তি সন্ধির চেষ্টা চলতে লাগল নানাভাবে। কিন্তু যখন দেখল বাঘাচাঁদের বিশাল বাহিনী প্রচণ্ড মারমুখী, শালিডাঙার রাজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত—তখন আর কেউ এগোলো না। নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকাই উচিত মনে করল।

যুদ্ধ যখন হয় হয়, আকাশ যখন হুঙ্কারে হুঙ্কারে কালো হয়ে উঠেছে, তখন সেই কালোর চাদর ভেদ করে উড়ে আসে একটি সাদা বক। আসে বাঘাচাঁদের শিবিরে, বাঘাচাঁদের কাছে তার চোখের ভাষায় কী যেন লেখা। যে ভাষা হয়ত পড়তে পারত বাঘাচাঁদ, কিন্তু বাঘাচাঁদ তখন রোষে এমনই উন্মত্ত, শালিডাঙার রাজাকে নিকেশ না করে ওর যেন শান্তি নেই সে দেখতেই পেল না বককে। ওর বন্ধুরা যখন 'আহা কী সুন্দর বক' বলে ধরতে আসে- বক বেচারা তখন কী করে, শূন্যে ডানা ভাসিয়ে দেয়। আর তখনই খেয়াল হয় বাঘাচাঁদের আরে এতো শালিডাঙার রাজকন্যার প্রিয় বক। নিশ্চয়ই কোনও বার্তা বয়ে এসেছিল সে —আরে ধর-ধর—। বলে ছুটে আসে বাঘাচাঁদ। কিন্তু সে বক তখন কোথায়! শূন্যে ডানা ভাসিয়ে চলে গেছে রাজপুরীর দিকে। হয়ত রাজকন্যাকে বলতে গেছে, তোমার প্রিয় পুরু তোমার প্রার্থনা শুনল না।

তা বাবা কী বলব, বাঘাচাঁদের মন খারাপ হলেও কিছু করার ছিল না। যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধ না করার কোনও মানে হয় না। সঙ্গীসাথীদের উন্মত্ততা দেখে বাঘাচাঁদ যুদ্ধ শুরু হাঁক দিতে বাধ্য হল, মন না চাইলেও।

যুদ্ধ শুরু হল। আর যুদ্ধের কথা কী বলি। শালিডাঙার রাজা তো নামেই রাজা। সে দুর্মুখ বটে, অত্যাচারীও বটে, কিন্তু লোকবল তার ছিল না। সুযোগ বুঝে তার নিজের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে বাঘাচাঁদের উন্মত্ত বাহিনীর সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তার সমস্ত প্রতিরোধ। তার সাজানো রাজ্যপাট তছনছ হয়ে গেল। যেন হাওয়ায় উবে গেল সবকিছু। মুহূর্তেই শ্মশান সে দেশ, শূন্য রাজপুরী :

লুঠপাটে শ্মশান হইল শালিডাঙা নগর
পুরুষ মরিল নারী লুটিল পুড়িল ঘরদোর।

বাঘাচাঁদের আকুল হৃদয় ছুটিল রাজপুরী
হা কন্যা হা কন্যা ডাকে যেন সুরলহরী।

কিন্তু কোথায় সে নারী। বাঘাচাঁদ শূন্য পুরীতে দেখল পালঙ্কে পড়ে আছে কন্যার পোশাক, মেঘবরণ চুলের রাশি। কন্যা কোথাও নেই। সে তখন বক হয়ে ডানা ভাসিয়েছে আকাশে। শূন্যে ভেসে চলে তার কান্না।

বাঘাচাঁদের বুক ভেসে যায় চোখের জলে। অত বড় শরীর দুমড়ে-মুচড়ে একাকার। বুকে চাপড় মারে ঘন ঘন, আর হাহাকার করে চলে একটানা। এভাবেই সে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায় রাজপুরী থেকে। বাইরে আ-দিগন্ত মাঠ। তার শরীর মিশে যায় সেই মাঠে। তার কান্না মিশে যায় বাতাসে। পিছনে পড়ে থাকে রণক্ষেত্র, রক্তাক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত শালিডাঙা।

তাই বলি বাবা, যুদ্ধ যুদ্ধ করো কেন, যুদ্ধ বড় সর্বনেশে। এই যে কাল, এই বসন্তকাল— এ কালটাও খুব সহজ নাকি। কোকিল ডাকে কুহু, পাপিয়া বলে, চোখ গেল, আর ওই যে এক মহা বদমাশ পাখি, নাম ঘুঘু, সে তো দিনরাত ডাকছে, কুরু-র কুরু-র—। এই কালে প্রেম আসে, আবার যুদ্ধও আসে। সর্বনেশে যুদ্ধ। এই যে আগুণা বাঘাচাঁদ, তাকে আর দেখা গেল না বাদার দেশে। শূন্য হৃদয় নিয়ে অকূল আঁধারে সে কাঁদে। কান পাতো বাতাসে, শুনবে তার কান্না। চোখ মেলো আকাশে, দেখবে তার দয়িতা বকপাখিকে। — ওই হে বাঘাচাঁদ ফিরকে এসো—। এই বলে বাদার মানুষ হাঁক দেয়। ওই শোনো—।

বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন

অধিপ ঘোষ

—ওহায়ু গোজাইমাসু
—কোম্বান ওয়া
—ও দোঙ্কি ডেসুকা
—ও কাগেসামা ডে
—নিহঙ্গো গা ডেকিমাসু কা
—সুকশি ওয়াকারিমাসু
—কেককু ডেসু

মাথার উপরে তো বর্ষায় ধোয়ামোছা আকাশ এখন পেল্লায় একখানা নীল শ্লেট। আর তাতে যেন অপুর কাঁপাকাঁপা হাতে মেঘখড়ির আঁক, অ আ ই ঈ। অথচ নীচের পৃথিবীতে কেন যে আগাম এমন কুয়াশা-কুয়াশা সংলাপ। এর মাধ্যমে কি সেই পারস্পরিকতার সেতুভাঙা ভাষা যার জন্য ওল্ড টেস্টামেন্টের নিমরডের বেব্‌ল প্রাসাদ স্বর্গ ছুঁতে-ছুঁতেও শেষটায় পারেনি।

কিন্তু সংলাপের সিঁড়ি বেয়ে কী সুন্দর নামছে শব্দগুলো। এক-একটা বাক্যের সারে গায়ে গা লাগিয়ে, পা টিপে-টিপে। এদের কাছেই হয়তো একদা সুনীলের প্রত্যাশা ছিল, শব্দ তার প্রতিবিম্ব দেখাবে বলেছিল, গোপনে। প্রত্যাশা নিখুঁত। শব্দের ছাঁচেই তো গড়া হয় বাকপ্রতিমার মুখ। নির্ব্রণ, নিটোল। অর্থ আসতে এখনও অনেক-অনেক দেরি। সেই উচ্চৈঃ মন্ত্রোচ্চারণের হাত ধরে নবপত্রিকা স্নানের সকালে। আপাতত, অনেক ভালো চুপ করে থাকা।

নব্বই উর্ধ্ব প্রীতিরঞ্জন। বরিশাল গাভার ঘোষদস্তিদার। সেই বরিশাল, আইতে শাল যাইতে শাল। এক ইঞ্চি এখনও যেখানে রেলপথ নেই। পার্টিশনের আগে যার পরিচিতি, গ্র্যানারি অভ বেঙ্গল। তায় আবার ঘোষদস্তিদার। গাভার দস্তিদার খাওয়ানে বাহার।

প্রায় তিন দশক এক বুক আগ্রহ নিয়ে এই মানুষটি অপেক্ষা করেছেন। তাঁর যৌবজীবনের মৃত্যুপালানি কাহিনি কেউ একজন শুনুক। নিকট কেউ একজন, থেকে থেকে 'তারপর'-এর শৈশকৌতূহল নিয়ে। এক দীর্ঘ বেলা ধরে। আমেরিকান লেখক থোরাউকে অজান্তে স্মরণ করেই হয়তো প্রীতিরঞ্জন বলতে চেয়েছিলেন, সত্য প্রকাশে দুইজনই যথেষ্ট, একজন বলায় অন্যজন শোনায় যদি সচেষ্ট। তাই বলে লোকপ্রচারের জন্য এই আত্মভাব, এমন ভাবাটা ঠিক হবে না। প্রসঙ্গত, মানুষটি রুক্ষ এক মানসিকতায় শুধু প্রচার বিমুখই নন, ঘোরতর প্রচারবিরুদ্ধ। চিরটা কাল। অদ্যাবধি। থাকবেনও। এ তাঁর নির্বর্ষ জিদ।

কিন্তু তা কী করে হয়। বেগবর্ধন আর বেগহ্রাস তো তবে প্রীতিরঞ্জনকে হাস্যকর স্ববিরোধী করে তুলবে। আর আমরা জানি, এইসব সুযোগের গলিপথ ধরেই সংযোগী অব্যয় 'কিন্তু' অনুপ্রবেশ করে আমাদের রোজকার কথায়, কাজে। যেতে পারি কিন্তু কেন যাব? এই ফাউস্টীয় দ্বন্দ্ব-ধন্দের দরুনই-না ম্যাকবেথ্-এর স্বগতোক্তিতে চার-চারটে 'বাট' চলে এসেছে ওই নাটকের

প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে! সাধে কি, এ হেন পরিস্থিতির চাপটাকে হাল্কা করতে স্বয়ং সেক্সপিয়রকেই আমরা প্রাত্যহিকতায় টেনে নামাই, বাট মি নো বাটস!

এই প্রসঙ্গে মিলটনের, সব আবেগ নিরসন যবে মনে যথার্থ প্রশান্তি রবে, মিথ্যাবাদ। আবেগ কি সত্যিই নিরসন হয়! প্রত্যেক চৈতন্যের ফেনায়িত তরঙ্গায়ন কী করে, আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে, আপনা-আপনি স্থিতপ্রজ্ঞ হবে! হয় না, আর হয় না বলেই দান্তের ডিভাইন কমেডি-তে ত্রিস্তর সিঁড়িভাঙা অঙ্কের চিরোজ্জ্বল পথসূত্র, মানুষের মনোরাজ্যের নির্ভুল ঠিকানা, নরক, বিশোধন, স্বর্গ। আবেগ-দমন যুক্তিগ্রাহ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু আবেগ নিরসন হাস্যকর। ভিসুভিয়স এখন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সময়ের নীচে, কিন্তু সব ঘুমন্তকে বিশ্বাস করতে নেই, ঘুমের মধ্যেও ওরা জেগে উঠবে। মিলটনীয় তত্ত্বকে তাই যোগমার্গ বলে চিহ্নিত করা কষ্টকর। অন্তত প্রীতিরঞ্জনের ক্ষেত্রে।

দুই আমেরিকান ব্যবস্থাপন মনোবিদ যোশেফ লুফ্‌ট আর হ্যারি ইনগ্রাম তাঁদের সৃষ্ট দ্য যোহ্যারি উইনডো-তে মুক্ত, বদ্ধ, গুপ্ত আর সুপ্ত এই চারটি উইনডো বা বাতায়ন পথ ধরে বক্তা আর শ্রোতার মধ্যিকার মন চালাচালির যে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত অভ্যাগমের কথা বলেছেন, বাস্তবের ধোপে শেষ বিচারে, তা-ও খুব একটা গ্রহণযোগ্যতার শংসাপত্র পাচ্ছে না নানা কারণে। সবচেয়ে তার মধ্যে জোরালো এই প্রীতিরঞ্জনের স্মরণ-সরণি এত কাল পরে কী করে এখনও কৌশিক মসৃণ থাকবে! শত শীতাতপনিয়ন্ত্রেও তো মহাফেজখানায় ধুলো-ঝুল জমে! প্রীতিরঞ্জনকে তাই সংসর্পী হতেই হবে। স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধিতেই যে তাঁর এখন ডাকহরকরা মন। আর এই মনের যে কী কষ্ট! এতে ঠিক সৃষ্টি-স্ফুরণের উদ্‌গিরণ কণ্ঠ্যজ্বালা! আরবি কবি কাহ্‌লিল জিব্রানের বিশ্বাস। এই দহনের লাঘব একমাত্র জলজ সুতানে। অজানার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের বলাকা তাই নিশ্চল শূন্যপথে মুখর পরিপ্লব। জাপানি কবি ইওন নোগুচির বিয়ন্ডিং দ্য ইমাজিনেশন বা কল্পোর্ধ্বতায় মানুষ আর প্রাকৃতিক আত্মিক সহবাসে বাধ্য করানোর আহ্বান এই জন্যই, কবি হতে হলে একজনকে ফুল হতে হবে।

অবশ্য বিষয়টির অন্য আর একটি দিকও আছে। প্রীতিরঞ্জন কি সত্যিই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর বিস্মৃতির সংস্কার করবেন? তাঁর মনের দমন-অবদমনের ইচ্ছেটা কি বয়সের সাথে সাথে অনেকটা ভোঁতা হয়ে যায়নি? যায় না, যাওয়ার কথা নয় কারুর ক্ষেত্রেই। কারণ এই ইচ্ছের সঙ্গে মগ্নচৈতন্যগত প্রত্যক্ষকরণ মিললেই তো সেই জাং-উদ্ভাবিত ছায়ালোকের হদিশ পাওয়া যাবে। যেখানে ঠিক এখন প্রীতিরঞ্জনের মনের বাস। এই রোমান্টিক ছায়ালোক থেকে মানুষটিকে আকাশভরা সূর্য তারার বাস্তব দুনিয়ায় হাত ধরে নিয়ে আসতে অনেক অনুরোধ-উপরোধ, ধৈর্য, কৌশল আর মেহনতের সাহায্য লাগবে। একটা গুড ফ্রাইডে থেকে ইস্টার সানডে কতটা সময়, যা যিশু হাতে পেয়েছিলেন তাঁর মানবদেহ থেকে ট্রানস্‌ফিগার করে স্বর্গমুখী ফিনিক্স হতে। পান-দেশান্তরী প্রীতিরঞ্জনকে তাই বারবার শোনাতে হবে আর এল স্টিভেনসন-এর রেকুইম, ঘরে ফিরল নাবিক, সমুদ্র থেকে ঘর, ঘরে ফিরল শিকারী, পাহাড় যে তাঁর পর।

অঘটন আজও ঘটে-র ক্লিশেত্ব কাটিয়ে তাকে সত্যতর প্রবচনরূপ দিয়েছিলেন শিবরাম, অপটন আজও পটে! সত্যি, শিবরামের হাস্যরস অভিজ্ঞার মর্যাদা এইজন্যই পেয়েছে যে,

তাঁর কলমে জীবনকে চূড়ান্ত সুবেদী সমানুপাতে দেখান হয়েছে। প্রীতিরঞ্জন যারপরনাই প্রীত হলেন, যখন এই লেখকের মধ্যে একাধারে যেমন পেলেন তাঁর নিকট কেউ একজনকে, যে তাঁর ডপেলগ্যাংগার বা আত্মস্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে সে-ই মর্জিনা আবদাল্লা ছায়াছবির বাবা মুস্তাফার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর ছেঁড়াফাটা স্মৃতির শবদেহকে বারসুই-সেলাইয়ের ফোঁড়ে-ফোঁড়ে জীবন্তসদৃশ করে তুলবে। অবশ্যই, লাইফ লাইক নট লাইক লাইফ।

স্বভাবতই আমি তখন আনন্দের স্বর্গতুঙ্গে। পেয়েছি পরশমাণিক আর কে আমায় পায়! স্যার জেমস জিন্‌স-এর দ্য মিস্টিরিয়স ইউনিভার্স-এর সেই দ্বিতীয় নক্ষত্র আমি তখন যে। আহ্বান-সান্নিধ্যে পেয়ে প্রথম নক্ষত্র, সূর্যকে, চৌম্বক বাঁধনে বেঁধে পর-পর নয়টি উপগ্রহ তার শরীর থেকে খসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এতো পাপাহঙ্কার। আমার ফানুস-স্ফীতি তাই পিনবিদ্ধ একটু পরেই। আইকারাসের পৃথিবীর মাটিতে ঝরে-গলে পড়া। পোয়েটিক জাস্টিস কি একেই বলে। এত নির্ব্যূঢ়, এত নির্মম, এত নিয়ন্তা। এখন আমার ফুল্লরার সাথে গলা মিলিয়ে, দুঃখ কর অবধান গাওয়ার কালমুহূর্ত। কী দরকার ছিল মিলটনপুচ্ছ ধরে সালমাসিউসকে খোঁচা দেওয়ার। নব্বই প্লাস প্রীতিরঞ্জন হতে পারেন আমার কাকা এবং খুবই নিকট সম্পর্কের। তাই বলে তিনি তো আর পঞ্চম বিষ্ণু নন যে, আমি তাকে আমার এক হাতের অনায়াস চেটোয় বয়ে নিয়ে বেড়াব! তিনি তো সাক্ষাৎ একটা খনি, জীবন্ত ফোর্ট নক্স। তাঁর গভীরে যে ইতিহাস, পরতে-পরতে তাতে কী হয় কী হয়-র উৎসেক। তিলেক দাঁড়াও ওরে শমন-এর রামপ্রসাদী আর্তি কথা, আজও যা অশ্রুত! গ্লোবালাইজড্ পাঠককুলের বিচারে, কোনও দোষ নেই, সেই ইতিহাস আজ অশ্মীভূত বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু আমি ট্যানটালাস, সে স্কন্ধ-গভীর জলে দাঁড়িয়ে থেকেও তৃষ্ণানিবারণে এখনও অপারক। আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়!

কিন্তু আমি তখন এক নাছোড়বান্দা গন্ধমূষিক। এ্যালিস মেন্‌লের রিনাউন্সমেন্ট-এর শেষ পংক্তিকে আঁকড়ে ধরে ছুট দিলাম দিকভ্রান্ত পথে। ফরাসি লেখক আঁদ্রে মঁরয়-এর টু দ্য ফেয়ার আননোন-এর দ্বাত্রিংশ পত্রাধ্যায়ের শুরুতেই আমি পেয়ে গেলাম আমার কাঙ্ক্ষিত বীতভয় বাণী, লিবনিৎসের চোখ দিয়ে দেখ, পাহাড়-খাদে কোথায় মরণ? ওখানেই তো যত্নে পাতা হাঁস-পাখনার শয্যা-শয়ন।

প্রীতিরঞ্জনের মুখোমুখি হলাম। চোখল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে। চতুর্পাশ শুভ-শুভ। ভয় কী? পিছনে শুধু ভাটায় মতামত ম্যাগাজিন খাল। দূরের মানুষ যাকে বলে, বাগজোলা। আর স্থানীয়রা, নিবেদিতা। কুখ্যাত দমদম বুলেটের সেলাখানা ইংরেজরা অধুনা ভি আই পি রোডের সঙ্গে প্রায় সমকোণের জ্যামিতিতে পুব-পশ্চিমে বয়ে যাওয়া এই খালের যশোর রোড প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করে না বলেই, এটা ম্যাগাজিন। প্রীতিরঞ্জনের এ হেন শব্দব্যাখ্যা শুনতে-শুনতেই চোখ পড়ল ওনার খালমুখী বাড়ির পাশের জমিতেই ছোটদের একটা স্কুল। এই মনে হল, প্রেয়ার শুরু হল। একটা গান। কচিকাচারা তা গাইছে সুরে-বেসুরে, স্কেলভেঙে, চড়ায়-খাদে। তবু কী ভালো লাগছে শুনতে। আড়চোখে দেখলাম কাকা আমাকে দেখছেন। চোখাচোখি হতেই সেই ওহায়ু গোজাইমাসু।

ভাগ্যিস, রেখা চাওলার লার্ন জাপানিজ ইন আ মানথ-টা নিয়ে দু-একদিন একটু

হোমওয়ার্ক করে গিয়েছিলাম। তাই কাকা গুড মর্নিং বলতেই আমার উপ্ত উত্তর, কোম্বান ওয়া। ভেবেছিলাম এরপর বুঝি লাউ গড়গড় লাউ গড়গড় হবে। হঠাৎই কাকার আবার প্রশ্ন, তুই জাপানি শিখেছিস? বিনয়ে ধুলোস্য ধুলো হয়ে দিলাম উত্তর, একটু-একটু। কিন্তু তা শুনে কাকার স্কাই অফ দি আই-তে মেঘ ভিড় করবে কেন। কোত্থেকে, কী বার্তা নিয়ে তুমি শ্রীমান মেঘদূত? একটু পরেই তা অবশ্য ভ্যানিশ কাকার সহাস্য এক সাবাশ-এ। স্বগতোক্তিতে আমি তখন নিজেই প্রীতিরঞ্জন, পোলায় এখন জগত দ্যাখছে, সিধা হইছে মাজা, চলনরে সে ভয় করে না। ছাওয়াল অইবো রাজা।

কিন্তু এ কী পরাবৃত্তি। আমার ক্ষণিকের স্বত্বান্তরণ। ব্যস। এই নিবন্ধের পাঠকেরা আমার শূন্যস্থান ভরাট করে এক-একটা 'আমি' হয়ে গেল। ওরা কি ইটালো ক্যাল্‌ভিনোর ইফ অন আ উইন্টারজ নাইট আ ট্র্যাভেলার-এর রিসেপশন থিয়োরি মেনেই এমনটা করে ফেলল নিজেদের। তাই হবে। না হলে ওরা একযোগে ইশারা-ভাষায় কেন আমাকে বলল, প্রীতিরঞ্জনের স্কাই অফ দি আই-তে যে মেঘ জমার কথা একটু আগে লিখেছ না, তা তোমার ওই কোম্বানওয়া-র অপপ্রয়োগের জন্য। তুমি বল, কেউ তোমাকে গুড মর্নিং, বললে কি তুমি তাকে গুড ইভনিং বলবে। আর একটা কথা। প্রীতিরঞ্জনের তোমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ও তোমার তাতে উত্তর, তুমি কই আলোচনায় আনলে না তো। ছিঃ।

কী লজ্জা। শুধু লজ্জা নাকি। অন্যায় না। পাঠকের চেয়ে সম্ভ্রান্ততর অতিথি কি আর সম্ভব। আর তার সঙ্গে আমি কিনা দু-নম্বরী করতে গিয়েছিলাম। ঠিকই তো, এখন মনে পড়ছে, কাকা জাপানিতেই জিগ্যেস করেছিলেন আমাকে, কীরে ভাল আছিস? আমি তাৎক্ষণিক উত্তরও দিয়েছিলাম এবং ওই জাপানিতেই, হাঁ। এখন বুঝতে পারছি, পাঠকদের অবজ্ঞা করাটা কতটা অন্যায়। ওরাই লেখক গড়ে, আবার ভাঙেও। স্মরণে এল, কী অবলীলায় এইচ এল বি মুভি-র মতো গুণধর ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক তাঁর এক বিখ্যাত গ্রন্থের 'জেনেসিস', তাঁর এক প্রথমবর্ষের ছাত্রের লেখা কবিতা, দ্য প্রবলেম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং পোয়েট্রি-র উপর আরোপ করেছিলেন। ছাত্রটির নাম, ম্যালাম মহম্মদ আওয়ল ইব্রাহিম।

সমগ্র পাঠককুল শুনতে পায়। গলায় ডলবি লাগিয়ে তাই এখন আমাকে বলতেই হচ্ছে, ডুমো আরিগাতু গোইমাসু। তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ।

সত্যি। তাঁর দ্য সাউথ সি হাউস-এ চার্লস ল্যাম তাঁর পাঠকদের যে ভাবে মনের সাধ মিটিয়ে বুর্বাক বানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন, তা কি সবাইর পক্ষে সহজলভ্য। সবটাই অবশ্য মজা, খেলার ছলে। কারণ ওই পাঠকেরাই যে ল্যামের হাসি হাসে। ওনার কান্নাই কাঁদে। ল্যাম মানুষটির, তাঁর লেখক-সত্তার, সহস্রধারা যে ওই পাঠকেরাই।

প্রীতিরঞ্জন আর আমার মধ্যে, দুজনেরই অজান্তে তখন এক মন-ছোঁয়া-যায় নৈকট্য। পারস্পরিক পরিবেশটাও দেখতে-দেখতে এমন নিবিড় হয়ে এল যে, মানুষটি তখন আমার 'সাধুকাকা' আর আমি ওনার 'সাহেব'। আমাদের দুজনের মধ্য দিয়ে সময় যে খালটা কেটে চলে গেছে। তার দৈর্ঘ্য তিরিশ বছর আর চওড়ায় তা দুই পর্যায়। একটু আগেও এই খালে পারস্পরিক অদেখা-অসাক্ষাতের একটা জড়সড় থিকথিকে ভাটা নির্বিকল্প সমাধিতে ছিল। কিন্তু সাধুকাকার স্কাই অফ দি আইতে যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল বর্ষার টাইগার হিল-এ সূর্যোদয়ের

মতো দুরাসদ একচিলতে স্নেহাভা, আমার খুব মন চাওয়া পূরণের সম্মতি-আখর, এ্যাপোক্যালিপস। যা প্রায় গানের কলির মতো, এমন দিনে তাঁরে বলা যায়। আমি এক লাফে ব্রাউনিং-নায়ক, দ্য লাস্ট রাইড টু-গেদার-এর। সাধুকাকাকে শুনিয়েই বললাম 'রাইট'। আলতো স্বরে সাধুকাকা শুধু বললেন, সুমিমাসেন। আবেগ-বধির আমি শুনলাম, ওপেনসেসামি। শুনলাম আরও, নবীনতা আমার মনের খোপ থেকে বকবকুম করে বলছে, বুকের মধ্যে টানেল ছিল খোঁড়া, অন্ধকারে দেখা যায়নি মোটে...ব্রিজের পরে ছোটে ত্রিকাল, ছোটে।

আঠারোশো সাতান্নয় দুর্দম দুশো সিপাই সৈনিককে যাবজ্জীবন কারানির্বাসনের জন্য ব্রিটিশ সরকার যে 'ভাইপার আইল্যান্ড' বা 'সর্পদ্বীপ' চিহ্নিত করেছিল, অধুনাতন পোর্টব্লেয়ার থেকে যা নৌকাপথে পনেরো মিনিট দূরত্বে। তা আজ একটি স্মৃতিকুঞ্জ নাম। লোকে জানে, আন্দামান। ব্ল্যাক ওয়াটার। কালাপানি। হাঙ্গেরীয় লেখক আর্থার কোয়েস্‌লার একটা উপন্যাসের নাম ভাঁড়িয়ে একে নাকি এখন লোকে 'ডার্কনেস এ্যাট নুন' 'বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন' নামেও জানে। তা জানুক। সাহেব, আমার কথা হল, সেলুলার জেল-এর বীভৎস ইতিহাসকে নামের এমন অলঙ্কার রহস্যে ঢেকে রাখা কেন। ইংরেজরা তো একে ঠগীদের বৃদ্ধাবাস করবে বলে বানায়নি। আঠারোশো ছিয়ানব্বইয়ে শুরু করে উনিশশো দশে, মানে পাক্কা চোদ্দ বছরে, যে জাহান্নম তৈরি করা হল, যার ছশো আটানব্বইটা কুঠুরিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী আর বিবেক-জাগানি সাংবাদিকরা দিনভর ছোবড়া পেটাই, সর্ষে পেষাই করত, কথায়-কথায় ঘাড়ে রদ্দা আর পশ্চাদ্ভাগে নির্ভুল তিন ডাণ্ডা খেয়েও যাঁরা মুখে রা কাড়ত না। বুকের হাপর যাঁরা ছিঁড়ে চেঁচাত বেতের ফালাকাটায়, যক্ষার রক্ত-ভলকানিতে। —সেই উল্লাস, হেম, সুধীর, ইন্দু, নন্দ, উপেন, পুলিন, ননী, পৃথ্বী, ছত্র, বারীনদের লাঞ্ছনা-নির্যাতনের অক্ষয় আর্কাইভ যে সেলুলার জেল, তার আবার নাম-ছোপানি। আমি আঙুল কাটিয়া কলম বানাই। চোখের জলে কালি। বিপেসটারাস। ক্রোদ দ্য নেকেড, খুব ভালো গসপেল। কিন্তু অনেক-অনেক, শতগুণে ন্যায়সম্মত গসপেল হল, অজমাস্ক দি ইভ্‌ল। ভিখিরির বাচ্চার নগ্নতাকে শালীন ক্যামেরার ভণ্ড-লজ্জার আড়ালে না রেখে বরং টান দিয়ে ঘোমটা সরিয়ে দে খুনি-ডাকাত-রেপিস্টদের, পুলিশ যাদের ওইভাবে প্রিজন ভ্যানে তোলে। সর্বনাশা, দিনের আলোর মতো, প্রকাশিত হোক। মানুষকে তাই এ ব্যাপারে আগাম বোধজন্ম নিতে হবে রে, সাহেব।

ইচ্ছে হল বলি, সাধুকাকা, তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথামালা কোন সুবোধ বালক শুনবে আজ! তুমি যেমন এখন কালদলিত নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের সি এম ডি-এর কৃপা-খননে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির একখণ্ড অতীত ট্রাম লাইন। আজকের মানুষ শুধু উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। আত্মোন্মত্ততায় ছুটে-মরা টিউবের এক শব্দক্রতি মাত্র। যে বেচারার মন-চাওয়ায় যেখানে পুরব-পশ্চিমের, জনম-মরণের, আলো-ছায়ার, আসা-যাওয়ার কোনও রেখাচিত্রই নেই, সেখানে বোধজন্মের সম্ভাবনা অলীক। জীবনের চাল চেলে দেওয়ায়, সাধুকাকা, তুমি নিজে যেমন এখন অতীত। আজকের মানুষও। অতীত আত্মতুষ্ট আত্মসর্বস্বতা। মনে হয় কেন, ওই একমাত্র সময়। বর্তমান-ভবিষ্যতের পরিণতিও যে এই অতীতে। নিকোমাচিয়ান এথিক্স-এর এক জায়গায় তাই বুঝি এ্যারিসটটল বলেছেন, এমনকী ভগবানেরও সাধ্যি নেই, অতীতে কোনও পরিবর্তন আনেন!

দেখ সাহেব, বয়সে বায়ুরোগ আর রাগ মানুষকে বড় কষ্ট দেয়। 'তাহাদের কথা'য় বুদ্ধদেব এক দৃশ্যে এই দুটোরই বাস্তব সত্যতা স্বীকার করিয়েছেন তাঁর মিঠুনকে দিয়ে। পাছে এই দুইয়ে আমি নিজে দুষ্ট হই। তাই নাম-প্রসঙ্গে আর একবারটির জন্য ফিরতে চাই। মন দিয়ে শোন। ফরাসি লেখক হেনরী চ্যাঁরি-এর আত্মজীবনীতে যে পেনাল কলোনির প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে প্যাপিলোঁ আর তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী দেগা-র নির্বাসন হয়েছিল। তার কী নাম ছিল, একটা নয়, তিন-তিনটে? 'শয়তানের দ্বীপ', 'অবিষহ্য নরক', 'অনুদ্ধার দ্বীপ'। মানুষ দুটো কিন্তু দোষমুক্ত ছিল। নির্ভেজাল দুটো স্বাধীনতা সংগ্রামী। তবু তাঁদের জীবন থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হল, তেরোটা বছর, মোর দ্যান আ ডিকেড। এই খোয়ানিতে বাকহুলার অনুপ্রবেশ অসহ্য নয়। কী?

সাধুকাকার কথার খেই ধরে আমার চোখের সামনে কিন্তু এখন প্যাপিঁলো ছায়াছবির নামভূমিকায় অবতীর্ণ স্টিভ ম্যাককুইনকে দেখছি না লং শটে, চার-চারটে ঢেউ ছেড়ে পাঁচ নম্বরীকে বুকে টেনে নারকেল ভেলায় শয়ানে যিশু ভঙ্গিমায় মুক্তি লক্ষ্যে ভেসে যেতে। দেখছি আমি ল,অফ এ্যাসোসিয়েশনের মোহমুগ্ধতায়, তিতীর্ষু বীর সাভারকরকে। ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড যে চালান-বন্দি ইংলিশ চ্যানেল ডুবু-ডুবু সাঁতারে পার হয়ে ফের ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয়ে কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন। যতদিন না পর্যন্ত আন্তর্জাতিক এক্সট্র্যাডিশন আইনের চাপে ফরাসি সরকার বাধ্য হয় ওনাকে ইংরেজদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে। বাইব্‌ল কি সাধে প্রবাদ-অভিধানের মর্যাদা পেয়েছে। সর্ষেদানার মতো একরত্তি আত্মবিশ্বাসও যদি তোমার থাকে, বলেই দেখ না দূরের ওই পাহাড়টাকে, এই পিছিয়ে যা, আরও। দেখবে ও ঠিক পিছিয়ে গেছে। সময়ের অন্য এক বাঁকে, এখন আমার মনে পড়ছে, সাভারকর আন্দামানের সেলুলার জেলেও তাঁর জীবনের দশ-দশটা বছর কাটিয়েছিলেন। অথচ, কী বিষাদ কৌতুক, জানতে পারেননি একদিনের জন্যও, লাগোয়া কুঠরিতেই তাঁর মায়ের পেটের ছোট ভাই মৃত্যুর সঙ্গে বসে গোলকধাম খেলছে। আপন মনে। নিশিদিন।

—আন্দামানে তুমি ঠিক ক-বছর ছিলে, সাধুকাকা?

—বেঁচে না মরে, কোনটা জানতে চাস?

প্রশ্নের উত্তর এভাবে প্রশ্নে দিলে, আমি জানি, কথা বাড়াতে নেই। মানে-মানে চুপ করে যাও। বেশ, গেলাম। আড়চোখে একবার কাকাকে দেখলাম। কোথায় সেই মানুষটি। মুখের সহজাত হাসি পলেস্তরার মতো কখন আপনা থেকেই খসে গেছে। নীচ থেকে দ্রঢ়িষ্ঠ ভঙ্গিমায় উঠে আসা এ কোন জন। এই বুঝি বলে ফেলবেন। আবার বুঝি ফোড়ন কাটিস। তুলে আছাড় দেব। তা মানুষটি পারলেও পারতে পারেন। নব্বই-পার সাধুকাকার ত্বকে কই বয়সের গিলে তো এখনও পড়েনি। নি-টাক মাথার নীচে প্রশস্ত কপাল, বড়-বড় চোখ, দাঁতালো চোয়াল, নিষ্কম্প উচ্চারণ, ভদ্রস্থ কণ্ঠা, এখনও ছাতি-ছাতি বুক, গুলি-শিরা-জাগা হাত, কাবলি কব্জি—এসব তো ওনার শরীরের সামান্য আগু-ঝুকনিকে। আমি বলব, যথেষ্ট কৌলিন্যই দিয়েছে। একেই না বলে, কনডিসেন্ডিং স্টুপ। সে যাক, আমার সন্নত দৃষ্টিপথ দেখেই হয়তো কাকা তাঁর বিস্ফোরণী রাগটা গিলে নিলেন উন্মগ্ন এক হাসি দিয়ে। আফটার এ্যাংগার কামজ ল্যাংগার, একেই বুঝি বলে।

বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। এই চার বছরকে যদি তুই, সাহেব, আমার আন্দামানে জীবৎকাল বলে মানিস, এর থেকে বাদ দিতে হবে চার মাসের এক খাবলা সময়। সে সময়টা আমি সেলুলার জেলের তিন তলার এক কুঠরিতে। মৃত্যু নির্দিষ্ট এক বন্দি। সেটা তাই আমার ভিরান কাল। বুক ঘড়িতে আমি তখন সময় গুনি। সেই ঘড়িতে একটাই কাঁটা। সেটা সেকেন্ডের। কেমন যেন তাতে ঘসটে-ঘসটে যাওয়ার শব্দ। কোথায় যেন কী একটা জড়তা। কাঁটাটার পায়ে যেন ভারী কিছু বাঁধা। জানিস, সেলের দরজাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, তাদের ভেদ করে যাবার সময় প্রতিবার কেন জানি দেয়ালে দু-পা ঘসটে যেত। ভীষণ ব্যথা লাগত। ছাল-চামড়া চটকে যেত যেন।

এই এক মুশকিল। আমার পাঠকদের নিয়ে আর পারি না। সাধুকাকার পিছন-পিছন কী ভাসা-ভাসা বিহার হচ্ছিল আমার মনের সেই কবেকার কোথায়। হঠাৎ লাটাইতে সুতো গোটানোর টান। কী, না, ধীরে ভাগীরথী, বহ ধীরে। কী আর করা। ওদের খুশি করতেই তাই এখন মুভমেন্ট বাই ব্যাকওয়ার্ড স্টেপ্স। খ্যাংরাকাঠি বেয়ে ফের গুবরেপোকার নীচে নেমে আসা।

দারুণ অঙ্কের মাথা নিয়ে বি এস সি ডিস্টিংশনে পাস করে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে সাধুকাকা রেডিয়ো অফিসারের একটা কোর্স করেন প্রথমে। উদ্দেশ্য, মার্চেন্ট নেভিতে চাকরির সুবাদে বিশ্বদর্শন। পরিবারে সবাইর ছোট বলে অনেক পুতু-পুতু জীবন কাটাতে হয়েছে অনেককাল। আর নয়। এর মধ্যে অল ইন্ডিয়া একটা পরীক্ষায় দুরন্ত ফল। পোস্টিং। একেবারে আন্দামান। তখন পি অ্যান্ড টি আর এ্যাভিয়েশন একটাই সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় ব্ল্যাক আউট, সাইরেন। কানে-দাঁতে রাবার প্লাগ। টমিদের রুট মার্চ, ডেড্ লেটার অফিস—খিদিরপুর-হাতিবাগানে বোমাতঙ্ক। ছেলে-ছোকরাদের পথে-ঘাটে সরব গান, সা রে গা মা পা ধা নি, বোম ফেলেছে জাপানি, বোমের ভেতর কেউটে সাপ, ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ। তাছাড়া তো মিটিং মিছিল আছেই। বত্রিশ বছরী সাধুকাকা তখন নিকোবরে। সেখানকার অবজারভেটরিতে। কী কাজ, না ওয়েদারকাস্টার, আবহাওয়াবিদ। কদিন পরে ফের সেই আন্দামান। টি এইচ মার্শ আর এইচ এস হেনান যুগ্ম বস্। সাধুকাকার আঙুলে তখন সোর্স কোড ঝালার কাজ তুলছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্থানীয় এনআইলড ইংরেজ প্রশাসনের র‍্যাপোর্টের কেন্দ্রবিন্দুতে। সবাইর বিশ্বাস—আস্থাভাজন চরিত্রের নাম তখন, প্রীতিরঞ্জন ঘোষদস্তিদার।

জানিস সাহেব, আমার ভাবনালোকে তখন কোনও পরিচিত মুখের জায়গা নেই। কলকাতা। সার্পেনটাইন লেন। মাসি শান্তিলতা দত্ত, দাদা-দিদি সবাই তখন আমার অনিচ্ছাকৃত বিস্মৃতির হিমঘরে। দেশের খবরগুলোকে মনে হত রোজ বিকেলে আসা ঘুস-ঘুসে জ্বর। বাড়েও না, যায়ও না। উত্তেজনার পারদ চড়ত, শুধু ওই নেতাজির ভাষণ শুনে—কখনও বার্লিন। কখনও সিঙ্গাপুর। কখনও টোকিও তাকে তুলে ধরত ইতালির গ্যারিবল্ডির ইমেজে। একার মনে ঠিক বুঝতে পারছিলাম। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। একটা তোলপাড় এল বলে। অব মচল উঠা হায় দরিয়া হা, ভাই সাবধান বড়ি আ তুফান। একদিন গেল, দুদিন গেল, এক সপ্তাহও দেখতে-দেখতে এক সময় চলে গেল। মর্স-হেনান-এর কেউই অফিসে এল না।

আমরা করগুণতি কতিপয় হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলুম। আমরাই মাথামোথা। আমাদের উপর মুরুব্বি করবার আর কেউ নেই। পরিস্থিতিটা ভালো লাগছিল, আবার লাগছিলও না। কেমন যেন দু-মুখো একটা স্রোতের ঠিক মাঝখানটায় একটা ছোট্ট শালতি নৌকোর মতো মনটা একবার এদিক, আর একবার ওদিক করছিল। তখন নিজেদের মধ্যে গল্প হোঁচট খায়। আড্ডা ভেঙে যায়। বিশেষ করে যখন একজন তখন আর একজনের চাউনিতে, নিজেকে, শুধু নিজেকে দেখছে, নিঃসঙ্গ একক। সাহেব, একেই বলে 'এ্যালোমনেস'। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাতশো বত্রিশ মিটার উচ্চতায় চিরানন্ত সবুজভরাট অরণ্য আর মৌনী পাহাড়ের খাঁজ-ফোঁকরে আমরা কয়েকটা নরদেহ যেন রুবিকন ঝর্ণার গভীরে খুঁজে মরছি এক আঁজলা জীবনোষ্ণতাকে। বলতে পারিস সাহেব, তখন থেকেই আমার সেলুলার জেলের জীবন। ওপন জু! বুঝতে পারছিস তো কী মিন করছি!

আন্দামান! সেলুলার জেল! আমার চেতনে তাৎক্ষণিক সে কী তীব্র উন্মন্থন। দুটো নাম। দুটো ছবি। একটা আকার আরেকটা কিমাকার। সুমাত্রা প্রণালীর লক্ষ্যে যেতে গিয়ে নাকি আরবি জাহাজিরা সর্বপ্রথম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দর্শন পায়। সে, সুদূর ন শতকে। মার্কো পোলা তো এরই নাম দিয়েছিল, 'মুণ্ডু শিকারীর দেশ'। তারপর প্রায় দু-দশক জুড়ে মারাঠা এ্যাডমিরাল কানহোজি আংরে'-র দস্যু ইতিহাস এই দ্বীপাবলী ঘিরে। আর সেলুলার জেলের প্রতিধ্বনিত রূপ, যা আমার বিদ্যাকোষি মন আমার চোখের সামনে তুলে ধরে। তা হল সাত দাঁড়াওয়ালা তামাটে সেই চতুর্তল অন্ধ প্রাসাদ। যার প্রতি সাড়ে চার বাই আড়াই মিটার খুপরিতে দস্তয়ভস্কির সাইবেরীয় কারাগৃহের হুবহু জলছবি। সেই ফাঁসি ঘর, চাবুক ঘর, ঘানি ঘর, বন্দিদের কষ্টের হাস্যকর ক্রমনিম্ন গ্রাফ! অশ্রুর জলরঙে পছন্দ করেননি অনেকেই ট্র্যাজেডি আঁকতে। কারণ একটাই, ভাবপ্রবণতায় ট্র্যাজেডির নান্দনিক গুরুত্বটা অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হয়। ইংরেজ ডন জুয়ান বায়রন তাই তাঁর দ্য কাসল অফ শিলোন-এ ফ্র্যাঙ্কয় দ্য বনিভার্ড-এর ছ-বছরী কারাবাসকে ঈশ্বরের কাছে মানুষের বিচারাকুল মনের উচ্ছ্বসন বলেছেন। পক্ষান্তরে ব্যবিলন কারাগারে নিক্ষিপ্ত নির্দোষ ইহুদিকুলের পক্ষ নিয়ে মিলটনের যে সনেট, তাতে তো ভেনডেটা একেবারে উচ্চণ্ড। এও লাইফফোর্সের এক জাতীয় নিরত্যয় প্রকাশ। এককথায় একেই বলে, রাইচেস এ্যাঙ্গার।

কিছুদিনের মধ্যেই সব দিনের আলোর মতো প্রতিভাত হল। ইংরেজদের দখলনামা চলে গেল আন্দামান-নিকোবরের উপর থেকে। ছোট-ছোট জাহাজে জাপানিরা এসে গেল তখন আমাদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে। সময় থাকতে-থাকতেই মোটর লঞ্চে ইংরেজ অফিসাররা পালিয়ে যায়। তবে ওয়্যারলেস ট্রানসমিশন টাওয়ারগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে-দিতে। এ জাতীয় ইমপিরিয়ল আইকোনোক্লাজমের নজির বিরল। আত্মরক্ষাও হল। আবার শত্রুবিনাশের পথ আগেভাগে সিঁধ কেটে করে নেওয়াও গেল অনেকটাই। জাপানি সোর্স তো তখনও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মর্যাদা পায়নি। ফলে জাপানিদের আন্দামানে চোটপাট অল্প কদিনের মধ্যেই অনেকটা থিতিয়ে গেল। ওরা-আমরা দু-পক্ষই বুঝে গেল, সবাই তখন থেকে সমুদ্র-নির্বাসিত আলেকজান্ডার সেলকার্ক। ফারাক একটা কিন্তু মুছল না। ওরা শাসক আমরা শাসিত। ওরা খাদক আমরা খাদ্য। কেন এমনটা বলছি, এবার তবে শোন সাহেব।

ওদের চিফ ফিজিৎসুকার নির্দেশে আমার মতো সব আন্ডার-ব্রিটিশ স্টাফকে এক সকালে মাঠে গোল করিয়ে বসিয়ে শুধু এটাই জিগ্যেস করা হল, আমাদের মধ্যে জাপানি সোর্স জানে কজন এবং কে-কে। আমার মনের, জানিস, তখন কি উঠ্‌কিশতি অবস্থা! প্রায় বলে ফেলছিলাম আর কী। ইংরেজি সোর্স জাপানি সোর্স বলে কিছু নেই। সবটাই তো আমেরিকান শিল্পী স্যামুয়েল ফিনলে ব্রেজ-এর কল্পরেখা। ডট ড্যাশ আর থেকে-থেকে স্পেশ! সেদিনের বোবা-বোকা সেজে থাকতে খুব কষ্ট হয়েছিল রে। পরে একদিন সাকাইশা, ফুরোসাতো, খোগা আর তোমোদাচির সামনে সবাইকে বাদ দিয়ে আমাকে আর আশিক বলে এক ছোকরাকে উপস্থিত করে, আমার ততদিনে বন্ধু হয়ে যাওয়া ইংরেজি জানা এক জাপানি অফিসার, বাবাহেইচো। প্রায় বিচারসভা। আমরা নাকি ঘরের খবর স্থানীয় মানুষদের কাছে পাচার করি। এটা তখন সবাই জানত, স্থানীয়রা গেরিলা লড়ত জাপ শাসনের বিরুদ্ধে। অপবাদ আমার কোনওকালেই সহ্য হয় না রে, সাহেব। মিথ্যাচার চরিত্রহীনতা আমার ন্যায়বোধে, চিরটাকাল। বুঝতে পারছি পরিস্থিতি একেবারে ফাটো-ফাটো তুঙ্গে, তবু আমি মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। চাপটা নিতে পারল না বেচারা আশিক। অফিসের টেলিগ্রাফ কি-টা ও ওর প্যান্টের হিপ পকেট থেকে বের করে সবাইর সামনে টেবিলে রাখল। এবং এটা সে করল স্রেফ ভয়ের উত্তেজনায়। সেখানেই শেষ নয়। দাঁড়িয়ে পড়ে টেবিলে পাতা ব্লটিং পেপারে একটা কাঠ পেন্সিল দিয়ে ব্লক ক্যাপিটালে লিখল, 'বিওয়্যার' ছাড়া-ছাড়া করে। তারপর দুটো ড্যাশ, একটা ডট, একটা স্পেশ, আবার একটা ডট, মুখে শব্দ করে-করে এইভাবে লিখে গেল শেষ পর্যন্ত, আমি শুনছি, ডা—ডা-ডিড-ডিড। সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্ত ও তখন। একটা স্বপ্নচারী মানুষ। বাঁচন-মরণের নাগরদোলায় উঠছে-নামছে। ভয় মানুষকে একটা বিচিত্র মোড়ে নিয়ে যায়। তখন সে একটা শিশু। চারপাশে তার বাগ বেয়ার, জুজুবুড়ি!

হঠাৎ আমার পাঠকদের ঘনবিন্যাস লক্ষ করে গ্রাহাম গ্রিন-এর দ্য পাওয়ার এ্যান্ড দ্য গ্লোরি থেকে মৃত্যু-মুহূর্তে উপস্থিত একটি মানুষের তাঁর নৈশপ্রহরীর সঙ্গে কিছু সংলাপ আওড়ালাম। দুষ্টুমির সুযোগ কেউ ছেড়ে দেয়।

—কী হল! আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন!

—হ্যাঁ, ঠিকই। আচ্ছা, লেফটেন্যান্ট...

—বলুন।

—এই আমার মতো মানুষদের গুলি করে মারতে আপনি দেখেছেন। না?

—দেখেছি।

—আচ্ছা, ব্যথাটা কি অনেকক্ষণ ধরে থাকে?

—না-না। এক সেকেন্ড।

আমরা, সাহেব, সেই দিনই সব সেলুলার জেলে চালান হয়ে গেলাম। দুশোটা সেলে সবাই আমরাই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জেল মুক্ত করে জাপানিরা তখন ভারতবাসীদের চোখে মহান হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষগুলোকে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা জাপানিরা করল না। অজুহাত দিল। বিশ্বযুদ্ধ না! এটা মনে রাখি, জার্মানির চেয়ে কোনও অংশে কম ফ্যাসিস্ট জাপান ছিল না। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে জাপানিরা বন্দি করেছিল কেন? কারণ

মোহনের হাতে তথ্যনথি ছিল, লীগের অনেক যুবককে সাবমেরিন যোগে ভারতে রাতের অন্ধকারে পাচার করেছিল পঞ্চম বাহিনীর হয়ে কাজ করানোর জন্য। আর এটা তো স্বয়ং নেতাজির উক্তি, আমরা যদি একতাবদ্ধ না হই, তবেই জাপানিরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। 'হিকারী কিকান' নামে জাপানি সংগঠনের জোগান-বেইমানির জন্যই কিন্তু, সাহেব, আজাদি বাহিনীর পিছু হটা ইম্ফল সীমান্তে। রেঙ্গুন থেকে ওরা হঠাৎ ওদের সামরিক শিকড় উপড়ে ফেলে বলেই পয়তাল্লিশের মে-তে আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাত থেকে রেঙ্গুন পিছলে চলে যায় মিত্রশক্তির হাতে। চিন বা রাশিয়া থেকে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করার ইচ্ছে ছিল প্রথম দিকে নেতাজির। কিন্তু জাপানের তাতে সায় ছিল না। কারণ, প্রথমত, চিনের সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে জাপানের। আর দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার সঙ্গে ওদের যে অনাক্রমণ চুক্তিটা ছিল, সেটা যাতে পাঁচ কান না হয়, এ ব্যাপারে জাপান ভীষণ সতর্ক ছিল। এমনকী আকিয়াবে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে পর্যুদস্ত নেতাজিকে জাপান সামরিক কর্তৃপক্ষ উত্তরপূর্ব চিনের মাঞ্চুরিয়া যাবার অনুমতিটুকুও দিতে অস্বীকার করে। আসল কথাটা হল, নাজি জার্মানি আর ধুরন্ধর জাপান, দুজনের কেউই চায়নি ভারত ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হোক। উল্টে জাপানি নৌবাহিনী হিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরে, মায় ভারত মহাসাগরে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপাটনের স্বপ্ন দেখেছিল নিজেদের তাদের জায়গায় মৌরসিপাট্টা কায়েম করতে। এই স্বপ্নাচ্ছন্নতাতেই মাত্র ঠিক তিন দিনের ফারাকে পঁয়তাল্লিশের আগস্টে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আমেরিকান বি-টু থেকে নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার পর পর আঘাত হজম করেও জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যেদিন জাপান সমুদ্রতীরে রাশিয়া তার ভ্লাডিভস্টক নৌবন্দর থেকে তামাম বিশ্বদুনিয়াকে জানান-চমক দিয়ে, অনাক্রমণ চুক্তি পায়ে মাড়িয়ে, জাপানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল, জাপানের তখন অনৈচ্ছিক কণ্ঠে, এট টু ব্রুটে, ছাড়া আর কীই বা বলার থাকতে পারে।

আগুনে শরতবেলা এর মধ্যে কত গড়িয়ে গেছে। ম্যাগাজিন খালে এখন সর-সর জোয়ার। সাধুকাকা স্নানে গেছেন। এলেই আমার ডাক পড়বে। বড় পিঁড়িতে বসে লাঞ্চ। পদে-পদে অরণ্য হবে কাকিমার হাতে। এক কন্দু দিয়েই তিনটে আইটেম। মাছটা খেতে একটু কারিগরিশিল্প করতে হবে। জানি। বড় কাঁটা যে, বাটা না। পাশের জমির স্কুলে ডে ব্যাচের বাচ্চারা হয়তো এখন সুলুক-সুলুক টু-মিনিটস নুডলস দিয়ে টিফিন সারছে। সাড়াশব্দ কিছু নেই যে। রোদে কুমোরটুলির বাস। গরম ভাতে সরবাটা ঘিয়ের স্বাদ যেন। আর কী লাগে।

সাহেব, অনেক খুঁজে পেতে এই তিনটে জিনিস পেলাম। হাত ছুঁয়ে দেখতে পারিস। কিন্তু এগজিবিট ভেবে বাড়ি নিয়ে যাবি। এ স্বপ্ন দেখিস না। এগুলো এখন ইতিহাসের সম্পত্তি। আমারও নয় আর।

একটা শ্বেতী-শ্বেতী অ্যালবাম। ওয়ান টুয়েন্টিতে তোলা হলদেটে-কিছু চৌকো চৌকো ছবি। সবই সাধুকাকার, একায়-সদলে। যেমন তেমন পোশাকে, ভঙ্গিতে। দ্বিতীয় বস্তুটি, দু-ভল্যুমে বার্নাড শ-র নাটক সমগ্র। শক্ত বাঁধাই।

একবার 'লোকাল'দের পাল্লায় পড়ে আন্দামানে একটা লাইব্রেরি লুঠ করে ওই ভল্যুম দুটো হাত করি। সেলুলার জেলে ওরা আমার নিত্যক্ষণের সঙ্গী ছিল। কতবার যে আর্মস

এ্যান্ড দ্য ম্যান-টা পড়েছি ওর থেকে। রাতে ওদেরই মাথার বালিশ করে শুতাম।

আর ওটা তো বুঝতেই পারছিস, বাইনাকিউলার। শুধু ডানদিকের আই হুডটা নেই। রেস্ট অল ওকে। মেক-টা পড়তে পারছিস কিনা দেখ। কোডাকের বুশনেল বাইনাকিউলার। কী ভারী দেখছিস। অথচ হাত থেকে হঠাৎ জলে ফেলে দ্যাখ, ভাসবে। এটা আমায় প্রেজেন্ট করেছিল মিস্টার বার্ড নামে এক সাহেব। ওয়াটার ফল্‌সের সেক্রেটারি ছিল ওই বার্ড। বেচারা! ওর গুছিয়ে আসতে-আসতে সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে শেষ মোটরলঞ্চটা ওর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে চলে যায়।

জাপানিরা ওকে নিয়ে খুব একচোট লোফালুফি করে প্রথম দিকটায়। একটা শিকারে হাজারো থাবা, কামড়, নখর-খনন। মানুষ কোরবানি। হরির লুঠের বাতাসা। বার্ডের উপরে প্রথমে যে যেমনটা চাইল ক্যারাটে-কুংফু অভ্যেস করে নিল। ও যেন একটা জমি, কাঠের গুঁড়োয় ঠাসা। আমাদের চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটছে। আমরা নিথর পাথুরে কয়েকজন দর্শক। শুধু মানুষটার যন্ত্রণার চিৎকারগুলো আমরা আমাদের ওহ্‌-আহ্‌তে চাপা দিচ্ছিলাম। সেক্সপিয়রের না, এ্যাজ ফ্লায়েজ টু ওয়ান্টস বয়েজ! অল্প পরে একটা তীক্ষ্ণ হাওয়া-চেরা শিস। বার্ড ধড়ে-মুণ্ডুতে অসম দ্বিভাগ। এক জাপানির হাতে দেখি রক্তচেঁখো তরোয়াল। নির্লজ্জ পাশবিকতা! হুইচ ইজ দ্য বেসেস্ট ক্রিচার, ম্যান অর বিস্ট? কীরে সাহেব। এহেন অবান্তর প্রশ্নের কোনও মানে হয়! খবর রাখিস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম চার বছরে ব্রিটিশ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কত? —তিন লাখ সাতাশি হাজার নশো ছিয়ানব্বই। ঠিক যেন বাটা-র জুতোর দাম। অণুভগ্নাংশের অণুতে হিসেব। সে হোক, বিরাট সংখ্যা সন্দেহ নেই। যুদ্ধের খাঁই কে না জানে! কিন্তু অসহায় চোখ-নজরে একজনকে অভিমন্যু-বধ হতে দেখা, ভাবতে পারবি না, সাহেব, সেটা কতটা হার্ট একিং। ভলক-ভলক বমি উঠে আসে। আশিককে আর কোনদিন সেই দিনের পর থেকে দেখিনি আমি। খতমই হয়ে গেছে মনে হয় এবং নিশ্চিতভাবে, পিসমিল। মৃত্যুর একটা যৌন সম্মোহনী টান আছে, মানিস! খোলা ম্যানহোল পথচারীর পা টানে না। কী? ওই টানেই ছোকরা চলে গেছে। কিন্তু বার্ড তো অত মার খেতে-খেতেও আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল! ওর চাউনিতে সেদিন আমি 'অহঙ্কার পড়েছিলাম। ঘৃণা-বিদ্বেষ-ক্রোধ-আতঙ্ক-বিলাপ। সব কিছু ছাপিয়ে সাহেবটার চোখেমুখে শু জিদ, না হেরে যাবার অটল তাগিদ। মৃত্যুতেও তাই ও-ই জিষ্ণু।

আর আন্দামানের ট্রেজারি অফিসার অতুলদা, মানে অতুল চ্যাটার্জিকে নিয়ে কী নাটকটা না হল! একদিন লবসি গিলছি। দুপুর নাগাদ, দেখি আমার সেলের দরজায় অতুলদা, সঙ্গে দুজন জাপানি গার্ড। সেলের দরজা খুলল ওরা। মেঝেতে রাখা আমার পকেট ক্লক আ অফিসের স্টপ ওয়াচটা একজন ছোঁ মেরে তুলে নিল। ছোট্ট করে একটা 'সুমিমাসেন' তা সঙ্গে। পরক্ষণেই অন্যজনের এক রামধাক্কায় ভিতরে চলে এলেন অতুলদা। আমার হাতে গীতাপোনিষদের দু-খানা বই ধরিয়ে দিয়ে অতুলদা আমাকে কী বলেছিল সেদিন, জানিস প্রীতি, যদি তুই একদিন বেঁচে ফিরিস, আবার বউকে পারলে এগুলো দিস। এখনও অন্ত্যমি কবিতারে, সাহেব! আর কেনই বা হবে না! প্রকাশ মাত্রই কাব্য যে! আর প্রকাশ তো আবেগ সন্তান। আবেগের শিশির ভেজা ভূমি থেকেই তো প্রকাশ কাব্যের উৎপতন, ঠিক তে

ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক। হাঁ, তারপর যা বলছিলাম, কদিন পরে কোন্ সূত্রে যেন খবর পেলাম। অতুলদার এক সেকেন্ডের জন্যও একটুও ব্যথা লাগেনি। জাপানি ঘাতক দুটো নাকি তাদের তরোয়ালে খুব পুরু করে গ্রিস মাখিয়ে কাজটা সেরেছিল। ওদের যুক্তি ছিল, বুড়োর ভাম-ভাম রক্তের গন্ধ জোয়ান তরোয়াল নাকি সহ্য করতে পারে না। মনে পড়ে রে, সাহেব লর্ড আফ শ্যাটুনেয়ার, আই ক্যান এনডিয়োর ইওর ক্রটালিটি বাট নট ইওর হিপোক্রেসি!

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তো সেই দিক দিয়ে ভাগ্যবান বলব। সেলুলার জেলের অবর্ণনীয় কষ্ট, মানছি। তাঁরা পাঁজরে-পাঁজরে ঠাহর করেছেন। কিন্তু হাতগুণতি হলেও যাঁরা সেই ফেজটা উতরোতে পেরেছেন নিছক ভাগ্যকৃপায় বা স্বকীয় প্রাতিহারিক মনের জোরে। তাঁরা তো একদিন স্থানীয়দের মধ্যে ফের সমাজজীবনের স্বাদ পেয়েছে, তাঁদের সঙ্গে মনে মন মিলিয়ে শিবমন্দির গড়েছে। ছোবড়া চালানের ব্যবসা করেছে। নারকেলের জল থেকে সাকিও বানিয়েছে। ঠিকই করেছে। জীবনটা তো একটা আবাপন। ঝিনচাক-ঝিনচাক মাকুর টান। জীবনেরই তো আর এক নাম। কিন্তু সুধীর সাহা, বিনোদ গুপ্ত, এস এল দেবরায়। এই আমি তোর সাধুকাকা, অফিসিয়ালি 'প্রীতিরঞ্জন', আমরা কি জাসুস ছিলাম! অভিযোগের একটা দাগা আমাদের পরিচয়ে লাগালেই হল। আরে বাবা, খোদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সি আর ও ফাইলে যে গ্রিন কার্ড বা হোয়াইট কার্ড সাসপেক্টের কথা বলা আছে। তার কোনওটার শ্রেণীবিন্যাসেও তো আমরা পড়ি না! আমরা কি কোনওদিন জার্মানদের ছাঁচে রেভোলাক্‌নির্গাটা দল গড়তে পারতাম তখনকার সেই জাপশাসিত আন্দামানে এ্যান আই ফর এ্যান আই-এর প্রতিহিংসা রূপায়ণে! আরও আছে, আমাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার বা অপকর্মের কোনও অভিযোগও তো কোনওদিন খাড়া করা হয়নি যে, উনচল্লিশের অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর তা যদি হতও, খুব বেশি হলে দু-বছরের সশ্রম কারাবাস। কী হাস্যকার ভাব, সাহেব, জবাই-নির্দিষ্ট মুরগিকে আবার খাঁচার ভিতরে পায়ে দড়ি বেঁধে রাখা! আমাদের ক্ষেত্রে কিছুই হয়নি, কারণ কিছুই হবার ছিল না। টমাস উলফ-এর নায়ক কি সাধে হেমিংওয়ে আওড়াত রে তাঁর কয়েদী নিঃসঙ্গতায়, যত বলবে তোমার কী-পাইনির কথা। ততই হারাবে তাকে।

আমার পাঠকেরা দেখছি, সব বোবায় ধরা জোড়া-জোড়া শুধু কয়েকটা চোখ হয়ে বসে আছে। ওদের শরীর সব গেল-কোথায়! বিকেলের গেরুয়ায় ম্যাগাজিন খালটাকে কোপাই-কোপাই লাগছে। আকাশে ঝিম। বাতাসে ওস। সাধুকাকা শব্দ করে কলকা-আঁকা ছোট কাপ থেকে চা খাচ্ছেন। ওনাকে ছুঁলাম। উষ্ণ পুরুষ।

তেতাল্লিশের আটই নভেম্বর জেনারেল তোজো-র নির্দেশে নেতাজির প্রাপ্তি, আন্দামান আর নিকোবর। চারদিকে নিশ্চয়ই খুশির বিস্ফারের মধ্যে স্বাধীন ভারতের চিহ্নবাহী তেরঙা পতাকা সেইদিনই প্রথম আকাশ ভাসল। নেতাজি আন্দামান আর নিকোবরের নতুন নাম দিলেন, যথাক্রমে 'স্বরাজ দ্বীপ' আর 'শহিদ দ্বীপ'। আগ্রহ দেখালেও নেতাজিকে দেখানো হল না কিন্তু সেলুলার জেল। পাছে নিরপরাধ দুশো ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে আমার মতো কয়েকটা তখনও বেঁচে থাকা কানা-খানা-গানা-খানা চিৎকার করে বলে ফেলি, আইনি পাথর দিয়ে এই কয়েদখানা তৈরি। বিশ্বাস হয় না। এ তো অন্ধকূপ, ব্ল্যাক হোল। এখানের গলা দিয়ে যা প্রতিনিয়ত ঝরে পড়ে, তাকেই তো এডমন্ড ব্লানডেন থাকলে বলতেন, ম্যান

স্যুপ। জানিস সাহেব, বুলগেরিয়া লোককথায় নাকি এমনটি বলা আছে। সবাইকে তাঁর সব কিছু বিলিয়ে দেবার পর নাছোড়বান্দা গ্রিকদের নাকি ঈশ্বর এই বর মঞ্জুর করেছিলেন, যে ইনট্রিগ বি ইওরলট, তোরা ষড়যন্ত্রী হ। আমার তো মনে হয়, সেদিনের জাপানিরা এই একই বরের ইতিহাসযোগ্য দাবিদার।

ভাগ্য আমার ঘোলা জলের ডোবা। পৃথিবীর সব অন্ধকার তখন আমার কুঠুরিতে। স্বপ্নে, কতক্ষণ আর ডুব-সাঁতার দেওয়া যায়, বল। একটা 'নাউ' তখন আমি, একটা এখন, সংবিৎ শূন্য সংবহন সংবেদ শূন্য। ফলে উৎকণ্ঠা আতঙ্ক ভয় সব উবে গেল মন থেকে। জেগে উঠল তাদের জায়গায় বিচিত্র এক ঈর্ষা, মনোবিদদের বিশ্লেষণের অতীত। সঙ্গীসাথীদের জাপানি কর্তারা শিকারে নিয়ে গিয়ে বাধ্য করত খালি হাতে শম্বর-শুয়োর ধরতে। আমাকে ওই কাজে নিয়ে যাচ্ছে না কেন, তাই ঈর্ষা। ওদের মতো সেলে ফিরে জন্তুদের আঁচড়ে-কামড়ে আমি কঁকাচ্ছি না কেন, তাই ঈর্ষা। ফর হুম দ্য বেল টোলজ-এর হুম-এ আমি তখনও কেন সভ্যপদ পাইনি, তাই ঈর্ষা। এখনও আমার বিস্ময় রে সাহেব, মরণ-মুহূর্তে মানুষ কি সত্যিই সেদিনকার আমি-র মতো এতটা আত্মবাদী হয়।

সেই শুক্কুরবারটার কথা মনে আছে আজও। স্পষ্ট দেখতে পাই চোখের সামনে যেমন তোকে দেখছি এখন, চোখ খোলা রেখেই। মৃত্যু নির্দিষ্টের আটজনের তালিকায় সে দিনও যথারীতি আমার নাম নেই। তার মানে সেদিনও মৃত্যু-মেলা বসবে অন্য দিনের মতো সকালে। লোকে ভিড় করবে তা দেখতে। অথচ আমার সুযোগ নেই আ-স্কন্ধ বালিতে দাঁড়সাঁতার কাটতে-কাটতে জাপ প্রভুদের হাতে কবন্ধ হওয়ার। কী মিস। অথচ আমার সেলের দরজাটা গার্ডরা খুলে চলে গেল কেন। অঙ্ক দোষ কি এটা। এটা তো মানিস পৃথিবীতে মৃত্যুই চূড়ান্ত সৎ। কারুর কাছ থেকে কখনও এক পয়সা ঘুষ খায় না। এই জন্যই, ডেথ নেভার ডায়েজ। আবার এও ভাবছি তখন, জাপানিরা কি আমাকে স্পেয়ার করল ওদের কোনও কাজে আমাকে ইনডিসপেনসিবল ভেবে, না, এটা সেই কৌন্তিক প্রলোভন, সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম, লহো আপনার স্থান। আমি কিন্তু সবটুকু বোধ নিয়ে তখন জেগে আছি, ওওক্স ট্রেতে সারা শরীরে পিনবিদ্ধ ব্যাঙটার মতো, হৃৎপিণ্ডটা তখনও নড়ছে যার। কিন্তু যেই মুহূর্তে শুনলাম, বধ্যভূমিতে বন্ধুদের সমস্বর একটা চিৎকার, একটা কোরাসে 'হোয়াই'। আপন মনে আমার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল সেই ঈর্ষাজাগা তারানার বোল। তেরে নে তেরে নে তুম্ তানা তানা নানা তুম্ তানা, মৃত্যু কি তোদের একচেটিয়া সম্পত্তি, শুধু তোদের। এতদিন রইলাম তোদের সঙ্গে, আমাকে আজ বাদ দিলি কেন, বেইমান কোথাকার।

ততক্ষণে সব ব্যস্ততায় পূর্ণচ্ছেদ যতিচিহ্ন নেমে এসেছে। সব শব্দ উধাও। নিজেকে স্পর্শ করলাম। গোটাই তো আছি। বিস্ময়ানন্দ মহারাজ তখন আমি। মনে একটা লোভ এল, সত্যি বলছি। চেষ্টা করলে এখন বেঁচে যেতে পারি, এই লোভ। 'দেখিই না।' বলতে বলতে আমি সেলের বাইরে। পাথুরে করিডর দিয়ে হেঁটে চললাম। সিঁড়ি ভাঙলাম। সবাই দেখেও যেন দেখছে না। বরং পাশ দিল সসম্ভ্রমে। মৃত্যুত্তীর্ণ মহারাজ আসছে না। প্রধান ফটক আমার জন্যই যেন খুলে রাখা ছিল। নিশিপাওয়া মানুষটা গলে গেলাম আমি তার মধ্য দিয়ে। সেলুলার জেল পিছনে ওই অনেকখানি দূরে। চেহারায় জারোয়া-জারোয়া। পোশাক

ছেঁড়াভেঁড়া ঘরমোছা ন্যাতা, সারা গায়ে খড়ির বাটিক নক্সা। কী বোটকা গন্ধ। কে চ্যালেঞ্জ করবে আমায়! এখন যে আমি, ঠিক অমিতাভ-র ভাষায়, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি, ও যে যমের অরুচি!

আমার পাঠকেরা এবার আমারই নেতৃত্বে অবগাঢ় কণ্ঠে দিন সমাপ্তির প্রশ্ন সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। লিরিক উইলফ্রেড আউইন-এর, বাংলায় বর্ণান্তরণের ধৃষ্টতা আমার। এত চুপিসারে, গূঢ় কোনও অন্যায় চাপা দেবার ভঙ্গিতে, ওরা চলে গেল। ওরা তো আমাদের কেউ ছিল না! জানতেই পারব না কোনওদিন, ওরা কোনদিকে গেল!

সাধুকাকাকে একে-একে প্রণাম করলাম সবাই। মানুষটি নির্বাক পাথর। শুধু ঠোঁট-ফাঁকে একচিলতে হাসি তাঁর। আবারও বলছি মানুষটি উষ্ণ পুরুষ। নাই বা পেলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সমাজখ্যাতি। নিদেনপক্ষে 'পাউ'-এর যুদ্ধবন্দির। যদিও জীবনকে মৃত্যুর হিমহাতে উনিই গ্রহণ করেছেন। আমার সাধুকাকা মৃত্যুপার পরিনির্বাণ।

ম্যাগাজিন খালটাকে দেখছিলাম ওর উপরকার সিমেন্টের ছোট্ট সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে। আমার পাঠকেরা অল্প আগেই ঘরমুখো হয়েছে। পৌঁছতে আজ দেরি হবে। পদব্রজী মনে ওরা চলছে যে! যেন আজ বাড়ি ফেরার মন নেই ওদের। আমার সাধুকাকাকে ওই তো দেখতে পাচ্ছি তাঁর বাড়ির বাগানে, স্মৃতি নিস্তরণে প্রশান্ত তাঁর মুখে খালের আয়না থেকে শেষ রোদের প্রতিসরণ। তাঁকে ভালোবাসার নিগড়ে এই বাঁধল বলে কাকিমা আর তাঁদের ঘরফেরা জীবন প্রতিস্পর্ধী পঞ্চকন্যা। এই নিগড়ে বাঁধা পড়তে চাওয়ার নামই তো জীবনধারণ। মজার ব্যাপার, আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে তখন, জলজ্যান্ত পৌলমী। এবার তো তবে ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলাই যেতে পারে জীবনকে, তুমি কাছে এসো, আজ এসো সই পাতি, নাম রাখি 'ঘরে-ফেরা।'

পুনশ্চ : জেলনিষ্কৃত প্রীতিরঞ্জন সেই শুকুরবারই অনেকটা পথ হেঁটে প্রত্যন্ত একটি গ্রামের এক মিল্ক ফার্মে কাজের বিনিময়ে খাওয়াপরা আর রাতে ট্রিহাউসে শোয়ার একটা ব্যবস্থা জুটিয়ে নিয়েছিলেন। কেউ তাঁর তলব করেছিল, খবর নেই।

জাপান যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে ইংরেজদের পুনর্দখলে চলে আসে আন্দামান-নিকোবর। প্রীতিরঞ্জনের অফিসিয়াল স্টেটাসে ভেসে ওঠা নিয়ে সে এক নাটক। কারণ হারাধনের দশটি নয়, দুশোটি ছেলের সব্বাইর অন্তর্ধানের পর, উনিই তো একা মনের দুঃখে বনে চলে গিয়েছিলেন। বেঁচে।

সিভিল এ্যাভিয়েশন চাকরিতে পুনর্বহালের সব ফর্ম্যালিটি কাটিয়ে কয়েকজনের সাথে নিকোবর থেকে আন্দামানে আসছিলেন ব্রিটিশ যাত্রীবাহী লঞ্চ (রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এফ ভি ৬৯)-এ। জাপানিদের পেতে রাখা আন্ডারওয়াটার মাইনে সেই লঞ্চ ফেটে-ফুটে ডুবে যায় মাঝ-সমুদ্রে। প্রীতিরঞ্জন এবারও একা বেঁচে ফেরেন সাত মাইল স্রোতে শরীর ভাসিয়ে রেখে আন্দামানে। ঘটনাটা গল্প মনে হয়।

প্রীতিরঞ্জন দমদমে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন অফিসার পদে থাকতে-থাকতে অবসর নেন বাহাত্তরে। এখন পেনশন পান মাসে সাড়ে ছ-হাজার টাকা।

ঘৃতকুমারী

অজয় চট্টোপাধ্যায়

একাকার হব হব—পৃথা নিজেকে আলগা করে। শরীরী আস্কারা-আবরণে দ্বিজ হয়। ঈদৃশ মুদ্রার পাঠক্রম হচ্ছে : একলা ঘরের গিন্নি হব। আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে নাইতে যাব। এস। আপন খেলার সাথী হও। রোমান্স গড়ার আয়োজনে তীর্থ বউ ন্যাওটা বনে যায়। বলে, —আমারও কি ভালো লাগে হল্লার মধ্যে বসবাস। সন্ধে হলেই মন আনচান করে। টের পাই আমার মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে পাখির স্বভাব। আবার বাড়ি ফেরা মানেই খোঁয়াড়ে ঢোকা—ভাবলেই বৈরাগ্য আসে। অগত্যা রেঁস্তোরা হয় বিশ্রামাগার।

পৃথার রুদ্র শ্রী আস্তে আস্তে গলতে থাকে। প্রসন্ন ঝিলিকে পৃথা সমর্পিতা হতে হতে আহ্লাদি হয়। —কথা দিচ্ছ। কাল থেকেই উঠে পড়ে লাগবে। কী-ই—। গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।

—মাইরি বলছি। প্রমিস। কালই অলোককে ধরব।

পৃথা হতাশ হয়। —হায় কপাল। ওর ভরসা করা মানেই ভরাডুবি।

—না না। খুব জোগাড়ে। ঘাঁতঘোঁত জানে। নানান দিকে লাইন আছে। প্রচুর সন্ধান দিতে পারবে।

—কচু পারবে। আমার ভাই আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। যে কাজে হাত লাগায় কাজটা লেবড়ে যায়।

সোহাগিনি বন্দীত্বে লীন হতে হতে তীর্থ ভাবে তুই ভালো তোর মন ভালো না। মুখে বরাভয় দেয়। —ঠিক আছে। ঠিক আছে। আরো অনেক সোর্স আছে। তেড়ে ফুড়ে লাগব।

শয্যাসন্ধি। কারে পড়ে অঙ্গীকার। পলকা বনিয়াদ। টেকসই হয় না। পরিস্থিতি রদ হলে বৃহৎ ধামায় চাপা পড়ে যায় ইস্তেহার। ওজর বাহানা—ছিপেও না বড়শিতেও না। ঠেকনা দিয়ে দিয়ে ঠেকিয়ে রাখছিল প্রতিশ্রুতির মূল্য। একটা সময়ে এসে মধ্যপন্থা ঠোক্কর খায়। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। বিস্ফোরণের মুখে। একদিকে বধূতান্ত্রিক প্রেরণা অন্যদিকে আপসপূর্ণ একান্নবর্তিতার আড়ষ্ট জীবন, স্বাধীনতার অনটন—অন্তর্গতে তীর্থ ক্লান্ত হচ্ছে। প্রবল হচ্ছে নিরঙ্কুশ পৃথা আশ্রয়। যার উৎপাদন তুমি আছ আমি আছি সংসার।

ভেবেছিল অনেক চোখের জল ঝরবে। তর্ক-বিতর্ক-চিৎকারে আসর গরম হবে। কূট বিশেষণ ছোঁড়াছুঁড়ি হবে। কিছুই হল না।

ঢোক গিলে, কেশে গলা সাফ করে তীর্থ। পাঁয়তারা সূচক আঙ্গিক। তীর্থ দৃষ্টি ছড়ায়। সমাবেশ জরিপ করে। খাবার আসর ফুল প্রেজেন্ট। দ্বিধা জর্জরতা উতরে তীর্থ প্রস্তাব পাড়ল। —মা অফিসের কাজের ধাঁচ পালটে গেছে। এখন শুধু ফিল্ড-ওয়ার্ক আর অফিসে বসে ডেস্ক-ওয়ার্কের দিন নেই। ঘুমটুকু বাদ দিয়ে কোম্পানির কাজে ফুল টাইম স্পনসর্ড। এখন বাড়িতে বসেও অনেক কাজ সারতে হয়। কমপুটার, ইনজিনিয়ারিং সরঞ্জাম, নকশা, বই-কাগজ এ সবের জন্য আলাদা ঘর দরকার হচ্ছে। কাজের সূত্রে নানান লোক আসে। তাদের বসতে

দিতে হয়। আপ্যায়ন করতে হয়। এখানে সবকিছুই দীন। ভাবছি—।

মা কথার খেই ধরেন,—কথাটা তুলে ভালোই করেছিস। আমিও ভাবছিলাম সাবেকি বাড়ি। লোক বেড়েছে। ঘর বাড়েনি। ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। কয়েকটা খুপরিতে এত লোক কুলোয়! তাছাড়া দিদিভাই বড় হচ্ছে। ওর টিউশন পড়া আছে। লেখাপড়া আছে। বন্ধুবান্ধব আসবে যাবে। তোর দুটো বড় ঘর অবশ্যই দরকার।

অর্থাৎ মসৃণ সবুজ সংকেত। আনত ছিল যে চোখ তা তুলে জমায়েতের ওপর ফেলল তীর্থ। দেখল পৃথার ঠোঁট যুগলে বঙ্কিম হাসি। উল্লাস প্রবাহ। জাঁহাবাজ শাশুড়ির কবল থেকে মুক্তির হর্ষ। অন্যরা কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করল না। কেবল, তীর্থর দৃষ্টিতে এল, বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে ঢোকা বোন রানুর চুলের পাড় দেওয়া কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাঁকা ঘাড়ে ত্রস্ত হরিণী ছন্দ। টলটলে চোখে অভিমান-বিপন্নতার সমৃদ্ধ ছায়া। দৃষ্টির অভিঘাত সইতে না পেরে তীর্থর মাথা নুইয়ে পড়ে।

শঙ্কায় সন্তোষ্টি। তলে তলে কাজ গুছিয়ে রেখেছিল। পারিবারিক জট খুলে যেতে একদিন শুভক্ষণ দেখে সাড়ম্বরে নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। স্বেচ্ছা পৃথগন্ন। মন্দ লাগছে না। আবার কোনও কোনও ক্ষণে আচমকা বিষাদ হানা দেয়। একান্নবর্তিতার পিছুটানে কেমন অন্যমনা হয়ে পড়ে তীর্থ। এখন সে সেই মুহূর্তের গ্রাসে। বিভোরতা ছিন্ন হয় উচ্চ নিনাদে। এমনিতে, তীর্থ লক্ষ করেছে লতার প্রবেশ এবং প্রস্থান উভয় ক্ষেত্রে বিভঙ্গে লেপটে থাকে তড়বড়ে ভাব। আকস্মিকতায় গড়া। এক্ষণে ও ঢুকল ঘরে, ত্রস্তে। সমগ্র শরীরে মোচড় দিয়ে ছুঁড়ে দিল দাবি। —কাল লাস্ট ডেট। মনে আছে তো, যা ভুলো মন তোমার।

পৃথগন্ন হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ধাক্কা আসছে আর্থিক দিক থেকে। জীবনযাত্রার মান দমকা লাফিয়ে ওপরে উঠল। পি. এ. ডি-র সর্বজনীন শিবুদা ঠিকই বলেছিলেন,—যেচে বাঁশ নিলে। এ বাঁশ কখন নিঃশব্দে পেছনে ঢুকে যাবে টের পাবে না চাঁদু।

এখন এই গোষ্ঠী জীবনে প্রতিক্ষণ টের পাচ্ছে পোঁদে হুড়কো কাকে বলে। পাঁচ দিনের আরাকু ভ্যালি ট্রিপ। পার হেড সাত হাজার।

এই সময় পৃথা ঘরে ঢুকতেই রাগটা ঝাড়ল ওর ওপর। —ট্রিপটা ড্রপ দেওয়া যায় না।

—অন্যায় কিছু আবদার করেনি। এর আগে অনেকবার আটকে দিয়েছ। নানান ওজরে। কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। তুমি কী গো—ও তো আর পাঠশালায় যাচ্ছে না। বড় স্কুলে পড়াবে তার হ্যাপা পোহাবে না। ওখানে যারা আসে তারা কেউ মুটে মজুর কেরানি গেরস্থ থেকে উঠে আসা নয়। ভ্যাট সিক্সটি নাইন বোতলে জল বয়। তাদের সঙ্গে ওঠা বসা। ঠাট বাট বজায় রেখে চলতে না পারলে মেয়ের মাথা হেঁট হয় না!

—তা বলে সাত হাজার। সস্তার জায়গা। পড়ুয়া ছাড় আছে। থাকা-খাওয়া গণরেটে। পুকুর চুরি নয়। বছরে যে একবার তাও নয়। লেগেই আছে বারো মাসে তেরো পার্বণ। স্রেফ টাকা খ্যাঁচার গ্যাঁড়াকল। মচ্ছব মেটাতে আমার গাঁড় ফাটছে।

তীর্থ থেমে যায়। খেয়াল হয় মিছিমিছি ওর ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়া মানে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপান। এখন আর ভেবে কী লাভ। খিঁচকলে গর্দান ঢুকে গেছে।

কাছাকাছি কেউ শাঁখ বাজাল। মঙ্গলধ্বনি না ছাই। মাটি যেন টলছে। বার দরজায় কে

যেন বেল টিপল। ভেসে উঠল পাখির ডাক। পৃথা দরজা খুলল। আবাহনে কলকল করল।—আসুন আসুন।

ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন। তীর্থকে লক্ষ করা মাত্র, —নমস্কার। আই ইনট্রোডিউস মাইসেল্ফ। আমি বিনোদ মহাপাত্র। নবনগর পল্লীর ঘরে ঘরে ইনটিরিয়র ডেকোরেশনের কাজ করে টু পাইস কামাই। আমার প্রতিষ্ঠানের নাম "আয়েস"। হোর্ডিং নিশ্চই চোখে পড়েছে। বলে ঘরের চারপাশে চোখ ঘোরাতে থাকেন। মাপতে থাকেন পরিবেশ। মেপে নিয়ে বলেন,—এই স্টেশন স্টেশন ভাব থাকবে না। খোল নলচে সব পাল্টে দেব। ভেতরে ঢুকলে মানুষের চোখ জুড়িয়ে যাবে। বসলে ফেরার তাড়া ভুলে যাবে। ইচ্ছে হবে বসে থাকি আরো কিছুক্ষণ। পড়শিদের চোখ টাটাবে।

বহুজনের কোলাহল অস্তিত্ব অন্তর্হিত। বস্তি বস্তি আদল প্রবাসে। ভাগজোকের বিড়ম্বনা অস্তে। রসে বশে থাকার বিপুল আয়োজন শুরু হয়। খাট-আলমারি-সোফাসেট-পেলমেট-শোকেস এবং আরো বিচিত্র হরেক রকম যা হবে নয়নাভিরাম। কার্যকরী এবং স্বল্প জায়গার দখলি। বলা বাহুল্য উঁচু নজরের দ্যোতক হিসেবে প্রত্যেকটি নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। পৃথা উদ্যোগে জল ঢালে। মুখ ঝামটা দেয়। —আগে স্থির হয়ে বসুন তো। জিরোন। চা খান। তারপর কাজ।

মিষ্টি ধমকে বিনোদ থতমত। ফিতেসহ হাতে থমকে যান। অতঃপর ধপাস করে চেয়ার সংলগ্ন। গৌরী দাঁড়িয়ে আছে দরজা ঘেঁষে। নির্দেশ প্রতীক্ষায়। নির্দেশ না দিয়ে পৃথা নিজেই কিচেন অভিমুখী। কাউকে বাড়তি পাত্তা দিতে চাইলে পৃথা এই প্রথা পালন করে। অর্থাৎ চা এবং টা নিজের হাতে প্রস্তুত এবং পরিবেশন উভয় দায় নিজের হাতে তুলে নেয়।

টুকিটাকি কথা চলছে। ব্যবসায় মন্দা, দেশের মঙ্গলে ত্যাগ স্বীকারে অনীহা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি —ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছাড়াছাড়া মন্তব্য ড্রয়িংরুম শোভিত উৎকণ্ঠার প্রকাশ চলছে। ট্রের ওপর সাজান প্লেট নিয়ে গৌরী ঢুকছে। পেছন পেছন পায়ে পায়ে পৃথা। তারও হাতের বেড়ে ছোট ট্রে। ট্রে ভরাট চায়ের উপকরণে।

বিনোদের ঝোঁক চা-কেন্দ্রিক। সে আগ্রহভরা হাত বাড়াতেই থাতানি খায়। —না না। আগে স্ন্যাকস মুখে পুরুন। সব ঘরে বানান। মিষ্টি হলদিরামের।

বিনোদ অসহায় হাত পেটে বোলান, —কী করব ম্যাডাম। রক্তে চিনির বাড়াবাড়ি।

—কত? তীর্থ কৌতূহল প্রকাশ করে।

—১৮০।

—কিছুই না। খুব করে হাঁটুন। শর্করা পুড়িয়ে দিন। চিনির দৌরাত্ম্য খতম।

বিনোদ আশ্বস্ত হন না। হতাশ গলায় বলেন। —যাবে না তীর্থবাবু। এসেছে থাকবে বলে। বড় সামাজিক কুটুম। বলে দৃষ্টি প্লেটে স্থির রাখেন। নিষিদ্ধতার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁকে সংযম গলছে। সঙ্গে দোসর অন্তরঙ্গর চাপ। বিনোদ প্রত্যেকটি পদ তারিয়ে তারিয়ে সৎকার করতে থাকেন।

জলযোগ এবং চা পান শেষ। ফের আলোচনা শুরু। প্রসঙ্গ ঘরের আঙ্গিক। এই পর্বে তীর্থ বেকার। ওকে শিখণ্ডি রেখে আলাপচারিতা বহমান। বহাল ছাঁটাই, সাজাইবাছাই করে

সিদ্ধান্ত হচ্ছে। শুধু কথার খই ফোটান নয়। ফিতে নিয়ে মাপজোক পেন নিয়ে ছবি ডিজাইন নিয়ে কাটাকুটির খেলা অব্যাহত।

তীর্থর বিহ্বল দৃষ্টি নজর করে পৃথা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়। —এখন তো আর সাবেকি পাড়ায় বসবাস নয়। অভিজাত পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে ওঠাবসা। তুমিও উঁচু পোস্টে আছ। ইজ্জত আছে। ঠাট বজায় রেখে চলতে হয়। এ বাড়ি ও বাড়ি অনেক বাড়ি আসা যাওয়া আছে। সামাজিকতা আছে। অথচ কাউকে তেমন করে আসতে অনুরোধ আবদার করতে পারি না। কোথায় বসাব? তেমন সোফাসেট নেই। চা-জল খাবার দেব দেখনদারি ক্রকারি নেই। আসবাবপত্রের যা ছিরি—কী দেখবে তারা! দেওয়ালে নামী শিল্পীর কোনও ছবি নেই। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-কৃষ্ণনগরের কোনও পুতুল বা মুখোশ ঠাঁই পায়নি। ঘরের হা-হা ছাঁদ দেখানো মানে লোক ডেকে নিজের মুখ পোড়ান। নেই। নেই। নেই ফিরিস্তি দিয়ে যোগ করে। —সোসাইটিতে থাকলে সোসাইটির সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে হয় মশাই। আমরা তো আর গাঁটছড়া মুসাফির নই।

পৃথা কথক। তীর্থ শ্রোতা। আক্ষেপ-আশা-প্রকল্পের বয়ানে পৃথার বচন দোল খাচ্ছে। আক্ষেপ-উদ্দীপনা-বিষাদে শব্দ তরঙ্গ ভাসতে থাকে।

তীর্থর মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। যুক্তির ব্যাপক অংশ গ্রহণযোগ্যতায় শক্তিশালী। হাতছানি দেয় এক সুন্দর জীবনের ছবি। আর এক অংশ যার মধ্যে আছে টাকার খেলা—তীর্থর মনে হয় ও যেন হয়ে পড়ছে এক চক্রান্তের শিকার। যে অনুভব তাকে পীড়া দেয় তা হচ্ছে এ দিকটা নিয়ে পৃথার কোনও হেলদোল নেই। আমি যেন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পাম্পিং মানি।

পরের দিন কাজের তাগিদে তীর্থকে যেতে হয় তিনসুকিয়া। ফিরতে ফিরতে ১০দিন কাবার। ঘরে পা দিতেই তীর্থর চোখ ছানাবড়া। চমকিত। নতুন বিন্যাস তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। রিক্ত অন্ত্যজ রূপ নির্বাস। ঝা তকতক শ্রী। জানালায় জানালায় পেলমেট। বাতাবরণ রুদ্ধ করা হয়েছে হালকা আকাশনীল পর্দায়। যার বিস্তার জানালার ধাপি অবধি। পেলমেটের ওপর শোভা পাচ্ছে ছোট ছোট পুতুল। দরজার কোণে পোড়ামাটির ঘাড় বেঁকানো ঘোড়া। দেওয়ালে লগ্ন হয়ে আছে বাঁধাই ফটো। যামিনী রায়ের কৃষ্ণলীলা। সঙ্গতি রেখে ছিমছাম আসবাব। বসার। শোওয়ার। পড়ার। রাখার। ব্যবহার্য এবং দৃষ্ট। নয়নাভিরাম। ধু ধু ছিল আদল। এখন ভোগ ভোগ শ্রী।

তীর্থর ঘোর ঘোর চোখ ঘরময় ঘুরতে থাকে। আঙ্গিক দর্শনে বিস্ময় এবং মুগ্ধতার ছায়াচ্ছন্নতা।

—কী মশাই কেমন লাগছে। শুধু রোজগার করলে হয় না। রুচি চাই। মাথা খাটাতে হয়। বুঝলে।

তীর্থ চকিত হয়। দেখে ধান্য মঞ্জরীর মতো দীঘল কাঠাম, দু-হাত কোমরে ভাঁজ করে স্থির। তীর্থ দেখল কেবল ঘরোয়া আঙ্গিক নয় পরিবর্তন এসেছে পৃথার অবয়বেও। পাছা উপছান চুলের ধারা পার্লার ননদিনীর হস্তশিল্পে ছাঁটাই। হ্রস্ব গোছের ছাড়পত্র ঘাড় অবধি। কোঁচকান চুল চোপার ছন্দে আলুথালু। এই গাল ঢেকে যাচ্ছে এই মুখ প্রকাশ পাচ্ছে।

ভাবের ঘরে সিঁদ না কেটে তীর্থ অন্তরঙ্গে স্বীকার করে মন্দ লাগছে না দেখতে। বয়সিনী

ছাপ অনেকটাই ঝরে গেছে। মুখশ্রীতে কচি কচি আদল। দু-দণ্ড তীর্থর মোহ দৃষ্টি উপভোগ করে পৃথা। মুখর হয়। ঘোর চটকে দেয় ব্যাখ্যায়। —ঘর যদি সুন্দর সাজান হয়, ঘরোয়া শ্রীর যদি পিছুটান থাকে তবেই না ক্লান্ত মানুষের নীড় প্রেম প্রবল হয়।

সন্ধ্যা প্রয়াণে অবসন্ন সমাজ। প্রচুর জলের সেবায় স্নিগ্ধ তীর্থ। আরামের প্রলেপ পড়তে দানা বাঁধছে আলস্য। তীর্থ বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে আধশোয়া। আলস্য উপভোগের প্রিয় মুদ্রায়। ঢুল নামছে চোখে। কপালে আঙুলের টোকা পড়ল। চোখ ফেরাতে চোখে পড়ল পৃথা জানালার গ্রিলে মাথা হেলিয়ে। পর্দা তোলা। চোখ মটকে ইশারা করছে। অর্থবহ ইঙ্গিত। উঠে এস। আহ্বান জানাচ্ছে।

তীর্থ সাড়া দেয়। আড়মোড়া ভাঙে। শরীরে ভাঁজ ফেলে ফেলে খাড়া হয়। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে। ঘন হয় পৃথার।

পৃথা তর্জনী নির্দেশ করে বাইরে। তর্জনী উর্ধ্বমুখী। মুখর হয়। —দ্যাখো।

ইশারা অনুসরণ করে তীর্থ দেখল ফাটাফাটি জ্যোৎস্নায় ছাদ ভাসছে। তীর্থর রক্ত ছলাৎ করে। ভেবে, যে পৃথা জাগছে। ওর মানসিক কাব্যময়তা যা শাশুড়ি-ননদীয় সন্ত্রাসী রাজত্বে পিষ্ট হয়ে সুপ্ত ছিল। এখন প্রকাশিত হচ্ছে। আশ্রিত হচ্ছে স্বভাবজাত ঐতিহ্যে।

—ছাদগুলো এন্টেনায় থিক থিক করেছ। পৃথা জানায়।

তীর্থ হতবাক। বুঝে উঠতে পারে না ইঙ্গিত।

—যতগুলো পরিবার তার দ্বিগুণের বেশি টিভি। পরিবার পিছু নয় ঘর পিছু টিভি।

—সবই পয়সার কুড়কুড়ানি।

—না গো মশাই না। ফুটুনি নয় খুবই জরুরি। মেয়েদের সঙ্গে বসে বসে সব চ্যানেলের পোগ্রাম এনজয় করা যায় না। সংকোচ হয়। মাঝ রাতে কী সুন্দর সুন্দর সব ছবি হয়। স্বামী স্ত্রী একসক্লুসিভ বসে শুয়ে দেখে। রোমাঞ্চিত হয়।

তীর্থ মৌলিক দুর্বলতা প্রকাশ করে। —নতুন সংসার পাততে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে খুব ঝক্কি গেছে। অর্থনীতি পঙ্গু। সবুর করতে হবে।

—দিনভর খাটনির পর স্বামী স্ত্রী মজার রিলিফ লুটবে একটা বাড়তি টিভি নেই। পড়শিরা মিটিমিটি হাসে। সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকটাও ভাবতে হবে বৈকি। কাঁদো কাঁদো হয় পৃথা। তীর্থ কৌতুকপ্রিয় হয়। আওড়ায়।

কুছ কুছ নিন্দে ঘুষ কী বাদল, পেচক নিন্দে কাকের বোল।

মাদার নিন্দে কাঁঠালের কোষ।

অমানুষের আলাপে বড় দোষ।

পৃথা চোখ বড় বড় করে কথা গেলে। পীড়িত মুখশ্রী। তীর্থ বিচলিত। ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে দৃঢ়তা। তীর্থ চনমন করে। এই সময়ে পৃথা পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে দৃষ্টান্তস্বরূপ নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। চরম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আদি উপাদান। জল। প্রয়োগ নৈপুণ্যে চমকপ্রদ এফেক্ট।

তীর্থর অবস্থান টাল খায। তছনছ হতে থাকে নিজস্বতা। অবশেষে ব্যক্তিত্বের অন্ত্যেষ্টি। তীর্থ রাজি হয়। স্বাগত ২নং টিভি।

প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক। মুখের আঁচল শুকনো হয়। পৃথা মুখ ভাসায়। প্রসন্নতায় ডগমগ। চুল গুছোয়। পরিপাটি হয়।

কয়েকটা দিন কেটে যায়। তারপর সে এক দৃশ্যাবলী। তীর্থ দেখল ঘন সন্ধ্যায় সে এক বিরাট তোড়জোড়। মাথায় এক ঢাউস প্যাকেট বহন করে কুলি সিঁড়ি ভাঙছে। সে একা নয়। তাঁর ছোঁয়া বাঁচিয়ে পেছন পেছন এক ঝাঁক নারী। তীর্থ চেনে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যা। মূলত বধূ সংকলন। বাহুল্য হিসেবে বৎস ছাড়। লং মার্চের ধাঁচে ডি. এস. পি গিন্নি মিসেস রায় সকলকে লীড করে ওপরে উঠছে। তীর্থ এবার সবটা ধরতে পারে। সারাদিন ধরে ঘরে যে তুমুল কাণ্ড চলছে তা উৎসবের প্রাক প্রস্তুতি। ওরই নিরঙ্কুশ বন্ধু এবং তাদের স্বামী। সখীরা যেমন যোথবদ্ধ হয়ে এসেছে স্বামীরা তা নয়। কাজ-টাজ সেরে অরা আসছে একক। ছাড়াছাড়া। বর্ণাঢ্য সমাবেশ। স্বাস্থ্য ও সাজের হাট। ক্রমে ফুটতে থাকে আসর। আকারে এবং প্রকারে সমাবেশের স্বরূপ হয়ে ওঠে পাড়াগাঁর পুকুরঘাট।

তীর্থর নিজেকে মনে হল উদ্বৃত্ত।

আমন্ত্রিত রমণীকুল হাতে হাতে বহন করে এনেছে প্রভূত রেকর্ড। ঝাড়াই বাছাই হয়ে বাজছে। আসর তাতছে। ধীরে ধীরে রাত্রি দ্বিতীয় যামে গড়াতে থাকে। চপল প্রসাধিত মুখের আস্তর গলছে। ঘামজর্জর কাঠাম ক্লান্তিহীন। একসময় শুভ্রাই প্রথম খেয়াল করল ঘরে খলবল করছে নিরঙ্কুশ প্রমীলা সম্প্রদায়। গিন্নিরা একজোট। কর্তাদের কারো টিকি নেই। বরগুলো সব কখন নিঃশব্দে গুটি গুটি কেটে পড়েছে। সেঁটে গেছে ভেতর ঘরে। —কী পাজি দেখ দরজাটাও ভেজিয়ে দিয়েছে। শুভ্রা কলকল করে।

—দেখেছ মদ্দগুলো কী দুষ্টু। ভেজান দরজা তাক করে চিত্রা যেন রহস্য ফাঁস করে।
—কী ঢাক গুড় গুড়। বুঝি না কিছু। সটকে পড়ে কেমন নিজেদের বাসর সাজিয়ে বসেছে।

—বোঝার কিছু বাকি নেই। আমরা তো আর খুকি নই। একসঙ্গে জড়ো মানেই গেলাসের টুং টাং, মিত্রা সঙ্গত করা মাত্রই সুলেখা এগিয়ে আসে। গলাবাজি করে। —ওমা এতক্ষণ লাগল ধরতে। অর্ডার বুক হয়েছে গো—ভাজাভুজির পার্সেল যাবে।

পৃথা আক্ষেপ করে,—ছাইভস্ম গিলে গিলে মদ্দগুলো বেহুঁশ হবে। মুখে রুচি থাকবে না। এত খাটাখুটি করে বানালাম সব মাঠে মারা যাবে।

মল্লিকা চোখ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে।—ওমা সেকী। ওই সবের সঙ্গে ভালো ভালো পদের আড়ি আছে না-কি, বরং দারুণ জমবে।

সুলেখা পৃথার পক্ষ নেয়। —না গো পৃথা ঠিকই বলেছে। উগ্র তরলের সঙ্গে খিদের বনিবনা নেই। মদ পেটে পড়লে খিদে নষ্ট। স্বাদ জ্ঞান অসাড়। পাতে ভাজাভুজি পড়লেই হল।

লঘু ছন্দে নিঃশব্দ চরণে লায়লা কখন এসে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ করেনি। সদ্য মিসেস। ফলে চালচলনে ব্রীড়াবদ্ধতা। বধূর আড়ষ্টতা ঝেড়ে মুখ ঝামটা দেয়। —আহা বেচারাদের কী দোষ। আমরা যে এত টসটসে—মূলে তো কর্তাদের গাধার খাটুনি। এক আধটা দিন ফুরসৎ পেলে একটু অফ দি রুট আমোদ ফূর্তি করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। বরং কাজকর্মে টনিকের কাজ করে।

সুলেখা ধাতায়। —থাম। দরদে বুক ফেটে যাচ্ছে বাছার। ওদের আর তোল্লাই দিতে

হবে না। সং বৎসর মিনসেরা যেন হবিষ্যি করে থাকে। এক একটা যে কী পিস হাড়ে হাড়ে চিনি। ভালো করে তাকাও না। চোখে পড়বে সব কটা প্রভুদের চোখের কোল চর্বির ঢিবি। মধ্যদেশ ওথলান। অকালে থলথলে। বুঝি না। রোজ রোজ গেলার উপসর্গ। ফূর্তির ফুস্‌কুড়ি।

হেলুনির গন্ধে বিষম খায় মল্লিকা। ছন্দপতন। সহসা স্বামী চর্চায় ইস্তফা। আলোচনা বহে অন্যখাতে। যূথিকা দৃষ্টি ফুঁড়ে ফুঁড়ে লতিকাকে বিদ্ধ করছে। দৃষ্টি আক্রমণে লতিকা কুণ্ঠিত। —কী দেখছিস হাঁ করে।

—তোমায়। আচ্ছা লতিকাদি তুমি না আমার চেয়ে চার বছর সিনিয়র। বিয়েও করেছ আমার চেয়ে তিন বছর আগে। নার্সিং হোমে খালাস হতে ভর্তি হয়েছ দু-বার।

লতিকাদি .থ। —তথ্যে পাস। কিন্তু খোলসা কর তোর ধান্ধা কী।

—তুমি বয়সে বড়। দু-দুটো বাচ্চার মা। অথচ তোমার মাই কেমন আঁটসাট। এতোটুকু টসকায়নি। আর আমারটা এরই মধ্যে ঢিলেঢালা। ৩৮-এ ধরে না। বিশ্রি লাগে না। বুকের ধসন নিয়ে যূথিকার চোখ সদ্য খোসা ছাড়ান লিচুর মতো টসটসে। কান্নার দমক কোনওক্রমে রোখে। খেদ এবং ঈর্ষায় ম্লান হয় চোখ। প্রতিক্রিয়া হয়। লতিকা মুগ্ধ। আত্মশ্লাঘা আসে। আস্থা আসে। মদালস গলায় বলে, —ঠিকই ধরেছিস। গলি দিয়ে যেতে আসতে আড়ি পেতে আমিও শুনতে পাই ছোকরারা গান ধরেছে যেয়ো না যেয়ো না আঁখির আড়ে। দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার পাড়ে। এত যে সাজগোজ, বিউটি পার্লারে ঘন ঘন ঢু মারা—কী সার্থকতা যদি না পুরুষদের মাথা চলকায়। চোখ লেপটে না থাকে।

যূথিকা রহস্য উদ্ধারে ছলবল করে।—বল না গো তুমি তেমন করে রাখো।

স্তুতিতে লতিকা আপ্লুত। ঠোঁটে ফিচেল হাসি ব্যাপ্ত করে টোটকা বাতলায়। —আমারটা যা দেখছিস সবটাই কিন্তু আসল নয়। অনেকটা জালি। একদিন চল আমার সঙ্গে। নিউ মার্কেট। মজিদের দোকানে। ওখানে বিশেষ এক ছাঁদের ব্রা পাওয়া যায়। পরারও কায়দা আছে। কী করে পরতে হয় শিখিয়ে দেব। দেখবি কেমন টানটান দেখাচ্ছে। মনে হবে ৩৪-এর বুক। তবে হ্যাঁ...। বলে কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে। গোপন তথ্য ফাঁস করার মতো ফিসফিস করে। —এইসব নয়। এটা গেল বাইরের দিক। ভেতরেও সতর্ক থাকতে হবে। বরকে সাবধান করবি শরীরে আরো তো অনেক লোভনীয় অঞ্চল আছে সেইসব অঞ্চলে ধামসাক না। শুধু বুককে যেন রেহাই দেয়। আসল কথা নিজে সাবধান হ। না হলে হাহাকার আসবে।

বৃন্দা দলছুট। সে এই বৃত্তের বাইরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করছিল কাঠের আসবাবের সূক্ষ্ম কাজ, কারুকারি, ছোট ছোট পুতুলের আকার বৈশিষ্ট্য, রং-এর বাহার, বইয়ের সঞ্চয়। লতিকা পৃথাকে ঠেলা দিয়ে হিসহিস করল। —নজর রেখো। ওর কিন্তু হাতটান আছে।

এদিকে একটুকরো ভাপা ভেটকি মুখে পুরতে পুরতে সেন গিন্নির নজর কাড়ে অতসী। পেটটা দ্রষ্টব্য। সেন গিন্নি মন্থর পায়ে এগিয়ে আসে। তলপেটের ছোট্ট ঢেউয়ে হাতের আদর দিতে দিতে বলে। —কী গো আগেরটা তো সবে তিন। এরই মধ্যে আর একটা নামাচ্ছ।

লজ্জা লজ্জা হাসিতে অতসী জবাব দেয়। —কী করব বলো সবই কর্তার ইচ্ছেয় কম্মো।

সেন গিন্নি গার্জেন বনে যায়। —আখের নষ্ট কোর না। অধিক ফলনে কাঠামোয় ধস

নামবে। ওদের আর কী। রসের জোগান দিতে দিতে ফুরিয়ে যাবে। বাঙালি নারী কুড়িতে বুড়ি। পুরুষরা অনেক এগিয়ে। পুরুষের ত্রিশে, দাঁত পড়ে খসে। নিজেকে আগলাও। শেষে কেউ পুঁছবে না। সোয়ামিও না।

লতিকা প্রতিবাদে ধেয়ে যায়। —না গো দিদি পীরিতের ব্যাকরণে ওসব ধোপে টেকে না। শোনোনি : কেঁদে কেটে পীরিত,

মেজে-ঘসে রূপ,
দু'দিন পরেই চুপ।

—তোবা। তোবা। মল্লিকা হাততালি দেয়। —ডাউন ডাউন সেনদি।

ঐক্যবদ্ধ হাসির তোড়ে বিনোদিনী হল সকলে। গায়ে গায়ে লুটোপুটি। রাত গাঢ় হতে উসখুস করে নারী সমাবেশ। শেষ কর্মসূচি ভোজ অপেক্ষায়। বিস্তর আয়োজন। সখা-সখীরা যা যা খেতে ভালোবাসে যা যা খেলে খাওয়ার প্রতি আসক্তি জন্মায়—অনেক ভেবে যত্নে শ্রমে পৃথা সে সব পদ তৈরি করেছে। নিজের হাতে এবং তদারকিতে। বাহবা পাবে প্রত্যাশায়। চীনা—উত্তর ভারতীয়—বাঙালি বিভিন্ন ঘরানার। ডাক পড়ল পুরুষদের। টেবিলের ওপর খাবারের স্তূপ। সকলে এসে জড়ো হল। খাওয়াতে তেমন আলোড়ন নেই। খাচ্ছে মূলত মহিলারাই। বিচার বিশ্লেষণ চলছে। তারিফ হচ্ছে। শিক্ষা নিচ্ছে। পুরুষরা নির্বিকার। কেবল আঙুলের নাড়াচাড়া করছে। একটা দুটো পদ চাখছে। গোটা টেবিলে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে পৃথা আশঙ্কিত। সব আয়োজন পণ্ড হবার জোগাড়। পৃথা ধমক দেয়। —একী। সারাদিন হেঁসেল বন্দী হয়ে যা সব করলাম এখন মুখে না তুললে খারাপ হবে কিন্তু। অনুরোধের চাপে হাত ও মুখের ক্রিয়াশীলতা কিঞ্চিৎ বাড়ে।

আড্ডা কলহ রসালাপ হুল্লোড়—গান ও বাজনার তালে তালে শরীরী হিল্লোল অন্যদিকে শোণিতে শোণিতে মদের প্রবাহ। ঘন রাত—সবকিছুর রসায়নে সমাবেশ অবসন্ন। ঝিমুনির ঢল নামছে। অবশেষে মজলিস বিদায়ী। সবাই বারমুখী। নিজ নিজ ভামিনীবদ্ধ। যেতে যেতে মল্লিকা রসিকা হয়, —কী গো পৃথাদি তোমার বরটি কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। না-কি তুমিই আড়াল করে রাখছ। কে যেন ফুট কাটল।

—আমাদের বুঝি খুব ভয়। আমরা কি সব স্বামী ধরা—। রসালাপের ঝড়ে চঞ্চল হল জটলা।

পার্থ স্পষ্ট শুনল পৃথা সাফাই গাইছে। —ওকে নিয়ে আর টানাটানি কেন। ভীষণ কুনো। মিশুকে নয়। তাছাড়া জানোই তো একটু বোদা টাইপও আছে। তরল হাসিতে লঘু হয় বিনোদিনী সংকলন।

২

তোমরা চাইতে শতগুণে বেশি
আমার নিজের জীবন প্রিয়;
তোমারে ছাড়িয়া চলে না জীবন,
তাই তোষামোদ আমার নিও।

—হাল। গাথা-সপ্তশতী।

বয়স এবং চিন্তাজর্জরতা নিটোল ঘুমের প্রতিবন্ধী। ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতাই ঘুমের মান্য বিকল্প। সেই আচ্ছন্নতাও ছিন্ন হয়। মৃদু সুরেলা ধ্বনির গুনগুনানিতে। তীর্থ পাশ ফেরে। চোখ মেলতে দেখে গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে পৃথা প্রতিমার গান গাইছে। "ও আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা।" অতর্কিতে গান থেমে যায়। কারণ বারিধারা। বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তীর্থ বিস্ময় প্রকাশ করে।

—মাঘের শেষে বৃষ্টি। ক্ষিপ্র হাতে পাল্লা বন্ধ করে দিতে দিতে পৃথা ঘাড় বেকাঁয়। পাতলা নাইটিতে আবৃত কাঠামো উদ্ধত এবং বঙ্কিম হয়। মুখ মুখর হয়।

—যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।

তীর্থর কাছে বিশেষ লক্ষণীয় হয় যে যৌথ পরিবারে পৃথা যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। রূপশ্রী হয়ে যেন ফুটছে। শ্রী ও স্বাস্থ্যে উত্তরোত্তর খোলতাই হচ্ছে। হয়তো জলবায়ুর গুণ। হয়তো স্বাধীন আবহাওয়ার গুণ। হয়তো জলবায়ু এবং স্বাধীনতার যৌথ উৎপাদন। ও সুখী হচ্ছে। এ কী কম প্রাপ্তি?

তীর্থর রোমান্স আসে। অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে পৃথা আস্কারা দেয়। তীর্থ নিকটতম হতে পৃথা ওর মসৃণ কোমল ত্বকময় উষ্ণতার সেঁক দিচ্ছে। নি-ত্বক অভ্যন্তরে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে পৃথা বিযুক্ত হয়। রোমান্স ভোগে। আপসোসে ঝটকা দেয়। জানায়।—এভাবে চলে না।

ঘরপোড়া গরু তীর্থ। আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখে আঁতকে ওঠে।

—ওভেনটা বাদ দিতে হবে।

—কেন? পুরোনো তো হয়নি। বেশ তো চলছে।

—মামুলি রান্না আর পোষায় না। সখ করে অনেক কিছু রাঁধব উপায় নেই। লোকাল বাজারে খাবি খাওয়া মাছ অঢেল। ভেটকি চিতলের ছড়াছড়ি। চোখ জুড়ান রেওয়াজী খাসি। অথচ কাবাব রোস্ট তন্দুরি বানাব উপায় নেই।

তীর্থ নীরব। চলছে অংক নিয়ে কাটাকুটির খেলা। পৃথা দাবিতে ইস্তফা দেয়নি। ঝোপ বুঝে ফের কোপ।—আমাদের সংসারটা নেহাত ছোট নয়। খাঁই মেটাতে ওই ছোট্ট ফ্রিজে সব ধরে না। ইচ্ছেমতো পদ বানাব ইচ্ছেমতো মজুতো রাখব। রসনা তৃপ্ত হবে। সময় বাঁচবে। এটা থাকবে আমাদের শোবার ঘরে। বলে পৃথা চোখ মটকায়। নিবিড় গলায় বলে, —বিয়ার থাকবে। ঠাণ্ডা বিয়ার খেতে তুমি না খুব ভালোবাস। ফ্রিজ সূত্রে যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায় টুকে রাখা বিষয়। সে তা যোগ করল। —আর সেই সঙ্গে দরকার একটা মাইক্রোওভেন। তাওয়া টু নোলা গরম গরম স্নাকস উইথ চিলড বিয়ার। কী মশাই উত্তেজনা আসছে না। পৃথা শরীর ঝাপটায়।

দুর্বলতায় সুড়সুড়ি। বাক্যের পুষ্পবনে ভিড়িয়ে দিয়ে বিহ্বল করা। খড়কুটোর মতো তীর্থ আশ্রয় করে অর্থনীতির ছেঁড়া সুতো। —কত পড়বে?

—থোক নিলে ষাট হাজার। হিউজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। তাছাড়া কিস্তিতে কিনব। সুদ ছাড়। দারুণ অফার চলছে। আর দশ দিন মেয়াদ।

তীর্থ আমতা আমতা করে। —অনেক টাকার প্রশ্ন। আবার দেনা।

—দেনা একদিন শোধ হয়ে যাবে। থেকে যাবে ভোগ্যবস্তু।

—দেনা শোধ হয় না। দেনা হচ্ছে দাড়ির মতো। যতই ছাঁটো ঠিক গজাবে।

আর্থিক সমস্যায় ভেতরটা পুড়ছে। পথ বাতলে দিতে পারে এই আশায় অথবা মনটা হালকা হবে এই তাড়নায় তীর্থ কলিগ সুব্রতকে পারিবারিক অবস্থাটা হাট করল। সুব্রত বলল, —মুক্তি পেতে চাইলে এমন থেকেই রাশ টান। না হলে ডুববি।

—পারব না। টানাটানি চলছে শুনে ও কাঁদছিল।

—ও নিয়ে ভাবিস না। মেয়েদের কান্না মিউনিসিপালিটির জলের মতো। ঠিক টাইমে আসে আবার ঠিক টাইমে বন্ধ হয়ে যায়।

মুখস্থ বিদ্যে ধোপে টেকে না। ভীষণ জোগাড়ে মহিলা এই সেনদি। তার ব্যবস্থাপনায় এক অপরাহ্নে গৃহাঙ্গন জাঁকিয়ে আলোকিত করল সমূহ ভোগ্যপণ্য।

সন্ধ্যা নামছে। কাজের তাড়ায় রাজপথে হাঁটছে তীর্থ। সহসা আকাশের দিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে। আকাশের এক কোণ ওকে মুগ্ধ করল। কঙ্কনপরা দুটি বাহু অসীম শূন্যতা থেকে কলসি উপুড় করে যেন গলগল করে কাঁচা সোনা ঢেলে দিচ্ছে। বেলা পড়ে আসছে। এলোমেলো ঝাপটায় দুরন্ত বাতাস বইছে। দু-পাশে শ্রেণিবদ্ধ বনসাই বৃক্ষ। টব শিল্পে অরণ্যের গঠন।

শিরশিরে সুখকর বাতাস। মানসিক কাব্যময়তা উসকায়। তীর্থর নীড় প্রেম প্রবল হয়। ভাবে বাড়ি যাই। সন্ধ্যা এবং রাত্রির প্রথম যাম উপভোগ্য হোক পৃথা সঙ্গতায়।

৩

অন্ধকারই একমাত্র সূচি,
প্রেমের' নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ।

—অন্ধকারে আর, বিষ্ণু দে।

শ্রান্ত বিকেল। অবসন্ন পাড়া। মেঝেতে মাদুর পেতে পৃথা বসে আছে। আলগা হয়ে। মাসে একদিন এই সময় পার্লার ঠাকুরঝি আসে। এসেও গেল। ব্যাগ থেকে এক এক করে বার করল কাঁচি, হরেক রকম শিশিতে লোশন। ত্বকের ওপর পড়তে থাকে নানান লোশনের প্রলেপ। আঙুলের কারিকুরিতে চলতে থাকে মুখাবয়বের পরিচর্যা। লুপ্ত জেল্লা খুঁড়ে খুঁড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। এই সময়টাতে পৃথার মধ্যে একপ্রকার রানী রানী ভাব ভর করে। যে ভাবকল্প খুব উপভোগ্য। চুল হেনা করতে পৃথা বিউটিশিয়ান বিমলার বুকে মাথাটা এমনভাবে এলিয়ে দেয় যেন সে দাসীর সেবা নিচ্ছে। বিমলার আঙুল পৃথার চুল চিরে চিরে চুলের গোড়া ত্বক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বিভ্রমের আয়োজন অব্যাহত। ফাঁকে ফাঁকে পুটুর পুটুর কথা চালাচালি। বিমলার কাজ পাটে। তাকে "এসো" জানিয়ে দরজা ভেজায়। মনে আসে হাতে অনেক কাজ পড়ে আছে। থাক পড়ে কাজ। পৃথা সোফায় বসে আলস্যের দাস হয়। পূর্বাভাস ছাড়াই ফস করে বৃষ্টি নামল। পৃথার দৃষ্টিতে আসে জলের ঝাপটায় ভিজে

যাচ্ছে পরিপাটি শয্যা। উঠি উঠি করেও পৃথা ওঠে না। নিতম্বের ভার বয়ে অতদূর যেতে তার কুঁড়েমি আসে। নিতম্ব ভারে পড়ে আছি। ভাবতেই শিরশির করে গঠন। সম্পদ জ্ঞানে গর্ব আসে তার। সে সচেতন যে গলিপথে আনাগোনা কালে পাড়ার দেবররা উদ্বুদ্ধ হয়ে ধৃষ্ট রঙ্গ ছোঁড়ে এই বলে : ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়। একথা ঠিক ঈদৃশ টিজ ওকে ত্রস্ত করে। সূক্ষ্ম ত্রাসে ক্ষিপ্রতা পায় পদসঞ্চার। ভাবের ঘরে সিঁদ না কাটলে স্বীকার্য যে বিরলে তুষ্টি আসে। বার পুরুষের মোহদৃষ্টি বেশ উৎসাহবোধক। অন্তর্গতে এই আবিষ্কার হোক স্বৈরিণী মনস্তত্ত্বের দ্যোতক—তবু অদ্ভুত একপ্রকার অবৈধ অথচ সুন্দর রোমাঞ্চ ছেয়ে যায় অনুভবে। চাঙ্গা হওয়ার সালসাও বটে। পশ্চিমাগত যৌবনবেলায় রজনীকান্ত যে ভাবে তাকে থেকে থেকে আচ্ছন্ন করে; বৈরাগ্য আনে—তার থেকে মুক্তি পেতে পুরুষের স্তব দৃষ্টি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

ঘোর ঘোর ভাব ছিন্ন হয় আওয়াজে। গৌরী ঢোকে। তড়বড় করে বলে,—কী গো বৌদি সব যে চুবে যাচ্ছে। তোমার দেখছি হুঁশ নেই। বলে আর পটপট জানালার পাল্লা করতে থাকে বন্ধ।

কাজের মেয়ে কাজ সেরে ফিরে গেছে আপন ডেরায়। তীর্থ বাড়ি ফিরল। এ্যাটাচি রেখে ইতিউতি তাকায়। চোখে পড়ল গোড়ালি তুলে হাত তুলে ঝুল বারান্দার তারে পৃথা কাপড় মেলছে। সদ্যস্নাত। মাথার চুল থেকে বগলের চুল থেকে জল ঝরছে। পৃথারও চোখে পড়ল তীর্থর দুষ্টু দুষ্টু চাউনি। যে দৃষ্টিতে ভোগ ভোগ তৃষা। পৃথা পাত্তা দেয় না। চোখ পাকাল।

রোমান্সের অর্ন্তঘাত। বিষণ্ণ তীর্থ নিজেকে শম্বুক করে।

তীর্থ এবং দুই মেয়ে খেয়ে নেয়। খেয়ে দেয়ে ওরা যে যার শয্যালগ্ন। সবার শেষে টুকিটাকি কাজ সেরে পৃথা খায়। এখন সে রেওয়াজ পালিকা। মাছের ঝোল ডাল চচ্চরি ভাতের ওপর ঢেলে থালাটা টেবিলের এক কোণে নিয়ে বসে পৃথা। ভাত মাখতে মাখতে গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে এই সময়টাতে প্রত্যহ তার চোখে জল আসে। একা একা খেতে কান্না পায়। নিজেকে মনে হয় অনাথবতী। কেউ যদি ভাতের থালা বেড়ে দিত।

তীর্থ বিছানায়। ভাতঘুমের সন্ধিক্ষণে। টেবিল মুছে থালাবাসন এককাট্টা করে হাত মুখ ধোয় পৃথা। বার দরজা এঁটে বাড়তি আলো নিভিয়ে দেয়। শোবার আগে পৃথা মুখে নাইট ক্রিম ঘসে। এই সময় সোফায় বসে কিছুটা অবসর ভরাট করে আলস্যে। রোজকার অভ্যেস সে অদ্য রজনীতেও পালন করছে। পৃথা সোফায় বসল বিস্তৃত হয়ে। তার কাছে এই অবসর মহার্ঘ। মহিমাময় নিভৃতি। অনেকক্ষণ নিভৃতি উপভোগ করতে করতে এক সময় তাড়া অনুভব করে, ক্লান্তিহরক বিশ্রামে ঘুমের ইশারা।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল তীর্থ। আচমকা জাগল পৃথার কণ্ঠস্বরে। গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়ে শুধোয়, —শুনছো।

—উঁ-উচ্চারণে গোঙাতে গোঙাতে তীর্থ পাশ ফেরে।

—আমাদের বাথরুমটা দারুণ না!

ঘুমের ঘোর চটকে যায়। তীর্থ উৎকর্ণ। পৃথা বলছে।—দেওয়ালে পাথর ফিটিংস। মাথার

ওপর ফনা তোলা শাওয়ার। বেশ খোলমেলা কার্পেট এরিয়া। লং হুইট।

ছিল শুয়ে। কোমরে ভাঁজ ফেলে আধশোয়া হল পৃথা। মুঠি দিয়ে হাইচেপে দু-হাত ডানার মতো মেলে আড় ভাঙে। কোমল আক্ষেপ ঝরায়। —সব আছে। অথচ কী যেন নেই। ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তোমার লাগে না।

তীর্থ হতবাক। অপেক্ষাই ভরসা। অবশ্য তর সইতে হয় না। পৃথা স্পষ্ট করে বিষয়। —শীতে উষ্ণ ধারায় চান। সেই সঙ্গে কবোষ্ণ জলে অবগাহন। কী সুখ ভাবা যায়! এ বিলাসটুকু উপভোগ করা যায় একটা গিজার ও বাথটাব বসালে। সেনদি পরশু বসিয়েছে। মল্লিকাদের আগে থেকেই আছে।

তীর্থ বিভ্রান্ত। তার বিমূড়তা লক্ষ করে পৃথা খোলসা করে। —ভড়কে যাওয়ার মতো দাম নয়। এখন সেলে একটা নিলে আর একটা ৫০% রিবেট। ভাবা যায়! ২টো পড়বে মাত্র ১৬ হাজারের মতো। সবাই কিনছে।

এমনভাবে বলল যেন জলের দামে গঙ্গার ইলিশ বিকোচ্ছে। কিনতে কাড়াকাড়ি। তীর্থর মনে হল বুকে যেন শব্দের কুৎসিত চাবুক পড়ল। সবাই কিনছে। অর্থাৎ নিজস্ব প্রয়োজন বড় কথা নয়। বড় কথা হল পড়শিদের নকল করা। টেক্কা দেওয়া। ঠাট বজায় রাখা।

চোখকে যে ইচ্ছে মতন আয়ত এবং হ্রস্ব করা যায়; চোখকে করা যায় শুকনো এবং টসটসে তা জানা ছিল না। এখন জানল পৃথার দিকে চোখ পড়তে। বলশালী আবেদন। উপেক্ষা করা কঠিন। এমন ক্ষণে যুক্তি কল্কে পায় না। বাতাসের ভারে যেমন হয় কচি পাতার—পণ্য চাহিদার আক্রমণে জর্জরিত তীর্থর মাথাটা নুইয়ে পড়ে। স্তব্ধতা বিরাজিত। এই ভাষা পৃথার বোধগম্য। তীর্থ লড়ছে। ভাঙছে।

সুযোগ সন্ধানী পৃথা খেলায়। তীর্থর অসহায় এবং ব্যথিত মুখশ্রী দু-হাতের বেড়ে বন্দী করে। ধীরে ধীরে টেনে এনে স্থাপন করে তার প্রসিদ্ধ স্তন বিভাজিকায়। কথা বেকার। অভিব্যক্তির ভাষা হচ্ছে : আমি তোমার প্রাচীন সেবাইত। আমাকে খুশি রাখতে আমাকে ফোটাতে তোমার কি কোনও আকুলতা আসে না!

ওর ক্লান্ত মাথার অজস্র চুলে আঙুল চিরে চিরে ঘুম ঘুম আবেশ সঞ্চার করে।

দোঁহা সংলগ্নতা তীর্থকে পীড়িতের আস্বাদ দেয়। মনের আগুনে জলপড়া। তীর্থ বশীভূত।

কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল বাথরুমের দেওয়াল ঘেঁষে পিংক কালার বাথটাব এবং সিলিংয়ে গিজার ঝুলছে। পূর্ণতা পেয়েছে চানঘর।

তীর্থ ভেবেছিল এবার আগে বাড়বে। পন্য সঞ্চয়ে বুঝি ক্লান্তি এসেছে। ভুল। এক হাওয়ার রাতে, পৃথা দাবি পেশ করল। —সিনথেটিক সুতোয় তোমার না এলার্জি হয়। গা কুট কুট করে। এবার থেকে সুতি ধর। ছাড়া জামা পরতে হবে না। ধোপার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। সুইচি টিপব কাচা হয়ে যাবে। আমার দিকটাও দেখ—বলে হাতটা মেলে ধরে।— কাচাকুচিতে হাতে কড়া পড়ে গেল। একটা ওয়াসিং মেশিন কিনে ফেলি।

তীর্থ এবার নিষ্ঠুর হয়। —আর পারছি না। হতে পারি পদস্থ চাকুরে। তবু চাকরিজীবী তো। কত আর পারি।

পৃথার মুখ গোমড়া হয়। হা-হুতাশি গলায় বলে, —গ্যারেজে গ্যারেজে কত স্যান্ট্রো

মারুতি ইন্ডিকা ফিয়েট পড়ে পড়ে ঝিমোয়। কখনো বায়না করেছি কেনো।

বুক থেকে যেন পাথর নেমে যায় তীর্থর। বাঁচোয়া, চার চাকার চক্করে পড়েনি। অফিস গাড়িতেই তুষ্ট আছে।

অতএব অনেক বড় আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়ার খুশিতে কাপড়কাচা যন্ত্র এসে যায় ঘরে।

৪

বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র নাই; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন।।
—সৃষ্টি রহস্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

—পৃথাদি...অ পৃথাদি...। হাঁপাতে হাঁপাতে মল্লিকা ঘরে ঢোকে। যেন বা একটু নৈঃশব্দ্যে ও চমকায়। চোখে বিস্ময় টেনে শুধোয়,—একী কেউ নেই। আশা—ইতি...।

—না কেউ নেই। মেয়েরা টিউশন পড়তে। পৃথা টুকটাক কেনাকাটা সারতে বাইরে।

—অমৃতাঞ্জন আছে? মাথাটা যে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

—অমৃতাঞ্জন? নেই বোধহয়। থাকলেও কোথায় যে আছে জানি না। তীর্থ আমতা আমতা করে।

—কী যে জানেন। হ্যাঁদা কোথাকার। মল্লিকা তরল হয়। —ঘরেও কেউ নেই যে মাথাটা একটু টিপে দেয়।

—স্থির হয়ে বসুন না। দেখি কী করা যায়।

—বাব্বা। বেশ তো বোল ফুটছে। ঘর ফাঁকা তাই খুব সাহস দেখছি। পৃথাদি থাকলে তো চোখে ছানি পড়ে।

—ঠেস দিতে হবে না। বসুন আমি মাথা টিপে দিচ্ছি। অবদমনের খোলস ছিন্ন করে তীর্থ যেই হাত বাড়ায় মল্লিকা ছোঁ মেরে টেনে নেয় হাত। কপালে রাখে। হ্যাচকা টানে যে ব্যবধান ছিল চকিতে সংক্ষিপ্ত হয়। রোমান্সের বাণিজ্যকরণে প্রাণিত তীর্থ পৃথার বুকে এঁটে থাকা খাটো জামার বাইরে দ্রষ্টব্য উদার শ্রীনিকেতনে আঙুল নিয়ে খেলা করে।

ঘর ফাঁকা হতেই তীর্থ আবার একলা। সেন্টার টেবিলে পা তুলে 'আউটলুক' পত্রিকায় চোখ বুলোতে থাকে। হঠাৎ বিশেষ এক কলামে চোখ লেপটে যায়। একটা সংবাদ অন্ত্রের পাক দিয়ে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। সংবাদটি হচ্ছে : টেমস নদীর এক নির্দিষ্ট স্পট আত্মহত্যার জন্য বিখ্যাত। আত্মহত্যার উৎস নিয়ে সাতজনের এক সমীক্ষক দল ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালিয়েছে। সসদ্যরা সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসিদ্ধ। তাদের তথ্য সংগ্রহ বিচার বিশ্লেষণ গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে : আত্মহত্যার গোড়ায় তিনটি মূল কারণ বিদ্যমান। সবগুলোই হতাশা সঞ্জাত। ক। ব্যর্থ প্রেম। খ। উচ্চাশা। গ। ঋণ জর্জরতা।

আমজনতার ধারণা, স্যাম্পল সার্ভে সূত্রে প্রাপ্ত—বেশির ভাগ মানুষ আত্মহত্যা করে ব্যর্থ প্রেমে। তোমাকে চাই আকাঙ্ক্ষার শূন্য পরিণতিতে। অর্থাৎ "ক" বিভাগ।

আশ্চর্য যে গবেষণালব্ধ রায় এই প্রত্যয়কে থেতলে দিয়েছে। গবেষণার ছাঁকা রায় হচ্ছে : আত্মহত্যার মূল শিকার "গ" বিভাগের অন্তর্গত। অর্থাৎ সামাজিক অস্তিত্বের বিপন্নতা। কর্জের ভার।

তীর্থ শিউরে ওঠে। শঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে ভাবে প্রত্যেক মানুষ কোনও না কোনও ক্ষণে সংখ্যালঘু।

৫

পাপ পুণ্যে বোঝাই হইয়া
নৌকা হইল ভারি,
আপন দোষে ডুবল তরী
দোষ দেই কাণ্ডারী
—প্রচলিত।

ছুটির দিন। জটলার ঢল নেমেছে আবাসন চত্বরে। সময়-শাসিত তাড়া নেই। গয়ংগচ্ছ ভাব। ভাঁজ করা কাগজ দোলাতে দোলাতে ভূপতিবাবু হই চই শুরু করেন। —পাড়ার মধ্যে শেষে সি বি আই ঢুকল। পরিবেশ দূষণের কিছু বাকি থাকল না। ছি ছি।

ভূগোলের টাকমাথা শিক্ষক শুধোন। —সে কী। কার বাড়ি।

খেঁকিয়ে ওঠেন ভূপতিবাবু।—কোতায় আচেন। পাড়ায় থাকেন না-কি। ঐ যে তীর্থবাবু। ঠাটবাট দেখেই আন্দাজ হয়েছে ডাল মে কুছ কালা। মাল সোজা পথে হাঁটছে না। ভেবেছিল যেমন খুশি খেলবে। ফাউল নাই। বগা এবার ফান্দে। বলে তিনি আঙুল তাক করেন। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বোর্ড আঁটা ২টো এ্যমবাসাডার রাস্তার ধারে ঘেঁষে অপেক্ষায়। সি বি আই অফিসারদের বয়ে এনেছে ওই গাড়ি। খবরটা গোপন ছিল হাঁড়িতে। হাঁড়ি ভূপতিবাবু ফাটিয়ে দিলেন হাটে।

প্রণববাবু কৌতূহল প্রকাশ করেন। —অপরাধ?

—ঘুষ।

প্রণববাবু হতাশ হন। —সে আর নতুন কথা কি। আবহমানকাল থকে সর্বাঙ্গে লেপটে আছে ঘুষ।

—তা বলে ঘুষের খেসারত দিতে দু শো লোকের জীবন চলে যাবে মায়ের ভোগে। ইয়ার্কি।

অবুঝের মতো বিস্ময়ে ত ত করতে থাকেন প্রণব। —উনি না আই আই টির ইনজিনিয়ার।

ভূপতি দাবড়ান। —থোন আপনার আই আই টি। সিকস্টি নাইনের ব্যাচ। চোতা টুকে পাস। ভ্যালুজ বলে ওদের কিছু নেই। ব্যাপারটা আগে শুনুন, বলে তিনি বিশদ করলেন; যার সারমর্ম হচ্ছে : গয়া থেকে ৫২ কি. মি. দূরে রফিগঞ্জের কাছে এক নদী আছে। ছোট নদী। ৪০ ফুট উঁচু ৩০ ফুট লম্বা। নতুন ব্রিজ তৈরির দায়িত্বে ছিলেন তীর্থবাবু। তো, ফোকটে

টাকা ঝাঁপার তালে তিনি বালি সিমেন্ট-রডে এমন কারচুপি করলেন যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ঘুন ধরে যায় তিন বছরের মধ্যে। রাজধানী এক্সপ্রেসের ভার সহ্য করতে না পেরে এক অংশ ভেঙে পড়ে দুশো লোককে নিয়ে গত নাইনথ্ সেপ্টেম্বর। জনগণ হচ্ছে চৌবাচ্চায় জিয়ান মাছ। গেল আর থাকল কী এসে যায়। সব ধামা চাপা পড়ে যেত। গেল না। যেহেতু ট্রেন ভি আই পি, যাত্রী ভি আই পি, যোগাযোগ ভি আই পি। ফলে বাছা ফাঁসে।

অফিসাররা অনেককিছু ঘাঁটাঘাঁটি করেন। জেরা করেন। কাগজপত্র আটক করেন। সিজার লিস্ট করে সই করান। কাজগুলো সারা হলে চীপ অফিসার বললেন, —আমরা নিরুপায়। ওপর থেকে চাপ আছে। প্লিজ আপনি চেঞ্জ করে আসুন। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ আছে।

তীর্থ উঠল, ভেতর ঘরে ঢুকতে যাবে যাবে থমকায়। চেঞ্জের আগে আত্মসমীক্ষার চাপ তাকে অস্থির করে। ভাবে এই প্রয়োজনে সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ চানঘর।

চানঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। আত্মবিশ্লেষণের পূর্বক্ষণে করতলে মুখ ঢাকে। গোঙায় তীর্থ। পৃথা স্বীকার করছি আমি অপরাধী। আমার উৎকোচে অনেক মানুষের সর্বনাশ। আমি পাপী। প্রেরণা তুমি। বিফল স্বামীর মুখ কোনও স্ত্রীর কাছেই সুন্দর নয়। তোমার ম্লান মুখ বিকেলের ছায়াভরা মুখ আমি সইতে পারি না। তোমার তৃপ্ত মুখের প্রতি আমার হাহাকার কোষে কোষে। সফল হতে চেয়েছি। আমার সফলতা তোমার মধ্যে চারিয়ে দেবে পণ সুখ...নিরাপত্তা...গর্ব। কিন্তু এ আমি কী করলাম। বিশ্বাস করো আমি নিজেকে সংশোধন করব। সুযোগ দাও। আইনকে কলা দেখিয়ে আমি ফিরে আসব। এই দুঃসময়ে আমার পৃথা তুমি আমার পাশে থাক। আমাদের তাঁবু যদি শক্ত থাকে আবার ফিরে পা সুখ...নিরাপত্তা...দাম্পত্য। তীর্থ তার আকুল প্রার্থনা অনুচ্চে ভাসিয়ে দেয়। পৃথা আমি যাচ্ছি আমার আশ্রয়...আমার সুখ...আমার কষ্ট...আমার বিশ্বাস...আমার আস্থা...আমার সর্ব তুমি...তোমার কাছে যাচ্ছি। যাচ্ছি...যাচ্ছি...যাচ্ছি...।

৬

তবুও দিইনি সব; বন্দী দেহে জীবনের দ্বিধা
এখনও বিচার করে অনাচারী সুযোগ সুবিধা।
কবে আর নিঃস্বতার স্বৈরীতায় ছিন্ন হবে বেড়ি!
আর কত দেরি?

—মধ্যবয়সের প্রার্থনা। বুদ্ধদেব বসু।

পাঁচ বছর রাধেশ্যাম এবং ন-বছর দাম্পত্য কী দিল। হিসেব কষতে গিয়ে পৃথা আমূল ছিন্নভিন্ন একথা ঠিক আমি হয়ত বাড়তি চাহিদা ক্রমাগত চাপ দিয়ে দিয়ে ওকে বিব্রত করেছি। কি ও বলবে না কোথায় ওর বাধা। কী ওর আয়। কতটুকু সামর্থ্য। আমার ওপর এটুকু আ নেই গোটা অবস্থা মেলে ধরে। যৌথ আলোচনায় বসে। তর্ক-বিতর্ক করে। তা না ও হ চাইল কর্তা। কর্তা হব আবার সখা হব। হয়! এই কি প্রেমের টান? তাই যদি তাহলে প্রণ আর বাইজি আসক্তিতে প্রভেদ কোথায়। নানাবিধ প্রশ্নে পৃথা প্লাবিত। উতল জিজ্ঞাসা উথলা

আমার প্রেম...আমার বন্ধুত্ব...আমার বিশ্বাস...সহস্র অযুত অযুত ধারার যার ওপর বর্ষিত, সেই তীর্থ...আমার তীর্থ ঘুষখোর। হত্যার আয়োজনে খুনি। দুশো প্রাণময়তার জহ্লাদ। মারণ যজ্ঞের নায়ক। ধিক আসে। ছি ছি। ঘেন্নায় গা রী রী করে।

পৃথার জিজ্ঞাসা প্রখর হয়। এই ভাবে সে কি হয়ে যাচ্ছে না অপমানের অংশ। পণ্য মূল্যের শিকার।

এক অদ্ভুত কষ্ট পৃথাকে কুরে কুরে দংশায়। বিশ্বাসহীনতা যে এত দুঃসহ-আস্থাভাজনেষু হতে না পারার আঘাত যে এত তীব্র পৃথার জানা ছিল না। জানল। এই অনুভবে সে উন্মূল হয় বিছানায়। বালিশ ভেজায়।

তীর্থ যখন এ ঘরে ঢুকল পৃথা শান্ত। ঝড় বহে গেছে মুখে তার রেশটুকু আছে। খাটের কিনারে বসে আছে। মেঝে থেকে সামান্য শূন্যে পায়ের পাতা মৃদু মৃদু আন্দোলিত।

ভক্তের ভঙ্গিমায় তীর্থ পায়ের কাছে বসে। আসনপিড়ি হয়ে। পৃথা অপলক তাকিয়ে থাকল তীর্থর প্রতি।

ইতিহাসের বইতে আদিবাসী-শূদ্র প্রভৃতি জাতিগত পুরুষদের মুখের যে ছবি আছে তা এবড়ো খেবড়ো। পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠুর। একপ্রকার কষ্টের ছাপে বিধ্বস্ত এবং পরাজিত। কিন্তু ওই সব মুখেও একপ্রকার সৌন্দর্যময় আদল আছে। শ্রম সংগ্রাম পরাজয়ের উৎপাদন।

পৃথা তীক্ষ্ণ নজর বোলায়। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে সেই রূপ। ব্যর্থ হয়। আঙ্গিকে ঈষৎ ঐক্য থাকলেও তা মূলত বাহ্য। প্রকৃত মিল আছে সেই মুখের সঙ্গে : গণপ্রহারে ধৃত পকেটমারের ক্ষতবিক্ষত ঘেয়ো মুখোবয়ব যেমন হয়।

ঘেন্নায় পৃথার মুখ বিমুখ হয়।

অনেক কথা বলবে বলে ভেবে এসেছিল তীর্থ। মুখোমুখি হতে বোবায় ধরল। অনেক আয়াসে একটি মাত্র আর্তি উচ্চারণে সক্ষম। —আমায় ক্ষমা কর পৃথা।

ক্ষমা সে পেল কি না—শীতার্ত রাত্রি যেমন সূর্যের প্রতীক্ষায় থাকে সেই ভঙ্গিমায় মুখ ভাসিয়ে রাখল।

—আমি যদি ফিরে আসি বুঝবে জবাব পেয়েছ।

—কী বলছ! তীর্থ নিনাদিন করে ওঠে।

—সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আমি তোমার সঙ্গে থাকব না। প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটা দিন সময় নেব।

সদ্য শস্য কেটে নেওয়া প্রান্তরের মতো ধু ধু চোখ তীর্থর। নিজেকে মনে করল নবান্নর ধান। ঢেকির পাড়ে খোলসচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েছে।

---

১ সেপ্টেম্বর '০২ রাজধানী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার বলি প্রিয়বরেষু রণেন মুখোপাধ্যায়-কে স্মরণ করে গল্পটির বয়ন।

কুকুর গৃহপালিত পশু

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

ছোট্টো তানিয়ার চাপাচাপিতে একটা কুকুরের বাচ্চা কিনে ফেলল অবশেষে, আমাদের অনিমেষ। অনিমেষ মানে অনিমেষ চক্রবর্তী। স্কুলের মাস্টার। প্রাইমারী। সবে চাকরি পেয়েছে। এলাকার স্কুলে। কলকাতায় এতদিন ব্যবসা করত। পি.জি.বি.টি করা ছিল। স্থানীয় মুরুব্বীর জোরে না নিয়ম মাফিক, তা অনিমেষই জানে। পাড়ার সকলে বলে মুরুব্বীর জোরে, নয়ত এই বাজারে চাকরি! আর অনিমেষ শুনে স্মিত হাসে। মৌন থেকে সকলের ধারণাকে সম্মতি জানায় কিনা এ বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। কারণ অনিমেষের চাকরিপ্রাপ্তির গুপ্ত রহস্য অনিমেষই বলতে পারে। অন্য কেউ নয়।

কুকুরের বাচ্চাটি ঘিরে অনিমেশের বউ নীলিমা, মেয়ে তানিয়া দুজনেই খুশি। যেন চাকরির আনন্দের চেয়ে কুকুর কেনার আনন্দ-ই বেশি। কুকুরটি ঘিরে চলে সারাদিন পরিচর্যা। কখনও ফিডিং বোতলে খাওয়ানো, কখনও স্নান করিয়ে গা মোছানো ইত্যাদি।

স্কুলের মাস্টারের কতগুলো সুবিধা আছে। প্রাইমারী স্কুলে একটু বেশি। মেধা অপেক্ষা মুরুব্বীর জোর বেশি থাকলে চাকরি রক্ষার দায়ও কম। না হলে ১৫ই আগস্ট স্কুলে পতাকা-উত্তোলনের ভিড়ে না থেকে কুকুরের ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলে দিন কাটানোর বিলাসিতা দেখাতে পারে? কুকুরের চিন্তায় মগ্ন অনিমেষের পড়ানোর কাজেও মনোনিবেশ করতে অসুবিধে হয়। কয়েকটি বিষয়ে মৃদু বকুনি খায় হেডমাস্টারের কাছে। বকুনি খেয়ে কুকুরপ্রেমী অনিমেষ কুকুরের মতোই হাতে-পায়ে ঢেউ খেলায়।

কুকুরের আগমন ও চাকরিপ্রাপ্তি প্রায় একই সঙ্গে ঘটেছিল বলে অনিমেষের দৈনন্দিন যাপন-ক্রিয়ায় কেউই পৃথক হয়ে থাকে না। অনিমেষের চাকরির বয়স যেমন বাড়ে, কুকুরের বয়সও তেমনই বেড়ে যায় সমান তালে। ছোট্ট তানিয়াও পিছিয়ে থাকে না এই বাড়ন্তের সমাবর্তনে।

আমাদের অনিমেষ এখন মাস্টার। গৃহপালিত পশুর সঙ্গে অনিমেষও গৃহপ্রেমী হয়েছে। নিন্দুকরা একে 'ঘর কুনো', 'বউ-এর ন্যাওটা', 'আঁচলের তলায় থাকে' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করলেও অনিমেষের তেমন হেলদোল নেই। শুধু 'স্ত্রৈণ' বললে একটু প্রতিবাদ করে, হয়ত নিজের পুরুষকার জাহির করার জন্য, কিন্তু অন্য সব বিশেষণ সহ্য করার অভ্যাসে রপ্ত হতে পেরেছে অনিমেষ। আমাদের অনিমেষ।

অনিমেষ কিন্তু চিরকালই এমন ছিল। সে দঙ্গল বেঁধে হৈ-হল্লোর করতে পারত না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য সংঘবদ্ধ হলে পালিয়ে যেত। অনিমেষের স্বভাবে ছিল কুকুর-বৃত্তির প্রবণতা। ক্লাব মিটিং-এ তাই সে অনায়াসে সম্পাদকের প্রশংসিত হত। রাজনীতির মাঠে সব সময় থাকত অধিনায়কের কক্ষপথে। অনিমেষকে নিয়ে গর্ব ছিল না আমাদের।

অনিমেষ এইসবের বদলে পেয়েছে একটা চাকরি। আর একটা কুকুর তাকে বদলে দিয়েছে সবকিছু। ছোট একটা ব্যবসায় তেমন আয় ছিল না অনিমেশের। স্ত্রী নীলিমার প্রয়োজন ছিল

তাই কম। এখন অনিমেষ নির্দিষ্ট আয়-এর মুখ দেখেছে। সংসারে প্রয়োজন বাড়ছে সেই পারা মেপে। এই প্রয়োজন মাঝে মাঝে সেই পারা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর তখনই হচ্ছে সংকট। নীলিমার মুখ ভারী, কন্যার অসংখ্য বায়না, কুকুরের খাওয়া ও শিক্ষার খরচের সঙ্গে নিজের আয়-এর সামঞ্জস্য বিধান করতে অনিমেষ নিজের অজান্তেই কেমন যেন কুকুর হয়ে যাচ্ছে।

আজই ক্লাস ফোর-এ রচনা লিখিয়েছে 'কুকুর'। প্রথমেই বলেছে, 'কুকুর গৃহপালিত পশু।' ক্লাসের নবীন প্রশ্ন করেছে, 'গৃহপালিত মানে কী স্যার?'

—'যাদের গৃহে পালন করা হয়, মানে যারা ঘরে মানুষ হয়।'

পাল্টা প্রশ্ন করেছে ফচ্‌কে মানিক, 'কুকুরকে তো স্যার ঘরে মানুষ করা হয় না। তবে কুকুর কী করে গৃহপালিত হল?'

অনিমেষ পাল্টা প্রশ্ন করেছে ছাত্রদের, 'তাহলে অন্য একটা গৃহপালিত জন্তুর নাম বল?'

মানিক চটপট উত্তর দিয়েছে, 'গরু।'

অনিমেষ ভাবে, ঠিকই। কোনো গরুকে তো ছেড়ে পোষা হয় না। সব গরুকেই গৃহে পালন করা হয়, কিন্তু কুকুরের বেলায় এ কথা খাটে না। কারণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এমন অনেক কুকুর আছে।

নিতাই বলে, 'আপনাদের বাড়ির কুকুরটা গৃহপালিত, তাই না স্যার?'

অনিমেষ গম্ভীর হয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

অনিমেষ একটু বদল করতে চায় বাক্যটা। ছাত্রদের দিকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়, বলে, 'তোমরাই বলো কীভাবে শুরু করবে? কুকুরের চারটে পা দিয়ে শুরু করাটা বড্ড বেমানান।'

ফার্স্ট বয় সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কোনো কোনো কুকুর হয় গৃহপালিত।'

অনিমেষের মনোমতো হয় না বাক্যটা। কুকুর রচনার প্রথম বাক্যটিই সমগ্র কুকুর জাতিকে নিয়ে নয়, এটা হতে পারে না। মাথা নাড়ে অনিমেষ। ছাত্ররা বোঝে বাক্যটা পছন্দ হয়নি স্যারের।

সেকেন্ড বয় সুভাষ ভাবে, বাবা বলেছিলেন সমস্ত কিছুই উদাহরণ দিয়ে বলতে হয়। তাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি বলবো স্যার?'

—'বলো।'

—'কোনো কোনো কুকুর হয় গৃহপালিত, যেমন বড়বাবুদের টমি।'

হো হো করে হেসে ওঠে গোটা ক্লাস।

অনিমেষ গম্ভীর হয়ে যায়। মাস্টারি কুশলতায় বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে বলে, 'কুকুর রচনায় সমস্ত কুকুর জাতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, কোনো কোনো দিয়ে শুরু করলে হবে না।'

বাংলায় ভালো নম্বর পাওয়া বিমল ক্লাসে থার্ড হয়, সে সমস্ত প্রশ্নোত্তর মনোযোগ সহকারে শুনে বলল, 'সমস্ত কুকুর গৃহপালিত নয়।'

অনিমেষের বাক্যটা কিছুটা মনে ধরলো বটে কিন্তু নঞর্থক বাক্য দিয়ে রচনা শুরু

রীতিবিরুদ্ধ। অনেক ভেবে চিন্তে অনিমেষ বলল, 'লেখো, কুকুর গৃহপালিত পশু কিন্তু সমস্ত কুকুর গৃহপালিত নয়। কুকুরের চারটি পা, দুটি কান ও একটি লেজ আছে।' গড় গড় করে চার ছটা লাইন বলে গেল। কোনো বাধা এল না ছাত্র মহল থেকে। অনিমেষ যখন বলল, 'কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর' রঞ্জন প্রশ্ন করল, 'ঘ্রাণশক্তি মানে কী স্যার?'

অনিমেষ বলল, 'কুকুর শুঁকে সব কিছু বুঝতে পারে।'

ফচকে মানিক আর চুপ থাকতে পারল না, সে বলল, 'তাহলে স্যার, কুকুর অতবার শুঁকেও বুঝতে না পেরে গু খায় কেন?'

প্রাইমারী ট্রেনিংপ্রাপ্ত অনিমেষ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, 'গু ওদের খাদ্য বলে?'

—'তাহলে অতোবার শোকে কেন?'

নিতাই বলল, 'শুঁকে দেখে গুটা ভালো আছে কিনা?'

মুরুব্বীর জোরে প্রাইমারী শিক্ষক হলেও অনিমেষ এই সমস্ত 'পেছনে লাগা' ছাত্রদের শিক্ষকসুলভ পটুতায় কীভাবে ট্যাকেল করতে হয় জানে। অনিমেষ এ সমস্ত ক্ষেত্রে জানে, একবার রেগে গেলে সারা জীবন ছাত্ররা পেছনে লাগবে। একটা দল পাস করে বেরিয়ে গেলেও কোনো অশনি বার্তায় পরের উঠতি ছাত্ররা ঠিক জেনে যাবে ওমুক স্যার আমাদের 'খোরাক'। সে যখন টাউনস্কুলে পড়ত, বিনয় স্যারকে ওভাবে হাসির খোরাক করত সকলে। হয়ত চাকরি জীবনের প্রারম্ভে কোনো এক মুহূর্তের ভুলে হয়ত কোনোদিন 'কাতলা' কথায় রেগে গিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ ৩৪ বছর যতদিন শিক্ষকতা করেছেন তার 'কাতলা' নাম জেনে গেছে চৌত্রিশটি নতুন ক্লাসের দল। তার বিদায় সভাতেও নাকি কে যেন পেছন থেকে 'কাতলা' বলেছিল, আর তাই শুনে বিনয়বাবু কান্নামাখা বক্তৃতা থামিয়ে চোখ পাকিয়ে পেছনে ফিরে বলেছিলেন, 'কোন 'হারামজাদারে'।

অনিমেষ এ বিষয়ে সতর্ক। চাকরি জীবনের সবে কয়েক মাস হয়েছে, এখনও ২০-২৫ বছর চাকরি করতে হবে। এইসব শুনে বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করলে আর রক্ষা নেই। হয়ত ফচকে ছাত্রের দল তার নামও 'কুকুর' রেখে দিতে পারে। ভাবলে শিহরিত হতে হচ্ছে। দৈবাৎক্রমে যদি ওই নামের প্রাপ্তি লাভ ঘটে তবে...। না, অনিমেষ এ সব কিছুই ভাবতে চায় না।

চাকরি জীবনের তৃতীয় দিনে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সে ক্লাস থ্রি-র ভূগোল ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কয়লা কোথায় পাওয়া যায়?'

একটি ছেলে উত্তর দিয়েছিল, 'শ্রীহনুমান কোল ডিপো।'

অনিমেষ তার সঙ্গে রসিকতা করছে ভেবে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেটিকে মারতে মারতে হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিল।

ছেলেটি উল্টে অভিযোগ জানিয়েছিল, 'স্যার আমি কয়লা কোথায় পাওয়া যায় এর উত্তরে বলেছিলাম শ্রীহনুমান কোল ডিপো। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্যার আমাকে মারতে মারতে আপনার কাছে নিয়ে এলেন। কেন স্যার, আমি আজ সকালেই বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখেছি শ্রীহনুমান কোল ডিপোর সামনে বড় বড় করে লেখা রয়েছে, 'উন্নতমানের কয়লা এখানে পাওয়া যায়'। কেন স্যার আমি কি কোনো ভুল বলেছি?'

হেডমাস্টার তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ক্লাসে পাঠিয়ে অনিমেষকে টানা দশ মিনিট ছাত্রদের ট্যাকেল করা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই থেকে অনিমেষ প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনো দিন ক্লাসে ক্রোধ প্রকাশ করবে না।

বাংলা ক্লাসে একবার এক ছাত্র খাতায় 'পদব্রজের' অর্থ লিখেছিল, 'পা বাজিয়ে বাজিয়ে'। অনিমেষ সেটা কেটে শুধু লিখে দিয়েছিল 'পায়ে হেঁটে'। ছেলেটিকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আজও তাই সে শিক্ষকসুলভ সংযম দেখাচ্ছে। 'কুকুর গু শোঁকে কারণ শুঁকে দেখে গুটা ভালো আছে কিনা?'—এই উত্তর শুনে কান লাল হয়ে গিয়েছিল অনিমেষের। কিন্তু এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে শুধু বলল, 'ওরা শুধু ওগুলো নয়, মানুষও শুঁকে বুঝতে পারে। আজকাল তাই কুকুরকে চোর, ডাকাত, খুনি ধরার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

সুনীল বলল, 'কিন্তু স্যার সমগ্র কুকুর জাতিকে নয়।'

অনিমেষের মনে পড়লো হ্যা, রচনা লেখার শুরুতেই প্রথম বাক্য নিয়ে যে বিভ্রাট ঘটেছিল, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেই বলেছিল, রচনাটি কুকুর জাতিকে নিয়ে, নির্দিষ্ট কয়েকটি কুকুরকে নিয়ে নয়। তবে এখন সে কী বলবে? ক্ষণিকের ভাবনাতেই মুরুব্বী বা মেধার জোরে (যা আজও অমীমাংসিত) প্রাপ্ত প্রাইমারী শিক্ষক অনিমেষ বলল, 'তার জন্য অবশ্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।'

—কুকুরদেরও স্যার শিক্ষার প্রয়োজন হয়?

—হ্যাঁ, বিশেষ পারদর্শিতার জন্য হতেই পারে।

—তবে স্যার সব কুকুরকে দেওয়া হয় না কেন?

—সব কুকুর এ ব্যাপারে উপযুক্ত নয় বলে।

—কোন্ কুকুর স্যার উপযুক্ত?

—এ্যালশেসিয়ান, হাউণ্ড প্রভৃতি।

—দেশি কুকুর নয় কেন?

—ওরা ওসব পারে না বলে?

—ওদের শেখালেও কি স্যার ওরা পারবে না?

—না।

—না স্যার, দেশিদের নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

—উচিত বললে তো হবে না। যারা পারবে না তাদের মাথায় করে নিয়ে নাচলে তো হবে না।—একটু ক্রোধ প্রকাশিত হয় অনিমেষের উত্তরে।

এবার ফচ্‌কে মাণিকের পালা। আর সে চুপ থাকতে পারে না, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তবে স্যার সেদিন যে বলেলন—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই।'

সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে অনিমেষের। বলে, 'তোমার মতো মোটা মাথার ছেলেকে শেখানোর বিদ্যা আমার জানা নেই। তুমি এখন চুপ করে বোসো।'

মাণিক ভয়ে বসে পড়ে। ছুটির ঘণ্টা পড়ে।

অনিমেষ বলল, 'আজ এখানেই থাক পরের দিন বাকিটুকু লিখিয়ে দেব।'

একটা সাধারণ কুকুর রচনা লেখাতে গিয়ে যে এত বিভ্রাটে পড়বে অনিমেষ ভাবতে পারেনি। মেধা না মুরুব্বী কীসের জোরে অনিমেষ শিক্ষকতা পেয়েছে এই বিষয়ে সংশয় থাকলেও কুকুর রচনা যে অনিমেষ লেখাতে পারবে না, এই বিষয়ে তো নিশ্চয় কারো সংশয় নেই, তবু অনিমেষ পারল না। চল্লিশ মিনিটের ক্লাসে প্রথম লাইনটি লেখাতে চলে গেল আট-দশ মিনিট। পরের চারটি লাইন অবশ্য চার মিনিটে। তারপর ঘ্রাণশক্তিতে গিয়ে যে আটকে পড়লো, আর বেরোতে পারল না। পঁচিশ মিনিট যে কোথা দিয়ে কেটে গেল অনিমেষ বুঝতেই পারল না।

বাড়ি এসেও ওই কুকুরে মগ্ন থাকলো অনিমেষ। ভারক্রান্ত মন নিয়ে বিছানায় এলিয়ে দিল শরীর। তানিয়া কাছে এসে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। অনিমেষের মনে পড়ল কুকুর খুব প্রভুভক্ত। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তানিয়া আর কুকুর একই ভাবে লাফালাফি করেছিল আনন্দে। তারপর কাপড় জামা ছেড়ে হাত পা ধুয়ে বিছানায় এলে কুকুরটি পায়ে মাথা ঘষতে শুরু করল, আর আত্মজ তানিয়া মাথায় হাতে বুলোতে শুরু করল। আত্মজের সঙ্গে কুকুরের তুলনা কীভাবে মনে এল? ভেবে আঁতকে উঠল অনিমেষ। মেয়েকে দুহাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। কুকুরকে পা দিয়ে ঠেলে বিছানা থেকে নামিয়ে দিল মাটিতে। অনিমেষ এখন একা। তানিয়া রাগ করে কুকুরকে বলল, 'চল রমি, বাবাটা বড্ড দুষ্টু, আমরা দুজনে আর কেউ বাবার কাছে আসবো না।' রমিও যেন কতো না বুঝে তানিয়ার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আলো নিভিয়ে দিল অনিমেষ। পাখাটা ফুল স্পিডে ঘুরছে তবুও মাথার ঘাম শুকোচ্ছে না। রিনি রিনি ঘাম মাথার চারদিকে জমে। তানিয়াও রমিকে কি মানুষ ভাবে? ....গৃহপালিত কুকুর কি তবে প্রায় মানুষ? ....কুকুর প্রজাতির নয়? ....রচনা লেখানোর সময় তো এই বিষয়টাই তাকে বারংবার হোচট দিয়েছে। গৃহপালিত কুকুর ও রাস্তার কুকুর তো চরিত্রগতভাবে সত্যি ভিন্ন। কোনো গৃহপালিত কুকুর তো মানুষের মল স্পর্শ করে না। গৃহের অভিভাবকরা করতে দেয় না। এই জন্যই কুকুরের শিক্ষার প্রয়োজন। নীলিমার পরামর্শে প্রথম গেস্টেই সে কুকুরের জন্য ট্রেনার নিয়োগ করেছে। ১৫ই আগস্ট পতাকা তোলার দলে সামিল না হয়ে করেছে। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকার উত্তোলনের চেয়ে কুকুরের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আর এই কুকুর, মানুষ—সবার শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান এর মূলে যে অর্থব্যয়—যার উৎস শিক্ষকতা—যার একটি কর্ম রচনা লেখানো—কুকুর রচনা—সেই কর্মই কিনা যে ঠিকমতো করতে পারছে না। এটা কি নিছকই ছাত্রদের দুষ্টুমির জন্য না বিষয়টি সম্পর্কে নিজের সংশয়, স্থির সিদ্ধান্তমূলক বাক্যে না পৌঁছনোর দ্বিধা?

নীলিমা চা নিয়ে আসে, বলে,

—একি ঘর অন্ধকার? আলো জ্বালোনি কেন?

—ভালো লাগছে না।

—কেন? শরীর খারাপ?

—না, এমনি, মনটা ভালো নেই।

—কেন, স্কুলে গোলমাল হয়েছে?

—না।

—তবে?

নীলিমার কোলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে অনিমেষ। নীলিমা প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে বলবে ওেং?' মাথায় বিলি কাটে।

—চাকরির পর থেকে কুকুর আমার পিছু নিয়েছে।

—একথা বলছো কেন?

—দেখো, চাকরি পেয়ে আনন্দে অন্য কিছু না কিনে, কিনলাম কিনা একটা কুকুর। কুকুর কিনে চাকরি পাওয়ার আনন্দকে সেলিব্রেট করলাম। ভাবতে পারছো?

—ওভাবে ভাবছো কেন? কতো লোকই তো কুকুর কেনে।

—না শুধু কিনলাম না, ১৫ই আগস্ট স্কুলে না গিয়ে আমি কুকুরে ট্রেনার নিয়োগ করলাম।

—কেন তাতে কি তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে?

—পরদিন স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের বকুনি খেলাম।

—সে কথা তো তুমি আগে বলোনি?

—ওই লজ্জার কথা কি বলার না গোপন করার?

ওটাকে তুমি লজ্জা বলে ভাবছো কেন? চাকরি ক্ষেত্রে ওরকম সকলেরই হয়ে থাকে।

—তারপর কুকুরের প্রভুভক্তিতে আমি মুগ্ধ হলাম, কুকুরকেও তোমাদের মতো করে ভাবতে লাগলাম।

—এসব কথা আজকে মনে হচ্ছে কেন?

—মনে হচ্ছে কেন শুনবে? কুকুর রচনা লেখাতে গিয়ে আজ প্রতিপদে আমি ছাত্রদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি।

—কেন? রচনা বই-এর বাইরে কি তুমি কিছু লেখাচ্ছিলে?

—না। কুকুর গৃহপালিত পশু—এই কথাটাই ওরা মানতে চায় না।

—তুমি তো আর নতুন কথা কিছু বলছো না। বই-এর কথায় বলছো, তবে মানবে না কেন?

—কারণ ওদের প্রশ্ন শুনে আমারও সংশয় হচ্ছে, গৃহপালিত পশু আর রাস্তার কুকুর এক গোত্রীয় নয়।

—এক তো নয়-ই, তা সকলেই জানে।

—জানলে তো আর হল না। তাহলে কী করে বলি, 'কুকুর গৃহপালিত পশু'। আচ্ছা কুকুরের মধ্যে এতো ভেদাভেদ কবে থেকে চালু হল বলতে পারো?

—না।

—আচ্ছা কুকুরকে আলাদা করে মানুষ পোষে কেন?

—ভালো লাগে বলে।

—কুকুরের চরিত্রের সঙ্গে মানুষের চরিত্রের মিল আছে বলে?

—কী আজে বাজে কথা বলছো?

—আজে বাজে কথা নয় নীলিমা। তুমি ভেবে দেখো বহু কুকুরের সঙ্গে যেমন মানুষের মিল আছে, তেমনি বহু মানুষের সঙ্গে কুকুরেরও মিল আছে।

অনিমেষ কথাগুলো বলে হাল্কা হচ্ছে দেখে নীলিমাও আর বিশেষ কোনো বাধা দেয় না। বরং বেশি কথা বলানোর জন্য আবদার করে বলে, 'কুকুরের সঙ্গে আবার মানুষের কি মিল খুঁজে পেলে?'

—যেমন কিছু কুকুর প্রতিবাদ করে, আবার কিছু কুকুর প্রতিবাদ না করে ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালায়। আক্রান্ত হলেও কিছু কুকুর প্রতিরোধ গড়ে। কুকুরের মধ্যেও শ্রেণীবৈষম্য।

—কুকুরের মধ্যে আবার কী শ্রেণীবৈষম্য খুঁজে পেলে তুমি?

—কেন? একই সঙ্গে জন্মেও শুধু প্রতিপালনের কারণে একটি কুকুর হয় রাস্তার অন্যটি গৃহপালিত।

—আর মানুষের সঙ্গে কুকুরের মিলটা পরে বলবে। আজ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।

খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় এলে ঘুম আসে না অনিমেশের। একদিকে পাঁচ বছরের তানিয়া, অন্যদিকে নীলিমা, পায়ের কাছে রমি।

কুকুর নাকি রাত জেগে পাহারা দেয়? কই রমিকে তো কোনোদিন রাত জেগে পাহারা দিতে দেখলাম না। অথচ রাস্তার কুকুর, যারা সকলের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে, তারাই বরং রাত জাগে, রাত-বেরাতে লোকজন এলে অন্তত ঘেউ ঘেউ করে...।

বামদিকে তানিয়া, ডানদিকে নীলিমা, পায়ের কাছে রমি, সকলেই তাকে স্পর্শ করে। সুখ পায়। আদর চায় তার কাছ থেকে। কিন্তু তানিয়া বা নীলিমা তো রমি হতে পারে না! কিন্তু রমির মতো আচরণ করে। হয়ত রমিও ওদের মতো আচরণ করতে চায়। তানিয়া বা নীলিমা তো তখন রমি থেকে পৃথক অন্য কোনো আচরণ করতে পারে? যাতে কখনও ওদের রমি বলে মনে না হয়। ওরা তো চেষ্টা করলে কুকুর থেকে পৃথক হতে পারে? কারণ ওদের বুদ্ধি আছে। রমিরও বুদ্ধি থাকলে নিশ্চয় ওদের মতো নয়। তবুও আচরণে রমির থেকে ওদের পৃথক মনে হয় না। তবে ওরা কি ক্রমশ রমি হয়ে যাচ্ছে। আর সে অর্থাৎ অনিমেষ চক্রবর্তী একমাত্র প্রভু। পালক। পিতা। মানে মানুষ।

পরবর্তী রচনার ক্লাসে অনিমেষ সম্পূর্ণ তৈরি। মুরুব্বী বা মেধা যার দৌলতেই শিক্ষক হোক না কেন আজ সে ছাত্রদের সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মুখোমুখি হবে। আজ সে কুকুর রচনার জন্য যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছে। আগের দিন যেখানে শেষ করেছিল অর্থাৎ কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, আজ তারপর থেকে লেখানো শুরু করবে। ক্লাসে ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়াল। অনিমেষ স্মিত হেসে সকলকে বলল, 'বসো, আগের দিনের রচনার খাতা বার কর।'

সকলে খাতা নিয়ে তৈরি। অনিমেষও তৈরি। আজ সে প্রথমেই বলল, কুকুর ও মানুষের পার্থক্য। শুরু করল এরকম 'কিছু কিছু কুকুর আছে যারা মানুষের মত আচরণ করে। তখন সে সমস্ত মানুষকে কুকুর মনে হয়। কুকুর যখন মানুষের আচরণ রপ্ত করেছে, মানুষের

উচিত বুদ্ধি বলে নিজেদের আচরণকে আরো উন্নত করা এবং উন্নত করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাতে চেষ্টা করেও কুকুর সেই আচরণে না পৌঁছতে পারে। কিন্তু মানুষ তা করে না। তখনই মানুষ কুকুরে পরিণত হয়। যেমন...' নিজের স্ত্রী, কন্যা ও রমির উদাহরণ টানতে গিয়েও থেমে যায়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সমস্ত ক্লাস শুনছে। ফচকে মাণিক বা নিতাই কেউই প্রশ্ন করতে পারছে না। একমাত্র সুনীল, অনিমেশের উদাহরণ নিয়ে সংশয়-জনিত নীরবতার সুযোগে প্রশ্ন করে, 'আর স্যার কুকুর কখন মানুষ হয়ে যায়?'

সম্বিত ফিরে পেয়ে অনিমেষ আবার শুরু করে, 'কিছু কুকুরের অন্যতম চরিত্র পদলেহন করা। যেনতেন প্রকারেণ প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নিজের খাদ্য ও স্বাচ্ছন্দ সংগ্রহ করা। কুকুরের এই চরিত্র মানুষ সহজের রপ্ত করে। কিন্তু কুকুরের আর একটি প্রতিবাদী চরিত্র আছে, বহু মানুষ যখন ভয়ে পিছিয়ে যায়, কুকুর তখন সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপরে। আর তখন সেইসব কুকুর সহজেই মানুষে রূপান্তরিত হয়।'

টানা এতগুলো কথা বলে থামে। টেবিলে রাখা একগ্লাস জল খায়। সমস্ত মেধাকে নিঃস্ব করে এই কথাগুলো উচ্চারণ করে। স্বভাবতই ক্লান্ত হয়। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে, ছাত্ররা ধরাধরি করে টিচার্সরুমে নিয়ে আসে।

হাল্কা ঘুমে আচ্ছন্ন অনিমেষ স্বপ্ন দেখে।

তার ক্লাসে একে অপরকে প্রশ্ন করছে—হ্যাঁরে তুই কী? মানুষ না কুকুর?

কেউ বলছে, 'মানুষ?'

অন্যে বলছে, 'সাবধানে থাকিস। যেন কুকুর হয়ে যাস না।'

অন্যজন বলছে, 'অনিমেষ স্যার বললেন না, ভয় কি? কুকুর থেকেও তো আবার মানুষ হওয়া যায়।'

কচি মিঞার জলা

জয়ন্ত দে

কানু আমার চোখের সামনে দু-হাত মেলে ধরল, "ইশ্ দেখ পচা মাছের মতো ভেটকে আছে। একটু টানলেই ছাল চামড়া সব হড় হড় করে উঠে যাবে।"

আমি কানুর হাতের দিকে তাকালাম। বুকের ভেতর সির সির করে উঠল। সত্যি তাই। রক্তশূন্য ফ্যাসফ্যাসে সাদা চামড়া কুঁকড়ে আছে। আমি জামার তলায় পেটের কাছে গুঁজে রাখা নিজের হাতদুটো বের করে এক পলকে দেখে নিলাম। আমার হাতদুটোও জলে ভিজে ভিজে ভেজা কাগজের মতো হয়ে গেছে।

ঋষি বলল, "মুরগির গিলা দেখেছিস? আরে শালা স্টমাকটা, ওই মালটার ওপর যে সাদা ছাল থাকে, একটু উসকে দিয়ে সাট্ করে টেনে ছাড়িয়ে দেয়—আমার ঠিক তেমনি লাগছে। মনে হচ্ছে টেনে দিলেই লাল মাংস বেরিয়ে পড়বে।"

"বাঃ ভালো বলেছিস তো, দু-হাতের সঙ্গে স্টমাক মিলিয়েছিস। বেশ অন্য রকম একটা ভাবনা-চিন্তা আছে।" পার্থ কথাটি নিয়ে নাড়ে চাড়ে। অনবরত ঝরে যাওয়া বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে চলে, "গিলা মানে স্টমাক মানে পাকস্থলি......। দু-হাত অন্ন জোটায়, সেই অন্নই আবার পাকস্থলি গ্রহণ করে। হাত আর পাকস্থলি মিলেমিশে....।"

"এই শালা থামবি! তোর হাতও ভিজে ভিজে মুরগির গিলা হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে সব চটকে যাচ্ছে। আর উনি এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান কপচাচ্ছেন।" ঋষি কথার সঙ্গে মৃদু ধাক্কা দিয়ে পার্থকে সোজা করে দেয়।

আমি স্কুলের বেঞ্চে বসে আকাশ দেখি। আকাশ যেন স্কুলঘরের দরজা জানালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ঝিপ ঝিপ করা জলের সুতো ধরে ধরে শূন্য থেকে নীচে নেমে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে। তারপর তুমুল একরাশ বৃষ্টি নিয়ে এ ঘরও ভাসিয়ে দেবে। আমি বললাম "পার্থ আকাশটা দেখ, কত কাছে নেমে এসেছে, মনে হচ্ছে একদম দরজা জানালার মাথায়, এই ঘরে ঢুকে পড়ল বলে—"

দড়াম করে বেঞ্চে ঘুঁসি মারে ঋষি।—"বল, বল, বলে যা। স্কুলঘরের ভেতর ঢুকে আকাশ কী হবে? মাস্টার হবে, না ছাত্র হবে! মাস্টার বনে ছাত্র ঠেঙাবে, না ছাত্র সেজে চুপটি করে বেঞ্চে বসবে! শালা কী হল বলত তোদের? এই তিনদিনের বৃষ্টিতে কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!"

আমি হেসে ফেলি। পার্থও হাসে।

পরশু মাঝ রাত থেকে বৃষ্টি লেগেছে। তুমুল সে বৃষ্টি রাতের অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। সকালবেলা থই-থই জল। কোথাও পায়ের পাতা কোথাও গোড়ালি ডুবে যাওয়া। এক টানা টিপ টিপ বৃষ্টি। ফলে সবারই যেন ছুটি ছুটি আমেজ। রেনি ডে। কিন্তু সে বৃষ্টি কমল না। দুপুরের পর ঘোর করে চারদিক সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়ে আরও জোরে ঝেঁপে

এল। সঙ্গে আরও অন্ধকার, বিদ্যুৎ চলে গেল। মাঝ রাত থেকে ঘুম উবে গেল সকলের। সবাই মোম কেরোসিন কুপি জ্বালিয়ে রাত জাগছে। রাস্তার জল বাড়ছে, বৃষ্টির জল উঠে এল কোথায়—সবাই যে যার মতো মাপছে। ইট গুনে গুনে মাপ রাখছে। ঝাঁটার কাঠিকে জল ছুঁইয়ে বুঝে নিতে চাইছে জলের ঊর্ধ্বগতি। এ পাড়ার দু-চারটে পাম্পে জল-তোলা বাড়ির এই মাঝ রাতেই শিরে সংক্রান্তি। সিঁড়ির তলায় পাম্প ঘরে জল ঢুকছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র চলছে পাম্প মোটরকে ঢেকে দিতে। তার জন্য বস্তা থেকে পলিথিন শিট সব হাজির। কিন্তু কীভাবে বাঁচাবে এই হু হু করে আসা জল থেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া উপায়ই বা কী?

কানু বলল, "কিছুক্ষণ এরম বৃষ্টি হলে সিওর বানভাসি।"

পার্থর নির্লিপ্ত, মুখ, "বান কোথায়? বৃষ্টিভাসি!"

কানু চিড়বিড় করে উঠল, "বানভাসি—এতদিন তাই তো শুনে আসছি রে শালা, উনি এখন নতুন শব্দ পয়দা করছেন।"

পার্থর ব্যাজার মুখ "ছাড়, তোর সঙ্গে কথা বলছি না।"

ঋষি মুখ বেঁকাল, "কার সঙ্গে তবে কথা বলছিস—বৃষ্টির সঙ্গে, না আকাশের সঙ্গে।"

"নিতুর সঙ্গে বলছি।"

আমাকে চুপ করে মেনে নিতে হল। ঋষি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপল। আমি বললাম, "আর কিছুক্ষণ চললে দেখতে হবে না, জল স্কুলঘরেও উঠে এল বলে। একবার মাঠের দিকে যাবি নাকি, দেখে আসি কী অবস্থা।"

ঠিক তখনই স্কুলঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল তিনজন। দুটো ছোট বাচ্চা নিয়ে বিশু মাইতির বউ। তিনজনের মাথায় ঢাউস একটা পলিথিন শিট।

আমার কথায় ঋষি উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের দেখে হেঁচকা টান দিল শরীরে, "তোমাদের ওদিকের কী অবস্থা গো?"

পলিথিন শিট মাঝখান থেকে ভাঁজ করে ছোট করতে করতে বিলু মাইতির বউ বলল, "অবস্থা ভালো নয় গো দাদা। ঘরের ভেতরকার জলেই দাবনা ডুবে যাবে। মালপত্তর সব চৌকির ওপর তুলেছি। কিন্তু তাও কতক্ষণ। ছেলে দুটোকে রেখে যাই, ওর বাপ ওখানে আছে। কিছু কিছু করে মালপত্তর সরিয়ে আনি।"

পার্থ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ যাও যাও। আমরা এখানে আছি।"

ছেলে দুটো বেঞ্চে এককোণে এসে বসেছে। মাথায় পলিথিন চাপিয়ে বিশু মাইতির বউ ছুটল পড়িমড়ি করে। ঋষি ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে তোরা কিছু খেয়েছিস?"

ছেলে দুটো হ্যাঁ না উত্তর দেবার আগেই, খিঁচিয়ে উঠল কানু, "তুই আর ফালতু ল্যাফরা জুড়িস না তো। তার চে চল মাঠের দিকে যাই।"

আমরা জল ভেঙে মাঠের দিকে হাঁটা দিলাম।

এদিকের জমি বড় নিচু। সবই চাষের জমি। এখানেও কিছু কিছু জমিতে চাষ হয়। কিন্তু সারা মাঠ জুড়ে যেদিকে তাকাও দেখবে মাঝে মধ্যেই মাথা ঠেলে ওঠা বাড়ি। কোনওটা দরমা বেড়া টালির চাল, কোনওটা ইটের দেয়াল মাথায় অ্যাসবেস্টস। ছাদ ঢালাইয়ের বাড়ি

নেই। এদিকের শুরুর মুখে, অথবা বলা যায় রামকৃষ্ণ পল্লির শেষ মাথায় হল শিবেন পালের বাড়ি। সেটি দোতলা। বিরাট জায়গা বাগান নিয়ে সে বাড়ি। মাঝে একটা পুকুরও আছে। শিবেন পালের এটা শুধু বাড়ি নয়, বাড়ি এবং ব্যবসা মানে খামার দুটোই। তার পোলট্রি বিজনেস। দোতলা বাড়ির সঙ্গে পাশে পাশে মাথা উঁচু করে ইটের পিলারে তোলা চারতলা। এরকম বাড়ি তিনটে। এ বাড়ির বাসিন্দা অসংখ্য মুরগি। আর এ রকমই একটার নীচের তলায় কাজের লোকেরা থাকে।

তো সেই শিবেন পাল বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে বিস্তীর্ণ জলভাসা অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

শিবেন পালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পার্থ বলল, "শিবেদার বারান্দায় গেলে পুরো মাঠটা দেখা যেত।"

কানু ভ্রু কুঁচকে বলল, "পুরো নেতাদের মতো কথা। বাবু উঁচুতে উঠে জল দেখবেন। তা হেলিকপ্টার হলে তো আরও ভালো হয়!"

কানুর কথায় আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই বারান্দায় শিবেন পালের একটু দূরে আলগোছে ভেসে উঠল পুতুলের মুখ। আমি চুপ করে গেলাম। কেউ কোনও কথা বলছে না। বুঝলাম সবাই দেখেছে। এতক্ষণ বৃষ্টি অসহ্য লাগছিল হঠাৎ কেমন ভালো লেগে গেল।

শিবেন পালের বাড়ির বউ এখন পুতুল। ওর দিকে তাই সোজাসুজি তাকানো যায় না। কিন্তু আমরা সবাই যে যার মতো করে দেখে যাই। ঋষি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করল, "হারামজাদাটা কোথায়? কী করে দিয়েছে দেখছিস মেয়েটাকে!"

আমার কিন্তু ভালোই লাগল। আগের থেকে অনেক অনেক ভালো। ও কি একটু ভারী হয়েছে! হেমেন তো পুতুলকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে। আমাদের থেকে অনেক বেশি ভালোবাসতে পেরেছিল বলেই খুব গোপনে পুতুলকে নিয়ে চলে যেতে পেরেছিল। কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করেনি। আর শিবেন পালের সম্বন্ধে কী বলব এরকম নিরীহ ভালোমানুষ এ তল্লাটে কম।

এক সময় উনি আমাদের ক্লাবের সভাপতি ছিলেন, দীর্ঘদিন। পাড়ায় মেলামেশা করতেন অবাধ। কিন্তু বিয়ের পর হেমেনই তার বাবাকে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছে। আর পুতুলকে রেখেছে পর্দার ওপারে। বছরে এক আধবার পুতুলকে আমরা দেখি। দেখতে দেখতে পুতুল বাতাসে মিলিয়ে যায়। আমরা ফিস ফিস যন্ত্রণায় চুপ মেরে যাই। নয়, এ কথা সে কথা থেকে তুমুল হয়ে যায়।

হেমেন আমাদের বন্ধু ছিল। দিন রাতের বন্ধু। সেই হেমেন এখন এড়িয়ে যায়। অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে। চোখাচুখি হলে চেনা লোকের হাসি হাসে। তবে এ হাসি হেসে ও ঋষিকে এড়াতে পারে না। ঋষি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, "কী রে শালা ডুমুরের ফুল"। হেমেন পালটা চাল দেয়, "সংসার ধর্ম করে ফেঁসে গেছি বস্। তোরাই ভালো আছিস।"

কিন্তু আগেভাগে বিয়ে তো আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আরও দুজন করেছে। তাদের একজন ঝন্টু অভাব অনটনে জেরবার। তবু আমাদের ছেড়ে ঘরে ঢোকেনি। আর শুভর কথা বা

দাও। বিয়ে করেই ঝটপট বাবা হয়ে গেছে। এখন আবার আর একটিকে নিয়ে উড়ছে। আসলে ওরা কেউ পুতুলকে বিয়ে করেনি।

পুতুলের কথা ভাবলে, এখনও মনে হয় জামার সেলাই চাপ দিয়ে ফাটাই। না হলে দাঁতে সুতো টেনে সেলাই খুলে "ছেলাই হবে, ছেলাই" বলে ছেলাই খুড়োর মেশিনের পাশে বসি। আর তখনই ঘরের ভেতর থেকে পর্দা সরিয়ে পুতুল দেখবে, কে এল। কে তার বাবাকে কাজ দিল। পুতুলের তীক্ষ্ণ চোখ। যে কাজ দিল সে পয়সা দেবে তো! নাকি মজুরি দেবার সময় কচি মিঞার জলায় ঘুরে ঘুরে দৌড়বে। টাকা দেখিয়ে ছেলাই খুড়োকে ডাকবে। আর সেই টাকা নেয়ার জন্য তার পেছনে পেছনে ছুটে চলবে পুতুলের বাবা। মুখে তার গোঁ গোঁ স্বর। মাঝে মধ্যে "ছেলাই" "ছেলাই" বলে চিৎকার। সবাই বলে, আধ পাগলা ছেলাই। আসলে ও কিছুটা বোবা কালা, কিছুটা জড় বুদ্ধির মানুষ। পাগল নয়।

এই কথা প্রথম বলেছিল রাজা, "যা ছেলাই খুড়ো পাগল নয়। বোবা কালা মানুষদের একটু গোঁ বেশি থাকে। তবে বুদ্ধি শুদ্ধি কম। জড়বুদ্ধি।"

এই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক। কিন্তু রাজা তার যুক্তিতে অটল। তার এ কথা প্রমাণ করতে রাজা একদিন পুতুলকে ধরে ফেলল, বলল, "তোমার কি মনে হয় পুতুল তোমার বাবা পাগল!" পুতুল বড় বড় চোখ করে বলেছিল, "কিছুতেই না। বাবা পাগল কেন হবে? পাগল তো আপনারা, একটা ভালো মানুষকে পাগল সাজাচ্ছেন।"

সেই দিন থেকে লাঠি হাতে রাজা বসে গেল ছেলাই খুড়োর ঘরের সামনে, "কোন শালা ওর পেছনে লাগে দেখি, মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

আর রাজার সঙ্গে গেলাম আমরাও। কিন্তু আমরা কতক্ষণ, উত্যক্ত করার লোক তো অসংখ্য।

ক্রমশ ছেলাই খুড়োর সঙ্গে, পুতুলের সঙ্গে আমাদের ভাবসাব হয়ে গেল।

।। দুই।।

দু-চারজন করে পুরো স্কুল বাড়িটা ভর্তি হয়ে গেল। সকলের সঙ্গেই একটা ছোটখাট সংসার। হাঁড়ি-খুড়ি না থাকলেও, অনেক জিনিসই আছে। তবু এসব কিছুর থেকে বেশি ঝামেলায় পড়া গেছে গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে। স্কুলের ফাঁকফোকরে ছাগল মুরগির ভিড়, চার-টা খাঁচার পাখিও আছে। গরুগুলো নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিয়েছে। বেরা-বাড়ির পেছনে যে বিশাল পাকুড় গাছ আছে, তার নীচের দিকটা বেশ উঁচু; অনেকটা ঢিবির মতো। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে গরুগুলো। গা ঘেঁষাঘেষি করে থুম মেরে আছে। নেড়ি কুকুরগুলোও মাজ শান্ত। পাড়ার বেপাড়ার সবগুলো স্কুলের পুরোনো টালির চালার নীচে জটলা করছে। সব কটারই গা ভিজে। ভয়ার্ত চোখ, লেজ নেতিয়ে পিছনে।

বিনিমাসি মাঝে মাঝেই স্কুলঘরের বাইরে মাথায় পলিথিন শিট চাপিয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। এবার স্কুলের ভেতর ঢুকতেই কানু খপ করে তার হাত চেপে ধরে, "কীসের জন্য এত যানচান করছ বলো তো? খালি ছুটে ছুটে যাচ্ছো।"

বিনিমাসির এক পা কাদা। স্কুল বাড়ির বাইরের দেয়ালে পা ঘষে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, "হাঁসগুলানকে একবার চোখের দেখা দেখা দেখতে পেলাম না। সবগুলান উধাও।"

সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কানু, "খবরদার, আর তোমাকে বাইরে যেতে দেখি, কোন বাপ তোমাকে ঢুকতে দেয়, তখন থেকে ঘরগুলো কাদা মাখামাখি করছে।"

বৃষ্টি হঠাৎ একদম বন্ধ হয়ে গেল।

পার্থ বলল, "বৃষ্টি যদি আর না হয় তবে কাল সকালের মধ্যে এদিকের জল সরে যাবে।" ঋষির মুখে আঁকাবাঁকা দাগ, বলল, "এদিকের বলতে কোন দিকের?" পার্থর কিছুটা অবাক হওয়া মুখ, বলল, "এদিকের। আমাদের এই সাইডটা।" এবার দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ঋষির, ওর দু-হাতেও সামান্য ঝাঁকুনি লাগল, বলল, "এদিকের জল সরা নিয়ে এত চিন্তা—তুই যেন মনে হচ্ছে ভেসে যাচ্ছিস।"

আমি পার্থর পিঠে হাত রাখলাম, পার্থ বলল, "বুঝে দেখ, কী কথার কী মানে!"

কানু বিড় বিড় করল, "শালা খাওয়া নেই দাওয়া নেই, এ মানুষগুলো এখানে গরু ছাগলের মতো ঘর বাড়ি ফেলে পড়ে আছে, আর উনি এখন নিজেরটা নিয়ে ভাবছেন।"

পার্থর বিব্রত মুখ, "তোরা এত ঘুরিয়ে মানে করিস কথা বলাই যায় না। তবে এত যদি দরদ খাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

কানুর চড়া গলা, "আমরা ভোটবাজি করি না। যা সেই দাদাদের গিয়ে বল।"

ঋষির কিছুটা ম্রিয়মান গলা, "তা কিছু চাঁদা তুলে চিঁড়ে মুড়ির ব্যবস্থা করা যেতে পারত।"

"তাহলে কে স্কুল দেখবে, মাঠ দেখবে, আর কে লোকের বাড়ি বাড়ি ধুয়ো দেবে তুই ঠিক কর। শালা এলাকার পাবলিককে তো চিনি, এক দু-টাকা চাইলে কত প্রশ্ন করবে, জ্ঞান ঝাড়বে। আর পাঁচ দশ চাইলে নিজেরাই বানভাসি বলে এখানে এসে উঠবে।"

কানুর কথায় আমরা হেসে ফেললাম কিন্তু তার আগেই আরও নানা গলার হাসি ঘরের বাইরে খেলে গেল। আর সে হাসি পিঠে নিয়ে ঘরে ঢুকল হারানবুড়ো। কানু বলল, "কী ব্যাপার তুমি এখানে? তোমার বাড়ি তো অনেক উঁচু, ভাসেনি, তবে?" হারানবুড়ো পেটে হাত ঘষে বলল, "ভাসেনি। তবে ভাসতে কতক্ষণ। তা বাবারা তোরা নাকি খিচুরির ব্যবস্থা করেছিস।" এবার বাইরের হাসিটা হো হো করে উঠল। কানু চিৎকার করে উঠল, "চোপ শালা, বেরও এখান থেকে।"

বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে জমি দিয়ে জল ছুটছে মাঠের দিকে। ছেঁড়া মশারির জাল নিয়ে ছেলে বুড়ো কালভার্টের মুখে, মাঠের দিকে ছুটছে। বৃষ্টি থামতেই যেন উৎসব। ঋষি আমাকে বলল, "আমাদের মতো এলাকায় ক্লাবঘরে যেমন স্ট্রেচার রাখা হয় তেমন বুঝলি ছোট নৌকাও খুব জরুরি। ফি বছরই তো মাঠ ভাসছে।"

আমি ঋষির মুখের দিকে তাকাই, ও কি মজা করছে? কিন্তু ওর মুখ যে বিষণ্ণ!

আমরা আবার জল ঠেলে মাঠের দিকে এগিয়ে চলেছি। বাঁক ঘুরেই দেখলাম ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে হেমেন খুব দ্রুত জল ভেঙে এগিয়ে আসছে। আমি ঋষির মুখের দিকে তাকালাম। ঋষি বলল, "চুপ কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবি না। শালা তোর বাড়ির সামনে দিয়ে যারা দু-বেলা হাঁটে আজ তাদের ঘর বাড়ি ভাসছে, আর তুই সুন্দরী বৌ নিয়ে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছিস। এখন বৃষ্টি থেমেছে মজা মারতে বেরিয়েছে।"

পার্থ বলল, "মেন গেটে তালা দিয়ে রেখেছে।"

কানু বলল, "কেন তুই গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জল দেখতিস!"

পার্থ জলের ভেতর জোরে জোরে লাথি কষানোর চেষ্টা করল, "এই হল তোদের দোষ, যদি না বেরিয়ে রাজার সঙ্গে বোতল খুলে বৃষ্টি উপভোগ করতাম তাহলে গালমন্দ করতিস। এখন বেরিয়েও দেখছি আমার হাজারটা দোষ।"

ঋষির গম্ভীর মুখ, "আমাদের কোনও উপকার করছিস না, বল নিজের তাগিদেই বেরিয়েছিস।"

"সত্যি রে, এইসব লোকজন নিয়েই তো আমরা। এদের সঙ্গে নিত্য দেখাসাক্ষাৎ। তখন ...ত হাসি মজা সুখ দুঃখ আর দেখ এখন কেমন অপরাধীর মতো কুঁচকে আছে।" আমি বললাম।

কানু ফোড়ন কাটল, "সমস্যা বললি না, দিনরাত্রি ক্যাচাল শালাদের।"

আমরা জল ঠেলতে ঠেলতে আবার হেমেনদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে দিয়ে মাঠের দিকে কোমর সমান তারপর পেট বুক সমান জলে নেমে গেল হরিদা, রাজুদা।

ঋষি দেখামাত্র চিৎকার করে, "এই হরিদা কোথায় চললে?"

হরিদা থমকে গিয়ে বিব্রত মুখে, "দেখি বৃষ্টি এখন থেমেছে কটা জিনিসপত্তর নিয়ে আসি। আবার যদি নামে।"

শিবেন পালের বাড়ির সামনে আমরা একটা রিকশ-ভ্যান রেখেছি, পলিথিন শিটে তার মাথায় একটা ঢাকাও দিয়েছি। মাঠের জল ভেঙে সবাই ওখানে মালপত্র এনে রাখছে, তারপর ভরতি হলে জল ঠেলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্কুলঘরের দিকে।

কানু একবার বলেছিল, "শিবেনদাকে গিয়ে বলি, মুরগির সব ঘর তো ভরতি নয়, কটা তলায় যদি এই মালপত্রগুলো রাখতে দিত—"

ঋষি বলেছিল, "উনি তো একটা সময় ক্লাব প্রেসিডেন্ট ছিলেন। স্বেচ্ছায় নিজের বাড়ি ...লি করে লোক থাকতে দিয়েছে—সে বিবেক কোথায় গেল এখন? সব হেমেন খেয়ে ফেলেছে।"

ঋষি বলল, "হরিদা চলো তোমার সঙ্গে যাই—যা হোক দু-একটা জিনিস তো টেনে আনতে পারব।" বলেই ঋষি ঝপ করে জলে নেমে গেল। ওর পেছন পেছন কানুও। ঘাড় ফিরিয়ে ঋষি বলল, "তোদের আসতে হবে না, তোরা এদিকটা দেখ।"

ভ্যান-রিকশার শম্ভু বলল, "দাদা তোমরা স্কুলঘরে চলে যাও। আর কেউ কিছু দিলে আমি স্কুলঘরে রেখে আসছি।"

আমি ছাতার দড়িটা গেটে ঝুলিয়ে শিবেন পালের বাড়ির ভেতরটা তাকালাম। পার্থ ...কে বলল, "না না ওরা ফিরলে এক সঙ্গে যাব।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "...খানে দাঁড়িয়ে আছি, ভালো আছি। স্কুল ঘরে যা ক্যাচাকেচি। মাথা খারাপ হবার জোগাড়।"

ঠিক এ সময় গেটের এক কোণে একটু আড়াল থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি অন্যমনস্ক ভাবে এদিক ওদিক তাকালাম। তখন আবার কাগজফুলের লতাঝোপের আড়াল থেকে পুতুল ডাকল। আমি পার্থ একসঙ্গে তাকালাম ওদিকে। করুণ মুখে গেটের সামনে ছুটে এল পুতুল, "আমার বাবার কোনও খবর জানো?"

হু হু করে যেন মাঠের জল আমাদের পেট বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠল। সত্যিই তো! কচি মিএগার জলায় ছেলাই একা।

পার্থ বিড় বিড় করল, "আমরা ওদিকটা যাইনি একদম। ওদিকটা আসলে একা তোমার বাবা! এদিকটা দেখতে দেখতে—"

"তোমরা যাবে একবার?" পুতুলের কাতর গলা ডুবিয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়ল। পার্থ রুমাল জড়ানো ঘড়ি দেখল, "চল্লিশ মিনিট ইন্টারভেল দিয়েছে—নে আবার শুরু হল।"

পুতুল ভীষণ করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকায়। আমি কথা বলার চেষ্টা করি কিন্তু গলা যেন ধরে গেছে। খুব কষ্টে ধরা গলায় বলি, "ঋষি আসুক আমরা সবাই যাব।"

পুতুলের কান্না ভেজা স্বর, "ওকে পাঠিয়েছিলাম। ও বলল, ভয়ঙ্কর অবস্থা নাকি, ঘরটা একদিকে হেলে গেছে, খুব জল।"

"হেমেন গেছে?" পার্থর বিস্ফারিত গলা।

"ওকে দেখে বাবা ঘরের খুঁটি ধরে চিৎকার করে মাথা ঠুকেছে। বৃষ্টির জলে মুখ ডুবিয়ে এমন করেছে, ও ভয় পেয়ে গেছে। পালিয়ে এসেছে। ও-ই বলল তোমরা না গেলে বাবাকে বাঁচানো যাবে না।"

আমি আবার বললাম, "মনে থাকলে আমরা ঠিকই যেতাম, ঋষি আসুক, কানু আসুক।"

"নিতুদা তোমরা বাবাকে বাঁচাও।" পুতুল বাড়ির ভিতর চলে গেল।

একটু পরেই ওরা ফিরল। ভিজে চান করে গেছে। কোমর-টোমর পর্যন্ত তো সকাল থেকেই ভিজে গিয়েছিল। এখন সরাসরি জল থেকে উঠে এল। এসেই যেন বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। বলল, "কীরে কী হয়েছে মনে হচ্ছে কোনও খবর আছে?"

পার্থ পুতুলের কথা বলল, তারপর ছেলাইয়ের কথা।

খিঁচিয়ে উঠল কানু, "হেমেন হেমেন কী করছে? সে-ই যাক উদ্ধার করে আনুক তার শ্বশুরকে। এর বেলা আমাদের কেন?"

"ইস আমাদের কারোর ছেলাইয়ের কথা মনে ছিল না।" ঋষির ব্যথা পাওয়া গলা। "ছিঃ ছিঃ আমরা ছেলাইয়ের কথা ভুলে গেসলাম!"

।। তিন ।।

আমরা বিধুসুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সামনে এগিয়ে ডানদিকের রাস্তায় পড়েছিলাম এই রাস্তা ধরে আর একটু গেলেই সামনে বিস্তৃত নিচু জমি। জলা জমি বলা যায়। এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত এখানে চাষ হত। এখনও যে একদম হয় না তা নয়। তবে তা খুব সামান্য। কেননা প্রথমত চাষের লোকের অভাব। তারপর হু হু করে বাড়ি ঘর লোকাল ছেড়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। আগুন দাম হয়ে যাচ্ছে জমি জায়গা।

আর ছেলাইয়ের বাড়ি এই রকমই নিচু জলা জমিতে, কিন্তু তা অন্যদিকে। সেটা বিধুসুন্দরী পর্যন্ত না গিয়ে কটা বাড়ির উঠোন টপকে কচি মিএগার জলায় পড়তে হবে, এই কচি মিএগার জলার পরে ডাক্তার বাগান তারপর দক্ষিণপাড়া।

এই বিরাট এলাকার ছোট একটুকরো জমি ছেলাইয়ের। তার বাবা একদা ডাক্তার বাগানের মালি ছিল। ছেলাই অনেক দিন গোঁ গোঁ করে আধভাঙা স্বরে বলেছে, বুঝিয়েছে, সে গা

লাগাতে পারে, ফুল ফল ভরিয়ে দিতে পারে। তার মালি হবার খুব ইচ্ছে ছিল। বাবার কাছ থেকে সে সব শিখেছিল। কিন্তু সব বৃথা গেল। কারণ ডাক্তার বাগানের দিকে ডাক্তারবাবুর ছেলেরা আর তাকাল না। বাগানে আগাছা ভরে গেল। ভালো ভালো গাছ বিক্রি হল। চুরি হল। পুকুরের মাছ বিষ মেরে জাল পড়ল, তারপর শেওলা ভরে গেল। বারো ভূত লুটেপুটে নিল। আর তাই এসব দেখে ছেলাই বাপের রাস্তায় না গিয়ে সেলাই শিখে মেশিন নিয়ে বসে গেল।

ছেলাইয়ের সেলাইয়ের কথা তুললে সবাই হাসত। বলত, "সেলাই জানে না ও ফুটো সারাতে জানে।"

আমরা সেই ফুটো তৈরি করতাম। সেটা ছেলাইয়ের জন্য না, পুতুলের জন্য।

ছেলাই কিন্তু খুব সতর্ক, সেলাই করতে করতে দেখে নিত পুতুল কোথায় কী করছে। এক মুহূর্তের জন্য পুতুলকে ছাড়ত না, কিন্তু রাজাও ছাড়ার পাত্র নয়। আমরাও যে যার মতো করে পুতুলের কাছে চলে যাবার চেষ্টা করতাম। পুতুলকে মনের অনেক কথা বুঝিয়ে দিতাম, নিজস্ব কায়দায়। আর পুতুল শুধু হাসত।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ছিল রাজা। ও ছেলাইয়ের কাছেও দ্রুত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকী পুতুলের কাছেও। ও আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে পুতুলের কাছ থেকে জল চেয়ে, হাত থেকে গেলাস নিত। কত দিন দেখিয়েছিল, কীভাবে ও পুতুলের আঙুল স্পর্শ করে। আর আমরা তখনও ছেলাইয়ের মেশিনের পাশে রাখা ঘটি থেকে জল খাই।

তখন আমরা সবাই মনে মনে ভাবতাম, আর কানু একদিন, রাজার মুখের ওপর সোজা বলল, "আরে এখানেও পয়সার গন্ধ! তোর বাপের মতো আমার বাপের যদি পয়সা থাকত তবে আমি জলের গেলাস কেন এতদিনে বিয়ে করে নিতাম।"

ঋষি বলে, "পয়সা দিয়ে সব কিছু হয় না, তাহলে হেমেনদের তো কম পয়সা নেই— হেমেন কেন সবার আড়ালে গুটিয়ে থাকে?"

কানুর কথা শুনে কিন্তু রাজা রাগল না, বলল, "এইখানেই তো কানু হালদারের সঙ্গে রাজার তফাত। তুই শালা বিয়ে করার চিন্তা করছিস, আর আমি শোওয়ার ধান্দা করছি।"

রাজার কথা শুনে রেগে গিয়েছিলাম আমি, "কী বলছিস তুই রাজা, পুতুলের সম্পর্কে এত নোংরা কথা—"

রাজা হাসে, "যা বাব্বা, নোংরা কথা কী বললাম, শোওয়াটা কি নোংরা কথা, তাহলে কানু ভাইবোন না পাতিয়ে বিয়ে করতে চাইছে কেন, সে ও তো শোওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য তো এক বস্।"

গম্ভীর মুখে ঋষি বলল, "বিয়ে আর তোর কথা এক হল?"

রাজা মুখ বাঁকায়, "ওকে বিয়ে করলে তো আমি আর বড়লোক থাকব না, বাপ মা খেদিয়ে দেবে। তাহলে আমি কী করব?"

রাজার এইসব কথা আমি পুকুরঘাটে চুপি চুপি পুতুলকে বলেছিলাম। আমার কথা শুনে পুতুল অদ্ভুত হেসেছিল, বলেছিল, "আপনারা যে কেন শুধু শুধু আমাকে নিয়ে এত ভাবেন!"

আমি তখন মরিয়া, পুতুলকে বলেছিলাম, "তুমি জানো না, কত মেয়েকে এই ডাক্তার

বাগানে নিয়ে এসে রাজা সর্বনাশ করেছে।"

কিন্তু দু-দিন না যেতে যেতেই, রাজা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভেরি গুড সাজেশান—ডাক্তার বাগান ছেড়ে দিলাম। ভাবছি ওটা শুধু পুতুলের জন্যই রাখব।" আমি বুঝলাম, সব কথা পুতুল বলে দিয়েছে।

একটু থেমে রাজা বলল, "আচ্ছা, তুইও কি কানুর মতো পুতুলকে বিয়ে করতে পারবি? সত্যি কথা বল। তবে আমি ওদিকে যাব না, ওয়াক ওভার দেব।"

আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না।

রাজা বলল, "এই গোঙা ছেলাইয়ের মেয়েকে তোর বাপ মা পারবে ছেলের বৌ হিসাবে মেনে নিতে?"

রাজা আমাকে চুপসে দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ছেলাইয়ের বাড়ির দিকে কচি মিএগার জলায় আর যাব না। দু-তিনদিন একা ভ্যাকা হয়ে গেলাম। সবাই কখন যেন ওদিকেই চলে গেছে। ফলে এক সময় আমিও চলে এলাম। দেখলাম ওখানে একটা উৎসব চলছে। দেখলাম ছেলাই একটা নতুন জামার কাপড় কাটছে। আমি আঁতকে উঠলাম। কে ছেলাইকে জামা বানাতে দিল, এ জামা তো গায়েই তুলতে পারবে না।

আমার সোজাসুজি এসে দাঁড়াল রাজা, "আমি বানাতে দিয়েছি। কমদামি কাপড় নয় কিন্তু। বিমলের দুশো কুড়ি টাকা দাম।"

আমি কোনও কথা বললাম না, বুঝে গিয়েছিলাম, এটা রাজার সেরেফ জামা নয়, ছল

আর সে কথাটা রাজাই আমাকে একটু পরে ডেকে নিয়ে বলল, "কিস্তি প্রায় মাৎ বুঝলি—ভগবান ওর বৌকে নিয়েছে, মা-মরা মেয়েকে খুব চোখে চোখে রাখে, এ ছাড় উপায় ছিল না—এখন খুব ব্যস্ত. জামায় না হলে প্যান্ট বানাতে দেব, পুতুলকে আমা চাই।"

আমি একা একা মাঠ পেরিয়ে চলে এলাম।

ক-দিন পর হেমেন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল, "তোর কী ব্যাপার রে ক'দি ধরেই তোকে দেখছি না। যখনই আসি দেখি তুই বাড়ি নেই।"

আমি বললাম, "আর বসে থাকলে চলে, কাজকর্মের ধান্দা করছি। তোদের তো ও চিন্তা নেই, অত বড় মুরগির বিজনেস!"

হেমেন বলল, "দুর বাবা ধান্দা বিজনেসের কথা কে শুনতে এসেছে, বরং তুই একা মজার কথা শোন, রাজা ছেলাইকে প্যান্ট বানাতে দিয়েছে।"

আমার গলায় আটকে যাওয়া স্বর, "জামাটা ঠিক হয়েছে?"

হাওয়ায় হাত ছুঁড়ল হেমেন, "সে জামা পুতুলের কাছে জমা রেখেছে, বলেছে, প্যা হোক দুটো একসঙ্গে পরব।"

আমি তখন ভেতরে ভেতরে কাঁপছি। হেমেন বলল, "রাজার দরদ আছে বুঝলি, জামা মেকিং চার্জ কুড়ি টাকা দিয়ে দিয়েছে। প্যান্টের ষাট টাকাও কমপ্লিট।"

আমি হেমেনকে বিড় বিড় করে বললাম, "ঋষিকে বলবি রাতের দিকে আমার সা একটু দেখা করতে—খুব জরুরি কথা আছে।'

রাতে ঋষি এল না। এল পরদিন, সকাল নটা সাড়ে নটা নাগাদ। আমাকে বাইরে থেকে খুব জোরে জোরে ডাকল। আমি বললাম, "ভেতরে আয়।" ও বলল, "না না, বাড়িতে যাব না, তুই আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

বাড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, ঋষি রাগে ফুঁসছে। বলল, "তুই একবার কচি মিএগার জলায় যা, গিয়ে কাণ্ড দেখ।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

ঋষি বলল, "কাল দুপুরে প্যান্ট বানানোর জন্য ছেলাই হুক চেন বকরম কিনতে গিয়েছিল। আর তখন ওই হারামির বাচ্চা রাজা গিয়ে পুতুলকে ঘরের ভেতর টানাটানি করেছে। যা হোক পুতুলকে রাজি করাতে পারেনি, তেমন কিছু ক্ষতিও করতে পারেনি। যাই হোক সেই দুপুরেই আমি জানতে পেরে রাজাকে লাথি মেরেছি। অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করেছি পুতুলকে। যাতে ও বাবাকে না বলে, আর পাঁচ কান না করে। পুতুল আমাকে কথা দিয়েছে সে কাউকে বলবে না।"

আমি বলি, "তাহলে মিটে গেছে তো সব। এখন আবার কী হল?" ঋষির চোয়াল শক্ত হয়, "রাজা এখন বদলা নিতে গেছে। ছেলাইয়ের কাছে সেই জামা ঠিক হয়নি বলে হুজ্জতি করছে। আমি কানুকে বলে পাঠিয়েছি, এখুনি যদি ও হুজুতি না বন্ধ করে আমি গিয়ে ওকে শেষ করে দেব—। ওদের পয়সা আছে বলে, মানুষকে মানুষ ভাববে না। ও আজ আমার হাতেই মার্ডার হবে।"

আমি ঋষিকে থামাই, "তুই একদম ওদিকে যাবি না, আমি রাজাকে দেখছি—।"

আমি দৌড়ে যাই কচি মিএগার জলায়। গিয়ে দেখি রাজা অনেকটা দূরে মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে। রাজাকে ঘিরে কতগুলো দক্ষিণপাড়ার ছেলে। কানু হেমেন দীপু পুতুলদের বাড়ির উঠোনে।

কানু আমাকে বলল, "ঋষির নাম শুনেই শালা গোলমাল বন্ধ করে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ও অন্য কিছুর মতলব করছে।"

আমি বললাম, "দাঁড়া দেখছি।"

আমি যেতেই রাজা বলল, "বস্ ঋষি তাহলে আমাদের পাড়ার দাদা এখন। ঠিক আছে ওকে রেসপেক্ট করে আমি সব টাকা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এই জামা নিয়ে আমি এখন কী করব বল? তাই, আমি এই কাকাতাড়ুয়া বানিয়ে তাকে জামাটা পরিয়ে মাঠে বসিয়ে রাখব। এতে নিশ্চয় তোদের ঋষিদাদার আপত্তি নেই। যদি আপত্তি থাকে তবে কিন্তু আমি দক্ষিণ-পাড়ার নেলোদাকে পুরো কেসটা রেফার করে দেব। তখন পাড়ায় পাড়ায় অ্যাকশন—।"

আমি কানুকে এসে বোঝাই ও যা পারে করুক। ছেলাইকে কিছু করছে না, বাড়ির দিকেও আসছে না। না হলে এবার নেলো ঢুকবে। নেলোটা বহুত নোংরা।

আমার কথা শুনল কানু। তার কিছুক্ষণের মধ্যে মহা উল্লাসে জলার মাঠের মাঝে পোঁতা হল কাকতাড়ুয়াটাকে। তার গায়ে রোদে চকচক করছে রাজার নতুন জামাটা।

আমি ছেলাইয়ের কাঁধে হাত রাখলাম, মানুষটার গাল বুক ভেসে গেল চোখের জলে। পুতুলের চোখে জল নেই। সে স্থির চোখে তাকিয়েছিল কাকাতাড়ুয়াটার দিকে।

তার পরের দিন পুতুল আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমি ওকে দেখে চমকে উঠেছি।

পুতুলকে বললাম, "ঘরে এসো।" ঘরে এসে পুতুল বসল, বলল, "এই ঘরটা আপনার।" পুতুল বলল, "আমাকে বিয়ে করবেন?" আমি তখন কাঁপছি। পুতুল বলল, "না, আপনি কোনও কাজ করেন কি করেন না তা জানা আমার দরকার নেই। আপনি কোনও রোজগার করেন না, সে কিছু না কিছু হয়ে যাবে। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। কোনও অবস্থাতেই আমার কোনও অসুবিধা নেই। বলুন বিয়ে করবেন?" পুতুল বলল, "আমি অপেক্ষা করতে পারব না। বিয়ে করলে আজ কিংবা কাল। প্রয়োজনে বিয়ে করে আমাকে বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে আসতে পারেন। আপনার কাছে আজ কেন এলাম জানেন, রাজাদা একদিন বলেছিল, আপনি আমাকে ভালোবাসেন। তাই আমি দেখে গেলাম।"

পুতুল চলে গেল।

মা বলল, "কে রে মেয়েটা?"

আমি নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে বললাম, "ওই, কচি মিঞার জলায় একটা বাড়ি দেখছ?"

সঙ্গে সঙ্গে মা ধরে নিল, "ওই যে ওই গোঙা লোকটা, কী যেন নাম তোরা পয়সা-টয়সা দিস। কিন্তু মেয়েটা বেশ ভদ্রগোছের দেখতে।"

আমার হ্যাঁ-না সমস্ত কথাই ফুরিয়ে যায়। সারাদিন পাড়া ছেড়ে এতোল-বেতোল ঘুরে বেড়াই। পুড়ে বেড়াই। রাতে বাড়ি ফিরে কানুর বাড়িতে ঢুঁ মারি, "না, পুতুল কেন আসবে?" আমি বললাম, "পুতুল মনে হয় রাজাকে ভয় করছে। ঋষি বলল, "রাজা কিছু বলে দেখুক না ঘাড় ভেঙে দেব।" আমি কানুকে বললাম, "পুতুলকে বিয়ে করবি কানু?" কানু হো হো হাসল, "আমাদের তো দেখেছিস অকাল বস্তি রাবণের গুষ্টি। তাছাড়া ওকে আমি খাওয়াব কী? তোর বাবা দাদাকে বল না একটা বেয়ারা পিওনের কাজ দিতে—আমি বিয়ে করে আলাদা থাকব।"

তারপরের পরের দিন খবর পেলাম ছেলাই নাকি পাগল হয়ে গেছে। আমরা কচি মিঞার জলার ধারে এসে দেখলাম, রাজার সেই জামাটা কাকতাড়ুয়ার গা থেকে খুলে ছেলাই পরে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার হাত দুটো কাঁধের সঙ্গে সমান্তরাল। মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, অদ্ভুত তার আওয়াজ। অনেকটা যেন কান্না মেশানো। ঋষি কানু এগিয়ে যেতে গেল, আমি আটকালাম, বললাম, "যাচ্ছিস কিন্তু দুম করে যদি অ্যাটাক করে!"

ঋষি আমার মুখের দিকে তাকাল না, বলল, "তাই বলে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষটাকে মরে যেতে দেব।"

আমি বললাম, "পুতুল কী করছে—ওকে ডাক।"

কানু বলল, "ও যদি পারত ও ঠিক আসত।'

ঋষি কানু এগিয়ে গেল, আমাকেও যেতে হল। সামনে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে ঋষি ডাকল, "ছেলাইবুড়ো।" মুহূর্তে ছেলাই ভেঙেচুরে ঋষির পায়ের ওপর। ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে সে কী ভয়ঙ্কর কান্না। এর মাঝেই কানু আবিষ্কার করে ফেলল, পুতুলকে নাকি নিয়ে গেছে। আমরা ঘরে এসে দেখলাম ঘর ফাঁকা, পুতুল নেই। সারা দিন পুতুল এল না। দিন গড়িয়ে গেল রাত হল। বারবার কাঁদতে কাঁদতে মাথা ঠুকল ছেলাই, বারবার আমাদের

বুঝিয়ে দিল, বৌ নিয়েছে ভগবান আর মেয়েকে নিলাম আমরা।

ঋষি বলল, "রাতে আমি এখানেই থাকছি। তোরা বাড়ি চলে যা।" কানুও থেকে গেল। আমি চলে এলাম। খবর পেলাম রাজা বাড়িতে। তবে? সকালবেলা মা ডেকে বলল, "তোর বন্ধু হেমেন বিয়ে করেছে। শিবেনবাবু এসে তোর বাবা তোকে কাল বৌভাতের নেমন্তন্ন করে গেল।"

আমি বিস্ময়ের ঘোর কেটে বললাম, "হেমেন বিয়ে করেছে—।"

মা বলল, "কিছু জানিস না যেন, ন্যাকা সাজছিস, মেয়েটা তো মঙ্গলবার তোর কাছে এসেছিল। ওই কচি মিঞার জলায় যার বাড়ি, সেই পুলিন দাসের মেয়েকে।"

বাইরে বাঁশ কাপড় নিয়ে অনবরত ডেকরেটরের ভ্যান-গাড়ি চলেছে। একটু বেলায় হেমেনের বাবাকে দেখলাম ক্যাটারার ধীমানদার সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে চলেছে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, "এই যে তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো? তোমাদের কারোর টিকি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না, অথচ এত লোকের আয়োজন আমি পারি?"

আমি বোকার মতো ওঁর মুখে তাকিয়ে থাকি।

উনি হঠাৎ আমার কাঁধটা চেপে ধরেন, তারপর ধীমনদার থেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, "পুতুলের বাবাকে তো আসতে হবে—তোমরা একটা ব্যবস্থা করো। আমি দু-দুবার গেছি, কিন্তু উনি কী বলব এমনভাবে কাঁদছেন, আমার নিজেকে বড় অপরাধী লাগছে। কিন্তু আমি তো ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি রাখছি না। আমি তাও ওঁনাকে বললাম, পুতুল আমার মেয়ে, আমি তাকে মায়ের আদরেই রাখব।"

আমি ঋষির কাছে গেলাম। ঋষি বলল, "হেমেনের বাড়িতে আনন্দ করার চেয়ে ছেলাইয়ের কাছে থাকা বেশি জরুরি। না হলে মানুষটা কিছু করে বসতে পারে।"

ছেলাইয়ের মাদুরে লম্বা হয়ে শুয়ে বাদাম চিবতে চিবতে কানু বলল, "ছেলাইটা বোকা, মেয়ে তো ভালো ঘাটেই নৌকা ভিড়িয়েছে। রাজার পর ভালো ঘাট তো হেমেনই। কে আর আঘাটায় নৌকা ভিড়িয়ে ক্যাচাল চায়? শালা নিতু আমাকে বিয়ে করতে বলছিল। আমার বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়!"

।। চার।।

কচি মিঞার জলার সামনে এসে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! জল জল আর জল। চারদিক থই থই করছে জল। আসলে এই জলা জমিটায় গাছ শূন্য; একটা ছাড়া বাড়ি ঘরও নেই। ফলে জল এমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ছেলাইয়ে ঘরটা এখান থেকে দেখে আমরা সকলেই প্রায় আঁতকে উঠলাম, ঘরটা বিপজ্জনকভাবে জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আমার মনে হল, জল ভেঙে আমরা যেতে যেতেই বুঝি ঘরটা জলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

ঋষি চিৎকার করে জলে নেমে পড়ল। ঘরে নিশ্চয় ছেলাই আছে—ঘর ছেড়ে এলে ওকে এখানেই দেখতে পেতাম।

পার্থ নিজের কপালে দু-আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "বুঝলি আমার মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। তোরা যা। আমি যাব না।"

—"শালা সুখের পায়রা।" কানু এক খাবলা থুতু ছুঁড়ল জলে। আমরাও হুড়মুড় করে জলে নেমে যে যার মতো করে এগিয়ে যাই। মাঠের জল আপাতভাবে স্থির মনে হলেও একটু এগিয়ে

যাবার পর বুঝলাম ভেতরে অসম্ভব টান। সব জল ঢালিপাড়া খালের দিকে চলেছে।

জল তখন পেট ছাপিয়ে বুক ছুঁয়ে ফেলতে চাইছে। কানু বলল, "কটা কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে নিলে এতক্ষণে চলে যেতাম।"

ঋষি বলল, "আমি এবার ক্লাব-মিটিংয়ে নৌকার কথা বলব। আজকাল কত রকম নৌকা বেরিয়েছে। প্ল্যাস্টিক, ফাইবার। আমাদের মতো জায়গায় খুব দরকারি।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "সাধে কি আমার ভবানীপুরের বন্ধুরা বলে তোদের ছাব্বিশ পরগনা, এটাও যে কলকাতা, তার ওপর ক্যালকাটা কর্পোরেশন ভাবলে হাসি পায়।"

আমাদের থেকে ঋষি বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। কানু খপ করে একটা জলঢোড়া সাপের লেজ ধরে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। ছুঁড়ল বটে কিন্তু সেটা বেশি দূর এল না, সামনের জলে পড়ে কিলবিল করে চলে গেল। পর পর আমরা এসে দাঁড়ালাম ছেলাইয়ের ঘরের সামনে। এটা উঠোন, এখানে একটা তুলসিমঞ্চ আছে, ওদিকে একটা পাতা উনুন—এখন সব জলের তলায়।

একটা ঘর বারান্দা নিয়ে বাড়িটা হেলে। বারান্দায় ঢোকার মুখে বেড়ায় দরজাটা আধ ভেজানো। ঋষি বেড়ার দরজা দু-হাতে ঠেলল, দরজা ওইভাবে আটকে। ঋষি এবার খুব জোরে ধাক্কা দিল। তাতে বেড়ার দরজাটা বেশ অনেকখানি সরে গেল। দরজাটা আলগা হয়ে গেছে। ঋষি এবার পুরো দরজাটা একদিকে সরিয়ে দিল।

আড়াল সরে গেলে দেখলাম, বারান্দায় ছোট একফালি তক্তাপোশ, তার সামনে সেলাই মেশিন কিছু নেই, সব জলে ডুবে। তবে সামনে এগিয়ে টের পেলাম জলে ডোবা তক্তাপোশের। আমরা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। ঢুকে আমাদের থমকে যেতে হল। ঘরের ভেতর তক্তাপোশে উবু হয়ে ছেলাই বসে। তার কোলের ওপর মেশিনটা। পাশে মেশিনের নীচের দিকটা। ছেলাইয়ের দু-চোখ বন্ধ। তক্তাপোশের ওপর পা-পাতা ডোবা জল। ডেকে উঠল কানু, "ছেলাইখুড়ো। ছেলাইখুড়ো।"

কোনও সাড়া দিল না মানুষটা। ঋষি এগিয়ে গিয়ে ছেলাইয়ের গায়ে হাত রাখল, আর তক্ষুনি ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ছেলাই। চিৎকার করে মেশিনটা আঁকড়ে ধরল। একটু পিছিয়ে এল ঋষি। হতচকিত আমরা। কানু বলল, "ছেলাইখুড়ো আমরা। আমি কানু।" ছেলাই ভীষণ ঘোর চোখে আমাদের দিকে তাকায়, আর আর্তনাদ করে মেশিনে মুখ গোঁজে।

আমি বলি, "ছেলাইখুড়ো তুমি আমাদের সঙ্গে স্কুলে চলো। তোমার ঘরে জল উঠছে। এখন বৃষ্টি থামবে না।"

বেশ জোরে চিৎকার করে উঠল কানু, "তোমার ঘর হেলে গেছে। চাপা পড়ে মরবে।"

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ছেলাই। তারপর গোঁ গোঁ করে কেঁদে চলল। আবার এগিয়ে গেল ঋষি, কিন্তু এবার হেঁচকা মেরে মেশিনটা কাঁধের ওপর তুলে তক্তাপোশের ওপর লাফিয়ে উঠল ছেলাই। ঘোর ঘোর চোখে আগুনের ছোঁয়া। ঋষি বলল, "নেমে এসো। এখানে থাকলে মরে যাবে তুমি।"

ছেলাই মাথা ঝাঁকাল, "না!"

কানু বলল, "এই ভারী মেশিনটা কাঁধের ওপর তুলে—এবার মরবে তুমি। নামাও

মেশিনটা নামাও। চলো আমাদের সঙ্গে।"

কাঁধের ওপর মেশিনটা আঁকড়ে ফুঁসে ওঠে ছেলাই। একটা হাত শূন্যে ছোঁড়ে, পা উঁচিয়ে লাথি ছোঁড়ে। আর তার সঙ্গে জড়ানো ভাঙা গলায় অনর্গল কথা।

ঋষি আমাদের হাত ইশারা করে থামিয়ে দেয়, বলল, "কী বলছে বুঝেছিস? আমরা নাকি ওর মেশিন নিয়ে যাব!"

ততক্ষণে ছেলাই কী বলছে আমরা বুঝে গেছি, আমরা ওর মেয়ে নিয়ে গেছি, এবার মেশিন নিতে এসেছি। ও মেশিন ছাড়বে না, যাবে না।

ঋষি আমি কানু তিন জনে মিলে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের কথায় এই কাঁদছে। কাকুতি মিনতি করছে চলে যাবার জন্য। পরক্ষণে ফুঁসে উঠছে, হুঙ্কার ছেড়ে পারলে লাফিয়ে পড়ে আমাদের ঘাড়ে।

ঘরের অবস্থাও সুবিধার নয়, যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে। ভিজে শরীরও ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। কানু বলল, "শালা পাগল-ছাগল, মরুক গে যাক।"

আমি বললাম, "এবার আমরাই ঘর চাপা পড়ে মরব।"

ঋষি বলল, "তোরা দুজন চলে যা। আমি এখানে আছি। পুতুলকে একটা খবর দে।"

আমি বললাম, "পুতুলের কাছে যাব!"

ঋষি খিঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নইলে কার কাছে যাবি। কে পারবে।"

আমি বললাম, "এখানে পুতুল আসবে কী করে?"

ঋষি চিৎকার করল, "সেটা পুতুল জানে কী করে আসবে।'

কানু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, আমি ওর পেছনে চলি।

কানু বলল, "ছেলাইটা আমাদের চোর ডাকাত বানিয়ে দিল—!"

আমি বললাম, "আমরা ওর মেয়েকে কেড়েছি, এবার মেশিন কাড়তে এসেছি—ছি!"

আমি বললাম, "আমি পুতুলকে খবর দিতে যাব না কানু!"

কানু একটু থমকাল, "আমিও যাব না।"

আমি বললাম, "কিন্তু ঋষি যে ওখানে।"

কানু ভুল করে কোনও গর্তে পড়ে ডুব জলে যেতে যেতে উঠে বলল, "ঋষির সব কিছুতে বেশি বেশি। ও যা বলবে তাই করতে হবে। ও যখন বুঝবে নিজে উঠে আসবে। শালা!"

"ঘরটা আর একটু হেললে, ঋষি কেন ছেলাইও পাগলামি ঘুচিয়ে সাঁতরাচ্ছে দেখবি।" আমি বললাম।

জল থেকে উঠে আমরা দুজনে দুদিকে পা বাড়ালাম। যে যার বাড়ির দিকে। কিন্তু বাড়ির সামনে এসে মনে হল, খবরটা পুতুলকে দেওয়া উচিত। হয়তো কানুরও সে কথা মনে হয়েছিল। তাই আমাদের আবার দেখা হয়ে গেল হেমেনদের বাড়ির কাছাকাছি। দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "বুঝলি ছেলাইটার জন্যে—!"

কিন্তু আমরা কেউ কারও দিকে তাকালাম না।

বেড়ালের ভাষা, বেড়ালাধিকার...

সুদর্শন সেনশর্মা

চিত্তবাবু, চিত্তবাবু অ চিত্তবাবু—

ঘুমটা ভেঙে গেল। চিত্তর কষ্ট সাধনার রাতের ঘুমটি চটকে গেল খুব ভোরে। সুতপা তাকে ঠেলছিল—এই শুনছ দাদা ডাকছেন। ধেৎ, বলে চিত্ত বালিশটা নিয়ে দূরে সরে গিয়েছিল, কী যে কর না.....কত কষ্ট করে আমাকে ঘুমোতে হয় তুমি জান না। যাও উঠব না... চাপাগলায় সুতপা বলছে তখন, জানি, দাদা অনেকক্ষণ ধরে ডাকছেন যে।

ঘরে এখন জানালা দিয়ে কোনও আলো ঢোকেনি। কোনও প্রভাতপাখির ডাক সে শোনেনি। সে খুব খেয়াল করে শোনার চেষ্টা করল কোনও সাইকেলের ক্রিং, অতর্কিত কোনও গাড়ির ভোঁ....অনুমানে বুঝতে পারে চিত্ত সকালের এখনও ঢের দেরি।

দাদা মানে চিত্তদার বাড়িঅলা ভোলানাথবাবু। দোতালায় থাকেন। চিত্ত ফিসফিস করে বলল, তুমি উঠে দেখ না কী ব্যাপার। তেমন কোনও গুরুতর ব্যাপার হলে না হয় তখন...

—ও চিত্তবাবু একটু শুনবেন। দোতলা থেকে যে নেমে এসেছেন ভোলানাথবাবু চিত্ত বুঝতে পারে। চিত্ত মনে মনে বলে, চিত্তবাবু আর কি শুনবেন। কাল রাতেও তো শুনেছি। ঘুমোতে পারিনি। ন-দশ বছরের আপনার কাজের মেয়েটির রাতে ফুঁপিয়ে কান্না শুনেছি। আপনি এবং আপনার স্ত্রী দুজনেই তার গায়ে হাত দেন। না দেখছি বাড়িটা এবার পাল্টাতে হবে। দুঃখটা এই হয়তো আমি নতুন বাড়ি দেখে ওঠার আগেই আপনি আমায় নোটিশ দিয়ে দেবেন। বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে আনমনে বলে ওঠে চিত্ত, আসছি দাদা—বাড়িঅলা বলে কথা.....

সুতপা উঠে পড়েছিল, হাই তুলে উঠে বসতে বসতে চিত্ত বলল, দেখ তিনুর আবার কিছু হল নাকি। সুতপা বলল—তিনুর জন্য তোমায় এত সকালে নিশ্চয়ই ডাকবেন না।

চিত্তবাবু....একটু শুনবেন—বাড়িঅলা ভোলানাথবাবু এখন ল্যান্ডিং থেকে নেমে এসে ভাড়াটের একতলার দরজাটায় কড়া নাড়ছেন।

চিত্ত উঠে বসল, লুঙ্গিটা ঠিক করতে করতে বলল সুতপাকে, এই দাঁড়াও.....আমি যাচ্ছি। দরজা খুলে বারান্দায় বেরল চিত্ত। বাড়িঅলার হুকুমে জানালা-টানালা বন্ধ করে রাখতে হয়। জানালা খোলা থাকলে রান্নাঘরের দিক থেকে পুবের আকাশ ফর্সা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারত চিত্ত। রান্নাঘরের পেছনে খানিকটা মাঠ। তার পিছনে পুকুর। তারও ওপারে নিম্নবিত্তদের চালাঘর, আধপাকা বাড়ি। ভোলানাথবাবুর ভয় ও পাড়াকেই। ব্যাঙ্কের চাকরিতে কেউকেটা হয়ে অভিজাত এলাকায় বাড়ি ফেঁদে উঠে আসায় ভোলানাথবাবুর ভাষাতেই অশিক্ষিতরা হিংসে করে। ভোলানাথবাবুর স্ত্রী সে পাড়াতেই বহুদিন ছিলেন। সে যাকগে চিত্ত তাদের দরজা খুলে বাইরে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াতেই ভোলানাথবাবু বললেন, আসলে আপনাকে খুব সকালেই ডেকে ফেললাম। কী করব, ঠিক কী করা উচিত ভেবে ভেবে সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না।

চিত্ত খুব চিন্তিত মুখ করে বলল, ওমা সে কী। সারারাত ঘুমোতে পারেননি....আর

অত ভাবনার কী আছে। যা আপনার ঠিক মনে হবে আপনি তাই করবেন।

....না না এ ব্যাপারটায় আপনাকে না জানিয়ে কিছু করা যাবেই না। আমার স্ত্রী, মানে আপনার বৌদিও তাই বল্লেন....আপনি ছিলেন বলেই প্রাণিহত্যার দায় থেকে বেঁচেছি। ছি ছি এমন ভুল যে আমার কি করে হল।

চিত্ত ভেতর ভেতর রাগে গর গর করলে কী হবে, মুখ হাসি ফুটিয়ে বলছে, না না সে আপনি কি আর ইচ্ছে করে করেছেন। সে বলল না তিনু রাতে কাঁদছিল কেন দাদা? এটুকু সে তো বলতেই পারত, ভাড়াটে বলে, আপনারা তিনুকে মারধর করে ঠিক করছেন না বলার সাহস তার বা সুতপার না হলেও।

কলকাতায় এক আড্ডায় চিত্ত তার এক অ্যাডভোকেট বন্ধুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা ভাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের মামলা কীভাবে করতে হয়?

বন্ধু বলল, কার নামে করবে?

চিত্ত হেসে বলল, আমার বাড়িঅলা.....

তার অপরাধ?—

তার কাজের ন-দশ বছরের মেয়েটাকে সকাল বিকেল তিনি মারধর করেন, খেতে-তেতেও ঠিকমতো দেন না.....পয়সা কড়ি তাঁর যতই হোক, হৃদয়টা তার কিন্তু খুব রেচেড—

অ্যাডভোকেট বন্ধু একচোট হেসে বলল, না এ মামলা তোমাকে করতে হবে না। তার আগে বাড়িটা পাল্টাও। ভদ্রলোকের প্রতি এটুকু কৃতজ্ঞতা তো তুমি দেখাবে—যে তোমার বাবা মা তোমাদের বিয়েটা যখন মানেননি, বৌকে নিয়ে কোথায় উঠবে ঠিক করতে পারছিলে না তখন এই ভোলানাথই তো তোমায় পার করেছিল বন্ধু।

চিত্ত বলেছিল, সে তো আমিও অনেক কিছু করেছি ওদের জন্য.....

ন্যায়াধীশ বন্ধু বললেন....তুমি তো ভাড়াটে ওটা তোমাকে করতেই হবে...তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ আগে, ভোলানাথবাবুই হয়তো মানবাধিকার রক্ষার কেষ্টবিষ্টু হয়ে আছেন।

চিত্ত মিঁইয়ে গিয়ে বলেছিল—ধেৎ।

এখন ভোলানাথবাবু চিত্তকে বলছেন.....আপনি কিছু মনে করবেন না চিত্তবাবু....অনেক ভেবে দেখলাম আমার জেঠুর বেলাকে আর বাড়িতে রাখা যাবে না.....চিত্ত অবাক হয়ে বলল....এজন্য এত সকালে আপনি কষ্ট করে ঘুম থেকে না উঠে এলেও পারতেন....একটু দ্বিধার ভাব করে তখন ভোলানাথবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। যেন কথা খুঁজছেন....জুতসই বাক্যটা পেলেই বাক্যবাণে একদম ভাড়াটেকে শুইয়ে দেবেন....ভোলানাথবাবু গলা খাঁকারি দেন....দেখুন বেলা তো আমার....কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে ও আর আমাদের দোতলার চৌকাঠ মাড়ায় না। ও সারাক্ষণ আপনাদের একতলায় বসে থাকে। আপনার স্ত্রী সুতপাদেবীর পায়ে পায়ে ঘোরে। আপনার শিশুপুত্রটি মানে আমার জেঠুর অসুখ হতে পারে....সে তো এখন তার বেলা বলতে অজ্ঞান। মাঝেমধ্যে হামা দিতে দিতে বেলাকে জাপ্টেও ধরেছে...ও কিন্তু কিছু বলে না...

চিত্ত হাসতে থাকে। মনে মনে বলে, আরে ড্যামনা। সত্যি কথাটা বলতে পারলে না প্রাণ খুলে, আসলে তোমার বেড়াল আমার ঘরে খায় তাতে সম্মানে লাগছে না আমি বেশ

ভালোই বুঝতে পারছি....আসল কথাটা বলছ না তো ভোলানাথ ভায়া, থুড়ি দাদা, বেড়ালটা সেই থেকে তোমার চৌকাঠ না মাড়ালেও সকাল বিকাল বড়ি দেয়াটা যে তোমার দোতলার দরজার সামনেই সারছে আক্রোশে, সেটা আমরা বিলক্ষণ জানি। সুতপা এই নিয়ে কম হাসাহাসিও করে না। বেড়াল বলে কি চতুষ্পদের মানসম্মানবোধ থাকবে না? আক্রোশে থাকবে না?

ভোলানাথবাবু বলছেন, আজ রঘুবাবু আসবেন। রঘুবাবুকে বলেছি বস্তায় করে বেলাকে একটু দূরে ফেলে আসতে। ওর চেহারাও কদিনে এমন দাঁড়িয়েছে ঘরে রেখে হেল্‌থ হ্যাজার্ড না হয়ে যায়.....

ঠিক আছে, চিত্ত চোখ মুছতে মুছতে বলল, আপনার পোষ্য আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে.....রঘুবাবু এলে আমায় একটু বলবেন।

ভোলানাথ এবার হেসে বললেন—জেঠুর বেলা তো আপনার ঘরেই ঘাপটি মেরে থাকবে। আপনাকে না জানিয়ে ওকে বস্তাবন্দী করাও যাবে না।

২

রঘুবাবুর চেহারাটা রোগা রোগা গেঁজেল টাইপের । ভোলানাথের সাকরেদ তো। একদম নন্দী ভৃঙ্গির মতোই ভোলানাথের আজ্ঞাবহ। এই সেদিন চিত্ত জেনেছে রঘুবাবু তার যৌবনকালে ডাকসাইটে মাস্তান ছিলেন। কিন্তু এই চেহারা নিয়ে রঘুবাবু কেমন মাস্তানি করত চিত্তর সেটা মালুম হয় না। এখনও যে রঘুবাবুর রং চটেনি সেটা টের পেল এই সেদিন চিত্ত। গোলবাজারের ফণিদার কাছে একটা বুককেস তৈরি করতে দিয়েছিল সুতপা। ফণিদা দেড়হাজার টাকা এ্যাডভান্স নিয়ে মাস দুই এই দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে কাটিয়ে দেয়ায়, একদিন সুতপা দোতলায় গল্প করতে করতে কথাটা বলে দিয়েছিল। ভোলানাথ বলেছিলেন তার স্ত্রীকে, এই রঘুবাবু এলে একটু মনে করিয়ে দিও তো। ঘটনাটা তাঁদের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকাণ্ডের পর পরই ঘটেছিল। তা রঘুবাবুকে ভোলানাথ বলায়...দিন চারেক বাদেই ফণিবাবু বুককেস নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে বাসায় হাজির। চিত্তকে একদিন রাস্তা থেকে ডেকে খুব ভয়ে ভয়ে বলেছিল ফণি, রঘু যে আপনাদের জানাশুনো একটু আগে যদি বলতেন....সে তো আমারে এই মারে সেই মারে.....ফণিকে খুব চাপাচাপি করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে তবেই চিত্ত জানতে পেরেছিল দশ-বারো বছর আগেও রঘুর দাপটে এ তল্লাটে ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই সুতপা ধরল, দাদা কেন ডাকছিলেন? চিত্ত গজরাতে গজরাতে বলল—ন্যাকাষষ্ঠী। বেড়ালটাকে বস্তাবন্দী করে রঘুবীরকে দিয়ে সাইকেলে চালান করা হবে....সেটা জানাতে ভোর না হতেই উনি আমার ঘুম ভাঙালেন।

সুতপা আঁতকে ওঠা গলায় বলল, ওমা সে-কী! আমার বাবুর বেলা তো ওদের এখন পোছেও না। আমরা না দেখলে তো বেড়ালটা দোতলায় পচে মরে থাকত...বেড়ালটাকে আধমরা করেও রাগ গেল না?

চিত্ত আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বলল...দাঁড়াও আমিও দেখছি। এ সময়ে একদম দেয়ালের দিকে দু-পাশে বালিশ দেওয়া উঁচু বিছানায় ঘুমোতে ঘুমোতে বাবুও কেঁদে উঠল।

সুতপা আলো নেভাতে নেভাতে বলল—দেখেছ চারটেও বাজেনি। কোনও মানে হয়। চিত্ত গর গর করতে করতে বলল—এইবার হবে। সুতপা অবাক চোখে একবার চিত্তকে দেখল। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে চিত্ত আবার পুরোনো সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখছে।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষ করে সেই রোববার ভোলানাথ দম্পতি ল্যান্ড করতেই একতলায় তাদের দিকের দরজা খুলে দিয়ে চিত্ত খবরটা দিতেই...এমা সে কী মরে যায়নি তো—বলতে বলতে একতলাতেই ব্যাগ থেকে চাবি বের করে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ভোলানাথ বললেন, সব দোষ ওই তিনুটার বাবার। অন্যদিন আসতে পারবে না। এল সেই আমরা বেরিয়ে যাবার মুখে মেয়েকে নিতে। কতদিকে খেয়াল রাখব। সুতপা বলল, কাল থেকে মিনির আর আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। চিত্তকে দেখিয়ে বলল—কালও কত ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডাকল...

টিভির পর্দায় যেন অ্যানিমেল প্লানেট বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি...চ্যানেলের সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্যে সুতপার কোলে বাবু দরজার একপাশে। তার পেছনে চিত্ত। ভোলানাথবাবুর সদর দরজার তলদেশের একচিলতে ফাঁক দিয়ে শুকিয়ে আসা দুধের নদীর দাগ, কাঠি দিয়ে ঢুকনো খাবারের দু-এক টুকরো। দোতলার ঘরের দরজার শেষ তালাটা খোলা হয়ে গেল। দরজাটা ফাঁক হতেই দশদিনের দুর্গন্ধের সঙ্গে চিড়িয়াখানার বাঘের মতো সুতপার মিনি বা তার ছেলের বেলা লাফিয়ে বেরিয়ে এল।

চিত্ত মনে মনে পুলকিত এই দেখে যে এক্সপেকস্টেড ডেটের দুদিন আগে ফিটাল হার্ট সাউন্ড বন্ধ হবার মতোই, ভোলানাথের আগমন তিথির দুদিন আগে মিনির ম্যাঁও বন্ধ হয়ে গেলেও....সে এ দশদিনের বন্দীদশায় মরেনি। চিত্তর সরবরাহ করা তার শিশুপুত্রের বরাদ্দ ল্যাকটোজেন টু গোলা দোতলার দরজার একচিলতে ফাঁক দিয়ে বহুকষ্টে যে চিত্ত চালান করতে পেরেছিল, বালতি করে জল ঢালতে পেরেছিল, কোনওমতে তাই খেয়েই....। সুতপা তখন বাবুর বেলার শোকে এতটাই কাতর হয়েছিল, চিত্ত জানে কোনও মতে তখন বেড়ালটাকে মুক্ত করতে পারলে হয়তো সুতপা বাবুকে খাওয়ানোর মতো তার ব্লাউজের ঢাকনা খুলে ভেজা বুক উন্মুক্ত করে দিত...

ভোলানাথেরা চলে যাবার দিন বিকেলে সুতপাই আবিষ্কার করেছিল বাড়িঅলারা তাদের বেড়ালটাকে ঘরে বন্ধ করে বেড়াতে গেছে....বাড়িঅলার দরজা ভেঙে বিড়ালকে মুক্ত করতে এখনও কোনও পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি বলেনি। বন্ধু অ্যাডভোকেটকে বলতে সে বলেছিল...তুমি পাগল নাকি বাড়িঅলার ঘরের তালা ভাঙবে? আইন বিশ্বাস করবে যে তুমি বাড়িঅলার পোষ্য চতুষ্পদকে মুক্ত করতেই, তার ক্লেশ ঘোচাতেই তালা ভেঙেছিলে?

ঘরে তার দুগ্ধপোষ্য ছোট ছেলে। আর বাড়িঅলার বেড়ালটা ঘরে আটকা পড়ে না খেতে পেয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে.....

সে যতটা পেরেছিল করেছিল। প্রতিদিন সকালবেলা, দুপুরবেলা দরজা গলিয়ে দুধ ঢালত সুতপা। রাতে সুতপা বাবুকে কোলে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালে, একপাশে দাঁড়িয়ে চিত্ত বলত ম্যাঁও, একদম বেড়ালের গলায়।

বন্ধ দরজার ওধার থেকে তখন বেড়ালটার ছুটে আসার শব্দ পাওয়া যেত। সেও দরজার

ওপাশে মাথা ঠেকিয়ে ক্লেশ ভরে বলত ম্যাঁও—তারপর চিত্ত দরজার ফাঁক দিয়ে দুধ ঢালত কিমা রান্না করে সুতপা এনে দিলে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে....

সুতপা ছাতের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল এখন.....জান এ বাড়িটা যত তাড়াতাড়ি পারি ছেড়ে দিতে হবে। আচ্ছা সেদিন দরজা খোলার পর বেড়ালটার ছুটে এসে তোমার পায়ে অমন মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা, পায়ে মাথা ঘষতে দেখেই কি ভোলাদা ক্রুদ্ধ হয়েছেন? দেখ বেড়ালেরও কেমন মানসম্মানবোধ, অ্যা করা ছাড়া দোতলায় আর উঠছেই না.....সে....

চিত্ত বলল, দশদিন বন্দী থেকে বেড়ালটা যে আঁচড়ে কামড়ে ওদের টি. ভির স্ক্রিন, তোশক, বিছানা, বালিশ সব দফা রফা করে দিল। দাস্ত বমিতে কেমন নোংরা করেছে বিছানা....কাচাকাচিতে ওদের কত সাবান,.কত মেহনত অপচয় হল। একটা তোশক, চাদর, বালিশ একদম ফেলে দিতে হল.....

সুতপা বলল....বেশ হয়েছে।

ঠিক নটার সময় এল. আই. সি-র যতন এল তার স্কুটার নিয়ে। বাইরে থেকে খুব ডাকল সে, এই চিত্তদা—এই চিত্তদা বাড়ি আছ। সে ঘরে ঢুকতেই চিত্ত ফিকফিক করে হাসল। সুতপাকে বলল, এই তুমি যতনকে আজকে একটা নতুন কিছু করে খাওয়াও তো....ওকে তো আজ দশটা অব্দি আমার সঙ্গে থাকতে হবে। যতন ভাইটি তোমাকে আজ একটা....আচ্ছা তুমি এখান থেকে স্কুটার নিয়ে কোথায় যাবে। মানে তোমার ডাইরিটা দেখ তো আমার এখান থেকে বেরিয়ে তোমার কোনদিকে যাবার কথা?

যতন সোফায় আধশোয়া হয়ে বলল, ডাইরি দেখতে হবে না, এখান থেকে আমি মধ্যমগ্রাম চৌমাথা হয়ে.....বাদুর রাস্তায় কিছুদূর.....

চিত্ত বলল......আচ্ছা ঠিক আছে।

সুতপা বাবুকে চিত্তর কোলে বসিয়ে দিয়ে চা বসাতে যেতে যেতে শুনল দুজনে ফিস ফিস করে কীসব বলছে.....

ঠিক দশটার সময় রঘুবাবু সাইকেল নিয়ে এল। বেড়ালটাকে কলতলায় মিনি মিনি করে ভোলানাথবাবুর স্ত্রী খুব ডাকতেই বিভ্রান্ত হয়েই বোধহয় মিনি একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রঘু তাকে পেছন থেকে সেই সুযোগে এমনভাবে বস্তাবন্দী করল....সুতপাও হা হা করল। ভোলানাথবাবু একতলায় এসে খুব শ্লাঘার গলায় চিত্তকে চমকে দিয়ে বলল.....জানেন এত না করলাম, অফিসের ওরা শুনল না আমাকে মানবাধিকার সমিতির যুগ্ম সম্পাদক করেছে....

চিত্ত হেঃ হেঃ করে কান বেছান হাসি হাসতে হাসতে বলল, সে তো বটেই সে তো বটেই.... আপনার মতো দয়াপরবশরাই তো এ কাজের উপযুক্ত....আপনারা এগিয়ে না এলে....

যতন খুব তালেবরের মতো কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ সোজা হয়ে বলল.....জানো চিত্তদা মানবাধিকার তো জানা আছে....আমাদের আগরপাড়ায় খুব বেড়াল কম তো....ওখানে না একটা বেড়ালাধিকার সমিতি হয়েছে....

চিত্ত হঠাৎ যতনের আচমকা খচরামিতে দম আটকে চিৎ হয়ে যাচ্ছিল...কোনওক্রমে সামলে চকচকে চোখে সে বলল....তাই নাকি যতন?

ভোলানাথ খুব ভারিক্কি গলায় তখন বললেন....সে সমিতির সভাপতি কি আপনি?

যতন বলল—আজ্ঞে না।

চিত্ত হঠাৎ গায়ে পড়া গলায় বলল—দাদা বেড়ালটাকে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা ছাড়িয়ে ফেলে আসতে বলুন রঘুবাবুকে, আমি একটা বইয়ে পড়েছি বেড়াল কিন্তু বহুদূর থেকেও....

হ্যা হ্যা সে ব্যবস্থাই হচ্ছে....মধ্যমগ্রাম চৌমাথা ছাড়া ওকে নিয়ে আর বিশ্বাস নেই....ফের হয়তো.....

বস্তাটার মধ্যে বেড়ালটা খুব দাপাদাপি করছিল। সাইকেলের হ্যান্ডেলে বস্তাটা ঝুলিয়ে রঘুবাবু রওনা হওয়ার একটু বাদেই যতন স্কুটার নিয়ে চলে গেল। দিনটা ছিল রবিবার। সময়টা সাড়ে দশটা।

সোমবার সকালবেলা কলেজ যাবার মুখে বাড়ির হাতার মধ্যেই রিক্সাস্ট্যান্ডে ফের চিত্তর বেড়ারটার সঙ্গে দেখা হল। বেড়ালটা তার দিকেই ফের আসছিল। চিত্ত দাঁড়াতেই ছুটে এসে চিত্তর পায়ে একেবারে মুখ ঘষেই আবার বাস রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছিল। বোকার মতো চিত্ত বলল....ম্যাঁও যা তোর বেলার সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে দেখা করে আয়....চিত্ত রিক্সায় উঠে চলে যেতে যেতে দেখল.....বেড়ালটা একপাশে দাঁড়িয়ে তার রিক্সার দিকেই তাকিয়ে আছে। চিত্ত খুব মায়াভরে বেড়ালের গলায় বলল....ম্যাঁও....বেড়ালটা দাঁড়িয়েই আছে....

রাতে বাড়ি ফিরলে সুতপা উল্লসিত হয়ে বলল, জান বাবুর বেলা এসেছিল.....আমার হাতে খেয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। দোতলার দিকে ফিরেও তাকায়নি। বাবুর দিকে তাকিয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডেকেছিলও।

আরও ক-দিন বাদে সোদপুর স্টেশনের চার নম্বর প্লাটফর্মে শেয়ালদার গাড়ির জন্য দাঁড়িয়েছিল চিত্ত। বাবুদের সে দিনটা ছুটির....কিন্তু চিত্ত এমন একটা কলেজে কাজ করে যে তার অফিসে এসব কোনও ছুটি নেই। ট্রেন আসছে দেখে সে একটু পিছিয়ে এসেছিল....এ সময়েই তার পায়ে মখমলের পেলব স্পর্শে চমকে তাকিয়ে দেখে সে মিনি তার পায়ে মাথা ঘষছে। চার নম্বর প্লাটফর্মের রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে সে নিশ্চয়ই এসেছে.....কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে মিনির....নিরন্ন.....নিরক্ত......

কীরে মিনি তুই আসিস না কেন আর।

—ম্যাঁও...

তোর চোখে জল কেন মিনি! চল আমার বাসায় চল...

—ম্যাঁও ম্যা....ও-ও।

আমার ছেলে রে, যে তোকে বেলা বলে.....সে তোকে দেখতে চেয়েছে।

—ম্যাঁও......

তুই কি আমাদের ওপরেও রাগ করেছিস....?

—ম্যাঁও ম্যাঁও.....

ট্রেনটা অবশ্যই চলে গিয়েছিল। অনুরোধ না শুনে মিনিও রেলিং গলে পুকুর পাড় দিয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিত্ত বাড়ি ফিরে এল। কলেজে গেল না। সেই থেকে মিনিকে তারা আর দেখতে পায়নি।

চিত্ত বাড়িটা পাল্টাবে ঠিক করে নিয়ে নতুন ভাড়াবাড়ির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। একদিন বন্ধু সেই অ্যাডভোকেটকে বেড়ালের গল্পটা বলতে.....সে বলেছিল বেড়ালও নিজের ভালো বোঝে। তারও সম্মানবোধ আছে। চতুষ্পদ হলেই বা কী! ম্যাঁও-ও নাকি চিত্তকে, ন্যায়াধীশের মতোই, শেষ দেখা হবার সময় বাড়ি পাল্টাতেই বলে গেছে তার ভাষায় অবশ্য।

আপনাদের খোঁজে কোনও ভাড়া বাড়ি আছে, বলবেন? বাড়ি পাল্টালে চিত্তর সঙ্গে, বাবুর সঙ্গে, সুতপার সঙ্গে মিনির আর একবার দেখা তো হতেও পারে!

সেদিন যেমন ভোলানাথবাবুর স্ত্রী কলতলায় একটা ইঁদুরের লেজ ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে বলছেন, মিনি এই দ্যাখ, খাবি। সুতপা দেখেছিল একটা ইঁদুর শুধু নয়, আরো দুটো কলতলায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। সুতপা আর না পেরে বলেছিল, দিদি কাল বিষ দিয়েছিলেন বুঝি?

ভোলানাথ জায়া বললেন, না গো সুতপা, এমনই মরে গেছে। মিনি ইঁদুর দেখেও দাঁড়িয়ে রইল। এ সময়েই বাবু হামা দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে এসে বেলা-লা লা বলতেই, সুতপা ওমা তুই উঠে এসেছিস বলে সেদিকে ছুটে যেতেই, মিনিও ম্যাঁও বলে সুতপাদের ঘরেই ঢুকে গেল।

ভোলানাথ বৌদি, রাগ করে বললেন, তুই ঘোড়ার ডিমের বেড়াল। ইঁদুর মারিস না। মেরে দিলেও খাস না....তোকে দূর করে দেব।

সেদিন যেমন সত্যনারায়ণ পুজো করব বলে ডেকে পুজোর শেষে হাতে একটা ছোট বাটি দিয়ে বলল, এটা মিনির। মিনিকে খাইয়ে দাও। দেখ বাবু যেন হাত-টাত দেয় না। খটকা লাগল। ঘরে নেমে বাটিটা সুতপার হাত থেকে চিত্ত নিয়ে দেখে শুনে বলল, তুতে মেশানো আছে। আচ্ছা মিনিটাকে মারতে চাইছে কেন বল তো?

রসায়নের মাস্টার চিত্ত পরদিন ল্যাবরেটরি থেকে অ্যামোনিয়া দ্রবণ নিয়ে এল খানিকটা। সুতপাকে বলল, ম্যাজিক দ্যাখ! বলেই ওই বাটির সিন্নিতে এই দ্রবণ ঢালতেই একটা হাল্কা নীল ক্বাথ তলানিতে এল।

সুতপা বলল—ওমা।

চিত্ত বলল, এখনও হয়নি....এরপর ওই দ্রবণ আরও খানিকটা ঢালতেই তলানির হাল্কা নীল জমাট পদার্থ মিলিয়ে গেল একদম দ্রবণে আর দ্রবণটা গাঢ় নীল হয়ে গেল।

সুতপা বলল—কী হল!

কী আবার হবে, ভোলানাথের বৌ মিনিকে মারতে সিন্নিতে তুতে মিশিয়ে তোমাকে দিল....কী রকম বুঝছ?

—তুমি বাড়িটা পাল্টাও.....

—দেখছি তো......

রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল চিত্ত....রঘুবাবু সাইকেলে বেড়াল ঝুলিয়ে যাচ্ছে....উল্টোদিক থেকে ফণিবাবুর সাইকেল......যতনের স্কুটার সাজিরহাটে তাদের একটু চেপে দিতেই রঘুর সাইকেল কাত.....ব্যাগ থেকে বেড়াল বেরিয়ে দে দৌড়। ফণিবাবু পতন সামলে কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে বলল.....রঘুবীরের ঝোলা থেকে ম্যাঁও বের হচ্ছে? ম্যাঁওটা এখন বাস্‌স্টপে....এই গাছতলায় রিক্সাস্ট্যান্ডে...চুপি চুপি সুতপাদের সন্তানকে দেখতে আসছে.....

একাকী পৃথিবী

কল্যাণ মজুমদার

সময় সচেতনতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ ঘটেনি কখনও। বরং অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার জন্য অহেতুক বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে অনেক সময়। তবু স্বভাব এমনই। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ-দশ মিনিট আগে পৌছলেও দেরিতে পৌছাবে না কখনোই প্রতিম অধিকারি। অথচ আজই দেরি করছে। আধঘণ্টার ওপর হল সুজিত খাঁড়া এসে বসে আছেন, অথচ প্রতিমের পাত্তা নেই। অবনীভূষণ এমনিতেই রক্তচাপে ভোগেন। এখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁর প্রেসারও যেন একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। কেন দেরি হচ্ছে জানালেও পারত। মোবাইলের যুগে অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু হচ্ছে। অবনীভূষণ কিছুতেই প্রতিমের লাইন পাচ্ছেন না। নেটওয়ার্ক বিজি—এই বার্তা তাঁকে স্বস্তি দিতে পারার কথা নয়।

—কী হল অবনী, আর কতক্ষণ চুপচাপ বসিয়ে রাখবে! আরে আমাকে তো আবার বাড়ি ফিরতে হবে। এ তো দিল্লি নয় যে কেউ কৈফিয়ৎ চাইবে না। —সুজিত খাঁড়ার স্বরে অস্থিরতা ও বিরক্তি।

কাঁচুমাচু গলায় অবনী বলেন, প্রতিমটা যে কেন দেরি করছে—ও এমন কক্ষনো করে না—আসলে এসব ব্যাপারগুলো ও-ই ভালো জানে—আমি ঠিক—

—ঠিক আছে। কলকাতার রাস্তা তো। কোথাও আটকে গেছে হয়ত। ততক্ষণে একটু গলা ভেজাবার ব্যবস্থা করা যায় না?

—গলা ভেজানো—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সোডা গ্লাস, বরফ সবই রাখা আছে।

—সেসব তো দেখছি। আসল বস্তুটি কোথায়?

—আসল বস্তু! হ্যাঁ, হুইস্কি—রাখার তো কথা ছিল। আমি দেখছি। আছে কোথাও নিশ্চয়।

অবনীর মোবাইল রুনুঝুনু শব্দে বেজে উঠল। ব্যগ্র চোখে পর্দায় নম্বর দেখেই বললেন, কোথায় আছো, এত দেরি হচ্ছে কেন?

—একটা সমস্যা হয়েছে। পরে বলছি। মিনিট দশেকের মধ্যে মার্গারেট পৌছে যাবে।

—কেন? কথা তো ছিল—

—সেটাই সমস্যা। মার্গারেট এলে আপনি ৩১৬ নম্বরে চলে আসবেন। সব বুঝিয়ে বলব।

—হুইস্কি কোথায়?

—ডানদিকের কাবার্ডে রাখা আছে।

অবনী তাড়াতাড়ি কাবার্ড খুলে হুইস্কির বোতল বের করেন। বোতল দেখে সুজিত বলেন, দেখি দেখি—এমন বোতল আগে আর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো।

বাক্সের গায়ে রোমান হরফে লেখা 'সুইং'। বোতলটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সুদৃশ্য। জনি ওয়াকার কোম্পানির। এই কোম্পানির রেড লেবেল, ব্ল্যাক লেবেল ভুবন বিখ্যাত। সুইং-

এর নামও কখনও শোনেননি সুজিত। ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকে মনে মনে তারিফ করলেন। নিজেই গ্লাসে ঢেলে এক চুমুক র' গিলে বললেন, বাঃ দারুণ তো! কোথায় পেলে এটা?

—প্রতিমই আপনার জন্যে স্পেশালি জোগাড় করেছে। জিনিসটা ভালো তো?

—ভালো কী হে, খুব ভালো! খুব ভালো! কী স্মুদ্! অন দ্য রকসের জন্যে ঠিক জিনিস।

নিরুদ্বেগ বোধ অবনীর মুখে আশ্বস্থ প্রফুল্লতা ফোটায়। বিনীত স্বরে বলে, কাজুবাদাম, চিপস সব আছে। কাবাবও দিয়ে যাবে। আপনি খান, আমি একটু আসছি। মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগবে না। অপরাধ নেবেন না, দাদা। যাব আর আসব।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বেশি দেরি করো না। একা থাকতে ভালো লাগে না আমার।

টুং শব্দে ডোরবেল বাজল। স্যুটের ভেতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে এসে দরজা খোলেন অবনী। সামনে দাঁড়ানো মোহিনী প্রতিমা বলল, আমি মার্গারেট—মার্গারেট ডিসিলভা। প্রতিম আমাকে—

নিচু স্বরে অবনী বলেন, বুঝেছি। এসো। শোন গেস্ট কে জানো তো?

—প্রতিম বলেছে। খুব বড় ভি আই পি নাকি!

—হ্যাঁ। আমাদের ভাগ্য তোমার হাতে—এটা মাথায় রেখে চলবে।

পাশের ঘরে মার্গারেটকে এনে অবনী বললেন, সুজিতদা, দেখুন তো একে চেনেন কিনা।

সুজিত খাঁড়া শবব্যবচ্ছেদ শরীর চোখে মার্গারেটকে আপাদমস্তক দেখেন। শাড়ি পরলেও গায়ের রং, কটা চোখ ও চুল বুঝিয়ে দেয় এর মধ্যে বিদেশি অনুপ্রবেশ আছে, যা সুস্বাস্থ্যকর। শরীরের বঙ্কিম রেখায় বিজ্ঞাপনের উপচে-পড়া ছন্দ।

মুগ্ধ নয়নে সুজিত বলেন, আগে কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না তো।

—কী করে দেখবেন—একদম নতুন জয়েন করেছে আমাদের কোম্পানিতে। মার্গারেট ডিসিলভা। আমাদের এক্সপোর্টের নতুন ডিভিশনের লিয়াজোঁ অফিসার। আপনার সঙ্গে পরিচয় করার জন্যে ও নিজেই খুব উৎসাহী হয়ে আসতে চাইল।

মার্গারেট বলল, আমার বোধহয় একটু দেরি হয়েছে আসতে।

সুজিত বলেন, কিছু দেরি হয়নি। বসো—কী খাবে বলো, অবনী—

মার্গারেট বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, স্যার। আমি সব ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

অবনী বললেন, দাদা, আমি তাহলে একটু আসি।

—ও হ্যাঁ, কী কাজের কথা বলছিলে যেন। ঠিক আছে, এসো। এখন তো আর একা নই।

বেরুবার মুখে অবনী চোখ টিপে সুজিতকে নিহিত বার্তা বুঝিয়ে দেন।

৯৩০ নম্বর থেকে ৩১৬ নম্বরে এসে অবনী আবার হকচকিয়ে গেলেন। প্রতিমের সামনে চেয়ারে বসে থাকা মেয়েটির চোখে মুখে একই সঙ্গে ক্ষোভ, বিরক্তি এবং তাচ্ছিল্য। প্রতিমের গলায় এমন অনুনয় শোনারও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই অবনীর।

—আপনি শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছেন। —মেয়েটির কথার মধ্যেই ঘরে ঢোকেন অবনীভূষণ।

—ব্যাপার কী প্রতিম। এ কে?

প্রতিম বলল, বসুন অবনীদা। মার্গারেট এসেছে তো? ওদিকে সব ঠিক আছে?

—তা আছে মনে হয়। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রতিম বলল, এ হচ্ছে পায়েল মুখার্জি। মিসেস ভাট পাঠিয়েছেন। ও আমার কথামতো ঘণ্টাখানেক আগে এ ঘরে রিপোর্ট করে। আমি কোনও চান্স নিতে চাইনি বলে, ওকে আগে আসতে বলেছি। আর সরাসরি ৯৩০ নম্বরে গেলে কারও চোখে পড়াব সম্ভাবনা এড়াতে এ ঘরে আসতে বলি। এখানে ব্রিফিংটাও দেওয়া যাবে। যা মার্গারেটকে টেলিফোনেই সারতে হয়েছে।

—অসুবিধেটা কী হল? ওকে পাঠালে না কেন? প্রতিম একবার পায়েলের দিকে তাকিয়ে আবার অবনীর মুখে চোখ রাখে। অবনী লক্ষ করেন পায়েলের পরনে স্মার্ট সিল্কের শাড়ি। রং মেলানো হলুদ ব্লাউজ। ঝকঝকে ত্বকে নবদূর্বাদলের উজ্জ্বলতা। চোখ দুটো ডানা মেলা পাখি—যেন এখনই কোনও স্বপ্নভুবনে উড়ে যাবে। গলার স্বরের সুরমূর্চ্ছনা আগেই শোনা গেছে।

প্রতিম বলে, আপনি তো ওকে দেখছেন। বলুন তো এই সুকুমার প্রতিমার কী এই কাজ করা উচিত হচ্ছে?

পায়েল বলল, ক্ষুধা উচিত বোঝে না, খাবার বোঝে। অভাব উচিত জানে না, উপার্জন বোঝে।

হতভম্ব অবনী একবার পায়েলের দিকে তাকান, আর একবার প্রতিমের দিকে। তাঁর মাথায় জিজ্ঞাসার বদলে সংশয়। মার্গারেটের তুলনায় এই মেয়েটিকে অনেক বেশি উপযুক্ত লাগছে। বয়েস কম, শরীরে টাটকা সতেজতা। এবং আত্মপ্রত্যয়ী। যদিও এখন আর পেছোবার উপায় নেই, তবু মার্গারেট যদিও কোনও কারণে সুজিত খাঁড়াকে যথোপযুক্ত তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়—নাঃ, অশুভ চিন্তা মাথায় আসতে দেবেন না। প্রতিম নিশ্চয় জেনে বুঝেই সব করছে। ওর নিজেরও তো দায় আছে সুজিত খাঁড়াকে পরিতৃপ্ত করার। এই সুযোগ হারালে আর কখনো কি পায়ের তলায় বাঞ্ছিত ভূমি খুঁজে পাবে?

প্রতিম কী যেন বোঝাচ্ছিল মেয়েটিকে। সব কথা মন দিয়ে শোনা হয়নি। এখন অবনী শুনলেন, প্রতিম বলছে, মাথা ঠাণ্ডা করে তুমি আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখ। আমি তো বলছি, সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।

পায়েল তীব্র স্বরে জবাব দেয়, দেখুন, এসব ছেঁদো কথা আমি ঢের শুনেছি। শখ মিটিয়ে নিয়ে সাতদিন পরই ফেলে পালিয়ে যাবেন। আমি তখন কোথায় যাব? আমার পরিবারের কী হবে?

—পরিবার?

—আমার মা আছে, ভাই আছে। ভাইয়ের পড়াশোনা আছে। ওদের দায়িত্ব ভুলে আপনার প্রলাপে নেচে উঠলে আমার চলবে?

অবনী জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মা, ভাইয়ের সঙ্গে থাকো? কোথায়?

—তবে কি ভেবেছেন আমি ব্রথেল থেকে এসেছি? বাঁশদ্রোনিতে বাড়ি আছে আমাদের।

—তাহলে তুমি এখানে এলে কেন?

অবনীর প্রশ্নে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে ওঠে পায়েল—আপনারা কি আমার জীবন কাহিনি শোনার জন্যে আনিয়েছেন আমাকে? যে কাজের জন্যে ডেকেছেন তার যদি দরকার না-থাকে আমাকে ছেড়ে দিন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিম বলল, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

—ওরে বাব্‌বা! একেবারে গাড়ি করে বাড়ি! আর কিছু দেবেন না? শাড়ি, গয়না, ব্যাঙ্ক, অ্যাকাউন্ট, অ্যাড-অন ক্রেডিট কার্ড?

—তুমি বিদ্রূপ করছ! আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলেছি। এখনও বলছি। তুমি আমার কথাগুলো একটু ভাবো। কিছু খাবে? আনাবো?

—না। কিছু লাগবে না। আমি এখন যাব।

অবনী বললেন, প্রতিম তুমি কী করছ, কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। ওদিকে সুজিতদা যে কী ভাবছেন কে জানে। উনি বিগড়ে গেলে আমার যা হবার তো হবেই, তোমার কী হবে ভেবে দেখেছ?

—জানি, অবনীদা। ফুলবেড়িয়ার কন্ট্রাক্টটা না পেলে আমি আর দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু পায়েলকেও আর ছাড়তে পারব না। আমি ওকে বিয়ে করব, অবনীদা।

—বিয়ে! কী বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এ মেয়েকে এভাবে নষ্ট হতে দেব না আমি।

—তুমি ওর কতটুকু জান? কতটুকু দেখেছ?

—আর দেখার বা জানার কিছু নেই আমার। ওর চোখেমুখেই আঁকা আছে ওর ভেতরের প্রতিমার সৌষ্ঠব।

অবনী বললেন, ঠিক আছে, এ নিয়ে তো পরেও কথা বলা যেতে পারে। এখন তো সুজিতদার ব্যাপারটা সামলাতে হবে।

প্রতিম তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, ওঁকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই। শালা লোচ্চা নাম্বার-ওয়ান—মাল পেয়ে গেছে—মার্গারেটও খুব চালু। ও নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। যাবার সময় মন্ত্রীমশাইর হাতে খামটা গুঁজে দিতে ভুলবেন না যেন। মদ, মাগি, টাকা—শালার তো সব চাই। পাবলিককে ঢপ দেবার সময় নদের নিমাই সাজে হারামজাদা।

—ওসব বলে কী লাভ? ওদেরই জমানা। ওদের হাতেই ক্ষমতা।

—সে জন্যেই পায়েলরা এই পথে। আপনি এগোন অবনীদা। মন্ত্রীকে দেখুন। আমি দেখি একে রক্ষা করতে পারি কিনা।

পায়েল খেঁকিয়ে ওঠে, আপনাকে কে অ্যাপয়েন্ট করেছে? কে বলেছে আমার রক্ষাকর্তা দরকার? রাবিশ! শুনুন, নর্মালি কাজ না করে আমি টাকা নিই না। কারণ আমি ভিক্ষে করতে আসিনি। পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জন। কিন্তু আজ আমাকে কাজ না করেই টাকা নিতে হবে। আপনারা আমার সারা সন্ধেটাই নিষ্ফলা করে দিলেন। মন্দিরা মাসি আপনার প্রলাপে গলবে না একটুও।

—মন্দিরা মাসি কে? প্রতিম জানতে চায়।

—যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের মিসেস ভাট।

অবনী প্রশ্ন করেন, তুমি চেন মিসেস ভাটকে? হু ইজ শী?

প্রতিম বলে, আমি নিজে মিট করিনি এখনো। আমার এক বন্ধু আছে ক্যালকাটা ক্লাবের—সে-ই রেফারেন্সটা দিয়েছে। আপনি ওঁর স্বামীকে নিশ্চয় জানেন—প্রভুনারায়ণ ভাট। দ্য গ্রেট পি. এন.বি।

—পি. এন ভাট। —অবিশ্বাসের চমকে অবনী বলেন, কী বলছ প্রতিম! অত যার ব্যবসা-ইন্ডাস্ট্রি—

—ঠিকই বলছি। এটাই ছিল প্রাথমিক ব্যবসা। এটা ভাঙিয়েই বাকি যা কিছু, যাকে বলে সুপার স্ট্রাকচার। পলিটিশিয়ানদের কেমন পালিশ লাগে খুব ভালো বোঝেন পি. এন. বি। ক্লাব সারকিটে কিছুদিন ঘুরলেই জানতে পারবেন।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবনী বললেন, এতক্ষণে সুর্জিতদা নিশ্চয় ফ্রি হয়েছেন। আমি যাই। একটু কথাবার্তা বলি।

প্রতিম বলল, হ্যাঁ, যান।

—তুমিও এসো।

—আমার দেরি হলে ফোন করব।

পায়েল বলল, আমার টাকা?

যেতে যেতে অবনী ঘুরে দাঁড়ান। প্রতিম চোখের ইঙ্গিতে ওঁকে যেতে বলে উত্তর দেয়—চিন্তা নেই। টাকা মার যাবে না। এসো একটু চা খাওয়া যাক।

—বলেছি তো কিছু খাব না। আপনি আমার টাকাটা দিয়ে দিন। আমি চলে যাই।

ওকে আশ্বস্ত করে প্রতিম—যাবে, নিশ্চয় যাবে। বললাম যে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। তার আগে আমার কথা শোনো। তুমি বললে, তোমার মা আর ভাই আছে। তাদের দায়িত্ব তোমার। আর কেউ আছে বাড়িতে?

—এরপর জানতে চাইবেন, কী করে এ লাইনে এলাম? কেন এই খারাপ কাজ করছি?

—না, ওসব জানার কোনও আগ্রহ নেই আমার। অনুমান করছি, তোমার বাবা নেই। ভাই কী করে?

—ভাই এইটে পড়ছে। বাবা দু-বছর হল পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন।

—পুলিশের গুলি কেন?

—মিছিলে এসেছিলেন গণহত্যার প্রতিবাদ করতে।

—ওঃ! বুঝেছি। আরও অনেকে মারা গিয়েছিল। কাগজে পড়েছিলাম মনে পড়ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিম বলল, তুমি তো গোঁ ধরে আছো, কিছু খাবে না। আমি একটু হুইস্কি নিচ্ছি। তোমার কি চলে?

পায়েল চোখ তুলে বলল, ওসব এখনও অভ্যেস করতে পারিনি। আগে গন্ধও সহ্য করতে পারতাম না। ক্লায়েন্টদের তো ওটা না হলে চলে না। তাই সহ্য হয়ে গেছে।

প্রতিম গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে, জল মিশিয়ে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলল, জল খাও। —বলে জলের বোতল বাড়িয়ে দেয়। পায়েল বোতল নিয়ে বোতল থেকেই দু-ঢোঁক জল খায়। বোঝা যায় ওর তৃষ্ণা পেয়েছিল। মুখের রেখা নরম হয়।

পায়েলের মুখোমুখি বসে প্রতিম বলল, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, আমার কথাগুলোও মানতে পারছ না—খুবই স্বাভাবিক। আমি বুঝি। তবু বলছি, একটু ভেবে দেখ। আমাকে একটা সুযোগ দাও। আমি বলছি না, কালই আমাকে বিয়ে করো। বলছি, আমাকে বিয়ে করার কথাটা ভাবো। আমাকে দেখ, জানো আমার সম্পর্কে। শুধু এই কাজটা আর করবে না।

—কাজ না করলে আমাদের চলবে কীভাবে?

—বলছি। যতদিন মনস্থির করতে না পারছ আমাদের বিয়ে হচ্ছে, ততদিন তোমাদের সব দায়িত্ব আমার।

—মানে আপনি আমাকে টেম্পোরারিলি রাখতে চাইছেন?

—না। রাখতে চাইছি না তোমাকে। বোঝাতে চাইছি। আমি তোমাকে দুটো অপশন দেব। এক, বিয়ের আগে তোমাকে আমি স্পর্শও করব না। দুই, যদি ফাইনালি আমাকে বিয়ে করতে না চাও, আমি সরে যাব। তারপর তুমি যা খুশি করো। আমাকে টাকাও ফেরত দিতে হবে না। তবে একটা টাইম-ফ্রেম থাকা দরকার। বলো কতদিন সময় লাগবে তোমার —এক মাস? দু-মাস?

—অতদিন আপনি আমাকে টাকা দিয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ। তাই তো বললাম।

—কেন দেবেন? বিনিময়ে কিছু করবেন না তো বললেন।

—আমি ব্যবসা করি, পায়েল। এটাকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট বলি।

—বিনা কাজে আমি কেন টাকা নেব?

—স্ত্রীরা স্বামীর টাকা নেয় না?

—স্ত্রী হলে তো স্বামীর সব কাজই করতে হয়। তখন আইনি অধিকারও জন্মায়। —বলতে বলতে হেসে ওঠে পায়েল।

ওর হাসি দেখে বিস্মিত প্রতিম বলে, কী হল?

সপ্রতিভ ঢঙে পায়েল বলল, হঠাৎ বার্নাড শ-র বিখ্যাত লাইনটা মনে পড়ে গেল—ম্যারেজ ইজ নাথিং বাট লিগ্যাল প্রস্টিটিউশন।

—তুমি কতদূর পড়েছ?

—পার্ট ওয়ানে ভর্তি হয়েছিলাম। পরীক্ষা দিতে পারিনি।

প্রতিমের মোবাইল বেজে উঠল। অবনীভূষণ বললেন, সুজিতদা চলে যাচ্ছেন। আমি যাচ্ছি। তুমি পরে ফোন করো।

—আমাদের কাজের কথা হল কিছু?

—হয়েছে। তবে—কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন অবনীভূষণ।

প্রতিম বলল, মার্গারেট ঠিক ছিল? ও কি চলে গেছে?

—অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। পুরোপুরি ঠিক ছিল না বোধহয়। একটু খুঁতখুঁত করছেন। দেখা যাক যেতে যেতে কী বলেন।

ফোন অফ করে প্রতিম বলল, তুমি তো তাহলে দাদন শব্দটির সঙ্গে পরিচিত।

—হ্যাঁ। দাদন নিয়ে কাজ না করলে টাকা ফেরত দিতে হয়। আপনি তো বললেন, ফেরত নেবেন না।

—ওই টাকাটা হবে তোমার বিয়ের আগাম যৌতুক।

—আমার বিয়ে?

—আমাকে না করলেও কাউকে তো করবেই একদিন।

—আমাকে 'হোর' জেনেও আপনি কেন বিয়ে করতে চাইছেন?

—নিজেকে অকারণে অপমান করো না। আমি বিশ্বাসই করি না তুমি কখনও 'হোর' হতে পার। আমিও কিন্তু ধোয়া তুলসি নই। তোমার ছিল টাকার প্রয়োজন। আমার ছিল আকাঙ্ক্ষার আয়োজন। ভেবে দেখতে গেলে আসলে আমরা একসূত্রে গাঁথা।

হুইস্কি শেষ করে প্রতিম বলল, আমি তোমাকে আজ এক সপ্তাহের টাকা দিচ্ছি। সপ্তাহে একবার দেখা করে টাকা নিয়ে যাবে। ফোন করতে পারো যখন খুশি, যতবার খুশি।

পায়েল বলল, আমি যদি টাকা নিয়েও আপনাকে ঠকাই—মানে 'প্রোগ্রাম' করতে থাকি?

—তুমি করতে পারবে না, পায়েল। যদি পারতে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইতাম না। তবু, কখনও যদি পারো, আমাকে ফোনে ক'বো, যাতে অন্তত গুডবাই বলতে পারি। বলো, কত দেব?

পায়েল বলল, আজকের পুরো টাকাই দেবেন। পরের টাকা ফর্টি পার্সেন্ট কম করে দেবেন।

—কেন? কম কেন?

—মন্দিরা মাসির কমিশন তো আর দিতে হবে না।

—দ্যাটস গুড।

—আমি কিন্তু আপনাকে কথা দিচ্ছি না।

—জানি। তবে তুমি সিরিয়াসলি ভেবে দেখবে।

—দেখুন, এমন প্রস্তাব অনেক পেয়েছি। সবগুলো ছিল ফাঁপা। প্রতারণার কৌশল। আমি এখনও জানি না আপনি কতটা বিশ্বাসযোগ্য। তবে, যদি বিয়ে করি—আবারও বলছি, আমি কোনও কথা দিচ্ছি না—তবু, যদি—যদি করি, আমার একটা শর্ত থাকবে, যা মানতেই হবে।

—কী শর্ত?

—মা হয়ত বাড়ি ছেড়ে আমার কাছে যাবেন না। কিন্তু আমার ভাই থাকবে আমার সঙ্গে—যতদিন না ও স্বাবলম্বী হয়।

—এ তো খুব ভালো কথা। বউয়ের সঙ্গে একটা রেডিমেড ভাইও পেয়ে যাব। ডান—মাই ডিয়ার লেডি।

পায়েলকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কাঁকুড়গাছিতে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল প্রতিম রাত এগারোটারও পর। জামাকাপড় বদলে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে ফোন করল অবনীভূষণকে।

—কখন বাড়ি ফিরলে? —অবনী জিজ্ঞেস করেন।

—এই একটু আগে। এবার বলুন কী সমস্যা হয়েছিল?

—এমনিতে মনে হল খুবই স্যাটিসফায়েড। মেয়েটির বাড়ির প্রচুর প্রশংসা করলেন।

তবে বোধহয়, সোয়ালো করতে চায়নি মার্গারেট। তাই—

—বুঝেছি, বুঝেছি। ব্যাটা হারামির বাচ্চা একটা গোদা পারভার্ট। আমার কাজটা, দাদা?

—রাজি হয়েছেন। তবে ফাইভ পার্সেন্ট চাইছেন।

—এতদিন তো থ্রি-তেই হচ্ছিল। ফাইভ দিলে আমার আর কত থাকবে!

—বলছেন, সামনেই ইলেকশন আসছে। ফান্ড তুলতে হবে তো!

—যা বলেছেন। আজ রাখি তবে?

—প্রতিম, ওই মেয়েটাকে কী করলে?

—বাড়ি পৌঁছে দিলাম। কথা দিয়েছে আর এ লাইনে থাকবে না।

—তার মানে তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে? তুমি ওকে বিয়ে করবে?

—এখনও রাজি হয়নি। হলে অবশ্যই বিয়ে করব।

—এমন ভুল করো না, প্রতিম। ডোন্ট গেট রুইনড। ওকে তোমার চোখে লেগেছে, এনজয় হার যদ্দিন ভালো লাগে। বাট, বিয়ে—না, না, প্রতিম, না—আমার এই কথাটা তুমি রাখো।

—অবনীদা, আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। আপনি তো জানেন আমার ন-বছর বয়েসে মা মারা গেছেন। আমাকে স্কুলে দিয়ে ফেরার সময় মিনিবাস চাপা দেয়। এই মেয়েটি আজ ঘরে ঢুকতেই আচমকা মার ছবি ভেসে উঠল আমার চোখে। ঠিক ওইরকম একটা শাড়ি সেদিন মার পরনে ছিল। ওর চোখ দুটো ঠিক আমার মার চোখের মতন। তখনই স্থির করি, ওকে বেলাইন থেকে ফেরাতে হবে। বিবাহের নিরাপত্তা ছাড়া ও আমার কথ শুনবে কেন, অবনীদা? আমি ওকে লালসা বা ভোগের জন্যে চাইছি না, চাইছি ওকে জীবন-আরাধনার নিঃশঙ্ক পূজারিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। করবে তো?

দুই

পৌঁছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আসছেন অবনীভূষণ। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। যেন আকাশের অশ্রু। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকালেন। প্রতিমের বিয়ের পর এগারো আর আগের পাঁচ—মোট ষোলো বছরে বার ছয়েকের বেশি এ বাড়িতে আসেননি প্রতিমের বাবার মৃত্যুর পর এসেছিলেন। তারপর ওর বিয়েতে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে মনে হল, কত স্মৃতি মাড়িয়ে চলেছেন। প্রায় তিন মাসের নিরলস, নাছোড় অধ্যবসায়ে প্রতি পেরেছিল পায়েল ও তার মাকে বোঝাতে যে, সে কুসুম-লিপ্সু, ভ্রমরবিলাসী নয়। বর জীবনপিপাসু যোগী।

বিয়ের দিনেও অবনীর মনের মধ্যে একটা অলক্ষ কাঁটা কিটকিট করছিল। তবু প্রতিমে মানসিক দৃঢ়তা ও স্বপ্ন-বিম্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে আশীর্বাদ করেছিলেন। কী আমূ বদলে ফেলেছিল প্রতিম নিজেকে! অন্য নারী তো দূর কথা, মদ্যপানও ছেড়ে দিয়েছিল মেতে উঠেছিল ব্যবসা আর সংসার নিয়ে। মেয়ে টুপসি যেন আকাশগঙ্গা থেকে আলোকবৃ নিয়ে আবির্ভূত হল প্রতিমের জীবনে অনন্ত কোজাগরীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে। টুপসির অন্নপ্রাশনে পর আর আসা হয়নি।

আজ এ অবস্থায় আসবেন কখনো দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। প্রতিম যখন দিল্লি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠেছিল, অবনীভূষণ গ্রেন্ড কেনিয়ন অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন লাস ভেগাস। খবরটা সেখানেই পান। খবরকে বলা হয় সন্দেশ—এমন খবর, শুধুই বিষ। না, বিষাতীত বিষ।

কাঁপা হাতে ডোর বেলে চাপ দিলেন। কর্কশ শব্দ ভেসে এল ভেতর থেকে। পদশব্দ। দরজা খুলল এক যুবক। অবনী চিনতে পারলেন। পায়েলের ভাই প্রদীপ্ত। বললেন, দিদি কোথায়?

—ভেতরে আসুন। দিদি আছে টুপসির সঙ্গে।

অবনী পরিচিত সোফায় বসলেন। সোফার রং বদলেছে মনে হল। টিভির ওপরে প্রতিমের একক ছবিটা সমান হাস্যময়। মন দিয়ে দেখলে হাস্যমুখর বলতে ইচ্ছে করবে। অবনীর বুকে আবর্ত।

পায়েল ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল। মাকে ধরে আট বছরের টুপসি। তার চোখে জিজ্ঞাসা। ওর স্মৃতিতে অবনীভূষণ নেই।

অবনী বললেন, এসো—বসো।

পায়েল মেয়েকে বলল, অবনীজেঠু। প্রণাম কর।

টুপসি এগিয়ে আসতেই অবনী উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে বললেন, প্রণাম করতে হবে না। আমার বুকে আয় মা।

এইসব মুহূর্তে শোকের কথা বলা, ঘটনার পুনরালোচনা অর্থহীন। বেদনাবহ। অবনী বললেন, শুধু একটা কথা মনে রেখো, তোমার জীবন নতুন করে শুরু হল। আমি আছি। যখন যা দরকার হয় জানাতে দ্বিধা করো না।

পায়েল বলল, আপনি তো আছেনই। তবে দাদা, উনি সব ব্যবস্থাই করে গেছেন। আমার ভাই এম. বি. এ করেছে। ওকে কাজকর্মও শিখিয়েছেন অনেক। আমার কোনও চাওয়া উনি অপূর্ণ রাখেননি। টুপসির পড়ার জন্যে—এমনকী বিয়ের জন্যেও ইনসিওরেন্স করে রেখেছিলেন।

অবনী বললেন, জানি। আমাকে বলেছে সব। আমি জানি আর্থিকভাবে তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। তবু জীবন তো নিষ্ঠুর। আর আমাদের পৃথিবী শঠ ও শ্বাপদে ভরা। তাই সাবধানতার প্রয়োজন। আবারও বলি, সব সময় মনে রেখো, একজন দাদা আছে তোমার।

বলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ান অবনী। টুপসির মাথায় হাত দিয়ে আদর করেন। বললেন, এত বয়েসেও প্রতিমের মতন একজন আশ্চর্য মানুষ আর দেখলাম না।

একটু চুপ থেকে পায়েল বলল, দাদা, আপনাদের কাছে—পৃথিবীর সকলের চোখে ও ছিল একজন মানুষ। আমার তো ও-ই ছিল একমাত্র পৃথিবী। আমার তো আর পৃথিবীই রইল না!

পায়েলের বুকের হাহাকারের প্রতিধ্বনি করে আদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। আকাশের মতো পায়েলের চোখে অঝোর বৃষ্টি।

কেউ ভালো নেই আমরা

বাসুদেব দেব

ওরা তোমাকে পাগলা গারদে দিয়েছিল
শেষ খবর, তুমি পালিয়েছ সেখান থেকেও...

শুনেছি তুমি নাকি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলে
পাঁচিল আর কাঁটাতার, পুলিশ আর পোস্টার
অশান্তির একশেষ দেখে শেষরাতের কুয়াশায়
মিশে গেছ কখন...
তারপর এক তুখোড় ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায়
ধরা পড়েছিলে তুমি সবরমতীর আশ্রমে
ত্রাণশিবিরের কান্না, ঘরপোড়া মানুষের চিৎকার
অহিংসার বাসাবাড়ি ভেঙে ঝোড়ো হাওয়ায়
উড়ো পাতার মতো কোথায় যে ভেসে গেলে তুমি...

এক উটকো কবি তোমাকে দেখেছিল কাশ্মীরের ভূস্বর্গে
ডাল্‌হ্রদের ওপর ফুটে উঠেছিলে যেন একবার
আমাদের স্বপ্ন হয়ে...
নষ্ট আপেল, থেৎলানো ফুল, আইসক্রিমের ওপর রক্তের ছিটে
আমাদের পাপবোধের মতো কোথায় লুকিয়ে গেলে তুমি
কারা যেন গুজব ছড়ালো, তুমি গেছ বসরায়
গোলাপ বাগান জ্বলছে সেখানে, ট্যাংকের তলায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে
আরব্য রজনীর বাঁকা চাঁদ, বুকে বুকে কারবালার দাহ
কাকতাড়ুয়ার মতো হাস্যকর লিবার্টি স্ট্যাচুর ঘোলাটে চোখে
তোমার ওর্নাটা বেঁধে দিয়ে
আবার কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে...

কেউ ভালো নেই আমরা, কেউ ভালো নেই
আমিও তো খুঁজছি তোমাকে সেই থেকে
গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

খুঁজছি কলকাতার পুজো প্যান্ডেলের ভিড়ে
আমাদের কবিতা থেকে সেই কবে তুমি পালিয়ে গেলে
রাঙাসখী আমার...

পৃথিবী যখন প্রমায়, আমরা...

শুভ বসু

ঠিক, আপনি যা বলে দিয়েছেন
জীবন থাকতে কোনোমতে সেটা ভোলা নেই,
'মণিপদ্মে হুং ওম মণিপদ্মে হুং' বলে
এখনো যেমন তরে যান অতিবৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা
তেমনি করেই আজীবন বীজমন্ত্রের মত
জপতে থাকবো আপনার দেয়া সে ধ্রুবসত্য,
ভরসা রাখব ইতিহাস ঠিক নাচবেই একদিন
আমাদের হাততালির ছন্দে,
বাস্তবে যত পশ্চিমজুড়ে হোক না টালমাটাল
আর গাঢ় পুবদিকে
সকল দুয়ার খুলে যাক শাদা বণিককুলের
স্বাধীন সহজ সুখমৃগয়ার জন্য।

হোক না, সে সব শুধুই তো প্রমা, আমাদের দৃষ্টির
বিজ্ঞানসম্মত জটিল খর নৈর্ব্যক্তিকে
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী ভুলভ্রান্তির পথ ছেড়ে
আমাদেরই কাছে ছুটতে আসছে ঠিক দিক নির্দেশের আশায়।

তা স্বপ্নে নয়, যখন দেখি যে টালমাটালেও
আমাদেরই হাল সঠিক লক্ষ্যে ঠিক দিক পানে সংহত আছে।

ফলে, এমনকি পাখিরাও যদি আজ সংঘের প্রতিষ্ঠা চায়
নিশ্চিত এই আমাদেরই কাছে এ্যাফিলিয়েশন চাইতে আসবে।

আজ আমাদের তর্জনী ছাড়া ঠিক নির্দেশ কে দেয় বিশ্বে?
সেই কথাটুকু সত্যি না হলে এমনি কি জোটে গরিষ্ঠতা?

সংখ্যাগরিষ্ঠতা তন্ত্রে ইতিহাসকে পথ দেখাচ্ছি,
সেই বিশ্বাস আছেই বলে না, মানি একদিন আমাদেরই কাছে
ইতিহাস পাঠ নিতেই আসবে দিগদর্শন।

প্রায় ততদিনই মুক্তকণ্ঠে চলুক আমাদের এ বৃন্দগান
: হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে, হে নির্ভীক হে নির্ভয়...

খুঁজে বেড়াচ্ছি

আশিস সান্যাল

ভোর হলো
আহ্নিকের অমোঘ নিয়মে
পৃথিবীর সদর দরজায়
ছিটকে পড়লো জবাকুসুম রোদ।
কিন্তু মরুভূমির আকাশে
কেবল অন্ধকার—
বালিয়াড়ির বুকে ক্রুদ্ধ মরুঝড়
চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে
অবিশ্বাসের রক্তিম প্রতিচ্ছবি।

জাগুয়ারের হিংস্র থাবায়
ভেঙে পড়ছে
সমস্ত বিশ্বাসের কঠিন প্রাচীর।
শকুনের কর্কশ আওয়াজে
কেঁপে উঠছে
চারপাশের দুর্গম প্রান্তর।
আর আমি
খুঁজে বেড়াচ্ছি সেইসব প্রিয় মুখ—
বারুদের তীব্রতার মধ্যে
তাদের কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

অথচ একদিন
ভোরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো

গোলাপের নির্মম সুগন্ধ।
অজস্র-অচেনা পাখির ডাকে
ভরে উঠতো
মরুভূমির সমস্ত আকাশ।
ঝল্‌মল্‌ করতে থাকতো
খেজুরগাছের স্বপ্নময় সবুজ পাতারা।

কিন্তু আজ
চারদিকে কামানের অবিরাম শব্দ।
গোলাপের বুকে
চাপ চাপ রক্তের দাগ।
ভালোবাসাকে
হত্যা করেছে মানবতার মুখোশ পরে
যুদ্ধবাজ দানব—
আর আমি
এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছি
মরুভূমির বাতাসে
ভালোবাসার সেইসব পবিত্র মুখ।

বে-ওয়াচ

রণজিৎ দাশ

ইন্টারনেটে দেখা দেবেন ঈশ্বর,
তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে—

এই কথা বিশ্বাস ক'রে এক কম্পিউটার-পাগল
দিন-রাত নেট-সার্ফিং করতে করতে,
একদিন, তথ্যের সমুদ্রে ডুবে গেল।

সেই পাগলের মৃতদেহ পাঁজাকোলা ক'রে তুলে ধরে
ইন্টারনেটে দেখা দিলেন শয়তান—
পৃথিবীর সমস্ত ওয়েবসাইটে।

তিনি বললেন,
ঈশ্বর একটা পাসওয়ার্ড, নিষিদ্ধ এবং বিপজ্জনক।
এই পাসওয়ার্ডের জন্ম জঙ্গলে, জঙ্গলেই এর বাস।
কম্পিউটারে এর ব্যবহার যে করবে, তারই
ওয়েব-মৃত্যু হবে।
এত ঈশ্বর-সন্ধানী মৃতদেহ আমি তথ্যের সমুদ্র থেকে
কী করে তুলবো, আমি
কী করে সেই প্রতিটি মৃতের নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী
অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করবো, একা একা?'

সত্যিই শয়তানকে
এক বৃদ্ধ নুলিয়ার মতো ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখালো।

এবার ফিরিয়ে দাও

নন্দদুলাল আচার্য

কবে এই ছুটে চলা শান্ত হবে নিজেও জানি না।
এত নদী, মহাবন, পাহাড় ডিঙিয়ে, তৃণরেখা,
মাড়িয়ে মাড়িয়ে এসে বলেছি, এবার দেখা দাও।

মেঘের জঠর ছিঁড়ে বজ্র ফাটে। হাওয়া,
উড়িয়ে পিঙ্গল ধুলো দিগন্তে মিলায়।
চারিদিক ব্যাপ্ত করে আছড়ে পড়ে ভরা নিশীথিনী।
তন্তু মজ্জা ছিঁড়ে যায়,
যেন খুব কাছে এসে ডাক দেয় মৃত্যুর মোহনা।

বর্ষণের শঙ্কা নিয়ে শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ জানে,
শুধু তার অভিজ্ঞান দেখে দেখে ছুটে যাই।
খুলে পড়া পায়ের নূপুর, দেখে সেগুন শাখায় তার
স্খলিত মেখলা।
এলো খোঁপা থেকে তার খুলে পড়া বনজ কুসুম।

গড়-পঞ্চকোট থেকে পাথরে ব্ল্যাস্টিং শোন,

অন্তিম সন্ত্রাসে কাঁপে মহুলের ডাল।
দ্যাখো দু'চোখের অশ্রু শিলাই কাঁসাই হয়ে
কি প্রবল ছুটে যায়, চূর্ণ মেঘমালা?
প্রতিটি নিউরন থেকে গর্জে ওঠে গার্গানতুয়ান অধীরতা।

ঝরোকার ঐপারে দেখি কার কৃশ করাঙ্গুলি?
পিঠের প্রান্তর থেকে সরাও কুন্তল রাশি
ও মায়াঠগিনী,
এত দীর্ঘকাল জুড়ে বাসনা জর্জর ছুট,
আকাশ তোলপাড় করে খোঁজা,
এবার সম্পন্ন হোক।
আমার সমস্ত রশ্মি-বিকিরণ এত কাল ধরে
শোষণ করেছো যা যা আলো,
এবার ফিরিয়ে দাও, হে কৃষ্ণগহ্বর, ব্লাকহোল।

নারী যখন ঈশ্বরী

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

নারীর নামে ফুপিয়ে ওঠা
সাবেক দিনের ব্যথা; ঠিকানা—
বিষয়ক কথকথা।

ফুলের নামে নাম রাখলে
সকালে ফুটে বিকেলেই ঝরে যাওয়া
নাইবা থাকুক ঝড়ো হাওয়া
তবু হাহাকারের হাহা হাহা।
নারী নামে ফিসফাস রক্তজবা!

অনেক খেয়ার পারাপারেও নারীর
কোনো নিজস্ব বাড়ি ছিল নাকি?
সমান্তরালে রাতের আড়াআড়ি...
একটা দিন কারও জিম্মায় রেখে
আর ফেরৎ পায়নি কোনোদিন।

সেই নারী একদিন ঈশ্বরীর মগ্নপ্রেমে
গর্জন তেলে চক্ষুদানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়
বরাভয় মুদ্রায় ঈশ্বরীর চালচিত্রে
মহাকালের মুখোমুখি। নারীর ঈশ্বরী
দুচোখে সংসারের ভাত ফোটানোর আগুন।
আগামী ভিজে দিনের জন্যে সে আগুন
পাট করে রাখা সিন্দুকে
তা সে যত কথাই
রটিয়ে বেড়াক নিন্দুকে।

পিতা

অমিতাভ গুপ্ত

পালিত কন্যার মতো ধরিত্রী এখন তাঁর কবিতাকে সূর্যের উদ্দেশে
পাঠ করে। এদেশে মৃত্যুর কোনো শেষ নেই, তবু
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সূর্যশ্রুতির মতো পাঠ করে জননীকন্যারা
তবুও প্রতিটি গাছ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মূল বাক্প্রতিমার মতো
পাতা জড়ো করে
তখন গভীর মেঘ। বোধে ও বিদ্যুতে ওই পাতাদের প্রাণ ভরে ওঠে
বিপন্ন হবে না বলে যেসব মঞ্জরী শুধু সাবধানে ঝরে পড়ে গেছে
তাদেরও কুড়িয়ে নিয়ে ধরিত্রীর আঁচলে দিলেন
তারপর হাতের মুঠোয় আরো ঝড় নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি পায়ে পায়ে
ঝোড়োপথ নিয়ে
ক্ষতি নেই, আকাশের কাছে তাঁর কবিতার পূর্ণপাঠ ধরিত্রী রেখেছে
ঝড়ের উদয়তিথি বুকে এঁকে নিয়ে
অজস্র সূর্য উঠবে চিরদিন, অজস্র সূর্য, যারা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
শুনেছে বলেই কিছু পিতৃবোধ এনে দিতে পারে তবু অবশেষে এদেশেরও মানুষের মে

সমান্তরাল

কৃষ্ণা বসু

ঐ তোমার রঙিন হাসি, ছুটন্ত ঝর্ণা,
খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠো, সুবর্ণবর্ণা।
হাসতে হাসতে চক্ষু জ্বলে, চক্ষু জলে
ভরে, জলের তলায় ভাসতে থাকে, ফলে,
দুঃখগুলি ক্বচিৎ ওঠে উপর দিকে ভেসে,
নিজের দিকে যখন তাকাও রাত্রি-পার্টি শেষে,
তোমার হাসির, তোমার গানের তলার দিকে, শোনো,
গুমরোনো এক কান্না বাজে, কান্না ডাকে কোনো,
কে কাঁদছে কে? লক্ষ লক্ষ কন্যাভ্রূণে কাঁদে,
কয়েক লক্ষ শিশুকন্যা ছটফটাচ্ছে ফাঁদে,
ফান্দে পড়ি কান্দে কন্যা বরপণের জন্যে,
ভারত জুড়ে নারীজন্ম কাঁদছে শোনো, কন্যে!
প্রতিটি ঐ ঘণ্টা জুড়ে ধর্ষণে ধর্ষণে
অপমানের রক্ত ফোটে ঘরের কোণে কোণে,
ঘরে এবং বাইরে দ্যাখো মারণ ফাঁদ পাতা,
তবুও প্রেমের মিষ্টি গানে ভরে উঠছে খাতা!
খাতা ভরছে, ছাপা হচ্ছে হৃদয় হরণ পদ্য;
রাত্রি জুড়ে ফিনকি ছোটে তুফান এবং মদ্য,
তোমার হাসির তলায় আছে কোটি মেয়ে কান্না,
রঙিন বিজ্ঞাপনের ঘোরে আর না, মেয়ে, আর না,
যখন তুমি সুগন্ধী এক বিলাস-নারী হয়ে
রাত্রি-পার্টি জমিয়ে দাও, শিরায় যায় বয়ে
আগুন, আগুন, আগুন মাপিস মেয়ে,
মারখাওয়া ঐ কোটি মেয়ে তোরই দিকে চেয়ে;
চেয়ে রয়েছে, কষ্ট পাচ্ছে, উঠতে চাইছে বেঁচে
রঙিন মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে ওর কাছে যাস যেচে;

দুঃখগুলি ক্বচিৎ ওঠে উপর দিকে ভেসে,
নিজের দিকে যখন তাকাও রাত্রি-পার্টি শেষে।

কবিতার মুহূর্ত

মল্লিকা সেনগুপ্ত

কবিতা পড়া শুরু হতেই ছলাৎছল
থমকে যায় সব কোলাহল
নদীর জল যেভাবে পাড়ে আছড়ে পড়ে শব্দরাশি নিয়ে
জলতরঙ্গ সেভাবে তাঁর গলায় চলকিয়ে
ভাঙতে থাকে ডাঙার মাটি আর্ত হাহারবে
যেভাবে বনে আগুন জ্বলে পাথরে চকমকি
কবির গলায় ঠিক সেরকম আগুন জ্বলে, আর্তনাদ ওকি।

যখন কোন নদীর জলে ভাসতে থাকে দাঙ্গাভেজা লাশ
যখন কোন কিশোরী দল গাছকে বাঁচায় কুঠারে পেতে শ্বাস
জবার পোশাকে কোন মেয়েকে যখন ওরা টেনে নিয়ে যায়
যখন খুন আরওয়ালে যখন গুজরাটে
যখন কোন আর্ত মেয়ে মায়ের কাছে আগুন চায় রাতে
তখন তাঁর কবিতাগুলি রক্তে ভেজে, বাঁচতে চায়, কুঠার তাদের মারে
মাঠভর্তি মানুষ যারা মঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা শুনছিল
তারাই যেন তমসা নদী, তিরে দাঁড়ান নতুন বাল্মীকি

শতাব্দীর কবিতাপাঠ শুরু করেন শঙ্খ ঘোষ
আমরা শুনি বজ্রপাত বিদ্যুতের মন্ত্র নির্ঘোষ।

আমি মেফিস্টো বলছি

সুবোধ সরকার

আমার কোনও ভূমিকা নেই, আমি তোমার আয়না
আমার কোনও রাষ্ট্র নেই, আমি তোমার রাষ্ট্র
আমার সংবিধান আমি, আমি আমার পৃষ্ঠা
তারা কোথায় যারা তোমায় ভীষণ ভালোবাসত?

সহ্য করতে পারি না আর কমিউনিস্টদের
ওরা লোকের ভালো দেখে না, ভালো দেখলে টাটায়

মুছতে হবে ভিয়েৎনাম, কিউবা, বলশেভিক
নদীগুলোর কী হাল হয়েছে, শেয়ার দিক আমায়।

তার মানে কি তোমরা নদীর জল পাবে না?
তার মানে কি হারিয়ে যাবে শ্রাবণমাস?
আকাশ পুরো কেনা যায় না বলে,
আকাশে এতো বিমান সন্ত্রাস।

আমি তোমায় প্রোটেকশান দেব, আমি তোমার যশ
ওরা যখন আমার ঘরে আগ লাগাবে, ওরা খারাপ
আমি যখন ওদের ঘরে আগ লাগাব, ভালোর জন্য
মাথার ওপর উনি আছেন, উনি আমার মা-বাপ।
কিন্তু আমি অন্নদাতা, আমি তোমাকে ঘর দিয়েছি
ঘরে শোবার খাট দিয়েছি, বউ দিয়েছি ভালবাসার
আফিম খাও, আফিম লেখো, ভাবছো কেন?
বাড়িয়ে দেব স্যালারি চেক, আলোবাতাস।

তোমার ভাষা ইমোশানাল। বলতে হবে আমার ভাষা
তোমার চালচলন খুব লোকাল
ঘটিবাটির দিন গিয়েছে। প্ল্যাসটিকের দিন
ইতিহাস কি এক থাকে চিরকাল?

আমি তোমার কেউ না। তবু আমার হাতেই রিমোট
তোমার মুখ, আমার ভাষা, আমরা হলাম নতুন সংবিধান
তোমার খিদে, আমার খাদ্য, সেটাই আমার প্রতিপাদ্য
রাষ্ট্রপুঞ্জে গাইছে ওরা হরিলুটের গান।

আসলে তা রেখা নয়

আনন্দ ঘোষহাজরা

আসলে তা রেখা নয়, অরৈখিক বিসর্পিল তরঙ্গসঙ্কুল
আসলে তা পথ নয়, পথের মতনও নয়
        অথচ তা নিয়ন্ত্রণ করে যাতায়াত

অথবা তা যাতায়াতও নয় যেন, ভাষার অতীত কোনো কিছু!
আকাশে যেমন মেঘচক্রগুলি গড়ে আর ভাঙে
সেভাবেই ভাঙাগড়া একসাথে চলে ব'লে দৃষ্টির বিভ্রমে
আমরা কেবল ভাবি যাত্রাপথ; অথচ তা শুধু রূপান্তর
দেখায় পর্দার মোহে। যেইভাবে কুণাবর্তগুলি
আর্ত চীৎকারে ঘোরে, ভাঙে, ফোটে, মেশে তমসায়
অথচ তা অবরুদ্ধ কোনো এক গীতধ্বনিময়...

আসলে তা রেখা নয়, অরৈখিক বিসর্পিল তরঙ্গসঙ্কুল
আসলে তা পথ নয়, পথের মতনও নয়
অথচ তা করে যাতায়াত
ভাষার অতীত কোনো কিছু...

স্রোতে অহঙ্কারী ছায়া

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

বোঝাপড়ার দিন নিভে আসতে আসতে
যখন নাকের ডগায় সন্ধ্যার রহস্যগলি
হঠাৎ আমাদের চমক ভাঙে
ভুল নিশানায় কতদূর চলে এলাম
আমরা বোঝাতে চেষ্টা করছি
নদীর বাঁক থেকেই ভুলের সুরু
পাড় ভাঙছে তো দু'পা পিছিয়ে যাব
ঘাড়ের উপর শিরশির করছে খাঁড়ার লাল চোখ
হাঁড়িকাঠ থেকে পেছাতে পেছাতে
কখন যেন সীমান্ত ডিঙিয়ে এসেছি
এখানে আমরা কেউ কারুর নই
কেউ কাউকে চিনতে চাই না

এ সময়ে মহাপুরুষেরা ছায়া খোঁজেন
দিব্য চোখ আর দিব্য শব্দাবলীর ছায়া
দারুণ তপনতাপ থেকে পরিত্রাণ চাই
মিথ্যাকে সত্য সাজাতে কয়েকটা মুহূর্তই যথেষ্ট

শববাহী শকটে ঠিকরে পড়ছে শেষ আষাঢ়ের রোদ্দুর
কৈফিয়তের ছাতায় মাথা ঢাকছে লজ্জা

আমাদের বোঝাপড়া নিয়ে তেমন ভাবি না
ভালবাসা আর আক্রোশের সঙ্গে বারবার
আমাদের শয্যাবদলের খেলা
মানুষ যেখানে ছিল সেখানেই স্থাণু
শুধু অস্তসূর্যে তার অহঙ্কারী ছায়া
শালশীর্ষ থেকে লুফে নিচ্ছে গৈরিক কোপাই।

ভালবাসা, প্রত্নভাণ্ডার

রাণা চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে যা বলবো ভেবেছিলাম বলা হয়নি,
মিছিল চলে গেছে শতাব্দী পার ক'রে
বিপ্লব আসেনি, নীরবতা রাত্রি খেয়েছে।

আজ তোমাকে দেখি, আরো বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছ
কপালে ভাঁজ পড়েছে, সুগার বেড়েছে
খুব অন্যমনস্ক গোলদিঘি পেরিয়ে
অন্ধকারে ঢুকে
মেঘলা চোখ মেলে দেখছো যেন
গণেশ পাইনের জলরঙের লৌকিক আকাশ।
তখন তোমাকে দেখে আমার না-বলা কথারা
মঙ্গলগ্রহের মাটির নিচের
লুকোনো বরফ হ'য়ে গেল।
ভাবলাম—'আজ থাক, অন্য একদিন বলা যাবে।'
পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এখন দ্রুত
ষাটবছরের দিকে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি নিয়ে
ঢুকে পড়ছি
উড়ালপুলের সু-সভ্য শহরে এখন
কোথাও সাঁঝবাতি জ্বলে না গলিতে-গলিতে।

তবু মনে হয় কালীঘাটের শীর্ণ সেইসব গলি
ভালবাসা, প্রত্নভাণ্ডার
আর স্তম্ভিত পাথর আজো "ছিন্ন বাধা পলাতক
বালকের মতো" খুঁজে-খুঁজে হয়রান
তাকে, স্বপ্নের হারিয়ে যাওয়া জতুগৃহকে।
তোমাকে দেখা হ'লে এবার নিশ্চয় বলবো
ফিরিয়ে দাও শৈশবের মেঘমালা
শ্রাবণ পূর্ণিমা, 'গথিক গির্জের ছাঁদে' আঁকা
ভালবাসা শিমুল-পলাশ।

যদি না সুন্দরবন

সত্য গুহ

বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী প্রত্যেকেই জানে,
অরণ্য নিঃশেষ হলে খরচেরও অরুচি কুড়ুল;
নদীও রাক্ষুসী হয়—গ্রামকে গ্রাম পঞ্চায়েত শিবের মন্দির
মসজিদ, ইস্কুলবাড়ি, থানা—
জীবনের থামগুলো হয়ে ওঠে মুড়ি-মুড়কি গ্রাস;
সাপ বেজি হিন্দু-মোছলমান কিম্বা কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট ইত্যাদি প্রভৃতি
শবের শয়ন স্থানে পাততে আসন
শেষ চেষ্টা বাঁধ করে; কিন্তু ততক্ষণে
বড় দেরি হয়ে যায়, যখন পরস্পরে করতে ইচ্ছুক হয়
প্রিয়তর হৃদয় স্থাপন, ভাঙে মুহুর্মুহু
রঙিন মলাটগুলো প্রকৃতির রচিত গ্রন্থের,
বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি-ব্যাপকতা যতদুর, সারাক্ষণ ঝুপঝাপ ঝাপঝুপ সুর,
ভাঙতে ভাঙতে যায় গোলা ও নবান্ন নদী, যদি
প্রত্যেকে শিকড়ে শিকড় জুড়ে মাটি আঁকড়ে না হয় সাবধানী,
সামর্থ্য বাসনা ঢেলে যদি বা না হয়ে ওঠে বাঁধ
অর্থাৎ সুন্দরবন
খরস্রোতা কাল খাবে মানুষের চাষবাস সম্পর্ক এবং
আদিগন্ত জল রবে, তেষ্টা মেটানোর যার থাকবে না একছিটে যোগ্যতা।

বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী সকলেই জানে :
সুচেতনা মানুষকে ছেড়েছে বলেই
সব নদী—এমনকি ধানসিঁড়ি নদীটিও রাক্ষসী বনেছে—
বনলতা সেন সহ নাটোর ও ভুবনডাঙা গিলেই চলেছে।

মর্ত্য মানে

কমলেশ সেন

একটা উদাস কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে

বাগানে সদ্য-ফোটা কোনো ফুলের অকাল মৃত্যুবরণের মতো

সাতসকালে কথাগুলি আমার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়
আমাকে ডাকে,
মশায়, সারা রাত জেগে কাটিয়েছি
আপনার দাওয়ায় একটু ঘুমোবার অনুমতি দিলে...

উঠোনে তখন আমার পোষা কুকুরগুলি
প্রচণ্ড ঘেউঘেউ করে উঠলো

আমি বললাম, দাওয়ায় নয়,
আমার উঠোনে ঐ স্থলপদ্মের গাছের নিচে
তুমি ঘুমোতে পার

আমার গোয়ালঘর থেকে বাছুরটা ঘুমঘুম চোখে
বেরিয়ে এলো,
হাওয়ায় একবার ডিগবাজি খেল
ওর চারটে পা যেন
চার আটি সজনের সবুজ ডাটা

আমি কিছু বলার আগেই
হাওয়ায় দুলে উঠলো স্থলপদ্মের গাছটা
গাছের আবডাল থেকে ভেসে এলো একটা হলুদ পাখির শিস্

কুকুর স্থলপদ্ম গোয়ালঘর বাছুর
সজনের ডাটার মতো কচি কচি পা
হলুদ পাখির শিস
এসব কিছুর সাথে ঐ ভোরবেলায় উদাস কথাটির
সে কী ভাব বিনিময়

উনুনের এক কেটলি টগবগ জলে চা-পাতা দিয়ে
আমি চোখ দুটি থেকে নামাতে চাইলাম
আমার ঘুমঘুম ভাব

এমন ঘুমঘুম চোখের সাথে কখন, কিভাবে যেন
আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি

একটা কলম কানে গুঁজে মহাপণ্ডিতের মতো
আমি তাকে বললাম, তথাস্তু

এক কাপ চা ভাই, খেয়ে নাও

একটা ঘুম সবকিছুর আত্মাকেই জুড়িয়ে দেয়

হলুদ পাখিটি দু'পা পেছনে টান করে
মর্ত্যে নেমে আসে

মর্ত্য মানে, আমার এই এক চিলতে সখের উঠোন

উঠোন জুড়ে তখন হলুদ ফোটার একটা তীব্র গন্ধ।

মেধাবী ফতোয়া

মৃণাল বসুচৌধুরী

রাঙচিত্তিরের বেড়ার ওপরে
বসেছিল ক্লান্ত গিরগিটি
বহুদিন
মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে
রঙ বদলানো নিয়ে
তার কোন মনস্তাপ নেই
নেই কোন দায়ভাগ
পরিবর্তনের নামে
নেই কোন মেধাবী ফতোয়া

সে জানে
সাফল্য মানে বর্ণহীন বেঁচে থাকা নয়
একবর্ণ মানুষেরা
যতো প্রাকৃতিক আর
যতোই নমস্য হোক
সাম্রাজ্য গড়ার কাজে
রঙ ও মুখোশ আজ
ভীষণ জরুরী

কবিরাই পারে

অনন্ত দাশ

এ-সংসারে কবিরা মূল্যহীন
বলেছেন প্লেটো; দিয়েছে নির্বাসন
সময়ের বিষ পান ক'রে তবু কবি
একুশ শতকে সমান সংবেদন

স্বপ্নচারী সে নেই তাতে সন্দেহ
সত্যকে তবু বাঁধে কল্পনাজালে
প্রেরণার সাথে আবেগের মিশ্রণে
আকাশপাতাল ধরা থাকে চৌতালে

কবিরা কিভাবে বলবে বানানো কথা
বাতাসে যখন হিংসার বীজ ওড়ে
যুদ্ধ থেমেও থামে না কান্নারোল
সব লেখে কবি রক্তের অক্ষরে

দেশের যতই থাকুক বিদেশি ঋণ
কবিরাই পারে এনে দিতে শুভদিন

একটু আগুন, আর কিছু নয়

অরুণাভ দাশগুপ্ত

আঁধারের আল বেয়ে
কখনও বা
মুক্তির বহুবর্ণ বাসনায়
এক হিরণ্য-দিনের স্বপ্নে
বিভোর কবি শুধু হাঁটতেন
আর হাঁটতেন।
আর হাঁটবার সময়
এমন কথাগুলোকে তিনি পায়ের ওপর
দাঁড় করাতে চাইতেন
যা কখনও মিথ্যে বলে না।

মানুষ ফুলকে দিয়ে মিথ্যে বলায় বলেই
ফুল তাঁর সইতো না,
বরং এক টুকরো আগুন, আগুনের একটা ফুলকি
যার কোনো মুখোশ নেই, কোনো মিথ্যাচার নেই,
একটু আগুন
যা ফুলের সমস্ত ব্যথা নিমেষে ভুলিয়ে দেয়;

ছুটি হ'লে, কলমটা নামিয়ে রাখবার মুখে
কবির সাধ ছিল একটু আগুন, আর কিছু নয়।

ও সব তোমার কম্ম নয়

রূপক চক্রবর্তী

ওগো তোমায় ভারত-ছাড়ো দিব্যি
তোমায় মুরারিপুকুর বোমার মামলা দিব্যি
এ সব কথা কাউকে বোলো না, গা ছুঁয়ে, বলো গা ছুঁয়ে
চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান দিব্যি
কড়ে আঙুলে কামড় দিয়ে বলো, শত বীণা বেণু রবে বলো
আজ কলেজস্ট্রিটে বক্তৃতা দেবেন কাকা, ইদানীং ফ্রন্টে ফিরেছেন
আজ সব লাল হো যায়গা, সব্বাই বাম হয়ে যাবে,
এ রাজত্বে রাম বলে কিছু নেই, রাম নাম সত্ হ্যায়।
ওগো তোমায় বামফ্রন্টের দিব্যি
বিদেশি লগ্নি টানা, বিদেশ যাওয়া আর মউ-এর দিব্যি
আমার কথা শোনও—মাছে ভাতে থাকো, মার্ক্সবাদে থাকো,
কোনও ঝামেলায় যেও না প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্যোধন আর,
মাগুর ফিসের ঝোল, আর উরু ভেঙো না।
সবাইকে কি সব মানায়। ওই যেমন দেখছ না
সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে বসন্ত রায় রোডে
একমাথা কাশফুল ওড়াতে ওড়াতে দুনিয়ার মা-বাপহীন
ছেলেমেয়েদের নিয়ে কে যেন
একটু পা চালিয়ে চলেছেন।

ভালো পিসির অন্ত্যেষ্টি

মলয় দাশগুপ্ত

প্রিয়তোষের ফোন যখন আসে মনীষী তখন দাড়ি কামাচ্ছে। ঘরে আর কেউ ছিল না, কনক বাথরুমে আর রুণু কলেজে চলে গিয়েছে। দাড়ি কামানোর মধ্যেই ফোন ধরতে হয়। প্রিয়তোষ জানায় যে মা সকালে চা বিস্কুট খাওয়ার পরেই আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়ে, অজ্ঞান কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তার ডাকা হয়েছে, প্রিয়তোষ একা কী করবে ঠিক করতে পারছে না, মনীষী যদি একবার যায় তো ভালো হয়।

ফোন শুনতে শুনতেই কর্তব্য ঠিক করতে হয়। মনীষী জানতে চায় যে এমন কিছু ঘটেছিল কিনা যাতে সেকেন্ড স্ট্রোকটা এলেও আসতে পারে। প্রশ্ন শুনে ওপাশের কণ্ঠ কিছুক্ষণ নীরব থাকে, অস্বস্তির নীরবতা, তারপর ও জানায় যে তেমন কিছুই না।

মনীষী আর বিষয়টা নিয়ে এগোয় না। এ সময়ে ও নিয়ে এগোবার কোনো অর্থ হয় না বলেই এগোয় না। নাকের কাছে ফেপে ওঠা ক্রিমের ফেনা মুছতে মুছতে জানায় যে সে যাচ্ছে, তার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। কোন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে তাও জানতে চায় সে তখন। প্রিয়তোষ এ প্রশ্নেরও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না। না পারার জন্যই মনীষীর ধারণা হয় যে আদৌ ডাক্তার ডাকাই হয়নি, ঘাবড়ে গিয়ে আগে বলা মিথ্যেটাকে ম্যানেজ করতে পারছে না। প্রিয়তোষের ওপর রাগই হয়, তবু তা বুঝতে না দিয়ে নির্দেশের মতো স্বরে বলে যে ডাক্তার নিয়োগীকেই ডাকা উচিত, এ সময়েও পয়সা-কড়ির হিসেব করতে হয় না।

বাইরে নিঃশব্দ বৃষ্টি হচ্ছে। জানালা দিয়ে বৃষ্টিধারার দানাগুলি মাপতে চায় মনীষী, চোখে দেখেই বুঝতে হয় বৃষ্টির জোর কতটা। এখানে বৃষ্টি ধ্বনিময় নয়, দৃশ্যসীমার মধ্যে কোনো গাছ-গাছালি নেই যে ঝমঝমানি শুনবে, টাওয়ারের মতো বহুতলের সারি সারি বাড়ি বাতাসের শব্দও রুদ্ধ করে। ধ্বনিহীন বর্ষণ মাপার জন্য এখন দু'টি চোখ ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়। ধীরে ধীরে গালে রেজর চালায় আর মসৃণ হয় ত্বক। ওই বর্ষণ, ওই মসৃণ ত্বকের স্নিগ্ধতা, বর্ষা মেঘের আনত ছায়া হেতু ম্লান আলো—এ সবই পূর্বানুবৃত্ত, কেবল নিঃশব্দ ধারাপাতই একটা অভাববোধ আনে মনে। সেই অভাববোধ দূর করারই জন্য, নাকি ভালোপিসির আচ্ছন্নতার খবরের উদ্বেগ কাটানোর জন্য মনীষী ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে। ধূমপানের জন্য না, মন ভোলানোর জন্য প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দ্বারস্থ হওয়া। প্রিয়তোষের গলার স্বর আর বলার ধরনই বিপদের সঙ্কেত বলে মনে হচ্ছে। মন বলছে এ যাত্রা আর ফিরে আসা সম্ভব না। কেবলই না না বলে মাথা নাড়ছে মনের ভিতর মন। সিগারেট ফুরোতে ফুরোতে কনক বাথরুম থেকে বেরোয়। সময় নষ্ট না করে মনীষী বাথরুমে ঢোকে।

বাথরুম থেকে বেরোবার সময়ই কনক গান গাইছিল। ও গান গাইতে জানে, নিছক

বাথরুম সিঙ্গার নয়। মনীষী বেরিয়ে এসেও শোনে, কনক বেশ গানের মতো করেই গাইছে গান। বৃষ্টিধারার সঙ্গত নেই, তবু মেঘমল্লারে রবীন্দ্রসঙ্গীত মনের ওপর ঘন নিবিড় ছায়া ফেলে। সেই সান্দ্র মেদুরতার মধ্যেই বেশ বদলাতে বদলাতে মনীষী বলে, 'আমি এখন বেরোব, প্রিয় ফোন করেছে ভালোপিসি খুব ক্রিটিক্যাল।'

'খেয়ে যাবে তো কিছু?' নিরুদ্বেগ গলা কনকের।

মনীষী একটু ভাবে। এতক্ষণ গলায় যে বারিধারা ঝরছিল এখন তার লেশমাত্র অবশিষ্ট পায় না কণ্ঠে। মনীষী একটু ভাবে, তারপর বলে, 'হ্যাঁ, সারা দিনেরই হ্যাপা মনে হয়। বিষ্টিটা কনটিনিউ করলে তো আরো ক্যাচাং।'

চুল আচড়ানো, ক্রিম মাখা সেরে কনক এখন ভুরু পরখ করছে। গেঞ্জি গলিয়ে মনীষী এখন শার্ট পরছে। জানালার ওপারে বর্ষার দানাগুলি আরো ঘন হচ্ছে। খাবার ঘরে যেতে যেতে হাল্কা, গানের কলির মতো সুরেলা স্বরে বলে, 'কী হয়েছে ভালোপিসির? নতুন কোনো প্রবলেম?'

উত্তর দেবার উৎসাহ পায় না। কেন পায় না? তবু উত্তর দিতে হয়, 'প্রিয় একা কিছু ভেবে উঠতে পারছে না, সকাল থেকে অজ্ঞান—'

'যা ভুগছে...এখন—যাও, যেতে তা হয়ই।'

আবার সিগারেট ধরায়, বাইরে বৃষ্টি একটু ধরলে বেরোবে বলে অপেক্ষা করে, ব্যালকনিতে গিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর প্রসারিত করে দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ছাতা নিয়েই বেরোতে হয়। কিছুটা যাওয়ার পরে ট্যাক্সি পেয়ে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করে মনীষী। চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে ভালোপিসির মুখটা ভাসে মনে। ওর সঙ্গে আমার শৈশব একাকার হয়ে আছে। বিশাল ব্যাপ্ত একান্ন পরিবারে মায়েদের অনেক দায় যে কালে পিসিরা, এমনকী দিদিরাও ভাগ করে নিত এ সে কালের কথা। মনীষী ছিল ভালোপিসির ন্যাওটা, ভালোপিসি ছিল মনীষী-অন্ত প্রাণ। সে কালে এই ভাবেই এক এক পিসি এক এক জনকে গ্রাণ করে না নিলে বহুপ্রসবা মায়েদের পক্ষে সব দিক সামাল দিয়ে ছেলেপিলে মানুষ করা অসম্ভব হত। মা পিসিদের পিসিমা বলতে, কাকিদের কাকিমা বলতে শিখিয়েছিল। এতে সম্পর্ক াকি ঘন হয়, আঠা বাড়ে।

াসতে আসতেই বৃষ্টি ধরে আসছিল। পিসির বাড়িতে এসে তা একেবারে থেমে যায়। গল্ফ াবের বাঁ-পাশের রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোলে ওদের বাড়ি। জবরদখল কলোনি না, কলোনির াশে কয়েক ঘর কেনা জমির বাড়ির একটি পিসিদের। দেশভাগের পরে পরেই এ দেশে সে পিসেমশাই আর তার দাদারা কলোনিতে দখল করতে গিয়েছিল। কিন্তু ধাতে সয়নি। ই না সওয়ারও কতগুলি কারণ ছিল : প্রথমে কারণ অবশ্যই মনোবৃত্তি বা মানসিকতার। মিদার না হোক তালুকদারি তো ছিল তাদের। এক কথায় সে তালুক ছেড়ে চলে আসা ায়, তালুকদারি মনটাকে বিসর্জন দেওয়া অত সহজ না। দ্বিতীয়ত পিসেমশাইরা ভাইয়েরা কলে চাকরিজীবী, দু-ভাই তো সরকারি চাকুরেই। দখলকারীর মধ্যে একটা ভয়ের গন্ধ তারা েয়েছিল, দখল না করে তাই ক্রয় করেছিল জমি। সেই জমির ওপরে বাড়ি।

দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে মাথা নেড়ে জানতে চায় মনীষী, অবস্থা কেমন। মাথা নেড়েই প্রিয়তোষ বাড়ির ভেতরে আসতে বলে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে আসে একতলার বড় ঘরটায়। প্রিয় জানিয়েছিল, দোতলা করার পরে পুরো একতলাটা মায়ের জন্য রেখেছি, 'এ্যাটাচড্ বাথ' করা আছে। ভালোপিসি,. সেরিব্রাল স্ট্রোকে বাঁ-দিকটা পড়ে যাওয়া ভালোপিসি ডান পায় ভর দিয়ে, ডান হাতে দেয়াল ধরে ধরে ওই 'এ্যাটচড্ বাথ'-এ আসত। ছেচড়ে ছেচড়ে চলার ভঙ্গী দেখে অন্যদের অস্বস্তি হলেও ভালোপিসির নাকি কোনো অসুবিধা হত না, অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

এখন সেই বড় ঘরে, ভালোপিসির খাটে সটান শুয়ে আছে সে। প্রিয়তোষের সঙ্গে ঘরে ঢুকেই একটা একাকীত্বের ধাক্কা মনীষীর মনে এসে লাগে। একা, একেবারে রেখায় রেখায় চিত্রিত এক একলা মুখ, দূর থেকে বোঝার উপায় নেই জীবিত কী মৃত। কাছে, আরো কাছে গিয়ে মনীষী বোঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। বুক, খুব ধীরে হলেও, ওঠা নামা করছে। ধবধবে শাদা চুলের গুছি মুখের ওপর এসে পড়েছে, রোগে ক্লান্ত মুখের ওপর। মনীষীর মনে একাকীত্বের অসহায়তা বড় জোরে ধাক্কা দেয়।

: বসো। বলে ঘরের চেয়ার দেখায় প্রিয়তোষ।

মনীষী চেয়ারে না বসে খাটের পাশে বসে। ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর মুখ আনে, নাকের কাছে হাত রাখে, শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু হাতে স্পর্শ করে না। পাল্স্ দেখতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেয়। হাত সরিয়ে প্রিয়র দিকে তাকায়। সময় পেয়ে প্রিয়তোষ জানায়, 'ডাক্তার নিয়োগীকেই এনেছিলাম।'

'কী বলল ডাক্তার?'

'কোনো আশা দিতে পারল না। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলল।'

'হাসপাতালে নিলে সারভাইভ করার কোনো চান্স আছে বলল?'

'কিছুই বলেনি, হাসপাতালে নিয়ে দেখতে পারেন। এ রকম একটা হাফ-হার্টেড কথ আর কী।'

মনীষী আবার ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর। চোখের পাতা বন্ধ, কণ্ঠার কাছটা তিরতি কাঁপছে, 'সাড়া দেয়?'

না-বাচক মাথা নাড়ে প্রিয়তোষ।

'কী ঠিক করেছিস, হাসপাতালে নিবি?' মনীষী সময় নষ্ট করতে চায় না।

'আমি একা, ডিসিশন নিতে পারছি না। তুমি কী বলো?' মনীষী সোজা হয়ে বে একটু নীরব থাকে, নীরবতার ফাঁকে কিছু ভাবে, ভাবতেই হয় এবং বলে, 'ঊর্মি কোথা দেখছি না তো?'

'ও মেয়েকে স্কুল-বাসে ওঠাতে গেছে। এই এক্ষুনি আসবে।'

মনীষী আরো অন্ধকার খাদে পড়ার অনুভূতি পায়। কিছু বলার আগে ভাবে—' ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে প্রিয়র।' আহ্লাদে গলতে গলতে বলেছিল ভালোপিসি। 'ঠিক তোম মতন।' মেয়ে দেখে বলেছিল মনীষী, 'তোমাকে সবাই সুচিত্রা সেন বলে খেপাতো না সময়?' তখনও পিসির স্ট্রোক হয়নি। 'ফাজিল' বলে হেসে বাঁ-হাতেই মুঠিভরা আদুরে কি

দিয়েছিল পিঠে।

'আজ পাঠালি কেন?'

'কী নাকি উইক্‌লি টেস্ট, দরকার হলে পরীক্ষা দিয়েই চলে আসবে।' দরকার হলে মনে মনে পুনরুক্তি করে মনীষী। প্রকাশ্যে বলে, 'ডাক এ্যাম্বুলেন্স, হেরে গিয়ে মরে যাওয়ায় আমি বিশ্বাস করি না। লড়ার শেষ সুযোগটুকুও কাজে লাগাতে হয়।'

মনীষীর বেপরোয়া কথায়ও বল পায় প্রিয়তোষ। বল পায় নিজের ঘাড় থেকে অন্য একটা ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। মনীদাদার কথামতোই কাজ করবে সে। এ্যাম্বুলেন্স আনার তোড়জোর শুরু হয়।

এরই মধ্যে প্রিয়র খুড়তুতো দু-ভাই আসে। ওরা খুব দূরে থাকে না, প্রিয়ই সম্ভবত ওদের ডেকে এনেছে। মনীষীর সঙ্গে দূরত্ব রেখেই দু-চারটে বাক্য বিনিময় হয়। এবং এই অবকাশে আকাশ পুনরায় মেঘে ছেয়ে যায়। মেঘচ্ছায়ে চলে আসে দিন। ঘরের ভেতরে শব্দ নেই, ঘরের ভেতরে এখন মৃত্যুর পাশে প্রাণ আর প্রাণের পাশে মৃত্যুর অবস্থান। যে যার নিজের এককত্বে ঢুকে থাকা তিনজন, নীরবতার প্রহরী তিনজন, শেষ হতে হতেও শেষ না হওয়া এক আত্মজনের প্রশ্বাস গুণছে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ঢেউ গোনার মতোই এ কাজ।

উর্মি এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে যেতে একবার বড়ঘরের সবাইকে, সব কিছুকে দেখে। প্রিয়তোষও কিছুক্ষণ বাদে ওপরে উঠে যায়। এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হল কিনা, ডাকা হলেও কতক্ষণে আসবে ইত্যাদি কিছুই জানা হয় না। অথচ সময় গড়ায়, একটি মানুষীর প্রাণ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকে।

মুখ মুছতে মুছতে প্রিয়তোষ সিঁড়ি ভেঙে নামে। আলগা শোনায় ওর কণ্ঠস্বর, 'তোমরা চা খাবে? উর্মি জানতে চাইছে।'

ঘরের তিনজনই তিনজনের দিকে তাকায়। ভালোপিসি খুব ভালো চা বানাতে পারত, আর ফুলকপির সিঙ্গারা। খা, গরম গরম খা না, যতদিন পারি—কতদিন আর পারব?

'না, এখন চা খাওয়ার সময় না।' তিনজনের হয়েই একজনকে বলতে হয়, সে একজন মনীষী।

'উর্মি বলছিল তাই।' বিড়বিড় করে, বোকা হাঁদার মতো মুখে বিড়বিড় করে প্রিয়তোষ।

এই চা খাওয়া না খাওয়ার বিসম্বাদের অবসরে ভালোপিসি কারোকে কিছু না জানিয়েই চলে যায়। চলে যায় সেখানে যেখানে মানুষ দ্বিতীয়বার যেতে পারে না।

এ জন্যই শ্রীমতী করুণা দত্তর মৃত্যুর ক্ষণটি অজানা রয়ে যায়। দিন দুপুরে স্বজন পরিবৃত মৃত্যুও যে এত নিঃশব্দে নীরবে হতে পারে তা ভালোপিসির নিষ্ক্রমণকে না দেখলে বোঝা যেত না। তবু একটাই মুখের কথা, শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যেই চলে যাওয়া সম্ভব হল।

ওরা তখনও মগ্ন ছিল যে যার নিজের মধ্যে। সেই নিমগ্নতা ভাঙে এ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ায়। প্রিয়তোষ দৌড়ে গিয়ে স্ট্রেচারসহ অ্যাম্বুলেন্সের লোককে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এ্যাম্বুলেন্সের দুই স্ট্রেচারবাহক আশ্বস্ত হয়, 'যাক বাঁচা গেল, পেশেন্ট একতলায় আছে। ঘরের দরজাও বেশ বড়।'

প্রিয়তোষ হেঁ হেঁ ঘাড় নাড়ে। আসা যাওয়ার পক্ষে তাদের দরজা জানালা যে স্পেশাস

এতে এ সময়েও অহং নন্দিত হয়।

তুষ্ট এ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা তখন খাটের নীচে স্ট্রেচার রাখে। 'একটু ধরুন তো' বলে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা মনীষীদের সাহায্য চায়। এবং সমবেতভাবে তুলে স্ট্রেচারে রাখার মুহূর্তেই আবিষ্কৃত হয় পেশেন্ট আর পেশেন্ট নেই ডেড-বডি হয়ে গিয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সেরই একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'একী, এ তো শেষ হয়ে গ্যাছে। ধড়ে প্রাণ নেই।'

সত্যিই ধড়ের প্রাণ অবসিত। চোখের তারা দৃষ্টির সকল রহস্য ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে, ঠোঁট পাথুরে নির্বিকারত্বে সমাহিত, হাত-পা দ্রুত উষ্ণতা হারাতে শুরু করেছে। বায়ু আর তার জন্য প্রবাহিত হবে না, সিন্ধু আর মধু ক্ষরণ করবে না, কারোর বোঝা হতে হবে না আর।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে ক'টার সময় মারা গেল মা?'

কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখে মনীষী বলে, 'এখন বারোটা-দশ, এই সময়ই মৃত্যুর ক্ষণ। জীবিতরা যখন বুঝতে পারে প্রাণ নেই, সেটাই মৃত্যু-ক্ষণ হয়। ভালোপিসি বারোটা দশে গত হয়েছে।'

মৃত্যুর পরে যা যা করা হয় তা তা করার জন্য তৎপরতা বাড়ে। আত্মীয়দের ফোনেই খবরটা দেওয়া হয়। কেউ কেউ আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানতে চায়, কতক্ষণ রাখা হবে। জানানো হয় যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো, কারো জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

প্রিয়তোষ তার এক খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায় ডেথ সার্টিফিকেট আনার জন্য। না দেখে ডাক্তার কি সার্টিফিকেট দেবে? এমন একটা সংশয় থাকেই। প্রিয়তোষ না ফেরা পর্যন্ত—জানা যাবে না ডাক্তার কী করবে।

মৃত্যুর সংবাদ শুনে ভিড় করে আসার মতো ঘটনা ঘটে না। মনীষীর ছোট দুই ভাই আসে প্রায় এক ঘণ্টা পরে। বাচ্চু, যার পোশাকি নাম ঋষি তাকে প্রায় ছ-মাস বাদে দেখল মনীষী। ফোনে ফোনে কথা হলেও চোখে দেখা আজকাল আর হয় কোথায়? ঋষি ওর চেয়ে পাক্কা এগারো বছরের ছোট, এক সময়ে ভাইয়ের ওপর বাৎসল্য স্নেহই ছিল। এখন ঋষি কেন দূরে সরে গিয়েছে বুঝতে চায় না মনীষী, কেবল ভালোপিসির সব ছুঁয়ে বসে থেকে তার শীর্ণ বুড়োটে ভাইকে জিজ্ঞেস করে, তোরা ভালো আছিস তো?

ঋষি ভালোপিসির মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মাথা নাড়ে। মুখে কথা কয় না। ঋষি আর শশী এই দু-ভাই ছাড়াও এসেছে প্রিয়তোষের জ্যেঠার দুই ছেলে কান্ত আর বদু। আর একজন, ভালোপিসি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যার গুণে মুগ্ধ হয়ে সারা জীবন নিজের ছেলেদের তারই আদলে গড়তে চেয়েছিলেন সেই শঙ্করনাথ। শঙ্কর পিসেমশাইয়েরও জ্যেঠামণির ছেলে, সে অর্থে প্রিয়তোষের কাকুমণি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এইসব আত্মীয়রা আসে। তবু বড় ঘর ভর্তি হয় না, ফাঁকা থেকে যায় অনেকটাই। শঙ্করনাথ মনীষীর চেয়েও বছর পাঁচেকের বড়, বয়সের হিসেবে বলতে গেলে সবার বড় তিনিই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, অবসরের পর কী করেন জানে না মনীষী।

আসলে শঙ্করনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই মনীষীর। ভালোপিসির মুখেই সারা জীবন

শঙ্করের কথা শুনেছে। শঙ্কর যে কত ব্রিলিয়ান্ট, কত ভালো তা শুনে শুনে একটা 'ফিগার' গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে। আজ প্রিয়র এতগুলি ভাইয়ের মধ্য থেকে ঠিক শঙ্করকে বেছে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। বয়েসের রেখা দিয়ে তো আর সবাইকে মাপা যায় না, সুখের একটা কাজই মুখের প্রশান্তি বজায় রাখা। প্রিয়তোষের দাদারা যারা এসেছে তারা সবাই বিত্তে আর বিত্ত অন্বেষণের ক্ষেত্রে সুখীই। মনীষী অহেতুক চেষ্টা করে না তাদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের।

একজন প্রিয়তোষের খোঁজ নেয়। একজন উর্মির খোঁজ নেয়। একজন ওদের মেয়ের খোঁজ নেয়। কারণ এদের একজনও এখন এ ঘরে নেই। তখন ওরা নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে থাকে, 'মেজো কাকিমার শেষ দিনগুলি বড় কষ্টে কেটেছে।'

'যাক, বাঁচল এতদিন পরে। ও ভাবে পড়ে থাকা।'

'দশ বছর তো, হ্যাঁ দশ বছর। লাট্টু যখন মাধ্যমিক দিল তখনও তো মেজোবৌদি বেড-রিডন্‌ই। সেও তো আট বছর পেরিয়ে গেল।'

মনীষী মনে মনে বুঝতে চায়, এ-ই তা হলে শঙ্করনাথ। এরই ছেলে আট-ন বছর আগে মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল। হ্যাঁ, টি. ভি-তে এর পরিতৃপ্ত ছবিই তো—ঝিলিক দিয়ে ওঠে মস্তিষ্কে। মনীষী পূর্ণায়ত দৃষ্টিতে তাকায় শঙ্করনাথের দিকে। ভালোপিসির শ্বশুরবাড়ির আইডল। যাকে ঘিরে এক ধরনের ভালোবাসা ছিল করুণা বসুর মনে, দত্ত পদবি বদলে বসু হওয়া বসু পরিবারের. সেই ষোড়শী বধূটিকে দেখতে পেলে এখন বড় ভালো হত। এই-ই যদি শঙ্করনাথ হন তো তিনি বড় ভালো কাজ করেছেন, ভালোবাসার টানে বয়সকে অগ্রাহ্য করার মতো ভালো কাজ।

এ সময়েই বাস্তবি তো বাজ মনীষীর পকেটের ফোনটি বেজে ওঠে। ঝন্‌ঝন্ শব্দ পরিবেশকে চকিত করে। বিব্রত মনীষী 'কল' নিতে নিতে প্রায় ছুটে বাইরে চলে আসে। ফুটপাথ ঘেঁসে একটি লম্বা গাছ, তারই তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলে, কনক বলছে ওপার থেকে, 'তুমি মিস্টার কর্মকারকে আসতে বলেছিলে?'

'কোন কর্মকার। ফার্স্ট নেমটা বল।'

'ফার্স্ট নেমটেম বলেনি, মিস্টার কর্মকার বলছে।'

'ওহ্ হো, ভজহরি, নাম বলতে চায় না, ও কি এখনও বসে আছে?'

'হ্যাঁ, তুমি কখন আসবে?'

'শোনো, ভালোপিসি নেই। এখানে লোকজন কম, শ্মশানে যেতে হতে পারে।'

'সে কী?' আর্তনাদ করে ওঠে কনক, 'তুমি আমাকে জানাওনি এতক্ষণ কী ভাবো তুমি আমাকে?'

মনীষী সত্যিই অপরাধী হয়ে পড়ে, 'জানানো উচিত ছিল। তুমি ভজহরিকে কাটিয়ে দাও, পরে আসতে বল।'

'আ এ্যাম ভেরি মাচ্ শক্‌ড্ মনী। তুমি আমাকে কী ভাবো বল তো? আমি কারোকে কাটাতে-ফাটাতে পারব না।'

'তা'লে একটা কাজ করো,' বলে কিছুক্ষণ থামে, 'মিস্টার কর্মকারকে ফোনটা দাও।'

বাস্তবিক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আসলে এইসব মুহূর্তে, পুরো সময়টাই মন জুড়ে ছিল

ভালোপিসি, তাও মারাত্মক ভুল—ভুল কেন? অন্যায়, কনককে না জানানো অন্যায়। এইসব ভাবতে ভাবতেই আবার কনকের গলা, 'ওকে বলেছি সব। শুনে নিজেই চলে গেল, কাল আবার আসবে, খুব জরুরি নাকি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া।'

মোবাইল অফ করতে করতে মনীষী নিজের মনে নিজেকেই শোনায়, সব এন.জি.ও করবে। ভজহরি, সেও এন্. জি.ও-র চেয়ারম্যান। স্পষ্ট বিরক্তি নিয়ে ভালোপিসির ঘরে আর যেতে চায় না। সিগারেট ধরিয়ে পুরো সিগারেটটা শেষ করে, একটু শান্ত হয়। তারপর আবার পিসির খাটের পাশে।

প্রিয়তোষ ফিরে এসেছে সার্টিফিকেট নিয়ে। চারঘণ্টা অপেক্ষা করতে চেয়েছিল ডাক্তার। একটু চাপাচাপি করায় দু-ঘণ্টাতেই রাজি হয়েছে। খাট, ফুল-মালা, অগরু আর খই আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে সেই। গরচায় ফোন করে শ্মশানযাত্রার শববাহী-শকটের ব্যবস্থাও পাকা, ওরা এসে পড়ল বলে। এলেই, আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া।

পরিবারের মেয়েরা দু-চারজন এসেছে, প্রিয়তোষের শাশুড়ি আর শালিও হাজির। থুম্বো মুখে বসে আছে ওরা।

মনীষীর হঠাৎ মনে হয়, কারো চোখে জল নেই। কেউ একজনও কাঁদল না ভালোপিসির জন্য। আমিও না। ভালোপিসির জন্য একদল রুদালীর বড় প্রয়োজন ছিল। ভাবতে ভাবতে তন্ময় মনীষী দেখছে তার বাবার মৃতদেহের পাশে হাপুস কান্নায় ভেঙে পড়ছে ভালোপিসি করুণা। এ ক'দিনের মধ্যেই মানুষের চোখের জল শুকিয়ে যায়?

শঙ্করনাথ ধীরে ধীরে মনীষীর পাশে এসে বলে, 'একটু বাইরে আসুন।'

বাইরে এলে জিজ্ঞেস করেন, 'অনুকে জানানো হয়েছে? জানেন কিছু?'

মনীষী স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে, 'অনুকে জানানো হবে না কেন?'

'কে জানিয়েছে?'

'ঠিক বলতে পারব না, কেউ একজন তো জানিয়েছেই।'

মাটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখকে আরো গম্ভীর করে শঙ্কর বলে, 'প্রিয়কে ডেকে জেনে নিন না একবার। আমার একটু অসুবিধা আছে।'

মনীষী প্রিয়তোষকে ডাকে, 'অনুকে জানিয়েছিস?'

প্রিয় চুপ করে থাকে।

'সে কী, মা-এর মৃত্যুসংবাদ জানবে না ছেলে? কেন জানানো হয়নি?'

'এবার কেঁদে ফেলে প্রিয়তোষ, প্রায় ফুঁপিয়ে কান্না, 'অনু আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। যা-তা বলে লোকের কাছে। তুমি শঙ্করকাকুকে জিজ্ঞেস কর।'

'সব মানছি। তোরা একজনকে আর একজন, তোদের বউরা একজনকে আর একজন সইতে পারে না। কেন পারে না তা জানতে চাই না। কিন্তু এ খবরটা, খুব অন্যায়, খুব অন্যায়।'

চোখ মুছে আরক্ত চোখেই বলে প্রিয়তোষ, 'আমার গলা পেলেই ফোন নামিয়ে রাখবে, কথা শুনবেই না। তাছাড়া পুনে থেকে তো আর আসতে পারবে না। পরে জানালেও ক্ষতি নেই।'

সব শুনে শঙ্করনাথ বললেন, ঠিক আছে, আমিই ফোনটা করছি। আমার গলা শুনলে তো আর ফোন নামিয়ে রাখবে না।'

বাঁধাছাদা হয়ে গেলে, ফুল-মালা দেওয়ার পরে মৃদু হরিধ্বনি ওঠে। চলো, গাড়িতে চাপাও।'

গাড়িতে চাপানোর পরেও চলা হয় না। ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে, বাধাটা সেজন্যে না। কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে জল্পনা। কেওড়াতলা না শিরিটি, কোন শ্মশানে?

'আমাদের এখান থেকে একই ডিসট্যান্স। কেওড়তলায় ভিড় হবে খুব।'

'তা'লে শিরিটি চলো। কেওড়াতলার জ্যামে পড়ে গেলে অনেক রাত—, প্রিয় তোর কোনো সংস্কার নেই তো?'

প্রিয় ঘাড় নাড়ে, 'সংস্কার আবার কী?'

'তা'লে শিরিটিই। তাড়াতাড়ি হবে।'

শিরিটি শ্মশানে গিয়ে প্রমাণিত হয়, লাক ভালো। এইমাত্র একজনের অস্থিভস্ম বার করা হয়েছে। এখন একদম খাঁ খাঁ শ্মশান। মৃতদেহের জ্যাম না, মৃতের জন্য কান্নার রোল না। বড় শান্তির আগুনের ভেলায় চাপলেন করুণাদেব্যা। এ গঙ্গায় জল না থাকায় ওঁ শান্তি বলাটা হল না কেবল।

ডোভার লেনে থাকে ডাক্তার অনীশ, প্রিয়তোষের এক খুড়তুতো ভাই। ডাক্তার গাড়ি নিয়ে এসেছে। শঙ্করনাথ মনীষীকে ডেকে বলল, 'আসুন আপনি তো ও দিকেই যাবেন, আমি যাদবপুর সেন্ট্রাল রোডে, আপনি?'

মনীষী একটু অবাক হয়ে বলে, 'আমাকে বলছেন? আমি তো অম্বুজা-কমপ্লেক্স।'

'আসুন, একই দিকে যখন অনি আমাদের লিফ্‌ট্ দেবে।'

এমন আন্তরিকভাবে বললে না বলা যায় না। ডাক্তার গাড়ি চালাচ্ছে, মনীষী শঙ্করের পাশে বসেছে। আলাপে আলাপে অনেক দূর চলে যায় ওরা, সবই অতীতের, সবই স্মৃতির কথা। ওরা দুজনেই ইচ্ছে করে ভালোপিসি করুণার কথা বলতে বলতে সারাটা পথ আসে।

গাড়ি আনোয়ার শাহ্ রোড হয়ে যাদবপুর থানায় এলে শঙ্করনাথ অনীশকে বলে, 'তুই সাজা বাড়ি চলে যা, আমাদের এখানে নামিয়ে দে।'

'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে—।'

'না, আমি ওর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে যাব। তুই ডাক্তার, তোর রোগীরা বসে থাকবে।'

গাড়ি ঘুরে দাঁড়ায়। শঙ্করনাথ বলে, 'এবার আর আপনি না, তুমি। তোমার চেয়ে আমি অনেকটাই বড়।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে, আলোয় আলোকিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ। মনীষীকে পাশে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শঙ্করনাথ বললেন, 'এ পথটা আমার খুব ভালো লাগে। মাথার ওপরে কত গাছ দেখো।'

মনীষী কেবল গাছই দেখে না। অজস্র পাখির কাকলি শুনতে পায়। সেই গাছের মধ্য

দিয়ে পাখির গান শুনতে শুনতে একেবারে ভুলে যায় নিজেকে।

শঙ্করনাথ বলে, 'দেখেছ, কত পাখি, কী কেমন লাগছে?'

'বাহ্, ভারী চমৎকার।' উচ্ছ্বাসের ভাষা পায় না মনীষী।

'কাছাকাছি আর এমন পাখি-ডাকা পথ পাবে না। সব পাখি পালিয়েছে। তুমি এখন যেখানে থাক ওখানটা কী ছিল জানো?'

'জলা ছিল, বিশাল ওয়েটল্যান্ড—।'

'শুধু ওয়েট-ল্যান্ড বললে তো চলবে না। নয়াবাদ, হোসেনপুর, আনন্দপুর, এখনকার পঞ্চ সায়র, কালিকাপুর পুরো অঞ্চলটা ছিল পাখিদের জন্য। মাইগ্রেটরি বার্ড—কত রকমের পাখি যে আসত। এখন কি পাখি দেখো তোমাদের কম্‌প্লেক্সে?'

'পাখি কোথায়? ইট-পাথর আর পিচ, সারি সারি টাওয়ারের মতো বাড়ি। কোথায় বসবে পাখি?'

শঙ্করনাথ হাঁটতে হাঁটতে বলেন, 'মাইগ্রেটরি পাখির ওপর রিসার্চ চালিয়ে দেখা গেছে যেখানে যেখানে মানুষ ওদের প্রতিকূল অবস্থা গড়েছে সেখানে সেখানে আসা বন্ধ করেছে ওরা। নির্দয় মানুষের সঙ্গে পাখিরা সম্পর্ক রাখে না।'

থেমে পড়ে মনীষী জিজ্ঞেস করে, 'ভালোপিসিও আর ফিরে আসবে না, তাই না?'

ভূমি নেই

শচীন দাশ

রাত গভীরের আকাশটা এখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। এমন যে দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট নয়। যেন চরাচর জুড়ে নিঃশব্দে কুয়াশার একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। হয়তো কোনো জাদুকর, আর দিয়েই সে সবার আড়ালে কোথায়ও এবং সেখানে দাঁড়িয়েই হাত তুলে হাতের ওপর ফুঁ দিয়ে তৈরি করে চলেছে রহস্যময় এক কুয়াশার জগৎ। না হলে গত দু'পাঁচ বছরে এমন তো চোখে পড়েনি কোনোদিন। কুয়াশার এমন রহস্যও দেখেনি। উড়ে উড়ে ও উড়তে উড়তে, ঘুরে ঘুরে ও ঘুরতে ঘুরতে জমাট বেঁধে গোটা দেশটাকেই বুঝি গ্রাস করে ফেলবে এখুনি। যদি করে, বা করার আশঙ্কায় এই মুহূর্তেই এখন স্থির রফিকুল। তাছাড়া ভয়ও হচ্ছিল, এখন সে যাবে কোথায়, কোনদিকে। কুয়াশা না সরলে বাকি রাতটা তো এখানেই কাটিয়ে দিতে হবে ঠায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে এমন কনকনে ঠাণ্ডার ভেতরে। তাছাড়া একটানা কি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

রফিকুল এগোবার চেষ্টা করে। আন্দাজে খানিকটা এগিয়েও যায়। কিন্তু পা ফেলতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়ায়। সামনে কী আছে, ফাঁকা মাঠ না শস্য প্রান্তর? ধান না সর্ষে লাগানো হয়েছে সে প্রান্তরে। ন্যাকি কোনো জলাভূমি? না মাঠের ভেতরের কোনো লিক-পথ। কিংবা নদীখাতও হতে পারে। খাত হলে ঠিক আছে। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়াতে পারবে সে। কিন্তু যদি বিল হয়? অথবা বাওর। আন্দাজে পা ফেলে ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে যায় রফিকুল। এখন সে যাবে কোনদিকে? খবর যা সংগ্রহ করেছে, সংগ্রহ ঠিক নয়, প্রায় পড়ে পাওয়াই বলা যায়, বি. ডি. আরের ওই জওয়ানটাই তো বলছিল তখন ওর পাছায় একটা লাথি কষিয়ে : যা. হালায়, ঢুইক্যা পড় অহনে ইন্ডিয়ার খোন্দলে। ওই ৮৫ পিলারের পাশ দিয়াই হান্দাইয়া যা। যা কুয়াশ লাগছে ওই বি. এস. এফের বাপের সাধ্য নাই তরে ধরে। আর একবার যদি চোখকান বুইজ্যা কোনোকিছু ধইর‍্যা উত্তরে যাইতে পারস তো কেল্লাফতে। বারসই দিয়া সোজা বিহারে ঢুইক্যা যাবি। বাস্ তরে আর পায় কে? এক্কারে চুপচাপ বিশটা বচ্ছর। যা হালায়—বলতে বলতে রাইফেলের কুঁদোয় এক ধাক্কা। আর ওই ধাক্কাতেই একদম ৮৫ পিলার। এবং সেই থেকেই হাঁটছে। কিন্তু হাঁটলেও পা যেন রাখতে পারছিল না। একে কনকনে ঠাণ্ডা তার ওপর নাকমুখ দিয়ে অনবরত কুয়াশা ঢুকে যাওয়ায় শরীরটা তার কাঁপছিল। পাতলা একটা জামার ওপরে সামান্য একটা চাদরে কি আর এ ঠাণ্ডা রাখা যায়। তবু চাদরটা মাথায় তুলে দিয়েছিল। দিয়ে একরকম জড়িয়েই নিয়েছিল মাথাটা। আর তারপরেই পা রাখছিল আস্তে আস্তে, সীমানার এপারে। কিন্তু সবটাই অনুমানে। অথচ একটু আগে বি. ডি. আরের জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ার পর, এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে করতে প্রায় মারধোর করেই যখন ওকে ইন্ডিয়ায় ঢুকিয়ে দিল তখনো কিন্তু কুয়াশা এত গভীর ছিল না। অন্ধকার থাকলেও দু'পাশে ঘরবাড়ির চিহ্ন চোখে পড়ছিল।

ভাসছিল চোখে, টিমটিমে আলোর উপস্থিতি। টের পাওয়া যাচ্ছিল খানাখন্দ, পচা ডোবা আর কাঁচামাটির রাস্তা। শোনা যাচ্ছিল মানুষজনের কথাবার্তা ও হাঁকডাক। কিন্তু এরপরে হঠাৎই গভীর এক অন্ধকার। আর সে অন্ধকারে আচমকা যেন উড়ে এল কুয়াশার হিমগুঁড়ি। হিমগুঁড়ি জমল। জমতে জমতেই যেন রহস্যময় এক জমাট পৃথিবী। হাঁটছিল রফিকুল। হঠাৎই এই সময়ে আচমকা এক ধাক্কা। হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল যেন কুয়াশার গভীরে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিতেই হাতের সামনে কিছু একটা ঠেকে গেল। রফিকুল টের-পেল একটা গাছ। বেশ বড়সড়ই হবে, কেননা, প্রসারিত হাতেও গুঁড়িটার ঠিক নাগাল পাওয়া গেল না। রফিকুল তবু দু'হাত বাড়িয়ে মোটা গুঁড়ির গায়ে হাত রাখল। সন্তর্পণে এরপর গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। হাত গেল না তার গুঁড়ির দু'পাশে। তবে স্পর্শে বুঝল, গুঁড়ির গায়ের শুকনো বল্কলে এখন হিমের ছোঁয়া। জল গড়াচ্ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। মাথার ওপরের পাতা থেকেও বুঝি টুপটাপ জল ঝরে পড়ার শব্দ।

বাঁদিকে পা নামিয়ে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে সরে গেল রফিকুল। আর ওই তখনই ঝপ করে একটা হলদে আলো। কুয়াশা ভেদ করে আচমকা যেন ঠিকরে পড়ল। পড়তেই চকিতে আবার সরে এল রফিকুল। চট করে গুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে গুঁড়িরই গায়ে যেন আঁকড়ে রইল একটা লতানো গাছের মতো। এবং সেই সঙ্গে নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ প্রায়।

চেপেই রেখেছিল নিঃশ্বাসটা। এই সময়েই টর্চের আলোটা যেন নিভল। আবার জ্বলেও উঠল একটু পরে। রফিকুলের চোখে পড়ল, জোরালো আলোটা গাছ ও গাছের গুঁড়িকে মাঝখানে রেখে দু'দিকে দুটি রেখা এঁকে যেন ছিটকে পড়েছে। পাশাপাশি শব্দও একটা কানে আসছিল তার। শব্দটা নিশ্চয়ই কোনো পায়ের সম্ভবত সে পায়ে কোনো জুতোও আছে। না হলে শব্দ কেন এমন ভারী হয়ে উঠছে।

ভারী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলোটা এখন ঘুরছে আশেপাশে। কুয়াশার গভীরে। কিন্তু থই পাচ্ছে না তেমন। কোনো অবয়বই ধরা পড়ছে না সে আলোয়। পড়ত যদি গাছের আড়ালে না থাকত রফিকুল। এবং পড়বে না যে তা-ও বলা যাচ্ছে না। কেননা আলোটা ফেলতে ফেলতে এদিকে এলেই সে একসময় ধরা পড়ে যাবে। অবশ্য যেভাবে গাছের গুঁড়িতে পোকার মতো সেঁটে আছে রফিকুল তাতে খুঁজে বার করাই তাকে মুশকিল এখন। কেননা আশেপাশে সারিবন্দি গাছ, গাছেরই ঝোপঝাড় আর শুকনো স্তূপীকৃত পাতা। আর আচমকা আলোর ঝলকানিতে যেটুকু চোখে পড়েছিল একটু আগে, তাতেই বুঝেছিল এটা একটা বাগান। সে এসে এমনই এক বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

টর্চের আলোটা নিভল। নিভেই আবার জ্বলে উঠল। জ্বলতে জ্বলতেই এরপর ঘুরল আবার পেছনের দিকে। তারপর দূরে সরে যেতে লাগল কেঁপে কেঁপে। আলোর একটা ঢেউ তুলে।

কা ভাই কুছ মিলা?

রফিকুল শুনল দু'তিনটে শব্দ। টুপটাপ জলের ফোঁটার মতো পাতার ওপরে পড়ে যেন কুয়াশার ভেতরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যেতে যেতেও যেন ভেসে আসছে আবার দূর থেকে।

নেহী ভাই—

লেকিন আওয়াজ তো শুনা।

হ্যাঁ, ম্যায় ভি শুনা—। লেকিন কাঁহা গেইল ও আদমি?

শব্দেরা চুপ। আলোর রেখা যত মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দকটিও দ্রুত তত হারাবার পথে। বাগান পেরিয়ে সরে যেতে যেতে দূরে কুয়াশার ভেতরে একসময় যেন মিলিয়ে গেল।

কোথায়ও একটা রাতপাখি ডেকে যাচ্ছিল। সম্ভবত ওর মাথার ওপরে। চোখ তুলে একবার দেখার চেষ্টা করেও না দেখতে পেয়ে রফিকুল এবারে সোজা হল। কান খাড়া করে যেন কিছু শুনতে চাইল কুয়াশার গভীরে। এবং কোনো কিছু কানে না আসায়, এখন অন্তত এটুকু নিশ্চিত যে ধারে কাছে আর সেই জওয়ান দুটোর কেউ কোথায়ও নেই। অনুমানে, পা বাড়িয়ে, আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল আবার রফিকুল।

হাঁটল তবে হাতদুটো বাড়িয়ে, মাঝে মধ্যে। আর ওই বাড়ানো হাতের নাগালে এসে যাচ্ছিল কখনো কখনো কোনো গাছের গুঁড়ি ও ঝোপঝাড়। পায়ের তলায় পড়ছিল শুকনো পাতা ও নরম মাটি। কুয়াশায় ভিজে সে মাটিও কোথায়ও কোথায়ও পিচ্ছিল প্রায়।

পা চেপে চেপে, যতটা সম্ভব নৈঃশব্দ বজায় রেখে হাঁটছিল রফিকুল। এবং অনেকক্ষণ ও অনেকটা সময় ধরে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে ঠেকল, হাত বাড়িয়ে বুঝল সেটা একটা মাটির দেওয়াল। তার মানে কোনো বাড়িরই পেছনের অংশ। রফিকুল হাত বাড়িয়ে ও হাতের তালু চেপে চেপে দেওয়ালের বিস্তৃতি বোঝার চেষ্টা করল। ফলে সে ঘুরে এল দেওয়ালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত এবং এরপরেই বসে পড়ল যেন কী ভেবে। আসলে যত না ভাবা তার চেয়ে শারীরিক ক্লান্তির ব্যাপারটা এত বেশি যে নিজের অজান্তেই কখন বসে পড়েছে ঝুপ করে। বসেই দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে যুগপৎ অন্ধকার ও কুয়াশা জরিপ করার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি আবার এ-ও মনে হয়েছে : কাল সকালে তার অবস্থানটি কী হবে? কেননা সে যে ইতিমধ্যেই কোনো লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে এতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু এ লোকালয় থেকে বেরোতে গেলেই তো আবার বি. এস. এফের খপ্পরে পড়ে যাবে। আর পড়লেই আবারো সেই রাইফেলের গুঁতোয় সীমানার ওপারে। এভাবেই তো মাস দুইয়েক আগে ধরা পড়ে রাতের অন্ধকারেই একদিন এক লাথিতে অন্য এক দেশ। বর্ডার থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে এক অজ পাড়া গাঁ-র ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল বি. এস. এফেরই দু'তিনটে জওয়ান। পকেটে ক'টা টাকা ছিল। ক'দিন আগে রাস্তা মেরামতির কাজে লেগে ঠিকাদারের কাছ থেকেই পেয়েছিল। ঢুকিয়ে দেবার সময় সেটাই কোমর হাতড়ে তুলে নিয়েছে। ফলে ভুখা রফিকুল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছিল বি. ডি. আরের চোখ বাঁচিয়ে। কিন্তু সে আর ক'টাদিন। দু'রাত পরেই তো আচমকা কাল দুপুরে ধরা পড়ল হঠাৎ করে।

মাথার চাদরটা আরো টেনে, চাদরে নাকমুখ ঢেকে কুয়াশা আড়াল করার চেষ্টা করছিল রফিকুল। হঠাৎ এই সময়েই একটা শব্দ। চমকে উঠলেও রফিকুল টের পেল কোনো মানুষ নয়, হয়তো কাছাকাছি কোনো গাছটাছ থেকে কিছু পড়েছে। রফিকুল তাকাল এদিকে ওদিকে। কিন্তু তাকালেও কি দেখা যায়? তবে ভোর বোধহয় হয়ে আসছে মনে হয়। না হলে এত আলো এল কী করে। আর কুয়াশাই বা এত স্পষ্ট হয়ে উঠল কেন?

রফিকুল উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। আর ওই তখনই তাকিয়ে বুঝল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা বাড়িই, বাড়ি তো বটেই তবে পেছনের দিক নয়, পাশের অংশ। এবং তারই ছেঁচতলায় সে বসেছিল এতক্ষণ। ওপরে টিনের চালা, তা থেকে ফোঁটা কুয়াশার জলও পড়ছে এখনো।

ছেঁচতলার ধার ঘেঁষে একটু একটু করে এগিয়ে গেল রফিকুল। সন্তর্পণেই পাড়ার ভেতরে ঢুকতে লাগল। না ঢুকে আর এখন উপায় নেই ওর। বরং এখানে এভাবে বসে থাকলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে কোনোরকমে এই বর্ডার অঞ্চলটা পার হলেই ও নিশ্চিন্ত এ রকম। কিন্তু এ জায়গাটা পার হওয়াই মুশকিল। ওদিকে বি. ডি. আরগুলো যেমন, তেমনি এদিকে বি. এস. এফ। অন্তত এ ক'দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, নজর ওদের যেন শকুনের মতোই তীক্ষ্ণ। গন্ধ একবার পেলেই হল। কাজেই কোনোরকমে একবার পেরোতে পারলে হয় জায়গাটা। কিন্তু পারবে কী করে! এমন কুয়াশা থাকলে অবশ্য বি. এস. এফের চোখে ধুলো দেওয়া যায় ঠিকই কিন্তু পালানোও বড় কঠিন হয়ে পড়ে। তবু চেষ্টা তো রফিকুলকে করতেই হবে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছিল এই সময়েই কার পায়ের আওয়াজ। রফিকুল চমকে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভেতর যেন একঝলক বিদ্যুৎ। ঝলসে উঠেই বুক কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল। মাটির দেওয়াল ঘেঁষে ছেঁচতলায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রফিকুল

একটা মেয়েছেলে। হাতে বালতিও আছে একটা। তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে হাত তুলে ঘোমটাটা নামিয়ে মুহূর্তেই নিশ্চুপ প্রায় এবং ওই তখনই যেন কুয়াশা ফুঁড়ে দুটি জওয়ান। পিঠে রাইফেল। পায়ে ভারী জুতো। শব্দ তুলে এসে সামনে দাঁড়াল।

ইধর কই আদমি ঘুষা!

বউটি মাথা নাড়ল ঘোমটা সমতে, আমি দেখিনি—

মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে জানায় বউটি।

ধেয়ান রাখনা। ঘুষলেই খবর দিবে। হামরা ক্যাম্পে আছি—

নিঃশ্বাস বন্ধই প্রায় রফিকুলের। জানে ধরা এখুনি পড়ে যাবে, যদি ভালো করে একবা ছেঁচতলার দিকে দৃষ্টিটা ফেরায়। কিন্তু না জওয়ান দু'জনের কেউ, না বউটি, নজর যে নেই এদিকে কারোরই। অথবা নজর পড়লেও কুয়াশার হিমগুঁড়িই তাদের ধন্দে ফেলেছে

চেপে নিঃশ্বাসটাকে আরো ধরে রাখতে যাচ্ছিল রফিকুল, এমন সময় জওয়ানদুটি যে এগিয়ে গেল। বলাবাহুল্য, বউটিও। ফলে রফিকুলও নড়ল এবারে। এমন ঠাণ্ডায়ও তা কপালে যেন ঘাম। ঘামেরই বিন্দু গলায় জমেছে। অথচ কুয়াশার অনবরত পতনে তার মাথা ওপরের চাদরটা ভিজে সপসপ করছে এখন। গায়ের জামাটাও যেন ভিজে উঠেছে।

ছেঁচতলা থেকে সরে এসে কোনদিকে যাবে, এমনই যখন ভাবছে, ঠিক তখুনি আবা যেন ভারী পায়ের শব্দ। ভয়ে চমকে উঠে, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আর কোনো উপা না দেখে, সামনে কার দাওয়ায় নিঃশব্দে বেড়ালের মতো লাফিয়ে উঠল রফিকুল। এরপ এপাশে-ওপাশে চোখ রেখে ঝটিতি দাওয়ারই এক কোণের একটা ঘেরা জায়গায় গিয়ে ঢুে

পড়ল। শব্দ বুঝি হল একটু তাতে। ফলে ঘরের ভেতর থেকে একটা গলা উঠল, কে—

রফিকুল চুপ। নিঃসাড়ে তখন দাওয়ার দিকেই চোখ রেখেছে সে। গলা যখন উঠেছে গলার মালিকও নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে এবারে।

কিন্তু বেরিয়ে এল না কেউই। তবে গলাটা আবারো শোনা গেল।

কে—। কে ওখানি?

চুপ করে থাকে রফিকুল।

ভেতরের গলাটা যেন এবারে একটু সময় নিচ্ছে।

বউমা, ও বউমা—

ডাকল মানুষটি। বোধহয় বয়স্ক। ছেলের বউকেই ডাকছে। ডেকে বলছে, কে যেন ঢুকল ঘরে। দ্যাখো তো ঘরখান। বউমা—।

মানুষটি খুঁজছে তার পুত্রবধূকে।

রফিকুল তাকায় ভালো করে। কিন্তু তেমন করে আর দেখতে পায় না। কেননা খোলা দাওয়ায়ও তখন কুয়াশার হিমগুঁড়ি। বাইরে থেকে উড়ে এসে দাওয়ার ওপরেই জমাট বাধার চেষ্টা করছে।

কোণের ঘেরা জায়গাটা লক্ষ করতে করতে মাথা থেকে ভেজা চাদরটা নামিয়ে দেয় রফিকুল। এরপর চাদরটাকে ভালো করেই জড়িয়ে নিল গায়ে। নিতে এই প্রথমই নিজেকে একটু উত্তপ্ত বোধ করল। কেননা বাইরের কনকনে হাওয়াটা এখন আর ততটা গায়ে লাগছে না ওর। তবু ঠাণ্ডায় যেন কাঁপছিল রফিকুল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড খিদে। খিদেয় যেন পেটটায় টান ধরছিল মাঝে মাঝে। সেই কখন, কাল ধরা পড়ার আগে দুপুরের দিকে একটু ভাত পেটে পড়েছিল। তারপর থেকেই নির্জলা প্রায়। সুযোগ যে হয়নি তা নয়, ওই বি. ডি. আরের জওয়ানগুলোই আর দাঁড়াতে দেয়নি।

তাকিয়ে ঘরটাকে আবারো দেখতে যাচ্ছিল, এই সময়েই ওই বউটি। যাকে একটু আগেই না বি. এস. এফের জওয়ান দু'জন জিজ্ঞেস করছিল ওর কথা? রফিকুলের শ্বাস পড়ে না যেন বুক থেকে। যদি বউটি ওকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে? চেঁচালেই এখুনি হয়তো ধরা পড়ে যাবে সে। কাছেই তো ক্যাম্প। চিৎকার শুনে বি. এস. এফের আসতে আর কতক্ষণ।

দম বন্ধ করেই ছিল। বউটি জলের বালতিটা নীচে রাখল। ইটের সিঁড়ির পাশে। তারপর সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে মগে করে জল নিয়ে পা-দুটো ধুয়ে নিল। এই ভোরেও এত ঠাণ্ডায়ও সে চানটা করে এসেছে। বোঝা যায় অভ্যেস।

বউটি নিচু হল। ইটের সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে তার পায়ের ওপর থেকে ভেজা শাড়ির খানিকটা তুলে নিয়ে সে চেপে জল নিঙড়ালো। পরে বুক থেকে ভেজা গামছাটা নামিয়ে, নিঙড়ে তা দিয়ে খোলা চুল ঝাপটাতে থাকল। এবং এরপরেই দাওয়ায় উঠে এল। আর কী আশ্চর্য, যেখানে, দাওয়ার যে অন্ধকার মতো ঘেরা জায়গাটায়, সংসারের যত বাতিল করা জিনিসপত্র এবং যেখানে ঢুকেই আশ্রয় নিয়েছে রফিকুল, বউটি যেন সেদিকেই আসছে। রফিকুল আশঙ্কায় চোখ বুঝে ফেলল। জানে, এখুনি বা একটু পরেই আচমকা একটা ভয়ার্ত চাপা চিৎকার উঠবে। কিন্তু চিৎকারের মুহূর্তটি খোলা চোখে সহ্য করার চেয়ে চোখ বুজে

বুঝি হজম করা যায় সহজেই। রফিকুল আতঙ্কে মুহূর্তের হিসেব করছিল। কিন্তু ঘটনা ঘটছিল না কিছুই। তখন কী এক দুর্বার সাহসে সে চোখ খুলে ফেলল। আর খুলতেই অবাক। বউটি তার ভেজা শাড়ি পাল্টাচ্ছে।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি, সে সেখানে বসে আছে ঘাপটি মেরে, তার উল্টোদিকেই অন্যকোণে একটা পাড়ের দড়ি টাঙানো। তাতে বউটির শুকনো শাড়ি-ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার। ভেজা শাড়িটা কোমর পর্যন্ত রেখেই সে ব্রেসিয়ারটা বুকে আঁটছে এখন। কিন্তু পুরোপুরি এদিকে ফেরেনি। বাখারির দেওয়ালের দিকে আড়াল একটা নিয়েছে। কিন্তু নিলেও পাশ থেকে তার শঙ্খধবল স্তনযুগলের একটি উদ্ভাসিত। রফিকুলের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

জনমজুরের ছেলে সে। জন্ম থেকে বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে এবং যেখানে যখন কাজ সেখানে গিয়েই হাজির হয়েছে ওই দম্পতি। ফলে রফিকুল বেড়ে উঠেছে পথে পথেই। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ও শীতের বাতাসে ফাটতে ফাটতে। কাজেই রফিকুলের যে এমন দৃশ্য দেখা নেই তা বলা যাবে না। বরং দেখেছে, চোখে পড়েছে, এমনকী কখনো কোনোদিন লক্ষ্যও করেছে সে মন দিয়ে। কিন্তু এভাবে কোনোদিন সাড়া পায়নি। এখন দেখে যেন শরীরে কীসের শিহরণ। এই ঠাণ্ডায়ও রফিকুল যেন ঘামছে। এবং সে যে পলাতক ও এই মুহূর্তে ধরা পড়ার অপেক্ষায় সে ভাবনাও তার মাথা থেকে অন্তর্হিত। রফিকুল তাকাল এক নিষিদ্ধ তাড়নায়। কিন্তু তার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ আড়াল করে, যাতে কোনোরকম শব্দ না হয়।

শব্দ হল না। কিন্তু তার উপস্থিতিটা আচমকাই ধরা পড়ে গেল।

বউটি তার ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টে ছাড়া শাড়ি-শায়া নিয়ে যেই না এগিয়েছে অমনি চোখে পড়ে গেল রফিকুলকে। আতঙ্কে চিৎকার একটা দিয়ে উঠছিল কিন্তু রফিকুলই লাফিয়ে উঠে ওর মুখ চেপে ধরল। তারপর একটু তাকিয়ে, ওর নিজের মুখের ওপরে একটা আঙুল তুলে বউটিকে চুপ করতে বলে বউটির মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। এরপর আবার যেখানে বসেছিল সেখানেই একটু একটু করে পিছিয়ে গেল। রফিকুলের বুকের ভেতরে তখন ঢিপঢিপ করে যেন শব্দ উঠছে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী! একমুহূর্তে বি. এস. এফের জিম্মায় চলে যেত। তারপর আবার হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো গ্রাম বরাবর সীমান্তরেখা দিয়ে বি. ডি. আরের চোখের আড়ালে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিত। কে জানে ধরা হয়তো পড়ে আজই না বি. ডি. আর আবার পাঠিয়ে দেয় তাকে এপারে?

বউটির আতঙ্ক তখনো কাটেনি। কিন্তু রফিকুলের আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটি বোধহয় তার মনে কোথায়ও একটু দাগ কেটেছিল। তাই সে আতঙ্কেও চুপ। বিস্ফারিত চোখে রফিকুলকেই দেখছিল। পরে একটু স্বাভাবিক হওয়ার ফাঁকেই যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই ওপারের। বি. ডি. আর রাতের অন্ধকারে এদিকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর খবর পেয়েই বি. এস. এফ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুখোমুখি হওয়ায় একটু আগে মনেও তো করিয়ে দিয়েছে ওকে।

কে তুমি? চাপা স্বর বউটির। বলল যেন প্রায় নিজেরই গলাকে চেপে ধরে।

আমি রফিকুল। উত্তরে যেন পুরোটাই আত্মসমর্পণ।

বউটির প্রশ্ন তখনো শেষ হয়নি। বলল আবারো সেই চাপা স্বরে, বাড়ি! বাড়ি কোন্‌খানে? রফিকুল মাথা নাড়ে। অর্থাৎ নেই। আর তারপরেই যা জানায় তা এরকম।

পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল তাদের ওপারে। এক নদীর পাড়ে। কিন্তু জমিজমা ছিল না। অথচ জাতে তারা কৃষাণ। জমিতে ধান রোয়া, ধান কাটার কাজ করেই বেড়াত। এজন্য তারা ঘুরত দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। যেখানে যেমন কাজ পায়। এই কাজ করতে করতেই কখনো তারা ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। কখনো বা আবার গঙ্গার ধারে। ভবঘুরের মতো শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে। আর এমন ঘুরতে ঘুরতেই দেশ কখন স্বাধীন হয়েছে এবং কখনই বা আবার ভাগ হয়ে গেছে তা তারা জানত না। ফলে ঘুরতে ঘুরতে একসময় যখন আবার নিজের গাঁয়ে ফিরে গেছে তার দাদু তখন সেখানে আর তার ভিটেটুকু নেই। অগত্যা এখানে ওখানে। নদীর পাড় ও গাঁয়ে-গঞ্জে। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরেছে। আর যেখানে যেমন কাজ পেয়েছে কাজের সন্ধানে ছুটেছে। এভাবেই ছুটতে ছুটতে রাজসাহী থেকে গঙ্গা পার হয়ে ভগবানগোলা হয়ে লালবাগে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে দাদু গেল। ঠাকুমাও মরল। তারপর একদিন কান্দি থেকে রামপুরহাট যাবার পথে সাপে কাটল মাকে। বাপ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই তখন ওর। তা সেই বাপই ওকে নিয়ে নিয়ে তখন ঘুরছে নানা জায়গায়। কখনো গাঁয়ে-গঞ্জে ধান রোয়ার কাজে। কখনো বা আবার শহরের রাস্তায়। রাস্তা মেরামতির কাজে। কিন্তু কাজ করতে করতেই বাপটা একদিন হয়ে পড়ল দুব্‌লা। তার বুকের দোষ ধরা পড়ল। কাশে শুধু সারাদিন কাশে। তারপর এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে রেলস্টেশনে তারা ঘুমিয়েছিল বাপটা তার সেখানেই মরে পড়ে আছে। তা একে ওকে ধরে-টরে এরপর বাপটাকে গোর দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ল। দুনিয়ায় তখন সে একেবারেই একা। কাজ করে আর খায়-দায়। যেখানে যেমন সুযোগ পায় সেখানেই ঘুমোয়। একদিন এমনি ঘুমিয়েছিল এক রেলস্টেশন। পুলিশ এসে তুলল মধ্যরাতে। বলল ওর পরিচয় কী, কোথায় থাকে এবং কোত্থেকেই বা এসেছে। বাপের কাছে যা শুনেছিল বলতেই পুলিশটা তাকে চালান দিল বর্ডারে। এরপর এক লাথিতেই সীমানা পার।

বউ শুনছিল ভেজা শাড়িটা হাতে নিয়ে। আর শুনতে শুনতেই তার মুখ থেকে কখন আতঙ্ক উধাও। বরং মনটাই তার চলে যাচ্ছিল অনেকটা দূরে। রফিকুল তা লক্ষ করল।

শুধু দিনটা একটু লুকিয়ে থাকতে দাও। তারপর সন্ধে হলে না হয় আবার পালাব—

যেন কাকুতিমিনতি করে বোঝাবার চেষ্টা করে রফিকুল।

কিন্তু বউটি এবারে অনেকটাই নরম। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলেই ফেলল; জিজ্ঞেস করল সাবধানী গলায়, কোথায় পালাবে?

বোঝাতে যাচ্ছিল রফিকুল। এই সময়েই ভেতর থেকে যেন কার গলা ভেসে এল। সেই বুড়োর কি?

বউমা—ও বউমা—

বউটি এবারে সন্ত্রস্ত, হ্যাঁ বাবা এই যাই।

কার সঙ্গে অমন কথা কচ্ছ? আমার আগেই মনে হয়ছিল কেউ ঢুকছে—। কে আইল কও তো?

কই, কেউ না।

তবে য্যান শুনলাম তোমার গলা।

বউটি ইতস্তত করে, হ্যাঁ। শুনছেন ঠিকই। ওই বি. এস. এফ-রা যাওনের সময় খোঁজখবর কইর‍্যা গেল—

ক্যান, আবারো বুঝি ঢুকছে কেউ?

হ্যাঁ তাই তো কইয়া গেল—

বুড়ো মুখটা একটু তোলার চেষ্টা করে কাঁথার ভেতর থেকে, আইজ কুয়াশ লাগছে কেমন?

খুব লাগছে। অখনো পরিষ্কার হয় নাই—

বুড়ো কী ভাবে। ভাবতে ভাবতেই একসময় আবার প্রশ্ন : মাঘের আইজ কত হইল বউমা!

বউটি হিসেব করে। গত পরশু ১৮ গেলে আজ হবে ২০। তারিখটা বুড়োকে জানায় সে। কিন্তু জানাতেই বুড়োর মুখে গজরানি, ছি ছি ছি। দুই দুইটা বছর পার হইয়া গেল অখনো নি আসার নাম আছে ছামড়ার। একবার আসুক সে—

থাউক না বাবা। বউটির চোখ ফেটে যেন জল গড়িয়ে নামে।

থাকব ক্যান। ক্যান থাকব। আমার না হয় তিন কাল গিয়া এককাল ঠেকছে। কিন্তু তোমার কথাটা একবারও ভাবব না?

বউ ওঠে নীরবে। ঘরের কোণ থেকে একটা বাটি নামায়। পরে পাশের ঘরে গিয়ে সেই বাটিতে খানিকটা মুড়ি ও গুড় নিয়ে সে বারান্দায় আসে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সংসারের নানা বাতিল জিনিস রাখা জায়গাটার দিকে এগিয়ে যায়। নিঃশব্দেই এরপর বাটিটি নামায়।

টানাপোড়েনের সংসার। এর বেশি আর কিছু নাই গো—

চাপা স্বরে বলল বউটি।

রফিকুল ততক্ষণে বাটিটা তুলে নিয়েছে হাতে, বেশি কী বলছ এই আমার জোটে নাকি নাকি? সত্যি কী যে খিদে পেয়েছে—

সন্তর্পণে বলতে বলতে হাতের মুঠোয় একটু মুড়ি তোলে রফিকুল।

আচ্ছা ঘরে যে বকবক করছে ও তোমার কে?

ওই তো আমার শ্বউর। বাতের কষ্টে আর উঠতে পারে না। চোক্ষেও প্রায় দ্যাখে না কিছু। তবে কান বড় খাড়া—

আর সেই মানুষটি? তোমারে যে ভাত-কাপড় দেয়—।

চমকেই ওঠে বউটি। চোখ থেকে যেন জল বেরিয়ে আসার উপক্রম। কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। কী করবে। না সামলে আর উপায় কী। একই কথা আর কতবার বলবে বিয়ে হয় না করে করে যেন মামারই গলগ্রহ। একসময় যদিও বা হল মানুষটা আর রইল না ঘরে। বর্ডারে মাল পাচার করত সে। করতে করতেই একদিন খেল গুলি। আর সেই গুলিতেই প্রাণবায়ুটি উধাও। কিন্তু বডি খুঁজে খুঁজেও পাওয়া গেল না। ফলে মরেছে জেনেও বলতে পারল না কেউ মরেছে। অগত্যা বৈধব্যের বেশ উঠি উঠি করেও উঠল না। তবে ওই, সিঁদুর এখনো রয়েছে কী এক আশায়, শাঁখাজোড়া এখনো গলানো এই ভেবে, যদি

হঠাৎই কখনো চলে আসে খবরটি মিথ্যে প্রমাণিত করে।

মুড়ি খেতে খেতেই একসময় কখন বাইরের কুয়াশাটা হাওয়া। রোদ উঠেছে। কিন্তু এ-রোদে তেমন জোর নেই। কনকনে হাওয়াটা এখনো যেন আরো বেশি বেশি করে উত্তরের হিমের গুঁড়ি ঢুকিয়ে এনে সমানে বাতাসের ঝাপটা মেরে যাচ্ছে।

জল এনে দিয়েছিল এক ফাঁকে। জলটা একঢোকে খেয়ে নিয়েই হাসল বুঝি একবার রফিকুল।

তোমারে জ্বালাচ্ছি খুব। আর একটু। সন্ধের দিকে পথটা একটু বলে দিও। চাইলে যাবখন।

কোন পথে যাবে? দাওয়ার ওপরে বউটি নামাচ্ছে তার কাজের জিনিসপত্র। রঙ, তুলি ও কুলো।

রফিকুল তাকায়, ওদিকে বারসই দিয়ে ঢুকে পড়া যায় য্যানো। আর একবার ঢুকলে বুঝি ভাবনা নেই। টাকা হাতে গুঁজে দিলে ওরা তাড়ায় না—

আচ্ছা, তোমারে ওরা তাড়ায় কেন বল তো?

বউটি কুলোর পাঁজা নামিয়েছে তখন দাওয়ার ওপরে। এক পলেস্তরা রঙ হয়ে গেছে। এবারে আরেক পোঁচ লাগিয়ে শুকোলেই তাতে ফুটবে ফুল আর প্রজাপতি। বিয়ের মরশুম শুরু হয়েছে যে। সামনের মাসে দিয়েও আর শেষ করতে পারবে না। এই তো, এই সিজিনেই যা দুটো পয়সা, তারপর সারাটা বছর ধরে আবার...

রফিকুল অন্যমনস্ক। কী বলবে সে। কেন যে তাড়ায় সে কি নিজেও বোঝে রফিকুল? একটাই তো মানুষ সে। তা তার জন্য এক চিলতে ভূমিও জোটে না কোনো দেশে। শহরে ধরা পড়লে বলেছে, কই—কোথায় থাকা হয়। ঠিকানা কী? আর রেশন কার্ড। এবং গায়ে-গঞ্জে ধরা পড়লে গাঁয়ের নামটি তাদের জানা চাই। থানার নামটি তাদের বলা চাই। আর শেষে ওই পরিচয়পত্র। শুনছে রফিকুল, সীমান্তের সব গাঁয়েই দু-তিন মাইলের মধ্যে সবারই নাকি এখন পরিচয়পত্র করে দিচ্ছে সরকার।

তুলি হাতে রঙ করছে এখন বউটি।

কোথায়ও থেকে একটা পরিচয়পত্র করালেই হয়?

কে দেবে! টাকা নেই যে আমার। তার উপুর ভূমি নাই তো আমার ঠিকানাও নাই—

বলল রফিকুল। বলতে বলতেই মনে পড়ল। ও দেশে ধরা পড়েছিল সে। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতেই জানিয়েছিল, এক নদীর পাড়ে তাদের বাড়ি। নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু গাঁয়ের নাম। প্রতিবেশীর নাম? বলতে পারেনি রফিকুল। কী করেই বা পারবে! সে কি দেখেছে কোনোদিন ওই নদীকে। সে কি গিয়েছে কখনো ওই ভূমিতে? সবটাই তো শোনা। শুনেছে সে বাপের কাছে। ছেলেবেলায় ঠাকুর্দার মুখে।

কথায় কথায় বেলা বাড়ে। তুলি রেখে একসময় উঠে পড়ে বউটি।

যাই। শ্বউররে তুলি অখন। তারপর নাওয়ামু খাওয়ামু। কাজ কি কম এ-সংসারে—

উঠতে গিয়েই আবারো ফিরে আসে সে।

সাবধান, লুকাইয়া থাকো। শ্বউরের চোখ না থাকলেও কানটা কইলাম খাড়া। শব্দ কইরো

শব্দ করেনি। কিন্তু শব্দ বুঝি হল একটা। শেষবেলার দিকে হঠাৎই বুটের শব্দ উঠল। খবর এল গাঁয়ের ভেতরে। বি. এস. এফ-এর তিন জওয়ান যেন আসছে। খবর গেল কি?

বউটি পড়িমড়ি করে ঢুকল। বাইরের বেড়ায় শাড়ি শুকোতে দিয়েছিল সে। তুলে নিয়ে এসেই বারান্দায় উঠে কোণের জায়গাটায়।

শিগগির আসো।

কোথায়?

আগে তো আসো। পাড়ায় বি. এস. এফ ঢুকছে—

শুনেই সোজা একদম রফিকুল। বউটি বাইরে তাকায় এক মুহূর্ত। নিমেষেই রফিকুলের বাঁ হাতটি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের ভেতরে। বুড়োর সামনে।

বাবা, আপনের পোলা আইছে—

আইছে! বুড়ো উত্তেজিত। দুপুরের ভাত ঘুমে বুঝি আচ্ছন্ন ছিল একটু আগে। ছেলের কথায় গা থেকে কাঁথা সরাল।

কই, কই সে হারামজাদা—

না না অখনে চিক্কার পাইড়েন না বাবা। বি. এস. এফ বুঝি টের পাইছে। এইদিকে আইত্যাছে ওরা শুনলাম। আপনার পোলায় তো ডরে কাঁপতে আছে। আমি কইলাম বাবার পাশে গিয়া কাঁথার তলায় সাইটা থাকো অখনে। আমি উপুরে একটা কম্বল চাপাইয়া দিমু। বি. এস. এফের বাপের সাধ্য নাই বোঝে। তয় আপনেরে একটু বাতের ব্যথায় কাতরাইতে হইব বাবা—

হ হ। হেইয়া ঠিক আছে। বুড়োর মুখে বুঝি আতঙ্ক। চোরাচালানের কারবারে গিয়ে নেমেছে। পুলিশ তো পেছনে লাগবেই। ভালো রাস্তায় আসার কথা কম কি বলেছে বুড়ো। কিন্তু ছেলের কানে যায় কই—

আয়, আয় রে বাপ।

রফিকুল নিচু হয়। আর ওই তখুনি দাওয়ার কাছে ভিড়। বি. এস. এফের পেছনে পেছনে পাড়ারই দশ বারোজন। ভেতরের ঘরে তখন একটা যন্ত্রণার শব্দ।

কী হল রে বউ? পাড়ারই এক বুড়ি। কৌতূহলে সে-ও বুঝি এসে দাঁড়িয়েছে কখন দাওয়ার মুখোমুখি।

আর কী! বউ বলে সামনে এসে, বাতের ব্যাদনাটা আবার বাড়ছে পিসিমা। আমি—

বলতে বলতে নিজেই বলে পিছিয়ে যায়, কী হইছে পিসিমা?

তর দাওয়ায় বলে তাড়া খাইয়া ঢুকছে কে।

ও বাবা—আচমকা ভয়ে জড়সড় হয়ে প্রায় একলাফে নেমে বুড়িকে এসে ধরে বউটি। কী অইব অখন পিসিমা?

বি. এস. এফের জওয়ান দু'জন দাঁড়িয়েছিল। একজন রাইফেল বাড়িয়ে দাওয়ায় উঠে। তারপর দাওয়া খুঁজে, ঘর খুঁজে এবং যন্ত্রণাকাতর বৃদ্ধকে দেখেই তারপর হতাশ হয়ে নেমে এল। না নেই। এ ঘরে সে ঢোকেনি। তবে ঢুকেছে নিশ্চয়ই। এবং অন্য কোনো ঘরে।

যেমন উঠেছিল শব্দটা তেমনিই আবার মিলিয়ে গেল। ভিড়ও তখন পাতলা। অ—

পাতলা হতে হতে একদম সুনশান হয়ে এলে রোজকার মতোই আবার হিমগুড়ি উড়ে এল। উড়ে এসে জমতে জমতে তারপর জমাট কুয়াশা। সন্ধে নেমে এল সে কুয়াশার ভেতরে। ঘরবাড়ি হারাল। পথঘাট মিলোল। গাছপালারা যেন কোনো জাদুকরের নির্দেশেই অদৃশ্য তখন। কিন্তু সে অদৃশ্যের ভেতরেই চেনা পথে যেন দুটি মানুষ। এক নারী এক পুরুষকে পথ দেখাচ্ছে।

যাও, এবারে যাও। তখন আর কোনো ভয় নাই। ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে টিম টিম করে ওটাই রাস্তা। ওখানেই বাস আসবে। ওই বাসে কইরাই...এই নাও—

কী!

দশটা টাকা। রাখো সঙ্গে। ভাড়া তো লাগব—

কিন্তু—পুরুষটির গলায় যেন রুদ্ধ আবেগ, তোমার এ টাকা ফিরিয়ে দেব আবার কী করে?

দিও। যদি পারো আবারো কুনোদিন আইস্যা। কিন্তু এভাবে পলাইয়া নয়। আইস্যা নিজের একখান দেশ লইয়া। পায়ের তলায় এক টুকরা ভূমি রাইখ্যা—

বলতে বলতে গলা যেন বুজে আসে নারীটির। ওই তখনই পুরুষটি বিড়বিড় করে, আসব। নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু তোমার নাম? নামটা কিন্তু জানা হল না।

নাম বলে নারীটি। পুরুষটি জানতে চায় তখন তার গাঁয়ের নাম। থানার নাম। আলাদা আলাদা করে বলে নারীটি। তারপর পুরুষটি একসময় বিদায় নেয়। হন হন করেই সামনের আলোটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে থাকে।

আর যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ওই নারী। তারপরেই অন্ধকারে, কুয়াশায় ও জমাট হিমগুঁড়ির মাঝে যেন গলা তার বুজে আসে। কান্নায় কি—! না অন্য কোনো এক কষ্ট। যেন সেই কষ্টটা বুকে নিয়েই ফেরে সে। তারপর কুয়াশার ভেতরেই হাঁটতে থাকে।

বনাম স্কেচ-মানুষ

প্রদীপ দাশশর্মা

ব্যাপারটা এরকম হবে ভাবতে পারেনি সুমতি। সে, বস্তুত, সুমতি। তার মতিভ্রম হবে কেন
হয়েছে বাদলের। বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে পার্টি ছেড়ে দিল। বসে গেলেও কথা ছিল
শেষে কি না পি. ডি. এস-এ। আরে বাবা, ওদের সাপোর্ট-বেস কত? মুরোদ? আর, সুসময়ে
দখিনা বাতাসে, কোন আহাম্মক পার্টি ছাড়ে। এক ধাক্কায় জীবনের ২০টা বছর বরবাদ। এ এক
ধরনের আত্মহত্যা। সুমতি বাদলের মতো পার্টি-মেম্বার। হোলটাইমার না—এই যা। প্রাইমারি
স্কুলে, পার্টির সুবাদে, চাকরি। নতুবা, বি এড না করে চাকরি পাওয়া কি অত সোজা। বাদলের
ওতে একটা মৃদু ভূমিকা ছিল। অবশ্য তখন তাদের বিয়ে হয়নি। প্রেমও না। সুমতি ভাবে
অকৃতজ্ঞ। পার্টি এত করার পরেও, প্ররোচনাহীন, সে ছেড়ে দিল। সুমতি ঢের জানে বাদল
সমীরের ঘরের খুঁটি। তা বলে উনি পার্টি ছেড়ে দিলে, বাদলকেও ছেড়ে দিতে হবে। চমৎকার
এই দিকবিদিক শূন্য হয়ে যাওয়া। এমনকী এ ব্যাপারে সুমতির সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত না। অথচ
১৫ বছর হয়ে গেল বিয়ের। ১৫ বছর তারা এক শয্যায়। মাঝে মাঝে চাদর পাল্টেছে, এই যা।
১৫ বছর ধরে তারা শেয়ার করেছে এক স্বপ্ন। আজ সকালে বড়দার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া
বাদলের। আর তাতেই সুমতি টের পায় বাদল পার্টি ছেড়েছে। লোকটা মানুষ খুন করতে
পারে। ছাড়ার আগে তাকে কিছু বলেনি পর্যন্ত। সেও তো একসঙ্গে পার্টি ছাড়তে পারত। যে
কোনও দম্পতিই তো একটা কোয়ালিশন। বাদল তার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া, ডানা বিনা, পি ডি
এস-এ। অবশ্য, এটা ঠিক, বাদল বল্লেই সে যে পার্টি ছাড়ত এমন নয়। আসলে বাদল এসব
বোঝে। কম দিন তো তাদের একসঙ্গে থাকা নয়। সাকুল্যে ১৫ বছর। পাঁচ হাজার চারশো
পঁচাত্তর দিন, অর্থাৎ, ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৪০০ ঘণ্টা, ৭৮ লক্ষ ৮৪ হাজার মিনিট, ৪৭ কোটি
৩০ লক্ষ ৪০ হাজার সেকেন্ড। প্রতি পলে, সেকেন্ডে বাদল তার জীবনে। অথচ গোটা ব্যাপার
জানার পর, নিমেষে বাদল আলাদা। অন্তত, সুমতি সেরকম দেখে।

বাড়িতে সচরাচর কফি হয় না। সুমতির ভালো লাগে না। পোড়া পোড়া গন্ধ। বাদ
পছন্দ করে বলে হয়েছে। আজ বাদল-সুমতির ১৫ নম্বর বিবাহ-বার্ষিকী। গতকাল একডালিয়া
মনজিনিস থেকে পেস্ট্রি কিনে এনেছিল সুমতি। বস্তুত, পেস্ট্রির কারণে, বোধহয় ওই কফি
কফি আর পেস্ট্রি খেতে খেতে, আড়চোখে সুমতিকে দেখে বাদল। নিজেকে অপরাধী ঠেকে
এরকম মেজর ডিসিশন তার শেয়ার করা উচিত ছিল। তারা তো স্ট্রেঞ্জ-বেড ফেলোস ন
স্বামী-স্ত্রী। উপরন্তু কমরেডস। সুমতি কি রেগে আছে। নাকি, ভেতরে ভেতরে, মুরোদ দেখব
চায় বলে, কুলকুল করে বরফ জলের নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে! মনে আছে, সেবারে সুমতি স
স্কুল-ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। প্রথম মিটিং। কী উৎসাহ! বাদলকে বারবার খুঁটিয়ে খুঁটি
জিজ্ঞাসা : কতজন কমপক্ষে হলে কোরাম, সমস্যাগুলি সে কমিটিতে কীভাবে রাখবে, কীভা
অ্যাড্রেস করবে, প্রয়োজনে নোট অব ডিসেন্ট দেবে কি না...। বাদল তখন কাকাতুয়া। প্রশ্নে

ছোলা খুট্ করে ঠোকরায় আর উত্তর দেয়। মিটিং-এর আগের দিন রাতে, বিছানায়, হঠাৎ বাদল আবিষ্কার করে সুমতির ভুরু প্লাক্‌ড। কীরকম অন্যরকম লাগে। এমনিতে, সুমতির ভুরু সুন্দর। প্লাক করার কথা নয়। তবু, ওই মৃদু রূপচর্চায় সুমতির শ্রী বাড়ে। অন্তত, বাদলের সেরকম মনে হয়। ফলে, সেদিন বিছানায় সুমতির শরীর হাদাড়-পাদাড়...। বিলক্ষণ মনে আছে। পরে, অল্প মনঃসংযোগে, সে বোঝে, সুমতি কেন ভুরু প্লাক করে। কারণ, মিটিঙে তর্কবিতর্ক বড় কথা না, কাজ হাসিল করতে শরীরেরও একটা ডায়ালগ থেকে যায়, থাকে। সুমতি এসব বড় বেশি বোঝে। মনে মনে হাসে বাদল। ফ্রিডম তো দিতেই হবে। যাক সে যেখানে যাবে। কিন্তু, বিছানায়, বোম্বে ডাইং-এ সে তো·ডাই, রং!

বাদলদের বাড়ির হাতায় ক্লাব। প্রোমোটার রক্ষিত ক্লাবের বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। দুটো ঘর। বড় বড়। যেমন ক্লাবের হয়। একটা ঘরে অক্সিজেন-সিলিন্ডার, কিছু লাইফ-সেভিং ড্রাগস, টেলিফোন...। রাতে ক্লাবের কেউ না কেউ ওই ঘরে শোয়। রাত-বিরেতে কখন কী লাগে। অক্সিজেন-সিলিন্ডার ভাড়া দেওয়া হয়। এছাড়াও, বাইরে খোলা ক্লাব-চত্বরে অপেক্ষা করে মারুতি-ওম্নি' অ্যামবুলেন্স। বাদল ক্লাব-সেক্রেটারি। সব তার নিয়ন্ত্রণে। এ ব্যাপারে সে পক্ষপাতিত্ব করে না। মারুতি-অ্যামবুলেন্স সত্যি সত্যি 'ওম্নি'। সকলের। কেউ অসুস্থ হলে একটা ফোন মাত্র। সকলের জন্য দৌড়বে। কী তৃণমূল, কংগ্রেস, কী সি পি এম। ফলে, গোটা এলাকায় বাদল পপুলার।

আজ রোববার নয়। রোববার হলে তো মাংসের দোকানে পর্যন্ত লাইন। আজ সে সব না। বিনা বাধায়, পছন্দমতো, হিটলারের স্বভাবে ডিক্টেট করে, টেংরি আর চাপের-মাংস এনেছে সে। আজ, হুর্‌রে, তাদের বিবাহ-বার্ষিকী। কাউকে অবশ্য খেতে বলা হয়নি। কারুর মনেও নেই। সুমতি ছুটি নিয়েছে। লিখিত কিছু না। ফোনে হেডমিসট্রেসকে জানিয়েছে, 'রমাদি, আজ যেতে পারছি না।' রমাদি ওপার থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও আমি ম্যানেজ করে নেব। অ্যাপ্লিকেশন, পরে, ব্যাকডেটে দিয়ে দিও।' রমাদি কারণ জিজ্ঞেস না করায়, কিছু বলা হল না। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বোধহয় কারণ জানাতে হয় না। কিন্তু সে তো কারণ জানাতে চায়। একবার সুমতি ভাবে রসগোল্লার পায়েস করে। দুধ ঘন করে তেজপাতা, এলাচ, কিসমিস আর ছোট রসগোল্লা কিছুক্ষণ ফোটালে চমৎকার রেসিপি। কিন্তু, সকাল থেকে ব্যাপারটা শোনার পর, অন্তরাত্মা অব্দি তেতো। বাদলরা তো প্রায়, বংশ পরম্পরায়, কমিউনিস্ট, কাথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল পি. ডি. এস। বাদল যে এটা কী করল। ব্যাড ডিসিশন।

খাওয়ার টেবিলে, যেমন হবার কথা, দুজনের মধ্যে চেঁচামেচি :

—কোন্ আক্কেলে দল ছাড়লে। তোমার বিরুদ্ধে তো কোনও অভিযোগ ছিল না। শো-কজ তো করেনি। বরং এলাকার বেশির ভাগ ডিসিশন তো কম. বাদল ছাড়া পার্টি নেয় না।

—তাতে কী। তা বলে পার্টি ছাড়া যাবে না। দাসখৎ লিখে দিয়েছি নাকি।

—আমিও কি দাসখৎ লিখে দিয়েছি!

—তাহলে, ছাড়ছো না কেন। পার্টির বিপুল জনসমর্থন, অথচ সেখানে ফ্যাসিজম...

—ছাড়বই বা কেন? জনগণের সঙ্গে আছি। তুমি একটা প্লেখানভ। সুমতি প্লাক করা

একটা ভুরু আরেকটা থেকে উঁচু করে ধরে।

—পার্টিতে ডেমোক্রেসি নেই। আমি ডেমোক্রেসির পক্ষে...। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কথা জানো।

সুমতি চুপ করে থাকে। কী সব 'ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল' করছে। বোকার হদ্দ। নিজের ভাবে বোঝে না। এমন মানুষের সঙ্গে তর্কে যাওয়া বৃথা। তারা কী এমন খারাপ আছে। একমা সন্তান বুবন নরেন্দ্রপুরে। ক্লাস সেভেনে। অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা পার্টি এক ডি. পি. সি-কে ধ করে দেয়। সব ভুলে গেল।

বাদল মাংসের নলি-হাড় ঠকঠক করে থালায় ঠোকে। চোষে। সার কিছু বেরোয় না। ফ হাড়টা থালায় ছেড়ে দিয়ে বলে, 'রুশের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মামি, হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি হিটলারের সুহৃদ স্ট্যালিন।' অমনি রাগ হয়ে যায় সুমতির। অন্য সময় হলে সে বাদলের থা থেকে হাড়টা ছোঁ মেরে নিত। হক। নাকি টমাহক। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে...। বাদ হাড়ের রিস্ক নেয় না। দাঁতে ব্যথা।

এই প্রথম বাদলের মনে হয় তার জীবনে ব্যস্ততা অপহৃত। যে পার্টি নিয়ে তার ২ বছরের ঘর সেই পার্টি সে ছেড়ে দিয়েছে। পি. ডি. এস-এর কাজকর্ম, সাপোর্ট-বেস, তুলন অনেক সরু, রোগা। ফলে মাংস-ভাত খেয়ে সে দিবানিদ্রায়। সম্প্রতি, দুপুরে ঘুমিয়েছে কো দিন, মনে পড়ে না। সুমতিও দিবানিদ্রা ভাবে। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টায়। নাহ, লোকটার সঙ্গে এ বিছানায় শোওয়া যায় না। দুজনের ইডিওলজি আলাদা। ফলে বাদল ডাকছে, আর সে চ আসবে। ব্লাউজের হুক খুলে ফেলবে। সে কি কলগার্ল। সুমতি, তাই, কাঠের চিকের এ পা টি. ভি খুলে বসে। মাথায় সাদা টোপর পরে রান্না শেখাচ্ছে গ্রেট-ইস্টার্নের শেফ। রিয়েলি গ্রে বাদল ওরকমই লম্বা, দোহারা। কিন্তু, বাদল ওরকম নয়। কোনও দিন ভুলেও এক কাপ চা ক খাওয়ায়নি সুমতিকে। বাদল কোনও ক্রিয়া নয়, অলওয়েজ নাউন। ক্রাউন। এই মুহূর্তে সুমতি কাছে অলীক। সুমতি, পুনর্বিচারে, ..টের পায় মোটেও অলীক নয়। সে এখন অন্য পার্টি অতএব, শত্রু। শ্রেণি-শত্রু কি না বলতে পারবে না, তবে শত্রু। অন্তত, লোকাল-কমিটি বাদলকে এভাবে অ্যাড্রেস করবে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একটা ভয় বা অসহায়তা কোথ যেন ঝোলে। সুমতি বারবার টি. ভি চ্যানেল পাল্টায়। কোনওটাতে থিতু হতে পারে না।

দুপুর সোয়া-দুটো নাগাদ হঠাৎ পল্টু দৌড়ে আসে। হাঁফায়।

—সুমতিদি। খারাপ খবর। গুপ্তদার মার হার্ট-অ্যাটাক। গুপ্তদার অফিস ইছাপুরে। ফো পাওয়া যায়নি। লোক পাঠানো হয়েছে। ড. স্বস্তিক বল্লেন, এক্ষুণি হাসপাতাল বা নার্সিংহো দিতে হবে।

সুমতি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য বাদলের দিকে তাকালে বাদল তড়িঘড়ি পাঞ্জাবিটা লুঙ্গির ও চাপিয়ে ড্রাইভারকে ডাকতে যায়। গাড়ির চাবি তার কাছে। সবাই জানে। গাড়ি গুপ্তদের বা সামনে, নৌকোর মতো, বিনা শব্দে, ভেসে আসে। পাল ওঠানোর সময় যেমন পালের পাঁজ মট্ করে শব্দ হয়, তেমনি গাড়ির দরজা খোলার আওয়াজ। পাড়ার লোকজন অনায় স্ট্রেচারে গুপ্তদার মার বডি গাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। বডি বললে ভুল হবে। মরা নয়। অসু ফিরে আসবে বলে যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে সুমতি আর গুপ্তদার বোন বুলবুল। সামনে বাদল ও

ড্রাইভার। ঘাড় ঘুরিয়ে বাদল বলে, পি. জি-তে যাওয়াই ভালো। সুমতি সায় দেয়। প্রথমে এমার্জেন্সি, ফের কার্ডিওলজি উইং। বেড নেই। কার্ডিওলজি বিভাগের ভাঙা বারান্দার সঙ্গে ভাঙা সম্পর্কে মারুতি-ওম্নি। সামনে সিঁড়ি। অন্য সময় হলে ঘাবড়াত না বাদল। সরাসরি সূর্যকান্তকে ফোন করত। খু-উ-ব ভালো লোক। বুদ্ধিজীবী। মূর্খ ও বাচাল নয়। কিন্তু পার্টি ছাড়ার পর কোন মুখে তাঁকে ফোন করে। এদিকে ডাক্তার পেশেন্ট দেখলেও বেড দিতে পারছে না। বেড দেওয়া তো আর তার কাজ নয়। গোটা ওয়ার্ডে মাছি ও ফড়ে ভন ভন করছে। বিজ্ঞপ্তি 'দালালকে টাকা দেবেন না।' সুমতি ছোট হ্যান্ডব্যাগ থেকে 'এয়ার টেল' বের করে। সরাসরি মলয়কে ধরে। বুদ্ধবাবুর সচিব। পরোপকারী। সাধ্যে কুলোলে সকলের জন্য করে। সংক্ষেপে গুপ্তদার মায়ের কথা বলে। গুপ্তদাকে মলয় চেনেন। ফ্যাসিস্ত আক্রমণের দিনগুলোতে; ওই একটা ফ্যামিলি, বিশেষত গুপ্তদার বাবা ডিফেন্সের বড় অফিসার হওয়ার কারণে, অকুতোভয়, অনেক কমরেডকে প্রাণে বাঁচায়। এখন অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে গুপ্তদার মা মারা গেলে মুখ দেখানো যাবে না।

—কমরেড, এই তো আমার পাশে এখন পি. জি.র সুপার ড. চ্যাটার্জী। নিজের কাজে এসেছেন। নিন্ ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। সব শুনে ড. চ্যাটার্জী বললেন, 'কাইন্ডলি, অপেক্ষা করুন। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোচ্ছি। একটা ব্যবস্থা হবে। মিনিট কুড়ির মধ্যে ড. চ্যাটার্জীর গাড়ি হাসপাতালের কার্ডিওলজির বকুল-ছায়ায়। কার্ডিওলজি-বিল্ডিং-এর বাইরেটা পুরোনো প্লাস্টার খসিয়ে নতুন প্লাস্টার হচ্ছে। ছোট ছোট বালতিতে সিমেন্ট-বালির মশলা কুয়োর বালতি টানার মতো শোঁ শোঁ করে উঠে যাচ্ছে। উঁচু বাঁশের কাঠামোয় তখন রাজমিস্ত্রিদের ছাপিজের খেলা। দিব্যি প্লাস্টার করছে। বাদল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে সেই কাজ দেখছিল। ডাক্তার কাছে এলে সে উইশ করে। ড. চ্যাটার্জী তাকিয়ে দেখেন না। ই. সি. জি, ইকো-কার্ডিওগ্রাফি, ব্লাড-ভিসকোসিটি এসবের জন্য কিছু টাকা ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিতে বলেন। ধাপে টাকা কমানোর সুপারিশ। পি. জি-তে অনেকগুলি ক্যাশ-কাউন্টার। অসুবিধে হয় না। বাদল বোঝে, দড়ির বালতির মতো তারা অনায়াসে শোঁ করে রোগীকে ওপরতলে নিয়ে যেতে পারল। গুড লাক। ড. চ্যাটার্জী সুমতিকে একপাশে ডাকেন, 'কমরেড, কাইন্ডলি এদিকে আসুন।' বাদল, লুঙ্গি পরা বাদল এগিয়ে গেলে, উনি বিরক্ত। বলে ফেলেন, 'যাকে তাকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন কেন আপনারা?' সুমতি বলতে চায় 'উনি আমার স্বামী।' ফের, চেপে যায়। যদি আবার রেগে যান। অন্তত, বেড তো জুটল...। সুমতি, এক্ষণে বড় চতুর চড়ুই।

বাদল জানে এই ডাক্তার তাকে, এর আগে কতবার 'স্যার, স্যার,' করেছে। তবে আজ চিনছে না কেন। চিনতে চায় না বলে। না কি সে যে পি. ডি. এস সবাই জানে। জানবেই বা কেন? আনন্দবাজার, আজকাল, প্রতিদিন, বর্তমান সবেতেই তো ওই খবর ফলাও বেরিয়েছে। তবু, এদেশে, বিশেষত রোগী-প্রজ মেট্রোপলিসে ডাক্তাররা কি কাগজ পড়েন। সময় পান। কে জানে। বুলবুলকে পেশেন্টের বেডের পাশে বসিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে সুমতি ও বাদল। ফেরে। ওই গাড়িতে ফের ক্লাবের দুজনকে পাঠাবে। এয়ার-টেল বুলবুলের হাতে। ইছাপুর থেকে গুপ্তদা ফিরে এলে বাবা নিশ্চিন্ত। মুস্কিল, গুপ্তদার স্ত্রী এ সময় বাপের বাড়ি, চন্দ্রকোণা। ফিরে আসার পথে বাদল সুমতিকে জিজ্ঞেস করে,

—কলকাতায় কটা বাইপাস আর উড়ালপুল জানো?

—মোট কটা জানিনে।

—কলকাতার ফুসফুসে ফ্রেশ-এয়ার নেই বললেই হয়। তাই বাইপাস। গুপ্তদার মার বাইপাস হতে পারে। ওসবে বাপু অনেক টাকা......

—হ্যাঁ, বাইপাস অন্তত তুমি ভালো বোঝো। অন্য রাস্তায় চলে গেলে।

এরপর কোনও কথা হয় না। কী রকম বিধ্বস্ত লাগছে বাদলের। গণতন্ত্রের মধ্যেকার নাৎসিবাদ সাধারণ নাৎসিবাদ থেকে খারাপ। এই বোধি থেকে সে চুপ করে থাকে। দলবদলের কারণে সে এখন অপরিচিত। নিজেকে একমাত্রিক লাগে। কারুর উপর আধিপত্য নেই। সুমতির ওপরেও না। অথচ, পাওয়ার তো রিলেশন। এক্ষণে সে রিলেশনহীন। অতএব, পাওয়ার আসবে কোথা থেকে? নিজের অবস্থান সুমতির কাছে সে ক্লিয়ার করতে পারল না কেন? তার পার্টি ছেড়ে দেওয়া, নতুন পার্টি করা—এর মধ্যে কোনও প্রকৃত কারণ আছে কি? না সবটাই আকাডেমিক। সে এক ধরনের বহুমাত্রিকতায়। বৈচিত্র্য খোঁজে। নতুবা, ফ্যাসিজম সর্বত্র। এই যে সে ও সুমতি বুবনকে নরেন্দ্রপুরে পাঠাল, সায়েন্স পড়াতে চায়, ছেলে তা চায়নি। সে তার পুরোনো জগবন্ধু ইনস্টিউটে থাকতে চায়। ইংরেজি নিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু, এই চয়েস তাকে দেওয়া হবে না। এসব কি ফ্যাসিবাদ নয়! রেজিমেন্টেশন নয়। তাহলে, পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মধ্যে ফ্যাসিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ভেবে সে উতলা কেন! শেষমেষে, দল ছেড়ে, সাইডলাইনে। আর এখন যেখানে, সেখানে কি ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নেই! টপ ডাউন কম্যান্ড তো কার্যত সর্বত্র। শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি কি পুরোটাই শ্রমিকদের কাজ? নেতৃত্বে কারা? তারা কি সবাই লেদে কাজ করেন, বালতিতে জল টানেন, বীজ বপন করেন, আলচিতির কামড় খেয়েছেন। সৈফুদ্দিন-সমীর সম্পর্কে তো একই কথা! তাহলে দাঁড়াচ্ছে : শ্রমিকরা শ্রমিকদের জন্য নয়, মধ্যশ্রেণি গর্তে, বুর্জোয়ারা প্রতিযোগিতায় জেরবার। বাজার অর্থনীতি একে অপর থেকে আলাদা করে। ময়দান এক। শুধু অদৃশ্য হাত খেলাচ্ছে.....।

এসব কথা এলোমেলো ভাবতে ভাবতে, রাত্রিবেলা একা জেগে থাকে বাদল। এক সময় কলকাতার রাস্তায় বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাশে সুমতি। নাইটিতে শিশুসুলভ বিশৃংখলা কত কাছের অথচ কত অপরিচিত। আজ, ডাক্তার তার সামনে সুমতিকে ডাকল : 'কমরেড..... তার নাম অব্দি ভুলে গেল। লুঙ্গি পরে ছিল বলে! এটাই, বোধহয় অ্যাসথেটিক্স অব্ দি রুলিং ক্লাস। না কি, আপনা মাংসে বাদল বৈরী। মতাদর্শ এই মাংস তৈরি করে।

খোদ কলকাতায় ওয়ান-রুম ফ্যামিলির সংখ্যা বড় কম নয়। বাদলেরও তাই। আসলে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ হয়েছে। তাতে রান্নাঘর-বাথরুম সহ মোটামুটি পেল্লায় ১৬ বাই ২২ ঘর তাদের। এর বেশি পায়নি তারা। বরং বড়দার স্কোয়ার-ফুট বেশি। ছেলেমেয়ের সংখ্যাও আপত্তি করেনি সে। সুমতি মৃদু ঘুন ঘুন করেছিল। এই যা। বুবন নরেন্দ্রপুরে পড়ায়, হস্টেলে থাকায়, বড় একটা অসুবিধে হয় না, এক সামার আর পুজোর ছুটি ছাড়া। ঘর বড় হওয়ায় কাঠের হাফ-মাস্ট খোদাই-করা ঔরঙ্গাবাদী পার্টিশনে বাইরের লোকদের বসার একটা ব্যবস্থা..... সুবিধে-অসুবিধেয় এতগুলি বছর তো কেটে গেল! এছাড়াও, স্থাবর বলতে, ব্রহ্মপুরে, খালের ওপারে, সাড়ে তিন-কাঠা, বছর দশেক আগে, জলের দামে, কিনেছিল বাদল। নিজের নামে

আইডিয়াটা এরকম : 'বুবন বড় হলে, বিয়ে হলে, বাদল-সুমতি এই জমিতে একটা কিছু করে উঠে আসবে। তখন বুবনকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়া। এসব বাদলের মনে হচ্ছে, সবটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সবাই বলছে, সুমতির আঁচলে বাদলবাবু পি. ডি. এস করছেন। চমৎকার জুটি। গাছের খাচ্ছেন, তলারও কুড়োচ্ছেন।

রোববার সকালে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সাতটা। বাদল থলে হাতে টিমা পায়ে বাজার যায়। ফেরে। পরপর দু-পেয়ালা চা খায়। ডিম, মাখন-টোস্ট আর মর্তমান কলা। জম্পেশ টিফিন। একটা সময়ে রোববার রোববার লুচি করত সুমতি। ছোট ছোট ফুলকো লুচি। তিলোত্তমা। মানে কালো জিবের ছিটে। খুলনার লুচি ফুলনা। সঙ্গে কলকাত্তাইয়া আলুর সড়সড়ি। দুটো লাল লঙ্কা গোঁজা। অন্য প্লেটে খান দুয়েক ঘেমো লাল পান্তুয়া। এখন আর পারে না। সময় নেই। খাবার টেবিলে বোবা। বেশি কথা হয় না সুমতির সঙ্গে। কদিন ধরে বোবা-পর্ব চলছে। আজ নরেন্দ্রপুর যাবার কথা। ছেলের কাছে। ফার্স্ট সান-ডে। তারা এদিন দুজনে যায়। মায়না আর হাতখরচ দিয়ে আসে। নতুন বই কিনতে হবে কি না, বাড়তি ট্যুইশন নিতে হবে কি না, জেনে আসে। আজ সকালের দিকে যাবে, না বিকেলে—ঠিক হয়নি এখনও। মানে সুমতি বলেনি। সচরাচর ওরা সকালে যায়। ফেরার পথে হয় গড়িয়ায়, নতুবা গাড়িয়াহাটায় খেয়ে নেয়। ফলে এই একটা দিন সকালবেলায় রান্নাবান্না করে না সুমতি। ফ্রি। অনেক সময়ে, মিশনের উল্টোদিকে, মন্দির অ্যাপার্টমেন্ট-এ মাণিকাকার ওখানে খেয়ে নেয়। অবশ্য, আগেভাগে, ফোন করে দিতে হয়। বছরে দু-একবার হয়। প্রত্যেক মাসে তো যাওয়া যায় না। চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা আছে।

বাজার থেকে এসে বাদল দেখে সুমতির স্নান শেষ। অবাক হয়। সুমতির এ হেন সুমতি তো সচরাচর হয় না। প্রত্যেকবার সে-ই তো, সুমতির তাড়ায়, প্রথমে স্নান করে। আজ, কোন দিকে সূর্য উঠল। শাড়ি ছাড়তে ছাড়তে সুমতি বলে, 'স্নানে যাও। আমি আগে বেরিয়ে যাচ্ছি। গড়িয়াহাটে আনন্দমেলার সামনে অপেক্ষা করব। মিষ্টি-টিষ্টি—যা কেনার কিনে নেব। বেরোবার সময় দরজায় তালা দিতে ভুলো না যেন। দেরি করবে না।' বাদল জানে তালার বুকে লেখা থাকে ফাইভ লিভার্স, সেভেন লিভার্স ইত্যাদি। প্রতিটি লিভারই, আসলে অবিশ্বাস। অর্থাৎ পাঁচ অবিশ্বাস, সাত অবিশ্বাস.....ইত্যাদি।

বাদল খানিকটা অবাক। তারা তো একসঙ্গে বেরোয়। এর তো কোনওবার অন্যথা হয়নি। রোববারে ১নম্বরের খালি পেট। দুজনে পাশাপাশি বসে। গড়িয়াহাটে নামে। তারপর অটোয় গড়িয়া, ফের অন্য অটোয় নরেন্দ্রপুর। আজ সুমতির হল কী! সব ব্যাপারটা কীরকম গোলমেলে, কেয়স। আচমকা বোঝে, পাড়ায় সুমতি দেখাতে চায় না সে বাদলের সঙ্গে চলাফেরা করছে। এই দূরত্ব প্রকৃত, না স্ট্র্যাটেজিক।

সুমতি আগে বেরিয়ে গেল। বাদলের বেরোতে মিনিট কুড়ি দেরি হয়ে যায়। সমীর পতিতুণ্ডির ফোন আসে। সন্ধেয়, ঝিলরোডে পার্টি-মিটিং। সৈফুদ্দিন আসবেন। বাদলকে যেতে হবে। গড়িয়াহাট আনন্দমেলায় এসে দেখে সুমতি নেই। এমনিতে ফাঁকা, উড়ালপুলের কারণে ভিড় আগের মতো নেই। তার উপর, আজ রোববার। বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ। সুমতিকে না পেয়ে, সামান্য পিছিয়ে সে 'জলযোগে'-এ আসে। সেই বিখ্যাত 'জলযোগ'। ফুড-মুভমেন্টের

সময় এক কর্মচারী পুলিশের গুলিতে মারা যায়। কী রকম যেন লতায়-পাতায় আত্মীয় ছিলেন বাদলদের। নাহ্, সুমতি কোথাও নেই। আরো মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে বাদল অটোয়। কলকাতার অটো মানে কালো বা নীল পরী। যতই জ্যাম থাকুক না কেন, কৃশানু দে-র মতো ড্রিবল করে পাশ কাটিয়ে যাবে। গড়িয়া-মোড়ে এসেও বাদলের চোখ সুমতিকে খোঁজে। পায় না। ওখান থেকে অটোয় নরেন্দ্রপুর। মিশন গেটে নামতেই সুমতি।

—এত দেরি।

—ন্যাকামো কর না। তোমার আনন্দমেলায় থাকার কথা। খুঁজে খুঁজে হন্যে। সুমতি হাসে। ভাবে, আমাকে তবে খোঁজো তুমি।

—কী করব। গড়িয়াহাট মোড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে। কম. ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে দেখা। স্যাট্রোয় যাচ্ছিলেন। গড়িয়া পর্যন্ত লিফ্‌ট দিলেন। নাকতলা যাবেন। আমার জন্য গাড়ি ঘুরিয়ে গড়িয়া মোড় হয়ে তবে গেলেন। স্যাক্রিফাইস বলো।

বাদল চুপ। একটা সহজ স্পিনে সে হিটউইকেট। বোঝে ওঁর জন্য সুমতি দাঁড়িয়ে থাকবে না আর। আ সিম্পল পোলিটিক্যাল লজিক। এখানে মতাদর্শ নেই, পাওয়ার। স্বপ্ন, আবেগ, অনুভূতি, চিত্রকল্প, যৌনতা, হৃদয়, বিশ্বাস, অভ্যাস, প্রবৃত্তি, মনস্তত্ত্ব, হাহাকার—সব কিছু ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে।

বুবনের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে, টাকাপয়সা দেবার পর, দুজনে বেরিয়ে আসে। বুবন একবার বলেছিল :

—বাবা, দাড়ি কামাওনি কেন? তোমাকে কেমন যেন লাগছে।

—না, ওসব না। ভালো করে পড় বাবা। তোদের এখানে আবার ইউনিয়নবাজি নেই তো?

—এখানে কেউ পলিটিক্স করে না। ভালো ছেলেরা ইন্ডিয়াতে রাজনীতি করে না বাবা।

সুমতি গেট থেকে বেরোতে বেরোতে বলে,

—কথার কী ছিরি। ও কি জানে না আমরা দুজন রাজনীতি করি। আমরা কি খারাপ? গুণ্ডা-বদমাস?

—তার চেয়েও অধম। বিপ্লবে অনেক সময় লুম্পেনরাও হঠাৎ দুঃসাহসিক কাজ করে। বিপ্লবের পক্ষে। মধ্যশ্রেণি তারও অধম।

গেটের বাইরে এসে বাদল বলে,

—তুমি যাও। আমার ফিরতে দেরি হবে। ব্রহ্মপুর যাব। জমিটা দেখে আসি। ওয়ানরুম ফ্ল্যাট আমাদের। আমি না থাকলে সুবিধে। এ সময়, পোলিটিক্যাল আলোচনা, মিটিং.... করে নাও বরং। আমি তো বিরোধীপক্ষ....।

—খাবে না। ফিরে গিয়ে আমি বাপু রাঁধতে পারব না।

—'সাউথপোলে'-এ তুমি বরং খেয়ে নিও। আমি খাব না। সকাল থেকে বমি পাচ্ছে। অটো চেপে সুমতি চলে গেল। অটোর বাইরে সুমতির আঁচল উড়ছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট। অনেকক্ষণ দেখা গেল ওই সিল্ক। মনে আছে গড়িয়াহাটের 'সাউথপোল'-এ পর্দা-ঢাকা কেবিনে হাউহাউ করে কেঁদেছিল সুমতি। ২২/২৩ বছর তখন। সে নাকি বাদলকে ছাড়া বাঁচবে না। একবার মনে হয়েছিল, তাহলে এতদিন সে কী করে বাঁচল। বাদল তো কোথাও ছিল না। এসব সে তখন

বলতে পারেনি। আসলে, অন্বেষা খুব দ্রুত বাদলের কাছে গ্লাইড করে চলে আসছিল। সুমতি আর রিক্স নেয়নি। তাই কান্না। ওই সিনেমা দুজনকে এক করে দেয়। সেই সুমতি, ৩৮ বছর বয়সে, বাদল ছাড়া, সাউথপোলে চলে গেল। বাদল নর্থ-পোলে। অটো অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও সে, খানিকক্ষণ, বিমূঢ়। দাঁড়িয়ে রইল। ফের ভেঙে গিয়ে, অনেক দিন পর, আজ রাস্তায়, বাঁশের ঘুণধরা বেঞ্চে বসে, ভাঁড়ে, চা খেল। এক বান্ডিল হলুদ সুতো-বাঁধা বিড়ি কিনল। বাবু বিড়ি। সুমতি আবার বিড়ি পছন্দ করে না। তাতে কী। সে তো এখন পাশে নেই। থাকবেও না। অনেক দিন পর বিড়ির মধ্যে সে কাঁচা তামাক পাতার গন্ধ পায়। চোখ বুজলে শালমঞ্জরী। একই জায়গায় বাবু হয়ে বসে সে পর পর তিনটে বিড়ি আর দু-ভাঁড় চা খায়। তারপর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঠে। নাহ্, ব্রহ্মপুর যেতে হবে। গড়িয়ার মোড়ে নেমে দক্ষিণে খালপাড়। 'উষা গেট' দিয়েও যাওয়া যায়। ব্রিজের ধনুক পেরিয়ে রিক্সায় চাপে সে। এখানে জমির দাম, এখন, লাফ দিয়ে বাড়ছে। একটাই কারণ। গড়িয়া অব্দি মেট্রোরেল হবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। থ্যাঙ্ক য়্যু নীতিশকুমার। ভাগ্যিস জমির টুকরোটা নিজের নামে। থ্যাঙ্ক য়্যু বাদল, বাদল সেন। ভাবছে, ওটা বিক্রি করে দেবে। টাকা পয়সা হাতে নেই তেমন। সুমতির কাছে হাত পাতা যাবে না। অবশ্য কোনও দিন পাতেনি সে। রিক্সায় হেলান দিয়ে কেমন যেন ঘুম পায় তার। ফুরফুরে হাওয়া। ব্রহ্মপুর কলকাতা হলেও, কলকাতা না। পিনকোড আর প্রকৃতি তো এক নয়। এদিকটায় কলকাতার হৃদয়-ভূমির মতো পলিউশন নেই। সবটাই চমৎকার। কয়েক বছর টিকে থাকা যাবে। তার আজকাল প্রায় মনে হয় 'অতীত' হল মুক্তির জন্য সংগ্রাম, আর বর্তমান হল টিকে থাকা। ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। ভবিষ্যতের কথা সে ভাবে না। তাই কি মার্কসবাদ থেকে সরে আসছে। ব্ল্যাক-আউট।

বাড়ি ফিরতে সোয়া চারটে। দরজা বন্ধ। বাইরে কয়েক জোড়া চটি। নেমে আসে। ১৮৮ গরফা রোড। ফের ওঠে। দরজা ঠেলতে দরজা খুলে যায়। মিটিং ভাঙে। আসলে শ্রেণিশত্রুর সামনে তো আর মিটিং হয় না। সুমতি উষ্ণ।

—একটু পরে ঢুকলে পারতে। আর বেশিক্ষণ লাগত না।

সুমতি মোটেও জিজ্ঞেস করল না খেয়েছো কি না, কী খেলে? জমির টুকরোটা আছে তো। মন্দির-অ্যাপার্টমেন্টে যাওনি? মণিকাকারা কেমন আছেন? ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে ঢকঢক করে জল খায় বাদল। সুমতির সঙ্গে কথা বলে না। শার্ট খুলতেই বুক পকেট থেকে বিড়ির বান্ডিলটা বিছানায় গড়ায়। বাদল ভ্রূক্ষেপহীন। লুঙ্গি পরে বিছানায় উল্টোমুখ করে শুয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় : 'আহ্'। গজগজ করে সুমতি। 'আমার হয়েছে কপাল। এক কাপ চা পর্যন্ত করে নেবে না। দাসী-দাসী....সব কিছু করে দিতে হবে।' 'চা পেলে ভালো হত সত্ত্বেও বাদল বলে, 'তুমি চা নাও। আমার চা চাই না।' শান্ত গলা। সেখানে শিশিরের শব্দের মতো মৃদু নিরাশা নেই। উষ্ণতা-চিহ্নও নেই। সুমতি বাদলের দিকে তাকায়। মনে হয়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি—এই লোকটা অনেক কিছু করতে পারত জীবনে। অথচ পার্টি পার্টি করে জীবনপাত। খোদ সেন্টজেভিয়ার্স থেকে ম্যাথে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম. এস. সি পড়ার বদলে হোলটাইমার। চমৎকার। ল্যাডারের উঁচু ধাপ শেষ পর্যন্ত অস্পৃশ্য থেকে গেল। আসলে তোমাকে ঠিক গ্রুপে থাকতে হবে। এখন তো সব গুড়ে বালি। পি. ডি. এস-এ গোড়া থেকে শুরু। ইউ আর ইয়োর

ওন গ্রেভ-ডিগার। ফট্।

রাতে গোলমরিচ দিয়ে ডিমের ঝোল রাঁধল সুমতি। একটু সর্দি হয়েছে। ভালো লাগবে। সারা দিন ধকল কম যায়নি। খেয়ে দেয়ে ঘুমোলে শেষ পর্যন্ত ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে তারিখটা সরে যাবে। আলমারি খুলে দুনিয়ার কাগজপত্র বার করছে বাদল। পাগল কাকে বলে। তবু, রান্নাঘর থেকে অভ্যাসবশত, চেঁচায় সুমতি : 'আমার টাকায় হাত দেবে না কিন্তু'। ১৫ বছরে সুমতির টাকায় কোনওদিন হাত দেয়নি। তাই অবাক! দল ছাড়ায় স্ত্রীর কাছে সে তবে চোর।

সুমতি ভাবেনি, শুতে না শুতে সে এভাবে আক্রান্ত হবে। মাঝখানে দিন পনেরো কিছু হয়নি। এই সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া। উফ্, ৪২ বাদল এখন বস্তুত ২১। ধর্ষণে পটু। সুমতি শীতল। অর্থাৎ, এই খেলায় সে কোনও প্লেয়ার না। তার দুই স্তন পলু পোকার মতো নত। এক সময় সব শেষ হয়। ক্লান্ত বাদল, অর্ধভুক্ত বাদল নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকে। সুমতি ঘুমোয় না। সে জানে, বাদল কোনও প্রোটেকশন নেয়নি। হি ইজ আ ফ্যাসিস্ত। কিন্তু বাদল জানে না সে নিয়মিত পিল্-এ। পিল বড় ডেমোক্র্যাটিক। পিলের আর এক নাম ফ্রিডম।

খুব ভোরে উঠে পড়ে বাদল। সুমতি ঘুমিয়ে। করুণ শঙ্খের মতো স্তন। ঔরঙ্গাবাদী পার্টিশনে ঝুলে আছে শাদা ব্রা। গত রাতের হিংস্রতা। স্নান করে বাদল। এত সকালে অভ্যেস নেই, তবুও। রান্নাঘরে ঢুকে দু-কাপ চা করে। সুমতিকে ডাকে : 'ওঠো চা'। সুমতি ওঠে। ব্লাউজ পরে। ফের ময়ূরীর গলায় বলে,

—চা, এত ভোরে!

—হ্যাঁ, খাওয়ালুম। আমিও পারি। চেষ্টা করলে কী না পারা যায়। তবে ওভেনের লাইটারে ভালো ফ্লিকার হচ্ছে না, পাথর পাল্টে নিও।

—বাহ্, বেশ হয়েছে। এরকম কর না কেন?

—সরি, এটাই লাস্ট-কাপ ম্যাডাম। আসলে আমি বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে-দিচ্ছি। তুমি তো প্রপার্টি নও আমার, পার্টির....

এতক্ষণে সুমতির চোখ যায় স্যুটকেশের দিকে। বাদল হাসে।

—খুলে দেখো তোমার টাকা নিইনি। সোনাদানা নিইনি। ব্যাঙ্কের লকারের চাবি, জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টের চেকবই—সব যেমন থাকার, আছে, সব টাকা তুলে নিজের সিঙ্গল অ্যাকাউন্টে রেখে দিও। আজই।

একটা স্কেচ আঁকে সুমতি। ভেবেছিল বাদল সেই স্কেচের আদলে নিজেকে তৈরি করে নেবে। প্রতিটি অনিবার্য স্ট্রোক-রেখা তাল সমে সমে মিলে যাবে। সেই স্কেচমানুষ থেকে বাদল ক্রমে উপচে পড়ছে। বাদল জলস্রোতের মতো সিঁড়ি দিয়ে বয়ে যায়। তার পদশব্দের রং নীল। জলে গুলে যায়।

সামনের মাসে হেডমিসট্রেস রমাদির ফেয়ারওয়েল। নেকস্ট হেডমিসট্রেস সে। ডিসিশন হয়ে গেছে। পার্টি নেতৃত্ব জানে। হাই তুলল সুমতি। বড় ঘুম পাচ্ছে। সাতসকালে সে ঘুমিয়ে পড়ল ফের।

ডেথ ক্লেইম

ভবানী ঘটক

দরজা সামান্য ফাঁক হওয়া মানে ড. ঘোষ জানেন যে আরেকজন রুগি। অর্থাৎ আরেকটা ভোড়কো উদ্বিগ্ন মুখ। একে তো এই মফস্‌সল শহর, তার উপর আবার কার্ডিও চেম্বার। রিপ্রেজেন্টেটিভ ছেলেগুলো ছাড়া বেশ তরতাজা সাহসী মুখ এখানে বড় একটা নজরে পড়ে না। তাই খচাখচ প্রেসক্রিপশনটা লিখতে লিখতে একঝলক দৃষ্টি ফেলেও দ্বিতীয়বার বিনয়কে দেখেছেন ডাক্তার। তার ভ্রূ-দুটোর মাঝখানে সামান্য ভাঁজ ফুটেছে। এ সময়টা রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্যে বরাদ্দ নয়, লোকটার হাতে প্রতিনিধিমার্কা ব্যাগও নেই, রুগি রুগি হাবভাবও বোঝা গেল না। মুখ না তুলে ড. ঘোষ বিনয়ের উদ্দেশ্যে বলেন—'বসুন।'

টেবিলের এপাশে দুটো চেয়ারের একটাতে, ঠিক ড. ঘোষের মুখোমুখি বসল বিনয়। ডাক্তারের যুবক যুবক চেহারাটা যেন কার মতো...কার মতো...গলা বেড় দিয়ে বুকের দু-পাশে ঝুলন্ত স্টেথোটাকে সাপের মতো দেখালো নাকি? ...বিনয় দৃষ্টি ভাসিয়ে রাখে।...

ইতিমধ্যে ড. ঘোষ প্রেসক্রিপশন শেষ করে এ্যাসিস্টেন্ট উজ্জ্বলের দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন। রুগিকে প্রেসক্রিপশন বুঝিয়ে দেওয়ার মতো সময় তাঁর নেই, ওটা উজ্জ্বলই করে। উজ্জ্বল পেসেন্ট পার্টির কাছে এগিয়ে গেলে ড. ঘোষ তাঁর রিভলভিং চেয়ারে বসে বাঁই করে বাঁদিকে ঘুরে যান। আর ভিউবোর্ডের সুইচটা অফ করে ফের সঠিক পজিশানে ফিরে আসেন। এই সামান্য কাজটুকু তাঁর করবার কথা না, এ্যাসিসটেন্ট আছে। তবু ডাক্তারবাবু এটুকু খুঁজে নেন। যেন কাজটুকুর মধ্যে নতুন করে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া যায়—আবার নতুন রুগি, কী তার সমস্যা....এইসব আর কী। ড. ঘোষ বিনয়ের চোখে চোখ রাখেন—'বলুন, কী হয়েছে?'

—'আমার কিছু হয়নি ডাক্তারবাবু। শুধু এই ফর্মটা...'

বিনয় তাড়াতাড়ি গার্ডারে মোড়ানো কাগজগুলো থেকে রোল খুলে একখানা ছাপা কাগজ বার করল। সে বাড়িয়ে ধরতে যাবে, অমনি ড. ঘোষ বলেন—'কীসের ফর্ম ওটা?'

—'একটা ডেথ ক্লেইম, এল আই সির।'

ফর্মখানা সম্পূর্ণ মেলে ডাক্তারের সামনে এগিয়ে দেয় বিনয়।

টেবিলে হাতের ভাঁজ করা কনুই দুটোতে ভর রাখেন ড. ঘোষ। তার কোনও ভাবান্তর হল না। কিছুটা বা সঙ্কোচে বিনয় ড. ঘোষের মুখে তাকায়—'ফর্মটা একটু ফিল আপ করে দিন ডাক্তারবাবু।'

—'আমাকে ফিল আপ করতে হবে কেন?' চোখদুটো কুঁচকে ড. ঘোষ প্রশ্ন করেন।

—'আপনাকে, মানে...আপনি তো বাবাকে ট্রিটমেন্ট করতেন, তাই। এই ফর্মটাতে সে রকমই....' বিনয় আমতা আমতা করে। কথা সম্পূর্ণ করতে পারেনি।

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যান ড. ঘোষ। বিনয়ের মুখের থেকে চোখ সরিয়ে হঠাৎ ব্যস্ততা

দেখান। ঝটাঝট টেবিলের ড্রয়ারটা খোলেন, আবার সশব্দে বন্ধ করেন। চট করে পেন তুলে নেন। তারপর বিনয়ের দিকে না তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন—'আপনি পরে আসুন। বুঝতেই পারছেন, এখন তো.....'

বিনয় তেমনই কাচুমাচু মুখে বলে—'পরে বলতে কখন আসব ডাক্তারবাবু?'

ড. ঘোষ প্রথমে—'বিকেলের দিকে'—বলেও কথার পিঠে নিজেই শুধরে নেন—'না না, আপনি আগামীকাল আসুন।'

বলতে বলতে ডাক্তারবাবু কলিংবেলের ঝুলন্ত সুইচে হাত দিলেন। আর জাহাজের ভোঁ-র মতো ছোট্ট আওয়াজ—সুদূরের ডাক নেই, বরং কাছের, একেবারে কেজো এক সুর বাজল দরজায়। পরবর্তী রুগির ডাক পড়েছে। এমন ক্ষিপ্র হাতে ড. ঘোষ কাজটি করলেন, আর প্রায় হুড়মুড়িয়ে রুগিসহ দুজন ভদ্রলোক, মানে 'পেসেন্ট পার্টি' ঘরে ঢুকে এলেন যে বিনয় 'ধন্যবাদ' জানানোর সময়টুকু পায়নি। হয়তো ধন্যবাদের মতো অহৈতুকী সৌজন্য ডাক্তার আশা করেন না।

হাতের কাগজগুলোর সঙ্গে ফর্মটাও ফের রোল করতে করতে বিনয় উঠল। চেম্বারের বাইরে এল। কেন যে এই ঝামেলার কাজটুকু তাকে করতে হবে। ঝামেলা তো বটেই। কেননা, ডাক্তার—যে ধরনেরই হোক, তার কাছে গেলে বিনয় ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ে। হাজারো রোগের কথা, দুর্ভোগের কথা, যন্ত্রণা-কষ্টের কথা—এই বিড়ম্বিত জীবনের নিশ্চিত পরিণতির সেই কালো বিন্দুটা যেন কোথা থেকে উড়তে উড়তে এসে ঠিক বুকের মধ্যে ঢুকে যায়। ...আজও মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

কিন্তু ফর্মের নির্দেশে তো তেমনই লেখা আছে—'টু বি কমপ্লিটেড বাই দি মেডিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্ট অফ দি ডিসিজড্ ইন হিজ ইলনেস।" মন খারাপ নিয়ে হাঁটতে থাকে বিনয়। সবে চুল গজানো মাথার উপর দিয়ে হাতের চেটোখানা একবার বুলিয়ে আনে সে।

বাবার মৃত্যুর পর এল আই সির ডেথ ক্লেইমের জন্যে মায়ের দু-দণ্ড স্বস্তি পর্যন্ত নেই। এজেন্টকে ধরে, আর নিজেও একটু ছুটোছুটি করে ফর্মটা আনিয়েছে। সারাজীবনের বিনিময়ে বাবা পৃথিবীতে স্থাবর হিসাবে যা রেখে গেছেন, তা ওই বাড়ি আর এল আই সির প্রায় লাখ খানেক টাকা। বাড়িটা অবিশ্যি এল আই সির লোনে। লোনের দরুন এখনও কিছু টাকার দেনা আছে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ঘরে। বাড়িটাও বাঁধা। ফলে ডেথ ক্লেইমটা এ্যাকসেপ্টেড হলে পলিসি ম্যাচিওরিটির টাকা থেকে লোন কাটিয়ে বাড়ি মুক্ত করা হবে। বাড়ি মুক্তি পেলে বাবার আত্মারও মুক্তি ঘটবে—মায়ের ইচ্ছাটা এমনই।

মায়ের এই ইচ্ছার পাশ দিয়ে বিনয় একটুখানি আলো কি দ্যাখেনি—বেকারত্বের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে একটু নতুন আলো? লোনের দরুন হাজার চল্লিশেক কাটিয়ে দিয়েও তো মায়ের কাছে কিছু পরিমাণ টাকা থাকবে। সেখান থেকে যদি মাকে বুঝিয়ে...সামনে রাস্তা লাগোয়া ফালিটাতে যদি স্টেশনারি...কিংবা যদি মেডিসেনের স্টক সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা...অথবা ডি টি পির জন্যে যদি....

অনেকগুলো যদির কথা বিনয় উজ্জ্বলকে বলবে কিনা ভাবছিল। চেম্বারের বারান্দাতে বিনয়ের

সঙ্গে তার বারকয়েক চোখাচোখি হয়েছে। মাঝেমাঝে ঘরের বাইরে এসে সিরিয়াল অনুযায়ী রুগিদের নাম ডেকে যাচ্ছে উজ্জ্বল। কিন্তু বিনয় রুগি নয়, তার নাম তালিকাভুক্ত নয়, তাই সে তাকে ডাকেনি।

এই উজ্জ্বল বিনয়ের খুব পরিচিত। পূর্বপাড়া এ্যাথলিট ক্লাবের ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় বছর কয়েক আগে প্রথম স্থান পেয়েছিল সে। কালচারাল সেক্রেটারি হিসাবে বিনয় উজ্জ্বলের গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে তো বটেই, তাছাড়া রাস্তাঘাট-বাজার-খেলার মাঠ পথচলতি ভিড়ে দেখা হয়, হওয়াটা স্বাভাবিক। মফস্‌সলের এই এক সুবিধা অথবা অসুবিধা—প্রত্যেকেই প্রত্যেককে কোনও-না-কোনওভাবে চেনে, চিনবেই। তাই একজন রুগির পিছনে উজ্জ্বল ফের ঘর থেকে বেরোলে বিনয় ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে যায়—'উজ্জ্বল, ডাক্তারবাবু আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন। আমাকে ভাই যদি একটু......'

এমন ঝটিতে উজ্জ্বল তাকাল, যেন এই প্রথম বিনয়কে সে দেখছে—'আরে আগে বলবেন তো। স্যার যে এখুনি হাসপাতালে চলে যাবেন।'

—'স্যার? স্যার আবার কে?'

—'কেন, ডাক্তারবাবু।' উজ্জ্বল একটু বিস্ময় বোধ করে যেন।

—'ও। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ আগেই এখানে এসেছি।'

—'আসলেই তো হবে না। আমাকে জানাতে হবে।'

বেশ চটপট আর টানটান ভঙ্গিমায় কথাটা বলে উজ্জ্বল চেম্বারে ঢুকে যায় ফের।

বিনয় কিছু বলতে পারেনি। বারান্দায় এতগুলো রুগির মাঝে সে একটু কুঁকড়ে গেল। চেম্বারের নিয়মরীতির অদৃশ্য পরিকাঠামোকে এমন স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল বুঝিয়ে দিল, সে যেন অশিক্ষিত, আনপড়। মনে মনে তার কেমন এক হীনমন্যতা খেলে যায়। সে তো রুগি নয়। কিন্তু উপস্থিত প্রতিটা মানুষই এখানে ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রায় সকলেই হার্টের পেসেন্ট। এদের সময়ের ফাঁকফোকর গলিয়ে ব্যক্তিগত কাজটুকু করিয়ে নেবার মধ্যে কি একটু হলেও......ভাবনাটা মাথায় ঢুকে যেতে বিনয়ের আর কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করল না। বড় ছোট মনে হল নিজেকে।

কিন্তু ফর্মখানা তাকে ফিল আপ করাতেই হবে। না হলে সব শেষ—সব আশা ভরসা পরিকল্পনা শেষ। আর ড. ঘোষকে অন্য কোনও ভাবে ধরা পাওয়া সম্ভব নয়। দত্তবাড়ির নীচের তলা ভাড়া নেওয়া এই বাসাটা তাঁর চেম্বার, হাসপাতাল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে যাকে বলে। সপ্তাহে চারদিন মাত্র এখানে থাকেন, বাকি তিনদিন বাড়িতে চলে যান—কলকাতা। যে চারদিন ড. ঘোষ এখানকার জন্যে বরাদ্দ রাখেন, সে ক'দিন প্রোগ্রামে ঠাসা। প্রত্যেকটি ঘণ্টা কাজের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন সকালে নিজের চেম্বার, তারপর হাসপাতালে রাউন্ড ভিজিট, ফের চেম্বার...এর মধ্যে জরুরি কলবুক আছে, আউটডোর সিটিং আছে, প্রাইভেট নার্সিংহোম আছে, নাইট ডিউটিও মাঝেমাঝে ভাগে পড়ে। তাছাড়া মরণ বাঁচনের মতো কত কত জটিল রহস্য নিয়ে ডাক্তারবাবুর নাড়াচাড়া। জীবনের এই বাঁচা-মরার রহস্যের জাদু যার আয়ত্তে, সে কি শুধুই ডাক্তার? সে তো ঈশ্বরের মতো। বিনয়ের কি সাধ্য আছে যে হুট্ করে তার কাছে চলে যাবে? তাকে বিরক্ত করবে? বরং ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে

হলে উজ্জ্বল আছে। উজ্জ্বলের উপরেই ভরসা রাখতে হবে। যে করেই হোক, ড. ঘোষের কাছ থেকে একটুখানি সময় বার করে যদি সে দেয়...

"টাইম ইজ প্রেসাইজ, লাইফ ইজ প্রেসাস্।" জেব্রা ক্রসিং পার হচ্ছে একটা শিশু। আর ডানদিকে পরপর গাড়িগুলো থমকে দাঁড়িয়ে। বাকিটা নীল দেওয়াল।

ক্যালেন্ডারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বসে ছিল বিনয়। উদ্ধৃতিটা নিশ্চয় কোনও মহাপুরুষের সুভাষিত হবে। কিন্তু ক্রসিংয়ের ওই শিশু, আর হঠাৎ সিগন্যালে সবুজ আলো...আর গর্জে ওঠা গাড়িগুলো শিশুটাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে, পিষ্টে দিয়ে...

ভাবতে ভাবতে বিনয় মুহূর্তকাল চোখ বুজেছে, অমনি ছোট্ট ভোঁ। ধক্ করে ওঠে তার বুকটা। চেম্বারের দরজা খুলে উজ্জ্বল সরাসরি তার দিকে তাকায়—'আপনি আসুন।'

বেঞ্চি থেকে বিনয় তড়িঘড়ি ওঠে। কিন্তু চেম্বারের মধ্যে ঢুকতেই বুকের ধুকপুকানি তীব্র হয়। টেবিলে ঠেক্‌নো দেওয়া মুঠিবদ্ধ হাতের উপরে ড. ঘোষ থুতনির ভর রেখে চুপচাপ বসে আছেন। বিনয় টেবিলের কাছে গেলে ডাক্তারবাবুর চোখের তারাদুটোর নড়াচড়া স্থির হয়। তীক্ষ্ণ ফালাফালা করা এই দৃষ্টি বিনয়ের উপরে পড়ল—'আচ্ছা রোজ রোজ আপনি কী চান বলুন তো?'

আচমকা এ প্রশ্নে বিনয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

—'ফর্মখানা আমাকেই ফিল আপ করতে হবে?'

—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। আপনি তো বাবার ট্রিটমেন্ট করেছেন, তাই...মানে...' বিনয় ভরসা পেয়ে ঠোঁটে একটু হাসি টানাবার চেষ্টা করে।

—'কিন্তু আপনার বাবা যে মারা গেছেন, আমি জানব কীভাবে?' ড. ঘোষের চোখ দুটো একটু ছোট দেখায়। ফলে রহস্য রহস্য তাঁর চাহনিটা।

বিনয় বলে—'মারা না গেলে কি শুধু শুধু আপনাকে...'

—'শুনুন, ওসব মুখের কথার ব্যাপার না। ডেথ কেসের অনেক ঝামেলা।' বিনয়কে থামিয়ে দিয়ে ড. ঘোষ নিজেও একটু থামলেন। তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে বলেন—'আপনার বাবার মৃত্যুর কোনও প্রমাণ আছে?'

—'প্রমাণ, মানে...' ন্যাড়া মাথাটা চুলকাতে থাকে বিনয়।

—'ইয়েস প্রমাণ। ডেথ সার্টিফিকেট বা ওই ধরনের কিছু এভিডেন্স।'

—'মিউনিসিপালিটির ডেথ সার্টিফিকেট এখনও বেরোয়নি, ডাক্তারবাবু। কিন্তু ডাক্তারি ডেথ সার্টিফিকেটের জেরক্স আছে। বাড়িতে।'

—'জেরক্স না, আমি অরিজিনালটা দেখতে চাই।'

—'অরিজিনাল! কিন্তু ডাক্তারবাবু, অরিজিনাল সার্টিফিকেট তো বডি পোড়ানোর সময় শ্মশানে জমা দিতে হয়।'

—'আ'ম নট টু লুক আউট দ্যাট। আমি শুধু অরিজিনালটা দেখতে চাই।' বলে স্থির পলকে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর—'না হলে...' সুর টেনেও কথা শেষ না করে ধীরে ধীরে রিভলভিং চেয়ারে পিঠ ঠেস দিয়ে বসেন ড. ঘোষ। বিনয়ের চিন্তান্বিত

চোখমুখ ভালো করে জরিপ করতে থাকেন।

এ সময় বিনয় উজ্জ্বলের মুখের দিকে তাকায় একবার। ভাবলেশহীন মুখখানা তার। চোখ সরিয়ে টেবিলে স্ট্যান্ড করা হার্টের মডেল ডায়াগ্রামের দৃষ্টি রাখে সে। কিছুক্ষণ, মাত্র...তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায়—'ঠিক আছে, ডাক্তারবাবু।'

—'কী?'

—'আপনাকে আমি অরিজিনাল ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখাব।'

—'ও কে। ওটা নিয়ে আপনি পরে আসুন। আগে আমি দেখি ওটা।'

বলেই ড. ঘোষ কলিংবেলে হাত দিলেন।

শ্মশানে কালির থানে টুং টুং করে ঘণ্টা বাজছে। মন্দিরের অন্ধকারে ঘুপচিতে একা পুরোহিত। তার সামনে নিভু নিভু মোমবাতি। তাছাড়া বাকি শ্মশানঘাট শূন্য। দুটো বাঁধানো চিতার একটাতে নিভে যাওয়া আগুনের ধোঁয়া উড়ছে তখনও। মাঝেমাঝে নদী থেকে তিরতিরে হাওয়ায় সেই ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে সবদিকে। কেমন এক পোড়া পোড়া বোঁটকা গন্ধ।

নদীর দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বিনয়, চুপচাপ। কতবার তো এখানে এসেছে সে। তবু এমন পরিবেশে শ্মশানটা দ্যাখেনি কখনও। দিনের আলোর সামান্য রেশটুকু গপ্‌গপ্ করে গিলে ফেলছে অন্ধকার। ...এই আলো-আঁধারির জড়াপেটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিনয় যেন চোখের সামনে বাবার অন্তিম শয়ান দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, এই তো সেদিনের ঘটনা। নিথর সমাহিত দেহটা...একটু ঘি বাবার সাড়হীন দেহে মাখাতে মাখাতে মনে হচ্ছিল, এখুনি বাবা যদি উঠে বসে... 'বড় হ বিনু। এম এ পাশ করলেই হয় না। লোকের চোখে অন্তত মান্য হয়ে ওঠ।' ...কানের কাছে আজও কথাগুলো বাজে। আজও...বুকের থেকে মুচড়ে কী যেন গলায় উঠে এসে হারিয়ে যায়। দমকা এক আবেগে বিনয় হঠাৎ ডেকে ওঠে—'বাবা।'

—'এদিকে এসো, বিনয়।'

চমকে তাকিয়ে বিনয় দ্যাখে—মংকাদা। গেঁজেড় মংকা। শ্মশান অফিসে পুরসভা নিযুক্ত কর্মী—'আরে, তোমার ওয়ার্ডের কমিশনার ফোন করেছিল অফিসে। আমি বললাম, বিনয়কে চিনাতে হবে না। পুবপাড়া এ্যাথলিটের বিনয়কে চিনব না, তা হয়?'

হা হা করে হাসতে হাসতে মংকাদা বিনয়কে শ্মশান অফিসের ঘরে নিয়ে যায়। টেবিলের উপরে ধড়াস করে একটা ফাইল ফেলে বলে—'লাস্ট তিন মাসের ডেথ সার্টিফিকেট আছে এতে। কারেন্ট অফ। তোমাকেই বের করে নিতে হবে ভাই।'

টেবিলল্যাম্পের কালিপড়া কাচ। সলতেটা বাড়িয়ে দেয় মংকাদা—'ভাগ্যি ভালো তোমার, ফাইলটা মিউনিসিপালিটিতে যায়নি। দু-একদিনের মধ্যেই পাঠায়ে দেব।...'

এ কথাগুলো আর বিনয়ের কানে ঢোকেনি। সে তাড়াতাড়ি ফাইলের দড়ির ফাঁসটা খুলল। একটা একটা করে সার্টিফিকেট ওল্টাতে থাকে সে। তিনশো সাড়ে তিনশো সার্টিফিকেট—একটার পরে আরেকটা পড়ে রয়েছে। সার্টিফিকেট তো নয়, যেন একেকটা

লাশ ঘাঁটছে সে। বিনয়ের কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ...বাবার মৃত্যু তারিখ স্মরণ করে দ্রুত একসঙ্গে অনেকগুলো উল্টে নির্দিষ্ট ডাক্তারি ডেথ সার্টিফিকেটখানা পেয়ে যায় বিনয়। খুব এমন অসুবিধা হয়নি তার।

ফাইলটা ফের বাঁধতে বাঁধতে বিনয় বলে—'এটা আমি আবার জমা দিয়ে যাব, মংকাদা। একটা বিশেষ কাজ আছে।' বলেই বাইরে চলে আসে সে। ড. ঘোষের চেম্বারে যেতে হবে তাকে, এখনও সময় আছে। বিনয় দ্রুত পা চালায়।...

কেন যে এত ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে ড. ঘোষের কাছে, সে বুঝে পায় না। ফর্ম ফিল আপ করবার মতো মামুলি একটা বিষয়। মৃত মানুষের পরে সামান্য সহানুভূতি থাকলেই তো মিটানো যায়। তাঁরই পেসেন্ট ছিল, আজ নেই। সেই পেসেন্টর ব্যাপারে এতটুকু দায়বোধ অনুভব করেন না ডাক্তারবাবু! কেনই বা ডেথ সার্টিফিকেটের প্রসঙ্গ এল? আর কেন বিনয়কে বিশ্বাস করতে অসুবিধা তাঁর? ...বিনয়ের ভিতরে কোথাও একটা ক্ষোভ দানা পাকাতে থাকে। আনমনে হাঁটতে থাকে সে।

কখন যে পায়ে পায়ে ড. ঘোষের কার্ডিও চেম্বারে চলে এসেছে, খেয়াল করেনি বিনয়। রুগিদের ভিড় এখন কমে গেছে। কিন্তু কেমন এক ধরনের অস্থিরতা তার মনের মধ্যে শুরু হয়েছিল, একটুও তর সইছিল না। কেউ যেন ভিতর থেকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

সে এসে দাঁড়াতেই একজন রুগি চেম্বারের বাইরে এল। আরেকজন ঢুকতে যাবে। ঠিক এই ফাঁকটুকুতে সুযোগ বুঝে বিনয় দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকে পড়ে। ড. ঘোষের টেবিলের সামনে সটান গিয়ে দাঁড়ায়।

তাকে দেখেই ড. ঘোষ কড়া চোখে তাকান—'এ কি! আপনাকে তো ডাকা হয়নি।'

তার গলার স্বর গমগম করে উঠল।

—'ডাকা হয়নি ডাক্তারবাবু, ঠিকই। কিন্তু...'

—'কোনো কিন্তু-ফিন্তু বুঝি না। কী ভেবেছেন আপনি? যখন তখন চেম্বারে ঢোকা যায়? রাবিশ।' তীব্রভাবে ভ্রূ-দুটো কুঁচকান ড. ঘোষ—'শুনুন, আপনার অরিজিনাল ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছাড়া কিছুতেই....'

ড. ঘোষের রুক্ষ গলার স্বর হঠাৎ থমকায়। তাঁর কথা শেষ না হতেই বিনয় ডেথ সার্টিফিকেটখানা নীরবে সামনে বাড়িয়ে ধরে শুধু। ড. ঘোষ কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে তাকান প্রথমে। তারপর স্যাট্ করে বিনয়ের হাত থেকে সার্টিফিকেটখানা টেনে নেন। অত্যন্ত দ্রুত তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিনয়কে তক্ষুনি ফিরিয়ে দেন—'এই জন্যেই দেখতে চেয়েছিলাম।'

—'কী ডাক্তারবাবু?' বিনয় তাকিয়ে থাকে।

—'দেখুন এই সার্টিফিকেট আমার দেওয়া নয়। আমি লিখে দিইনি।'

—'হ্যাঁ, ঠিকই তো। বাবা যেদিন মারা গেলেন সেদিন আপনি এখানে ছিলেন না। বাড়ি গেছিলেন। শেষ সময়ে আমরা লোকাল ডক্টরকে নিয়ে এসে...'

—'ও. কে, সে সব আপনাদের ব্যাপার। আমি বলতে চাইছি, আমি ডেথ সার্টিফিকেট

দিইনি, তবে কেন ডেথ ক্লেইমের ফর্ম ফিল আপ করব?' বলতে বলতে দৃঢ়ভাবে দুদিকে মাথা নাড়লেন ড. ঘোষ—'না না; এ আমি কিছুতেই করব না।'

মুহূর্তে বিনয় অনুভব করল, তার কপালের রগদুটো দপ্‌দপ্ করছে। সারা দেহের রক্ত যেন মাথায় উঠে এসেছে। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে—'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনি বাবাকে ট্রিটমেন্ট করেছেন। আমার কাছে প্রেসক্রিপশানগুলো আছে। আপনি ছাড়া ফর্মের কয়েকটা কলাম যে...'

—'আরে আশ্চর্য ব্যাপার', ড. ঘোষ প্রচণ্ড বিরক্তি ঝরালেন—'মৃত্যুর বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিইনি, তবু আপনি বলছেন ফর্মখানা—'

—'আপনি প্রায় ছ-মাস ট্রিটমেন্ট করেছেন পেসেন্টকে। ফর্মের যে কলামগুলোতে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে জানতে চাওয়া আছে, সেগুলো...'

তার কথার মাঝে ড. ঘোষ টেবিলে এক চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালেন। বিশ্রি চিৎকারে ফেটে পড়েন—'স্টপ ইট ননসেন্স। তখন থেকে সেই এক কথা বলে যাচ্ছেন, ডিসগাস্টিং। ইউ গেট লস্ট এ্যাট ওয়ান্স। আই সে—' বলেই উজ্জ্বলকে ধমকে ওঠেন—'এই উজ্জ্বল, করছিস কী? বার করে দে। যখন তখন পাগল-ছাগল ঢুকে পড়ে দেখিস না?'

শরীরটা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে বিনয়ের। এ কী শুনছে সে...সে ননসেন্স?...সে কি সত্যিই পাগল? ছাগল? ...বাবার সেই কথাগুলো...চোখের দৃষ্টিটা কেমন ঘোলা হয়ে আসে বিনয়ের। প্রাণপণে স্থির রেখে একবার শুধু তাকানোর চেষ্টা করে সে। তার সামনে টেবিলের ওপাশে দাঁড়ানো ড. ঘোষের চেহারাটাকে এ সময় বিশাল এক দৈত্যের মতো মনে হল বিনয়ের। চোখ দিয়ে ঠিকরে আসছে আগুন। ...আগুন। ...তার দিকে এগিয়ে আসা উজ্জ্বলের মূর্তিটা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায় চোখের থেকে।...

বেশ কিছু সময় পরে বিনয় কার্ডিও চেম্বারের বারান্দায় একটা বেঞ্চির পরে নিজেকে আবিষ্কার করে।

"নেসেসিটি ইজ দি মাদার অফ ডিসকভারি"—প্রবচন অনুসারে পথটা বার করতে দুটো দিন লেগে গেল বিনয়ের। তার সঙ্গে যোগ করেছে কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রম মাত্র।

অবশ্য দুটো দিনের মধ্যে একটা দিন একেবারে ব্যর্থ। কেননা, সারাটা দিনের মধ্যে অন্তত চারবার রাখাল মিস্তিরের বাড়িতে হত্যে দিয়ে তারপর বিনয় ধরা পেয়েছে তাকে। গণ্যমান্য কমিশনার বলে শুধু নয়, রাখালদা এই শহরের তুলনায় বড় মাপের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অনেকক্ষণ চুপ করে শোনার পর রাখালদা যখন বলল—'দ্যাখ্, ডাক্তারি ইউনিয়নে ড. ঘোষ আমাদেরই লোক। কিন্তু অনেক বড় জায়গা ধরা আছে। আমি গেলেও হবে না, একবার যখন 'না' বলেছেন। তাছাড়া আমাকেও যে মাঝে মাঝে চেক আপে যেতে হয়।'—বিনয় তখন দেরি না করে বাইরে আসে। দিনটা কখন যেন রাতের অন্ধকারে ঢুকে গেছে।

বিনয় বাড়িতে না এসে সোজা ক্লাবঘরের আড্ডাতে চলে যায়। আর রাখালদার বাড়ি থেকে ক্লাবের পথে যেতে যেতে কিছু একটা ভর করে তার উপর। সে আবিষ্কারক হয়ে ওঠে। মাত্র একটা সিদ্ধান্ত।...জীবনে এই একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়েই নিজের স্বাধীনতা,

দৃঢ়তা—নিজের অস্তিত্বকে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারে বিনয়।...

ক্লাবের তাসের আড্ডাতে শম্ভু ছাড়া কর্তাব্যক্তিদের অন্য কেউ ছিল না। বিনয় শম্ভুকে অপেক্ষা করতে বলে বিশু কালি দিলু আর সনাতনদাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতে যায়। আর, দিলু ছাড়া বাকি সকলে ক্লাবঘরে এক জায়গায় হতে পেরেছিল। দুর্গাপুজো বা অন্য প্রতিযোগিতার সময়গুলোতে মাঝেমাঝে এমনই যৌথ আলোচনায় বসতে দেখা যায় এদেরকে।

তো পরদিন সকাল দশটা নাগাদ পূর্বপাড়া অ্যাথলিটের অন্তত দশ-এগারোজন তরুণ আর মাঝবয়সি যুবক ড. ঘোষের কার্ডিও চেম্বারে আসে। দুপুরের দিকে ঢলে পড়া জ্যৈষ্ঠের সকালটাতে রস নেই কোথাও, শুষ্ক। তবু চেম্বারে রুগিদের ভিড় চোখে পড়বার মতো। একসঙ্গে সকলে চেম্বারের বারান্দায় উঠে আসে। রুগিদের প্রত্যেকেই তাকিয়ে থাকে শুধু। কারো মুখে কোনো উচ্চ রব নেই। সনাতনদা সকলের আগে দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকে যায়। তার পিছন অন্যেরাও হুড়পাড় করে ঢুকে পড়ে।

—'কী ব্যাপার, আপনারা?' অপ্রস্তুতের মতো তাকিয়ে পড়েন ড. ঘোষ। বিরক্তিতে কিছু একটা বলতে যাবেন, অমনি বিনয়কে সকলের মাঝখানে দেখে ফেললেন।

সনাতনদা ডাক্তারের টেবিলে দুই হাতে শরীরের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ায়। লম্বা সুঠাম মানুষটা ড. ঘোষের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনে—'বিনয়ের ফর্মটাকে ফিল আপ করে দিতে হবে, রাস্কেল।'

দাঁতে দাঁত পিষা, বাজখাই গলায় নির্দেশের স্পষ্ট সুর ফেটে পড়ল ঘরের মধ্যে। সনাতনদার পিছনে বাকি সকলে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। আর পাশে বিনয় দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

সনাতনদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে ঝটিতে চোখ সরান ড. ঘোষ। তার পাশে দাঁড়ানো উজ্জ্বলের মুখে অসহায়ের মতো তাকান। উজ্জ্বলের মুখখানাও এ সময় ম্যাড়মেড়ে দেখায়।

ড. ঘোষ হঠাৎ স্বাভাবিকতায় ফিরতে চাইলেন—'হ্যাঁ, মানে...ডেথ ক্লেইম...যদি ভুলটুল হয়ে যায়...আসলে, ট্রিটমেন্টের সময়কার প্রেসক্রিপশানটা যদি...'

—'এই, প্রেসক্রিপশানটা দে।' সনাতনদা এবার সোজা হয়ে দাঁড়ান। তারপর চেয়ারে বসতে বসতে বলেন—'ফর্মখানা বার কর।'

ড. ঘোষ বাধ্যের মতো পূরণ করলেন। তারপর ড্রয়ার খুলে নিজের সিগনেচারের পাশে রবার স্ট্যাম্প মারলেন।

ফিল আপ করা ফর্মখানা নিতে নিতে বিনয় ড. ঘোষের চোখে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল একটু—'থ্যাংক ইউ. ড. ঘোষ।'

এই প্রথম বিনয় ইংরেজিতে জব্বর একটা ধন্যবাদ জানাল।

সমুদ্রপ্রাণ

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

যেভাবে জাগছে ঢেউ, আমার বন্ধুর মুখ, মরামুখ ফুটে উঠছে উপর-শাদায়।
কেন কী, কল্লোল মাথার মধ্যে স্মৃতি তোলে, যত না স্ফূর্তি, তীরে মেঘজ্বলা
শরত-আলোয়।

মন্দির দূর পাড়ায়। কিন্তু চন্দনের গন্ধ পাই,
ভিতু, পাপী মানুষের চোখও ঠাহর করলে দেখা যায়,
আলো-অন্ধকার পুজোপাঠ।
সমুদ্রপাশ ছেড়ে এক পা-ও নড়ছি না, 'প্রাণ আছে—প্রাণ নেই' এইসব মৃত্যুবোধ
মিথ্যে করে দিয়ে, এই একটু আগেই ফেনা ছিটোচ্ছিল বিষাদ।

শরতের ধর্ম-ই এমন, আরও কিছুক্ষণ টিলে দিলে,
অকরুণ, আনন্দ আটকানো যাবে না আর

মৃগয়া : ১লা এপ্রিল : ২০০৩

উৎপলকুমার গুপ্ত

আজ কাগজে বেরিয়েছে ইরাকে আমেরিকার আক্রমণে ফুটফুটে
এক মেয়ে
একটা বোচকা কাঁধে ফেলে
অনির্দিষ্ট নিয়তির পথে হেঁটে চলেছে—
সে জানে না কোথায় যাবে—কে তাকে পথ দেখাবে—
বাবা-মা হয়ত মৃত, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে পারে পালিয়েছে
জ্বলন্ত রাত্রির কালপ্রহরে সে ছুটতে শুরু করেছিল
তারপর ছুটতে ছুটতে এখন এই উষর মরুভূমিতে—
সভ্য পৃথিবী তার ছবি তুলছে পরদিন কাগজে ছাপবে—
কিন্তু সভ্য জগৎ কি পারল না বন্ধ করতে এই অন্যায় যুদ্ধ?
কেন পারল না?

কেন জ্বলেপুড়ে গেল ধ্বংস হল সভ্যতার প্রাচীন পিলসুজ?

সারাজীবন ধরে বহন করবে ওই ছোট মেয়েটি তার বোচকার চেয়েও
ভারি
এই আর্ত-জিজ্ঞাসাটি—
কিন্তু কোথাও সে উত্তর পাবে না
কারণ উত্তর যাদের দেবার কথা, তারাও হয়ত তখন
প্রস্তুত হচ্ছে
আর এক যুদ্ধের জন্য—
কারণ অপরকে ধ্বংস করাই আজ একমাত্র মৃগয়া।

বাজি

দীপেন রায়

দুধ অনেকক্ষণ গরম হচ্ছে
ওথলাবে এবার
বাঁ হাত ঘটির জল ঢালবে
ওথলানোর ঠিক মুখে
ভিতরে গুছিয়ে ওঠার জন্য।
এই সময়টুকু তোমার পক্ষে, সংসারের
এক মুহূর্ত
দিনের বাকিতে যা জরুরি
তা করতে চাইছো।
আর এভাবে
প্রতিবার উথলে ওঠার মুখ
ভেঙে দিচ্ছ।

আমি ভাবছি, কী নিপুণ তুমি,
দুধ গরম করছো
আর ওথলানোর মুখ ভাঙছো ঠাণ্ডা ছিটিয়ে।
এমনি করে সারাদিনের কাজ
নিমেষে সেরে উঠছো
আজকের সুখী মানুষদের একজন।

দিনের বাকি মুহূর্তগুলিতে
কোলের ওপর ভাঁজ করা আতিশয্যের একটি বিড়াল
খেলছে তোমাকে নিয়ে
আর কুশলী দাবাড়ুর মতো প্রত্যেক চালেই মারছো বাজি।

যেখানে শেয়াল নেই

অনুরাধা মহাপাত্র

আতুর রাক্ষসদল ছেয়ে আছে গ্রাম-গ্রামান্তের সব ধূসর ক্যাকটাসে
নির্বাসিত পলাতকা তুমি দ্যাখো দগ্ধ বৃক্ষসাজ।
শাত-অল-আরব থেকে বিপ্লবী মাতঙ্গী ইরাকী,
তাকে দেখে বেঁচে ওঠা যায়—তবে বলো।
স্বাধীন সে গোলাপের বন্যতায়, শুদ্ধ চারায়।

নিরাকাশ প্রশ্নবেঁধা দোভাষীর মতো আজ নিজের লুকোনো মুখ
নিজের রক্ত-ক্ষরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা
কবিত্বের, বন্ধুত্বের, ঘেয়ো হাসি, সমাজসেবার
যা কিছু মুখোশ আছে

জলের রঙহীন, পরিচয় শূন্য করে মানুষকে
আতঙ্কিত ঘণ্টাবাঁধা ভেড়া বানাবার
যেভাবে অকরুণ করুণ কোনো তৃণের উৎসার
তুমি সব মুছে ফেলো তোমার ও নিজস্ব গোলাপে।

তাইগ্রিসের জলে মহাতামাসায়, যেসব বাদুড় নামে
ইউফ্রেতিসের জলে বিষমন্থিত মন্দ্রিত নখর ভেজায়
দিক্‌চক্রবালের ডানায়
তুমি তাকে পাপড়িতে পাপড়িতে ভরে তোলো গোলাভ আভায়
বাংলার করবীকে চেনো তুমি? বসরার নীলাভ গোলাপ রাখো
অনির্ণেয় শঙ্খের, নিমেষ হননে

আতুর ডাইনির চল—চুলের ফ্যান্টাসি-জাল ছিঁড়ে
তুমি কি বেভুল কোনো শিস হানো, ফুলের সৌরভ কাড়া
এইসব ছায়াছায়া শূকরের ছায়া সন্ত্রাসে।

নীলিমা ও সহজজ্ঞানেরা জানে খাকি খুনরঙের ক্ষেপণে
পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে যারা, খগেনের মেসোকে হাসায়
খগেনকে চেনো তুমি? আমাদের পিসির ভাইপো হয়—
ঝুপড়িতে, থাকে চেতলায়
আমেরিকা ভেঙে পড়ল দেখে কেন আহা উহু, রেরে রেরে
সঙে ও কান্নায়
সঙিন চেয়ারে বসে যাদের তিমির কাটে ঘুঘু চরানোয়
নরসুন্দরেরা জানে, কার ঐ নকল চুল কাকে বা পরায়।
আমি ওই লুকোনো বিষণ্ণ মুখে গুপ্ত বিষমাখা কোনো কাফন পরি না
এমন নয় যে ঠিক গভীর গভীরতর ভালোবাসতে তুমিও পারো না।

দূর সমুদ্রের থেকে সকালের রোদ ধেয়ে আসে
আমার গোলাপচারা সে রোদে বন্য হয় দগ্ধতা হতে
যেখানে শেয়াল নেই, বাতাসের নিঃশ্বাসে কোনোও বাদুড়
যেখানে গোলাপ গোলাপ আর গোলাপের আলো দেখা দেয়
সে অরণ্যে বিপ্লব ও গর্ভধ্বংসে বিপ্লবীর মাকে যেন স্থান দিতে পারি।

আবার

সুব্রত রুদ্র

জেলের ভিতর ছায়া
মা যে আমার মায়া

আমি যাবো আকাশে
মাথা দেবো বালিশে

ফাঁসি ফাঁস ফাঁস ফাঁস
আমাকে কি চাস আমাকে কি চাস

মা আমি তোমার নসু
জীবন যাবে কাল নয় তো পর্শু

আমার রয়েই গেল দোষ
দীনেশ গুপ্ত এসেই আবার
মারতে গেলে করবে না আফশোষ

শিকড় সংগীত

বিকাশ গায়েন

এন্নিতে না কোন ঝগড়াই নেই
শাল শিমুলের বীথি
ছায়ায় ঘেরা লতাগুল্ম সংবেদি মর্মর
নিয়েই ছোট অরণ্যসংকুল সামগ্রিকে বাঁচা।

এ ওর পাতা একটুখানি হেসে
দুলিয়ে দেয়। আলো
তেরছা ভাবে পড়েছে কারও গায়ে
অন্যের কোল ঘেঁষে।
এ ওর শাখা জড়িয়ে খানিক এগোয়।
সব শিকড়-ই মাটিতেই যে গাঁথা
থাকে, থাকতে চায়
সামান্য তরাই
ভরে তুলেছে ময়না ছাতার তিতির কাকাতুয়া।

কেই না জানে মারাত্মক সে হাওয়া
এক লহমায় এসে
গাছপালাদের খেপিয়ে দিয়ে গেল

শতছিন্ন বনাঞ্চলে ভস্মে ভাঙাডালে
শিস্ দিয়েছে দগ্ধ ডানা পাখি—
বিপদ আবার ঘুরে আসতে পারে
আয় শিকড়ে সন্ধি করে রাখি।

নদী, স্পর্শ

নাসের হোসেন

রক্ত চুঁইয়ে পড়ে, যেতে যেতে বহুদূর, ঘাসের ভিতরে কত রকমের
সবুজ, কোথাও কোথাও কাদামাটি ছেনে মূর্তি গড়েছি, সেইসব
অবয়ব আজো চিরস্থায়ী রয়েছে, স্মৃতিতে, গাছের উপরে শব,

পাখিও যে নেই তা নয়, মাঝেমাঝেই অজস্র পাখি, মাঝেমাঝেই
একটিও নেই, সেখানে কেবল তাদের ছায়ারা ওড়াউড়ি করে, মাঠ
পেরিয়ে নতুন আর একটি নদী, স্পর্শ করি, প্রতিটি নদীই
চিরনবীন অথবা নবীনা, 'এই খেলতে যাবি না?' বলে উঠল
কোনো বালক বা বালিকা, মেঘ করে আসে, চাঁদ দুলছে

এলিজি

(সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণে)

ব্রত চক্রবর্তী

সুভাষ যাচ্ছেন।
লেনিন দেখছেন।

চললে হে?
ধর্মতলায় দাঁড়ানো লেনিন
অল্প গলা তুলে জানতে চাইলেন।
মিহি ভেজা গলায় সুভাষ বললেন :
তারপর
যেতে
যেতে
যেতে
মৃত্যুর সঙ্গে দেখা,
যাচ্ছি, যাই।

কিন্তু বিপ্লব? তার কী হবে?
সুভাষ কিংবা স্লেট রঙের আকাশের দিকে মুখ তুলে
যেন স্বগত প্রশ্নে লেনিন।
বারুদজামা-পরা পৃথিবীর দিকে
শেষবারের মতো চোখ রেখে সুভাষ বললেন,
এ ওকে গরম হাওয়া দিয়ে
যুদ্ধের মাঠে নিয়ে গিয়ে
অস্ত্রের ধার পরখ করতে লেগেছে,
এই দেখে গেলাম।

সমস্ত বিপ্লবের পথ
গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে গেছে...

লেনিন দেখছেন।
সুভাষ যাচ্ছেন।
শ্লোগানগুলোকে কবিতার দিকে নিয়ে যাওয়া,
বারুদের ফুলকিগুলোকে ফুল করা,
ট্রাকটরের পাশে কলম নামিয়ে দেওয়া
সুভাষকে দেখতে দেখতে লেনিন বললেন :
যাচ্ছ, চ'লে, কমরেড
নবযুগ আনবে না?

প্রিয় সুভাষদাকে

জিয়াদ আলী

লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে ফেলতে ফেলতে তিনি
স্বপ্ন দেখান লাল পতাকায় ঢেকে যাওয়া প্রিয়ভূমি।
অথচ মৃত্যু চলে এলে দরজায়
পতাকাবিহীন ফ্যাসিস্ত আদলে কারা তাঁকে নিয়ে হামলায়।

কার দেহ কারা কেড়ে নিয়ে যায় তাতে
কবির তাতে কী এসে যায়
তিনি থেকে যান নিজের মতোই কবিতার মহা-মহিমায়।

ইরাক যুদ্ধের শহীদ বন্ধুদের

পার্থ রাহা

তোমার হৃদয়ে এখন কোন স্পন্দন নেই
এখন তোমার হৃদয়
তোমার আবীর রাঙানো হৃদয়
মৃত
তোমার উচ্ছল গান

টাইগ্রিসের উথাল পাথাল গান
স্তব্ধ
স্তব্ধ তোমার স্বর

জানি একদিন বারুদগান্ধভরা ঘাস আর মাটি
তোমার কবরের উপর ফুল ফোটাবে
একদিন, কোন একদিন সেই ফুল
আকাশপানে তুলে মাথা
নদীর স্রোতের মত রক্তের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
দুলে দুলে
তোমার নামগান করবে

আমি এখনো জীবনের কাছাকাছি
এখনো তোমার আঘাত
আমার হৃদয়ে
তাজা
জীবন্ত
দগাদগে

এখন আগুন এখন কোথাও কোন জলকণা নেই।

খুব অন্ধকার ছিল
জয়তী রায়

খুব অন্ধকার ছিল,
কবুতর বাসা বেঁধেছিল ঘরে,
ছড়ানো পালকে বিষ্ঠায় ধুলিজট,
বন্ধ ছিল ঘরের কপাট—
মৃতশ্বাস পুরনো দেয়ালে, টিকটিকি
পোকা, অসহায় রাতপাখি
ডানা মেলে উড়তে পারেনি,
থেমেছিল ঘড়ি, উল্টে দেখেনি কেউ
ক্যালেন্ডারের ছেঁড়াপাতা,

বিষাদের বেহাগ রাগিণী
উদাসীন হেঁটে চলে গেছে—

আজ হঠাৎ হাওয়ায় ভাসে যুথীগন্ধ,
কার কোঁচড়ের ফুল এলোমেলো
খসে পড়ে আছে,
পুরনো বিবাদ ভুলে ওপারের পরিযায়ী পাখি
নতুন মৃণাল খুঁজে ফেরে,
পদ্মবীজ তুলে নেয় ঠোঁটে,
কচিঘাসে মুখ রাখে ছটফটে গঙ্গাফড়িং,
আবার প্রাণের সাড়া বদ্ধজলায়,
নতুন রঙের গন্ধ,
ভাঙাচোরা ছাদের কার্নিসে
কে সাজিয়েছে অপরূপ ফুলের কেয়ারি,
সারি সারি টবের বাহার,
ফুলপাতা ভিনদেশি, ভিন্নরঙ
সংসারের মেলা,
সাজানো পুতুল ছবি, গৃহস্থালী,
পশু, পাখি নবজাত শিশুর পোস্টার—

আমি নির্বাক, সামনে ক্যানভাস,
তবু আমার হাতের তুলি অন্যছবি
আঁকতে ভুলে গেছে।

সময়

গৌতম দাশগুপ্ত

ইলেকট্রিক নেমে আসে
নিচে জ্বলে শহর অচেনা
জড়োয়ার সেট্‌দুটি
সেন্‌কোর বোনের কাছে দেনা
ও নিয়েই জল খাবো
ভূতের মতন মরুঝড়ে
দেখবো না ডায়বেটিস

লাফায় তেলের গহ্বরে
তেলমাখা রোগাটে লম্বা
গুঁজিবক ডাকে মাঝরাতে
আবছা করুণ যুধিষ্ঠির
তুই কি বুঝিস
পোর্টসমাউথ-চুক্তির
অজ্ঞাতবাসের শেষে
পাক দিয়ে ওঠে কালো ধোঁয়া
বৃহন্নলা-খোঁপার মধ্যে
ঢুকে যায় হার্মাদ ভীমরুল
মার্চিং সং গায় মর্জিনা
তুষের কাথায়
এদিকে বারান্দায় আমি
বালাপোশ হয়ে দেখি
বাক্‌সো আলো করে বসে
সুরক্ষামণ্ডলী
বুধবাজারের মত—
বিক্রি করে মলম-সাবান
পোড়া অঙ্গ লুকোতে যারা
নামছে নদীতে
র‍্যাংলার ডেনিমে তাকে
ঢাকবে কোন্ ভুল সওদাগর।

স্তবগান

শ্যামল সেন

সারাজীবন শিখিনি কোনো স্তবগান।
প্রণামে বা প্রার্থনায়
দিনকে রাত অথবা রাতকে দিন দেখাবার
কোনো কৌশলপ্রণালী জানা নেই।

কালশিরা জন্মের দাগ দেখে
ধাইমা নাকি বলেছিলো—

'এ ছেলের রক্তে আছে বেয়ারা কোটাল
মানুষ হবে না।'

কথাটা সত্যি হয়েছে, মানুষ হইনি।
মাথা নত করে কোনো দেবদূত
অথবা ঈশ্বরপুরুষের গোলামী করিনি আমি।
জনমদুখিনী মা আমার
মৃত্যুর আগে মাথায় হাত রেখে বলেছিলো—
'মানুষের মধ্যে মিলেমিশে থাকিস।'

সেইদিন থেকে
অশুচি রক্তমাংসের বেড়া ভেঙে জোয়ারের টানে
আমি আমার মায়ের নামে
মনে মনে বিছিয়ে রেখেছি একমাত্র স্তবগান,

জন্মের মাটি আজ আমার চোখে মায়ের সমান।

বিকেলে

অনির্বাণ দত্ত

সব চোখ মেলে তুমি আমার দিকেই চেয়ে আছ,
রক্তচোষার মতো শুষে নিচ্ছ স্বেদ থেকে শ্রান্তির জল;
মেদ থেকে মজ্জা-মাস..অসাড়ে-অসাড়ে—
আমার সবুজ ভূমিতল
জমিয়েছে ধানফুল তবু অকৃপণ চোখের ভাঁড়ারে।

এ কেমন ভবিতব্য? লুঠেরার অদৃশ্য হাতে
বাড়ানো আমারই দুহাত। মুগ্ধ করতলে—সমুদ্রপিপাসা কবে
অঞ্জলি দিয়েছে বারবার?

পৃথিবীর কোনো নদী জানেনি যে রোমাঞ্চের ঢেউ, কোনো ঠোঁটই
শুশ্রূষায় পায়নি যে চুম্বনের বিভা—তাই চেয়ে..
ওরে মেয়ে—
শূন্যহাতই এ বিকেলে আরতির আলো ধরে রেখেছে নীরবে।

রাজসাক্ষী

অজিত বাইরী

অভিযোগ ভিত্তিহীন;
কিন্তু আমি রাজসাক্ষী
আসামীর বিরুদ্ধে
মিথ্যাচারে প্ররোচিত।

রাষ্ট্র স্বয়ং প্রতিহিংসাপরায়ণ;
বপন করে ত্রাস।
প্রতিবাদ করে যারা, তারা দেশদ্রোহী।

লক্ষ্য তাদের ভেদ করে যায় বর্ম
অপশাসন আর নৃশংসতার।
কিন্তু আমি রাজসাক্ষী
এসব কথা চিন্তা করাও বারণ।

আঁধার থেকে ছিট্‌কে আসে গুলি
সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকে যায় বুকের ভেতর,
তারপর ঝলকে ঝলকে রক্ত।
কিন্তু আমার ঘাড়ের উপর কটি মাথা?
এসব স্বীকার করব?

রক্তে ফুটে ওঠে মানচিত্র
দেশ সন্ত্রাসকবলিত;
কিন্তু আমি রাজসাক্ষী
দেখি চোখ বুজে আর শুনি কানে কালা।
বাক্‌, মেধা বন্ধক রেখে
আমি শুধু রাজসাক্ষী,
ঘাড়ের উপর আমার জ্বলজ্বলে
রাজসিক গলবন্ধের দাগ।

মীনরাশি

(কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চরণেষু)

দুলাল ঘোষ

যে কোন পুকুরে
প্রতি টানে তুলতেন
রুইকাতলা
লোভ আর লালা দিয়ে গড়া
আরো কতশত মাছ

কি এমন কঠিন কাজ
ভেবে
আমিও পেতেছি ছিপ;
আপনার ফর্মূলায়
আধার গেঁথে বঁড়শিতে
সেই থেকে
টানটান রেখেছি চোখ
ফাতনায়

দুপুর গড়িয়ে গেল
বিকেলও জানালো সেলাম
এখন এই নিভন্ত সন্ধ্যায়
উঠি, স্থির প্রত্যয়ে—
মীনরাশি ছাড়া
মাছেরা দেয় না ধরা—
অন্য কারো ফাঁদে

বিজ্ঞাপন

উপাসক কর্মকার

প্রথমেই বলে নেয়া ভাল
দাঁতের আছে বহুবিধ রূপ ও গুণ

মাজতে শিখুন সেভাবেই
দাঁত হেসে হবে খুন

দাঁতের সঙ্গে জানুন
হাতের সম্পর্ক চিরদিন

আপনার কব্জির উপর নির্ভর করবে ঠিক ঠিক
দাঁত মাজার কৃৎকৌশল

এই কৌশল কেউ কাউকে শিখিয়ে দেয় না
জেনে নিতে হয় সে তো সবাই জানেন

প্রতিদিন উজ্জ্বল করে তুলুন ঘষে ঘষে
দাঁতের সব কটি পঙক্তি

ছোপছাপ হলদেটে খয়া রং সব উঠে যাবে
আপনার প্রয়োজনীয় মৃদু আঙুলের ছোঁয়ায়

এখন আপনার বয়েস কত
সেই অনুপাতে চলবে আঙুল

দাঁতন কিংবা ব্রাশের ওঠানামা
শহুরে কি গ্রামীণ সেখানেও পদ্ধতি নানা

বেছে নিন পছন্দসই ব্রাশ অথবা দাঁতন
বয়স হিসেবে শক্ত অথবা নরম

মানচিত্র

রমেন আচার্য

এক হাত কেটেছিল উড়ন্ত টিনের চালে
সেবারের ভয়ঙ্কর ঝড়ে। আর মুখের বাঁদিক
পুড়ে গেছে দাঙ্গার আগুনে।—এরকম ক্ষতচিহ্ন নিয়ে

স্বদেশের মানচিত্র টাঙানো রয়েছে ক্লাসঘরে।
নিষ্পাপ শিশুর চোখ যাতে ক্রমে ক্রমে
দৃশ্যের নির্দয় প্রহারে
পাথরের চোখ হয়ে ওঠে?

আকাশ অরণ্য আর নদীর সংলাপ শুনে যারা
মাতৃভাষা শেখে,
সেইসব শিশুরা কোথায়?
ফাটা ছাদ বেয়ে জল পড়ে জীর্ণ ক্লাসঘরে। দুঃসময় এসে
থাবা মারে প্রচণ্ড আক্রোশে।

এরই মধ্যে একদিন
অন্য রকম আলো নেমে এলো ক্লিষ্ট পৃথিবীতে
ফুটবল-খেলার মাঠে ভেঙে পড়লো সমস্ত ইস্কুল। আর
ক্লাসঘরে একা এক বিষণ্ণ বালক
আন্তিগোনের মতো উঠে এসে
মানচিত্রের গভীরে শায়িত তার নিরুদ্দিষ্ট মা-কে খুঁজে পাবে?
সেইদিকে কিছুক্ষণ স্থির চেয়ে থেকে
তারপর অতি দ্রুত
মায়ের মুখের কালো ক্ষতচিহ্নগুলি
ঢেকে দেবে তুলির প্রলেপে।

তখনই কি ক্রুদ্ধ বাতাস তেড়ে এসে
বিষম ধাক্কা খাবে জানালার জালে? সশস্ত্র বাতাস
নিজেকে লুকিয়ে দেখবে,—ঘর আলো করে
বিপন্ন মায়ের কোলে ফুটে উঠছে অনাগত দিন।

সমুদ্রের কাছে গেলে

প্রদীপচন্দ্র বসু

সমুদ্র যা নেয়, ফেরায় নিমেষে—
দীঘা ও গোপালপুর গেছে যারা
এ কথাটা সকলেই জানে,

শুধু জানা নেই
সমুদ্র কী ভুলে যায় দেনা ও পাওনা,
ক্ষমা করে, সংখ্যাগুলি রাখে না স্মৃতিতে।

আমি বালিয়াড়ি জুড়ে লিখে দিই
দুঃখ ও ব্যর্থতা, মানুষের ভুল ব্যবহার...
অকস্মাৎ ঢেউ এসে মুছে দেয় সব,
জল নেমে গেলে দেখি, সাদা পাতা
সাদা আছে প্রথম দিনের মতো।

বালিয়াড়ি জুড়ে আর একবার লিখি
এ জীবনের সব পাপ, অপরাধ...
ঢেউ এসে এবারেও মুছে দেয় দ্রুত,
কালো পাতা মুহূর্তেই সাদা হয়ে যায়।

সমুদ্রের কাছে গেলে আজকাল
ডায়েরিটা রেখে যাই ঘরে।

অরবিন্দ দাশগুপ্ত-র পাঁচটি কবিতা

১. রবীন্দ্র ঠাকুর

আরম্ভের শেষ কিছু থাকে
শেষেরও আরম্ভ থাকে কিছু
তুমি একা হাঁটো দূর পথে—
পৃথিবী চলেছে পিছু পিছু

২. ভালোবাসা

গড়িমসি করে বলেছিলে—ভালোবাসি
অর্ধেক রাত কেটে গেলো ধুম জ্বরে
চোখের গভীরে অতৃপ্ত পরিযায়ী
পাখিরা ফিরছে, ডানা ভেঙে যায় ঝড়ে

৩. মেয়ে-মানুষ
মা তার গেছে অন্ধকারে ভেসে
বাপ-দাদা ভর সন্ধেবেলায় এসে
বিকিয়ে দিলো তার চিবুকের তিল
যুবতী তাই লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভে
দৌড়ে গিয়ে দুয়ারে দেয় খিল

৪. ছেঁড়া পাতা
স্বামী জনে জনে ডেকে বলেছিলো ওকে
—হাভাতে
পাড়া পড়শী-রা বলেছিলো—বানভাসি
তাকে, ডেকে নিলে ও তুমুল বনজ্যোৎস্না
ঘাসের শিশিরে মুখ ধুলো উপবাসী

৫. অন্ধকার
ছাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি
তাকে চুমু খেলো, পাতা খুলে দিলো জল
গাছে গাছে যেই ভ'রে এলো কুঁড়িগুলি
জোর ক'রে মুখে ঢেলে দিলো ফলিডল

পায়ে ধরে

অপূর্ব কর

এখন রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া
এমন কী ঝড়কেও অন্য গাঢ় প্রার্থনায় ডাকি।

সূর্য নেভা অন্ধকারে নয়
অন্য কোনো অন্ধকারে এখন ঢেকেছে দশ দিক

আমার কৃতাঞ্জলিপুটে চাওয়ার যে রোদ এখন
তাকে আমি গট্‌গট্‌ হেঁটে আসতে বলি
শীতের অভব্য পিকনিকের উপর চাবুক মেরে
সে যদি জাগিয়ে তোলে বসন্তোৎসব

বৃষ্টিকে ডাকি আমি সেই মেঘমল্লারের গানে
উঁচানো বল্লমের মতো যার সুতীক্ষ্ণ হিল্লোলে
ঝাপটে ঝাপটে ধুয়ে মুছে সব ক্লেদ হু হু ভেসে যায়,
জঞ্জাল-কাদায়-ক্লেদে কী ভয়ঙ্কর চারদিক থিক্‌থিক্।

বাতাসকে বলি যুদ্ধের নাকাড়া হয়েই সে যেন বাজে
দুঃসময়ে তাই বড়ো চিত্তে ভালো লাগে
সাহসের, প্রত্যয়ের ধুক্‌পুক কলিজায়
হাঁপরের টানে টানে প্রিয় হাওয়া যদি দেয় দুর্দম তেজ

ঝড়কে একটাই নিবেদন
আমার পৃথিবী এখন দুঃখের খুব
হৃদয়ে কত যে স্বপ্ন-পুরাণ মাটি চাপা পড়ে গেছে
যদি ঝড় আমার অহল্যার বুকে পা রেখে আবার জাগায় শিহরণ

সসাগরা পৃথিবীতে আবার নবজন্ম আমার
আবার আমার কাঁধে জীবন কেতন;
ও রোদ ও বৃষ্টি ও মৃদু ও দুরন্ত হাওয়া
তোমাদের যদি পা থাকে তোমাদের পায়ে ধরে

এখন আমার এই একান্ত চাওয়া।

দেখবে ত্রিভুবন

ব্রততী ঘোষরায়

আমাকে প্রশ্ন করছে রঙ ছোপানো মুখ
মলাট ছাড়া পুঁথির মত, যার দুপিঠ খোলা
তার রঙ কি আকাশ ফোটাবে—দেখে দেখে
কেউ আর চোখের পলক ফেলবে না।

কেন খাবো? সে বলছে—এই আগুন আমার
জিভে দিচ্ছে অনন্ত স্বাদ, তাকে বক্ষে রেখে

থই থই রঙ ফোটাবো—ডাকবো আয় বালিকা
স্মৃতি কৈশোর—সব ওড়ানো দুঃসাহসে আয়
মোহমুগুরে হাত রেখেছিস—পুরনো কেশর খুলে দে
বায়ুলোকে, আমি উড়ব অনেক আলো দিগন্তে

এইসব কথার ঝালর দিকভ্রষ্ট চারদিকে
আমি ঝুলিয়ে দেবো, আমার
মলাট-ছেঁড়া মুখ দেখবে ত্রিভুবন,
এই প্রহর আমার খোলামেলা, আমার
সহজযানী নৌকো—ভাসিয়ে দেব
—দেখবে ত্রিভুবন।

যাপনচিত্র

নমিতা চৌধুরী

বাচাল থেকে বোবা হবার মধ্যে
অনেক পথ হেঁটে আসা আছে
কোন কিছুই আর বলা যায় না এখন
বললেও কোন লাভ নেই
এই না বলতে বলতে শব্দ হারিয়ে গেল
চুপ হল কথা
না দেখাই ভাল চোখ শুধু চেয়ে থাকে
শুনতে না চাওয়ার জন্য কান সর্বদা প্রস্তুত
বধিরতা তাই বড় প্রিয় আজকাল

পূর্বপল্লীর ঝড়বৃষ্টি

বীথি চট্টোপাধ্যায়

পূর্বপল্লীতে আমার ছোটবাড়ি
   তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়েছি।
তোমাকে নিয়ে আমি ঝড় ও বিদ্যুতে,
   সেই যে একরাত কাটিয়েছি...

সে রাতে না পড়েও আমার জানা হল,
পুরোটা ফ্রয়েড আর বাৎসায়ন।
সে রাতে বুঝলাম তোমার শরীরেই,
লুকিয়ে থাকে রোজ আমার মন।
আমার মন মানে ওষ্ঠ অধরের
মধুর ব্যথাতুর অমনিবাস
তোমার সঙ্গেই পূর্বপল্লীতে
অনৈতিকভাবে রাত্রিবাস।
পূর্বপল্লীতে নিবিড় মেঘ আর
তারারা টুপ করে নামল যেই—
শরীরে শিহরণ সোনাঝুরির গাছে,
আমি তো সেই মেয়ে শোন না এই।
দেখ না বৃষ্টির ঝিমুনি ধরা নেশা,
ঝড় ও বাতাসের বাড়াবাড়ি।
পূর্বপল্লীতে জ্যোৎস্না বিদ্যুৎ,
আকাশে ক্ল্যাসিকাল তরবারি।
বারান্দায় আমি, ঘামছে ঠোঁটবুক...
এমন সুমধুর বৃষ্টিতেও
তোমার জিভে ঠোঁট হারিয়ে দিল যেন
পূর্বপল্লীর প্রকৃতিকেও।

নির্জনের উদ্দেশে এলিজি

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

আজ আমার বিপন্ন আত্মজীবনীর কীটদষ্ট শেষ পরিচ্ছেদ থেকে একটি খোলা পাতা
তোমাকে পড়ে শোনাব, নির্জন। ডানার উড়ান ছেঁটে ট্র্যাপিজের ক্লান্ত প্রদর্শনী,
অতঃপর পুনর্জন্ম, অথচ রক্তের গভীরে ক্রমে গাঢ়তর সোঁদা গন্ধ—পথ খুব
দীর্ঘ কিছু নয়, তবু মাইলফলকগুলি মনে রেখো, কেননা মোড় ঘুরতেই সামনে
ওই যে ধু ধু মাঠ, আর দিগন্তে বর্ষার ভারী হয়ে আসা আকাশের নিচে
শত-সহস্র সম্ভাব্য অনুষঙ্গের নির্মম ধ্বংসাবশেষের মতো এক পোড়ো বাড়ির কঙ্কাল,
দেখো, তার খুলি ফাটিয়ে আদ্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক আবেগসর্বস্ব এক হলদেটে
চাঁদ উঠে এল। নির্জন, তুমি তো জান, পরিপ্রেক্ষিতের কাছে ঋণ থাকে সকলেরই।
অধমর্ণ জীবনের দায় থেকে জায়মান মৃত্যুবীজ, ব্যপ্ত চিদাকাশ জানে প্রেম ও

অধিকারবোধ প্রথামতো সকলই বাঙ্‌ময়, তবু একটি অসুখী হাসি চেনা অভিমান থেকে
অচেনা প্রতর্ক গড়ে তোলে যদি, নিরাময় হবে বুঝি অসেতু সম্ভব ভালবাসা?
নির্জন, তুমি তো জান, সুরের বিহার সেরে যে-বিহঙ্গ এসে বসে ক্লান্ত নীল
নাবিকের কাঁধে, নিজেরই ডানার ওমে সে চেনে সন্তপ্ত পরবাস, তার
স্বরলিপিখানি তবু তাকে বলে চলে ভালবাসো, ভালবাসো, ভালবাসো,
নিরেট মূর্খের মতো ভালবাসো, যদি তাতে নিরাময় হয়। নির্জন, বাঁচাও
তাকে, দেখাও নোঙর-ছেঁড়া নাবিকের শেষ বিপন্নতাটুকু, যে-নাবিক নিজের
উড়ান ছেঁটে, ট্র্যাপিজের খেলা সেরে অবশেষে অন্তিম ভেসেছে নিরাশায়।

স্মৃতি-বিস্মৃতি

পঙ্কজ সাহা

কতোজন আমার বন্ধু ছিলো।

কেউ কেটে রেখেছে আমার হাত,
কেউ নিয়ে গেছে আমার পা,
কেউ উপড়ে নিয়েছে আমার দাঁত
কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে আমার চুল।

সবাই ভালোবাসায়
কোন স্মৃতি রাখতে চায় আমার।

দূরে দাঁড়িয়ে একজন অপলক
শেষ দেখলো আমায়
এক বিন্দু অশ্রু লুকলো,
আমার কোন স্মৃতি রাখতে চায় না সে,
আমার বন্ধু নয়
সে আমার প্রতিবেশী ছিলো।

শীত ফিরে আসে যদি

প্রবালকুমার বসু

পাশ থেকে সরে গেছ, যেন আর কোনোদিনই শীত আসবে না
চাঁদ ডুবে গেলে বালুতটে জাগে হিমগ্ন জলের উচ্ছ্বাস
অনেক অনেক দিন সমুদ্রের পাশাপাশি হাঁটাহাঁটি করে
জেনেছি কেমন করে ভারী হয়ে ওঠে বাষ্প, পাড় ভেঙে যায়
ভেঙে যায় সম্পর্ক, পরিবর্তনীয় ঋতুর আবেগে

পাশ থেকে সরে গেছ, সহসাই বেড়ে গেছে বয়সের ভার
শীত ফিরে আসে যদি অনন্যোপায়, কে ফেরাবে উষ্ণতা আবার?

যেভাবে বিশ্বায়ন

তাপস রায়

যে পাতা ফুল ফোটাচ্ছে তারও কথা বলো
চাঁদের হাসির পাশে ওই মেঘ
বাঙলা ইচ্ছের ইংরেজি তর্জমা বানানো

যে প্রেমিক ব্যথা দেয়, বিরহে তার জানাজানি
শিবমন্দিরের পর ভাঙা ঘর, ফুরফুরে হাওয়া
দূরত্ব নিভে যায়, ও-পশ্চিম, আমাকে বোঝ না

খুলে রাখা বুক, এই ছাইভস্ম, ক্রেতার সিন্দুক
কাঁথাখানি শিল্প, আর নামও বেশ, মানদাসুন্দরী
বাকিটা তুমিই জানো, নৌকো বাও, যাও অন্তঃপুর

একটি বার

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

একটি বার তাকাও আমার মুখের দিকে
একটি বার বন্ধ করো আলোর খেলা
একটি বার স্পন্দমান হৃদয় থেকে
ঝরাও ফুল ঝরাও পাতা সাঁঝের বেলা

একটি বার বধির করো আমাকে তুমি
একটি বার অন্ধ করে দাও অভিশাপ
একটি বার পুরনো সুর ফেরিওলার
শোনাও তুমি আমাকে দাও জন্মভূমি

একটি বার তোমার থেকে আমার কাছে
পালিয়ে এসে দুপুরগুলো সাঙ্গ করো
একটি বার স্পর্শ করো অশ্রুময়ী
সোনার খাঁচায় বনের পাখি বন্দী করো

অনন্তকাল প্রতীক্ষার সীমারেখায়
ঝরছে কুসুম নগ্ন স্থবির অত্যাচারে
একটি বার ফোটাও কথা ফোটাও তারা
একটি বার ব্যথায় তুমি সীমানা হারা।

তেল

শঙ্কর বসু

নাভিপদ্ম থেকে উঠে আসছে শব্দব্রহ্ম
আসতে আসতে আণবিক বিস্ফোরণ
সবটুকু দূষণ ছড়িয়ে দিল মাস্তানি ভাষাতে
তেল ভাসছে তেলে, তেল ভাসছে নদীতে
নদী সাগর যখন ভরতনাট্যমে থই থই করছে
তখন মাস্তানের ডাইনিং টেবিলে
জলের জায়গায় বিশুদ্ধ তেল, স্যান্ডউইচে তেল
তেলের স্যুপ খেতে খেতে
তার জুলজুলে চোখে ভেসে উঠবে
নতুন তেলের খোঁজ—তখন
বাঘ ও মেষশাবকের হন্যমান শরীরের ব্যবধান
মাত্র কয়েকটা মহাদেশ।

দহনবেলা
তৃপ্তি সান্ত্রা

পুড়ে যাচ্ছি খণ্ডকাব্য

ঢেউ এর পর ঢেউ আসছে আগুন।
কি দেখেছি কি দেখিনি এক কোঁচড়
আগুন ভুলের পথ।
পথ ভেঙে পয়ার কোথাও
শব্দে গাঁথা চোদ্দ প্রদীপ শরীর,
অন্তমিলের শুদ্ধতম সাঁকো
ভেঙে
আমরা পুড়ি নশ্বরতা
ছন্দহীন খণ্ডকাব্য রোজ।
কুচি কুচি উড়ছি রোজ
মৃত্যু রোজ জন্ম রোজ
পুড়ে যাচ্ছি প্রেম।
তোর
অন্তমিল পয়ার শরীর ভেঙে
খণ্ডকাব্য পুড়ে যাচ্ছি
রোজ—

তোমাকেই খুঁজি
মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম দিগন্ত আজ মেঘ মেঘ করে আছে সারাদিন ধরে
গতকাল রাতে যেন ফোন করে কি কি বলেছিলে?
বিদ্যুৎ আকাশ আজ, আকাশের তারে বাঁধা তোমার হাসিটি
তবু যেন মনে হয় তোমার পালক চোখ অন্যদিকে ঘুরে আছে খুলে

যতবার দেখা হয়, দৃষ্টি বিনিময়, সব সব যেন অর্থহীন লাগে
হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় তোমার সে নায়ক শরীর রোজই
কিছু তো বলবে আর কিছু নাও বলো যদি তোমার রেশম
বুকের ঐ খাঁজে জানো অতলান্ত কষ্ট নিয়ে কতবার তোমাকেই খুঁজি

খুঁজেছি অনেক এই বিশ্বস্ত দুপুরে তবু পাইনি কিছুই
আকাশে পাতালে আজ খুঁড়ছি অজস্র মাটি, আশা
ঝড়ে যদি সব শেষ, ঝড়ই যদি সব শেষ কথা
তবে দেখি, কতদূর বয়ে যায় আহা তোর পালক-চোখের ভালোবাসা

কদমছায়া

রমা চট্টোপাধ্যায়

বসেছিলাম খোয়াই ধারে একলা দিনে অন্যমনে
এমন সময় উড়িয়ে এলো ধুল
ও কালোমেঘ দেখতে পেলাম
লালশিমুলের ফুল যে ওড়া
সবটুকু কি আমার মনের ভুল?

ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের গানে
পথের ধারে প্রাণের টানে
ভাসতে ভাসতে কোন সুদূরে যাই—
নামলো তোড়ে জলের ধারা
মেঘবালিকার কোন ইশারা
ডাক দিয়েছে কাজ কি কিছু নাই?

কাজ তো আছে উঠোন ভরা
ধান পিটোনো চাল ছড়ানো
গামলা ভরা জলের মাঝে শীষ
ও কালো মেঘ আকাশ ভরে
অঝোর ধারে শ্রাবণধারা
পথের মাঝে কদমছায়া দিস।

বাঁচার জন্য প্রার্থনা

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

হাসপাতালে শুয়ে আছি। পশ্চিমের জানলাখানি খোলা
শয্যাপাশে তুমি শুধু,—ওষুধের গন্ধ, স্যালাইন
সুন্দরী নার্সের দল দ্রুতপায়ে ঘোরাফেরা করে
আমার বাঁহাত জানো, সূচফোটা ব্যথায় অসাড়
পশ্চিমের জানলা দিয়ে হাওয়া নয় নিওন আলোর দ্যুতি
  মাঝে মাঝে চোখে এসে পড়ে
শুধু তুমি বলে দাও আমার কি বেঁচে থাকা হবে?

সাদা অ্যাপ্রন এসে পাশের শয্যায় কার
        মুখ ঢেকে দিয়েছে চাদরে,
মুমূর্ষু লোকটি ছিল সকালেও হাসিখুশি, তখনও যে
        পূবের জানলা খোলা ছিল
এখন সে ঘুমিয়েছে, ওদিকে তাকাতে গিয়ে কাঁপছে শরীর।

এ কদিন শুধু তুমি শয্যাপাশে রয়েছো আমার
আমি আর বাঁচবো কি? অই বেডে যে নতুন রোগী এসে গেছে
তোমার সমস্ত গায়ে নিহত রক্তের ঘ্রাণ স্পষ্ট পাওয়া যায়
পশ্চিমের জানলা দিয়ে মৃতদের কলধ্বনি ভেসে আসে জোরে
তুমি তো সবই জানো, বসন্তকালেই যত প্রেমিকের মৃত্যু হতে পারে
আমার শয্যায় যাবে হয়ত বা কাল থেকে আর এক নতুন প্রেমিক

আমাকে বাঁচাবে তুমি? পারবে তো? বাঁচতে ইচ্ছে করে খুব
সেকথা তো জানো তুমি, আর জানে সবগুলি পূবের জানলা
  পারো যদি, আমায় বাঁচাও।

কথাঘর

বিশ্বজিৎ রায়

প্রতিসরণের মতো দূরে সরে যায় কথা
লক্ষ্যবস্তুগুলি দুলে দুলে আকাঙ্ক্ষাহীন
ধুলোর আস্তর জমে ক্রমশ কদাকার
হনন অক্ষর...

এভাবে শুরু করতে চাইনি কখনও,
অমরত্বের মতো শুধু বলে দিতে চেয়েছি যা কিছু সত্য গোপন
ভালোবাসা, প্রত্যাখ্যান, সোহাগ, বিষ—
সমস্ত জাগতিক...

অথচ, পাথরে ফুল ফোটাতে গিয়ে প্রতিবারই উঠে আসে
অমিশ্রিত কান্নার জল; দাউদাউ আগুন, হিংস্রপতন—
বহুদূরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মন্ত্র, সামগান,
জীবনমথিত কথাঘর...

শিশুমৃত্যু একটি অস্বচ্ছ জেলায়

সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধনযোগ্য নয় এভাবেই প্রকৃতিকে গ্রহণ করি
কত আসন বদলে বদলে শীর্ষে স্বভাবগম্ভীর হল রাষ্ট্র
ভাসমান সন্ধ্যা—দলে দলে পাখির মত পরিযায়ী
স্বার্থ পেরোতে পেরোতেই
শিশুগুলি ছোট ছোট হাড়ের মুঠি নিয়ে চলে গেল
কঙ্কালীতলায়, নদীর মান্দাসে বেহুলার মত উদাসীন
খেজুর পাতার নীচে দড়ি দড়ি মেঘ, গোরু সামলাই,
বাগাল, বাগানে আগাছায় শোক বয়ে যায়
সময় কি আছে শোক নিয়ে বসে থাকবো ফুটোচাল
ঘরের সঙ্গিন সিংহাসনে, চাটাইপাতার বিছানায়
ঘোর হয়ে এল কালো, ছোট গোল মাথার দাগটুকু
তুলোছেঁড়া বালিশে হিসিগন্ধ উবে গেছে গুনগুন বর্ষার

ভিজে সোঁদা ঘ্রাণে,
কাঁথাকানি মুছে নেয় হারিকেনে কালি, দুধের
ফ্যাকাশে দাগ নীল কেরোসিনে,
চামড়ার নীচে শিরশির সঙ্কেত পাঠাল কাঁধে, গাল
রাখত নরম, সব মনে করে বসে আছি! যাই,
কাঠে জ্বাল দিই, পড়ে এল বেলা,

ওদের শিশুগুলি অক্ষত আছে পাহাড়ের ওপারে,
কনভেন্টে কার্শিয়াংএ

শার্সি যুবক

শ্রাবণী ঘোষ

মিলেমিশে একাকার, তুমি আর আমি
অরণ্যে হাজার গাছ সবুজ বনানী
অরণ্যে আগুন লাগে অরণ্য হলুদ
পৃথিবীতে হুস্ নেই, তুমি আমি বুঁদ।
বেশি নয় ছুঁয়েছিলো আঙুলে আঙুল
একটু সে ছোঁয়াতেই এত বড় ভুল।
চারিদিকে ইঁট কাঠ মাঝে আমি একা
জানালার শার্সিতে তুমি দিলে দেখা
শার্সিতে প্রেম এল বইয়ে বকুল
ফুটে ওঠে অবয়ব ঘন কালো চুল
ছাতিমের নীচে ছিলো ভীরু ভীরু চোখ
পশ্চিমি লাল আলো, মাঝে কিছু লোক।
কৃষ্ণচূড়াটা ছিলো একা একা দাঁড়িয়ে
রাধাচূড়া কাছে এলো ন্যায় নীতি মাড়িয়ে
এখন শ্রাবণ মাস প্রেম গাঢ় হোক
জানালার কাছে এসো শার্সি যুবক।
মিলেমিশে একাকার হই তুমি আমি
অরণ্যে হাজার গাছ সবুজ বনানী।

সংবেদ

অত্রি ভৌমিক

যা কিছু প্রতিবাদের মতো—
ঝলসে ওঠে
যা কিছু বুকের ভিতর—
লালন সামাজিক
তারা অবিরত শব্দ খুঁজে মরে,
শব্দ খুঁজে মরে মূর্ত হবে বলে।
বৃদ্ধের মুখের সহস্র রেখার মতো
অসংখ্য কল্পনা আমার সকলেই
নিজস্ব সত্তা চায়
নিজস্ব সত্তা চায় মনোমতো চাওয়ায়।
দীর্ঘ পথে চলতে চলতে
নিঃসঙ্গ ছায়ার কাঁধে হাত রাখলে
চমকে ওঠে সে;
সে-ও কি চলতে চায় ভিন্ন পথে?
সকলেরই নিজস্ব অভিমান আছে,
আমিই শুধু চার দেওয়ালের মাঝে
নষ্ট ভ্রষ্ট হতে হতে
দু-হাতে আকাশ ছুঁতে চাই,
আকাশ ছুঁতে চাই
শেষ শক্তি উজাড় করে দিয়ে।

স্মৃতি-মেদুর
অমিতাভ বসু

এ সময় আর এক সময়, অচেনা অজানা।
বোশেখী বিকেল থেকে পথ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
পৃথুলা রাত্রিকে ছেনে ক্লান্ত পায়ে উত্তরিত হওয়া
অচেনা অজানা এক সময়ের
বিপন্ন গলিতে। সে নিরক্ত সময় অমোঘ।
অবিচ্ছিন্ন অনাদ্যন্ত সময়ের সকরুণ একটি অধ্যায়
এ সময় দিনশেষে ঘরে ফেরা বৈরাগীর
দোতারার মীড়ে গোপনে মন্ত্রণা দেয়—
নিজ নিজ ঘরে যেতে ফিরে—স্মৃতিতে আপন্ন কোনো
বিস্মৃত সত্তায় লীন একমুঠো ঘরে।
অচেনা, অজানা হোক,—এ সময় তবু জানি
মানুষের অতিভ্রান্ত নিয়তির দোসর নিশ্চিতি।
আজন্মের স্মৃতিন্যুব্জ চিত্রকল্পে মেদুর মধুর,
কখনোবা রক্তরাগ বেদনায় কালো,
কখনোবা লবণাক্ত অশ্রুভেজা কখনোবা প্রসন্ন আলোয়
ঝলোমলো এসময় পৃথিবীর ভালোবাসা হয়ে
শোধ করে দিয়ে যায় সবটুকু ঋণ-রিক্তদীর্ণ
জীবনের দুটি শূন্য মুঠিপূর্ণ করে।

দাম : ষাট টাকা

পরিচয়

ড. রণেন সেন

সুবিনয় রায়

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

পরিচয়

নভেম্বর '০৩-জানুয়ারি '০৪
কার্তিক-পৌষ ১৪১০
৪-৬ সংখ্যা ৭৩ বর্ষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে
মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

জন্মশতবর্ষে পাবলো নেরুদা-কে নিবেদিত কবিতা

তুমি কত কষ্ট পেয়েছো, কত ভালোবেসেছো

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মাচ্চু পিচ্চুর
খাড়াই দিয়ে নামছে নারেঙ্গ রাত।
সেই রাতে
সেই তারায় তারায় ফেটে পড়া-মেহ্‌ফিলের রাতে
হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে
স্পেনের জল মাটি নিসর্গ
যৌবন প্রেম মৃত্যু,
কেউ কথা বলছে না,
শুধু ভালো করে কান পাতলে শোনা যায়
বাতাসের ফিশফিশ হুঁশিয়ারি—
চুপ,
পাবলো নেরুদা কবিতা লিখছেন।

বলিভিয়ার অন্ধসূর্য-অরণ্যে
যখন রাইফেল পাশে নিয়ে
মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে নৈশাহার সেরে নিচ্ছে
কিউবান গেরিলা-তরুণেরা,
তখন হ্যামকে দোল খেতে খেতে
নেরুদা-র কবিতার বইয়ের পাতা
গ্যাংগ্রিনে সবুজ আঙুলে ওলটাচ্ছেন চে গুয়েভারা,
আর মাঝে মাঝে অস্ফুট তারিফ করছেন—
ভিভা লা নেরুদা।

চিলি থেকে বহুদূরে বসে
প্রাচ্যের ঝাঁ ঝাঁ সূর্যের নিচে
তোমার কাতালান আর আন্দালুসিয় আবেগে ঠাসা কবিতাগুলি নিয়ে
একমনে বাংলা বর্ণমালা সাজাচ্ছেন
দুই কবি সুভাষ মুখুজ্জে আর শক্তি চাটুজ্যে।

প্রতিভাহীন ভীরু মানুষ আমি এসব কিছুই পারি না,
শুধু পাঠশেষে তোমার কাব্যগ্রন্থের মলাটে
একটি লাজুক চুম্বন এঁকে দিয়ে বলি—
তুমি কত কষ্ট পেয়েছো, কত ভালোবেসেছো, পাবলো।

সেকালের কথা—৪

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বাল্যকালের নানা কথা

সেকালের একটি Primary School ও High School-এর কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই দুই প্রসঙ্গে বাল্যকালের সকল কথা বলা হয় নাই। তবে আমার বাল্যজীবনে বৈচিত্র্য বড় ছিল না। খেলাধুলা হইতে দূরে থাকিতাম। দেশভ্রমণ করি নাই। বলিতে পারি ঠাকুরমার আঁচল ধরিয়াই সমস্ত বাল্যকাল কাটাইয়াছি। তবে বাল্যকালের কতকগুলি ঘটনা এখনও ভুলি নাই। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার বয়স ছিল ছয়। অসহযোগ কী তাহা জানিতাম না। সে বিষয়ে গুরুজনেরাও আমাকে কিছু বুঝাইতেন না। আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময়েই আমরা কাঁচড়াপাড়া চলিয়া গেলাম। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় যেসব মিছিল, জনসমাবেশ হইত তাহার কিছু আভাস বেচু চাটার্জি স্ট্রিটের ঘরে বসিয়াই পাইতাম। বাড়ির কাছেই Amhurst Street-এ City College। সেই কলেজের ছাত্রদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনিতাম। বন্দেমাতরম কথাটির অর্থ না বুঝিলেও মনে হইত উহা একটি মন্ত্র বিশেষ। ওই ধ্বনি বার বার শুনিতে শুনিতে শব্দটি মুখস্থ হইল। মাঝে মাঝে আওড়াইতাম। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা আমাকে এই বন্দেমাতরম কথাটির অর্থ বুঝিতে সাহায্য করিল। আমার পিতার রাজসাহী কলেজের সহপাঠী প্রফুল্লচন্দ্র ভদ্রের দাদা অবিনাশচন্দ্র ভদ্র ছিলেন নোয়াখালি শহরের Police Inspector। কলিকাতায় গড়ের মাঠে Prince of Wales-এর সংবর্ধনায় জন্য যে বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল সেখানে অবিনাশ জ্যেঠামশায়ের duty পড়িল। তিনি আমাদের বাসায় উঠিলেন এবং অনুষ্ঠানের দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন আমি তাঁহার আর্দালির সঙ্গে থাকিব। বাড়িতে তখন বাবা অনুপস্থিত। আমায় ঠাকুরমা অবিনাশ জ্যাঠামশায়কে আমাকে গড়ের মাঠে লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। ময়দানে পৌঁছাইয়া অবিনাশ জ্যাঠামশায় Pavalion-এর এক কোণে আর্দালি এবং আমার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিলেন। একটি বেঞ্চিতে আমরা বসিলাম। Pavalion-এর অভ্যন্তরে সাহেব-মেমের ভিড়। এই সাহেবদের মধ্যে একজন Prince of Wales। কোন জন আমি বুঝিলাম না। যাহা হউক, ইংরাজি বাদ্য খুব শুনিলাম, সৈন্য-সামন্তের কুচকাওয়াজ দেখিলাম এবং কিছু বক্তৃতাও কানে আসিল। অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর অবিনাশ জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখি পিতৃবন্ধু উষাহরণ গুপ্ত উপস্থিত এবং তিনি খুব উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন কে আমাকে এই উৎসবে পাঠাইল। তিনি যখন শুনিলেন যে আমার ঠাকুরমা আমাকে ওই উৎসবে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন তিনি নীরব হইলেন

তবে তাঁহার উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি আমায় পিতার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বুঝিলাম আলোচনার বিষয় ছিল আমার গড়ের মাঠে গমন। আরও বুঝিলাম যে বাবা এই ব্যাপারে বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছেন। অবিনাশ জ্যাঠামশায়কে তিনি গুরুজন বলিয়া মানেন সেজন্য তিনি এই বিষয়টি লইয়া তাঁহার সঙ্গে কোনো কথা বলিলেন না। সব কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে ইংরাজ আমাদের শত্রু এবং ইংরাজের কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের যোগ দেওয়া এক বিষম অপরাধ। তৎকালীন রাজনীতির এইটুকুই বুঝিলাম। এখন এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়া দেখিতেছি যে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছি। কংগ্রেস যে অনুষ্ঠান boycott করিয়াছে আমি সেই অনুষ্ঠানে বেশ দিয়াছি। এই উষাহরণ গুপ্ত ছিলেন Gupta Friends বইয়ের দোকানের মালিক। বাবার সঙ্গে শ্যামচরণ দে স্ট্রিটে এই বইয়ের দোকানে বহুবার গিয়াছি। ইহার কয়েক বছর পরেই Gupta Friends মেটারলিংকের *নীলপাখী* বইখানি প্রকাশ করেন। উষাহরণ গুপ্ত (যাহাকে আমি দোস্ত বলিয়া ডাকিতাম) আমাকে একখণ্ড *নীলপাখী* দিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। দোস্ত আমাকে আরও একখানি বই দিয়াছিলেন। সেই বইখানি, গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত। পড়িয়া প্রথম বুঝিলাম স্বাধীনতা বলিয়া একটি বস্তু আছে এবং তাহা লাভ করিবার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন।

বিধানচন্দ্র রায়

আমরা যখন ৬ নম্বর রামকিষণ দাস লেনের একটি বাড়িতে থাকিতাম তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলাক্ষের এক বিষম typhoid হয়। রোগের যখন দ্বিতীয় মাস চলিতেছে তখন আমার ভাইয়ের চিকিৎসা ড. পি. ডি. বোস বাবাকে বলিলেন, বিধান রায়কে Call দিন। বিধান রায় আসিলেন এবং জানালা দিয়া রোগীকে দেখিয়া বলিলেন—The boy is dying। আমার তখন আট বছর বয়স। আমি কথাটির অর্থ বুঝিলাম। বিধানবাবু ঘরে আর প্রবেশ করিলেন না। তখন (১৯২৩) ড. রায়ের ভিজিট ছিল বত্রিশ টাকা। কোনো চিকিৎসক ডাকিলে যোলো টাকা। তবে বিমলাক্ষের অবস্থা দেখিয়া যে-কোনো লোক বলিবে মৃত্যু আসন্ন। অস্থিচর্মসার চেহারা, চক্ষু কোটরাগত এবং উদর বিশেষ স্ফীত। আমি দেখিলাম আমার বড়দি লক্ষ্মীর আসনের সামনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুরমা কাঁদিতেছেন। তখন অবশ্য typhoid-এর কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ড. পি. ডি. বোস বাবাকে বলিলেন রোগীকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিন। বাবা বলিলেন, রোগী তো আপনারই হাতে। ডাক্তারবাবু বলিলেন আমি এমন কিছু করিব যাহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া রোগীকে বাঁচাইবার অন্য কোনো উপায় নাই। ড. বোস বাবার অনুমতি লইয়া আমার ভাইকে পিচকারি দিলেন। এবং পরক্ষণেই রোগীর নাড়ি ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তরখণ্ডের মতো কতকগুলি বস্তু রোগীর উদর হইতে নির্গত হইল। এক ঘণ্টা পর ড. বোস বলিলেন রোগী সুস্থ হইতেছে। কিছুদিনের মধ্যে বিমলাক্ষ বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহার পর ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

এইখানে বাড়িতে অসুবিসুখ হইলে আত্মীয়স্বজন কীরকম সহযোগিতা করিতেন তাহা বলি। এ কালে দেখি কাহারও অসুখ হইলে আত্মীয়স্বজনরা টেলিফোনে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। কেহ বাড়িতে আসিয়া খবর লইয়া যান। এক মিনিট, দুই মিনিটের বেশি কেহ থাকেন না। কিন্তু ১৯২৩ সালে আমাদের কিছু আত্মীয় রোগীর সেবা করিবার জন্য আমাদের বাড়িতেই থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল সম্পর্কে আমার মাতুল যতীন্দ্রনাথ সেন। ইহার পুত্র শিশিরকুমার আজ একজন বহুশ্রুত ভূতত্ত্ববিদ।

যাহা হউক আমার ভাই সেবার সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৯২৮ সালে তাহার ভীষণ কলেরা হইল। তখন আমরা মামাবাড়িতে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নিলাখি গ্রামে। সেই গ্রামে কোনো ডাক্তার ছিল না। Saline দিবারও কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। আমরা বড় বিপাকে পড়িলাম। আমার বড় মামা জিতেন্দ্রনাথ সেন নৌকাযোগে বহরমগঞ্জে গেলেন ডাক্তার আনিতে। মামাবাড়ি আড়িয়ল খাঁ নদীর পারে। নদীতে ভাঙন শুরু হইয়াছে। আমার বাবা সন্ধ্যার পর নদীর পারে উদ্বিগ্নচিত্তে বিচরণ করিতেন। ভাইয়ের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। গ্রামের কোনো কোনো লোক মন্ত্রপূত জল লইয়া আসিত রোগীকে খাওয়াইবার জন্য। আমরা সেই জল গ্রহণ করিতাম কিন্তু রোগীকে খাওয়াইতাম না। যাহা হউক, ভাই ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিল। আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হইল। বাবা কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া আমার পিতামহী এবং বড়মাকে আনাইলেন। এই বড়মা বাল-বিধবা, নিঃসন্তান। তিনি আমার ভাইকে পালন করিতেন। বাবার ধারণা ছিল এই বড়মার আদর যত্নে আমার ভাই তাড়াতাড়ি সুস্থ হইবে। আর পিতামহীকে আনিলেন এই ভাবিয়া যে তিনি আমাদের সাংসারে এক মঙ্গলদায়িনী অভিভাবিকা, তাঁহার আশীর্বাদে সকলের মঙ্গল হইবে, কিছুদিন পরে আমরা সকলে কলিকাতা ফিরিলাম।

ওজনের হরির লুঠ

পিতামহীর ইচ্ছা হইল যে ছোট ভাইয়ের নিরাময়ের জন্য তাহার নামে ওজনের হরির লুঠ দিবেন। আমি ছোট ভাইকে লইয়া আমাদের বাড়ির কাছে একটি কয়লার দোকানে তাহার ওজন লইলাম। মনে আছে নয় বছরের রোগজীর্ণ শিশুটির ওজন হইল উনিশ সের। উল্টাডাঙা খালপাড়ের একটি বড় বাজনার দোকান হইতে উনিশ সের বাতাসা আনা হইল।

কীর্তনীয়া শীতল সেন

কীর্তনের জন্য আমার বাবা শীতল সেনকে বলিলেন, তিনি তখন কলিকাতার এক বিখ্যাত কীর্তনীয়া। বরিশালের মানুষ। তিনি রাজি হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাদক আমাদের সংগ্রহ করিতে হইল। ঠিক হইল বিজয়কাকা খোল বাজাইবেন এবং করতালের জন্য তিনিই একজন লোক ঠিক করিলেন। হারমনিয়াম ধরিলেন অবনীমোহন গুপ্ত। ইনি বরিশালের গৈলা গ্রামের মানুষ। তখন কলিকাতার পুলিশ ইনস্পেক্টার ছিলেন। আমাদের পল্লি বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটে থাকিতেন।

কীর্তনের দিন স্থির করা হইল। অতিথিদের জন্য পাঁচ সের ছানা আনা হইল এবং কিছু

পানতুয়াও আনা হইল। কীর্তনের শেষে চায়েরও বন্দোবস্ত ছিল। শীতল সেন সুপুরুষ সুকণ্ঠ। কীর্তন খুব জমিল। বড়মা আমার ছোটভাইকে জড়াইয়া কীর্তন শুনিলেন। তখন আমরা জানিতাম না যে হারমনিয়াম বাদক অবনীমোহন গুপ্তের একমাত্র কন্যা মীরার সঙ্গে এই ছোট ভাইয়ের বিবাহ হইবে। এই প্রসঙ্গ পরে আসিবে।

সেকালের আরও কথা

বাল্যকালে যাহা দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি তাহার তাৎপর্য তখন বুঝিতাম না। এখন বুঝিতেছি। সেকালের যৌথ পরিবারের বন্ধনের মূলে ছিল কোমল হৃদয়। সেই কথা বলিতেছি। আমরা তিন সহোদর ভাই বড়মার কাছেই থাকিতাম। মা আমাদের ভর্ৎসনাও করিতেন না আদরও করিতেন না। ইহার কারণ তখন বুঝি নাই। পরে বুঝিয়াছি। মা বড়মাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে আমরা তিন ভাই তাঁহারই সন্তান। তিনি আমাদের পালন করিবেন। এই ত্যাগ যে কত বড় ত্যাগ, তাহা এখন বুঝিতেছি। মায়ের এই বিবেক বুদ্ধির উৎস কোথায়? আমি মনে করি ইহার উৎস তাঁহার কোমল হৃদয়। বাঙালির কোমল হৃদয় সেকালে যেমন দেখিয়াছি একালে যেন তেমন দেখি না। একালে বঙ্গদেশের বড় দুর্দশা, চুরি, ডাকাতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। নারী নির্যাতনের কথাও অনেক শুনি। হাসপাতালে রোগীর সুচিকিৎসা হয় না। ইস্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সুশিক্ষা হয় না। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে বিরোধের অন্ত নাই। উৎকোচ গ্রহণ এবং উৎকোচ প্রদানের কাহিনিও সংবাদপত্রে পড়ি। রাম, শ্যাম, যদু, মধুর আচরণে, কথাবার্তায় স্নিগ্ধতার অভাব লক্ষ করি। এমন কেন হইল। আমি মনে করি না পুলিশের সাহায্যে এই অবস্থার অবসান সম্ভব। নূতন নূতন আইন জারি করিয়াও এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে বলিয়া মনে করি না। সমাজের বিপদ সমাজকেই দূর করিতে হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে কীসের অভাবে আমাদের এই দুরাবস্থা। আমি মনে করি আমাদের বড় অভাব হৃদয়ের অভাব। আমরা বড় হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। মানুষের সকল গুণের উৎস তাহার হৃদয়। আমাদের বিবেক বুদ্ধিও হৃদয়প্রসূত। যিনি বিবেকবান তিনি হৃদয়বান। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, শঙ্করের মস্তিষ্ক ছিল, বুদ্ধ বা চৈতন্যের হৃদয় তাঁহার ছিল না। বঙ্গদেশের প্রথম বৈষ্ণব কবি জয়দেব বুদ্ধের হৃদয়ের কথা বলিয়াছেন এবং সেই হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া বুদ্ধকে তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম, কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর—জয় জগদীশ হরে।'

আমরা যদি আমাদের হৃদয় হারাইয়া থাকি তাহা হইলে কী উপায়ে তাহা ফিরিয়া পাইব? রবীন্দ্রনাথের কথা—'হৃদয় যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।' এই করুণাই আমাদের সকল মৈত্রীর উৎস, কিন্তু করুণাধারা কখন আসিবে। মাইকেল বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'He has the heart of a Bengali mother'। এই heart কোথায় পাইব? আমার মনে হয় এখন আমাদের পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন নূতন করিয়া সাজাইতে হইবে। আমরা বড় চিৎকার করি, খুব তর্ক করি। আমাদের আনন্দ উৎসবেও যেন কোমলতার অভাব, শৃঙ্খলার অভাব। আমাদের এক নূতন জীবন বপন করিতে হইবে।

সাধুতার সংযম

সেকালে যেন সাধুতার মধ্যেও একটা সংযম ছিল, অর্থাৎ সাধু মানুষের সাধুতার অহংকার ছিল না। ইহা আমি আমার পিতার মধ্যে লক্ষ করিয়াছি। আমরা যখন ১১৭নং আপার সার্কুলার রোডে বাস করিতাম। তখন বাবা একদিন আমাদের বাসভবনের কাছে একটি খামে একশত টাকা কুড়াইয়া পাইলেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া বলিলেন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিয়া টাকা লইয়া যান। এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে আসিলেন এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিতে তাঁহার হাতে একশত টাকা দেওয়া হইল। তিনি ধন্যবাদ দিয়া গমনোদ্যত হইলে বাবা তাঁহাকে বলিলেন বিজ্ঞাপনের খরচ বাবদ আমাকে একটি টাকা দিতে হইবে। ভদ্রলোক বাবার হাতে একটি টাকা দিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। আমার তখন আট বছর বয়স। আমার মনে হইল টাকাটা না চাহিলেই ভালো হইত, বাবাকে সেই কথাই বলিলাম। বাবা বলিলেন পরের উপকার করা উচিত, কিন্তু এ বিষয়ে বাহাদুরি বর্জনীয়। টাকাটা যদি ছাড়িয়া দিতাম তাহা হইলে একটু বাহাদুরি করা হইত। বাল্যকালে গুরুজনদের মধ্যে অনেক গুণ দেখিয়াছি, কাহাকেও যেন বাহাদুরি করিতে দেখি নাই। কিন্তু এখন মানুষের অহমিকা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের কথাটি খুব মনে হয়—

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে

ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যেও কখনও অহংভাব বড় দেখি নাই। প্রতি বৎসর তপেন গুপ্ত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইত। কিন্তু ইহার জন্য তপেন গর্ববোধ করিত বলিয়া মনে হইত না। আমাদের ছয় ভাইয়ের মধ্যে কেহই প্রথম বা দ্বিতীয় হইতাম না। এ বিষয়ে বাবার বিন্দুমাত্র দুঃখ হইত না। পুরস্কার বিতরণের দিন যখন বাবাকে বলিতাম তপেন এবারও প্রথম হইয়াছে, তখন তিনি বলিতেন তপেনকে একদিন লইয়া আসিও, একটু মিষ্টিমুখ করিয়া যাইবে।

আমাদের পল্লিতেও যেন কাহারও সঙ্গে কাহারও বিরোধ ছিল না। বিশ্বাসবাড়ির খুব বড় এবং সুন্দর রোয়াক ছিল। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় পল্লির বহুলোক একত্র হইত। আমি সেখানে মাঝে মাঝে যাইতাম। এককোণে বসিয়া সকলের কথা শুনিতাম। বড়দের সঙ্গে গল্প করিবার অধিকার অবশ্য ছিল না। কিন্তু গল্প শুনিবার অধিকার ছিল। যে সব কথা শুনিতাম তাহা আবার ভাইদের বলিতাম। একদিন শুনি নির্মলদা কী খাইলে bowels clear হয় সেই কথাই বলিতেছে। তিনি বিশেষ করিয়া পাকা বেল এবং পাকা পেপে খাইতে বলিলেন। ঠিক ওই সময় দাসুদা একটি পাকা পেপে হাতে লইয়া রোয়াকে বসিলেন। তখন নির্মলদা বলিয়া, উঠিলেন ওই দেখ, দাসু আমাদের bowels হাতে লইয়াই চলাফেরা করিতেছে।

এই বিশ্বাসবাড়ির প্রাঙ্গনেই প্রতি বৎসর শুর্তি খেলা হইত। এক আনা দিয়া শুর্তির খাতায় নাম লিখাইতে হইত। প্রত্যেক নামের সঙ্গে একটি শব্দ লেখা হইত। একজনে একাধিক শব্দ লিখাইত। প্রত্যেক শব্দের জন্য এক আনা দিতে হইত। খেলার দিন একটি হাঁড়িতে ছোট

ছোট কাগজে ওই শব্দগুলি লিখিয়া কাগজটি মোড়াইয়া সূতা দিয়া বাঁধা হইত। এইরকম কয়েক হাজার কাগজের মোড়ক একটি হাঁড়িতে রাখা হইত। আর একটি হাঁড়িতে সমান সংখ্যক কাগজের মোড়ক রাখা হইত, এবং তাহার মধ্যে একশত মোড়কের কাগজে লিখা হইত 'মাল'। 'মাল' বলিতে বুঝাইত এক কলসি খেজুরি গুড়। বাকি হাজার হাজার কাগজে কিছুই লেখা থাকিত না। প্রথম হাঁড়ি হইতে একটি কাগজ খুলিয়া উহাতে লিখিত শব্দটি উচ্চারণ করা হইত। তাহার পর দ্বিতীয় হাঁড়ি হইতে একটি কাগজের মোড়ক খোলা হইত এবং তাহাতে কিছু লেখা না থাকিলে চিৎকার করিয়া বলা হইত 'ফর্সা'। আর যদি লেখা থাকিত 'মাল'। তাহা হইলে 'মাল' বলিয়া চিৎকার করা হইত। সারারাত এই খেলা চলিত। একবার আমি এক আনা খরচ করিয়া শুর্তির খাতায় নাম লেখাইয়া ছিলাম। ইংরাজি বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমি International শব্দটি দিয়াছিলাম। আমার ভাগ্যে 'মাল' জুটিয়াছিল। এক কলসি খেজুরের গুড় লাভ করিয়া পিতামহী খুশি হইয়াছিলেন। আমার জীবনে প্রথম পুরস্কার এক হাড়ি খেজুরি গুড়।

বাল্য শিক্ষা

বাল্যকালকে বিদায় দিবার পূর্বে একটি কথা বলিতে চাহিতেছি। আমার বাল্যকাল বড় বর্ণময় ছিল না। আমি একটি সাধারণ ছেলে ছিলাম। এই সময় আমার জীবনে অসাধারণ কিছু ঘটে নাই। কিন্তু আজ যখন বাল্যকালের কথা স্মরণ করি তখন ভাবি এই সময়ে মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে একটি বড় জিনিস শিখিয়াছিলাম। তখন ইহার মূল্য যেন বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি। শহরে বাস করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কথিত স্নিগ্ধ নদী দেখি নাই। ধূম্র পাহাড়ও দেখি নাই। ধানের খেতে ঢেউ খেলিতে দেখি নাই। কিন্তু হৃদয়বান বাঙালি অনেক দেখিয়াছি। ভাইয়ের মায়ের এমন স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ—এই কথাটির সত্যতা তখন উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি সেকালে সমগ্র সমাজ এক নিবিড় স্নেহের ডোরে বাঁধা। পল্লির অনেক যৌথ পরিবারে ইহা লক্ষ করিয়াছি। এখানে আমাদের পরিবারের প্রসঙ্গ করিতে পারি। আমার বড়মার অর্থাৎ বড় জেঠিমার খুড়তুত ভাইয়ের স্ত্রীর Cancer হইয়াছিল। তিনি স্বামী, পুত্র, কন্যা লইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। মাসের পর মাস এই পরিবার আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। আমার বাবার এক সহপাঠীর দাদা অবিনাশচন্দ্র ভদ্র নোয়াখালিতে পুলিশ ইন্স্পেকটার ছিলেন। তিনি যক্ষার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় তিনি থাকিতেন। আমার মা, জেঠিমা তাঁহার আহার লইয়া ওই ঘরে আসিতেন। আমিও অনেক সময় অবিনাশ জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গল্প করিতাম। একালে কোনো বাড়িতে অসুস্থ আত্মীয়স্বজন বড় দেখি না। এই হৃদয়ের বন্ধন এখন বিরল। এখন শুনি হাসপাতালে রোগীর সুচিকিৎসা হয় না। ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার মূল কারণ এই যে বাঙালি আজ তার হৃদয় হারাইয়াছে।

স্কটিশ চার্চ কলেজ

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগেই পাস করিয়াছিলাম। তখন প্রথম বিভাগে পাস করিলেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়া যাইত। কোনো admission test ছিল না। কিন্তু আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হইলাম। দুইটি কারণে। স্কটিশ চার্চ কলেজ আমাদের বাড়ির কাছে, হাঁটাপথ। দ্বিতীয় কারণ এই যে সুধীর দাদা এই কলেজের অধ্যাপক। আমাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয় শরবিন্দু সেনগুপ্ত তখন ওই কলেজে বি এ পড়িতেছেন। তিনি আমাদের লেখাপড়ায় খুব সাহায্য করিতেন। আই এ ক্লাসের প্রায় সব বই তাঁহার কাছে পাইলাম। স্কটিশ চার্চ কলেজে কোনো admission test ছিল না। কিন্তু interview ছিল। অধ্যক্ষ Dr. W.S Urquhart এই Interview লইতেন। এই প্রথম এক সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কেবল নামটি জিজ্ঞাসা করিয়া Optional Subject কোন তিনটি পড়িব তাহা জানিতে চাহিলেন। আমি সভয়ে বলিলাম, History, Logic, Civics। অধ্যক্ষ মহাশয় আমার application-এর উপরে admit কথাটি লিখিয়া কাগজখানি আমার হাতে দিলেন। মনে আছে কলেজের অট্টালিকা, কলেজ হল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কলেজের দপ্তরে ভর্তির টাকা জমা দিয়া হেদুয়ার দিঘিটি পরিক্রমা করিয়া আনন্দে বাড়ি ফিরিলাম। তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের খুব খ্যাতি ছিল। মনে আছে কলেজ আরম্ভ হইল ১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাই। কলেজ খুলিবার আগের দিন সন্ধ্যার পর বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে প্রত্যহ দশ মিনিট Prayer হয় এবং কুড়ি মিনিট Bible Class হয়। বাবা বলিলেন আমি যেন prayer-এ এবং Bible Class-এ উপস্থিত থাকি। আমি পিতার এই আদেশ পালন করিয়াছি। যখন Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন আমার এক ইংরাজির অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, How is it that you know more of the English Bible than our Christian Students? আমি বলিয়াছিলাম ইহাতে আমার কোনো কৃতিত্ব নাই। আমি চার বছর কলেজে প্রত্যহ Bible Class করিয়াছি এবং এই Class লইতেন কোনো ইংরাজিভাষী অধ্যাপক। তবে Bible Class-এ Old Testament পড়ান হইত না। প্রতি বৎসর আমরা এক খণ্ড New Testament বিনামূল্যে পাইতাম। এই New Testament আমার প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকই বড় সুন্দর পড়াইতেন, ইংরাজির অধ্যাপকদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন ইংরাজিভাষী Scotish Missionary। তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন Rev. Arthur Mowat। কলেজের Vice Principal Rev. Allan Cameron ইংরাজি পড়াইতেন। আর যে তিনজন ইংরাজি পড়াইতেন তাঁহারা হইলেন M.D. Gray, Water Sotherland এবং Miss Logan। তবে ইংরাজির শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন বীরেন্দ্রবিনোদ রায়। সুশীলচন্দ্র দত্ত বড় সুন্দর আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলিতাম তিনি সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, সুবেশ।

বীরেন্দ্রবিনোদ রায় ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, ঈষৎ গোলাকৃতি, কিন্তু পরিচ্ছদে পাকা সাহেব। ক্লাসে ভুলেও একটি বাংলা কথা উচ্চারণ করিতেন না। উনি আমাদের Macaulayর

History of England-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদটি পড়াইতেন। Macaulay-র Style-এর বৈশিষ্ট্য বড় সুন্দর বুঝাইতেন। কখনও কখনও Macaulay-র Style এবং ওনার Style মিশিয়া একাকার হইত। Macaulay-র History of England-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় ছিল London শহরের ক্রমবর্ধমান প্রসার। এই অংশটি শেষ করিয়া বীরেন্দ্রবিনোদ রায় বলিলেন, A city is like a monster eating up the neighbouring Villages। উনি যে সমস্ত ইংরাজি বাক্য বলিতেন তাহা আমাদের মুখস্থ হইয়া যাইত।

সুশীলচন্দ্র দত্ত বড় সুন্দর আবৃত্তি করিতেন। তিনি আমাদের Oliver Goldsmith-এর *The Deserted Village* পড়াইতেন। তিনি এমন সুন্দর আবৃত্তি করিতেন যে Goldsmith-এর অনেক লাইন মুখস্থ হইয়া যাইত। দুইটি লাইন এখনও আমার কানে বাজে—

In fares the land, to has tening ills a prey
Where weath accumulatese and men decay..

Industrial Revolution-এর tragedy যেন Goldsmith দুই লাইনে বুঝাইয়া দিলেন।

Civics বিষয়টি চারিভাগে বিভক্ত ছিল—General Economics—৫০ নম্বর, Indian Economics—৫০ নম্বর Politics—৫০ নম্বর, Constitution—৫০ নম্বর। Politics ও Constitution পড়াইতেন নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। বড় সুন্দর ইংরাজি বলিতেন। Politics ক্লাসে আমরা ইংরাজি শিখিতাম। Economics পড়াইতেন N.A.Nateson। তিনি সুবক্তা ছিলেন, Economics-এর আর একজন অধ্যাপক ছিলেন John Kellas। তাঁহার অধ্যাপনার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। একটু পুনরুক্তির দোষও ছিল। একদিন একটি ছাত্র উঠিয়া বলিল Sir এই কথাটি তো বহুবার শুনিলাম। তিনি একটু উচ্চস্বরে বলিলেন, I believe in repetition। এই কথাটির মূল্য আছে। যাহা বারবার শুনি মনে গাঁথিয়া যায়। ইতিহাসের ছিল তিনটি ভাগ—Greek history—৫০ নম্বর, Roman history—৫০ নম্বর British history—১০০ নম্বর। British history পড়াইতেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ইহার পুত্র বাদল সরকার আমাদের নাট্যজগতে একটি বহুশ্রুতি নাম। মহেন্দ্রলাল সরকার বরিশালের মানুষ ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিলাম, Greek history পড়াইতেন অরুণচন্দ্র সেন, দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র এবং কবি সময় সেনের পিতা। আমাদের এই বিষয়ে পাঠ্য ছিল Bury-র *History of Grecee*। বইখানি আমাদের এমনভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে অধ্যাপকের কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিবার যেন প্রয়োজন হইত না। Roman history পড়াইতেন Rev. Fraser। মনে হইত তিনি সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিতেন না। Roman history-র নাটকীয়তাও যেন তিনি তেমন উপস্থিত করিতে পারিতেন না। বড় হইয়া যখন Gibbon-এর *Decline and Fall of the Roman Empire* বা Mommsen-এর *History of Rome* পড়িলাম তখন বুঝিলাম এই ইতিহাসের বস্তু উপস্থিত করিতে হইলে প্রতিভার প্রয়োজন।

Logic-এর অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র সেন ছিলেন সেকালের এক বহুশ্রুত অধ্যাপক। তিনি Deductive Logic পড়াইতেন। Inductive Logic পড়াইতেন সুবোধচন্দ্র দে। তিনিও খুব পরিপাটি করিয়া পড়াইতেন।

এখন বাংলা ক্লাসের কথা বলি। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন মন্মথমোহন বসু। তাঁহার অধ্যাপনায় একটা বাগ্মিতার ভাব লক্ষ করিয়াছি। তিনি সেকালের সাহিত্য, সভা, সমিতির এক প্রধান পুরুষ ছিলেন। বাংলা নাটক সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্ত ছিলেন। তবে কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীর বাংলার প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। তিনি ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েক বছর দার্জিলিং Language School অধ্যাপনা করিয়া ১৯২৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। সুধীরকুমার সেকালের বাংলায় এক শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। *কাব্যালোক* নামে অলংকার সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন। সুধীরকুমার দাশগুপ্ত জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার দাদা। তিনি আমাদের এত কাছের মানুষ ছিলেন যে তাঁহাকে আমি জ্যেষ্ঠ সহোদর হিসাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। মাহিলাড়া গ্রামে সুধীরদাদার বাড়ি এবং আমাদের বাড়ি এক বাড়ি বলিয়াই মনে হইত।

যখন কলেজে প্রবেশ করি তখন আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা দুইটি, একটি সংস্কৃত আর একটি ইংরাজি। সুধীর দাদার ক্লাসে বাংলা পড়িয়া বাংলাকেও একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া চিনিলাম। দাদার উচ্চারণে ঈষৎ বাঙাল টান ছিল, কিন্তু তিনি এমন সুষ্ঠু এবং উজ্জ্বল বাংলা বলিতেন যে আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতাম। রবীন্দ্রনাথের তাজমহল সম্বন্ধে কবিতাটি যখন আবৃত্তি করিয়া পড়াইতেন তখন মনে হইয়াছে এমন সুন্দর কবিতা যেন ইংরাজি ভাষায়ও নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যে অনুরাগ তাহা সুধীরদাদাই সঞ্চারিত করিয়াছেন। দাদা যখন প্রথম Half-yearly পরীক্ষায় খাতা ফেরত দিলেন সেদিন আমাদের শব্দ-প্রয়োগের এবং বানানের বিস্তর ভুলের কথা বলিলেন। কয়েকটি ছাত্র মধুসূদন নামের বানান জানিত না। দাদা হাসিয়া বলিলেন মধুসূদন শব্দটির বানান অনেকেই ভুল লিখিয়াছে। তবে এই ভুল এড়াইবার জন্য কেহ কেহ মধুসূদনকে মধুবাবু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হাস্যকর। মধুসূদন শব্দটির বানান যখন জানো না তখন কবিকে মাইকেল বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিতে। এই কথা বলিয়া সুধীরদাদা সূদন শব্দটির অর্থ বুঝাইলেন। বানানও বলিয়া দিলেন।

Politics-এর ক্লাস লইতেন নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ইনি বড় সুন্দর ইংরেজি বলিতেন। আমার মনে হইত Politics-এর ক্লাসে আমরা ইংরাজি শিখিতেছি। তাহার অনেক কথা এখনও আমার মনে আছে। State কাহাকে বলে বুঝাইতে তিনি বলিলেন State is people organised for law। আইনের শাসন কাহাকে বলে তাহা বেশ বুঝিলাম। এখন দেখি এই ভারতবর্ষে রাজ্য আছে, কিন্তু আইনের শাসন তেমন নাই।

স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রত্যেক বিষয়েরই একটি সমিতি থাকিত এবং প্রত্যেক সমিতির একটি বার্ষিক সভা হইত। এই সভা সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হইত। সেই জন্য প্রত্যেক সমিতির বার্ষিক সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আমি English Literary Society এবং Bengal Literary Society-র সভায় উপস্থিত থাকিতাম। প্রত্যেক সমিতির বার্ষিক সভায় কলেজের

Principal W. S. Urquhart সভাপতিত্ব করিতেন। তিনি দুই একটি কথা বলিয়া একটি মন্তব্য করিতেন এবং সেই মন্তব্য শুনিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা খুব হাসিতেন। তিনি বলিতেন I have always said that this Society is the best Society of our College। আমার প্রথম বৎসরে English Literary Society-র প্রধান অতিথি ছিলেন G.W.Tyson। তাহাকে আমি চিনিতাম, তিনি *India Monthly Magazine*-এর সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজের Managing Editor ছিলেন আমার বাবা। Bengali Literary Socity-র বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার বক্তৃতার একটি কথা এখনও মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন বাক্যবিন্যাস বড় সহজ নয়। কিন্তু বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে সাবধান হইও।

আমাদের কলেজে discipline ছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের কোনো বিবাদ দেখি নাই। ছাত্রীরা অধ্যাপকের সঙ্গে ক্লাসে আসিয়া বসিতেন, আবার অধ্যাপকের সঙ্গে তাহাদের Common room-এ যাইতেন। কোনো ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা বলার অনুমতি ছিল না। কোনো কাজে কোনো ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে Principal-এর অনুমতির প্রয়োজন হইত। সেই অনুমতির কাগজখানি Ladies Common Room-এর পরিচারিকাকে দেখাইতে হইত। তিনি তখন সেই ছাত্রীকে Ladies Common Room-এর বাহিরে লইয়া আসিতেন। এই নিয়ম সম্বন্ধে ছাত্রদের কোনো আপত্তি ছিল না। আমাদের ক্লাসের একটি ছাত্রীকে আমি চিনিতাম এবং তাহার নাম জানিতাম। ক্লাসের ছাত্রদের কাছে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল এই নাম আমি কী করিয়া জানিলাম এবং আমাকে ভয় দেখাইল এই কথা তাহারা আমার বাবাকে জানাইবেন। এই ছাত্রীটি আমার দিদির বন্ধু ছিল বলিয়াই আমি তাহার নাম জানিতাম।

কলেজের আসবাবপত্র ভাঙচুর করিবার কথা আমরা ভাবিতে পারিতাম না। আমরা কেবল অধ্যাপকদের শ্রদ্ধা করিতাম না, কলেজটিকেও ভালোবাসিতাম। কলেজ সম্বন্ধে আমরা বেশ গর্ববোধ করিতাম। আমাদের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩০ সালে। Presidency College অর্থাৎ Hindu College-এর প্রতিষ্ঠা ১৮১৭ সালে। Presidency College কেবল বয়সেই আমাদের কলেজ হইতে বড় ছিল না, সেই কলেজের খ্যাতিও বেশি ছিল। কিন্তু তবুও আমরা বলিতাম আমাদের কলেজ Presidency College-এর সমকক্ষ। ১৯৩৩ সালে আমাদের I A পরীক্ষা হইল। সেই পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে ছয়জন ছিল আমাদের কলেজের ছাত্র বা ছাত্রী।

এইখানে একটি কথা বলিতে পারি। কলেজের দশজন অধ্যাপক ছিলেন Scottish missionary। তাঁহারা কিন্তু কোনো দিন ক্লাসে বা ক্লাসের বাহিরে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কিছু বলিতেন না। হিন্দুধর্মেরও কোনো নিন্দা তাঁহাদের মুখে শুনি নাই। আমাকে অধ্যক্ষ W.S. Urquhart দর্শন সম্বন্ধে কিছু বই লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একখানা ছিল *Upanishads and Life* এবং আর একখানির নাম *Vedanta and Modern Thought*। B A ক্লাসে উঠিয়া আমি এই দুইখানি বই পড়িয়াছিলাম। কোথাও Urquanat সাহেব কোনো প্রসঙ্গেই হিন্দুদর্শনকে আক্রমণ করেন নাই; তবে তাঁহার একটি প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের

গীতাঞ্জলিতে New Testament-এর প্রভাবের কথা বলিয়াছিলেন। Radhakrishan তাঁহার Philosophy of Rabindranath (1918) গ্রন্থে Urquhart-এর এই অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে শেষ কথা বলিয়াছেন নরওয়ের নোবেলজয়ী কবি John Bojer। *Golden Book of Tagore* (১৯৩১) গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, Rabindranath has broght to the West the message not of the Cross but of the Lotus।

আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে I A ক্লাসে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাকে আমি সুশিক্ষা বলিতে পারি। ইস্কুলের শিক্ষকদের যেমন শ্রদ্ধা করিতাম, ভালোবাসিতাম, কলেজের শিক্ষকদেরও শ্রদ্ধা করিতাম, ভালোবাসিতাম, কলেজটিকেও বড় ভালোবাসিতাম। কলেজের প্রতি একটা টান ছিল। ছুটির দিনেও হেদুয়ার পারে কলেজের অট্টালিকাটি দেখিয়া আসিতাম। মাঝে মাঝে দুঃখ পাইতাম যে চার বছর পরে এই কলেজের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না। কলেজ ছাড়িয়াছি প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে। এখনও কলেজের কথা স্মরণ করিলে মনের মধ্যে কীরকম হু হু করে।

BA ক্লাসে উঠিয়া যেন কলেজটিকে আরও নিবিড়ভাবে পাইলাম। ইংরাজি Honours Class-এ বিশেষ করিয়া চারজন অধ্যাপকের অধ্যাপনা আমার হৃদয় স্পর্শ করিত। তাঁহারা হইলেন অধ্যাপক বীরেন্দ্রবিনোদ রায়, Arthur Mowat, সুশীলচন্দ্র দত্ত এবং মহীমোহন বসু। বীরেন্দ্রবিনোদ রায় তিনখানি বই পড়াইতেন—Becon-এর *Advancement of Learning*, Rosebury-র *William Pitt*, Milton-এর *Samson Agonistic* এবং Shakespeare -এর *Julius Caesure*। যখন যেই বই পড়াইতেন তখন সেই বইয়ের পরিবেশটি সৃষ্টি করিতেন। বীরেন্দ্রবিনোদ রায় যখন পড়াইতেন তখন বুঝিতাম তিনি গ্রন্থখানির রস উপভোগ করিতেছেন। সেই রস তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতেন। আমাদের যখন Becon পড়াইতেন তখন শীতকাল আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ক্লাসে আসিয়া বলিলেন, One loues Becon in Winter। তাহার পর Becon-এর গদ্যের মাহাত্ম্য বুঝাইতেন। ইংরাজি গদ্যের উদ্ভব যে Latin গদ্যে তাহা বলিয়া তিনি Latin গদ্যের দুইটি রীতি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। একটি রীতি Ciceronian আর একটি রীতি Senecan। Rolling Ciceronian Period-এর ইংরাজি গদ্য হইতে দৃষ্টান্ত দিলেন Edmind Burke এবং Mecaulay-এর গদ্যের কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করিয়া। আবার Senecan brevity এবং anithetical manner বুঝাইলেন Becon-এর গদ্যের নমুনা দেখাইয়া। ইংরাজি গদ্যের এখন আর সেই চাল দেখি না।

Arthur Mowat পড়াইতেন *Hamlet*। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। আবৃত্তিও ভালো করিতেন, ব্যাখ্যাও স্বচ্ছ, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনায় বিদ্যার রস যত নিঃসৃত হইত তত বোধহয় কাব্যের রস নিঃসৃত হইত না। বীরেন্দ্রবিনোদ রায়ের অধ্যাপনায় যেন বিদ্যার রাগ এবং সাহিত্যের রস মিশিয়া একাকার হইত।

এখানে বলিয়া রাখি আমাদের সময় Honours-এ ছয় paper ছিল। এখন Honours-এ আট paper। আমাদের সময় pass course-এর বইগুলির সঙ্গে মাত্র কয়েকখানি বই

যোগ করিয়া Honours course হইত। এখন যে আট paper Honours course তাহাতে Pass course-এর বই থাকে না। অর্থাৎ আমরা কম পড়িয়া Honours degree লাভ করিয়াছি, তবে যাহা পড়িতাম তাহা যত্ন করিয়া পড়িতাম। আমার মনে হয় পাঠ্যপুস্তকের ভার কমিলে শিক্ষায় একটা গভীরতা আসে। অনেক জানিলে অনেক কথা বলিয়া তোমাকে চমৎকৃত করিতে পারি, কিন্তু সেই অনেক কথায় গভীরতার এবং সবলতার অভাব হইবে। একালে বিদ্যার ভার বাড়িতেছে এবং সেই অনুপাতে উপলব্ধির গভীরতা হ্রাস পাইতেছে, ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, Where is the Knowlege lost in information/Where is the Wisdom lost in Knowledge। আমরা যেন কম পড়িয়া বেশি শিখিতাম। একালে বোধহয় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি পড়িয়া কম শিখিতেছে। কথাটি বলিলাম এইজন্য যে একালে আমি অধিকাংশ কথাবার্তায় এবং রচনায় গভীরতার এবং সরলতার অভাব বোধ করি। আমাদের শিক্ষকদের দেখিতে হইবে যে ছাত্র-ছাত্রী যাহা শিখিল তাহা উপলব্ধি করিল কিনা। একটি উদাহরণ দিতে পারি। সুশীলচন্দ্র দত্ত কাব্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেকগুলি কথা বলিতেন না। কিন্তু তিনি যখন Tennyson পড়িতেন Heavily hangs the holly hock hock, heavily hugs the tigerlily। আমরা যেন ওই দুটি পুষ্পকে দেখিতাম। যদিও ওই পুষ্পের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। শব্দের মধ্যে একটা সত্য নিহিত থাকে। সেই শব্দের সার্থক উচ্চারণে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়। যাহা হউক, B A পড়িবার সময় অধ্যাপনার দোষ গুণ বুঝিতাম। কিন্তু আমার অধ্যাপনা সম্বন্ধে বলিতে পারি গণয়িতে দোষ গুণলেশ না পাওবি।

গড়ে ওঠার পটভূমি

কুমার রায়

নাটক আমার মনের নির্ভেজাল নির্যাস
মুক্ত প্রাণের বিশুদ্ধ প্রশ্বাস,
এতে নেই কোনও আক্ষেপ, এ যেন এক
সুখ, একটি রঙিন পালক।

—না, স্মৃতি রোমন্থন নয়। কেন না রোমন্থনে যে কেবলই ফেলে আসা দিনগুলোতেই ঘুরপাক খাওয়া। তবে অতীতের দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার সার্থকতা বোধহয় একটাই—আমার আজকের অস্তিত্বকে, কাজকে, কতটা সেই অতীত প্রভাবিত করেছে—সেইটা বুঝে নেওয়া। আজকের এই মানুষটি আশ্বিন মাসের ক্যালেন্ডার-এর দিকে চোখ ফেরাতেই স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। দেওয়ালে টাঙানো আশ্বিন মাসের ক্যালেন্ডারের পাতা ঝড় তোলে। রক্ত রঙে ছাপা তারিখগুলো ঝাপটা মারে হৃদয়ের কোণে—ঝড় তোলে। হঠাৎ আশ্বিনে জেগে ওঠে স্বদেশ। প্রাসাদে, অঙ্গনে, বারোয়ারি মাঠে ঢাকের কাঠির চাবুক—হৃৎপিণ্ডের লাব্-ডাব্ অকস্মাৎ বেড়ে যায় চৌদুনো হয়ে।

সেইখানে তো শুরু—সেই দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়া-নাটকের মহড়া। শোলার সাজ, চালচিত্র, চক্ষুদান—এসব ছাপিয়ে ডায়মন্ড জুবিলির মাঠে, মাঠের পাশে ঘর—নাটকের অঙ্গরাগ। রাজা কিংবা ভিখারির সাজ। প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা—বেজে গেল তিন নম্বরও। যবনিকার দড়ি ধরে টান। আলোর বৃত্তে বাজিমাত। সেই ক্রিয়া অশেষ আজও। আজও জ্যোতির্ময়। যা কিছু নাটকীয়, তা যেন শারদীয়। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর—উত্থিত মশাল—বুকের আগুনে। নন্দকুমারের ফাঁসি, সিরাজদ্দৌলা খুন। শিবপ্রসাদের নুটুবিহারী, ন্যাদা চাটুজ্জে, সুধীর রায়, ফটিক গুপ্ত, সুতান-এর নানা রূপ ও রঙ্গ। ওড়ে ঝড়ে এই আশ্বিনে; ঝাপটা মারে বয়ে যাওয়া কাঞ্চনের জল-তরঙ্গে।

শামিয়ানার নীচে মানুষ, অনেক মানুষের ঘাম, ডাকের আওয়াজ, কনসার্টের ঐক্যতান-আশ্বিন-ই তো জানে তার পরিণাম। স্বপ্ন নয়—সময়ের তির ভরা তূণ। উত্তরের আবাদি জমির ফসল-ফুল ফুটে আছে। ছেলেটির ঋণ তাই নরম সোঁদা সে মাটির কাছে।

ছেলেটি জানে তার জীবনে কালো কেশ কাঞ্চনমালা নেই, নেই তার পদ্মপাপড়ি চোখের বাহার। রূপকথার ভাঁড়ার শূন্য—কোথাও নেইকো তারা আজ। বেঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ছাড়া আজ সে পথের হদিশ দেবে কারা? রেলবাজারের হাট—নদীর পার—বোঝাই করা গোরুর গাড়ি কলসি হাঁড়ি—চালের মাথায় তিন শালিকের ঝগড়াঝাঁটি—আজ ভো-কাট্টা ঘুড়ি! ঘাস ফুল,

ভাঁট ফুল, শরতের কাশ? চোখ মেলে তাকাবার সেই চারিপাশ—বহু দূর আজ।

কোনও লাভ আছে এই অন্বেষার বোধিবৃক্ষের সন্ধান—বলো, কে আর করে? হারানো শৈশব-কৈশোর-যৌবন আজ বৃদ্ধ নতমুখ—সেসব তো আরও বহু দূর। চারিদিকে প্রেতযোনি নষ্ট সুন্দরের শব। কী হবে কাঞ্চনমালা দিয়ে? এ যে এক ক্লান্তিহীন ব্যথিত উৎসব।

তবু চেতন সরোবরে—স্মৃতির ঢেউ জেগে রবে, পথহারা, স্বপ্নহীন জীবন যে অন্ধকার, অর্থহীন, পাবে কি সে ফিরে যেতে সেই রূপকথা-দেশে? অন্ধকার অনাত্মীয়ী যেখানে! সে যে তার অমল শরীরকে ভাসাতে চায় কাঞ্চনের স্রোতে! ধমকে ওঠে আর একটি কণ্ঠ—'মূর্খ! পুষ্পিত আনন্দকে আজ তিরস্কার করো। ঘৃণা করো—চোখের মণিতে আলো জ্বালা—। তবে তুমি হবে—এই সময়ের। প্রবল আক্রোশে ছিঁড়ে ফেল—স্বপ্নে বোনা তন্তুজাল খান্ খান্। বৎস ইহাই বাস্তব!'

ধমক খেয়েও বলে উঠতে যায় সেই ছেলেটি, —কারও কাছে পদানত হয় নাকো আজ এই বাস্তব? বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বলে নাকি কেউ,—'তুমি পরাজিত'! বর্ণহীন ঘাস ফুল, কাশ ফুলে বিষ ঝেড়ে বলে না কি কোনও ওঝা,—'এই তো ফুটিয়ে দিলাম ফুল, ফেলে দাও অবসাদ বোঝা! একবার শৈশবে টলমল্ পা ফেলে চলা শুরু সেই ছন্দের টানে যেখানে দাঁড়ে বসা সবুজ টিয়া কিংবা ময়নার বুলি, বাগানের আলো আর ভালোবাসায় শোধিত সুন্দর দিন।

এইসব কথাই ভাবছিল এক বৃদ্ধ,—যে তার বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়পর্ব নানা অববাহিকায় খেয়া পার করে পৌঁছে গেছে ঘাটের কিনারায়।

ধরা যাক এই মানুষটির নামকরণ হয়েছিল স্বরবর্ণের আদি অক্ষর 'অ' দিয়ে। আসলে তার নাম ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ দিয়েই। কিন্তু আপাতত 'আমি'-র বাহুল্য সে এড়াতে চায়। আর এর কারণ—জীবনভোর সেই বুঝেছে স্বরবর্ণই তার ধাত। সে ক, খ, গ, ঘ, হয়ে উঠতে পারেনি। অ-আ-ই-তেই তার সাফল্য অসাফল্য। তবু সান্ত্বনা খুঁজেছে বিমূঢ় কোনও মুহূর্তে যে স্বরবর্ণ না থাকলে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ সম্পূর্ণ হয় না—হসন্ত যুক্ত হয়েই ক, খ, গ-হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার ভূমিকা সহযোগীর। সহযোগী হয়েই সে থাকতে চেয়েছে। নাটকের সঙ্গে তার যুক্ততা অনেক মানুষের সঙ্গে সহযোগী থেকেই। নাটক তো একার নয়—অনেকে মিলেই তাকে সম্পন্ন করতে হয়। কাজেই সহযোগী মানুষ নিয়েই তার সার্থকতা। অন্তত এটুকু সার্থকতার কথা সে ভাবতেই পারে। সে নাটকের জগতে না এলে বাংলা নাটকের কোনও ক্ষতি হত না। তার অবদান শূন্য। তবে এটা ঠিক যে নাটক এখন তার জীবনের অঙ্গ সেখানে একটু বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। অমরত্বের চিন্তা করাটা মূর্খামি।

স্বরবর্ণের আদ্যাক্ষর ভাবে সে থিয়েটারের লোক। এটা তার গর্ব,—'অ' অক্ষর দিয়েই তো অভিনয় কথাটা শুরু। আধুনিক সমস্ত শিল্পের প্রয়োগকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এক, শিল্পী এবং তার আত্মগত আবেগ আর দুই,—তার বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাপ্রবাহ। আপাতত সেই আত্মগত আবেগের কাহিনি। সেটাই প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে না হয়—জীবন-বৃত্তান্তকে গুরুত্ব না দিয়ে নাট্যজীবনকে এবং তার বিকাশের ছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া

যাবে। তখন আর রূপকের প্রয়োজন হবে না। তবে—একটা গৌরবজনক কাজের অংশীদার হওয়ার জন্য যে গর্ববোধ তার একটা পটভূমি নিশ্চয়ই আছে। সে পটভূমি কাজের প্রতি সম্মানবোধ থেকেই প্রসারিত। সে বিশ্বাস করে যে এই কাজ কথাটার মধ্যে একটা বিনয় আছে। এই বিনয়বোধ এবং কাজের প্রতি সম্মানবোধ তাকে শিখিয়েছে তার জন্মভূমি। তার ধারণা, একেবারে শৈশবের স্মৃতি বোধ করি, বেশির ভাগ মানুষেরই থাকে না। তবু সে স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে। সে তো জানে সে সময়কার অনেক কথাই অনেকে বলে, তা কিন্তু তার নিজের স্মৃতি নয়। বাড়ির বড়দের কাছে শুনতে শুনতে তার নিজের স্মৃতি বলেই মনে করে।

ছেলেবেলার কিছু ঘটনা, কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত স্মৃতির পরতে পরতে জমা থেকেই যায়। চার ভাগে ভাগ করা জীবনের তিন ভাগ সে পার করে দিয়েছে। শেষ ভাগে এসে পৌঁছে স্মৃতির আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে ফেলে আসা দিন, হারানো সময়ের জন্য তখন মমতা জাগে বৈকি! হয়তো মমতা, হয়তো উদাস করা সে অবলোকন। রং চড়ানো তো যায় না। যা সত্য তা যে সহজ। মানুষের দুর্বলতা হল অতীতের আলো-আঁধারিকে মুছে দিয়ে পুরো বৃত্তটাকে আলোকিত করে দেওয়া।

সে তার চেতনাকে সজাগ রেখেই ফিরে যেতে চায় সেই গড়ে ওঠার দিনগুলোতে। 'হয়ে ওঠা' কথাটা বেশ ওজনে ভারী—সেটা সে বলতে পারে না। গড়ে ওঠার কথাটা নিশ্চয়ই বলা যায়। গড়াপেটার মধ্য দিয়েই সে এক জায়গায় পৌঁছেছে আজ। সেসব দিনগুলির কি কোনও ভূমিকা ছিল? একভাবে অবশ্যই ছিল। সেই পর্বটাই যে গঠন পর্ব। ...

গঠন পর্বের কথা বলতে গিয়ে হয়তো খানিকটা আবেগভরে কাব্য প্রকাশ করে ফেলেছে 'স্বরবর্ণ'। হয় তো সে প্রকাশ কাব্যিক হয়ে উঠেছে। সেই ফেলে আসা দিনগুলো তো আর নতুন করে নির্মাণ করা যাবে না। তাছাড়া এ তো শৈশব বা কিশোরকালের স্মৃতিচারণা নয়—সে যে বলতে চায় এই বর্তমানে হয়ে ওঠার কোনও সূত্র থাকলে সেটাকে তুলে ধরা। 'স্বরবর্ণ' বোঝে আজকের সে নিরালম্ব বায়ুভূত নয়। তারও প্রস্তুতি আছে। অন্য সব আবেগ বাদ দিয়ে যেটুকু সে বলতে চায় কেমন করে তার মনে অভিনয়প্রীতি গড়ে উঠেছিল। সেই অনুষঙ্গ গুলির অন্যের কাছে অমূল্য না হলেও, তার জীবনে যে অনেক দাম। —সে এক্ষেত্রে অকপট এবং আন্তরিক থাকতে চায়।

অবশ্যই সে মনে করবে এই শুরুর দিন কাটানোর বাতায়নকে।

স্মৃতির হাত ধরে যতটা পিছনে ফেরা যায়, সেখানে ফিরে গিয়ে যেখানে সে পৌঁছুবে সেটা অবিভক্ত বাংলার জেলাশহর দিনাজপুর। উত্তরবঙ্গের জেলা শহরটি তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সে শহরে নাট্যচর্চা অব্যাহত ছিল।

সে ছোটবেলায় দেখেছে তাদের বাড়িতে সে যুগে তিনটে ব্যাপার খুব গুরুত্ব পেত। প্রথমটি হল স্বদেশিয়ানা, দ্বিতীয় সাহিত্য শিল্পচর্চা। আর তৃতীয়টি হল উদার ধর্মবোধ। বর্ধিষ্ণু পরিবারে ক্ষয়ের চিহ্নটাও তার স্মৃতিতে এমন করে বলাই যায়,—বাড়ির বড় হলঘর থেকে ঝাড়লণ্ঠন নামান হচ্ছে। আস্তাবল শূন্য—ফিটন্ গাড়িটা কবেই যেন বিক্রি হয়ে গেছে। পড়ে

আছে ঘোড়ার সাজ, কোচবক্সের দু-পাশে লাগান পিতলের বাতিদান। শ্বেতপাথরের কর্নার টেবিলগুলিও উধাও হয়ে গেল। সেই বয়সে সব কিছু না জানালেও, বড়দের কথোপকথনে সে জেনেছিল পরিবারেরই উঠতি বয়সের ছেলেরা সঙ্গোপনে বিক্রি করে দিয়েছে বড়দের না জানিয়েই। সে সব নিয়ে অসন্তোষ, রাগারাগি, ভাগাভাগি, বাস্তুভাগ। কেমন যেন নাটকীয় ঘটনা সব। বাড়ির মাঝ বরাবর, রাতারাতি, যে পাঁচিল উঠেছিল সেটাও নাটক, আবার বেশ কয়েক বছর বাদে সে পাঁচিল যাঁরা উঠিয়েছিলেন তাঁরাই ভেঙে দিলেন। নাটক নয়? ক্ষয়িষ্ণু স্রোতের টানে অর্থনৈতিক কাঠামো তখন ভেঙে যাচ্ছে। অনেক অবক্ষয়ের মধ্যে শুধু শিল্প ও সাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ক্ষণে এবং বিগ্রহের নিত্যসেবার কোনও অনুষ্ঠান—সকলে এক হয়ে যাওয়া যেন এক মূল্যবোধের পরিচয় প্রকাশ পেত। সেটাও কম নাটকীয় নয়।

ছেলেবেলায় সে দেখেছে তাদের বাড়ির হলঘরের পাশে একটা লাল-নীল-হলুদ কাচের শার্সি দেওয়া বড় বড় জানালা সমেত বড় একটা ঘরে লাইব্রেরি ছিল। সেটা একদিন সাধারণের জন্য পাবলিক লাইব্রেরি হয়ে গেল। বাইরে তার স্থান হল তখন। সেই লাইব্রেরির উৎসব অনুষ্ঠানে বাইরের লনে (একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট ছিল সেখানে এবং একটা জিম্। প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি সমেত) মঞ্চ তৈরি করে নাটক হত। আগের সংখ্যায় 'ছেলেবেলার কথামালায়' সে কথা বলা হয়েছে। পাড়ার সবাই তাতে অংশগ্রহণ করত। কাকারা অভিনয় করতেন। একজন তো খুব নামী অভিনেতা হিসাবে তাঁর সময়ে সম্মান পেয়েছেন। অল্প বয়সেই মারা যান। 'অ' শুনেছে, তার মা কাকিমার কাছে, যে সেই কাকার 'ঔরঙ্গজেব', 'জাফর খাঁ', এবং 'শম্বুক' কী পরিমাণ জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এক কাকাকে সে নিজেই দেখেছে অভিনয় করতে। শুনেছে তার বাবাও অভিনয় করেছেন বহু আগে। তাঁকে সেভাবে দেখেনি সে। শুধু মাঝে মাঝে সন্ধেবেলায় ঠাকুরবাড়ির আরতি শেষে ভাই বোনেরা যখন পড়তে বসত হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় তখন কেন জানি অন্য বারান্দায়, পায়চারি করতে করতে তার বাবা প্রতাপাদিত্য কিংবা 'হরিরাজ' থেকে পার্ট মুখস্থ বলতেন—স্মৃতি থেকে, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে। ছেলেটি একটু বড় হয়ে কেবলই ভাবত যে সে যদি তার বাবার মতো চেহারা, উচ্চতা এবং কণ্ঠস্বর পেত তা হলে কী ভালোই না হত। হয়নি। আবার নাটকের চরিত্র নয়, কখনও কখনও তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশপ্রেমের কবিতাও আবৃত্তি করতেন। খানিকটা খ্যাপামির মতোই লাগত কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বড় বাড়ি, বড় পরিবার কত নাটকীয় ঘটনাই তো ঘটেছে—কিন্তু 'অ' মনে করতে পারে যে রক্ষণশীলতা ছিল না পরিবারে, ছোটরা অনায়াসে বড়দের অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে। নাটকের আসরে যেতে কোনও বাধা ছিল না। সেই শহরে তখন দুটি রঙ্গালয় : একটি ড্রামাটিক হল (নাট্যসমিতি) অপরটি 'ডায়মন্ড জুবিলী'। দু-জায়গায় দুটি নাটক তৈরি হলে বেশ কিছুদিন টিকিট বিক্রি করেই সে সব নাটক চলত। তারপর আবার প্রস্তুতি-পর্ব, নতুন নাটকের। মফস্‌সল কোনও শহরে বোধকরি এমনটি ছিল না।

আরও দুটি ঘটনা সেই বয়সের 'অ' ভুলতে চায় না। বাড়ির ছেলেমেয়েরা বেশ কয়েক বছর প্রত্যেকে চরকা কেটেছে। বাইরের বাড়িতে ওই লনের পাশে তাঁতঘর তৈরি করে তাঁত

বসান হয়েছিল। সেই তাঁতের নাম ছিল 'চিত্তরঞ্জন ফ্লাই শাট্‌ল'—এটা 'অ' শুনেছে। সে মনে করতে পারে না যে তাঁতের ফট্‌ফটানি শুনেছে কিনা। কিন্তু চরকায় সুতো কাটা হত। এসবই যে তার বাবার আগ্রহে, সেটা বুঝেছিল। সেই আগ্রহটা মর্যাদা পায়নি। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'-র নিখিলেশের অনেক কাজের মতোই পরবর্তীকালে আড়ালে হাসাহাসির খোরাক জুগিয়েছিল বাড়ির এই বড় ছেলেটির কাজ। তবে সে যুগে চরকা কাটা তো ছিল স্বদেশপ্রেমের উদাহরণ এটা সে জেনেছিল। আর একটি নিয়মিত ঘটনা—সন্ধেবেলায় সবাই পড়তে বসার আগে বাড়ির সংলগ্ন তাদের ঠাকুরবাড়িতে আরতির ঘণ্টা বাজলে সবাইকে চলে যেতে হত। আরতি শেষে প্রণাম করে ফিরে এসে পড়তে বসা। এ এক শৃঙ্খলার অনুশীলন। শৃঙ্খলার কথাটা নিয়েই 'অ'-র মনে হয় এই অনুশীলন কি তাকে পরবর্তী অনেক বছর বাদে, সন্ধেবেলায় 'বহুরূপী'র মহলাকক্ষে নিয়মিত হাজিরা দেবার অভ্যাসে পরিণত করেছে! এও তো আরতির ঘণ্টা বাজার কালেই। দুর্গোৎসব হত না ঠিকই কিন্তু 'দোল' এবং 'ফুল-দোলেই' তো বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্ত্রীবর্জিত নাটক অভিনয় করার মূল পাণ্ডা হয়ে উঠেছিল ছেলেটি বড়দের দেখাদেখি। গান বাজনাও হত। বাড়ির ভেতরের উঠোনে, হলঘরের বাইরে ছোট মঞ্চ নিজেরাই তৈরি করে নিত। আর 'দোল' এবং 'ফুল-দোলের' সময় ঠাকুর বাড়িতেই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, সিংহাসনকে সাজানোর ভার পড়ত 'সে' আর তার এক দাদার ওপর। থিয়েটারের স্টেজ বানানোর প্রক্রিয়ার হাতেখড়ি যেন। নানান উপকরণ যে সব সজ্জার। বড়রা ভরসা করেছিলেন এই দুজনের ওপর, কেননা, এই দুই ভাইয়ের বাড়ি থেকে প্রকাশিত হাতে লেখা পত্রিকায় অলংকরণের ভার পেয়ে তা যথাসাধ্য আকর্ষণীয় করে তোলার উদাহরণটা তাঁদের জানা ছিল। তাই নির্ভর করতেন।

যে লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিয়েছে সে—সেসব অনুষ্ঠান বাড়ির মাঠে বন্ধ হয়ে গেল একদিন, আরও বড় জায়গায় লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হওয়ায়। কিন্তু সেই মঞ্চ বেঁধে নাটক করার নেশাটা থেকে গেল 'অ'-এর। হলঘরের ফরাস পাতা চৌকিতে হাতেখড়ি সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে। হাসি পায় 'অ'-এর সেই বিবরণ বলতে গিয়ে। হনুমানের লেজের দাপটে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অর্ধপথেই পরিত্যাজ্য হয়েছিল। সেই প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরের বছরই হলঘর ছেড়ে ভেতরের উঠোনে মঞ্চ বেঁধে 'সিরাজের স্বপ্ন', 'প্রতাপ সিংহ' আর রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুকের নাটিকাগুলির বেশ কয়েক বছর অভিনয় হয়েছিল। বাড়ির ভাইবোন এবং পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সেসব অভিনয়। সকলের যে ভীষণ আগ্রহ তৈরি করা গিয়েছিল তা নয়। 'অ'-এর ভূমিকা এখানে 'স্বরবর্ণের' মতোই 'ব্যঞ্জনবর্ণের' উচ্চারণ নির্দিষ্ট করতেই তার উদ্যোগ যেন। সেই উঠোনের মঞ্চের জন্য চারকোল্ (কাঠকয়লা) দিয়ে বিছানার চাদরে ইতিহাসের বই দেখে ঐতিহাসিক নাটকের পশ্চাদপট আঁকা হল। আলো বাতির আয়োজন ভালো করা হল এবং সে অভিনয় দেখতে বাইরের মানুষজন পারিবারিক বন্ধুজনেরাও এলেন। আজ 'অ' ভাবতে বসে সেই অভিনেতার দল 'স্বরবর্ণ'-রহিত 'ব্যঞ্জনবর্ণই' রয়ে গেল। তারা আর অভিনয় জগতে এল না কেউ। 'অ'-এর কান্তির দিব্যতা ছিল না—স্বাস্থ্যও অনুকূল ছিল না সে সময়ে, তাই ভালো

দেখতে ছেলেদের সে নায়ক, প্রতিনায়কের পার্ট ভাগ করে দিত—এবং থিয়েটারের আয়োজনের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবত। মাঝে মাঝে সকলকে জুটিয়ে মহলা দেবার সময়, সে কম হতাশ হত না, সেই সুদর্শন নায়করা কিছুতেই পার্ট মুখস্থ করছে না দেখে। প্রায় হাতে-পায়ে ধরে তাদের পার্ট মুখস্থ করতে বসান যেন তারই দায়। অভিনয় সুচারুভাবে হয়ে গেলে তার সান্ত্বনা এবং কৃতিত্বের জন্য একটু গর্ববোধও হত। আর সেই সুবাদে ভালোবাসাও সে পেয়েছে যে। সে যে দায়বোধ করত, নাটকটা যেন ভালোভাবে উতরে যায়। কিশোর মনের এ এক রোমান্টিক স্পন্দন। সে ভাবতে বসে এই বার্ধক্যে উপনীত হয় আর ভাবে এসব খনন করে কী লাভ? এ কি ভবিষ্যতের কোনও নকশা তৈরি করবে? মঞ্চের পাটাতনে পা রাখা সামান্য এক নাটুয়ার মিলিয়ে যাওয়ার আগে এইসব বৃত্তান্তের কী দাম? পথ চলার রঙিন অকরুণ ও অসমাপ্ত বৃত্তান্ত অসমাপ্তই থেকে যাবে হয় তো।

'অ'-এর ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাচ্ছি কেন? তার সব খবর তুলে ধরবার ভাব আমি কে নিলাম? ওর কথা, ভাবনা, চিন্তা, শ্রম এসব কথা আমি জানলাম কী করে? এ প্রশ্নের উত্তর হল, আমি তাকে দেখেছি কাছ থেকে সেইসব দিন থেকে আজ পর্যন্ত 'অ' যে আমার নিত্য সঙ্গী। তার অন্তর্লোকের উল্লাস যে আমার মনেও আলো জ্বেলেছে। তার ভালো-মন্দ, প্রেম-ভালোবাসা যে আমারও জানা অন্তরঙ্গতার সূত্রেই। অপরের কথা নিজের বলে না চালিয়ে তার নামে লেখা, অভিনব কিছু না হলেও, শ্রেয়। হ্যাঁ, 'অ'-এর ঘটনাগুলো আদপে পুরোনো—কিন্তু আজকের পাঠকের কাছে নতুন যদি নাও মনে হয়, তবে অপরিচিত মনে হবে নিশ্চয়ই। এই ছোটখাটো কাঠামোর মধ্যে বেশ দীর্ঘ ঘটনাক্রম, বিস্তৃত এলাকার ছবি আঁকার, কোনও বাধ্যবাধকতা হয়তো নেই—তাই এই পদ্ধতিগ্রহণ অভিনব কিছু নয়—বরং বলা ভালো পুরোনো পদ্ধতি।

এ কাহিনি কি রোমান্টিক হবে? কিংবা প্রগতিবাদী, বা ইতিহাস আশ্রয়ী বা অনৈতিহাসিক? এর থেকে নিষ্কাষণের ফলে কি কোনও সার পাওয়া যাবে?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম স্বরবর্ণের 'অ'-কে—সে হেসে জবাব দিয়েছিল 'না'। আমি থমকে গেলাম—তাহলে লিখে কী লাভ যে লেখার শেষে পাঠক সার কথা খুঁজে পাবে না! সে তখন বললে, 'I do need to search the past for its effects on my present'. আমি 'অ'-এর এই কথায় ভরসা পেলাম। বললাম, 'অন্তত সেটা দেখার জন্যেই তো অতীত হাতড়ান যায়। এটা হতে পারে এক সূত্র-প্রণালী।'

ঠিক আছে। লাটাইটা ধরা যাক 'অ'-এর হাতে আমি সুতোটা খুলতে থাকি। খুলতে গিয়ে দেখি দিনাজপুরের গণ্ডি এখনও কাটেনি। 'চাল, চিড়ে, তামাক, গুড়/এই চারে দিনাজপুর'—এইরকম একটা ছড়ায় পরিচয় ছিল দেশটার, লোকের মুখে মুখে। 'অ'রা যখন সবে স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়েছে তখন তারা মুখে মুখে আরও একটা লাইন যুক্ত করেছিল তার দেশের পরিচয় সমৃদ্ধ করতে। চার থেকে পাঁচে এসে ঠেকেছিল সেই সংখ্যা—'চাল, চিড়ে, তামাক গুড়/নাটক নিয়ে ভরপুর/এই পাঁচে দিনাজপুর'। সত্যিই সে দেশে নাটকের একটা হাওয়া বইত। বাড়তি

লাইনটা নিছক আবেগপ্রসূত নয় বরং বলা যায় এতখানি সত্যি আর বুঝি হয় না।

বরাবরই উত্তরবঙ্গ কলকাতার পরিমণ্ডল থেকে রীতিমতো বিচ্ছিন্ন। স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরেও। ফরাক্কা বাঁধের পর খানিকটা যাতায়াত সহজ হয়েছে। আর বহু আগে, পদ্মার ওপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ তৈরি হওয়ার আগেও বিচ্ছিন্নই ছিল। সেটা ১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ সালের কথা, যখন নির্মিত হয়েছিল ওই হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। সেখানকার মানুষ একটা নিজস্ব বৃত্ত, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল—তৈরি করেছিল নিজেদের মতো করে। ১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলনে যেমন বালুরঘাট অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল—তেমনি ১৯৪৫ সালে 'তেভাগা' আন্দোলনও শুরু হয়েছিল এই দিনাজপুরেই। শতকের পর শতক মূক ছিল যারা—তাদের মুখেই শ্লোগান উঠল—প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেলের মতো ধরা লাঠি—আধি নয় তেভাগা চাই—নিজ গোলাতে ধান তোল।' এও তো এক নিজস্ব বৃত্ত তৈরির নজির। আর পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি আন্দোলন —সেও তো এই উত্তরবঙ্গেই। যে ছড়াটি 'অ' বলেছিল তার মূল পাঠের মধ্যেই ধরা পড়ে সেখানকার কৃষিনির্ভর নিস্তরঙ্গ জীবনের। এতেই সম্যক পরিচয় ধরা আছে। সংযোজিত লাইনটিও মিথ্যে নয়। 'অ'-এর মনে পড়ে ওই যে দুটি নাট্যগৃহ উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও ওখানকার রাজবাড়িতেও একটি মঞ্চ ছিল। মহারাজার নাট্যপ্রীতিতেই সেটা চলত। এ জেলার তখনকার দুটি মহকুমা শহর—ঠাকুরগাঁ এবং বালুরঘাটে যথাক্রমে করোনেশন থিয়েটার এবং এডওয়ার্ড থিয়েটার ছিল (বালুরঘাট নাট্যমন্দির)। বিখ্যাত নট শিবপ্রসাদ কর, সুরেশ দাশ, নারায়ণচন্দ্র সরকার, রমেশ দত্ত, ফটিক গুপ্ত, সুতান, ন্যাদা চাটুজ্জে আরও কত অভিনেতার দল। কালেক্টারিতে যেমন ফুটবলাররা চাকরি পেত—রাজবাড়ির সেরেস্তায় তেমনই—অভিনেতারা।

ছেলেরাই মেয়ে সাজত। 'অ'-এর মনে আছে, সে তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। রাজবাড়ির মহলা কক্ষে রীতিমতো মহলা চলছে। সে সেখানে বসে আছে বড়দের আসরে। মাঝে মাঝে বই ধরে প্রম্‌ট্ করার ধরনটা। আর স্বরবর্ণের সুবিধে হল নাটকগুলি মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। বড়দের আসরে রং মেখে আসরে নামবার অধিকার সে পায়নি তখনও। কিন্তু ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। 'কর্ণার্জুন' নাটক হবে। যিনি দ্রৌপদী করবেন তিনি ঠাকুরগাঁ থেকে বিকেলের ট্রেনে এসে পৌঁছুবেন। অভিনয়ের দিন তিনি আসতে পারলেন না—সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। রাত নটায় রাজবাড়ির নিজস্ব মঞ্চে অভিনয়। মহারাজা সপরিবারে, সপার্ষদ দেখবেন এবং অভ্যাগতজনরাও উপস্থিত হবেন। রূপসজ্জা, সাজগোজ হচ্ছে। মঞ্চ, আলো, বাদ্যি সব প্রস্তুত মাথায় হাত ভারপ্রাপ্ত মানুষটির। যিনি অর্জুন করছেন সেই রমেশ দত্ত বললেন এই 'অ' ই পারে উদ্ধার করতে। কেননা ওর মুখস্থ। সাজসজ্জা, রূপসজ্জা হল—অভিনয়ও হল। নায়ক সপ্রশংস হয়ে উঠলেন তাঁর নায়িকার অভিনয়ে,—অভিনয় শেষ। আর এই অঘটনে 'অ' উত্তীর্ণ হয়ে গেল বড়দের আসরের অভিনয়ে। নতুবা সে তো বাড়ির উঠোনের মাচায় একাধিক স্ত্রীবর্জিত নাটকে অভিনয় ও প্রযোজনা করেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু বড়দের মাঝে। ছোট থেকে 'অ'-এর প্রমোশন হল। ঘটনাটা চাউর হয়ে গিয়েছিল—তাই একদিন নাট্যসমিতির হলে (ড্রামাটিক হল) নাটক দেখতে গেছে টিপু সুলতান, টিকিট কেটেই। যাঁরা অভিনয় করছেন

সবাই জানাশোনা। সেই প্রমোশন পাওয়া মন নিয়েই 'অ' অভিনয় আরম্ভের আগে একবার দেখা করতে ঢুকেছে সাজঘরে। তার প্রবেশের পরের প্রতিক্রিয়াটা নাই বা শোনা গেল 'অ'-এর কাছে। মোট কথা 'কৃষ্ণাবাঈ' চরিত্র যিনি করবেন সেই সুশীলদা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার আগে স্বরবর্ণ টিপু সুলতান করেছে কলেজে—জানা নাটক, অতএব 'কৃষ্ণাবাঈ'।

সুতো টানা বন্ধ করে 'অ'কে বললাম, —যে আকস্মিক নয়, দীর্ঘদিন মহলা দিয়ে 'পথের শেষে' নাটকে আরও এক স্ত্রী চরিত্রে সে অভিনয় করেছে বড়দের সঙ্গে, সে চরিত্র পারুল। রেলবাজারের হাটের কাছে বড় বন্দরে বিত্তবান জমিদার সুরেন চৌধুরীর বাড়ির মঞ্চে সে অভিনয় হয়েছিল। সেই মঞ্চেই সে একবার সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে সাহেবের ভূমিকা ওয়াট্‌স্‌নও করেছে। রিপন কলেজ ইউনিয়নের নাটকে দু-বছর 'মহারাজ নন্দকুমার' এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' নাটকে প্রফেসর জ্ঞানাঞ্জন সে আমলে তার অন্যতম চরিত্রচিত্রণ। শেষ নাটকটির উল্লেখ 'অ' নিজেই করে ফেলল। বোঝা গেল কোনও একটা কথা বলবার জন্যেই। তার যে কাকার অভিনয় সে দেখেছে তিনি এই চরিত্রটি করে প্রভূত খ্যাতি পেয়েছিলেন। 'অ', মহলা কিছুটা এগুলে চরিত্রটা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল। 'অ' তাঁর সে অভিনয় যে দেখেছিল। সেই কাকা তাকে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে 'অ'কে অবাক করা অভিনয়ের সেই চরিত্রে—অভিনয়ের পার্টটা বের করে দিলেন। 'অ' হতবাক। দৃশ্যের পর দৃশ্যের সংলাপ তো লেখা আছে সেই সঙ্গে মার্জিনে বিশ্লেষণ এবং সমস্ত স্টেজ মুভমেন্ট লেখা আছে। হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো অবস্থা। পরে, অনেকদিন পরে 'অ' ভেবেছিল এই হল যত্ন, এই হল প্রাপ্তাশা, এই হল ভালো অভিনয়ের ফলাগমের পথ।

যখন সে ক্লাস টেনে পড়ে তখন তার রাজনৈতিক পাঠ নেওয়া শুরু। আর এক অন্য জীবনের স্বাদ। 'অ'-এর ফেলে আসা জীবনের হারানো দিনগুলোর মধ্যে বহু অনুপ্রেরণা, আজকের বহু স্বপ্ন, অসংখ্য ভাবনার বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল। দিনাজপুরের খণ্ডকালীন রোজনামচাটা তাই তার পরিণত জীবনের অনুবীক্ষণ শক্তির সামনে নিছক ছেলেমানুষীর আকর নয়, আরও অনেক কিছুর—যা তার আত্মচেতনার নিরিখে মহার্ঘ এক ঐশ্বর্য।

আমি তাঁকে 'স্বরবর্ণ' বলতেই ভালোবাসি। তা সেই 'স্বরবর্ণ' ও এর সাল তারিখ মনে থাকার কথা নয় তখন। ১৯২৬-এর শুরুতে জন্মে করেও ১৯২৯, '৩০, '৩১, '৩২-এর কথা মনে থাকার কথা নয়—সে অবশ্য দাবিও করে না প্রত্যক্ষতার। কিন্তু এটুকু 'অ'-এর মনে আছে যে বাড়িতে, বিশেষ করে তার বাবা এবং দাদা এবং তাঁদের কাছে যারা আসছেন, শহরের গণ্যমান্য জন তাদের আলাপ আলোচনায় ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেস, তার আগে জালিয়ানওয়ালাবাগ, ভগৎ সিং-এর দিল্লিতে আইনসভায় বোমা ফেলা, লাহোর জেলে যতীন দাশের একষট্টি দিন অনশনের পর মৃত্যু, সেই আবছা শোনা কথাগুলো অস্পষ্টই হয়ে যেত যদি না বাড়িতে রাজনৈতিক আবহাওয়াটা বজায় থাকত। তাই এই পর্ব সে নিজের তাগিদেই বড় হয়ে পড়ে নিয়েছিল, জেনে নিয়েছিল। তার জন্মের আগের সেই ঘটনার কথাটাও সে সেই বয়সেই শুনে ছিল যে জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইটহুড' খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা তখন ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু যতীন দাশের

অনশনে লাহোর জেলে মৃত্যুসংবাদে যে আরও এক ইতিহাস সেটা জেনেছে, অবশ্যই বড় হয়ে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ মহলা দিচ্ছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে—এমন সময় খবর এসেছিল যতীন দাশের সেই আত্মবলিদানের। স্তব্ধ কবি। মহলা বন্ধ হল, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ঘটল—'সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ'—গানটির রচনার মধ্যে। সেই গানেই যে ছিল 'মৃত্যুর করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ'। আর একটি ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

সে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে চৌরিচৌরায় আন্দোলনের মাত্রাতিরিক্তর পর গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন—তার প্রতিক্রিয়াতেই গুপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল—ব্রিটিশ সরকার যাকে 'টেরোরিস্ট' কার্যকলাপ আখ্যা দিয়েছিল। কথাটা আজও চালু আছে দুনিয়াভর তবে তার তাৎপর্য ছিল অন্য। এইসবের মধ্যেই 'অ' শৈশব থেকে বাল্যে উপনীত হয়েছে—হয়ে উঠবে কিশোর, যখন থেকে রাজনীতির অ, আ, ক, খ শোনার পর্ব—আর নাটকের প্রতি আকর্ষণ।

একটা স্মৃতি তার চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে আছে। এই স্মৃতি কি নাটকের ক্ষেত্রে কোনও সহায়ক হয়েছে ভবিষ্যতে—'অ' জানে না—আমিও জানি না। শুধু জানে সে স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা যায়। জীবন নির্ভিক্ষু দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে তখন পারম্পর্য বিচার করা যায়। প্রতীক তখন প্রতিমা হয়ে ওঠে। আর নাট্যের অভিজ্ঞতায় এর কোনও কিছুই তো ফেলনা নয়। তাই স্মৃতির জাগরণ।

পাঁচ বছরের যে স্মৃতি হয়তো মনে নাও থাকতে পারে—কিন্তু প্রতি বছর সেই বিশিষ্ট দিনটিতে যে পাঁচ থেকে ১৪-১৫ বছর পর্যন্ত একই অনুষ্ঠানে সে যোগ দিয়েছে। আর কত কথাই শুনেছে—যুগ যুগান্তরের দুঃখের প্রতিচ্ছবি-পরাধীনতার গ্লানি, বঞ্চিত মানুষের আর্ত কান্না। এ এক প্রতিবাদ, এ এক ভবিষ্যৎবাণী। ইউরোপ তখন বিক্ষুব্ধ, আক্রান্ত আবিসিনিয়া, আর ২৬ জানুয়ারি এখানে স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য পাঠ। শেষ লাইনটাও 'অ'-এর মনে আছে—'আমরা শান্ত ও সংযত দৃঢ়তার সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব। বন্দেমাতরম।' স্বরবর্ণ আজ ভাবতে বসে—সূর্য মানেই আলো। তার নিঃশ্বাসে দেশ, দেশের বাতাস। বাবাকে নায়ক মনে হয়। ফলকে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেই সংকল্প। আজ 'অ'-এর মনে হয় চরিত্র নিয়তি নয়—নিয়তি চরিত্র। যা হব আমি তা-ই হয়ে যাব। ইতিমধ্যে কত নদী পার হওয়া গেল। বাঁচার প্রতীক আজ 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' আর 'রথের রশি'। এগুলো তো নাটক—হ্যাঁ, নাটকই তো। সেই সংকল্পেরই তো আর এক রূপ। এ যেন প্রজ্ঞার দীপ্তি। 'অ'-এর মনে তখন অগ্নিযুগের বীরেরা নায়ক হিসাবে মূল বিস্তার করেছে। তাদের শারীরিক পটুতা—তাকে হীনমন্য করে তুলত তার স্বাস্থ্যের কারণে। অন্য ভাইরা এগিয়ে যেত। আর সে বিছানার আশ্রয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী সেইসব বীরেদের রূপকথার নায়ক করে কল্পনা করত। তখন সে জুবিলী এম. ই. স্কুলে পড়ে। ক্লাস কামাইয়ের নজির তৈরি হয়ে গিয়েছিল। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় স্পোর্টসের প্রাইজ সে কোনওদিনই পায়নি—কিন্তু ক্লাস প্রমোশনের ফলের ভিত্তিতে

প্রফিসিয়েন্সির পুরস্কারটা সে বরাবর পেয়ে এসেছে ক'বছর। সেই পুরস্কার বিতরণী উৎসবে প্রতিবারই নানাবিধ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবৃত্তি ও ইংরিজি ছোট কোনও নাটক বা নাটকের দৃশ্য অভিনয় হত। তাতে সে অংশগ্রহণ করত। আর সেই ইংরিজি নাটকের সুবাদে বেশ কিছুদিন মহলার সময় উপস্থিত থাকতেন দিনাজপুর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি, বিলেতফেরত মানুষ। তিনিই ইংরিজি উচ্চারণ, অভিনয় এবং জুতো, মোজা, প্যান্ট পরে হাঁটাচলা দেখিয়ে দিতেন। সেখানেই প্রথম শিখেছিল—কী করে পা ফেলতে হয় হাঁটার সময়। শরীরটাকে সোজা রেখে ছন্দময় করা যায় চলাফেরা। হাতের ব্যবহার বাক্যের উচ্চারণের সঙ্গে। মনে আছে 'অ'-এর।

এরপর হাইস্কুল—সেখানে পালটে গেল পরিবেশ। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়া। আর ক্লাস টেনে পড়ার সময়ই বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। তার দাদাকে ধরে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বাড়ি সার্চ হল। 'অ'-র মনে পড়ে যায় আরও পুরোনো দিনের অন্য এক কথা। তখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ। বাবাকে তখন ক'দিন বেশ অচেনা লেগেছে—তিনি যেন খানিকটা সাবধানে চলাফেরা করছেন। সেই সময় পুলিশ এসে আর একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তাঁকে। না, কিছু হয়নি। পরে—অনেক বছর বাদে সে শুনেছে—দিনাজপুর জেলার হিলি স্টেশনে ট্রেন ডাকাতি হয়েছিল। সেটা ছিল স্বদেশি ট্রেন ডাকাতি। আমাদেরই পরিচিত বাড়ির হৃষিকেশ চ্যাটার্জি তখন তরুণ। ধরা পড়েছিলেন সেই রেল ডাকাতির সূত্রে। তা সেই হৃষিদা ধরা পড়ার আগে ক'দিন লুকিয়েছিলেন আমাদের বাড়ির গোলাঘরে। বাবা তাকে খাবার দিয়ে আসতেন—এবং বাড়ির আর কেউ জানতই না সে কথা। পরে খুবই কানাঘুষোয় কথাটা শোনা বাবার সেই ব্যবহারটা তখন ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল 'অ'।

বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তখন সারা দেশ বেশ কিছুকাল উত্তাল—সেই সময়েই 'অ'-কে ধরে নিয়ে গেল। ৯ আগস্ট-এর পরবর্তী কোনও দিনে নয়—নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণ দিনটিতে। আমার অনেক বন্ধুরাও তখন জেলে। দাদা তো ছিলেনই। দাদা তখন 'অ'-এর কাছে আর এক নায়ক।

আজ সকলেই জানেন যে তখন সেই আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেয়নি। কিন্তু যে-কোনও কারণেই দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের শুরুতে যোগ দিয়েছিল—এবং জেলে গিয়ে দেখা হল শ্রীযুক্ত বরদা চক্রবর্তী ও পঞ্চু চক্রবর্তীর সঙ্গে। 'অ'-এর বরদাদা এবং পঞ্চুদা জেলে। অবশ্য অল্প কিছুদিন বাদেই তাঁরা ছাড়া পান। পঞ্চুদা এবং সুনীল সেন-এর কথাটা পরে বলবে 'অ'।

সেই জেলে সন্ধেবেলায় বালুরঘাটের আন্দোলনে যুক্ত সমবয়সিদের আরও কয়েকজন মিলে সমবেত গানের মহড়া দেওয়া হত। শ্যামাপদ খাঁ, তাদের সকলের শ্যামাদা, —দারুণ গলা তাঁর—গান ধরতেন। 'অ' আর বালুরঘাটের টাকু দুজনেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী। আরও কয়েকজনও ছিল মনে পড়ে। 'অ' আর টাকু—রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করত। বিশেষ করে মনে আছে 'এবার ফেরাও মোরে'। অতবড় কবিতাটি তাদের মুখস্থ ছিল।'

'এইসব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা' এ যেন তাদেরই কথা তখন।

মাস তিন চার বিচার চলেছিল—তারপর বিবিধ ধারায় সাজা দেড় বছরের। মজার ব্যাপার অন্য অনেককেই বিচারের দিনগুলোতে বাইরের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে 'অ' এবং আরও তিনজনকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হত না—জেলের মধ্যেই বিচার হত। সাজা হয়ে যাওয়ার পরপরই এই তিন-চারজনকে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরের আদেশ হল। আর দাদা এবং ওদের সময়ের আরও কয়েকজনকে পাঠানো হল রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। বালুরঘাটের বড় দলটির বিচার তখনও চলছে, তারা রয়ে গেল দিনাজপুর জেলেই। 'অ' এবং 'টাকু' তখন শুরু করে দিয়েছিলেন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পড়াশোনা। বহরমপুরে নতুন পরিবেশে প্রাথমিক অস্বস্তির পর পরিচয়ের গণ্ডি নতুন করে তৈরি হল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি অভিনয় করতেন। 'অ'-এর চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু পুরোনো নাটকের পার্ট মাঝে মাঝে বলাটা যেন তাদের সময় কাটানোর সুযোগ ছিল। পড়াশোনাও চলতে লাগল।

'অ'-এর দাদা দিনাজপুর জেলে থাকতেই লেখালিখি করে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন, প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার।

শিবরাম চক্রবর্তী : শতবর্ষের মূল্যায়ন

পবিত্রকুমার সরকার

শতবর্ষ পরিয়ে গেলেন শিবরাম চক্রবর্তী। জন্মেছিলেন বাংলা সাতাশে অগ্রহায়ণ ১৩১০, ইংরেজি ১৯০৩। মৃত্যু ২৮ আগস্ট ১৯৮০। বাংলায় এমন বহুমাত্রিক প্রতিভাধর লেখক খুব কমই জন্মেছেন। কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করে তিনি উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, হাসির লেখা, শিশুদের জন্য লেখা—নানান ধারায়, নানান বিচিত্র ধাঁচে নিজেকে মেলে ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'শিবরাম চক্রবর্তী আসলে কজন? আগামী শতাব্দীতে হয়ত এমন গবেষণা হবে যে শিবরাম চক্রবর্তী নামে চার পাঁচ জন মানুষ লিখতেন।'

আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানুষটি একেবারে নিজেকে নিজের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি কখনই কালজয়ী হতে চাইনি, এমনকি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাতেও নয়। সেই বৃথা চেষ্টায় অক্লান্ত সাধনায় কাল যায় না কলের জীবনের সকালটা, না জয় করতে নয়, তার সঙ্গী করতে চেয়েছিলাম আমি। ছেলেমেয়েরা ছেলেবেলায় আমার লেখা পড়বে, একটু বেলা হলে, বড় হলেই অক্লেশে ভুলে যাবে আমায়।' কিন্তু শিবরামকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

হাসির গল্পে ও শিশু সাহিত্যে শিবরামের কায়েমি আসর পাকা। কিন্তু ছোটগল্পেও তিনি ইচ্ছে করলেই নতুন সৃষ্টি করতে পারতেন। বিভূতি-তারাশংকর-মানিক—এই তিন বন্দ্যোপাধায় ত্রয়ী যখন বাংলা গল্পে কর্তৃত্ব করছেন তখন তিনি 'দেবতার জন্ম' নামে একটি গল্প লিখলেন। পথের ধারে একটি নুড়িপাথর পড়েছিল। একজন সেটিকে কষ্ট করে তুললেন। অন্য একজন সেই পাথরটিকে নিয়ে গিয়ে গাছের গোড়ায় পুঁতে দিলেন। সেটি দেবশীলা হয়ে গেল। তার নাম হল বাবা ত্রিলোকেশ্বর। সেখানে পুজো-আচ্চা শুরু হয়ে গেল। ভক্তেরা আসতে লাগল। গজিয়ে উঠল একটি মন্দির। বিনাপুঁজিতে চমৎকার ব্যবসা ফেঁদে ফেললেন লোকটি। আর যিনি পথের প্রান্ত থেকে পাথর উদ্ধার করেছিলেন তিনি ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু মানুষজনের ভক্তি দেখে একদিন তিনিও চুপিসাড়ে বাবা ত্রিলোকেশ্বরকে প্রণাম করলেন। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে ভাবলেন 'কেউ দেখে ফেলেনি তো?'

রসসাহিত্যে শিবরাম এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। তিনি যমকের জাদুকর ছিলেন। তাঁর লেখায় প্রচুর অনুপ্রাস—শব্দকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন রূপকল্পে। অসাধারণ সব চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন—প্রিসিলা, বিনু, ইতু, পঞ্চানন, হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন, ডালুমাসি, প্রাণকেষ্ট ইত্যাদি। নিজের জীবন নিয়েও তিনি অদ্ভুত রসালো গল্প করতেন। শিবরাম চক্রবর্তী যে বিয়ে করেননি তা সবাই জানত। কিন্তু কে যেন একবারে খবর আনল হাওড়ার

কোনো এক মেয়ের সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর বিয়ে হয়েছে। সেই শিবরাম গয়নাগাটি নিয়ে উধাও হয়েছে। তার কোনো পাত্তা নেই আর। শিবরাম হাওড়ার সেই গ্রামে গেলেন। এবারে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনুন তাঁরই মুখ থেকে, 'কে লোকটা শুধাতে জানালেন কোথাকার কে এক লেখকমশাই শিব্রাম চক্কোত্তি গল্পটল্প লেখে। বইটই অছে নাকি তার। তার লেখা পড়েই পটে গেছিল মেয়েটা। পস্তাচ্ছে এখন, কুক্ষণে বিয়ে করে এখন তার যথাসর্বস্ব নিয়ে সে হাওয়া।' (ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা)। আসল শিবরামের সে এক বিস্ময়ের পালা।

'পাত্র-পাত্রী সংবাদ' নামে শিবরাম একটি পত্রগল্প লিখেছিলেন। এটি নতুন ধরনের লেখা। কলকাতার অজামিল বসু করাচিতে গিয়ে মিএগ্রা জামালউদ্দীন হয়ে গেলে ধর্ম বদল করে। সে কলকাতার পুরনো প্রেমিকা যমুনাকে পত্রমারফত বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। সেটি গল্প হয়ে গেছে।

কিশোর বয়সে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন শিবরাম। কলকাতায় ছন্নছাড়া জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। এটা শিবরামের নিজের কৈশোর কাহিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথায় জানতে পারি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রামধনু' কাগজে ওই গল্প ছাপা হওয়ায় কাগজের খুব নাম হয়, বিক্রিও হয় বেশ। তাঁর লেখার প্রশংসা হয়েছিল সীমাহীন। পরে ১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ওই গল্পটিকে চিত্রায়িত করেন। শিবরাম চক্রবর্তীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'রক্তের টান'। গঙ্গার ঘাটে মায়ের হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বালিকা ভবানী। মা সেই মেয়েকে কীভাবে ফিরে পেল তা নিয়েই কাহিনির বিস্তার ও বিন্যাস।

শিবরাম জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর বস্তুবাদী জীবনদর্শনে গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর সে সময়কার রচনাগুলিতে বৈপ্লবিক ভাবধারার ছাপ ছিল। সাম্যবাদী সাহিত্য আলোচনার তিনি পথ প্রদর্শক। তাঁর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'-তে প্রগতিবাদী কর্মীরা ও ভাবুক সমাজ নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এ-বাংলায় বা ও-বাংলায় যখন সাম্যবাদী সাহিত্যের আলোচনা হয় সচরাচর শিবরামের উল্লেখ চোখে পড়ে না। পরবর্তী পঞ্চাশ বছর শিবরাম যে পথেই যান না কেন, 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার নয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে কানপুরে। অবশ্য ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপর অংশ মনে করে, তারও আগে ১৯২০-তে তাসখন্দে পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়। সাল-তারিখ নিয়ে যে বিতর্কই থাক, বিশের দশকেই ভারতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ জায়মান হয়েছিল। রুশ দেশের ১৯১৭ সালের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গন্ধ এদেশে বাতাসে ভেসে এসেছিল। তাতে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মনে একটা প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল। বলশেভিক মতবাদে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন শিবরাম। তিনি নিজের মতো করেই মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বুঝেছিলেন। লেখক সেটাকে 'কমিউনিজমের অশিক্ষিত পটুত্ব' মনে করলেও পাঠকরা তা মনে করেন না। বরং 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'র ছত্রে ছত্রে শিবরামের প্রজ্ঞা ও বৌধিক অনুভূতির ছাপ রয়েছে। এটি ১৯২৯ নাগাদ—'আজ এবং আগামীকাল' শীর্ষকের আড়ালে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখাগুলি তারও আগের। তাঁর চব্বিশ-পঁচিশ বছর

বয়েসের লেখা। শিবরাম তাঁর সহজাত প্রতিভাবলে বলশেভিক তত্ত্ব ও সাম্যবাদী আদর্শকে আয়ত্ত করেছিলেন। ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের পার্থক্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এবং সমকালে বোলশেভিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। সে সময়ে স্বদেশি আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা 'বোলশেভিকি'র বিরুদ্ধে নানান পত্রিকায় আক্রমণাত্মক লেখা লিখতেন। তার জবাব দেওয়ার কেউ ছিল না। শিবরাম স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বোলশেভিক মতবাদের সপক্ষে দাঁড়ালেন এবং একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন যুক্তিনিষ্ঠ ও সরস ভঙ্গিতে। এবার শিবরামের মুখে শুনুন, 'সেই কালেই পণ্ডিচেরীর নয়া ব্রাহ্মণরা পৈতে ছিঁড়ে বলশেভিকদের বাপান্ত থেকে শাপশাপান্ত করতে লেগেছিলেন। সুরেশ চক্রবর্তী, নলিনী গুপ্ত, মহেন্দ্র রায়, দিলীপকুমার এবং আরও কারও কারও জেহাদি রচনাগুলি প্রবাসী ও বিজলী পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরুতে শুরু করেছিল। তাই যথাসাধ্য তার প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে কলম ধরতে হয়েছিল সামান্য এই আমাকেও। নবশক্তির পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আমার সেই রচনাগুলিই পরে বই হয়ে মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী নামে বেরয়।

'কমিউনিজম বিষয়ে বিশেষ কিছু যে আমি জানতাম তা নয়। তখনো মার্কসবাদী বইপত্তর এদেশে চালু হয়নি। তবে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার একটা ভাসা ভাসা আভাস বাতাসে ভাসছিল তখন। সে ভাবের বশে প্রেমেন সেকালে লিখেছিল, আমি কবি যত মেথরের যত ইতরের, সেই তাড়নাতেই আমার ওই কলম ধরা।

'আসলে যে করেই হোক কমিউনিজমের একটা সহবোধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারিধারে। সেই বোধকে সোজাসুজি নিয়ে আসার মত কয়েকজন লাফাতে শুরু করেছিল, তাদের এবং যাঁরা সেই বোধকে অধিকন্তু বুদ্ধি দিয়ে ছেঁকে নিয়েছিলেন সেই বুদ্ধিজীবীদেরও সেই সঙ্গে ধরে বৌদ্ধ কমিউনিস্ট বলা যায় বোধহয়। সেই কালে কমিউনিস্টদের বেদ দাস ক্যাপিটাল খুব কম ভারতীয়রই পড়া হয়েছিল। সেদিক দিয়ে একমাত্র বৈদিক কমিউনিস্ট একমাত্র ওই মজফ্‌ফর। কিন্তু তখনো তান্ত্রিক কমিউনিস্টরা দেখা দেয়নি এদেশে। প্রখর নখদন্ত প্রকট করে খাঁটি কমিউনিস্টতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়নি তখনো' (ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর)।

'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' প্রকাশের আগেই—একেবারে কৈশোর-তারুণ্যে তাঁর মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছিল। চাঁচোলের জমিদার পরিবারের ছেলে ছিলেন। মালদার সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে তিনি পড়াশুনো করতেন। টেস্ট দিয়ে আর ম্যাট্রিক দেননি। স্বদেশি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়াশুনো ছেড়েছুড়ে দেন। ১৯১৯-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। দেশবন্ধু তাঁকে বললেন, 'কলকাতায় যাবে তুমি আমার সঙ্গে। সেখানে পড়বে। পড়াশুনো ছেড়েছ কেন?'

শিবরাম দেশবন্ধুকে বললেন, 'গান্ধীজী যে বলেছেন, এডুকেশান মে ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যানট। আর বিপিনবাবু বলেছেন, ইংরেজদের গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে সবাই দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

সে সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) থার্বস ম্যানসনে দেশবন্ধু গৌড়ীয় সর্ববিদ্যালয় নামে একটি স্বদেশি স্কুল চালাতেন। এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন

সুভাষচন্দ্র বসু। শিবরামকে এখানে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্কুলের কড়াকড়ি ও গণ্ডিবদ্ধতা শিবরামের পছন্দ ছিল না। কোনো মতে এখান থেকে দশ ক্লাস পাস করে তিনি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গ ছাড়লেন। শুরু হল ফুটপাথে শোয়া-বসা, কাগজ ফিরিও করতেন।

দেশবন্ধু শিবরামকে বরাবরই স্নেহ করতেন। এ কারণে 'আত্মশক্তি' সম্পাদক বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ধরা পড়ে জেলে যান চিত্তরঞ্জন তরুণ শিবরামকে সম্পাদক করে দেন। পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন দেশবন্ধু শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু। কাজ পছন্দ না হওয়ায় তিনি শিবরামকে খারিজ করে দেন। শিবরাম অবশ্য তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আরেকটা নতুন কাগজ বের করার জন্য প্ল্যান ভাঁজতে লাগলেন। অবশেষে 'একশো পঁয়ত্রিশ টাকা পুঁজি সম্বল করে একশো চৌত্রিশ নম্বর থেকে যুগান্তর বেরুল—আমার ঘরের বিছানাই তার কার্যালয়।'

'যুগান্তর' সাপ্তাহিক বেশ নাম করেছিল, বিক্রিও ভালো হত। দেশবন্ধু, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ ওই কাগজে অর্থসাহায্য করেছিলেন। একই সময় আরও দুটি সাপ্তাহিক মজফ্‌ফর আহমেদ সম্পাদিত 'গণবাণী' ও নজরুলের 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হত। কিন্তু 'যুগান্তরে'র প্রেরণা কী ছিল এ প্রসঙ্গে শিবরাম নিজেই বলেছেন, 'আমাদের কালের সমাজ ব্যবস্থায় যে সব অবিচার অনাচার অত্যাচার মনে প্রচণ্ড নাড়া দিত, তাঁর বিরুদ্ধেই আমি কলম ধরেছিলাম। ইংরাজদের শাসন আমায় তেমন পীড়িত করেনি। যাকে বলে Social injustice সেইসব—যেমন অব্রাহ্মণদের ওপরে বামুনদের অত্যাচার, প্রজাদের ওপরে জমিদারদের শোষণ-পোষণ—এইসবে আমি বেশি অভিভূত হয়েছিলাম। সমাজবাদের ধূমধাড়াক্কা তখন তেমনটি পড়েনি, সোভিয়েত মুলুকে সমাজতন্ত্র পত্তনের নাম গন্ধ বাতাসে ভাসছিল, ঘুণাক্ষরের বার্তায় আসছিল—শুধু তারই সুদূর হাতছানি কাউকে কাউকে যেন কেমন উন্মনা করেছে সে সময়' (ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা)। 'ধূমকেতু' প্রকাশের দায়ে নজরুলের যেমন জেল হয়েছিল, 'যুগান্তর' প্রকাশের দায়ে হয়েছিল শিবরামেরও। শিবরামের তখন বয়স মাত্র উনিশ। সেইসময়েই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর জেল খাটা হয়ে গিয়েছে।

শিবরাম বাইশ-তেইশ বছর বয়সে দুটি উপন্যাস লেখেন—'ছেলেবয়েসে' ও 'সমর্পিতা'। 'ছেলেবয়েসে' পুরোপুরি রাজনৈতিক উপন্যাস। বয়ঃসন্ধিকালের প্রেম-ভালোবাসা ও সেইসঙ্গে উগ্রপন্থী বিপ্লববাদী চিন্তাধারা বিপ্লববাদী চিন্তাভাবনা এই উপন্যাসের উপজীব্য। শিবরামের নিজের কথায়, 'সুধীর ছেলেবেলা থেকে বিপ্লবের ভ্রান্ত পথে চলে অবশেষে গুপ্তহত্যার ফলে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল—কোন বৃথা বীরত্বের মোহে মুগ্ধ না হয়ে তার তরুণ জীবনের করুণ ব্যর্থতার দিকে আমি বাঙলার ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।' 'সমর্পিতা' উপন্যাসে জমিদার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সুতীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। এই কাহিনিতে জমিদারের বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে এক তরুণ সাংবাদিকের প্রেম ও বিবাহের চিত্র তুলে ধরে তিনি সমাজ সংস্কার ভাঙার আহ্বান জানিয়েছেন।

শিবরামের আধুনিক বিপ্লবী মনের তীব্র আকুতি ধরা পড়েছে 'যখন তারা কথা বলবে'

ও 'চাকার নীচে' নাটকে। ওই দুটি নাটক তিনি বোধহয় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে রচনা করেন। সালটা ১৯২৭-২৮ হতে পারে। দুটি নাটকই চিন্তা-ভাবনা, ভাষা, আঙ্গিক সবদিক থেকেই একেবারে ভিন্ন স্বাদের। একেবারেই মৌলিক। একদিকে স্বাধীনতা ও সমাজদ্রোহের আহ্বান, অন্যদিকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণ্ডিবদ্ধতা থেকে মুক্তি—এই দুটি ধারা নাটকে সংপৃক্ত। প্রেম ও ভালোবাসায় যিনি সাহসী ও সংস্কারমুক্ত হতে পারেন, তিনিই দেশমুক্তি ও বিপ্লবীবাদী আদর্শে নিজেকে সহজে মেলে দিতে পারেন। দুটি নাটকের মধ্যে 'যখন তারা কথা বলবে' চিরকালই বাংলা নাটকের দিক চিহ্ন হয়ে থাকবে। এটিকে আজও আধুনিকা নাটক বলেই মনে হয়। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, ''যখন তারা কথা বলবে' আজকালকার গণ সাহিত্যের নির্ভুল পূর্বগামী।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র কালপর্বে গান্ধীবাদী পথের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিধারার বিরোধ প্রকট ছিল। শিবরাম কিন্তু বিচ্ছিন্ন সান্ত্রসবাদী ধারাকে সমর্থন করেননি, বরং গান্ধীবাদেই তাঁর আস্থা ছিল—সেটা 'চাকার নীচে' নাটকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যে নতুন আদর্শবাদের কথা প্রচার করতে চাইলেন, নাটকের সংলাপে তা লক্ষ করুন—

অতসী। একজন লোক রাস্তায় বেরুচ্ছিল এমন সময় মোটর চাপা পড়েছে—একেবারে চাকার নীচে—

শৈলেশ্বর। তাই নাকি? আহা দেখি গে লোকটাকে—

অতসী। এক বুড়ো ভিখিরি—

শৈলেশ্বর। ও ভিখিরি। বেচারা অনেকদিন থেকেই চাকার নীচে পড়েছে। আজ শুধু তার জীর্ণ দেহটা পড়ল বৈ তো নয়। এ দুর্ভাগা দেশে মনুর সত্ত্ব যে মনুষ্যত্বর চেয়ে বড় দিদি।

'যখন তারা কথা বলবে' নাটকের সুরটা অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা। ওই নাটকের নায়ক সিদ্ধার্থ প্রেমের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী।

এই নাটকে ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধতা করেছেন শিবরাম। নার্সিংহোমের, অদূরে জেলখানা সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিসমিলের ফাঁসি আর সে কারণে জেল-কয়েদিদের বিদ্রোহ উপস্থাপন করেছেন তিনি। নার্সিংহোমে চিকিৎসারত ছিল সিদ্ধার্থ ও গাঁটকাটা জিগা। তারা বিসমিলের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করত। জিগার কাছে প্রশ্ন করে সিদ্ধার্থ জেনে যায় ফাঁসিকাঠে উঠে বিসমিল গজল গেয়েছে—

সর ফরোশি কে তমান্না অব হামারে দিলমে হ্যায়।
দেখ্ না হ্যায় জোর্ কেত্না বাজু এ কাতিল্‌মে হ্যায়।।

এরপর সিদ্ধার্থের মুখে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য শুনি, 'সত্যকারের যে কবি সে তো জীবন দিয়েই কবিতা লেখে।' বিসমিলের ফাঁসির পর জেলখানা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে বন্দিরা। উত্তেজিত জিগা চিৎকার করে বলছে, 'ভেঙে ফেল্ ভেঙে ফেল্।' সিদ্ধার্থের ভাষায়, 'ওরা কথা বলচে, কথা বলচে। মাথার খুলি ভেঙে ওদের কথা! রক্ত দিয়ে ওদের কথা!' এমন বিস্ফোরক নাটক সে আমলে বা তার পরেও কোনো দলই মধ্যস্থ করার সাহস দেখায়নি।

দুটি উপন্যাস ও দুটি নাটকে শিবরামের মধ্যে যে, বিদ্রোহের উদ্ভাস দেখি তা আরও

সুনির্দিষ্ট ও তাত্ত্বিক রূপ পেল 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'তে। 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' প্রবন্ধের শুরুটা এরকম, 'গোড়াতেই বলে রাখি, বোলশেভিকির পথ সমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি; কারণ বোলশেভিজম অনেক বড়ো বড়ো আক্রমণ সয়েও টিকে আছে এবং আশা করি নলিনীবাবুর ধাক্কাও সে সামলে উঠবে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়েচি গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের ঘরোয়া সাবেক জিনিসদের রক্ষা করতে। কারণ নলিনীবাবু যেভাবে গীতা উপনিষদের মতো অতি পুরোনো মাপকাঠি দিয়ে বোলশেভিকির অতি আধুনিক ও অত্যন্ত বিরাট বিশ্বরূপ মাপতে লেগেচেন তাতে আমার আশঙ্কা হয়। মরচে-পড়া কাঠিগুলি না মচ্‌কে যায়। মনে হয়েচে তাঁর মানদণ্ডের প্রাণদণ্ড দিতেই তিনি যেন মরীয়া।' এরপর একই প্রবন্ধে তিনি প্রত্যয়ের সুরে ঘোষণা করলেন, 'আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে—পুরনো গীতার কোন বচন দিয়েই এই নূতন গীতার সৃষ্টিশক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্বক্ষেত্র ঢের বড়ো—আদর্শের দিক দিয়ে, তত্ত্বের দিক দিয়ে ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়ে বড়ো বলবো এই জন্যে যে; তিনি তাঁর কঠোরতম সাধনায়, সবলতম বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়ির চেয়ে নতুন করে গড়তে পেরেচেন।' শিবরামের 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' প্রকাশের এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় আসেন। রুশ দেশের নতুন সমাজ গড়ার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করে কবি লিখলেন, 'যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র ও পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত ও প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত।' রবীন্দ্রনাথ রুশ দেশে যা প্রত্যক্ষ করলেন শিবরাম কল্পনায় তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আগেই।

'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'-র প্রত্যেকটি রচনাই সিরিয়াস ধরনের—ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন কী নিয়ে না তিনি আলোচনা করেননি। কিন্তু রচনাভঙ্গি অত্যন্ত সরল। পাঠ করা এক নিঃশ্বাসে সব কটি লেখা পড়ে ফেলতে আগ্রহ বোধ করেন। চমৎকার পান (pun) ধর্মী কথারস সৃষ্টি করেছেন। তার কিছু পরিচয় দেওয়া হল—

......সমাজ সৃষ্টির গোড়ায় থাকে শূদ্রের শক্তি—পরে সেই সমাজের শোষণ, শাসন ও নিছক শোভা বর্ধনের জন্য যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উদয় হতে থাকে। সমাজের মতো বিরাট সৃষ্টি একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই সম্ভব। ব্রাহ্মণের দ্বারা হতে পারে দু' একটা সঙ্ঘ, আশ্রম বা আড্ডা—বড়ো জোর এক আধটা নৈমিষারণ্য বা পণ্ডিচেরি-মার্কা। আধুনিক ব্যাসকাশি (মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি)।

আঙ্গিক দারিদ্র দূর করার আপাতঃ দায়িত্ব কমিউনিজ্‌মের নয়, আর্থিক দারিদ্র্য দূর করাই তার প্রথমতম কাজ। সর্বলোকে সে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তর্লোক স্বচ্ছন্দ হবে তার ফলেই (দো রোখা)।

একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা, তখনি বাধে লড়াই। তারই নাম ক্লাসওয়ার—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যতদিন পথ শেষ না হয় ততদিন লড়াই শেষ হয় না (দেো রোখা)।

......আমি মনে করি, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে মানবজাতিরই ওপর। সুপারম্যান হচ্ছে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক, আর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই হোক, সমস্ত মানুষকে নিলডাউন্ করে রেখে নিজের উচ্চতা-প্রদর্শনের প্রয়োগ নৈপুণ্য যাদের তারাই সুপারম্যান্। ....সমস্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কারুকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোশ্যালিজ্‌ম চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে.....সুপারম্যানের এক্‌জিবিশন খুলতে নয় (দেো রোখা)।

বুদ্ধ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মানুষকে আত্মার মুক্তি দিতে এসে ব্যর্থকাম হয়েচেন, কিন্তু লেনিন, এই জন্যই কৃতার্থ যে তিনি জেনেছিলেন ও-জিনিস কারু হাতে তুলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েচে। তিনি করে গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা (সুপারম্যানিয়া)।

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁকে Superman বলতে আমি রাজি নই। Superman বলতে তাঁর অপমান করা হয়।

অনন্তের যোগে ও জীবনের ভোগে মানুষ সম্পূর্ণ (কবি জয়ন্তী)।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ যখন সঙ্ঘ গড়েন তখন মনে হয়, এ সাঙ্ঘাতিক। এ দুর্বিপাক—তাঁদের পক্ষেও যেমন, তাঁদের আওতার মধ্যে যারা—তাদের পক্ষেও তেমনি। কেননা মানুষ নিজের ভেতর থেকে হয়ে ওঠে, তাকে করে তোলা যায় না ; করে তুলতে গেলে সে আর যাইহোক মানুষ হয় না (কবি জয়ন্তী)।

কোনোদিন এখানে সোসিয়ালিস্ট স্টেটের প্রতিষ্ঠা হয় তার প্রথম কাজ হবে দেশব্যাপী ছোট বড়ো মাঝারী যত সঙ্ঘ আছে সব ভেঙে দেওয়া ; মানুষের মন থেকে False God এবং ভুয়ো philosophy দূর করা, দুয়ো করা ; উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা যে এ সমস্ত—"সব্ ঝুট হ্যায়" (সঙ্ঘ মানে সাঙ্ঘাতিক)।

'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'তে সমাজতান্ত্রিক মূলবোধের প্রতি সমর্থনের পাশে ব্রাহ্মণবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার তিনি উগরে দেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র একটি মানববিরোধী প্রবণতা। 'শূদ্র না ব্রাহ্মণ?' প্রবন্ধে লিখলেন :

'সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হোক এই মর্মে একটি প্রস্তাব সম্প্রতি হয়েচে।

'এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি। পৃথিবীর কোথাও একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সব মানুষকে নরখাদক ঘোষণা করা হোক—এই মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। বরং আমার মতে, সম্ভব হলে, নরখাদকদেরই মানুষ করার পক্ষে চেষ্টা হওয়া উচিত।' শিবরাম চেয়েছিলেন শূদ্রসমাজকে ভারত সংস্কৃতির অঙ্গ বলে সসম্মান স্বীকৃতি দেওয়া হোক—সেটা অস্পৃশ্যতা বর্জন করে নয়—বৈবাহিক আদান-প্রদান ও সামাজিক আত্মীকরণ মারফত। এ বক্তব্য তাঁর সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল।

শিবরাম পরবর্তীকালে নিজের ভাবনার জগতকে অনেকটা বদলে ফেলেছিলেন। তাঁর বিশ্বাসটা অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'র তৃতীয় সংস্করণ (বাংলা ১৩৫৯)-এর ভূমিকায় বললেন, 'গান্ধীবাদই, আমার মনে হয়, কমিউনিজমকে সম্পূর্ণ করতে পারে।' ভারতীয় আত্মিক সাম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আর্থিক সাম্য-নীতির আত্মীয়তা ঘটলেই বিশ্বজনীন সাফল্য ঘটতে পারে। আর, ঘটবেও তাই।' সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মডেল ভেঙে যাওয়ার পর শিবরামের এ-বক্তব্য নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে।

শিবরামের 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' ও 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' আত্মদৈবনিক কাহিনি। গল্পের ভঙ্গিতে লেখা ওই কাহিনিগুলো আবার উপন্যাস হয়ে উঠেছে। তার জীবনের প্রান্তভাগে লেখা এই কাহিনিগুলি সাহিত্যরীতির দিক থেকে অসাধারণ। খুব সহজ ও স্বচ্ছ ভঙ্গিতে জীবনের অনেক ঘটনা বলে গেছেন। কত গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা করেছেন কৌতুক করে। পানাহারে ও সৃষ্টির অন্বেষণে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, নজরুল, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে উত্তর কলকাতার বনিতাপল্লিতে গিয়ে মজা করেছেন। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মায়ার বিষণ্ণ মুখ, রিনির মায়ের অবারিত দেহ, রিনির অবারিত দেহের সান্নিধ্য, সতীশ তার বন্ধুরা ওই কাহিনিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা'-র জগৎ এইসব উপাদানে পরিপূর্ণ। তাঁর কাছে ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা সমার্থক ছিল। ঈশ্বর অন্বেষণে তিনি মানুষের ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলেন। এক অবয়বসম্পন্ন অস্তিত্ব ছিল শিবরামের ঈশ্বরের। তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বর পৃথিবী আর ভালবাসা—প্রত্যেকের জীবনেই ওতপ্রোত। কেউ বঞ্চিত নয়। প্রত্যেককেই টের পেতে হয় কখনো কখনো, না টের পেয়ে উপায় নেই, যিনি এই নাটের গুরু তিনিই টের পাওয়ান।'

'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা'-র পর 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' নামে আরেকটি কাহিনি লেখেন। এই কাহিনিতে অনেক বিচিত্র চরিত্র। সমকালের বহু মানুষের কথা এসেছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজাফ্‌ফর আহমেদ যে আশ্চর্য গদ্যশৈলী বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসেন তা শিবরামই লক্ষ করেন। তিনি বললেন, 'কমিউনিস্ট বলেই হয়ত এই আশ্চর্য সহজভঙ্গী তাঁর সহজাত হয়েছিল। কমিউনিজম যেমন মেদিনীর ক্যাপিটালিস্ট মেদভার লাঘব করতে উদ্‌গ্রীব—উদ্যোগী, তেমনি কমিউনিস্ট লিখিয়েদের ভাষাভাষী ওই রকম নির্মেদ নির্ভার। এসব পরমেশ্বর গদ্যশৈলী আমি সুভাষ মুখুজ্যেরও দেখেছি।' এই উক্তির মধ্যে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট—ভাববাদের পথে গিয়েও তাঁর কমিউনিস্টের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরূপতা ছিল না।

'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গার দুটি মানবিক চিত্র আছে। শিবরামের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িটা ছিল হিন্দু-মুসলমানদের বর্ডার লাইন। বিহারের কয়েকটি বিপন্ন পরিবার তাঁর মেসবাড়ির পাশে আশ্রয় নিয়েছিল একটি বস্তিতে। একদিন রাতে অনিল নামে একটি ছেলে এসে বোমা মেরে ওই বস্তি ওড়াতে চায়। শিবরাম আর এস এস কর্মী অনিলকে স্পষ্ট বলে, 'যদি তুমি ওদের মারতে চাও, তার আগে আমাকে মারতে হবে তোমায়। জীবিত থাকতে এ ঘর পেরিয়ে ওদের গিয়ে মারতে দেব না।' সদ্য হাস্যরসিক একটি মানুষ

প্রয়োজনে কতটা দৃঢ় হতে জানতেন, এ থেকে তা স্পষ্ট। ওই দাঙ্গার সময় তিনি একই মেসে নির্ভয়ে থাকতেন। তাঁকে বিপন্ন ভেবে পার্ক সার্কাসের দুই পরিচিত কিশোরী সেলিনা আর আমিনা গাড়ি নিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছিল। পরে পার্ক সার্কাসে দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে ওরাই তাঁকে রক্ষা করে ও নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। গল্পের মতো এমন টুকরো টুকরো বহু কাহিনি 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বরে'।

শিবরাম পৃথিবীকে, মানুষকে ভালোবাসতে জানতেন। সবাইকে হাসাতেন, নিজেও হাসিখুশি থাকতেন। বিলাস-বৈভবে আসক্তিহীন এমন মানুষ বড় একটা দেখিনি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসে সেই 'তক্তারামে' শয়ন আর 'শুক্তারাম' ভক্ষণ—এ সুখ তাঁর জীবন থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। ওই যে তারুণ্যে লিখেছিলেন 'ভূখাতেও নাহি সুখ, অমৃতেও নাহি অধিকার। কে সহিবে আত্মার ধিক্কার!' এটাই তাঁর জীবনমন্ত্র হয়ে ছিল।

পদ্যপঞ্চক

শিবশম্ভু পাল

গুরুদ্বাদশপদী

তরাই জঙ্গলে ঐ প্রেতস্তম্ভ—মায়া সভ্যতার—
ঈশ্বরিত, শীর্ষদেশে রাক্ষসের করাল তক্ষণ
লোলজিহ্, হাঁড়িকাঠ পায়ের তলায়

দলে যাও ছিন্নপত্র—তমসাতীরের মা নিষাদ—
যেতে হবে চোখ বুজে, অনুশাসনের ডাঁই গুরুমন্ত্রে জ্বালো—
উইঢিবি চোরকাঁটা—চক্ষুষ্মান গণিতনিপুণ—

ওদের উপাস্য কীর্ণ নিরঞ্জন স্রোতকর্ণিকায়
পুতুলের দুর্গ ভেঙে গড়ে তোলে প্রতর্কনগর
ওদিকে তাকালে ভস্ম—তুমি শুধু খালি করো বিয়ারের ক্যান

ফেলে দাও, তুলে নিয়ে খেলা করবে বয়স্ক বালক
গলার লকেট যেন দুলে ওঠে বাইপাশে হাওয়ার ঝটকায়
যদিও গর্জায় মেঘ—তুমি কিন্তু যুগপৎ শিকারী-শিকার—

লোকপদ্য

জঙ্গলে পড়ে না ঝাঁট, পৌরনিগমের অত্র ইতিহাস নিয়ে
মাথাব্যথা নেই, তাই সৌভাগ্যবশত
যে-কোনো হলুদপাতা, শ্রেণিহীন, তুলে নিই প্রতিনিধিমূলক—
এ-সময় কালসন্ধি, বীতশোক, চোখ ও হাতের
প্রতিমুখী ওঠানামা—ঊর্ধ্ব-অধঃ ধরাধরি—যেতে-যেতে থামা—
বিরতিই ত্বরণের শুভাঙ্কুশ, নন্দনের শ্যাম গর্ভগৃহ
অনামী মহাস্থবির—জীর্ণপীতে ব্যক্তিকতা এনে
যখনই নিয়েছি তুলে রন্ধ্র ও শিরার যৌথ সংগঠন ফুঁড়ে

ধোঁয়ার ছত্রাক মেঘ পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে অপসৃয়মাণ
এবং ফেড-ইন করে তিনপুরুষ আগেকার মেটে নিরক্ষর
লোকপদ্য, প্রজন্মপুরাণ কোনো ছিদেম মাহাতো—
'দাঁড়ান, প্রণাম করব'—হাওয়ায় উৎসর্গ করি স্বগতোক্তি শুধু—

ব্যাঙের আধুলি

আজকাল গাছেদেরও বিনিয়োগ করা হয়, প্রত্যাহারও বটে
প্রকৃতির গোলমেলে ডানাগুলো ছেঁটে দেয় বীথিকাবিজ্ঞান
যেমন এখন নেই একটাও গাছতলা যোগক্ষেমবাদী
তারই কিছু শুশ্রূষার আধুনিক দাসখত লিখে দেয়, আজ
পুনর্বাসন তার ঘটা করে হয়ে গেল—পাঁচ বছর ধরে
আমাকে পুড়িয়ে ছিল দীর্ঘতম ধূপকাঠি, তবু তার ছাই
কাজে লাগছে, ঘষাপয়সা চকচকে করে তুলতে, ব্যাঙের আধুলি—

নিচে

শোকসভা ডেকেছিল, মেঘের সমিতি
গলিপথে ছায়া, ব্রহ্মগীতি

ছিল সকলের চোখে মণি
তরুণের বিতর্কিত দিবসরজনি

সে কি কোনো নারী ছিল? অথবা যুবক?
প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের রূপক

থেকে থেকে কাঁধে রাখত হাত
চমকে যেত নির্ধারিত শাদা যাতায়াত

ডেকেছিল তাকে দূরে আবছা বনস্থলি
কুয়াশার করবালে বলি

যূপকাষ্ঠে শীর্ষে চন্দ্রাতপ
নিচে ধূমকেতুচূর্ণ, রক্তিম নীরব

যাদুই কার্পেট

আগ্নেয়শিলার ভাঁজে আইন অমান্য হয়, যখন লিরিক
কাঁচের বাসন ভাঙে, গ্যাস আভেন, গ্রিল
নৈরাজ্যের খিড়কি থেকে উঠে আসে যাদুই কার্পেট—
লাফ দিয়ে ছাদে নামি, বন্দিনী নদীর হাসি জিতে নিয়ে কুমারীপুজোর
অশাস্ত্রবিধানগুলি বের করি শব্দ ভেঙে শব্দের অরবে—
এভাবে ভ্রমণসূচি বেড়ে গেলে প্রেম ও শরীর
শনাক্তবিহীন দ্বৈত বাতাসে বাতাস, তবে যৌগরসায়নে
হিশেবের ভুল হলে যাদুই কার্পেট হয়তো শাটল সার্ভিস—

একটু ভালো থাকার জন্য

নীরদ রায়

একটু ভালো থাকার জন্যে, মানুষ আজ কত কী যে করছে—
বিছানার কাছে এলেও রাতের ঘুমকে কেউ কেউ
দাঁড় করিয়ে রাখছে রাত দুটো পর্যন্ত,
হাতুড়ি পেটানোর শব্দগুলিকে ভরে রাখছে একটা লম্বা খামে,
সন্ধেবেলা অলৌকিকের পায়ে ফুল ও চন্দনের কৌটো রেখে
বাইপাশের সরু রাস্তায় রতনের চায়ের দোকানের পেছনে
শীতের রাতে একা একা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ ঘণ্টা,
সফল বন্ধুদের রঙিন কথাগুলি শোনার জন্যে
হাসিখুশির একটা বিকেলবেলাকে জোর করে আটকে রাখছে ঘরে,
যেসব কথায় প্রসঙ্গ পাল্টে যায়, ভারী হয়ে ওঠে চায়ের কাপ,
চোখে মুখে বিষাদ দ্রুত ছবি হতে থাকে—
সেইসব কথাগুলিকেও আটকে রাখতে চায় এক একটা গোপন কৌটোয়,
একটু ভালো থাকার জন্যে জনৈক মেশোমশায়ের পাঠানো
স্নেহ ও শুভেচ্ছাগুলিকেও আজ কেউ কেউ রেখে দিচ্ছে সন্দেহের তালিকায়
নিরাপদ দূরত্বে, রেলব্রিজের দক্ষিণে কোনো এক গোপন ডেরায়
লুকিয়ে রাখছে নবীন স্বপ্নগুলির বড় হয়ে ওঠা—
শুধু একটু ভালো থাকার জন্যে—।

এককোয়া রোদ
রঞ্জনা মিত্র

রাত্রি কুড়িয়ে নিয়ে খালধারে ঐ সাত বাই আটে
ঝুপড়ি খাঁচায় দীর্ঘমেয়াদে লটকানো পাটে পাটে।
দরমায় কাটা ঘুলঘুলি আর দরজার পাটা
আলো হাওয়া, আসা যাওয়া—সব সে মাপেই সাঁটা
ভেতরে ঘূর্ণি শিকলি থাবায় দিনগত পাপ বাটে।

সময়ের ফেরে আঁধার সুধীরে মজে জামদানি হয়
ফুল লতাপাতা যা কিছু দৃশ্য সবই অদৃশ্য নয়।
ভালোবাসাবাসি, গোপন প্রণয়, নিয়তযাপন রাত
দিনে আর রাতে, সাত বাই আটে, থাকে না সুপ্রভাত।
জন্মমৃত্যু হাঁড়িকুঁড়ি ঘিরে এমনই জীবন বয়।

তবু কোনোদিন আঁধার ছাপিয়ে সূর্যও ফুটে ওঠে
মেঘভাঙা প্রাতে নবজাত এক চিলতে মেয়ের ঠোঁটে।
সে আলোয় মা-র নীরক্ত চোখ থর মরুবুক কাঁপে
আলো গেঁথে গেঁথে তবু আহ্লাদে দিনরাত্তির মাপে।
দুই মুঠি ভাতে এককোয়া রোদ কালি নেবে চেটেপুটে।

নভেম্বর
রূপা দাশগুপ্ত

এক ॥ ধানের শীষের মতো মাঠগুলি খেলা করে
তোমার দু কাঁধে—
সেখানে পড়ন্ত রোদ অভিমান নামান্তর
এখনো কি ছন্দ বুনন
নিয়ে যাবে রাত্রিপার হাঁ করা কিশোর তুমি
চেনো না শিকড়বাকড় কিচ্ছুই
কেবল ক্রান্তিরেখা ঘুরে গেলে প্রান্ত বরাবর
কাঁপো একা একা

পাহাড়চূড়ায় নামে মেঘমুখ ছেলেবেলা
এক ফুঁয়ে সহজ উড়াল
এভাবে গোচর মাটি ক্লান্ত খুব দোলাচল
তবুও নেশার ঠায়ে বর্ষসুখ চেরাপুঞ্জি
নিহত মায়ের কথা মনে পড়ে বারবার
বন্ধ্যা প্রতীক্ষায়
যে আমার জানলাকে যে তোমার জানলাকে
পরিয়েছে জাফরির ক্লেদ
তাদের আস্থার বীজে প্রতিদিন রোপণ সাজাও
ব্যর্থ ককটেল।

দুই॥ ভুলগুলি শীতবিকালের নিমছায়া
সরাতে সরাতে যায় উঞ্ছ বারোয়ারি
তার অঙ্কুশের ভিড়ে মাটি খুঁজি
সিদ্ধকাল অখ্যাত কিঙ্কিরী।

কীভাবে রয়েছি জেগে

রাখাল বিশ্বাস

মাঝে মাঝে মনে হয় এ কুসুম নক্ষত্রের স্বরে,
কীভাবে রয়েছি জেগে জ্যোৎস্নার বৃষ্টিভেজা ঘরে।
দু'চোখে শূন্যের তুমি স্মৃতিসুখে পড়ে আছো, থাকো
আশ্চর্য জীবন জুড়ে কে বিঁধেছে পরাক্রান্ত সাঁকো।
চঞ্চল প্রহর পাশে কেঁপে ওঠে ঘুম ভাঙা পাখি,
ওঠে নাকি, বেলা যায়, পড়ে আছি আড়ালে একাকী।
কীসের নিসর্গ তুমি জ্বেলে রাখো শুধু দুঃখময়,
আঁধারে ফুলের কাঁটা সেও ভালো বোঝেনি হৃদয়.....

অস্তিত্ব ভুলেছি কবে

বিকাশ নায়ক

জীবন বুঝি না আজও—বেঁচে থাকা
লিখতে পড়তে দিন কেটে যায়।
যখন যেটুকু জোটে নুন-ভাত
ললাট-লিখন;
কখনও কলসি ডোবে, ফাঁকা থাকে কখনও কখনও—
পথের বাঁকের নাম : চিরজীবী দুখী হরিজন।
আকাশের নীচে কাঁপে ভালোবাসা
গৃহ-পরিবার......
নদীতে মেশানো বিষ; বাষ্প হয়—মেঘের গভীরে
ফসলে ছড়ায় আহা
হৃদিমাঝে, শরীরে শরীরে.....
জন্ম জানে বিকলাঙ্গ
প্রতিবন্ধী—মরণ সমান।
জরায়ু-পালিত ভ্রূণ
পাপজন্ম বয়ে নিয়ে আসে....
ভ্রূণের তো দোষ নেই—
বিবর্তন জলের অতলে
স্রোতে মিশে যায়।
তখন বিপন্ন বাঁচা বেঁচে থাকা
সম্মুখে দাঁড়ায়.....
অস্তিত্ব ভুলেছি কবে—মৃত্যুমুখ
যুঝতে যুঝতে
সকলেই ফুরায়......

ভণ্ডের দল লুকোক বিবরে

বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্মশান-শব্দ শুধু শোনা যায়
মুখর সঙ্গীত তবে নির্বসনে গেছে
সর্প-গর্ভে কোনো ভ্রূণ আজ লালিত
ঈশ্বর নয় শয়তান জন্ম নেবে এবার
ভণ্ডের দল লুকোক বিবরে।

সাগরবালিকার কাছে

রজতশুভ্র মজুমদার

সাগর তোমার জঠর ভরা জলে
লক্ষ প্রাণের প্রবল আনাগোনা
সাগর আমার তীক্ষ্ণ ছুঁচের সুতো
জঠর জুড়ে উল্কি করে বোনা

সাগর তোমার সূর্য ফোটা বুকে
আঠার মতো আগুন চুঁয়ে পড়ে
সাগর আমার বুকের মাঝে হিম
ঘরের পাখি ক্ষণিক অগোচরে

বিমুখ হয়ে ফেরার পথে পাড়ে
হাজার রাতের অসহ্য গঞ্জনা
তখন আমার জঙ্ঘা বেয়ে খুন
চলকে পড়ে, কেউ-তো তা জানে না

সাগর আমি অঙ্গহীনা, সঙ্গ শুধু স্মৃতি
সাগর তোমার জলের নীচে অশ্বক্ষুরাকৃতি...

নতুন কবির কবিতা

সৌমনা দাশগুপ্ত

রাত

সরাইখানার মতো টক্সিক হয়ে গেছে রাত,
চাঁদের সোনার বল কালো কাচ চুঁয়ে রংচটা
হলুদ, এখুনি পুড়ে যাবে গরম তেলে সবুজের সাথে।
নখ ডুবে যায় জ্যোৎস্না-শরীরে প্রত্নহাতে,
নর্তকী পা থেকে তালে তালে খসে যাওয়া
ঘুঙুরের মতো প্রহর খুলে খুলে রাত এক
খড়কাঠামো আকাশে, কর্কশ কাকরুতে
রাতচিতা আগুন বাতাসে হাসে।

কাঠ

নদীখাতের মতো ভঙ্গুর কাঠবৃত্তে দ্বিচক্রযান
এক সাইলেন্সারহীন বল্লম, পেশি ও সাহস খেলা,
পাথরের হাত ধরে পাথর খেলায় ভাত ফোটে,
টগবগ মুদ্রা হাতে ও ঠোঁটে, জনাকীর্ণ পাটাতন
ভেঙে কাঠ শুধু কাঠ, কাঠের আগুন,
গলে না মোমমাংসপেশি, হাজার মাইল শেষে
কাঠের কাঠামো হয়ে গেছি।

শুধু স্বপ্নই

স্বর্ণকেশী ঘোড়াজিন খুলে এক পা দুপা করে বেলাভূমি ছেড়ে জলে
হাত রাখতেই দুরন্ত নৌকার মতো এক সূর্য এ ঢেউ ও ঢেউ টপ্‌কে পৌঁছে
গেল পাথুরে পাহাড়ের অলৌকিক চূড়ায়। কন্দরে তখন তুলসীবীজের
মতো নিশ্চুপ মোমবাতি গলে যাচ্ছিল অসহ বিপন্নতায়।

হরিসাধন চন্দ্র

একটি পায়রা ওড়ানো সাদাবাড়ির কথা

ওপরে ফাতনা কাঁপে, বড়শিও টোপের খোলসে,
চার গন্ধে ঝাঁক বেঁধে ছোটে।
বড়শিতে গাঁথা পড়ে কেটে যায় ঘোরে ;
রক্তঝরা আছাড়-পিছাড়।

কেউ বা ভেষজে ভরা, কারো নীচে তেল,
আর কারো......ইত্যাদি ইত্যাদি।
ঋণটোপ খেয়ে ফেলে,
হ্যাঁচকা সবৃদ্ধিমূলে আক্কেলসেলামি ;
সাদাবাড়ি একে একে গিলে নেয় সব,
চারদিকে লোপাট লোপাট।

হাউ হাউ কাঁদা যায় যার পাড়ে বসে

উরুতে গড়ানো রক্ত কখনো কখনো
পুঁটলিতে বেঁধে রাখা ছেঁড়া-ফাটা পুরনো কাপড়
হঠাৎ মহার্ঘ করে তোলে।

সেরকমই ভুল পাটিগণিতের
কুলুঙ্গিতে ফেলে রাখা কোনো কোনো মুখ
হঠাৎ কখনো
একখানা পৈঠেফাঁকা দিঘি হয়ে যায়—
হাউ হাউ কাঁদা যায় যার পাড়ে বসে।

সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বল

দরজা খুলেই নদী—
আমি কোনখানে পা রাখি।
পায়ের নীচে তুমুল জলস্রোত
তাই
        দরজা বন্ধ রাখি
আমার
        ছিন্ন নৌকো বাকি
সেইটুকু থাক
        কান্না-ঘেন্না-ক্রোধ।

বায়ু উনপঞ্চাশ

হাতের পাতা ভেজা
        ছুঁয়ে উঠলো ভিজে
                নির্জনতার ভোর
আড়াল কিছু ছিলো
        কিছু ভাঙলো বলে
                সন্ধ্যাবাহুডোর
কঠিন হলো

নদীর ধারে চোরাবালির পথ
চলতে ডুবে যায়
        ডোবে স্বপ্নে গড়া
                রঙিন খেলাঘর
দু'কূল ভাঙা স্রোত
        ভাঙা ভেলার মাঝে
                নিছক নীচু মেঘ
মেঘে ভাসলো শেষে
        দুজন ওরা
                লাগিয়ে হাতে হাত

পালক কিছু ওড়ে
কিছু পালক জানে
অবৈধতার শাপ
মোমের মতো একা
একা জ্বলতে থাকে
উনপঞ্চাশ পাপ।

দেবত্ব

দেবতার কোনো মাতৃভাষা নেই
কান্না নেই, দুঃখ নেই
দেওয়ালি বা দোল কোনোটাই নেই

পুরোনো চিঠির মতো, বিক্ষত
প্রাণ এক, জেগে আছি—দূরে
নির্জনে।

সেতুর উপর এই অনন্ত চলাচল ছেড়ে
কবিতা লেখার পাপে
অনায়াসে মরে যেতে পারি
রাত্রির পর জানি জ্যোৎস্না-নীরবতা
এইখানে নেমে আসে, মাঝামাঝি
দুজনকে দেখার মতো আলো।

মাঝে মাঝে হৈচৈ করি, চিৎকার করি
প্রহরী...প্রহরী...
বেনোজলে, ফাঁসিকাঠে
ক্লান্ত চাঁদের দেশে
ভেসে যায় ভাষাহীন স্বর
প্রহরী...প্রহরী...
দেবতার আলো নেই, অন্ধকার নেই
মাতৃভাষাহীন শুধু করোটি, পাঁজর
খড়।

যোগ-বিয়োগ

বীরেন্দ্র দত্ত

ডোরবেল একটু বেজেই থেমে গেল। বেজে ওঠার ধ্বনিতে একটু বা ভিরুতা! কিছুটা কি সন্ত্রস্ত ভাব? নাকি আড়ষ্টতা, সলজ্জতা! দীপক কি? একটু একটু অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে ঋতি। ব্যস্ততায় যদি আর একবার বেলটা বাজে! হয়তো দরজার আড়ালে দীপক কিছুটা সাহস তৈরি করছে! ঋতির চোয়াল শক্ত হল। ছেলেটাকে আজ.....। ঋতি একতলার মেঝেয় পা ফেলতে ফেলতে বাইরের বন্ধ দরজার পিছনে চলে আসে। ডোর-আই-এ চোখ রাখে। তখনও ডোরবেলের পুনরুক্তি নেই। ডোর-আই-এর ভিতর থেকে চোখের সামনে কিছু পড়ছে না। সরে গিয়ে লুকিয়ে আছে বুঝি দীপক! শয়তানটাকে ও আজ ছাড়বে না। শালোয়ার কামিজে মোড়া শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে কখন! ঋতি অনুভব করছে ওর শ্বাস রীতিমতো উত্তপ্ত, বুকের ভিতরে ভয় আর বানানো সাহসের চাপ।

ঋতি দরজা খোলে।

সামনে এক যুবক। স্থির দাঁড়িয়ে। ঋতির চোখে ওর চোখ স্থির।

ঋতি সামলে নেয়, 'কী চাই?'

'আগে আমাকে ঢুকতে দাও।' গলায় যেন কঠিন আদেশ। দু'চোখে ক্রোধ।

'আপনি কে?'

মুহূর্তে আগন্তুক ডান পকেটের ঢোকানো হাত বাইরে আনে। হাতের উদ্যত রিভলভার সামনে ধরে, একেবারে ঋতির বুক বরাবর।

কয়েক মুহূর্ত দুজনের মধ্যে ভয়াল স্তব্ধতা।

ঋতি কিছু যেন বোঝে। একটু পিছিয়ে আসে। 'আপনি কেন এসেছেন!'

'আহ্!' যুবকটির গলার স্বরে কিছু গুমরানো বিরক্তি, 'সরো।' ঋতিকে ঠেলে পাশে সরিয়ে ভিতরে ঢোকে। 'রিভলভারের মুখ ঋতির কাঁধের কাছে বসিয়ে রাখে। 'তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করো। একটু দেরি হলেই—'

ভাবলেশহীন মুখে ঋতি দরজা বন্ধ করে।

'ভালো করে ছিটকিনি বন্ধ করো। লক্‌টা ঠিক পড়েছে তো।' যুবকের স্বরে নির্ভয়।

ঋতি যুবকের মুখোমুখি হয়। সারা শরীর জুড়ে শীতল স্রোত আচম্কা ভয়ের ভারে চেতনার লোপ।

হাতের রিভলভার ধরে নির্দেশ দেয় যুবকটি, 'আমাকে দোতলায় নিয়ে চলো।' ঋতিকে কী ভেবে লক্ষ করে, 'আর শোনো, কোনোরকম চিৎকার করার চেষ্টা কোরো না। ফল

মারাত্মক হবে।'

'আপনি কী চান?' ঋতি ভিতরে ভেঙে পড়ে। গলা কাঁপে। 'বাড়িতে কেউ নেই।'

'আমি জানি। সেটা ভেবেই তো এসেছি।'

ঋতি অসহায়ের মতো ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকে।'

নীচের একটা ঘরে ফোন বেজে ওঠে। বিরক্তিকর। দ্রুত যুবকটি ঘরে ঢোকে রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। 'একবারও রিসিভার তুলে রাখবে না।' যুবকের স্বর কর্কশ শোনায়। হাতের রিভলভার একভাবে ঋতির কাঁধের কাছে তাক করা।

'চলো উপরে উঠতে উঠতে বলছি।'

ঋতি ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে। একতলা থেকে দোতলার সিঁড়িতে পা রাখে।

যুবকটির হাতের রিভলভার সেই একভাবে ঋতিকে অনুসরণ করে। 'আমার নাম মন্দার', চকিতে আসল নামটা লুকোয়, 'তোমার তো ঋতি। আমরা দুজনেই সামান্য ছোট বড়, আমাকে 'তুমি' বলবে। অন্তত যতক্ষণ থাকতে পারব।'

দোতলার বড় বারান্দায় সাজানো কোচ পাতা। দোতলায় দুজন এসে দাঁড়াতেই মন্দার কী ভেবে রিভলভার ডান পকেটে ঢোকায়। 'অমি কোচে বসছি।' বসেই পাশের টেবিলে দেখে ফোন। 'আর শোনো, এই ফোনেরও রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। লাইন ডিস্‌কানেক্ট করছি না তুমি কিন্তু কোনোভাবেই ফোন করার চেষ্টা কোরো না। রিভলভারটা কিন্তু এর পাশেই রাখছি।' পকেট থেকে বের করে রিসিভারের পাশে রাখে।

ঋতি যেন যন্ত্র। কোনো কথা নেই মুখে। শুধু একভাবে তাকিয়ে থাকে মন্দারের দিকে। ঋতির সুন্দর ফর্সা মুখ ভয়ের বিকৃত প্রসাধনে ঢাকা।

'এক গ্লাস ঠান্ডা জল খাওয়াও।' কী যেন মনে পড়ে যায় মন্দারের, 'দোতলায় আর কোনো ফোন নেই তো?' স্বরে সন্দেহ চেপে বসে।

ঋতি মাথা নাড়ে, গলায় ভাঙা শব্দ বেরোয় 'না।'

'আর ঘরে গিয়ে কোনোভাবে চেঁচাবার কথা ভেবো না। তোমাদের ঘরের চারপাশে গাছপালা, একটা লন। এই সন্ধেয় এদিকটায় লোকজন কম। শব্দ যে যাবে না, দেখেই এসেছি।' কিছু সময় সামনে দাঁড়ানো ঋতিকে নিষ্পলক দেখে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। শুকনো কর্কশ মুখের ভাবে প্রচ্ছন্ন একটা হাসি ভেসে উঠে মিলিয়ে যায় 'যাও।'

. ঋতি ধীর পায়ে রান্নাঘরে ঢোকে। দোতলার বারান্দা থেকে রান্নাঘর দেখা যায় না। ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু সময়। ভিতরে কাঁপতে থাকে, মন্দার নামে ছেলেটা কেন এসেছে? কি চায়? মাথার ঘন চুল অগোছালো। জিন্‌সের প্যান্ট বুশশার্ট ময়লা। পিঠে রুকস্যাক-এর মতো ছোট এক বোঝা। দু'চোখের গোড়ায় ক্লান্তি। কুচো কিছু চুলে চিবুক, দাড়ি ঢাকা। যেন কতদিন স্নান করেনি। তারপর? আজ কি এখানে থাকবে! ভিতরে কেঁপে ওঠে ঋতি। মা-বাবা গেছে সেই চন্দননগরে, ফিরতে রাত দশটা তো নিশ্চয়ই। মাঝে যদি ফোন করে। যদি লাইন না পেয়ে সন্দেহ করে? মন্দার নামের ছেলেটা ওভাবে ওকে দেখছিল কেন। মুখে কীসের হাসি? দীপকের মতো। শিউরে ওঠে ঋতি।

'কী হল দাও!' বারান্দা থেকে কানে এল অতিথির কণ্ঠস্বর। ঋতি এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবত নিয়ে আসে মন্দারের সামনে আতিথেয়তায় যদি খুশি হয় যুবকটি।

'জানলা দিয়ে কাউকে ডাকছিলে নাকি?' তোমাদের যে কোনো দারওয়ান নেই, জানি!'

'না, না।' ঋতি কাঁপা গলায় শব্দ দুটো উচ্চারণ করে। হাঁপায়।

'বসো।' সামনের কোচে বসার ইঙ্গিত করে মন্দার, স্বরে কাঠিন্য, সেই নিষ্ঠুরতা যেন কিছুটা কম! কিন্তু আবার দেখা দিতে কতক্ষণই বা!

ঋতি জড়োসড়ো হয়ে বসে।

মন্দার এক নিঃশ্বাসে ঠান্ডা পানীয় শেষ করে। টেবিলের ওপর রাখে গ্লাসটা। একটা সিগারেট ধরায়। অন্যমনস্কের মতো ঋতিকে দেখে।

'শোনো।' মন্দার কিছু বলতে গিয়ে নেমে যায়।

'বলুন।' ঋতি তটস্থ। চমকে ওঠা ওকে বুঝতে দেয় না।

'বলুন নয়, বলো। তুমি তো কলেজে পড়ো। তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছ কেন?'

ঋতি একটু বা স্বভাবে স্বচ্ছল হয় মন্দারের সামনে।

'আমার কদিন ভালো খাওয়া হয়নি। তোমাদের রান্না করা কিছু আছে? আমি মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে কিছু খাবো।'

ঋতির ভিতরটা এবার ভাঙতে থাকে। শরীরে সেই আড়ষ্টতা নেই।

'আছে।'

'একটু রেস্ট নেব এই কোচেই। শুধু তুমি আমার কাছ থেকে একবারও নড়বে না! ফোনে হাত দেবে না।' অন্যমনস্ক হয় মন্দার। 'তোমাদের দোতলার বাথরুমের কাচ একটা বোধহয় নেই।'

ঋতি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চোখ সরায় না। কী করে জানল।

'দরকার হলে ওখানে দিয়েও চলে যেতে পারি।'

ঋতি রুদ্ধশ্বাস, 'কেন!'

মন্দার চুপ করে ঋতিকে দেখে। যেন ঋতিকে এবার উপেক্ষা করতে চায়।

'আর শোনো, কোনো ফোন এলে আমার সামনেই কথা বলবে।' এবার বিড় বিড় করে, 'কাউকে বিশ্বাস করি না, তোমাকেও না।'

ঋতি একভাবে মন্দারকে দেখে। যেন স্বীকারোক্তি করে, 'আমার কাছে আলমারির কোনো চাবি নেই।'

মন্দার হাসে। 'তুমি তো দারুণ সুন্দর সবদিক থেকে মর্ডান! মা-বাবার দামি অলংকার। তুমি তো আছো!'

'মানে।' ঋতি ভিতরে ভেঙে পড়ে। দু'চোখে চাপা কান্নায় জল ভরে যায়।

শব্দ করে হেসে ওঠে মন্দার। হঠাৎ মনে হল একটু জোর হয়ে গেছে হাসিটা, সংযত হয়। 'ওঠো, আমি বাথরুমে ফ্রেশ হয়ে নিই। বেশি সময় লাগবে না। তুমি বন্ধ বাথরুমের সামনে থাকবে একবারও যেন এদিকে আসবে না। ফোন এলে আমি বেরিয়ে এলে আমার

সামনে ধরবে।' মন্দার ছোট রুকস্যাক থেকে তোয়ালে বের করে এগোয়। পিছনে ঋতি।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে কোচে বসে মন্দার।

ঋতির দু'চোখে চাপা বিস্ময়। আগের মন্দারের থেকে এ যেন অন্য মানুষ। দু'চোখের গোড়ায় কালো দাগ চাপা পড়েনি, কিন্তু ঋতি মন্দারের সারা চেহারায় এক অদ্ভুত দৃঢ়তা, পৌরুষ লক্ষ করে।

বসেই মন্দার নতুন একটা সিগারেট ধরায়। 'এবার খাবার মতো যা আছে দাও। দেরি করবে না।'

ঋতি একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সামনে। যেন ফিস ফিস করে, 'গরম করতে যা সময় লাগবে'। মন্দারের চোখে মুখে সম্মতি বোঝে ঋতি। ধীর পায়ে দূরে সরে যায়।

হালকা শীতের সন্ধে বাড়ির চারপাশে লন ছুঁয়ে স্থির বসে পড়েছে একটু আগেই। যেন শীত আর কঠিন অন্ধকার গলাগলি করে মন্দারকে কিছুটা নিরাপত্তা দেয়। মন্দারের তাই মনে হল। মন্দার খাওয়া শেষে লম্বা কোচটায় গা এলিয়ে দেয়।

'তুমি একটু আমার কাছে এসে বসো।' মন্দার ঋতির চোখে চোখ রাখে।

'কেন!' ঋতি অসহায়তায় কেমন হালকা হয়ে যায়। স্বরটা জড়ায় যেন।

'ফোনটা তো হাতের কাছে আছে। তুমি আমার কাছে থাকলে সুবিধে।

'কীসের!'

'কোনো ফোন এলেই তুমি ধরবে। তার আগে কী কথা বলবে, কীভাবে—তোমাকে বোঝাতে হবে!' মন্দার রিভলভারটা হাতের মুঠোয় নেয়। পাশে সরিয়ে রাখে।

ঋতি এবার সাহস শ্বাসের সঙ্গে মেশায়, 'আপনি কে বললেন না তো! কেন এসেছেন?' যেন দাবির মতো শোনায় ঋতির কথাগুলো, কিন্তু নরম, ভীতার্থ।

'বলা যাবে না।' মন্দার ক্রমশ শুয়ে পড়ে। দু'চোখে তন্দ্রা ঝিমোয়।

হঠাৎ ফোনের রিং হয়।

চকিতে উঠে বসে মন্দার। দ্রুত হাতে রিভলভার মুঠোয় নেয়। ঋতির দিকে তাকায়, 'যেই ফোন করুক, এমন কিছু বলবে না—'বলেই ইশারা করে ঋতিকে ফোন ধরায়।

......'হ্যালো।' কে বাবা?'

হ্যাঁ। কেমন আছিস?

ঋতি মন্দারের দিকে তাকায়। ওপাশ থেকে স্বর আসে, 'কথা বলছিস না যে?'

'ভালো। খুব ভালো।'

'তোর গলাটা এত বসে গেছে কেন?'

'কই না তো?'

'হ্যাঁ। সেই চেঁচিয়ে কথা বলা তো তোর নেই!'

ঋতি কী বলবে। নীরব থাকে।

'কীরে কথা বলছিস না কেন?'

মন্দার হাতের রিভলভার নেড়ে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

'এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম তো। আচমকা ফোন করেছো।'

'ভুলে গেছি। তোকে সেইভাবেই তো ফোন করব বলেছিলাম।'

'এখন ঠিক হয়েছি।'

'শোন, আমাদের দেরি হলে ভাববি না। আবার বলি, দিনকাল ভালো নয়। কেউ ডাকলে দরজা খুলবি না। তোর কলেজের ছেলে এলেও না। তোর মা খুব ভাবছে।'

'কিছু ভাবতে হবে না বাবা।'

'তোর সেই দীপকটা এসেছিল নাকি?' এলে কিছুতেই ঘরে ঢোকাবি না।'

'না বাবা।' ঋতি দ্রুত ফোন ছাড়তে চায়। 'রাখছি, তোমরা ভালোভাবে ফিরে এসো। বাই!'

ঋতি রিসিভার নামিয়ে রাখে। সোজা কঠিন হয়ে বসে থাকা মন্দারকে দেখে।

ফোনে দূর থেকে আসা কথাগুলো কানে আসছিল মন্দারের। 'আসছিল' বলার থেকে মন্দার চাইছিল কথাগুলো শুনতে। মন্দার ঋতিকে অন্যমনস্ক হয়ে দেখতে থাকে। একবার হাতঘড়ি দেখে। কী ভেবে বলে, 'আমার আসার আগে তুমি কি কারোর জন্যে অপেক্ষা করছিলে?'

ঋতি ভিতরে চমকে ওঠে, 'কই, হ্যাঁ, না-না তো।' ভিতরে কথা জড়ায়।

'আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, তুমি অন্য কাউকে যেন ভেবেছিলে?'

'কী করে বুঝলে' ঋতি এবার সহজ হয়। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামে।

'দীপক কে?'

'দীপক।' ঋতি কিছুটা অচেনার ভান করে।

'তোমার বাবা যাকে ঘরে ঢোকাতে বারণ করলেন।' মন্দার এবার নিশ্চুপ মাথা হেঁট হওয়া ঋতিকে জরিপ করে। ওকে একভাব বসে থাকতে দেখে মন্দার আবার প্রশ্ন করে, 'তোমার কলেজ ফ্রেন্ড।'

মুখ তোলে ঋতি। 'একসঙ্গে কলেজে পড়ে।'

'ভালোবাসার মানুষ?'

'না।' গলায় জোর দেয় ঋতি।

'বাবা-মা তো তোমার কন্‌জারভেটিভ নন।'

'মোটেই না।'

'তা হলে একজন বয়ফ্রেন্ডকে ঘরে ঢুকতে বারণ করছিল কেন?'

'আমার ওকে ভালো লাগে না।'

মন্দার নতুন করে সিগারেট ধরায়।

'বিশ্বায়ন বলে একটা কথা আছে জানো?'

ঋতি মাথা নাড়ে। বোঝে।

'তাতে মুক্ত বাজারের কথা বলে। মেয়েরাও তো একটা পণ্য। ভোগ্যপণ্য। তাতে তো মুক্ত বাজার সমর্থন পায়।'

ঋতি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'মেয়েরা সহজেই হস্তান্তরিত হতে পারে। খোলা বাজারে তোমার মতো এত সুন্দরী মেয়ে তো চড়াদামে বিকোতে পারে।' মন্দারের গলায় সূচের মুখের মতো তীক্ষ্ণতা, সূচের শরীরের মতো উজ্জ্বল কটাক্ষ। 'তোমার মা-বাবার বুঝি সেখানে ভয়?'

হঠাৎ ঋতি ভিতরে ভেঙে পড়ে। মন্দারের কথাগুলো কখন যেন ঋতির বুকের গভীরে আঘাত করে, 'আমি ওকে তাই সহ্য করতে পারি না।'

'তা-ই!' মন্দার কিছুটা বিস্ময়ে স্থির, 'দীপকের কথা বলো, খুলো বলো। আমার মনে করার কিছু নেই।'

ছলছলে চোখে তাকায় ঋতি মন্দারের দিকে। কেমন গভীর বিশ্বাস আলোর মতো জ্বলে ওঠে ওর মধ্যে।

'দীপক এখন সহপাঠী হলে কী হবে, দু'তিনজন বন্ধু মিলে আমাকে ইভটিজিং-এ বিরক্ত করত। তখন ওদের চিনতাম না। পরে পরিচয় হলে—' ঋতি থেমে যায়।

'পরিচয় বা বন্ধুত্ব হবার পর তো? কী হল বলো?' মন্দার স্বরে চাপ দিয়ে সাহস জোগায়।

'দীপক আমাকে একদিন রেপ করার—'ঋতি ভয়ের আপ্লুত স্বরে চাপা পড়তে থাকে। কোনো কথা স্বরে ধরা পড়ে না, 'পুলিশ ওদের ধরেছিল। থানায় এক রাত।'

মন্দার চুপ করে থাকে কিছু সময়।

'আজ বুঝি ওর আসার কথা?'

ঋতি নিজেকে সামলায়, 'হ্যাঁ, একা থাকব—কীভাবে তা জেনেছে, তাই আসবে।' মাথা নিচু করে ফিসফিস করে, 'বাবা-মাকে তো বলা যায় না।'

মন্দারের মন অন্যমনস্ক। ঋতিকে দেখে। ভোগ্যপণ্যের সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা বিশ্বায়নে মেয়েদের দিয়ে লাভ আর লোভের হিসেব মেলাবে।

ঋতি মন্দারের মুখের দিকে তাকায় ওর মুখের চোয়াল শক্ত। দু'চোখ যেন চিতার মতো জ্বলছে। হাতে রিভলভার নিয়ে নাচায়। ভয় পায় ঋতি। 'শোনো, বাজার থাকলেই ব্রোকার থাকে। কিছু নিউজপেপার, ইলেকট্রোনিক মিডিয়া সেই ব্রোকার এইসব কাজে মদত দেয়।' মন্দার গুম্ হয়ে যায়।

এখন বেশি শীত লাগছে মন্দারের। এবার বুঝি ওকে যেতে হবে। বাথরুমের ভাঙা জানালার আড়াল দিয়ে নয়, সোজা বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ভেবেই পোশাক সব পরে নিয়েছে আগেই। ওর খোঁজে পুলিশ তৎপর, এদিকটায় খোঁজ পাবে না ভেবেই এখানে আশ্রয় নিয়েছে। জেল থেকে পালিয়ে একটু খিদে মেটাতে রাস্তার দোকানে তো খাওয়া যায় না। শান্তি পেতে ও এখানে আসে। আবার কোথায় যাবে কে জানে, ঋতিকে তো এসব কিছু বলা যাবে না। চলে যাবার পর যা বোঝে বুঝবে। পুলিশ এলে ও কী বলবে? মনে হয় না। তবু এবার উঠতে হয়।

হঠাৎ নীচে ডোরবেল বেজে ওঠে। একবার......একটু পরে আবার......।

সামনে বসা ঋতি চমকে ওঠে।

'কে আসতে পারে?' মন্দার রিভলভার শক্ত হাতে ধরে থাকে।

'তুমি নীচে গিয়ে দেখ। দীপক হলে নীচেই বসাও। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামছি।'

'তুমি........আপনি চলে যাবেন?'

'যেতে তো হবে।'

'কিন্তু আমি......।' হঠাৎ ঋতি কী কারণে যেন অসহায় একা বোধ করে।

'আগে ওকে বসাও ঘরে।'

মন্দার-ঋতি একসঙ্গে নীচে নামে। মন্দার আড়ালে লুকোয়। ঋতি দরজা খোলে।

দীপক খোলা দরজা দিয়ে কিছু না বলেই ভিতরে ঢোকে।

ঋতি দরজা বন্ধ করে।

'কোচে বসো।' দীপক কোচে বসলে ঋতি দাঁড়িয়ে থাকে। 'একটু অপেক্ষা করো। আমাদের এক আত্মীয় এসেছে। ও এবার যাবে। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।' যেন বিড় বিড় করে 'বারণ করেছিলাম।'

'বাড়িতে তো কেউ নেই! অনেকটা সময় পাওয়া যাবে।' দীপক ঋতির কথায় কানই দেয় না। এদিক ওদিক তাকায়।

আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে মন্দার।

ঋতি মন্দারের দিকে তাকায়, 'এসো। আলাপ করিয়ে দি।' এই হল দীপক সান্যাল। আর এ মন্দার। একটু আগে এসেছিল, এবার যাচ্ছে কলকাতার বাইরে।'

দীপক হাতজোড় রেখে নমস্কার করে একভাবে তাকিয়ে থাকে।

মন্দার তাকিয়ে থাকে দীপকের চোখে চোখ রেখে।

'পরে দেখা হবে।' দীপক হাসিমুখে মন্দারকে বিদায় জানায়।

'মন্দার তুমি একটু বসে যেতে পারো।' ঋতির এমন প্রস্তাব অভিনয়ের না ভয়ের?

'না আমি বরং উপরের ঘরটায় যাই। একটা জিনিস পড়ে আছে, নিতে ভুলে গেছি।'

ঋতি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মন্দারের দিকে। ওর কাছে মন্দার এক রহস্যময় যুবক। বিস্ময় সরিয়ে ঋতি বলে 'যাও, দেখে এসো।'

দেরি করে না মন্দার। কয়েক মিনিট পরে ঘরে আসে। দীপকের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'আবার দেখা হবে দীপকবাবু, তখন অনেক গল্প।'

বাইরে বেরুবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় মন্দার। তাকায় ঋড়ের দিকে।

ঋতি কেমন চাপা ভয়ে তটস্থ' মুখে চোখে অসহায়তা আতঙ্ক কিন্তু ভিতরে এক চাবুকের মতো শাণিত সাহস। মন্দারের থেকে দৃষ্টি সরায় না।

মন্দার বাইরে বেরুবার উদ্যোগে মাথা নাড়ে। পকেটের রিভলভারটায় একবার আলতো হাত বুলায়। 'চলি।' অন্ধকার শীতের ঠান্ডায় পড়ন্ত গেলে পার হতে হবে। চকিতে মন্দার কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

ঋতি দরজা বন্ধ করে ধীরভাবে। শব্দহীন পায়ে দীপকের সামনে দাঁড়ায়, 'তোমাকে আসতে

বারণ করেছিলাম দীপক।'

'মেয়েদের সব বারণ শুনতে নেই। শুনলে বোকা বনে যেতে হয়।' হাসে দীপক। 'বসো।'

'না। তুমি চলে যাও।'

দীপক একভাবে হেসে যায়। 'তোমার রাগ স্বাভাবিক, তবে—'

'আহ্, যুক্তি দিও না দীপক। থানায় রাত কাটানোর কথাটা ভুলে গেলে?'

দীপক অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে। উঠে দাঁড়ায়। ঋতির সামনে এগিয়ে আসে। ওর হাত ধরে সামনের কোচে বসায়।

ঋতির ভয় হয়, রাগে ঘৃণায় সারা শরীর কাঁপে। কোচে বসে নিশ্চুপ মাথা নিচু বসে থাকে।

দীপক নীরবতা ভাঙে, 'শোনো সেদিন আমার কোনো দোষ ছিল না। শান্ত আর অলোকই—

'থামো।' ঋতি স্পষ্ট করে দীপকের চোখে চোখ রাখে। 'পুলিশের কাছে কী বলে এসেছো, আমি জানি দীপক। ওদের সরিয়ে তুমি কেন আমার কাছে এগিয়ে এসেছিলে—পুলিশের খাতায় তা লেখা আছে।'

আসলে আমি পাগল হয়ে যাই ঋতি তোমাকে দেখলে। এটা কি এমন অন্যায়!'

ঋতি প্রবল মাথা নাড়ে, 'তোমাকে আমার একটুও ভালো লাগছে না। এখনি বেরিয়ে যাও।'

দীপক সারা মুখে উপেক্ষার হাসি নিয়ে ঋতিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ কোচ ছেড়ে উঠে ঋতির সামনে আসে। ওর থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে বসে পড়ে।

ছিটকে ওঠে ঋতি। কোচের পিছনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'শোনো।' দীপক নরম মুখে ঋতির দিকে তাকায়। 'তোমার সঙ্গে আমার কিন্তু কথা আছে— মানে সেদিনের ব্যাপার বোঝাতে চাইছি' একভাবে হাসে। 'একটু শান্ত হও।'

ঋতি কী ভেবে দূরে সরে যায়, 'আবার বলছি, তুমি চলে যাও দীপক।'

দীপক উঠে নীরবে কঠিন পায়ে ঋতির দিকে এগোয়, 'চেঁচিয়ে কথা বোলো না!'

ঋতি কী ভেবে হঠাৎ তীব্র চিৎকার করে ওঠে, দীপক! এগোবে না।'

ঝনঝন করে ডোরবেল বেজে ওঠে, 'বাড়িতে কে আছেন। দরজা খুলুন।'

ঋতি দীপক দুজনেই কাঠ।

'খুলুন? থানা থেকে আসছি।'

যেন সম্বিত ফিরে আসে দুজনের। দীপক স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকে। ঋতি ধীর পায়ে এগিয়ে দরজা খোলে।

সামনে দীর্ঘদেহী পুলিশ ইনস্পেক্টর দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এসে দাঁড়ায়। পিছনে একজন কন্সেটবল।

'এখানে দীপক সান্যাল বলে কেউ আছে।' ইন্স্পেক্টরের গম্ভীর গলা।

ঋতি হঠাৎ মূক হয়ে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দীপকের দিকে দৃষ্টি ঘোরায়। 'কী ব্যাপার!'

'থানায় একজন ফোন করেন আপনার বাড়ি থেকে, আপনি কি ঋতি সেন?'

'হ্যাঁ।'

'মন্দার নামে একজন ফোনে জানান—আপনি নাকি বিপদের মুখে।' হঠাৎ দূরে দীপকের ওপর দৃষ্টি পড়ে। ইন্সপেক্টর অবাক, 'আরে আপনি। সেই দীপক সান্যাল। স্ট্রেঞ্জ! আবার থানায় যেতে হবে যে।'

দীপক অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে ঋতির দিকে।

ঋতি বাকরুদ্ধ। দীপকের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

ইন্সপেক্টর কনস্টেবলকে আদেশ দিলেন, 'ওকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলো।'

দীপক কেমন অপরাধীর মতো কনস্টেবলের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ইন্সপেক্টর এবার ঋতির দিকে এগিয়ে আসেন, 'শুনুন মিস সেন। বলে রাখি, এক জেল পালানো বন্দি এদিকে এসেছে—আমাদের কাছে খবর আছে। একটু এ্যালার্ট থাকবেন। দেখতে পেলেই খবর দেবেন। স্বাস্থ্যবান যুবক, পিঠে ছোট মাপের রুকস্যাক। ঘরে ঢুকতে দেবেন না।' আরও কিছু বর্ণনা দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন 'দরজা বন্ধ করুন।' বেরিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর।

গাড়ির শব্দ দূরাগত হলে ঋতির যেন সম্বিত ফিরে এল। যার বর্ণনা দিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর হুবহু সেই বর্ণনায় হয় মন্দার।

ঋতি দু'চোখের তারায় জল নিয়ে রুদ্ধ দরজায় পিঠ রেখে চাপা শিহরণে স্থির।

ভাঙা লন্ঠনের গল্প

নীহারুল ইসলাম

—ছুঁড়ি আসছে না কেনে? সেই কুন স্যাকালে বকরিক'টা চরাতে নি গেলছে চরের মাঠে। সাঁঝ হুন এল, তাও অর পাত্তা নাই। কী হইল অর? মরল নাকি!.....

একচিলতে ঘুপচি বারান্দার উনুনে রুটি গড়তে বসে বিড়বিড় করছিল বাশিরা,......অর বাপটোও তো আইজ ক'দিন থেই পড়ি আছে ওই ডাহিন মাগির কাছে। হায়রে হামার কপাল!

দু'হাতের তালুর সাহায্যে নরম আটার গোলার বিস্তার ঘটানোর সঙ্গে উনুনে পাটকাঠি গুঁজে দিতে দিতে তার সারা শরীরে বিরক্তির ঘাম ফুটে উঠছে। এমনিতে ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরম। কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। তবু ভাবছে তার রুটি গড়া শেষ হওয়ার আগেই বিটি জারিনা ফিরে আসবে নিশ্চয়।

জারিনার বয়স কত? বড় জোর সাত-আট হবে। ওইটুকু মেয়ে রোজ একপাল ছাগল চরাতে নিয়ে যায় চরের মাঠে। ছাতি টনটন করে ওঠে বাশিরার। কিন্তু উপায় কী? গরিবের ঘরে জন্মেছে যখন! এমন ভাবলেও বাশিরার দুঃশ্চিন্তা যায় না। বিটি তার একটু একটু করে বড় হচ্ছে। কোথায় কী হয়। দিনকার যে ভালো নয়, তা অজানা নয় তার। কী জানি কেন— আজ রুটি গড়তে বসে তার মন খালি কু গাইছে। হঠাৎ একথা মনে হতেই বিটির কচি মুখখানা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সে। আর দেখতে পায়, সারাদিনের না খাওয়া বিটির শুকনো মুখ। ঠিক যেন আমচুরের মতো শুকিয়ে চিমসে হয়ে।

আবার মন খারাপ হয়ে যায় বাশিরার। আর সে ওই খারাপ মন নিয়েই সব রুটি গড়ে। কিন্তু একটা রুটিও তার হাতে আজ ঠিকঠাক গোল হয় না। উত্তপ্ত তাওয়ায় কোনো রুটিটা পুড়ে যায়। কোনোটা কাঁচা থাকে। তবু শেষপর্যন্ত রুটি গড়া শেষ করে সে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। যার ছটা এসে পৌঁছায় না বাশিরার ওই ঘুপচি বারান্দায়। সেখানে দুনিয়ার সব অন্ধকার এসে জড় হয়েছে যেন। রুটি গড়া শেষ হলে বাশিরা তার ভাঙা লন্ঠনটা ধরায় উনুন থেকে আগুন নিয়ে। কিন্তু সেই লন্ঠনের আলোর তার বারান্দায় জড় হওয়া অন্ধকার তাড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। বহু পুরনো লন্ঠন। ভাঙা কাচ। কাগজের তাপ্পি মারা। তবু সেটা বারান্দায় জ্বালিয়ে রাখে। আর সে এসে দাঁড়ায় তার ভাঙা দরজার সামনে। দাঁড়ায় মেয়ে জারিনার অপেক্ষায়।

বাশিরার ওই ভাঙা দরজা ঘেঁষেই গ্রামের বড় রাস্তা। রাস্তায় তখন লোকজন চলাচল করছে। তাদেরই কেউ একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, বাশিরাভাবী নাকি? দুয়ারে একলা দাঁড়ান কী করছো?

বাশিরা চিনতে পারল লোকটাকে। পড়শি সাজ্জাদ ভাই। কাসিমের ঘাটের এক নম্বর

লোক। এখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘাটেই যাচ্ছে বোধহয়।

বাশিরা জবাব দিল, বিটিটোর লেগি দাঁড়ান আছি ভাই। ছুঁড়ি আখুনো মাঠ থেকে ফিরে নি।

—মাঠ থেকি ফিরে নি। সাজ্জাদ চমকে উঠে বলল, এতক্ষুণ মাঠে কী করছে উ?

— কে জানে কী করছে। বলতে গিয়ে বাশিরার ছাতি টনটন করে উঠল। তার কান্না পেল। কিন্তু কাঁদতে পারল না। ততক্ষণে সাজ্জাদ এগিয়ে এসেছে তার কাছে। সাজ্জাদ বলছে, এতক্ষুণ চরের মাঠে কেউ থাকে নাকি। দাঁড়াও ভানী হামি দেখছি।

সাজ্জাদ চলে যায়। বাশিরা দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষায়। আকাশের সব তারা, ওই এক চিলতে চাঁদ—সকলেই তার সঙ্গে অপেক্ষা করে।

দুই

চরের মাঠে গরু-ছাগল চরাতে গেলে পুলপাড়ে ওপি ডিউটিরত বি এস এফের কাছে নাম লিখিয়ে যেতে হয়। আবার ফিরে এসে নাম কাটাতে হয়। সাজ্জাদ জারিনার খোঁজে প্রথম পুলপাড়ে যায়। কিন্তু তখন সেখানে 'ওপি' ডিউটিরত বি এস এফ নেই, আছে 'নাগা'। কারণ তখন রাত্রিকাকল। ওপি তো দিনের বেলায়। নাম লেখা ও নাম কাটানোর দায়িত্ব ওই ওপি ডিউটিরত বি এস এফের। অগত্যা সাজ্জাদকে যেতে হয় ক্যাম্পে। জারিনার জন্যে তারও মন খারাপ। বিয়ের এগারো বছর পরেও নিজের বালবাচ্চা হয়নি। তাই আফজল ভাই ও বাশিরা ভানীর মেয়ে জারিনাকে সে ও তার বউ নিজের মেয়ে মনে করে। জারিনা সময় অসময়ে তাদের আঙিনায় যায়। তার বউ ফুলবানু জারিনাকে খুব ভালোবাসে।

ক্যাম্পে পৌঁছে আরও তাজ্জব হয় সাজ্জাদ। চরের মাঠে আজ সারাদিন যাতায়াত করেছে এমন লোকজনের নামের লিস্ট দেখে সে। সবার নাম দেখতে পায়। এমনকী—মাঝপাড়ার সুখী ফকির, সে চরের ওপারে বর্ডার ছাড়িয়ে ভিনদেশি গ্রামে ভিক্ষা করতে যায়, সে-ও ভিক্ষা করে ফিরে এসেছে। তার নাম কাটা আছে লিস্টে। আর কিনা জারিনার নাম নেই!

ক্যাম্পে আর দাঁড়ায় না সাজ্জাদ। বেরিয়ে আসে। ভাবে, এখন, সে কোথায় যাবে তাহলে? আর কোথায় জারিনার খোঁজ করবে? ভাবতে ভাবতে সে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে।

হাঁটতে হাঁটতে সাজ্জাদ একসময় দেখতে পায় সামনের দিক থেকে একটা মোটর সাইকেল ছুটে আসছে। আর তার মনে হয়, কার না কার মোটর সাইকেল। এখন তো দেশে ঘরে মোটর সাইকেলের ছড়াছড়ি। যেই-সেই মোটর সাইকেল চড়ছে এখন। চড়েছে, চড়ুক গে। তার কী? কিন্তু মোটর সাইকেলটা যখন তার পাশেই এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল, সে চমকে উঠল।

—এ্যই যে সাজ্জাদভাই, তুমাকেই খুড়ে বেড়াইছি এতক্ষণ। কুন্ঠে ছিলা তুমি? তুমার লেগেঁ ঘাটে গরুল লাইন বন্ধ আছে। জলদি চলো। কাসেম ভাই ডাকছে।

সাজ্জাদ লোকটির মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু চিনতে পারল কণ্ঠ শুনেই। ৯ নম্বর কমিশন পার্টির সেনা। সেনার আজ ৩০০ গরু আছে। সকালেই কাসিমের মুখে শুনেছিল সে কথা, এতক্ষণে সেনাকে দেখে মনে পড়ল।

অগত্যা সাজ্জাদকে বলতে হল, তুই ঘাটে চল সেনা—হামি আসছি।

সেনা বলল, আসছি লয়—হামার সঙ্গে এসো। উঠে বোসো হামার মোটর সাইকেলে। সাজ্জাদ আর কী করে। সেনার মোটরসাইকেলে উঠে বসল। আর সেনা তার মোটর সাইকেলটাকে ফুল পিক্‌আপে ঘাটের দিকে ছোটাতে শুরু করল।

তিন

ঘাটে সারাদিনে জমা হওয়া সব গরু নিকেশ করার পর সেনা-আসু-কাসেম-সাজ্জাদ—আরও কয়েকজন মদের বোতল খুলে বসেছিল বড় রাস্তার নীচে উজির বিশ্বাসের ডাঙা জমিটায়। পাশেই একটা বাঁশঝাড়। যেটার মাথার ওপর তখন চাঁদটা কাত মেরে উঠছে। আর তার তেরছা জ্যোৎস্নায় একটু একটু করে ঘোর লাগছে সবার। এখনও বর্ডারে গরু পৌঁছাতে যাওয়া রাখালের দল ঘাটে ফেরেনি। তাদের ফিরতে সময় লাগবে। বর্ডার তো আর কাছে-ভিতে নেই। যেতে আসতে পাক্কা দু'ঘণ্টা লাগে। আর সঙ্গে গরু থাকলে তো কথাই নেই। গরুকে ডানে যেতে বললে বাঁয়ে যাবে। বাঁয়ে বললে ডানে যাবে। কখন ধানের জমিতে মুখ দেবে। কখন পাটের খেতে। গরু পার করার জ্বালা কম নাকি। অথচ এদের কোনও জ্বালা নেই এখন। মদের নেশায় সব জ্বালার অবসান। সব দুঃশ্চিন্তারও অবসান। এখন খালি খোশ-মেজাজে গল্প—যতক্ষণ না বর্ডারে গরু পৌঁছে দিয়ে রাখালের দল ফিরে আসে।

তাই কি?

সাজ্জাদ ভাবল। আফজল ভায়ের বিটি জারিনা চরের মাঠ থেকে ছাগল চরিয়ে ফেরেনি আজ। আফজল ভাইয়ের বউ বাশিরাভানী নিজের ভাঙা দুয়ারে বিটির ইন্তেজার করছে। আফজল ভাই যে বাড়িতে নেই, সেটা তো সে দেখেই এসেছে। নিশ্চয় তাহলে আফজল ভাই ওই আবেদা মাগির কাছে গিয়ে পড়ে আছে। আবেদার কী যে আছে—কে জানে। গাঁয়ের কত ঘর যে ভাঙলে মাগি। তাও কি কেউ বুঝছে? ঠিক গিয়ে পড়ছে মাগির মোহে, ঘর-পরিবারের কথা ভুলে। আর যত দুর্ভাবনা হয়েছে তার নিজের। সাজ্জাদ আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আচমকা। অন্যেরা ভাবল, সাজ্জাদ পেচ্ছাব করতে উঠল বোধহল। কিন্তু না, সাজ্জাদ পেচ্ছাব করে না, সে সোজা গিয়ে ওঠে বড় রাস্তায়। আসু পিছু ডাকে তার, সাজ্জাদ কুণ্ঠে রে? ও সাজ্জাদ—।

সাজ্জাদ কোনও উত্তর করে না। তার মাথায় জারিনার ভাবনা। চরের মাঠে যারা গরু ছাগল চরাতে যায়, তাদের কাছে জারিনার খোঁজ নেবার কথা ভাবে সে। যেমন আজ গেছিল যারা। লিস্টে যাদের নাম ছিল—কুদ্দুস, পিতা—এজাজুল , পিছমপাড়া, গরু ৫ঠো বকরি ৭ঠো / রাব্বুল, পিতা—তাহাসাম, গরু, ৩ঠো, বকরি ৫ঠো।

এজাজুলের বেটা কুদ্দুসের কাছেই যাওয়ার কথা ভাবে সাজ্জাদ। কিন্তু এতক্ষণ কি কুদ্দুস আর জেগে আছে? একথাও মনে হয় তার। তবু হাঁটতে হাঁটতে এজাজুলের দুয়ারে গিয়ে হাজির হয় সে। সেখান থেকে ডাক দেয়, এজাজুল ভাই—ও এজাজুল ভাই। কিন্তু কোনও সাড়া পায় না। তবু আবার ডাক দেয়।

শেষ পর্যন্ত তার ডাক শুনে দরজায় পাটকাঠির ঝাঁপি তুলে এজাজুল বেরিয়ে এল।

—কী ভাই, সাজ্জাদ নাকি? কী হইল? কী বুলছো?
—তুমার বেটা বাড়িতে আছে?
—কুন বেটা?
—কুদ্দুস।
—আছে। ঘুমাইছে। কেনে—কী দরকার তার সাথে?
—একটু তোলো তো অকে, একটা ব্যাপার জানতুম।
—কী ব্যাপার?
—অকে আগে তোলো তো, তারপর বুলছি।

এজাজুল কুদ্দুসকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে এল। কুদ্দুসের ঘুম ঘুম ভাব এমনই যে এজাজুল তাকে ধরে না থাকলে এখুনি সে এলিয়ে পড়বে।

—কুদ্দুস, চরের মাঠে কুন দিকে আইজ তোরা গরু-ছাগল চরাছিলি? সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল। কুদ্দুস কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। মাথাটা হেলে হেলে পড়ছে। যা দেখে সাজ্জাদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দু'হাতে তার মাথাটা সোজা করে ধরে আবার জিজ্ঞেস করল, কুদ্দুস বুল বাপ, কুন দিকে তোরা আইজ গরু-ছাগল চরাছিলি? তোর সাথে আর কে কে ছিল?

সাজ্জাদের হাতের ছোঁয়ায় কুদ্দুসের ঘুমের ঘোর কাটল যেন। বলল, দক্ষিণের দিকে ছিনু হামরা। হামি-রাব্বুল-লতিব-মানুয়ারা।

—আর জারিনা কুঠে ছিল?
—কে জানে কুঠে ছিল। অকে আইজ দেখিইনি।

সাজ্জাদ 'থ' বনে যায়। জারিনার তাহলে কী হল? কোথায় গেল? বাশিরাভাবী যে নিজের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করছে। তাহলে আর কোথায় খোঁজ করবে তার? ভাবতে ভাবতে সাজ্জাদ ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

চার

বাশিরা নিজের ভাঙা দরজায় দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তমনে অপেক্ষা করছিল। সাজ্জাদভাই যখন জারিনার খোঁজে গেছে, তার দুঃশ্চিন্তা কী। এই এল বলে। আকাশের এক চিলতে চাঁদটা—যে তার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল, সে স্থান পরিবর্তন করেছে। বাশিরা কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওই একই জায়গায়। ভাবছে, সাজ্জাদভাই জারিনাকে খুঁজে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়। খেলার ঝোঁকে বোধহয় ছুঁড়ি বাড়ির কথা ভুলে আছে।

নিষ্পলক চোখে নির্জন রাস্তা দেখতে দেখতে এমনি সব ভাবছিল বাশিরা। একসময় হঠাৎ সে দেখল নির্জন রাস্তায় জারিনাকে একা হেঁটে আসতে। জারিনার সঙ্গে ছাগলের পাল নেই। সাজ্জাদ ভাইও নেই। তাহলে এতরাত্রে অমন ধীর পায় জারিনা কোথা থেকে আসছে? ফসল খাওয়ার অপরাধে জাগালদার সব ছাগলকে ধরে নিয়ে গিয়ে খোয়াড়ে দিয়েছে বলেই কি ভয়ে এতক্ষণ বাড়ি আসেনি? কোথাও লুকিয়ে ছিল? মারের ভয়ে?

এমন ভাবনায় বাশিরা উচ্চারণ করে, হায়রে ক্ষেপীবিটি হামরি। তোর লেইগ্যা তো হামি

সেই কখুন থেইক্যা দুয়ারে দাঁড়ান আছি। জাগালদার সব বকরি খুয়াড়ে দিয়াছে তো দিয়াছে, হামি ছাড়িয়ে আনবো। তোর ভয় কী? সে বুলে হামার ভয়ে তু এতক্ষুণ লুকিয়ে থাকবি? হামার জান জী বাহির হুন যেছিল মা। আয় মা, জলদি আয়, ছুটে আয়। বলতে বলতে বাশিরা দু'হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়ে জারিনাকে বুকে পেতে। কিন্তু আশ্চর্য জারিনার পা ওঠে না। যেন একই জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সারা শরীর বেয়ে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে রাস্তার ধূলায়। বাশিরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিছু শুনতে পাচ্ছে কি? হ্যাঁ—ওই তো, জারিনা 'মা-গে-মা' বলে ডাকছে তাকে। নাকি কাঁদছে? বাশিরা আর দেরি করে না, ছুটে যায় জারিনার কাছে।—কী হইল মা তোর, বুল-মা, কী হইল তোর? তু কাঁদছিল কেনে? জারিনা কোনও উত্তর করতে পারে না, মায়ের বুকে আছড়ে পড়ে, যন্ত্রণায় গোঙায়।

—কী হইল মা তোর, বুল-মা হামাকে, তু এমুন করছিস কেনে? কতি ছিলি এতক্ষণ? বলতে বলতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বাশিরা। আর সে বুঝতে পারে মেয়ের শরীরের ফ্রকটার পরিণতি। ফ্রকের নীচে পরনের ইজেরটাও নেই। বদলে আছে অন্য কিছু—তরল, চ্যাটচেটে—যা চুঁইয়ে নামছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে তার পরণের শাড়ি-কাপড়।

বাশিরা চিৎকার করে উঠল, কে করলে তোর এমুন অবস্থা মা? বুল কে করলে? হায়রে আল্লা—এ কী হইল হামার? এ হামি কী করনু?

ওই সময় সাজ্জাদ সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাড়ি ফিরছিল। আসলে কোথাও জারিনার খোঁজ না পেয়ে সে ভেবেছিল, জারিনা এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে। সকালে ঠিক শুনতে পাবে তার বাড়ি ফিরে আসার খবর। অযথা রাত্রিবেলা আর বাশিরাভানীকে হাঁকাডাকা করবে না।

কিন্তু ডহরের ওপর এ কী দেখছে সে? কী শুনছে? তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল। তার হাতে একটা তিন ব্যাটারির টর্চ আছে। সেটা জ্বালিয়ে দেখবার প্রয়োজন হল না, তার আগেই যা বোঝার বুঝতে পারল সে।

পাঁচ

মাঠের রাস্তা ধরে সাজ্জাদ একা ঘাড়ে করে জারিনাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌছাল যখন, তার তার আগেই সেখানে থানার পুলিশ পৌঁছে গেছিল। হাঁক-ডাক করে ৯ নম্বর কমিশনের সেনাকে থানায় পাঠিয়েছিল সাজ্জাদ নিজেই। আর তার সঙ্গ ধরেছিল বাশিরা, পাড়া-পড়শি আরও কয়েকজন। তারাও এসে পৌঁছাল হাসপাতালে।

চিকিৎসা শুরুর আগে পুলিশ জবানবন্দি নেয় জারিনার। জারিনার কথা বলার শক্তি তখন কম। তবু সে যা বলে, পুলিশ তা ডায়েরিতে নোট করে নেয়। যেমন : জারিনা চরের মাঠে ছাগল চরাতে যাচ্ছিল। রাস্তায় দু'জন বি এস এফ তার পথ আগলায়। পাশ্বর্বর্তী পাটের খেতে যেতে বলে। জারিনা রাজি হয় না। তখন বি এস এফ দু'জন জোর করে তাকে পাটের খেতে নিয়ে যায়। তারপর অত্যাচার করে।

ডায়েরি লেখা হলে পুলিশ জারিনার মা বাশিরার টিপসই নেয়, সাজ্জাদেরও সই নেয় সাক্ষীস্বরূপ। তারপর হাসপাতল কম্পাউন্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পুলিশের পিছু পিছু

সাজ্জাদও বেরিয়ে এল। বড়বাবু তার পরিচিত। বড়বাবুকে ঘাটের হপ্তা দিতে তো তাকেই যেতে হয়। সেই সুবাদে বড়বাবুর কাছে, জারিনার কেসটার শেষতক্ কী হতে পারে, তা যদি জানতে পারে।

হাসপাতাল কম্পাউন্ডের বাইরে বেরিয়ে বড়বাবু প্রথমে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, সাজ্জাদ—মেয়েটি তোর কে হয় রে?

—কেহ হয় না সার, পড়শি।

—দেখে তো মনে হচ্ছে বাঁচবে না। তা তুই আবার এই ঝঞ্ঝাটে জড়াতে গেলি কেন? বি এস এফের বিরুদ্ধে গেলে তোদের যে ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তোরা খাবি কী? বড়বাবু যুক্তির কথা বলেছে। তবু তার কথায় সাজ্জাদের মাথা গরম হয়ে উঠল। অন্য কেউ হলে দু-চার কথা শুনিয়ে দিত এতক্ষণ। কিন্তু বড়বাবু বলে কথা। অগত্যা সাজ্জাদ চুপ করে রইল। আর বড়বাবু তাকে বলল, দেখ কী হয়। তবে আমার মনে হয় বি এস এফের বিরুদ্ধে তোদের না যাওয়াই ভালো। যখন তোদের কারবার ঘাট নিয়ে। তাছাড়া কোম্পানি কমান্ডার থানায় এসেছিল। যা হোক কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে যদি সমঝোতা হয়। আমি কিছু বলিনি। তুই মেয়ের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে আমাকে পরে জানাস।

রাত কটা বাজে কে জানে। হয়তো ভোর হয়ে আসছে। আকাশে সেই একচিলতে চাঁদটা পশ্চিমদিকে কাত মেরেছে। এখন সেটা সাজ্জাদের দৃষ্টির বাইরে। বোধহয় হাসপাতাল বিল্ডিং-এর আড়ালে দিগন্ত ছুঁয়েছে। আর অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘন হচ্ছে। যা দেখে সাজ্জাদ ভাবছে, এই অন্ধকার আর বুঝি কাটবে না। অনন্তকাল ধরে এই অন্ধকার ঘন ঘন হতে হতে গোটা দুনিয়াটাকে দুমড়ে-মুচড়ে গিলে খাবে।

ছয়

শেষ পর্যন্ত জারিনার মৃত্যু হল।

তার অবস্থার অবনতি দেখে সদর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে ডাক্তারদের জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই তার মৃত্যু হল। একচিলতে চাঁদটা তখন আর আকাশে নেই। দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। দুঃখে না লজ্জায়—কে জানে। বাশিরার একবার ডুকরে কেঁদে ওঠা ছাড়া আর কোনও শব্দই হল না পৃথিবীতে। ওই সময় বাশিরার মরদ এসে দাঁড়াল বাশিরার পাশে। বিবির শরীরে হাত ছুঁইয়ে সে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইল। কিন্তু বাশিরার সেটা সহ্য হল না। চিৎকার করে উঠল, তুমি হামাকে ছুঁবা না। তুমি হামাকে তালাক দিবা কী—হামি তুমাকে তালাক দিচ্ছি—এক তালাক-দু'তালাক-তিন তালাক। যাও তুমি তুমার ওই আবেদা মাগির কাছে। তুমাকে আর হামার দরকার নাই।

একটা বিচ্ছেদের সান্ত্বনা খুঁজতে বোধহয় আরেকটা বিচ্ছেদ। যারা আশে-পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এমন অনুমান করল। এবং সেটা যে মিথ্যা নয়, তা বাশিরা নিজেও বুঝতে পারল। না হলে এখন তার নিজেকে এত হালকা লাগবে কেন? সেই সন্ধ্যা থেকে একটা অদ্ভুত ভার চেপে বসেছিল তার বুকের ওপর। তা থেকে হঠাৎই মুক্তি পেল যেন। মেয়ে জারিনার লাশ ছেড়ে সে পায়ে পায়ে হাসপাতাল কম্পাউন্ডের বাইরে এল। বাইরে তখন প্রাণ ঠাণ্ডা

করা বাতাস বইছে। আকাশে ভারমুক্ত মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোদিকে বৃষ্টিপাত ঝরিয়ে এল বোধহয়। বাশিরা কোনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সব অনুভব করছে। এখন তার ভালো লাগার কথা। কিন্তু ভালো লাগছে না। তার শরীরে, শাড়ি-কাপড়ে মেয়ে জারিনার রক্তের ছোঁয়া আছে বলেই কি? বাশিরা ভাবছে।

সাত

মৃত্যুর পর লাশ চারঘণ্টা হাসপাতালেই থাকবে—এটাই নিয়ম। তারপর ময়নাতদন্তের জন্য যাবে। যেটা আবার সদরে। ততক্ষণ কী করবে বাশিরা? বাশিরার মরদ আফজল তাই সাজ্জাদকে ডেকে বলল, সাজ্জাদ তোর ভানীকে নি তু বাড়ি চলে যা। এদিকটা হামি দেখছি। যা করবার করছি।

আফজলের কথা শুনে সাজ্জাদ বাশিরাকে গিয়ে বলল, বাড়ি চলো ভানী।

বাশিরা কোনও প্রশ্ন করল না, যন্ত্রচালিতের মতো সাজ্জাদকে অনুসরণ করে গ্রামের পথ ধরল।

কিন্তু গ্রামে ঢুকে নিজের বাড়ির কাছাকাছি তালপুকুরটার পাড়ে এসে বাশিরা বলল, সাজ্জাদ ভাই—তুমি চলো, হামি আসছি।

সে কথা শুনে সাজ্জাদ থমকে দাঁড়াল। একটুখানি কিছু ভাবল বোধহয়। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। আর বাশিরা অন্ধকারে ওই তালপুকুরে নেমে পড়ল।

এর কিছুক্ষণের মধ্যে সাজ্জাদের বউ ফুলবানু এসে দাঁড়াল পুকুরপাড়ে। কিন্তু বাশিরাকে সে দেখতে পেল না। মনে মনে ভাবল, মরদ যে তাকে বললে—বাশিরাভানী তালপুকুরের পাড়ে আছে। কই তাহলে? বিটির শোকে কিছু করে বসল না তো! হাতে ধরা মরদের টর্চটা জ্বেলে আতি-পাতি করে বাশিরাকে খুঁজে পেতে চাইল সে। টর্চটার ফোকাশের সঙ্গে তার কণ্ঠও এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল, বাশিরাভানী—ও—বাশিরাভানী! কিন্তু না, বাশিরাভানীর কোনও সাড়া পেল না।

একসময় তালপুকুরের পানি আন্দোলনের শব্দ শুনল সে। আর সেটা লক্ষ্য করে টর্চের ফোকাশ ফেলতেই সে দেখল, উদোম শরীরে বাশিরাভানী এককোমর পানিতে দাঁড়িয়ে দু'হাতের তালুতে পানি তুলে অবিরাম নিজের চোখে-মুখে ঝাপটা মারছে। চকিতেই টর্চ বন্ধ করে দিল সে। কে জানে কোন আড়ল থেকে কেউ দেখছে কিনা! দুনিয়ায় তো পাপ চোখের অভাব নেই।

এমন ভাবনা থেকেই বোধহয় ফুলবানু আস্তে আস্তে ডাক দিল, ভানী ও ভানী, উঠে এসো। বাশিরা উঠে এল। একেবারে নগ্ন হয়ে উঠে এল সে। পরনের সব শাড়ি-কাপড় ইচ্ছে করেই সে পুকুরে ফেলে উঠে এল। এভাবেই হয়তো অতীতটার সঙ্গ ছাড়তে চাইল সে।

যদিও তখন চারিদিকে ঘন অন্ধকার, তাও অস্বস্তি হয় ফুলবানুর। অস্বস্তি হয় বাশিরাভানীর জন্য। তবে বাশিরার কোনও বিকার নেই। পুকুর থেকে উঠেই সে ডহর ধরে সোজা নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। ফুলবানু তার সঙ্গ ধরল তার নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে

বাশিরাভানীর নগ্ন শরীর আড়াল করবার চেষ্টা করল।

ওভাবেই বাশিরার সঙ্গে ফুলবানুও এসে ঢুকল বাশিরার আঙিনায়। সেই ভাঙা লণ্ঠনটা তখনও বারান্দায় জ্বলছে। সেটির পাশে পাড়া-পড়শি কয়েকজন বসে আছে। তারা বাশিরাকে দেখে ওই ভাঙা লণ্ঠনের আলোয়। তবে তাজ্জব হয় না। ভাবে, বিটি জারিনার শোকেই বুঝি এমন অবস্থা হয়েছে বাশিরার।

আট

সারাদিনমানে কত লোক এল বাশিরার আঙিনায়, তার ইয়ত্তা নেই। তারা কেউ জারিনার জন্যে আফশোস করল। কেউ হা-হুতাশ করল দেশ-দুনিয়ার গতি প্রকৃতি নিয়ে। কেউ বা বি এস এফের ওপর আক্রোশ দেখাল। কিন্তু বাশিরার কোনওরকম ভাবান্তর হল না তাতে। সে তার ঘরের দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে যেমন বসে তেমনি বসে রইল, একভাবে।

বিকেলবেলা ময়নাতদন্ত সেরে জারিনার লাশ নিয়ে ফিরল আফজল-সেনা—আরও কয়েকজন। সবাই উঠে গেল সেই লাশ দেখতে। দেখলও। খালি বাশিরা উঠল না। দেখলও না।

জারিনার লাশের গোসুল করানো হল তাড়াতাড়ি। মরেছে সেই ভোররাতে। আর এখন বিকেল। লাশ পচন ধরতে কতক্ষণ। কাটা ছেঁড়া করা লাশ। তার ওপর ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরম। তাই তাড়াতাড়ি দাফন করা দরকার। কিন্তু তার আগে বাশিরা একবার শেষবারের মতো মেয়েকে দেখুক—এমন ইচ্ছা সকলের। দেখে যদি বাশিরা একটু কাঁদে। কেঁদে হালকা হয়। কিন্তু না, বাশিরার বোধহয় তেমন কোনও ইচ্ছা নেই। না হলে এত হাঁকা-ডাকার পরও সে উঠে আসছে না কেন?

অগত্যা পুরুষের দল জারিনার লাশ নিয়ে গোরস্থানে চলে গেল। মেয়েদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। অনেকের চোখের পানি ঝরল। কিন্তু বাশিরার কোনও কিছুই হল না। সে যেমন- কার তেমন বসে রইল চৌকাঠে হেলান দিয়ে।

নয়

সেদিন সন্ধ্যার পর বাশিরার আঙিনায় অনেক গণ্যমান্য মানুষের আগমন ঘটল। থানার বড়বাবু, বি এস এফের কোম্পানি কমান্ডার, গ্রামের মোড়ল মাতব্বররা, ঘাটপার্টির অনেকেই, সাজ্জাদ সুদ্ধ। আর বাশিরার মরদ আফজল।

সাজ্জাদ অবশ্য সন্ধার আগে একবার এসে বাশিরাকে বলে গেছিল, ভানী মুনে হচ্ছে সাঁঝেরবেলায় সবাই আসবে তুমার কাছে। তুমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে কেস তুলে লিতে বুলবে। খবরদার তুমি কেস তুলবে না। শালারা সব পেয়াছে কী? যা ইচ্ছে তাই করবে, আর পার পেয়ে যাবে।

কোনও মন্তব্য করেনি বাশিরা। সাজ্জাদও চলে গেছিল।

অথচ এখন বাশিরার মন্তব্যের অপেক্ষা করছে সবাই। এমন কী তার মরদ আফজল পর্যন্ত। বাশিরা কিছু বলছে না। নিশ্চুপ বসে আছে সে।

বড়বাবু বলল, ফালতু ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে গিয়ে লাভ কী। যেটা হবার সেটা হয়ে গেছে।

মেয়ে তো আর ফিরে আসবে না। তাছাড়া ওদের নিজস্ব আইন আছে। সেই আইনে অপরাধীর বিচার হবে। বিচার আর কী—দু-চার-ছ মাস সাসপেন্ড। কী লাভ হবে তাতে? বরং আমি বলছি, কমান্ডার সাহেব ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছেন, সেটা নিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখাটাই ভালো। কী বলো আফজল?

আফজল জারিনার বাপ। আফজল এ-ব্যাপারে কী বলবে? তবু বললে, সে হামি কিছু বলতে পারব না সার। বিটির মা যা ভালো বুঝবে, করবে।

বাশিরা কী বুঝেছে—কে জানে। কিছু বলছে না। শুধু শুনছে।

শেষ পর্যন্ত কাসেম উঠে গেল তার কাছে। চোরাকারবারের ঘাটের মালিক কাসেম। বলল, ভানী—হামার কথা অন্তত শুনো। কম্পানি কমান্ডার যা দিচ্ছে-দিচ্ছে, ঘাটের তরফ থেকে হামরাও একলাখ দিচ্ছি তুমাকে। খালি তুমি কথা মুতোন চলো। না হলে বুঝতেই পারছো ই গাঁয়ের ভাত-ভিক্ষা সব বন্ধ হয়ে যাবে! বাল-বাচ্চা সব না খেয়ে মরবে।

—ঠিক আছে, তুমরা সব যাও। হামার কুনো অভিযোগ নাই! আচমকা বলে উঠল বাশিরা। আর তার কথায় সবাই খুশি হল। শুধু খুশি হতে পারল না সাজ্জাদ। ঘোর আপত্তি ছিল তার। কিন্তু বাশিরাভানী তার সে আপত্তি শুনল কই? রাগে-দুঃখে সাজ্জাদ আর সেখানে দাঁড়াল না, উঠে চলে গেল।

দশ

তারপর ছ'মাস কেটে গেছে। জারিনার কথা আর মনে নেই কারও। এর মধ্যে বাশিরার বাড়িটাও পাকা হয়েছে। বাড়িতে আর ভাঙা লন্ঠনটা জ্বলে না, বদলে বিজলি বাতি জ্বলে। তার বাড়িতে আর অন্ধকার জড় হওয়ার সাহস পায় না। তার ঘরে এখন টিভি-ফ্রিজ। মরদ আফজলও এখন তার কাছে ভিড়বার সাহস পায় না।

বাশিরা আগে বিড়ি বাঁধত। এখন একটা টেলিফোন বুথ চালাচ্ছে। বাড়ি-লাগোয়া সেই বুথ। ক্যাম্পের বি এস এফের ভিড় সেখানে অষ্টপ্রহর। বাশিরার খরিদ্দার তারা। অবশ্য লোকে বলে, কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে বাশিরার সম্পর্ক হয়েছে। লোক যা বলে তা মিথ্যা হয় কী করে?

সেদিন রাত ৯টা সোয়া ৯টা বাজে তখন, বুথ বন্ধ করে বাশিরা ঘরে গিয়ে ঢুকছে—এমন সময় কোম্পানী কমান্ডার এল।

—কেয়সা হ্যাঁয় রে বাশিরা? তবিয়ত কেয়সা হ্যাঁয় তেরা?

—বহুত আচ্ছা, সাহেব। আপ কেয়সা হ্যাঁয়? বৈঠিয়ে।

—হ্যাঁ, বৈঠনে কে লিয়ে তো আয়া।

—ঠান্ডা পিয়েঙ্গে আপ? জিজ্ঞাসা করে জবাবের অপেক্ষা করে না বাশিরা, ফ্রিজ খুলে বিয়ারের বোতল বের করে। টিভিটা অন করে দেয়।

ততক্ষণ কমান্ডার সাহেব বাশিরার ঘরের ফোনে নম্বর টিপতে শুরু করেছে। এ কাজটা এসেই প্রথমে করে সে। নিজের বাড়ির নম্বর। এই অল্পদিনের সম্পর্কে বাশিরা জেনেছে, সাহেবের বাড়ি দিল্লিতে। সাহেবের বউ আছে। আর আছে বিটিয়া, বয়স যার ৮ বছর।

কি জানি সে জন্যেই হয়তো সাহেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক। যাইহোক, সাহেব কিন্তু প্রতিদিন তার ঘরের ফোন থেকে বউ বিটিয়ার সঙ্গে কথা বলে। খোঁজ-খবর নেয়। হাল হকিকৎ পুছ করে।

টিভির সাউন্ড কম করে দিল বাশিরা। যাতে বউ-বিটিয়ার সঙ্গে কথা বলতে সাহেবের কোনও অসুবিধা না হয়। তারপর সাহেবের জন্যে গেলাসে বিয়ার ঢালে। আর বিয়ার ঢালতে ঢালতে সে শুনতে পেল সাহেবের আতঙ্কভরা কণ্ঠ—কেয়া হুয়া, অমিতা অভি তক্ স্কুল সে নেহী আয়া, কেয়া উনকো উগ্রপন্থী লোক উঠাকে লে গেয়া? কেয়া? ফোন আয়া থা—কিসকা ফোন? কেয়া? অমিতাকে রেহাইকে লিয়ে লোগ রুপায়া মাঙতে হ্যাঁয়?.....

সাহেবের হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ল। সাহেব নিজেও কেমন হয়ে গেল যেন। ধপাস করে বসে পড়ল পাশের সোফাটার ওপর। যা দেখে বাশিরা তার হাতে ধরা বিয়ার ভরতি গেলাসটা সাহেবকে দেওয়ার বদলে নিজের ওষ্ঠে ছোঁয়াল। শুধু ছোঁয়াল না, এক নিঃশ্বাসে চোঁ চোঁ করে পান করে ফেলল। ওই এক গেলাস নয়, পুরো বোতলটায় শেষ করে ফেলতে শুরু করল। সাহেব এতদিন বলে বলেও এ-কাজটা তাকে দিয়ে করাতে পারেনি। কিন্তু আজ যখন সাহেব কিছু না বলতেই সে এসব করছে, সাহেব তখন অন্য খেয়ালে, অন্য ঘোরে, কিছু ভাবছে বোধহয়। তা দেখে বাশিরার খুব হাসি পেল। এমনই হাসি যে, চেপে রাখতে পারল না। তার হাসি গোটা ঘর, ঘরের বাইরে আকাশ-বাতাসে আলোড়ন তুলে সারা জাহানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বাশিরার হাসিতে পড়শিদের কারও কারও ঘুম ভেঙে যায়। যেমন সাজ্জাদের বউ ফুলবানুর ঘুম ভাঙে। প্রথমে সে চমকে ওঠে। ধাতস্থ হতে সময় নেয় একটু। তারপর বুঝতে পারে যে, বাশিরাভানী হাসছে। কিন্তু এত রাতে বাশিরাভানী হাসছে কেন? কী হল?

ফুলবানু কিছুই বুঝতে পারে না। তাই বোধহয় মরদকে ঘুম থেকে তুলল। জিজ্ঞেস করল, এত রাতে বাশিরাভানী অমন হাসছে কেনে? দেখে এসো তো।

সাজ্জাদ বলল, চুপ কর। ওই নষ্ট মেয়েমানুষের কথা মুখে আনিস না খবরদার। বিটির মরা ছ'মাস হইল কি হইল না, আর দ্যাখ কেমুন নাঙের সথে গুলছড়ি উড়াইছে!

সাজ্জাদের কথা ফুলবানু মানতে পারল না। কেননা, ততক্ষণে বাশিরাভানীর হাসি তার কানে কান্না হয়ে বাজছে। জারিনার মৃত্যুর এতদিন পর বাশিরাভানী আজ কাঁদছে। ফুলবানু ভাবল, বাশিরাভানী জান ভরে কাঁদুক। তার কান্না বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ুক। দুনিয়া জাহান ঠান্ডা হোক। ফুলবানু মনে মনে এই প্রার্থনা করল।

চর

সজল চট্টোপাধ্যায়

মাঝ নদীতে এসে চরে ঠেকে গেল নৌকো, ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মহিম বাঁড়ুজ্যে। রীতি চরিত বোঝা মুস্কিল ভৈরবের। উপরে হুস হুস করে ফুঁসে উঠছে ঢেউ। ঘন কালো জলের মাঝে কোথাও বা ঘাঁটি পেতে আছে ঘূর্ণি—কুটোটি পড়ল তো রক্ষে নেই—সোঁ করে পাতালে নিয়ে হাজির করবে। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের বস্তুটি মালুম করবে এমন উপায় নেই। দূর-দূরান্তর যেন ভৈরবের কালো নাচের রঙ্গমঞ্চ। আর এই দ্যাখো, এখন চরে এসে ঠেকে গেল নৌকো। বসে থাকো হা-পিত্যেশ করে কখন জোয়ার-বান আসে। গাল দিতে গিয়েছিলেন গণি মিঞাকে—কী রকম নেয়ে বাপু, তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে। নদীকে পাতা-পাতা ক'রে চষেছো সারাজীবন অথচ চরের খোঁজ রাখো না! মিথ্যেই বলে লোকে—দক্ষিণে নেয়ে, বারফাট্টাই ষোলো আনা, আসল কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা......।

একলা একলা কাঁহাতক বকা যায় বিশেষত প্রতিপক্ষ যদি নীরব শ্রোতা হয়। গণি মিঞার ভ্রূক্ষেপ নেই। গলুইয়ের ধারে বেটার সঙ্গে নাস্তা নিয়ে বসে গেছে। খিদেতে পেটটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল একবার। সাতসকালে নাকেমুখে গুঁজে বেরিয়েছেন। কখন হজম হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কোথায় এখন ভালোমন্দ পাঁচরকম খাবেন........।

হঠাৎ যেন ভাবনাটা থতমত খেয়ে গেল মহিমের। কথাটা এর আগেও অনেকবার ভেবেছেন। সত্যি কি সেখানে ভালোমন্দ পাঁচটা তার জুটবে? কী সম্পর্ক আর আছে তাদের সঙ্গে? যেতেই যে লজ্জা করে। কী করবেন। মা শুনলেন না কোনো কথা। কর্তব্যের নজির দেখালেন। যতীনের যাওয়াটা কি ভালো দেখায়? তাছাড়া বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঁচটা কথা বলা। অগত্যা রাজি হতেই হল। ছেলের বিয়ে যখন তাকেই দিতে হবে তখন সব দিক তো দেখতে হবে তাকেই। আপনজন যখন তেমন তেমন কেউ নেই, ঝক্কিটাও নিশ্চয় নিজেরই। তাছাড়া' এ সব পুরোনো সমস্যা নিয়ে একেই তো লজ্জায় বাঁচেন না। কী হবে বাইরের লোক পাঠিয়ে, শত্রু হাসিয়ে?

সাত সকালে বার হয়েছেন বাড়ি থেকে। আটটা নাগাদ গাড়ি। মা বলে দিলেন—বেয়ানকে বুঝিয়ে বলিস খোকা। রাগারাগি করিসনে। বলিস শেষ কাজ, দুটো দিনের জন্যেও যদি পাঠান। আর বলব না........

আগেভাগে অনেক গাঁইগুঁই করেছেন মহিম—মিথ্যে মুখ নষ্ট করতে পাঠাচ্ছো মা। সে কি আসারই মানুষ! এত করেও যখন আসেনি.....

মা তবু ছাড়েননি—তা হোক। সাধ আহ্লাদ বলতে তারও তো একটা কিছু থাকতে পারে? আমার অদৃষ্ট। না হলে মিথ্যে বলতে গিসলাম কেন? কষ্ট কি শুধু তার। তোর মুখের দিকেও যে.......

বাধা দিয়েছে মহিম—থাক্ মা সে কথা। বলছো যাচ্ছি। যতীনকে দিয়ে তা হ'লে এদিককার কাজকম্মোগুলো সেরে রেখো। মিথ্যো দু'টো-আড়াইটে দিন নষ্ট হবে।

মা বলছেন—সে হবেখন। রইলাম তো আমি। তুই, কাল নয়—দিনটা ভালো নয়, পরশু সকালেই চলে যা।

আর সেই সাত তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আটকা পড়লেন কিনা মাঝ নদীতে এসে। ঝড় জল নয় যে কপালের দোহাই দেবেন। চর বলে জিনিস—থাকই না তার উপরে জলের স্রোত। এতদিন জলের বুকে কাটিয়ে নদীকে না চিনলে লাগে কেমন?

জোয়ার এল দু'টো নাগাদ। পসরার জল খলখলিয়ে ছুটে এল ভৈরবের বুকে। ছৈ-এর বাইরে বেরিয়ে এলেন মহিম। গণি মিঞার ছেলে লগি মারতে শুরু করেছে। বললেন—লখ্‌পুরের বাজারে পৌঁছোতে লাগবে কতক্ষণ মাঝি? একপর রাতে না আবার ঠেলে উঠতে হয় নতুন জায়গায়......

যতীনের পৈতের সময় কিন্তু ঠেলে উঠেছিলেন একপর রাতে। সেবারও মায়ের তাড়নায় আসা। চরে আটকিয়ে নয়—দেরি করে বেরিয়েছিলেন বলেই দেরি হয়েছিল। লখ্‌পুরে পৌঁছলেন যখন রাত দশটা। দেশ-পাড়াগাঁ। সন্ধে না হতেই নির্জন—আর রাত দশটা তো নিশুতি হবেই। ভাগ্যি-ভালো শাশুড়ি এসেছিলেন গোয়ালে বাছুর বাঁধতে। তাকে দেখে অবাক—ওমা, মহিম যে।

একটা কথা অনেকবার ভেবেছেন মহিম। এ বাড়িতে শাশুড়ির মতো লোক আছেন কেমন করে অথবা তাঁর ছেলেমেয়েরা এমনটি হল কী করে? উত্তর পাননি। সে রাতেও ভেবেছিলেন। কী মনোরমা, কী তাঁর ভাইয়েরা, কেউ উঠে কুটোটি নেড়ে দিয়ে উপকার করেননি। অথচ, অত রাত্রে খাওয়ার জোগাড়যন্ত্র সব একহাতেই করেছিলেন নিজে।

যতীনের পৈতেতে আসেননি মনোরমা। সেবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছেন মহিম। সম্বন্ধীরা বলেছিল—কেন যাবে মনো? কী সম্পর্ক আছে তোমার সাথে? তোমার নামে যে মামলা করিনি, এই যথেষ্ট। বারবার ঘাঁটিয়ো না আমাদের।

মনোরমা দেখাই করেননি। শুধু আসার সময় কেঁদেছিলেন শাশুড়ি—আর এসো না বাবা তুমি। দরকার কি তোমার বার বার হতমান্যি হওয়া। ভুলত্রুটি কি মানুষের হয় না.......

........তবু আবার চলেছেন মহিম। সবাই বারণ করেছে আসতে। তবু, তবু.........

সন্ধ্যে হওয়ার মুখে পৌঁছলেন মহিম। সব ক'টা দরজা বন্ধ দেখে ফিরেই যাচ্ছিলেন। সন্ধে প্রদীপটা পর্যন্ত জ্বালেনি বাড়িতে। গেল কোথায় মানুষগুলো! হাঁ-করে বসে থাকবেন নাকি এই নির্বান্ধব পুরীতে?

খোঁজ নিতে যাচ্ছিলেন পাশের বাড়িতে। আগড়-টা না পেরোতেই মনোরমার সাথে দেখা। কাপড় ভিজে সপ্‌সপে। কাঁথে কলসি, পিঠের পরে ছড়ানো ভিজে চুল। ঘাট থেকে ফিরছিলেন মনোরমা। আর তাঁরই সামনে একেবারে মুখোমুখি এ অবস্থায় পড়ে গেলেন মহিম।

কথা না বলে পারেননি মনোরমা। একেবারে কাঠ হয়ে গেছে মানুষটা। শত্তুর হলেও না কথা বলে পারা যায় না। বাঁ হাতে মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে বলেছেন—তুমি! বাইরে কেন?

তবু ভিতরে আসতে বলেননি তাকে। গাড়ু করে পা-ধোয়ার জল এনে দিয়েছেন, গামছাও তার সঙ্গে। কিন্তু কথাটি নেই মুখে। তারপরে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়েছেন, শাঁখ বাজিয়েছেন—আর সেই দাওয়ার উপরে ঠায় ভূতের মতন বসে রয়েছেন মহিম। শেষমেশ আর জিজ্ঞাসা না করে পারেননি—মা কোথায় গেলেন, দেখছি না যে?

ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেছেন মনোরমা। হঠাৎ যেন খাঁ খাঁ করে উঠেছে মহিমের বুকটা। ধড়াস্ করে উঠেছে একেবারে। উত্তর দেয় না কেন মানুষটা? মুখের কথা, তা বলতেও কি এতকাল পরে হিসেব-নিকেশ ধরে টানে কেউ? পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে গেছেন। পাশে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেছেন—কোথায় মা?

........আর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছেন মনোরমা—মা নেই গো, মা নেই......

খানিকবাদে নিবারণ বেয়ারা আর তার বউ এসেছে শুতে। একলা মেয়েমানুষ। রাতে ভিতে চোর-ছ্যাঁচোড়, বিপদ-আপদ আছে—তাই এ ব্যবস্থা করে গেছে ভাইয়েরা। অনুযোগ করলেন মহিম—একবার খবরটাও তো দিতে পারতে। চোখের দেখাটাও তো দেখে যেতাম অন্তত।

কথা বলেননি মনোরমা। ঘরে আলো জ্বালিয়ে, বিছানা পেতে—রান্নাঘরে ঢুকেছেন গিয়ে। আর একলা ঘরে বসে আবোল-তাবোল, সাত-পাঁচ ভেবেছেন মহিম। কী করতে এসে কী হয়ে গেল! এরপরে আর পাড়েন কী করে কথাটা?

মুখুজ্যেদের তারাপদ হঠাৎ হৈ হৈ করতে করতে এসে উপস্থিত।—কী ব্যাপার জামাই যে। তা হঠাৎ এ দিগরে?

তারাপদকে চিনতেন মহিম। তাঁরই বয়সি, বিয়ের ক'দিন সঙ্গে সাথে ঘুরেছেন। ঠাট্টা-তামাশা করেছেন। ভুলতে পারেননি মহিম হাসিখুশি মানুষটাকে।

তারাপদ ততক্ষণে গল্প শুরু করে দিয়েছেন—ছোটমেয়ের মুখে শুনলাম কে নাকি এসেছে শশী-ভায়ার বাড়ি, তা তুমি যে এসেছো ভাবিওনি। কীরে মনো, মাছ-টাছ আছে নাকি?

মহিম ব্যস্ত হয়ে বলেছেন—মাছ-টাছের দরকার নেই আর। এত রাতে বাজার হাটে পাঠাতে হবে না কাউকে। যা ধকল গেছে সমস্তটা দিন। ভাতে-ভাত খেয়েই শুয়ে পড়ব।

তারাপদ বলছেন—তা বললে কি চলে জামাই। রাঙাদি থাকলে......তা সে যাক্‌গে। বোসো তুমি—আমি এলাম বলে। কই একটা আলো-টালো দে তো মনো।

ঘণ্টাখানেক বাদে দড়াম্ করে এনে ফেলেছেন মস্ত এক মাছ। সারা গা ভিজে সপ্‌সপে। ঘর থেকে উঠে এসেছেন মহিম—ছি, ছি, তুমি কি দুপুর রাতে জলে ডুবলে নাকি, কী বাধালে এসব বলো তো?

তারাপদ শোনেননি কোনো কথা। মাছ কুটে, নুন ছড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—বাড়ি থেকে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসি রে মনো। বসো জামাই আরেকটু।

মনোরমার দিকে তখন চেয়েছেন মহিম। কী আক্কেল মনোরমার? এত করল যে মানুষটা তাকে খেতে বলতে হয় অন্তত একবার। সামান্য ভদ্রতাটুকু না জানলে এ বয়সে কি আর ভালো দেখায়! অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেছেন—ওকে খেতে বলেছো তো মনোরমা?

এবারে হেসে উঠেছেন তারাপদ—মনোকে তুমি লৌকিকতা শেখাচ্ছ জামাই। তা ভালোই

হল, কর্তা-গিন্নির ডাক তো আর একসাথে জোটে নি কখনও। আচ্ছা......

তারপর আবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন মহিম। শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। মনটা যেন হঠাৎ ভালো হ'য়ে গেছে। যেন এতকালের ভাবনার ভারটা হালকা হয়ে গেছে। যেন এতদিনের অপরাধটা সত্যিই মার্জনা হয়ে গেছে।

অপরাধ!.......থমকে গেছেন মহিম। অনেকদিন অনেকবার কথাটা ভেবেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর কোনও দোষ ছিল এ বিয়েতে?

দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে। অনেকবার অমত করেছিলেন মহিম। আগের পক্ষের বড়ো ছেলে আছে। রোগাভোগা ছেলে, একলা বুড়ো মাকে সংসার টানতে হয়। এমনি হলে কথা ছিল। অফিসের জন্য সময়মতো ভাত জোগানো, সময়মতো রুগ্ন ছেলেটার দেখাশোনা করা—অসুবিধেটা বুঝতেন মহিম। ঝি-চাকরের অভাব রাখেননি, তবু মন ওঠেনি মায়ের। গজ্‌গজ্‌ করতেন দিনরাত—লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। কী কপাল করেই এসেছি। বুড়ো বয়সেও সংসার টেনে টেনে মরছি।

প্রথম প্রথম কথাটা কানে নেননি মহিম। সারাদিনের কাজের পর নিত্যি গঞ্জনা অস্থির করে তুলল তাকেও। রাগ করে বলেছিলেন শেষে—তুমি যদি না পারো মা আমি তা হলে মেসে খাওয়ারই বন্দোবস্ত করে নিই।

মা বলেছেন—বেশ, ওই সঙ্গে ছেলেকেও তার মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমায় রেহাই দাও। আমি আর পারছি না।

অগত্যা নতিস্বীকার করতেই হয়েছে। মহিম শুধু একটা কথা বলে দিয়েছেন—দেখো মা, একটা দুগ্ধপোষ্যকে এনে হাজির কোরো না। কাজের মানুষের দরকার সেটা খেয়াল থাকে যেন।

নিজেই হেসেছেন শেষে কথাটা বলে। বয়স্কা ছাড়া দুগ্ধপোষ্যকে দিচ্ছে কে দোজবরের হাতে? সতীনের ছেলেকে নিয়ে ঘর করবে তেমন তেমন মেয়েই বা জুটবে কোথায় একালে! তা সেই ওই পর্যন্তই। আর খবর রাখেননি মহিম। ভাবেননি আর বিয়ে নিয়ে। সব জড়িয়ে একটা লজ্জা আর অপরাধবোধ যেন হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে মনের মধ্যে। ঘরে ফিরে স্বর্ণর ছবির দিকে তাকিয়ে কত কথা ভেবেছেন। মানুষের জীবনটাই বলিহারি! আঘাটার জলেরও বুঝি এর চেয়ে স্থৈর্য আছে। কিন্তু এ যেন তার থেকেও বাড়া। মায়া লাগে, মোহ লাগে কিন্তু গেল গেল ভাবটি থাকে সদাসর্বদা। বিয়ের রাতে সানাইয়ের সুরের মধ্যে পাওয়া ফুলের গন্ধে ভরপুর সেই মেয়েটিকে দেখে ভাবতেও কি পেরেছিলেন তিনি—যে একে বিদায় দিয়ে অন্য কাউকে আবার আনতে হবে ঘরে?

মা ওদিকে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছেন। নিত্যি ঘটকের আনাগোনা। কতদিন নিজেই বলেছেন—যা না খোকা এই মেয়েটিকে একেবার দেখে আসবি।

মহিম হেসেছেন—থাক মা, তোমার পছন্দ হলেই হল। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মা বলেছেন—তা হোক, সারাজীবন ঘর তো তোকেই করতে হবে। আমি আর ক'দিন?

তবু সেই ক'টা দিনের তৃপ্তির জন্যেই আরেকটি দিন হয়ে গেল। মেয়ে বাংলাদেশের। তা হোক, দেশ দিয়ে কী হবে মহিমের। যে না বিয়ে তাতে আবার পছন্দ অপছন্দ। মেয়ের

ভাই শশীকান্ত মুখুজ্যে মামাকে সঙ্গে নিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। বাপ নেই। তা অমন একটা কিছু তো হবেই, নইলে এমন ঘরে মেয়ে দেবে কেন? তবু যেন সন্দেহের কাঁটা একটা থেকে গেছে মনে। সঙ্কোচের সাথে জিজ্ঞাসা করেছেন—আপনারা সব জানেন তো, তুমি সব বলেছো তো মা?

মা হেসে বলেছেন—তুই থাম তো খোকা, আমাকে কর্তব্য-কর্ম শেখাতে আসিসনে।

শশীকান্ত বলেছেন—আমাদেরও চোখ, কান আছে তো? দেখলাম তো তোমাকে। ব্যাস্ কোনও কাজ নেই আর খোঁজখবরে।

বিয়ে হল কলকাতাতেই। সমারোহ করেননি মহিম। করবার ইচ্ছেও হয়নি। সামাজিকতাই বাধ্য করেছে সামান্য আয়োজনটুকু করতে। ফুলশয্যার রাতে তাই সকাল সকাল মিটে গেছে সব কাজকর্ম। মা পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছেন। ছেলেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন মামাবাড়ি। ফাঁকা বাড়ি। আর সেই ফাঁকা বাড়িতে ফুলশয্যার খাটে বসে জীবনের সবচেয়ে বড়ো কলঙ্কের সূত্রপাত দেখলেন মহিম। স্পর্শ পেলেন বাকি জীবনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো রাহুর। বলেছিলেন—মনে কিছু করো না মনো। উৎসবের ঘটা যে তেমন তেমন করে কেন করিনি তা বোধহয় তুমি বুঝতে পারছো। আমার ছেলেটাকে কিন্তু দেখো তুমি........

তোমার ছেলে!.......কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছেন মনোরমা। বিছানার পরে আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে উঠেছেনে কান্নায়, আর স্থানুর মতো বসে সব কথা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন মহিম। তাহলে......

ব্যস, সবশেষ। জীবনে অনেক দুর্ঘটনা দেখেছেন মহিম। ছত্রিশ সালের ঝড় দেখেছেন। নির্মল আকাশের কোণে লুকিয়ে থাকা মেঘ থেকে অকস্মাৎ নৃত্যের উন্মাদ পৃথিবী দেখেছেন। গরুর গাড়ি চলা শুক্‌নো দামোদরে দু'কূল প্লাবন করা বন্যা দেখেছেন। তাতেও তবু স্তর আছে, বিন্যাস আছে। তবু এমনটি আর দেখেননি কখনও।

সারারাত আর একটিও কথা হয়নি মনোরমার সাথে। পরের দিন সাতসকালে নিজেই গাড়ি ডেকে দিয়েছেন। মনোরমাকে রেখে আসবেন কলুটোলার বাড়িতে। মা বাধা দিয়েছেন, উত্তর দেননি তিনি। বচসা করে কী লাভ। শ্বশুরবাড়ির সকলে অবাক—কী ব্যাপার ফুলশয্যের রাত না পোহাতেই যে জোড়ে চলে এল জামাই!

উৎসবের রেশটুকু এ বাড়িতে কাটেনি তখনও। অল্পেই উচ্ছ্বাস সামলানো দায়। তারপরে আবার এই কাণ্ড। সবাই যেন ভেঙে পড়েছে মহিমের চারিদিকে। শশীকে অগত্যা বলতেই হল—মাকে একবার ডাকোতো শশী, তার সঙ্গে ক'টা ব্যক্তিগত কথা আছে।

আর সব মানুষ অনিচ্ছার সঙ্গে সরে গেছে। শাশুড়ি ছুটে এসেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন মহিম—একটা কথা মা, সত্যিই কি আপনারা জানতেন না যে আমার এর আগে বিয়ে হয়েছে? স্ত্রী মারা গেলেও আগের পক্ষের একটা ছেলে আছে?

থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠেছেন শাশুড়ি, বুড়ো মানুষ। চোখের জলের গতিকে ধরে রাখতে পারেননি। অভিনয় করে, তবু কথা সরেনি মুখ দিয়ে। শশীকান্ত লাফিয়ে উঠেছে—জানালে তো জানব। ইতর, ছোটলোক, বেরিয়ে যাও।

মহিম বলেছেন—শোনো শশী, সত্যি বলছি,—আমি জানি না এ সব কথা তোমাদের বলা হয়নি।

ছোটশালা নিশিকান্ত ছুটে এসে বলেছে—নিকালো আভি। ভাবব বোন আমার বিয়ের রাতেই বিধবা হয়েছে, তবু তোমার মতো জোচ্চোরের ঘরে পাঠাব না।

মহিম বলছেন—বিশ্বাস করুন মা, ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতে ছুঁয়ে বলছি......

তবু শোনেনি কেউ তার কথা। আসার সময় বলে এসেছেন—থাকল ও। দিন দুই পরে আসব। যা ভালো বুঝবেন করবেন।

বাড়ি ফিরে এলে মা কেঁদে উঠেছেন—খোকা এ কী করলাম আমি! বিশ্বাস কর এমনটি হবে জানলে......

মহিম বলেছেন—থাক্ মা, দোহাই, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

আর কোনও কথা নয়। তবু বুঝেছেন সব। ভালো মেয়ে দেখে লোভ সামলাতে পারেননি মা। ছেলেকে দেখে তো আর দোজবরে বলে ঠাহর করতে পারবে না কেউ। আর মেয়ের বয়েসও তো নেহাত কম নয়। আদুরে বোনের বিয়ে দেবার চাড় হয়নি ভাইয়েদের। হচ্ছে হবে করে বোনের বয়স বেড়েছে। তারপর মহিমের মতো পাত্রকে হাতছাড়া করবে কে? এমনই একটা ভেবেছিলেন সবাই। সুযোগ দিয়েছেন মহিম নিজেই। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে মায়ের উপর সব ছেড়ে দিয়ে.......

দু'দিন নয় তিন দিন পরেই আবার গিয়েছেন মহিম। মিথ্যে যাওয়া। মা ভায়ের সঙ্গে মনোরমারা দেশে ফিরে গেছেন। হাল ছাড়েননি তবু। অন্যায় নিজেরই। গিয়েছেন সেই খুলনায়। শশীকান্ত রেগেই অস্থির—কেন এসেছো এখানে। বলে দিয়েছি তো কোন সম্পর্ক নেই তোমার সাথে। আমাদের একমুঠো জুটলে বোনেরও অভাব হবে না কোনওদিন। ভদ্রলোকের এক কথা.......

ছেলেদের পরে কথা বলতে পারেননি শাশুড়ি। উগ্র মেজাজ। বেশি কিছু বললে হয়তো হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। তবু তিনি নিজেই বুঝেছেন—কী যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে—যার জন্য জামাই ঠিক দায়ী নয়। না হলে এতো লাঞ্ছনার পরেও আসে কেন? কিন্তু বুঝেই বা কী লাভ। তিনি কী করতে পারেন এ ব্যাপারে? দুঃখ হয়েছে নিজের স্বামীহীন অসহায়তার জন্যে। বলেছেন, কী করব বাবা আমার কথা কেউ যে শোনে না। যেমন ভাইয়েরা তেমনি হয়েছে তাদের বোন.......

নিরাশ হয়ে ফিরেছেন মহিম সেখান থেকে। পথে তারাপদর সঙ্গে দেখা। মহিম বলেছেন—তুমিও আমাকে ভুল বুঝো না তারাপদ। বিশ্বাস করো।

তারাপদ ভুল বোঝেননি। তাহলে আর এতরাত্রে এসে জলে ডুবে মাছ ধরে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করতেন না এতদিন পরে।

তা শুধু সেইবারই নয়। আরও ক'বার গেছেন মহিম। এক প্রস্তাব, এক কথা। শেষবার এসেছেন যতীনের পৈতেতে। সেবারেও নিরাশ। তারপর বছর দশেক আর এ পথ মাড়াননি তিনি। কী হবে শুধু শুধু এসে। শাশুড়িও বারণ করেছেন—কী হবে বাবা এসে? শুধু শুধু

হতমান্যি হয়ে লাভ কি? দোষ ত্রুটি ভগবানেরও হয়, তা আমরা তো মানুষ।

এতসব কিন্তু ভাবেননি মহিম। তবে দুঃখ পেয়েছেন মনে মনে। যার জন্য আসা সে মানুষ কথা বলা তো দূরের কথা সামনে আসেনি একবার। মরুকগে, যার জন্যে এত ভাবনা সে মানুষের যদি হুঁস না থাকে তো কী এমন বয়ে গেল তাঁর! মানুষ তো তিনিও—মান-অভিমান তাঁরও তো থাকতে পারে। যাক্‌গে যাক্‌গে.........

সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে এতদিন পরে হাসি পেল যেন মহিমের। যাক্‌গে!......কিন্তু গেল আর কোথায়? তাহলে এতকাল পরে থেমে যাওয়া নাটক আবার শুরু হল কেমন করে? বিচিত্র মানুষের প্রতিজ্ঞা আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। বিচিত্র তার মান আর মানভঞ্জনের পালা।......

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিম। তারাপদর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসেছেন। তারাপদ ঘরে ঢুকে বসে পড়েছেন বিছানারই এক কোণায়। জামাই যে ঘুমিয়ে-একেবারে কাদা। তা সারাদিন যা ধকল গেছে রাস্তায়। কিন্তু রাত যে অর্ধেক শেষ এদিকে।

অবিশ্যি অর্ধেক রাত সত্যি-সত্যিই হয়নি। মোটে সাড়ে দশটা বাজে। বাড়িতে ফিরতে এর থেকেও বেশি রাত হয়ে যায় বহুদিন। ঘর নেই বাইরে চক্ষুলজ্জার জড়তা থাকলেও দমবন্ধ হয়ে আসে না ঘরের মতো। বারবার মনে হয় না যে সবার অলক্ষে স্বর্ণর তীর্যক হাসি তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই শুধু নয়—গোপন ক্ষতকে খুঁচিয়ে মারছে। তাসের আড্ডায় গিয়ে তাই বসে থাকতেন অনেক রাত অবধি। তা সে কথা যাকগে। তারাপদর কথায় উঠে বসেছেন মহিম। চোখেমুখে জল দিয়ে খেতে বসেছেন দাওয়ায়। সমস্ত উঠোনটা অন্ধকার। লাউয়ের মাচাটা ঝুপসি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভট্টাচায্যি পুকুরের পাড়ের ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়ে চাঁদটা উঁকি মারছে। চারিদিকের এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে থালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন যেন তিনি। করেছে কী মনোরমা! সাত ব্যঞ্জনে সাজিয়ে দিয়েছে যে থালা। খেতে খেতে বারবার ভেবেছেন মহিম। এ আয়োজন সত্যি কি তারই জন্যে! সত্যিই কি এতদিন পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে মনোরমা? অথবা দোষত্রুটি সমেত মহিম মানুষটাকে ভালোবাসতে পেরেছে আর পাঁচটা মেয়ের মতো......

তা ভাবতে কি আর দিয়েছেন তারাপদ! খেতে বসে হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছেন ছেলেমানুষের মতো। এটা দিয়ে যা মনোরমা ওটা আন। আম দু'টো কেটেছিস্‌......

মহিম বারণ করেছেন—এত রাত্রে আবার আম কী হবে তারাপদ?

তা কে শোনে কার কথা। আর শেষ হয়ে এসেছে খাওয়া, এমন সময় জিজ্ঞাসা করেছেন তারাপদ—হঠাৎ তুমি এলে যে জামাই?

কথাটা বলি বলি করেও এতক্ষণ বলতে পারেননি মহিম। সন্ধেবেলার ঘটনা থেকে এ পর্যন্ত কেমন যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দে ডুবে আছেন তিনি। ভাঙতে মোহ লেগেছে এমন পরিবেশ। তবু বলে ফেলেছেন কথাটা—ছেলের বিয়ে তারাপদ—তাই এলাম.......

রান্নাঘরের দরজার মূর্তি যেন পাথর হয়ে গেছে একেবারে। তারাপদও চুপচাপ। ব্যাপার কী? একটা কিছু জবাব দেবে তো না কি? উৎকণ্ঠা নিয়ে কাঁহাতক মানুষ বসে থাকতে পারে? শেষে বলেছেন—একটু বুঝিয়ে বলো ওকে তারাপদ। একটা ত্রুটি নিয়ে.........আর সব থেকে

দুঃখ কী জানো ছেলের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে।.......

এতক্ষণের কথা বলা, হাসিখুশি, হৈ-চৈ করা মানুষটাও যেন চুপ করে গেছে সে কথায়। মহিমও কথা বাড়াননি আর। যাক্ প্রথম ধাক্কাটা তো গেল। কথাটা তো পাড়া হল.......

খাওয়ার পরে চলে যাচ্ছেন তারাপদ। মহিম হাঁ হাঁ করে পথ আটকেছেন—সে কি তুমি থাকবে না? কিন্তু কই বলে গেলে না তো কিছু ওকে?

ম্লান হেসেছেন তারাপদ। তারপর বলেছেন—তার কি শুনতে বাকি আছে জামাই! রাঙাদির কথা যে শুনল না—সে শুনবে আমার কথা? তার থেকে নিজেদের সমস্যা সরাসরি নিজেরাই মিটিয়ে নাও এবারে। যদি হয় তাতেই হবে......

ঘরে এসে অগত্যা শুয়ে পড়েছেন মহিম। মিথ্যেই আসা হল এবারও। তবু এসেছেন যখন এত পথ পাড়ি দিয়ে কথাটা নিজেই বলবেন মনোরমাকে। তা সে কাছেপিঠে এলে তো! সংসারটা এতোই আগোছালো হয়ে উঠেছে এই রাত্রে—যে সামান্য ফুরসতটুকুও নেই তার।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিম। মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেছে হঠাৎ। দরজাটা হাঁ হাঁ খোলা। লণ্ঠনটা মিট্ মিট্ করে ঘরের কোণে জ্বলছে। হু হু করে উঠল মহিমের মনটা। গেল কোথায় মনোরমা? এ ঘরে শোবে না ঠিক কথা। কিন্তু ব্যবহারযোগ্য ঘরও তো নেই আর!—তবে? বেরিয়ে এসেছেন মহিম ঘর থেকে। শেষরাতের ফুটফুটে জ্যোৎস্না চারদিকে। আর স্নিগ্ধ সেই আলোতে দেখতে পেলেন তিনি মনোরমাকে। দাওয়ার পরে পাটি বিছিয়ে শুয়ে আছে এক নারীমূর্তি। নিটোল নিখুঁত দেহের প্রতি রেখায় ব্যর্থ ও নিরর্থক এক নারীত্বের ছবি। আর সে ছবি ব্যর্থতার হাহাকারে, শ্রান্ত জীবন যন্ত্রণায় উদ্‌গত অশ্রুতে বারবার ফুলে ফেঁপে উঠছে। ভালো করে শুনলেন মহিম কান্নার শব্দ। একবার ভাবলেন মুহূর্তের জন্যে। তারপরে বসে পড়লেন গিয়ে পাটির এক কোণে। বললেন—ছি মনোরমা। কাঁদতে তো তোমাকে বলিনি। চলো ঘরে চলো.......

পরদিন সাতসকালে তারাপদর বাড়িতে গিয়ে হাঁকডাক শুরু করেছেন মহিম। তারাপদ ছুটে এসেছেন—ব্যাপার কী, রাত না পোহাতেই........

হেসে ফেলেছেন মহিম। রাত তার কাল রাতেই পুইয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। বলেছেন—একটা গাড়ি আর নৌকা ঠিক করে দিতে হবে তারাপদ। আজ দুপুরেই রওনা হব আমরা......

আমরা!—অবাক হয়ে গেছেন তারাপদ—তা বেশ, কিন্তু ভাইয়েরা যে বাড়ি নেই কেউ জামাই?

মহিম বলেছেন—আপাতত দেখাশোনার ভার তোমার, ওখানকার কাজ মিটলে ব্যবস্থা একটা করে দিয়ে যাব এসে। তুমি না কোরো না তারাপদ।

তারাপদ বলেছেন—আমাকে তেমন তেমন লোক ভাবলে জামাই! নিশ্চয় দেখব সব, কিন্তু ছেলের বিয়েটা ফাঁকি দিলে সত্যিই। ভেবেছিলাম নেমন্তন্নটা নিজেই চেয়ে নেব তো তার উপায়টুকুও রাখলে না।

দুপুর দু'টো নাগাদ নৌকোয় চেপে বসলেন মহিম। তারাপদ খুলনা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন বলেছিলেন। মহিমই বারণ করলেন—কী হবে অতদূর গিয়ে! রাত-বিরেতে নৌকোর

পথে। যা ঝড়—জলের দিন......

পালে বাতাস লেগে সোঁ সোঁ করে চলেছে নৌকো। ছৈ-এর ভিতরে মনোরমা বসে আছেন আর বাইরে মহিম। মহিম ভাবছিলেন গত রাত্রের কথা।

ঘরে নিয়ে মনোরমাকে বসিয়েছিলেন মহিম অনেক কষ্টে। সারামুখে তাজা আর শুকনো জলের দাগ। চোখ দু'টো ফোলা ফোলা। সব অভিমান ঘুচে গিয়ে আবার মনে হয়েছে মহিমের—আহা কত দুর্বল আর কত অসহায় মনোরমা। নির্বান্ধব এই পুরীতে কী করে কাটাত সে সারাজীবন? একটা জীবনের বন্ধ্যা ইতিহাস যেন মরুশূন্যতা নিয়ে ভেসে উঠেছে মহিমের চোখে। বলেছেন—যাবে মনোরমা আমার সাথে?

কথা বলেননি মনোরমা। মহিম আবার বলেছেন—অপমান করে অনেকবার ফিরিয়ে দিয়েছো মনোরমা, তবু আবার এসেছি। কিন্তু আজ আর না বোলো না। আমার ভয় হচ্ছে ফিরে আসার শক্তি আর আমার নেই। চলো মনোরমা, এবার আমার সঙ্গে। তুমিও যাবে।

বুকের পরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন মহিমকে। মহিমও সব ভুলে টেনে নিয়েছেন তাকে বুকের মধ্যে।........

.......ঘুম আর আসেনি সারারাত। আবোল-তাবোল বকেছেন তারা। সকাল হতে না হতেই ডাকাডাকি শুরু করেছেন তারাপদর বাড়ি গিয়ে। মানুষটাকে বোধহয় ভুলতে পারবেন না তিনি সারাজীবনে।

রূপসা ছেড়ে ভৈরবে এসে পড়ল নৌকা। মনোরমা বললেন—শুনছো বাইরে কাঠফাটা রোদ্দুর.......

মহিম বলছেন—হোক গে রোদ্দুর। এমন হাওয়া আছে তোমার ছৈ-এর ভিতরে? বাব্বা! কী বিরাট বেড়াজাল ফেলেছে এখানে.......

ছৈ-এর ভিতরে বসে মুখ টিপে হেসেছেন মনোরমা—পাগল একেবারে। এই মানুষকেই কিনা.......

বেলা পড়ে এসেছে। মাঝিরা হঠাৎ হাল তুলে বসে পড়ল। পড়িমরি করে ছুটে গেলেন মহিম। ব্যাপার কী? কী বৃত্তান্ত?

চর, ভৈরবের চরে নৌকো আটকা পড়েছে।

কী সর্বনাশ! ট্রেনের সময় যে পার হয়ে যাবে! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। শেষে বলেলেন—জল তো আছে মাঝি উপরে। লগি-টগি মেরে.......

হাসল মাঝি—লগি মারা কি একটা লোকের কম্মো বাবু, গা-গতর ব্যথা হয়ে যাবে। আরেকজন থাকলে.........

লাফিয়ে উঠলেন মহিম—কই আর লগি থাকে তো দাও। চরে আটকে বসে থাকবার সময় আর নেই।

ভারী তো চর! হাসলেন মহিম। পাহাড়-পর্বত পেরোতে পারেন এখন। জীবনের এত বড়ো চরটা পার হয়ে এসেছেন যখন, তখন ভৈরবের চর তো কোন্ ছার।

হুস্ হুস্ করে প্রাণপণে লগি মারতে শুরু করলেন মহিম বাঁড়ুজ্যে।

দশম সেতু

কৃষণ চন্দর

অনুবাদ : সুজয় ঠাকুর

(১৯৬৬ সালে সালে কৃষণ চন্দরকে সোভিয়েট ল্যান্ড পুরস্কার কমিটি পুরস্কৃত করেন। সাহিত্য এবং জীবনে গভীর মানবতাবাদের জন্যে তিনি খ্যাত। তাছাড়া তাঁর লেখার মধ্যে যেমন আছে ব্যথা তেমনি লক্ষণীয় সংসারে বিদ্যমান সব ধরনের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর সপ্রশংস মর্মগ্রহণ। উনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এম এ। ১৯১৪ সালে কাশ্মীরের পুঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে তৃতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ওঁর বেশিরভাগ সাহিত্য-কর্ম উর্দু ভাষায়। এখানে নাগরি লিপিতে বর্ণান্তরিত তাঁর একটি উর্দু গল্পের অনুবাদ দেওয়া হল।)

ছ হাজার ফুট উঁচুতে পর্বত প্রকোষ্ঠে শ্রীনগর এমনভাবে শায়িত যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের বুকে শুয়ে দুধ খাচ্ছে। সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ঢাকার শহর ধীরগতিতে রাতের অন্ধকারের অভিমুখে এমনভাবে এগোচ্ছে যেমন বোঝাই করা জাহাজ সন্তর্পণে সমুদ্রতটবর্তী হচ্ছে।

রাতের পেয়ালাতে আছে কত না ইচ্ছের খুন, কত পরিশ্রমের নুন, কত অশ্রুর জল, কত প্রার্থনার ফল, কত হাতের উষ্ণতা। বিন্দু বিন্দু করে, কাশ্মীরের বহু হাত, সারা দিনের পরিশ্রমে অন্ধকারের এই তরল ধারাকে নিংড়ে বার করেছে। কোনো মুহূর্তে শ্রীনগর এই পেয়ালা তুলে চুমুক দেবে এবং রাত্রির বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়বে আগামী দিনের আশায়। ...কারণ যদি আগামী দিনের আশা না থাকে তাহলে কোনো শহর হবে না, কোনো নদী বইবে না, কোনো সূর্য উঠবে না, কোনো দিবসও প্রকাশিত হবে না।

আমি ডাল হ্রদের নিকটবর্তী প্যালেস হোটেলে রয়েছি। হোটেলটা এক সময় প্রাসাদ ছিল এবং এখনও তাই। তবে এই প্রাসাদে বর্তমানে পুরোনো দিনের মহারাজেরা থাকেন না। নতুন মহারাজারা থাকেন। ভারতবর্ষের নতুন যুবরাজের এবং বিদেশগত শিল্পনবাবেরা, যাঁরা রাতের একটা পার্টিতে এত টাকা খরচ করে দেন যাতে শ্রীনগরের একটা পুরো পাড়ার পোষণ সম্ভব।

এক ভদ্রলোক তেলের নবাব। আগেকার দিন হলে লোকে এঁকে তেলি বলত এবং বাড়ির দরজার বাইরে থামিয়ে দিত। কিন্তু বর্তমানে উনি এই প্রাসাদোপম হোটেলে এসেছেন এবং নিজের জাঁকালো সুইটে বসে পনেরোজনকে শ্যাম্পেন পান করাচ্ছেন। টেক্সাসে এনার কুড়িটি তেলের কূপ বিদ্যমান, এবং গতকালই খবর পাওয়া গেছে যে এঁর এলাকাতে একুশতম তৈল-কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই কারণে এই শ্যাম্পেন-পার্টি এমন ধূম-ধামে করা হচ্ছে। আর ওনার ফরাসি প্রেমিকা ভয়ে কাঁপছেন যেহেতু এই সায়েবের নিয়ম থেকেছে যে প্রত্যেকটি নতুন তৈল-কূপ আবিষ্কারের পর উনি একটি নতুন প্রেমিকাও আবিষ্কার করেন। আরেক ধনিনী কানাডাতে এগারোটি পত্রিকার, দুটি দৈনিকের এবং পাঁচটি সাপ্তাহিকের মালকিন।

একটি ফিতে দিয়ে ইনি নিজের পত্রপত্রিকার ছবি মাপতে থাকেন। ছবি যত বড় ও রঙিন হবে, পত্রিকা তত বেশি বিকোবে কারণ এ ছবির দুনিয়াতে কল্পনার স্থান নেই।

এই ফিতে দিয়ে উনি নিজের শরীরও মাপতে থাকেন, যেন বুক, কোমর, নিতম্বের মাপ ঠিক থাকে। জল-খাবার থেকে রাতের খাওয়া অবধি উনি নিজের শরীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন।

হয়ত কোনো সময় এই মহিলা সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু নিজের শরীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে মহিলাটি নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছেন। ফিতের কথনে বুক, কোমর, নিতম্বের অনুপাত এখনও সঠিক কিন্তু সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। হৃদয়ের কোনো গভীরে মহিলাটি এ কথা জেনে গেছেন কিন্তু এ সত্যের মুখোমুখি হতে চান না এবং তাই প্রতিদিন নিজের শরীর মেপে মেপে নিজেকে প্রতারিত করেন। মহিলাটি খুবই ধনিনী। বর্তমান পর্যন্ত পাঁচটি স্বামী বদল করেছেন কিন্তু ফিতে ছাড়া অন্য কারুর বিশ্বসনীয় থাকতে পারেননি।

শ্রীনগরে ইনি এসেছেনে নিগ্রো যুবক বাট্‌লারকে সঙ্গে নিয়ে, যদিও ওঁর মালিকানাধীন সমস্ত পত্রপত্রিকা নিগ্রো বিদ্বেষের জন্যে খ্যাত। এ সময় উনি নিজের সুসজ্জিত শয়নকক্ষে (নিজের পত্রপত্রিকা-পাঠকদের দৃষ্টির অন্তরালে) সেই যুবক নিগ্রো বাট্‌লারের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন ও তার হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান শরীরের দিকে এমনভাবে দেখছেন যেন কোনো কসাই পোষা খাসিকে দেখে দেখে তার মাংসের বিষয় আন্দাজ করছে। এমনিতে হয়ত আমরা এই মহিলাকে বেশ্যা বলতাম কিন্তু তা বলা চলে না কারণ ইনি এগারোটি পত্রিকার, দুটি দৈনিকের এবং পাঁচটি সাপ্তাহিকের মালিক। খানিক পরে এই মহিলা বাট্‌লারকে নিয়ে ডাল হ্রদের ধারে বেরোবেন ও হ্রদের সৌন্দর্য নিজের ফিতে দিয়ে মাপবেন।

আর এক সায়েব নর্মদা পটারিজের মালিক। ভারতবর্ষে চিনেমাটির বাসন তৈরির সব চেয়ে বড় ফ্যাক্টরি এনার। এনার পেয়ালা, পিরিচ, কুঁজো ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি সাহসে কুলোয় তো এঁকে কুমোর বলে দেখুন। আস্ত খাইয়ে না দেন তো আমার নাম নেই। কারণ পুলিস থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রীগণ সবাই এনার বন্ধু এবং এঁরই চিনেমাটির প্লেটে এর নুন খান।

ইনি দেড় মাসখানেক প্যালেস হোটেল নিবাসী এবং সরকারের কাছে অনুমতি চান যে ডাল হ্রদ শুকিয়ে ফেলা হোক্ কারণ ওঁর ইঞ্জিনিয়রগণ বিভিন্ন জায়গার মাটি পরীক্ষার পর ওঁকে বলেছে যে ডাল হ্রদের তলাকার মাটি দিয়ে খুব উন্নতমানের চিনেমাটির বাসন তৈরি করা সম্ভব—নর্মদা পটারিজের বাসনের চেয়েও ভালো। এর জন্যে দু-কোটি টাকা খরচ করতে উনি প্রস্তুত। কেন যে সরকার বারবার মানছে না বোঝেন না। ওঁর দৃষ্টিতে পড়ন্ত বৈকালের অরুণ- চিত্র অনুপস্থিত। জলের উপর হিল্লোলিত গোলাপি পদ্মের শোভা অনুপস্থিত। কোনো চিত্র-শিল্পীর রচিত কল্পনার মতন সাজানো শিকারাগুলি অনুপস্থিত। উনি কেবল ঘুরে ঘুরে হোটেল থেকে হ্রদের ধারে এসে বুক চাপড়ান—"হায়, কেন ডাল হ্রদের কাদা আমি পেতে পারি না!"

আর একজন আছেন—ফিল্ম প্রোডিউসর। শ্রীনগরের সব কটি সুন্দর স্থান উনি ব্যবহার

করবেন পৃষ্ঠভূমিরূপে আর হিরোইনের সৌন্দর্যকে আরও জাঁকালো বানাবেন। এই প্রোডিউসর সৌন্দর্য বিক্রেতা কিন্তু এঁকে সৌন্দর্য বাজারের দালাল বলা চলে না কারণ ওঁর ব্যাংকে চল্লিশ-লাখ রয়েছে। ওঁর স্টুডিওতে দু-হাজার লোক কাজ করে এবং ওর গাড়ি একেবারে নতুন মডেলের শেভরলে। ব্যাংকে ওর সিন্দুকগুলি ভরা এবং পান করেন কেবল ওয়াইট্ হর্স।

এ সময় উনি চিন্তিত যে কেমন করে নিজের ফিল্মের হিরোকে বোকা বানিয়ে, হিরোইনকে নিজের সাথে নিয়ে, এই চন্দ্রালোকিত রাতে, ডাল হ্রদের ভ্রমণে যায়। আবার হিরোইনও চিন্তিত। সে প্রোডিউসারকে বলে রেখেছে তার সঙ্গে সোনার দ্বীপে যাবে আর হীরোকে বলে রেখেছে তার সঙ্গে রুপোর দ্বীপে যাবে। বেচারা একবার সোনার দ্বীপের দিকে এবং একবার রুপোর দ্বীপের দিকে দেখ্‌ছে তবে ঠিক করতে পারছে না আজ রাত্রি কার বাহুবন্ধনে কাটাবে।

হোটেলে কত না সুইট্, কত না লাউঞ্জ, কত না কামরা, যার প্রত্যেকটিতেই কোনো সমস্যা লেগে আছে। বাইরে হুইস্কি চলছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোনো টানা-পোড়েন চলছে, এবং কেউ ঠিক করতে পারে না কী কারণে এরা কেউ কোনো কিছু ক্ষতি স্বীকারে অপারগ, কিছুই হারাতে পারে না, কোনোভাবেই নিজের কোনো লোকসানে রাজি নয়। এরা কাশ্মীর বেড়াতে এসেছে বলার জন্যে কিন্তু তাদের অনেকের পক্ষে কাশ্মীর এক পৃষ্ঠভূমি, বা একটি ফিতে, বা বিশেষ রকম কাদা, বা সোনার দ্বীপ নামের দ্বীপ।

প্রতি বছর এরা শ্রীনগর আসতে থাকবে এবং শ্রীনগরের রাতগুলিতে আপাতভাবে উৎসবমুখর হয়েও শ্রীনগরের রাতকে দেখতে পাবে না, যেহেতু শ্রীনগরের রাতের রূপসি, অন্ধকারের আলখাল্লা পরে বার হয়, এবং কেবল সে ব্যক্তিই ওর ঘোমটা খুলে দেখ্‌তে পায় যে নিজের অন্তরের ঘোমটা খুলতে পারে। দিশাহারা হয়ে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি এবং রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে ডাল হ্রদের ফুলগুলিকে দেখি চাঁদের আলোতে ডোবা।

অনেক দিন আগে এই ডাল হ্রদের জলে এক ইংরেজ প্রেমিক-যুগল ডুবে মরেছিল। সেপাই নিজের মেজরের মেয়েকে ভালোবাসত। দুজনেই ইংরেজ, দুজনেই শাসকবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা সত্যেও কেউ ওদের নিজেদের সম্পর্কের গন্তব্যপূরণ হতে দিল না। কারণ একজন ছিল মেজর-পুত্রী, অন্যজন কেবল সাধারণ সেপাই।

লোকে বলে এক এমনিই চন্দ্রলোকিত রাতে এ দুজন প্রেম-পীড়িত, একটি শিকারা বাইতে বাইতে ডাল-হ্রদে এসেছিল। কখনও প্রেমিকা নৌকা চালাচ্ছিল ও প্রেমিক গিটারে কোনো বিরহগান শোনাচ্ছিল। আবার কখনও প্রেমিক দাঁড় বাইছিল ও প্রেমিকা শিকারার লাল গদীতে আপেল গাছের ডালের মতো হাত রেখে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকছিল। ডাল হ্রদের মাঝখানে দাঁড় বাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং অনেকক্ষণ ধরে ওরা দুজনে হাওয়ার অনিয়ন্ত্রিত গতির মতো কথা-বার্তা বলতে থাকল আর প্রেমের সুগন্ধের মতো এক অন্যের শ্বাস-প্রশ্বাসের আনন্দ গান করতে থাকল। বহুক্ষণ ধরে জলের উপরের নীল পদ্মফুলেরা ভয়ে ভয়ে ওদের দেখ্‌ছিল কারণ ফুলেরা প্রেমের সব মূল্য জানে এবং সব ফলাফল বিষয়ে অভিজ্ঞ।

হঠাৎ ওরা দুলতে থাকা নৌকাতে ফুলের দলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে উঠল। মেজরের

পুত্রী দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজের দুই বাহু ওই সাধারণ সেপাইয়ের গলায় জড়িয়ে দিল। সেপাই ওকে নিজের বাহুতে তুলে নিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল।

নৌকো খুব জোরে নড়ে উঠল। দুটো শরীর পড়ার পর জলের রুপোলি তল লক্ষ লক্ষ তারা হয়ে ভেঙে গেল ও নীল পদ্মদল ডুবে গেল। তবে সে ফুলগুলো আবার খানিক পরে ভেসে উঠল। তবে সে দুটি ফুল আর ভাসল না, যাদের প্রেমকে কেউ ফুলের মতো ফুটতে দেয়নি।

পরের দিন মেজর ডালেতে দূর দূর অবধি ডুবুরি আর সাঁতারু পাঠালেন কিন্তু কেউ ওদের মৃতদেহ খুঁজে পেল না।

লোকের ধারণা কিন্তু সে দুজন এখনও বেঁচে। সোনার দ্বীপের ধারে, যেখানে বেদে-মজনু গাছ জলের উপর ঝুঁকে আছে, যেন বিধবারা চুল খুলে কাঁদছে, তাদের অশ্রুর আড়ালে, হলুদ-নয়ন-পদ্মফুলের তলায়, ঘন লম্বা ঘাসের স্তরের তলায়, সাদা শামুকের প্রাসাদে, সে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা সংসারের চোখের অন্তরালে আজও কোথাও থাকে।

এও শোনা যায়, চাঁদের আলোর রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়ে, ডাল হ্রদের ধারে কেউ যখন বেড়াচ্ছে না, হ্রদের তলা থেকে একটি শিকারা বার হয়, যার কাঠ বেদে-মজনু গাছের, যার দাঁড় পদ্মফুলের। তার পাল জলের ঘাসের সবুজ তরঙ্গের মতো দোলা খায়। ওই শিকারাতে একজন অপলক দৃষ্টিতে অন্যজনের দিকে তাকিয়ে গিটার বাজিয়ে এক মৃদু অজানা সুরে গান করে এবং আরেকজন, আপেলগাছের ডালের মতো বহু শিকারার গদির উপর রেখে, অতি মনোযোগে গান শুনতে থাকে এবং শিকারা নিজে নিজেই নিশাতবাগ অভিমুখে এগোয়।

অনেকে এই নৌকো দেখেছে এবং সে রাতে প্যালেস হোটেল থেকে বেরিয়ে আমিও দেখলাম। চাঁদনি রাতের গহন নিস্তব্ধতাতে মনে হল যেন এ নৌকো চাঁদের আলোতেই তৈরি। পুরুষটির দুই চোখই ছিল খোলা এবং দুটি দাঁড়ই ছিল স্থির। মেয়েটির দুটি চোখ পুরুষটির উপর ছিল স্থাপিত আর নৌকোর হালটি একটি বাচ্চার মতো ওর কোলে ছিল রাখা। ওরা সমস্ত কিছু ভুলে এক অন্যকে দেখছিল, এবং নৌকোটি দুলতে দুলতে অমীরাকদল-পোলের দিকে যাচ্ছিল।

তারপর দেখলাম নৌকোতে অনেক জিনিস ভরা-কাঠ, তরকারির ঝুড়ি, পদ্মফুল এবং একটি ছাগল যেটি বারবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ছিল। হঠাৎ পুরুষটি এক কাশ্মীরী গান গাওয়া আরম্ভ করল :

"জহ কমিয়ো সোনিয়া ন ভরম দিস....."

[জানি না কে যে তোমার আমার প্রতি বিরূপ করেছে যার জন্যে তুমি আমার প্রতি উদাসীন।]

লজ্জায় কাশ্মীরী মেয়েটি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল, ওর গাল লাল হয়ে গেল, ওর কানের দুলগুলো যেন এক নরম কমনীয় উত্তরের মতো বেজে উঠল।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম এরা তো সে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা নয়। এরা তো শ্রীনগরের

সাধারণ দুজন লোক-সারা দিনের খাটা-খাটুনির পর ঘরে ফিরছে। এদের মনে আত্মহত্যা করা কেন আসবে? এরা প্রেমও করে, পরিশ্রমও করে।

তারপর আমি বাঁধের উপর হাঁটছি। পাশে পাশে ঝিলম নদীও চলেছে। দুজনেই ভাবলাম যেদিন মা জন্ম দিয়েছিল সেদিন কত দুর্বল ছিলাম। তেমনি যেদিন হিমবাহ ওয়েরিনাগ ঝিলমকে জন্ম দিয়েছিল সেও ছিল নিতান্ত দুর্বল। সে যখন এগুলো ওর সঙ্গে নানান নদী-নালা মিশতে থাকলো। আমি এগোলাম এবং আমার মধ্যে নানা দিন-রাত মিশতে থাকল।

তারপর আমরা জীবনের প্রস্তর খণ্ডে খণ্ডে ঘর্ষিত হলাম এবং নানা পরিস্থিতির পরিখায় ঝরনা হয়ে নীচে পড়লাম। বহু শস্যক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করলাম আর বহু ফুলের সুগন্ধে আমোদিত হলাম। আবার শহরের নোংরা বহন করলাম, সেখানকার অম্ল বুকে গুলে নিলাম এবং মানুষের নিরাশার মতো পঙ্কিল হলাম। আমরা লেকের মাঝে সেতু বাঁধলাম, নৌকো বাইলাম, জলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লাম।

ঝিলম একটি মানুষ আর মানুষ একটি নদী। দুই সাথে সাথে চলে এবং রাত্রিও এ দুইয়ের সাথে চলে।

অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম বাঁধের নীচে ঢালুতে নদীর ধারে এক যুবক একটি মেয়েকে ভীষণ নির্দয়ভাবে মারছে। কাছে একটি উনুন জ্বলছে এবং তার উপর তাওয়া রাখা এবং একটি মাঝবয়সি স্ত্রীলোক ভুট্টার রুটি তাওয়া থেকে নামিয়ে নামিয়ে উনুনে সেঁকছে। এক বুড়ো এবং একটি ছেলে থালাতে লাউয়ের তরকারি দিয়ে ওই গরম গরম রুটি খাচ্ছে। দুজন যুবক ডিমের ঝুড়িতে রাখা ডিমগুলো নির্বিকারভাবে গুনছে। আর একটি লোক নদীতে নিজের হাত পা থেকে কাদা ছড়াচ্ছে। সে লোকটি ঘুঁসি এবং লাথি চালিয়ে সেই যুবতী মেয়েটিকে মেরেই চলেছে। মেয়েটি জোরে জোরে সাহায্যের জন্যে ডাক ছাড়ছে তবে কেউই ওকে সাহায্য করতে আসছে না।

আমি বাঁধ থেকে নেমে সেই রুটি-তৈরি-রতা মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল "একটি লোক একটি মেয়েকে পেটাচ্ছে।"

"দেখতেই ত পারছি। কিন্তু তুমি মেয়ে হয়ে অন্য মেয়েকে বাঁচাচ্ছ না?"

ও উত্তর দিল "লোকটি ওর মরদ, মেয়েটি ওর স্ত্রী।"

আমি সে লোকটির কাছে গিয়ে বললাম "একে মারছ কেন?"

ও মেয়েটিকে এক থাপ্পড় মেরে বলল "এ আমার স্ত্রী।" এবং ওকে আরেক লাথি মেরে বলল "বল্, এ আংটি কোথায় পেলি?"

বলে উঠলাম "কী আংটি? থামো থামো...।"

"এই যেটা বেটি পরে রয়েছে।"

বললাম "রুপোর আংটি, কী এমন দারুণ জিনিস। হতে পারে এ কিনে পরেছে। হয়ত তিন বার টাকা বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। কী এমন বড় ব্যাপার!"

স্ত্রীকে পেটানো বন্ধ করে, দুই হাত কোমরে রেখে ও বলল "আমার পুরো পরিবার দিন-রাত তৈরি-হতে-থাকা-বিল্ডিং-এ ইঁট বয়ে এতটা কেবল উপায় করি যে দু-বেলার খাওয়া

জুটে যায়। এতে রূপোর আংটি কী করে কেনা সম্ভব? কাল অবধি ওর আঙুলে ছিল না, আজ কী করে এসে গেল?"

"এ কী বলে?"

"বলে, রাস্তাতে পড়েছিল। হারামজাদি, বেশ্যা, বল্ কোন নাগর থেকে পেয়েছিস?"

ও মেয়েটির মুখে এমন ঘুঁসি মারল যে ওর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল এবং মেয়েটি বেসামাল হয়ে পড়ে গেল আর ওর আংটি আঙুল থেকে বেরিয়ে নদীতে ডুবে গেল।

মেয়েটির মুখ থেকে আপনা আপনিই বেরিয়ে পড়ল "হায়!" এবং ও অজ্ঞান হয়ে গেল। পুরুষটি ওকে পেটানো থামিয়ে ওর জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল।

আমি রুটি-তৈরি করতে থাকা স্ত্রীলোকটিকে জিগেস করলাম "তোমাদের শ্রীনগরের লোক বলে মনে হচ্ছে না?"

ও বলল "আমরা রজৌরি থেকে এসেছি। সেখানে আমাদের যা ছিল সর্বস্ব বিক্রি হয়ে গেল তাই চলে এসেছি। এখানে বিল্ডিং-এ কাজ করি, ইঁট বই। আমার দু-ছেলে ডিম বেচে। এ যে স্ত্রীকে মারছে সেও আমার ছেলে। যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে সে আমার বউ। এই বুড়ো আমার স্বামী। এই ছেলে যে সঙ্গে খাচ্ছে সে আমার ছেলের ছেলে। ....রজৌরিতে আমাদের অবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু তারপর সব বিক্রি হয়ে গেল।..."

আমি আস্তে করে বললাম "আর যা বাকি ছিল তা শ্রীনগরে এসে বিক্রি হয়ে গেল।" তবে ও আমার কথা বুঝতে পারল না। আমি কথা পাল্টে ফেলে বললাম "একটা ভুট্টার রুটি কত পয়সাতে দেবে?"

সন্দেহের দৃষ্টিতে ও আমাকে আপাদমস্তক দেখল।

বললাম "মা জী, কথাটা এই, আমি বহুদিন ভুট্টার রুটি ও লাউয়ের তরকারি খাইনি। লোভ হচ্ছে। একটি ভুট্টার রুটি আর লাউসাক্ দাও এক টাকা দেব।"

"বসে পড়ো, বসে পড়ো।" বুড়ো বলে উঠল।

আমি একটাকা বার করলাম, বুড়ো হাত বাড়াল, কিন্তু চট করে ওর ছেলে সে টাকা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে ফেলে বলল "মা, একে লাউ ও রুটি দিয়ে বিদেয় করো।"

তারপর নিজের স্ত্রীকে, যার জ্ঞান এখন ফিরে এসেছিল, এক ঘুঁসি মেরে বলল "চল্, মায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চা, আর বল্ যে কখনও আর এরকম আংটি পরবি না।"

শাশুড়ির পা ছুঁয়ে, আগুনের সামনে হাত তুলে, বউ প্রতিজ্ঞা করল যে আর কখনও এরকম আংটি পরবে না।

কিন্তু মেয়েটি ছিল সত্যি দারুণ সুন্দরী এবং ওর দৃষ্টি বার বার আমার মুনস্টোন-আংটির দিকে পড়ছিল। তাই মনে হল মেয়েটি যদি এরকম সুন্দরীর থাকে এবং রকম গরিবও থাকে তাহলে রুপোর আংটি ও আবার পরবে। অবশ্য তখন কিছু না বলে চুপ রইলাম।

ভুট্টার গরম রুটি হাতে নিলাম এবং তার উপর ওই মা লাউ সাক্ দিল। লাউসাকের গরম গরম তাপ নাকে লাগল আর আমার ভিতরে সোনালি ভুট্টারুটির সোঁদা গন্ধ ছেয়ে

গেল। আমার খিদে বেশ বেড়ে গেল এবং মহানন্দে এক এক গ্রাস খেতে থাকলাম।

মনে পড়ে গেল—"মার্টিনি না বুরবোঁ?—কোন সুপ নেবেন?" "সল্ট পাইজটা এগোও।"

গ্রাস মুখে দেওয়ার পর সেই প্রহারকারী যুবককে জিগেস করলাম "কখনও প্যালেস হোটেলে গেছো?" বলল "কখনও ভিতরে তো যাইনি।" "চশ্মা শাহী দেখেছ?" "না।" "নিশাতবাগ?" "না।" "শালিমার বাগ?" "না। কেন ওখানে কাজ পাওয়া যায়?" "কাজ পাওয়া যায় না। আমোদ-প্রমোদ হয়।" ও বুঝল না, জিগেস করল—"আমোদ-প্রমোদ কী জিনিস?"

কী উত্তর দিতাম, তাই চুপ করে রইলাম। রুটির শেষ টুকরো ভাঙতে ভাঙতে ওকে জিগেস করলাম—"মাসে ক-বার স্ত্রীকে পেটাও?"

স্ত্রী-র মুখে গ্রাস দিতে দিতে বলল "এই পাঁচ, ছ-বার। কী বলিস জানকী?" জানকী খিলখিলিয়ে হেসে ফেলল।

অর্ধ রাত্রিতে ঝিলমের জলে ভাসতে থাকা হাউসবোটগুলির বাতি নিভে গিয়েছিল। শিকারা ও নৌকোর আসা যাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঁধের ওপারে সফেদার গাছগুলো সেপাইদের মতো অ্যাটেন্শন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝিদের কুঁড়ে ছিল নিস্তব্ধ। শিকারাগুলোর দাঁড় ছিল গতিহীন। বিজলির থামগুলোর আলো যেন এই চন্দ্রকিরণ-বর্ষার নীচে ম্লান হয়ে কোনো অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করছিল। আমি অমীরাকদল সেতুর উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। নীচে ঝিলম ছিল প্রবাহিত।

হঠাৎ অমীরাকদলের সাদা দাড়িওয়ালা পাগ্লা কাদির বাট সামনে হাজির হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

আমি বকে বললাম "হাসছিস কেন?" ও তখুনি হাসি থামিয়ে জিগ্যেস করল "বলতো, এ শহরে কটা সেতু?"

"সাতটা। অমীরাকদল, জন্দকদল, ফতেহ্কদল, জীনাকদল, আলীকদল, নওয়াকদল ও সফাকদল।"

"কিন্তু, আরও দুটো হয়েছে। সে দুটোর নাম কী?"

"নাম জানি না, কিন্তু হ্যাঁ সব শুদ্ধু নটা। শ্রীনগর এখন সেতুর শহর।"

"কিন্তু দশম সেতুটা কোথায়?"

আশ্চর্য হয়ে বললাম "দশম সেতু? কোন দশম সেতু?"

উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকল। হঠাৎ ঘুরে অমীরাকদলের অন্য পারে হরি সিং স্ট্রিটের দিকে চলে গেল এবং জোরে চেঁচাল "দশম সেতুটা কোথায়, দশম সেতুটা কোথায়?"

আগে ও সফাকতদলেতে কাঠের এক বড় আড়তে কাঠ চেরাইয়ের কাজ করত। সারা দিন কাঠ চেরাইয়ের পর কাঠে বোঝাই নৌকো সন্ধ্যাবেলা সাতটা সেতু পার করে অমীরাকদলের এক হোটেলে কাঠ পৌছতে যেত। ওর কাঠভর্তি নৌকো প্রতিদিন ঝিলমের প্রবাহের উপর সাতটি সেতুর নিচ থেকে পার হত। আর ও পুরোদমে বাইতে বাইতে নৌকোর

পুরো কাঠ হোটেলে পৌঁছে দিয়ে রাত নটা-দশটা নাগাদ কাঠের আড়তে ফিরে গিয়ে মালিকের কাছে সারা দিনের পরিশ্রমের মজুরি আড়াই টাকা আদায় করে ঘরে ফিরত। তারপর বউ-এর হাতের রান্না খাবার খেয়ে, এক পেয়ালা শীর-চা খেয়ে, অঘোরে ঘুমোত। ও বউকে প্রচণ্ড ভালোবাসত আর ওর পাগলের মতো ভালোবাসা সারা এলাকাতে বিখ্যাত ছিল।

এক সময় ওর বউয়ের কলেরা হয়ে গেল। ও আড়তওয়ালার কাছে ধার করে দু-টাকা দিয়ে হাকিমের ওষুধ এনে খাইয়ে আবার কাঠের আড়তে চলে গেল। সারা দিন কাঠ চেরাই করতে করতে মাঝে মাঝে দৌড়ে বউয়ের শুশ্রূষার জন্যে যেতে থাকল।

সারাদিনেও যখন বউয়ের বমি থামল না তখন সে আড়তওয়ালার কাছে ডাক্তারের ওষুধ আনার জন্যে দশ টাকা চাইল। আড়তওয়ালা বলল সব কাঠ চিরে হোটেলে পৌঁছে দিলে পরে দেবে।

কাদির বাট দৌড়ে দৌড়ে বউয়ের কাছে গেল। লোকে বলে সে সময়ই ওর বউ আধমরা হয়ে গিয়েছিল। প্রায় মরার মতনই দেখতে মনে হচ্ছিল। বউয়ের ঠাণ্ডা ঘামে নেয়ে যাওয়া মাথাতে হাত রেখে ধরা গলায় বলল "জৈনব খাতুন, তুই মরিস না। আমার অপেক্ষা করবি। বুঝলি, আমার জন্যে অপেক্ষা করবি! আমি এখুনি অমীরাকদলে কাঠ পৌঁছে, ইংরেজি ওষুধ-ওয়ালা ডাক্তার নিয়ে তোর কাছে আসছি। তারপর তুই ভালো হয়ে যাবি। বুঝেছিস্! দেখ, মরিস না। আমার অপেক্ষা করিস!"

অজ্ঞান বউকে এই কথা বলে চলে এল এবং তাড়াতাড়ি কাঠ নৌকোতে তুলে হোটেলের দিকে রওনা হল। ঝিলমের রাস্তা এর আগে কখনও এতটা লম্বা ও কঠিন মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল যেন এ নদী নয় মরুভূমি যার বালুকাতে প্রতিক্ষণ ওর পা ডুবে যাচ্ছে। এর আগে ও কখনও ঝিলমের সাতটা সেতু গোনেনি। আজ মাথার উপর থেকে যেতে থাকা সাতটা সেতুকে বোধ করল যেন দুঃখের বিরাট বিরাট ঢাকা ওর মাথার উপর চাপানো। নিজের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি সহকারে দাঁড় বেয়ে, রাস্তার সব কটা পোল পার করে ফিরে, আড়তওয়ালার কাছে দশ টাকা নিয়ে যখন বউয়ের মাথার কাছে পৌঁছল তখন জৈনব আর বেঁচে ছিল না। সাতটা সেতুই পার করে গিয়েছিল।

লোকে বলে সেদিন থেকেই কাদির বাট পাগলা। যখন শ্রীনগরে সাতটি সেতু ছিল ও চিৎকার করে লোকদের জিগ্যেস করত—"অষ্টম সেতু কোথায়?" যখন অষ্টম সেতু তৈরি হয়ে গেল ও চিৎকার করে করে জিগ্যেস করতে আরম্ভ করল "নবম সেতু কোথায়?" যখন নবমটি তৈরি হয়ে গেল তখন জিগ্যেস করতে লাগল "দশম সেতু কোথায়?"

আমার কানেও বাজছে—"দশম সেতু কোথায়, দশম সেতু কোথায়?"

রাত কাটতে থাকে, ঝিলম বইতে থাকে। কেন যে মন চায় নিজের সব কাপড় ছিঁড়ে ফেলি আর পাগল কাদির বাটের মতো চিৎকার করে জিগেস করি : দশম সেতু কোথায়? কোথাই সেই ইচ্ছের, সেই আশার, সেই আনন্দের আচ্ছাদন যা সফালকদলকে প্যালেস হোটেলের সঙ্গে দেবে মিলিয়ে?

বিমল কর : এক বিরল সাহিত্যস্রষ্টা

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

এই জগৎ যে সর্বাংশে মধুর তা নয়, প্রকৃতিও সর্বত্র নয়, মানুষের ইতিহাসও কলঙ্কহীন নয়। বর্বরতা, নৃশংসতা, রক্তক্ষয়, শঙ্কা, শোক দুঃখ সর্বত্রই আছে এখানে। তবু, যে অলস মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে মানুষ ছোট ছোট সুন্দর দৃশ্যগুলি দেখে জগতের আকাশ পাখি ও ফলমূল শুধু নয়, আমাদের জীবনের দৈনন্দিনের সুন্দর ছবিগুলি—সেগুলিই তো আমাদের বেঁচে থাকার সম্বল, বেঁচে থাকার আনন্দ—(উড়ো খই)। এই কটি কথা বিমল কর লিখেছিলেন তাঁর খানিকটা আত্মজীবনধর্মী রচনায়। এটিকে তাঁর জীবনদর্শন বললেও ভুল হবে না। পরিণত বয়সেই তাঁর প্রয়াণ। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত মানসিকভাবে তিনি অত্যন্ত সজীব এবং সক্রিয়, তাই শেষ পুজোসংখ্যার উপন্যাসটিও তিনি শেষ করে যান।'পূর্ণ অপূর্ণ'-এর লেখক বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ অপূর্ণতা নিয়েই যাত্রা শুরু করে, কিন্তু তার যাত্রা পূর্ণতার দিকে। কিন্তু এই যাত্রা নিশ্চিন্ত নিরাপদ নয়, তা অত্যন্ত বেদনার। এই আত্মিক যন্ত্রণাটা বিশেষ করে তাঁর গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। আবার ওই 'বেঁচে থাকার আনন্দ'টিই যে মানুষকে সমস্ত সংকীর্ণতামুক্ত করে দেবে এ বিষয়েও তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। ওপরের উদ্ধৃতিটাই তাই যথার্থ বিমল করকে চিনিয়ে দেয়।

এই অলোচনা নিঃসন্দেহে প্রয়াত বিমল করের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণেরও প্রয়াস। তাঁর রচনায় মর্বিডিটির উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়েছে। এরই সঙ্গে এসেছে অসুখ এবং মৃত্যুর কথা। নিজেকে ইন্ট্রোভার্ট লেখক বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। এছাড়া বিকলাঙ্গ চরিত্রও তাঁর রচনাতে ঘুরে ফিরে আসে। 'পূর্ণ ও অপূর্ণ'-এর সুরেশ্বর এক জায়গায় বলেছিল 'মানুষ মাত্রেই দুঃখী', তার আরও মনে হয়েছিল, 'পবিত্রতা তাই আমাদের কল্পনা'। আক্ষরিক অর্থে এসব শব্দ গ্রহণ করলে বিমল করকে কেবল 'সিনিক' বলে মনে হতে পারে। তাই একটু গভীরে সন্ধান করাই ভাল। মৃত্যুচেতনায় আচ্ছন্নতার কথা বোঝাতে গিয়ে তাঁর 'নিষাদ' গল্পটির কথা মনে করা যেতে পারে। বারো বছরের ছেলে জলকু-র যত রাগ রেল লাইনের ওপর। কারণ এই রেল লাইনেই তার প্রিয় ছাগল ছানাটি কাটা পড়েছে। সারাদিন রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে সে ঢিল ছুঁড়ে যায়। তার প্রতিবেশী প্রতিদিন জলকে ধরে বাড়ি নিয়ে আসত। কিন্তু তারও তো জানা হয়ে গেছে, 'ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে, হয়ত আজ....কিংবা কাল।' এই বাক্য কটিই গল্পে বারে বারে ঘুরে আসে। নিয়তি যেন এই বালকটিকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। নিয়তির এই অমোঘ লীলার মানুষ যেন এর অসহায় দ্রষ্টা মাত্র। প্রতিশোধের সুযোগ বা ক্ষমতা তার নেই।

এ সবই তো লেখকের আত্মানুসন্ধান বা আত্মবিশ্লেষণ। কখনো তিনি নিজেই তা করেন, কখনো কাহিনীর চরিত্রকে দিয়ে তা করান। যেমন করেছে 'সুধাময়' গল্পের নায়ক, 'বিরাট সংশয় আমাকে কাঁটার মত সর্বক্ষণ বিঁধছে।' কিন্তু সংশয়েই তার যাত্রাপথের সমাপ্তি নেই। তাই সে, 'নতুন করে বিশ্বাসকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিংবা তার সেই অদ্ভুত আনন্দকে।' বাংলা কথা- সাহিত্যে এই ক্রমাগত আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস নিঃসন্দেহে বিমল করের সবেচেয়ে বড়ো অবদান। এর জন্যই তাঁকে অনেকের ইন্ট্রোভার্ট বলে মনে হয়েছে, মার্বিডিটি বা মৃত্যুচেতনার প্রাধান্যও এই কারণেই চোখে পড়েছে। সম্ভবত এই জন্যই এক ধরণের বিষণ্ণতাও যেন তাঁর রচনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এসবই আপাতদৃষ্টিতে সঠিক। আত্মজীবনী উড়ো খই-তে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার জন্যই ঘুরে ফিরে মৃত্যুর কথা তাঁর লেখায় আসে, 'মৃত্যুর এই যে নিষ্ঠুর চেহারা, অর্থহীন আবির্ভাব, স্বেচ্ছাচারিতা এবং নির্বিকার আত্মসংবৃত্তি—এটি আমি কোনোদিনই আর ভুলতে পারিনি পরে। আমার লেখায় হয়ত তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দেয় মৃত্যুর কথা।' এর মানে তো এই নয় যে তাঁর লেখায় মৃত্যুকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়। 'খড়কুটো' উপন্যাসের নিঃসঙ্গ এবং অসুস্থ ভ্রমরের যা মনে হয়েছিল সেটাই বোধহয় লেখকেরও শেষকথা, 'ভালবাসাই মানুযেক বাঁচায়। যে অন্ধজন, যে কুষ্ঠরোগী এবং অন্য যারা যীশুর কৃপায় আরোগ্যলাভ করেছিল, তাঁরা তাঁর ভালবাসায় অসুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছিল, ভালবাসাই আরোগ্য এবং বিশ্বাস এবং ভালবাসাই সব।' এই যাঁর জীবনভাবনা তাঁকে মর্বিড বলা যায় কী করে?

।। দুই।।

বিমল করের ক্ষেত্রে Topicality বা সমসাময়িকতার কথাও এসে পড়ে। তাঁর সমকালীন লেখকেরা কেউ কেউ যখন রাজনীতিকে লেখায় নিয়ে আসছিলেন তখনও বিমল কর সে ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান নি। বর্তমান লেখককে এক আলাপচারিতায় তিনি জানিয়েছিলেন যে, অত্যধিক ডকুমেন্টেশান তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। কথাটা উঠেছিল তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'দেওয়াল' প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়টিকে তিনি এই উপন্যাসে তাঁর নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন। কাহিনী কাল্পনিক নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত, 'যুদ্ধের সময় আমি কলকাতায় বারো আনা কাটিয়েছি। বউবাজারে কাকার বাড়িতে যখন থাকতাম, এ. আর. পি-র চাকরি করতাম, কলেজের খাতায় নাম লেখানো ছিল, তখন আমি এই শহরের এই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের অনেক যন্ত্রণা ও গ্লানির চেহারা দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া, সামাজিক ভাঙন, মনুষ্যচরিত্রের লোভ লালসা, তার নৈতিক পতন, মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু (আমার লেখা, নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড)' উপন্যাসটিকে আমার একাধারে 'সময়ের দলিলীকরণ' আবার সময়কে উত্তরণের প্রয়াস বলে মনে হয়েছিল। পাশাপাশি এই উপন্যাসে তাঁর কালচেতনার নিদর্শনও আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সমসাময়িক রাজনীতি, আগষ্ট-আন্দোলন, সুভাষচন্দ্র, কমিউনিষ্টদের জনযুদ্ধনীতি, দুর্ভিক্ষ—সবকিছুই তিনি 'দেওয়াল' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে সাজিয়ে দেন। কিন্তু তার পরে তাঁর নিজেরই মনে হয় যে, খণ্ডটি অত্যধিক তথ্যভারাক্রান্ত। 'আমি জানি এই খণ্ডটির শিল্পগত

উৎকর্ষ তথ্যভারে চাপা পড়ে গেছে।' তাই এপথে তিনি আর পা বাড়াতে চান নি।

একেবারে চান নি তা নয়, সত্তরের দশকের ঝোড়ো সময়টিকে তিনি একটু অন্যভাবে ধরতে চেয়েছিলেন 'যদুবংশ' উপন্যাসে। এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে একটি স্প্যানিশ উপন্যাস দি ইয়ং অ্যাসাসিনস্-এর প্রভাবের কথা স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা নেই। "দি ইয়ং অ্যাসাসিনস্"। নামটা আমার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করত। কালের হাওয়ায় সব পালটাচ্ছে। আমাদের কালের ছেলে ছোকরারা। তারাও দি অ্যাসাসিনস্? অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো তাই মনে হয়। কী জানি কেন বরেনকে বললাম, কিছু রাগী, বেয়াড়া, পাজি টাইপের ছেলেকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়?' (অমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা)। এই একটি ব্যাপারে বিমল করের সততার কোনো তুলনা নেই। 'দেওয়াল' উপন্যাস রচনার সময় 'এ রুম ইন বার্লিন' নামক উপন্যাসের কথা তাঁর মাথায় ছিল একথা আমায় জানিয়েছিলেন। এগুলো কোনো প্রভাব নয়, এ কেবল অবচেতন মনে ছায়া ফেলা মাত্র। তাই সব লেখাই তাঁর নিজের মতো হয়ে যায়। 'যদুবংশ'-তে সত্তরের দশকের রক্তাক্ত রাজনীতি বাইরে থেকে যায়, কোন সমাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থা সত্তরের দশককে সৃষ্টি করে যদুবংশ-এর চরিত্রগুলি কেবল তারই ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব পাঠকদেরই।

বিমল কর-কে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ধাত্রী বলা চলে। কলেজ স্ট্রিট বা কে. সি. দাসের দোকানে যে অসমবয়সী লেখককুলকে নিয়ে তিনি আড্ডা জমাতেন তাঁদের মধ্যে কে ছিল না? এরা সবাই হয়তো টিকে থাকেন নি, কিন্তু এঁদের নিয়েই ছোটগল্পকে একটা আন্দোলনের চেহারা দিয়েছিলেন তিনি। একদিকে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁদের অনেকেরই আনুকূল্য করেছেন। অন্যদিকে ছোটগল্পের প্রথাগত কাঠামো ভাঙবার জন্য 'ছোটগল্প নতুন রীতি' পত্রিকাকে সামনে রেখে এগিয়েছেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন', দ্বিতীয় সংখ্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু'। এই দ্বিতীয় সংখ্যাতেই বিমল কর নতুন রীতির সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'ছোটগল্পের প্রচলিত তাত্ত্বিক কোনও ধারনায় আমরা বিশ্বাসী নই। 'ছোট' কথাটিরও কোনও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা অক্ষম। কোনও ধরনের লেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনও তত্ত্ব থাকতে পারে না।' প্রবন্ধটির শেষে নতুন রীতির সমর্থনে তাঁর উল্লেখযোগ্য বক্তব্য, 'আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাস একাকী হয়েছি—একথা অস্বীকার করা যায় না। ছোটগল্পেরও হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।' এভাবে তিনি কেবল তখনকার তরুণতর লেখকরাই হয়েই কৈফিয়ত দেন না। আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। 'নতুন রীতি'র তৃতীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক 'বিজনের রক্তমাংস', চতুর্থ সংখ্যায় মিহিরকুমার গুপ্তের 'অনামা' এবং পঞ্চম সংখ্যায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা' দিয়েই নতুন রীতির প্রকাশ শেষ। এদের মধ্যে 'জটায়ু' এবং 'বিজনের রক্তমাংস' নিয়ে হৈচৈ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি, বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, আর বিমল কর সর্বদাই তাঁর তরুণ বন্ধু লেখকদের পাশে। পরবর্তীকালে 'গল্পবিচিত্রা' বা 'গল্পপত্র' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি অবার তাঁর পুরোনো আর নতুন

সহযাত্রীদের এর জায়গায় জড়ো করতে চেয়েছিলেন। এমন কি তরুণতম শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের দিকেও তিনি সস্নেহ দৃষ্টি রাখেন। একজন প্রবীণ লেখক একই সঙ্গে নিজের পছন্দমতো লেখা লিখেছেন আর পাশাপাশি অন্তত দুই প্রজন্মের কথাকারদের সযত্নে আগলে রেখে চলেছেন—এরকম উদাহরণ বিরল।

আর একটি কথা না বললে বোধহয় বিমল করকে সঠিক বোঝা যাবে না। তা হচ্ছে বিমল করের সাহিত্যভাবনার কথা। বিমল কর সংক্রান্ত আলোচনা এ দিকটি সাধারণ ভাবে হতে দেখি। তাঁর চারপাশে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নামজাদাদের সংখ্যা কিছু কম নয়। অধুনা বিখ্যাতদের সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়নও আছে। দীপেন এবং দেবেশ ছাড়া রাজনীতির সঙ্গে এদের কারোই যোগাযোগ ছিল না, বিমল করও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু দীপেন বা দেবেশের মূল্যায়নে তিনি মুক্তমনা, 'তা দেবেশ কমিউনিস্ট হোক আর না হোক আমার কিছু আসে যায় না। আমি দেবেশ আর দীপেনকে দেখেছি লেখক এবং মানুষ হিসেবে। লেখাপত্রের ব্যাপারে দুজনেই মুক্তমন। লেখা ভাল হলে, ভালটাই বিবেচ্য লেখক কী ধরনের রাজনীতি করে, কি করেনা তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। এই উদারতা দুই বন্ধুকেই অন্যদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।' (আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা)

এই উদারতা বিমল করেরও ছিল। তাই লিখতে পারেন "আমার নিজের এ ব্যাপারে কোনো গোঁড়ামি নেই বলে দেবেশ কমিউনিস্ট হোক আর না হোক—তার লেখাই আমার কাছে বিবেচ্য হয়েছে'। এতটাই বিবেচ্য হয়েছে যে, দেবেশ সম্পর্কে তিনি যতটা উচ্ছ্বসিত এমন আর কারো সম্পর্কে নেয়। 'আমার মনে হত, দেবেশ ভীষণ শক্তিশালী লেখক, তার কাছে অনেক পাব। আমার দেবেশ প্রীতি যে সবাই খুশি মনে মেনে নিত তা নয়, বরং ঠাট্টা করে কেউ কেউ সব বলত, দেবেশকেই আপনি বড় লেখক বলেন।' এসব কথা বিমল কর লিখেছিলেন পরিণত বয়সেই। আর বিমল করের জীবিত কালেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে দেবেশেরও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, 'কিন্তু এইটুকু কথা বলে রাখা দরকার, বিমলদাই সবচেয়ে প্রথম আন্দাজ করতে চাইছিলেন, গল্প উপন্যাস নিয়ে আমি সম্পূর্ণ অন্যরকম কিছু ভাবছি।' (কোরক, বিমল কর সংখ্যা ১৯৯৭) এখানেই বিমল কর তাঁর সমসাময়িকদের অনেককে ছাড়িয়ে যান। উদারতা, অনুভব শক্তি এবং আগামী প্রজন্মকে পক্ষীমাতার উৎকণ্ঠায় আগলে রাখা—এই তিনটির একত্র সংমিশ্রণ আর খুব বেশি দেখা যায় নি। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই, কিন্তু তাঁর এই লালনক্ষমতাটিও বিরল।

নিষ্ঠাবান গবেষক দিলীপকুমার বিশ্বাস

গৌতম নিয়োগী

একদল উজ্জ্বল ছাত্র সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ দাপিয়ে বেড়াত। আই. এ এবং বি. এ ক্লাসের সেইসব সহপাঠীরা, যাঁদের কথা বলতে গিয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মুখ। আর হবেই না কেন? পরে তো এরাই হয়ে উঠলেন এক একজন নক্ষত্র।

সময়টা ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০। শেষের দু' বছর অনার্স—কারও ইতিহাস, কারও অর্থনীতি, কারও বা ইংরেজি। আবু সয়ীদ চৌধুরী, প্রতিবেশী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। আজ নেই। অমলেশ ত্রিপাঠী, খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ছিলেন। আজ নেই। রণজিৎ গুপ্ত ছিলেন পুলিশ। না, যে-সে নয়, তখনকার আই পি. অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল পুলিশ। সত্যজিৎ রায়, তাঁর পরিচয় দেওয়ার তো প্রশ্নই নেই। আর হ্যাঁ, আরও দু'জন বেঁচে আছেন, রাজনীতির লোক, নামীও বটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। আর এই সদ্য ২৩ নভেম্বর রবিবার ভোরবেলায় চলে গেলেন দিলীপকুমার বিশ্বাস।

আমার সঙ্গে কয়েক দশকের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথা নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা যেত যদি না দিলীপকুমার বিশ্বাস হতেন এক বিরল ব্যতিক্রমী মানুষ—পাণ্ডিত্য, সরসতায়, চরিত্র মাধুর্যে সবদিকেই খুব স্নেহবৎসল অধ্যাপক। প্রিয় বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, এম. এ ক্লাসেও পড়াতেন ভারতের 'রিলিজিয়াস হিস্ট্রি'। কিন্তু তাঁর গবেষণার মুখ্যকেন্দ্র উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালি। আর এ-কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনি ছিলেন সারা দেশের সর্বাগ্রগণ্য রামমোহন-বিশারদ এবং সেজন্য পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান। সেই কারণেই 'পরিচয়' সম্পাদকের অনুরোধে লিখতে বসেছি এই প্রয়াণলেখ।

কত স্মৃতি যে মনে ভিড় করে আসছে। ব্রাহ্মসমাজের পুরনো মানুষেরাও তো প্রায় নেই। 'একে একে নিবিছে দেউটি'। আমাদের যৌবনে যাঁদের পেয়েছিলাম সেই যোগানন্দ দাস, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, দেবপ্রসাদ মিত্র, পুলিনবিহারী সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সরল দেব, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, প্রশান্তকুমার ঘোষ, সরলা ঘোষ, করুণাকেতন সেন, সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সুধীরঞ্জন দাস, নলিনী দাস, অমিয়কুমার সেন অরুণকুমার সেন, সুশোভন সরকার. চিন্মাহন সেহানবীশ, হিরণকুমার সান্যাল, অজয় হোম, কনক দাস, মালতী ঘোষাল, নীহাররঞ্জন রায়, দেবেন্দ্রমোহন বসু কেউই তো নেই। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের প্রয়াণে টুপির শেষ পালকটিও খসে পড়ল।

এক মধ্যবিত্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম পরিবারে দিলীপকুমারের জন্ম ১৯২০-তে। পিতা জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষ, সরকারি আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। মা উড়িষ্যার

কন্যা। দাদামশাই বিশ্বনাথ কর। উড়িষ্যার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, 'উৎকল সাহিত্য'র সম্পাদক। সংস্কারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি উড়িষ্যায় ভক্ত কবি মধুসূদন রাও-এর মতোই। দিলীপকুমারের মাতৃভাষা আক্ষরিক অর্থেই ওড়িয়া, যা তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে লিখতে পড়তে পারতেন। ওড়িয়া ঔপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতির রচনা তিনি মূল ওড়িয়া থেকে ভাষান্তর করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'আলেখ্য' পত্রিকায়। তা পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়নি। যতদূর জানি পুস্তকাকারে এই আত্মজীবনচরিতের অনুবাদ বই হয়ে বেরিয়েছে। (মৈত্রী শুক্ল-কৃত)। শুধু লিপি ভাষা নয়, বিদেশি ভাষাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ফরাসি ভাষা জানতেন খুব ভালো। শুধু রামমোহন সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য ফরাসি দলিলই নয়, ফরাসি ভাষার ইতিহাস বই ভাষান্তরিত করেছিলেন বাংলায়, সম্ভবত ফার্মাকে এল থেকে তা ছাপাও হয়েছিল।

তাঁর বিস্তারিত জীবনকথা বলার স্থান এই প্রয়াণলেখ নয়, শুধু উল্লেখ থাক যে এই গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, স্বাস্থ্যবান মানুষটি ছাত্রজীবন থেকেই বিচিত্রমুখী কৌতূহল আর অনুরাগ নিয়ে বড়ো হয়েছেন। মাস্টারমশাইদের কথা উঠলে অনার্স ক্লাসে সুশোভনচন্দ্র সরকার আর এম. এ ক্লাসে হেমচন্দ্র রায় ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—এই দুই প্রবাদ-প্রতিম বিদ্বানের কথা বলতেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর কিছুকাল শান্তিনিকেতন (তখনও বিশ্বভারতী হয়নি) গবেষণা করেছেন। তারপর এলেন অধ্যাপনায়, প্রথমে সিটি কলেজে, তারপরে এডুকেশান সার্ভিসে যোগ দিয়ে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ। দীর্ঘকাল সেই সঙ্গে পড়িয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস।

অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার জগৎ ঘিরেই তাঁর বিচরণ। আর রামমোহন রায় সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত গত শতকের পঞ্চাশের দশকে। সেজন্য যোগাযোগ রেখেছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের সংগ্রহশালার সঙ্গে। তা নটিংহ্যামশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিউক অফ পোর্টল্যান্ড সংগ্রহই হোক বা প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটিই হোক। এই প্রচেষ্টার ফলেই ১৯৬২-তে প্রকাশিত হলো প্রয়াত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগে রামমোহনের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি জীবনী, কুমারী সফায়া (তিনি নিজে এই উচ্চারণ করতেন) ডবসন কলেট-এর লেখা বইয়ের সটীক সুসম্পাদিত সংস্করণ। প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। পরে বইটির তৃতীয় সংস্করণে সম্পাদকীয় সংযোজন বহুগুণ স্ফীত হয়েছিল নতুনতর গবেষণা-লব্ধ তথ্যের আলোকে এবং দিলীপকুমার বিশ্বাসের একক প্রচেষ্টায়। এই বই নির্মাণের সময় কত সকাল কত দুপুর বা বিকেল যে তাঁর সঙ্গে অলোচনায় কেটেছে। সম্পাদনা গুণেই বইটির মূল্য বহুগুণ বেড়ে গেছে।

শুধু ইতিহাস নয়, ভারততত্ত্বের নানা শাখাতেই তাঁর কৌতূহল আর আগ্রহ ছিল। আর সাহিত্য রসপিপাসু তিনি বরাবরই। খেলাধুলোতেও তাঁর খুব আগ্রহ। শাস্ত্রীয় সংগীতে শুধু সমজদার ছিলেন বললে কম বলা হয়। নিজে চর্চাও করেছেন। দীর্ঘকাল বাস করেছেন উত্তর কলকাতায়। ৮নং গড়পাড় রোডে। তারপর জীবনের শেষ পর্বে বেলগাছিয়াতে এম আই জি হাউসিং কমপ্লেক্সের বি ব্লকে। স্ত্রী ভারতী বিশ্বাস (দাস) সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেছেন

স্কটিশ চার্চ কলেজে। স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা নিয়ে সুখের সংসার—নানা জাগতিক দুঃখ বা শারীরিক যাতনা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ভগবৎবিশ্বাস মানুষটি, রবীন্দ্রনাথের মতনই, ভাবতেন 'তবে তাই হোক'। এমন নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রানুরাগী তো খুব কম দেখেছি।

১৯৮৪-তে বেরুলো, সারস্বত লাইব্রেরি থেকে, তাঁর 'রামমোহন সমীক্ষা'। যার অধিকাংশ রচনাই আগে নানা পত্রপত্রিকায় অথবা সংকলন গ্রন্থে বেরিয়েছিল। প্রায় সবই পড়া ছিল। তবু আমাদের সে কী উত্তেজনা। পুলিনবিহারী সেন বইটিকে বললেন 'মহাগ্রন্থ' আর তার প্রতিধ্বনি যেন শোনা গেল যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বইটিকে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস্ প্রমুখ দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা, তার কাজকে স্বীকৃতি ও মান্যতার কথা আমরা জানি। রামমোহন বিষয়ে তাঁর অসম্ভব উচ্চাঙ্গের কাজ দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'দ্য করেসপন্ডেন্স অফ রাজা রামমোহন রায়', যার টীকা-টিপ্পনী আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধায় বিস্ময়াবিষ্ট করে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ। পত্রিকাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সভাপতি এবং অন্যতম অছি হিসেবে সুদীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেছেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতিও ছিলেন বহুদিন। কলকাতার সারস্বত প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন বহুদিন। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগ অবশ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে, তারও ছিলেন সভাপতি একসময়। তবে কোনও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চেতনা তাঁর মনকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। সমাজের আচার্য হিসেবে কতবার ১১ মাঘের উপাসনা করেছেন তার হিসেব করা মুশকিল। উপাসনাতে ছিল নিজস্বতা আর ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ; আরাধনা অংশ আন্তরিকতার জন্যই অন্য মাত্রা পেয়ে যেত। সবিনয়ে মার্জনা চেয়ে ব্যক্তিপ্রসঙ্গের অবতারণা করে বলতে পারি আমাদের বিয়েতে আচার্য দিলীপকুমার বিশ্বাসের উপদেশ আমরা এখনও ভুলিনি।

অথচ এই জ্ঞানতপস্বী মানুষ ছিলেন আত্মগরিমাশূন্য সহজ সরল। ঘনিষ্ঠ মহলে খুব আড্ডা দিতে পারতেন। তবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিচু গলায়। মার্জিত আভিজাত্যে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা মনে রাখার মতন। খুব রসিক মানুষ। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার এক সাহেব যিনি খুব ভালো বাংলা লিখেছেন বলে গর্ব করছিলেন—তাকে দিলীপকুমার বললেন, 'বাংলা লিখেছেন, বলুন তো আমার সঙ্গে একদম পেঁয়াজি করবেন না,' এর মানে কী? একবার হিরণকুমার সান্যাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী দিলীপ কেমন খেলে? দিলীপকুমার স্মিত হেসে বললেন, এই খিচুড়ি। ডাল-ভাত মেশানো আর কী। হাবুলদা বললেন, ভুল বললে, বলো 'ডাল-ভাত আর ধুলো।' সকলের কী হাসি। শহীদ রামেশ্বর মৃত্যুর দিনে কলকাতার ওয়েলিংটন (অধুনা সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে মূল জনসভা ডেকেছিল ছাত্র কংগ্রেস, যার সভাপতি ছিলেন দিলীপকুমার বিশ্বাস। এই মানুষটি অতুলপ্রসাদের গান প্রসঙ্গে আমায় খাম্বাজ আর বেহাগের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবার ভেঙ্কটেশ-আপ্পারাও-ধনরাজ-আমেদ-সালে খচিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্বর্ণযুগ নিয়ে হাসিতে-গল্পে মেতে উঠতেন। এই সুপণ্ডিত-সুরসিক মানুষটি ২০০৩-এর ২৩ নভেম্বর তিরাশি বছরে যেন হাসতে হাসতেই চলে গেলেন।

নির্জন বাতিস্তম্ভ : কথাসাহিত্যিক সত্যপ্রিয় ঘোষ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

একটি ছোট গল্পের শেষ দুটি বাক্য তুলে ধরছি। 'যত বক্তৃতাই দিন'—দীনেশ জবাব দিল, 'দাসত্ব তা নীতিরই হোক আর দুর্নীতিরই হোক, সেটা কিন্তু গৌরবের নয়। 'সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি'—বলে বীরেশ বোকামির শাস্তিস্বরূপ মনে মনে যুক্তি এবং নীতি নামক দুটি আধলা ইঁট দুই হাতের তেলোতে চাপিয়ে দিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে নাড়ুগোপাল হয়ে দাঁড়াল।

লেখক সদ্য প্রয়াত সত্যপ্রিয় ঘোষ। গল্পের নাম 'রক্ত', সময় ১৯৬৩ সাল। এর ৪০ বছর পেরিয়ে ১৫ অক্টোবর হঠাৎ, বলতে গেলে আকস্মিক, তিনি চলে গেলেন। এই আকস্মিকতার প্রসঙ্গ অপরিণত বয়সের কথা নয়। সত্যপ্রিয় ঘোষ ৭৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। দীর্ঘ জীবনকালই বলা যেতে পারে। কিন্তু নীরোগ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, শরীরের সামান্য উৎপাতকে কেন্দ্র করে এমন আলটপকা ৭৯ বয়সের মৃত্যু আমাদের কাছে অপরিণত বয়সের ট্রাজিডির কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাংলা সংস্কৃতির খ্যাতনামা একটি পরিবারের সদস্য তিনি। শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্র ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ বা অভ্র শিক্ষিত গ্রহের মানুষের কাছে সুপরিচিত। পঞ্চাশের দশকে 'পূর্বাশা' 'অগ্রণী' পত্রিকার পথ বেয়ে উঠে আসা সত্যপ্রিয়ও প্রতিনিধিত্ব করতেন বাংলা সাহিত্যের একটি শৈল্পিক ধারাকে, যার পূর্বসূরি হিসেবে রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ, সাবিত্রী রায় প্রভৃতি বেশ কিছু লেখকের নাম করা যেতে পারে।

রসসাহিত্য যে নিছক অশিক্ষিত পটুত্ব নয়, জীবন যে সাহিত্যের ছোঁয়ায় অর্থবহ হয়ে ওঠে, সত্যপ্রিয় ঘোষ তাঁর যাপিত জীবনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে-করতে গেছেন। রাজনীতি, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে জ্ঞানভাণ্ডারের নানা শাখার প্রতি তাঁর অনিবারণীয় আকর্ষণ ছিল। যথার্থই, তিনি মজুরের মতো শ্রম দিতে জানতেন। 'পূর্বাশা' সংকলনটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখেছি তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রম। 'জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনে চীনেও যাওয়া যেতে পারে'—প্রাচীন এই বাণীটি ছিল তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র। শব্দ, বানান, ব্যুৎপত্তি, যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে যতখানি তিনি অক্লান্ত নিখুঁত হয়ে উঠতেন, হয়তো ইংরিজি impeccable—শব্দটি তিনি গভীর উপলব্ধি করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক। সত্যপ্রিয় ঘোষ যতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ, নতুন আলোক এবং সুগভীর শ্রদ্ধা ও শ্রমে মানিক-জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, শিক্ষিত বাঙালির কাছে তিনি ধন্যবাদার্হ হবেন। এই সেদিনও তিনি ঘাঁটতে ঘাঁটতে মানিকবাবুর এমন গোটা দুই বিরল গল্প খুঁজে বার করেছিলেন, যা কোনো গ্রন্থ, রচনাবলি, এমনকী লেখকের স্ত্রী পুত্রেরও জানা ছিল না। 'পূর্বাশার কথা' এবং 'পূর্বাশা সংকলন ১'-এর মধ্য দিয়ে সম্পাদক সত্যপ্রিয়কে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যায়। মনে আছে পূর্বাশার অতি পুরনো কয়েকটি সংখ্যার জন্য, খবর পেয়ে, তিনি পণ্ডিচেরীর গ্রন্থাগার পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করে নিষ্ঠার মর্যাদা দিয়েছিলেন। শুধু আত্মক্ষেত্রেই নয়, যে-কেউ যে-কোনো শব্দ তথ্য

বা অন্যান্য খুঁটিনাটির জন্য ওনার কাছে ছুটে গেলে অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করেছেন। শোনা যায়, বর্তমান management-এর নিয়ম অনুসারে, তথ্য বা imformation এ-ভাবে ঢালাও বিতরণ করা নাকি প্রথাবিরুদ্ধ। সত্যপ্রিয় ঘোষ এই 'আধুনিকতা'কে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন বলেই হয়তো গ্ল্যামারের আলো থেকে দূরে থাকতে স্বস্তি বোধ করতেন। মনে আছে এক সন্ধ্যায় তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম ধর্মগ্রন্থ যে কাঠের আসবাবটিতে রেখে ধার্মিকরা পাঠ নেন, যথার্থ শব্দটি কী? উনি টেলিফোনে একটি শব্দের কথা বলে দেয়ায় নিশ্চেন্তে লেখায় ব্যবহার করেছি, কিন্তু গভীর রাত্রে ফের টেলিফোনে শুধরে জানালেন যথাযথ শব্দটি হবে একটু ফার্শি ঘেষা। রেহেল। এবং আমার কৌতূহলের জন্য তিনি ঘণ্টা চার পাঁচ নানা কোষ অভিধান বা অন্যান্য উৎস ঘাটাঘাটি করেছেন। এই নিষ্ঠা ও সহৃদয়তা আজ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে নির্বাসিত। এমন সহজ, সরল, অনায়াস যোগাযোগের নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব ফুরিয়েই গেল, বলা যেতে পারে। দেখেছি কী নিষ্ঠা ও নিখুঁত পদ্ধতিতে তিনি অনুবাদ বা সমালোচনা লিখেছেন। আজ তো এ-দুটি ক্ষেত্রে চলছে যথেচ্ছাচার এবং চালাকি। বাক্য থেকে বাক্য ধরে খুঁটিয়ে নাড়া দূরে থাকুক, শুনি স্রেফ বইয়ের সংক্ষিপ্তসারটুকু চোখ বুলিয়েই সমালোচনা লিখে ফেলা হচ্ছে। সম্পাদক বা গবেষক হিসেবে তাঁর ভূমিকার সত্তর ভাগ অনুসরণ করলেও তরুণ প্রজন্ম উপকৃত হবে। এমন মানবিক, উদারমনা এবং মুক্তচিন্তার লেখক এ-সময় বিরল। তাঁর প্রখর রসবোধের ছোঁয়া অন্যকে সঞ্জীবিত করে। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি খবরের একটি ভাণ্ডার হয়েছিলেন।

পঞ্চাশ দশকে পূর্বাশা অগ্রণীর মধ্য দিয়ে যাঁর লেখকজীবন শুরু, 'নাভানা'-প্রকাশনী থেকে যাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, মধ্যগগনে কেন পাঠকদের আড়ালে চলে গেছলেন, ভাবলে অবাক লাগে। আসল কথা ষাট, সত্তর এবং পরবর্তী সময়ের বৃহৎ পুঁজি, বাণিজ্যায়ন এবং সাংস্কৃতিক জগতে গ্ল্যামার সর্বস্বতার জন্য যে মানবিক অবমূল্যায়ন ইঁদুর দৌড়, পুরস্কার রাজনীতি, বদ্ধ চিন্তা ও গোষ্ঠী-সংকীর্ণতা যে-ভাবে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতকে ঘুণ ও ঘেন্না ধরিয়েছে, তিনি কখনোই নতুন পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে পারেননি। তার ওপর শুধু অক্ষরচর্চাই তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন বা সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায়—যা মানুষকে সঠিকভাবে প্রভাবিত করে—তিনি নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল তাঁর ভাবনার অন্যতম বিষয়। গল্প লেখা কমে গেলেও, এই পর্বে কিছু না কিছু লিখতেনই। যেমন ১৩৬৮-তে লিখেছেন 'সারপ্লাস' গল্প, ১৩৬৯-এ লিখেছেন 'লোকোশেডের নায়িকা', ৭৪-এ লিখেছেন 'নবনাগনন্দিনী' প্রভৃতি গল্প। আজীবন তিনি লিটল্ ম্যাগাজিন বা সাহিত্য পত্রিকাগুলোতেই লিখেছেন। 'সারস্বত' 'উত্তরকাল' 'ক্রান্তি' 'গণবার্তা' 'চতুষ্কোণ' 'লেখা ও রেখা' 'ছাত্র' 'কালপ্রতিমা' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য গল্প। তিনি কখনোই নীতি বা দুর্নীতি—কারও দাসত্ব করেননি। যখন সোভিয়েত লেখক সলঝেনিৎসিন্-কে নিয়ে বাম লেখকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন, উনি অকপটে 'গুলাগ আর্কিপেলেগো'-কে সমর্থন করেছেন। রবীন্দ্র-আবহাওয়ায় এবং অনুরাগে আজন্ম বর্ধিত হয়ে 'চার অধ্যায়'-কে তীব্র সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। এমন স্পষ্ট মতপ্রকাশের ব্যক্তিত্ব ইদানীং চারপাশে

বিরল হয়ে যাচ্ছে যখন, সত্যপ্রিয়দার হঠাৎ চলে যাওয়া ভীষণ প্রভাব ফেলে আমাদের মনে। তাঁর yes বা no কখনোই ব্যক্তি বা পরিস্থিতি বুঝে বদল ঘটেনি। অথচ নিজের লেখালেখি নিয়ে নিজেকে এমন উড়িয়ে দেবার কৌতুক-রস বিস্মিত করে আমাদের। এমন নেতিবাচক অহংবোধ, ইদানীং লেখকরা আদৌ পোষণ করে না। যে-যার নিজের Band পেটাতে এমন নির্লজ্জ বেহায়া, চোখের পাতাহীন—সত্যপ্রিয় ঘোষ-কে একটু বেমানান ঠেকে সেখানে।

নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে, তাঁর চারপাশে একদল তরুণ অনতিতরুণ, প্রৌঢ় কিংবা পরিপক্ক বয়সের লেখক সম্পাদক জড় হয়েছিল। এদের বিশ্বাস আছে লেখার মান-ই একমাত্র বিবেচনীয়; সুতরাং এই অদ্ভুত আঁধার সময়ে প্রকৃত স্রষ্টার প্রতি justice delayed হতে পারে কখনোই denied হবে না। সত্যপ্রিয় ঘোষ এই বিশ্বাসে প্রথম অবস্থায় কতটুকু দৃঢ় ছিলেন, বলা মুশকিল। নিজের প্রতি দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সবসময় তাঁকে বিদ্ধ করত। কিন্তু চারপাশের বন্ধুরা বিশ্বাসটুকু ক্রমাগত প্রয়োগ করার চেষ্টা চালাত সত্যপ্রিয় ঘোষের ওপর। সত্তরোর্ধ বয়সে তিনি ফের যে সৃষ্টির সম্ভারে সবুজ হচ্ছিলেন, নতুন করে বাঁচতে শুরু করেছিলেন, তা এই বিশ্বাস ও প্রয়োগের একটু দোলায়িত ছন্দ যেন। উনি একটু একটু বিশ্বাসী হয়ে উঠলেও সন্দেহমুক্ত ছিলেন না। নিজের প্রতি, নিজের ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আস্থা কখনোই স্থাপন করেননি। অথচ, চারপাশের বন্ধুদের ক্ষমতা ও গৌরবকে চিনে নিতে ভুল হত না। গলা ফাটিয়ে প্রচার করতেন, ঝগড়ায় মাততেন। এমন সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব ও মানবিকতার ইদানীং দৃষ্টান্ত কোথায়? সৃষ্টির নতুন এই পর্যায়-কালে আমরা দেখতে পাই, ১৯৫৬ থেকে ৭৫ পর্যন্ত যেখানে তাঁর মোটে চারটি গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে, ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ অর্থাৎ দশ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০টি।

গল্প উপন্যাস, অনুবাদ, সম্পাদনা—বয়সকে উপেক্ষা করে তিনি নবীন হয়ে গেছেন। মানুষের সঙ্গে মিশবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। যে-কোনো বয়সের যে-কোনো জীবিকার সাধারণ মানুষ ছিল তাঁর ভালোবাসার পাত্র। নিজের জন্য কখনোই কোনো অনুযোগ শুনিনি। তাঁর কালিন্দীর বাড়িতে নানা পরিবেশে, নানা আড্ডায় তিনি অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে দিতেন। যার লেখা পছন্দ ছিল না, মুক্ত কণ্ঠে জানাতে কোনো দ্বিধা ছিল না। যত গ্ল্যামারসর্বস্ব লেখক হোন না কেন তিনি।

তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বনিতা জনম' ও 'মানপত্র'। লেখার শৈলী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর মতামত ছিল দৃঢ় ও স্পষ্ট। এ-ব্যাপারে আমাদের সঙ্গেও তাঁর প্রায়ই বিচার-বিতর্ক জমে উঠত। স্টাইলসর্বস্বতা বা আধা-বাস্তব, পরাবাস্তব কিংবা অযথা জটিল বাক্যবন্ধ তিনি পছন্দ করতেন না। বলতে গেলে, শৈলীকে তিনি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গল্প কিংবা উপন্যাস নির্মাণ ছিল প্রবাহিত কাহিনিকে ধরে এগিয়ে চলা। সাধাসিধে, টিলেঢালা ভারতীয় গ্রামীণ জীবনযাত্রার মতো তাঁর গল্পের ভুবনও ছিল আন্তরিক, অতিরিক্ত কথন ও একটি মূল্যবোধের অক্ষে বাঁধা। অথচ আধুনিক নাগরিকতার লক্ষ্য ও উপকরণ তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। 'আমার সন্তান যেন' গল্পে লিখেছেন....'গ্রিল-ঘেরা বারান্দার দোলনায় বসা মেয়েটার বাবা, তার বাঁ হাতে মোবাইল ফোন, ডান হাতে জিনের বোতল

এবং তার পাশে বেতের চেয়ারে দুই Y2K যুবক, সামনের টেবিলে সাউন্ড সিস্টেম, আর ফ্ল্যাটটার বাইরে রাস্তায় ফুটফুটের মাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচাচ্ছেন তার মা, জামাতার কদর্য নানা মন্তব্যের সমুচিত জবাব দিচ্ছেন কণ্ঠ সপ্তমে তুলে।' এ-জাতের লেখক যে বাণিজ্যায়ন, গ্ল্যামার বা যে-কোনো কৃত্রিমতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করবেন, তাঁর রচনা-প্রকরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। জীবন ও সাহিত্যভাবনাকে তিনি আলাদা করতে জানতেন না।

নগর ও উপনগরের প্রান্তীয় মানুষ ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রিয় বিষয়। আর ছিল প্রকৃতির প্রতি টান, অতীতপ্রিয়তা। এই অতীতপ্রিয়তা নিছক 'নস্ট্যালজিয়া' ছিল না; ছিল পরম্পরার মধ্যে একটি ইতিবাচক সেতুনির্মাণ।-তাঁর গদ্যে আমরা বরিশাল বা চাঁদপুর অঞ্চলের বেশ কিছু 'ডায়ালেক্ট' খুঁজে পাই, যা নতুন প্রজন্মের কাছে হারিয়ে গেছে। দেশ-ভাগের ট্রাজেডি নিয়ে বাংলায় তেমন মহৎ সাহিত্য প্রয়াস লক্ষ না করা গেলেও, সত্যপ্রিয় ঘোষের গল্প, উপন্যাসে বা ব্যক্তিগত গদ্যে তা নানা প্রসঙ্গে ঘুরে ফিরে এসেছে।

স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া লেখককুলের বাইরে যে তরুণ প্রজন্ম সিরিয়াস ভাবনায় উৎসাহী, তিনি তাঁদেরই উত্তাপে ক্রমে আশাবাদী হয়ে উঠছিলেন। ছোটছোট প্রয়াসের মধ্যে, লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে এইসব তরুণদের নিয়ে কর্মশালা, গল্পপাঠ পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য তিনি বারবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়া সুস্থ সাহিত্যচর্চাকে খানিকটা ধাক্কা দিয়ে গেল। এ বছরের নিজের শারদ-গল্পগুলো মুদ্রিত অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি। তবে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একটি 'নীললোহিত' পত্রিকার কথাসাহিত্য সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন, দ্বিতীয়টি 'পরিচয়'-এ অধ্যক্ষ হীরেন মুখোপাধ্যায় সম্মান সংখ্যায়, কিংবদন্তি পুরুষটিকে নিয়ে মূল্যায়ন।

বর্তমান অস্থির সময়, সাংস্কৃতিক মাৎসন্যায় পরিস্থিতিতে, সত্যপ্রিয় ঘোষ ছিলেন একটি নির্জন বাতিস্তম্ভ স্বরূপ। জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত করাই হবে তাঁর প্রতি তরুণ লেখকের শ্রদ্ধা প্রকাশ।

সত্যপ্রিয় ঘোষের গ্রন্থপঞ্জি :

উপন্যাস : চারদেয়াল (১৯৫৬), গান্ধর্ব (১৯৫৯), রাতের ঢেউ (১৯৬০), বহু বাসনায় (১৯৯১), স্বপ্নের ফেরিওয়ালা (১৯৯৯), মানপত্র (২০০১), বনিতা জনম (২০০৩)।

গল্পগ্রন্থ : অমৃতের পুত্রেরা (১৯৭৫), দ্বিতীয় জন্ম (১৯৯৮), নির্বাচিত গল্প (২০০১), গল্প-সমগ্র ১ (২০০৩)।

অনুবাদ গ্রন্থ : আরমানী ছোটগল্প সংগ্রহ (১৯৯০, ২০০০), তানসেন (১৯৯৩)।

সম্পাদনা : পূর্বাশা কথা (১৯৯৯), পূর্বাশা সংকলন ১ (২০০১)।

সম্মান : কালপ্রতিমা সাহিত্য শ্রদ্ধার্ঘ্য (১৯৯৯), নিমতা বইমেলা কমিটি সংবর্ধনা (২০০০), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কথাসাহিত্যিক সংবর্ধনা (২০০২), করিমপুর চেতনা সাহিত্য গোষ্ঠী স্মারক (২০০৩)।

সম্ভাব্য আসন্ন প্রকাশ : গল্পসমগ্র ২, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং পূর্বাশা সংকলন ২।

ক্ষমতায়ন এবং নারী পাচার

আমরা আমাদের দেশের সমাজ কল্যাণমূলক আইনকানুনের জন্য গর্ববোধ করি। সেই গর্ব অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সংবিধান গ্রহণের ৫০ বছর পরেও যখন চারপাশে তাকিয়ে দেখি তখন বুঝতে পারি সাংবিধানিক বা আইনগত ঘোষণা এবং তার রূপায়ণের মধ্যে পার্থক্য কত বেশি। জাতপাত, ধর্ম, জাতি ও লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য এবং বঞ্চনা কত ব্যাপক। দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান কত দূরে। ক্ষেত্র বিশেষে মনে হয় যে অগ্রগতি তো দূরের কথা পশ্চাৎগম ঘটেছে।

মূল সমস্যা হল ক্ষমতায়ন। আইন করলেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে না। সেটা তৃণমূল স্তরে বঞ্চিতদের সচেতনতা ও সংগঠনের মারফত বাস্তবায়িত করতে হয়। এই জন্যই প্রকৃত বাধাগুলি কোথায়—কতটুকু চেতনায় আর কতটুকু বাস্তব পরিস্থিতিতে তা বুঝেই সাংবিধানিক অধিকার আদায় করার জন্য বঞ্চিতদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সে সংগ্রাম শুধু বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই নয়—লড়তে হবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার যে মানুষ ও সমাজ তাদের চেতনার উন্নয়নের জন্য। অনেক সময়েই দেখা যায় যে নিপীড়িতরা নিজেরাই নিজেদের বাধাস্বরূপ।

চেতনাগত সমস্যা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি। মেয়েরা একই সঙ্গে শ্রেণীশোষণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার। লিঙ্গ নির্ভর শোষণ ও বঞ্চনা সব শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মেয়েদেরও আলাদা শ্রেণী হিসেবেই ভাবতে হবে। ধনতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে শ্রেণীর অর্থ অনেক বেশি ব্যাপক ও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শোষণের ভিত্তি প্রসারিত হচ্ছে। শোষিতদের মধ্যেও অর্থনৈতিক পার্থক্য—এমনকী বিরোধও থেকে যাচ্ছে। এর কারণ শোষণ আর শুধু অর্থনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ নেই—তা অর্থনীতির বাইরেও নানারূপে দেখা দিচ্ছে। যদিও সব ধরনের শোষণেরই একটা অর্থনীতিগত রূপও আছে। শোষণ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে মেয়েদের ক্ষমতায়নের সংগ্রামকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে। শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা নির্ভর বইটিতে এই সমস্যারই আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলার ১০টি গ্রামে নারী এবং শিশু পাচারের সমস্যাকে তিনি মেয়েদের ক্ষমতায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। লেখিকা সমাজবিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী আন্দোলনের নেত্রী হওয়ার কারণে তাঁর গবেষণা ও রিপোর্টটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশিতভাবেই অনেকটা বিস্তারিত হয়েছে। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে স্বীকার করেছেন যে তাঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে গ্রাম সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা এবং অবস্থানের সঙ্গে মেয়ে শিশু পাচারের কম বেশিকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা যায় না। এই গবেষণা থেকেই বোঝা

যায় যে মেয়েদের ক্ষমতায়নের সমস্যাটা এখনও কত কঠিন। সামাজিক সাংস্কৃতিক বাধা কত জটিল। প্রকৃত পরিস্থিতির খোলাখুলি প্রকাশও কত সংকুচিত।

আলোচ্য সমীক্ষাটি ৫টি জেলার ২টি করে গ্রাম বেছে নিয়ে সংগঠিত হয়েছে। আগের খবর অনুযায়ী যে সব জেলাগুলিতে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা অপেক্ষাকৃত বেশি বলে খবর ছিল তেমন ৫টি জেলাই বাছা হয়েছে। জেলাগুলি হল উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর (বিভাগের পূর্বে)। ১৯৯৮ সালে একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাতেই পূর্ববর্তী বছরে ১৫০০ পাচারের ঘটনা জানা গেছে।

আলোচ্য সমীক্ষাটি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সংলাপ নামে একটি বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংলাপ নারী ও শিশু নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বেশ কিছুকাল হল উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। জেলা ও গ্রাম বাছাই-এর ক্ষেত্রে সংলাপের সংগৃহীত তথ্য অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। বেলা নারী ও শিশু পাচার ব্যবসার বিষয়টিকে মেয়েদের গ্রামছাড়ার সমস্যার সঙ্গে জড়িতভাবে দেখতে পেয়েছেন। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় মেয়েদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে এই ব্যাপারটার কমা বাড়া সম্পর্ক আছে কিনা সেটিও বিচার করতে চেয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই রাজ্যে ৮ লাখের চেয়েও বেশি মহিলা পঞ্চায়েতের নানা স্তরে নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর তদন্ত ও সমীক্ষা থেকে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা উজ্জ্বল নয় বললে কম বলা হয়। পঞ্চায়েতের মেয়ে সদস্যরা এখনও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করে উঠতে পারছেন না। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব খুবই কম। মনোনয়নের ক্ষেত্রেও অনেক সময়েই প্রার্থীর নিজ যোগ্যতার চেয়ে পুরুষ রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কের প্রশ্নটিও বেশি গুরুত্ব থাকছে। পরিবারের মেয়েদের ইচ্ছা ও মতকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় সেখানে এমন ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। অবশ্য এ কথাও ঠিক নয় যে মেয়েদের চেতনার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। এই সমীক্ষা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মেয়েরাই বাল্যবিবাহ বিরোধী এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থক। তাঁরা চান মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হোক এবং চলাফেরার স্বাধীনতা অর্জন করুক। মেয়েদের বিপুলাংশই পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মারফত ক্ষমতায়নের পক্ষে তাঁরা। সমীক্ষা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে যে মেয়েরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার পেতে আগ্রহী। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত কম পক্ষে ২০ শতাংশ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সমর্থক বা কর্মী। তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ মেয়েরাই রাজনৈতিক পারস্পরিক হিংসা, সংঘর্ষ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতের বিরোধী। কেন না তাঁরা মনে করেন যে এসব দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। পঞ্চায়েতের কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক 'দাদা' এবং পুরুষ আত্মীয়দের প্রভাব খাটানোর চেষ্টার অভিজ্ঞতা তাঁদের কিছুটা বিরক্তি ও হতাশার কারণ হয়েছে।

সমাজে যেখানে বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথার প্রবল চাপ এখনও রয়েছে, মেয়েদের

অর্থনৈতিক উপার্জনের ক্ষেত্র এখনও নেহাতই সীমিত, যেখানে পুরুষ আধিপত্যের বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় না। বেশির ভাগ পরিবারকে এখনও পুরুষদের রোজগারের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরিবারগুলির মাসিক আয় বা মাথাপিছু দৈনিক আয়—এতই কম যে তাতে জীবনধারণ একেবারেই সম্ভব নয়। অথচ অনাহারের কথাও তাঁরা বলছেন না। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আয়ের অপ্রকাশিত উৎস অবশ্যই রয়েছে এবং সেই বিষয়গুলি তদন্তের অন্তর্ভুক্ত পরিবারের সদস্যরা বলতে চাইছেন না। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যেসব পরিবারে মেয়েরা উপার্জন করছে তাদের বেশির ভাগই গ্রামের বাইরে। এই দুটি বিষয়কে যুক্ত করলে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া মেয়েদের উপার্জনের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে।

ওপরের পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে বেলা তাঁর রিপোর্টে আলাদাভাবে সংগৃহীত যে 'কেস হিস্ট্রি' বা বিশেষ নমুনা তথ্যগুলি হাজির করেছেন তার কারণ ও গুরুত্ব বোঝা যায়। এগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক পরিবারেই মেয়েদের হারিয়ে যাওয়া বা পণ দেওয়া এড়িয়ে দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাজ দেওয়ার নাম করে। বোঝা কঠিন নয় যে কোনো পরিবারই মেয়েদের যৌন ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের ঘটনা বলেন না বা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তথ্য পেতে হয় গ্রামে বা সমাজের তৃতীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে। যার সত্যাসত্য সঠিকভাবে যাচাই করা বেশ কঠিন। এ সত্ত্বেও কিছু পরিবারে পণবিহীন বিবাহের জন্য মেয়েদের দেশের বাইরে নিয়ে যাবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা কোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের অঞ্চলে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনাকে স্বীকার করতে রাজি হন না। বিভিন্ন সংবাদপত্র বা রিপোর্টের তথ্য হাজির করলেও তাঁরা মানতে চান না। লেখিকা খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কি কোনো দায়িত্ব নেই? কাগজপত্রে বা লোকমুখে বাল্যবিবাহ, পণের অত্যাচার বা নারী শিশু পাচার ও ব্যবসা-সংক্রান্ত খবর পেলে এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া এবং অপরাধ বন্ধ করার চেষ্টা করা কি পঞ্চায়েতের ওপর বর্তায় না? লেখিকা সঠিকভাবেই জানিয়েছেন যে মেয়ে পাচার কিংবা দেহ ব্যবসার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হত তাহলে দারিদ্র পীড়িত সব অঞ্চলেই এই সমস্যার চেহারা একইরকম হত। তা যখন নয় বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা সমাজের অংশ যখন এই সমস্যার দ্বারা পীড়িত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে তখন সমস্যাটি গভীরভাবে এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে অনুসন্ধান ও বিচার করা প্রয়োজন যাতে সমস্যা সমাধানের সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা যায়। বেলা দেখেছেন যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার পশ্চাৎপদতা এবং শিক্ষার সুযোগের অভাব এইসব অঞ্চলে এখনও বেশ রয়েছে। পঞ্চায়েত নেতারা—তাঁদের সীমিত সম্পদ এবং ক্ষমতার কথা বার বার বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে সাংবিধানিকভাবে তাঁদের উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করার ক্ষমতা বা সঙ্গতি তাঁদের নেই। গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকাঠামো এখনও খুবই দুর্বল। অন্যদিকে শাসন ব্যবস্থার ওপরতলা থেকে টাকা আনা এবং সেই টাকা বিলির ওপরে নির্ভরতা খুবই বেশি রয়ে গেছে। টাকা যথেষ্ট নেই তো

বটেই—যেটুকু আসে সেটুকুও সময়মতো না আসায় প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয় না, অপব্যয় হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে টাকা ফেরতও যায়। বেলা বিশেষভাবে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমীক্ষা প্রাপ্ত তথ্য সরকারি প্রচারিত তথ্যের সঙ্গে অনেকটাই গরমিল।

বেলা তাঁর প্রতিবেদনে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত মহিলা আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্বে গরিব শ্রমজীবী মেয়েদের কথা ন্যায্য খেদের সঙ্গে উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে সংগঠনগুলির ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো গরিব শ্রমজীবী মেয়েদের উঠে আসার জন্য সহায়ক নয়। তিনি অবশ্য এই বাধা সচেতনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন যে এর জন্য সচেতন প্রয়াস দরকার। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে সমস্যা কি শুধু মেয়েদের? এমনকী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অথবা রাজনৈতিক দল শ্রমিক শ্রেণীর বলে পরিচিত সেখানেই বা শ্রমজীবীদের ভেতর থেকে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কতটা গড়ে উঠেছে? বেলা তাঁর প্রতিবেদনে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতা অভাবের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে মেয়েরা এখনকার পার্টি, দল ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না, বোঝেও না। এ বিষয়ে আমার মনে হয় যে এইটাই বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া ও পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর ইঙ্গিতবাহী এবং সেই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

২৫ বছর বামপন্থী নেতৃত্বে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলার পরেও পঞ্চায়েত নেতাদের ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ বা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে উঠে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষত গরিবের উন্নয়নের কাজ করতে হবে। মেয়েদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ ত্যাগ করতে হবে—এইসব কথা বেলাকে বলতে হচ্ছে এটা যথেষ্ট পরিতাপের। বেলা নারী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবেই মনে রাখতে চান এবং সহকর্মীদের মনে করিয়ে দিতে চান যে মেয়েদের সাংবিধানিক এবং আইনগত অধিকারের বিষয়ে সচেতন করে তোলার বড় দায়িত্ব তাঁদের রয়েছে।

সমীক্ষাটির নানা সীমাবদ্ধতার কথা লেখিকা নিজেই বলেছেন। তা সত্ত্বেও সন্দেহ নেই যে সমীক্ষাটিতে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং বেলা তার যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আগেই উল্লেখ করেছি যে প্রতিবেদনের রচয়িতার সমাজবিজ্ঞানের ধারাগুলির সঙ্গে পরিচয় ছাড়াও নিজে রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় এবং ধারাবাহিক অংশ- গ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই দুটি গুণের সংযোগ সমীক্ষাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বেলার সমীক্ষা ও পর্যালোচনা থেকে মনে হল যে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন এবং সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার গতি অনেকটা কমে এসেছে। এর জন্য অবশ্য কেন্দ্রকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক শক্তি সমাবেশের ক্ষমতা বামপন্থী দলগুলির এবং সংযুক্তভাবে বামফ্রন্টের রয়েছে। মনে হয় সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনের সক্রিয়তার বদলে এক ধরনের আত্মসন্তুষ্টি এবং সরকারি ক্ষমতা

নির্ভরতা বাম আন্দোলনকে দুর্বল করে তুলেছে। আমার মনে হয় রাজ্য সরকারের উচিত এই বিষয়গুলির অনুসন্ধানের জন্য, আরও অনেক বেশি স্বাধীন গবেষণার জন্য সাহায্য করা দরকার। দেখা দরকার যে গবেষণার ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রভাব খাটানোর চেষ্টা না করা হয়, এবং প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষ গবেষণা ও সমীক্ষাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। বেলা যে ধরনের তদন্তের চেষ্টা করেছেন এমন কাজ আরও অনেক হতে থাকলে নতুন নীতি নির্ধারণ এবং সঠিক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য পাওয়া যাবে। পরবর্তী স্তরে উন্নয়নের জন্য সরকার এবং বামফ্রন্টের উদ্যোগ সমৃদ্ধতর হবে।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও নারী শিশু পাচার। বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংলাপ, কলকাতা। ২০০২। ৫০ টাকা।

একটি সংগ্রহযোগ্য পত্রিকা

কার্তিক লাহিড়ী

কলকাতার শিল্পী সাহিত্যিক দর্শক পাঠক একটু ঘর-কুনো বলে মনে হয়। নিজের চৌহদ্দির বাইরে কিছু কাজ হচ্ছে তা দেখার বা জানার আগ্রহ থাকলেও সেই আগ্রহ মনের মধ্যেই পুষে রাখেন প্রায়ই। এজন্য অবশ্য অনেক কিছুকে দায়ী করা চলে যেমন—সময়াভাব, যাতায়াতের ঝামেলা, যানজট ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। কখনও সখনও হাতের নাগালে পেয়ে গেলেও শারীরিক জাড্য তাতে জল ঢেলে দেয়। কলকাতার কাছে এবং দূরে মফস্‌সলে যে সব লেখালিখি হচ্ছে তাকে মফস্‌সলী প্রায় নাবালকচর্চা মনে করে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়, যেন ওই লেখা ইত্যাদি আদৌ কলকাতার মানের নয়, যদিও এই মান যে কী, তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কারোর ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়, হয়ত ধারণাই নেই ওই সম্পর্কে। তবু মফস্‌সলের লেখা কলকাতা-মহলে সহজে গ্রাহ্য হতে চায় না।

তাহলে সহজে অনুমেয়, পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় যে লেখালেখি হয়, তার কথা পৌছয় না এ শহরে, পৌছলেও আমরা ভাবতেও পারি না—সেসব জায়গায় কিছু লেখালেখি হয় অথচ সময় সময় চমকে দিতে পারে এমন সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় সেখান থেকে। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'উত্তরা'-র তেমন একটি সংখ্যা (ষষ্ঠ সংখ্যা ১৪০৯ বঙ্গাব্দ) সম্প্রতি হাতে এসে পৌছল আমাদের প্রায় হতবাক্ করে।

অন্যান্য পত্রিকার মতো 'উত্তরা'-য় যথারীতি গল্প, কবিতা, পুস্তক-সমালোচনা সহ সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস ও স্মৃতিকথা আছে। মনে হবে আর পাঁচটি ছোট পত্রিকার মতো 'উত্তরা' একটি মামুলি পত্রিকা। কিন্তু 'উত্তরা'-র এই সংখ্যাটি বিশেষ হয়ে উঠেছে একটি দীর্ঘ ক্রোড়পত্র-র জন্য, তার শিরোনাম 'বিংশ ও একবিংশ শতাব্দী'। বিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন দেখানো ও স্বপ্নভঙ্গ এবং মধ্যযুগীয় মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার প্রত্যাবর্তন—মূলত এই দু-টি প্রশ্ন তোলার দায়-ই ক্রোড়পত্র যুক্ত করার উৎস। "বিষয়ের দুরূহতা ও নানান সীমাবদ্ধতায় উত্তরা-র এই সংখ্যাটির প্রকাশ পেতে প্রায় এক বছর বিলম্ব হয়ে গেল।" এতে পত্রিকার নিয়মিত পাঠক অস্বস্তি বা বিরক্ত বোধ করতে পারেন, কিন্তু সম্পাদক জানেন "এলোমেলোভাবে, যা হোক-তা হোক করে সময়ানুবর্তি হওয়া" পাঠকের সঙ্গে এক ধরনের তঞ্চকতা করারই সামিল। আমরাও তাই মনে করি, যা হোক-তা হোক বের করলে আমরা সত্যি বঞ্চিত হতাম একটি মূল্যবান ক্রোড়পত্র থেকে।

একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের পাথেয় কী হবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচিত

হয়েছে—পরিবেশ, বাজার ব্যবস্থা, অনাহার, মৃত্যু, শিক্ষা, গণতন্ত্র, হিংসার চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে আমাদের জীবন যাতে এবং যা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যেমন সাজপোশাক, স্পেশাল এফেক্টস, টিনটিন, জেমস বন্ড ইত্যাদি—সবই আলোচনার অন্তর্গত হয়ে যায়। এমনকী ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যময়তা এবং খেলা নিয়ে কারবার-এর কথা বাদ যায় না ক্রোড়পত্রের পরিধি থেকে। এই সঙ্গে বর্তমানে আলোড়নকারী স্যামুয়েল হান্টিংটন-এর 'দি ক্ল্যাশ অব্ সিভিলাইজেশনস্ অ্যান্ড দি রিমেকিং অব্ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বইটির আলোচনা করা হয়েছে। বইটির বিস্তৃত আলোচনার পর সমালোচক লেখেন—"...হান্টিংটন তাঁর উদ্দেশ্যের সুবিধার জন্য জটিল এবং বহুমাত্রিক এই বিষয়টিকে অতি সরলীকৃত করে নিয়েছেন। তাঁর 'সভ্যতার সংঘাত' আসলে বিশ্বের অন্যান্য বাস্তবিকতার ওপর পর্দা টেনে দেয়।"

ক্রোড়পত্র-র প্রতিটি লেখা বিশ্লেষণাত্মক। কোনো কোনো লেখা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই বিতর্কের ঝড় তোলা আলোচনার একটি বিশিষ্ট গুণ, এবং এ সম্পর্কে সম্পাদক প্রবীর বসুও সচেতন, তিনি লেখেন "যদি কোনও বিতর্কের জন্ম দেয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।" পত্রিকার পূর্বভাগে অন্যান্য পত্রিকার মতো চিঠিপত্র, সম্পাদকীয়, কবিতাগুচ্ছ, ছোটগল্প, প্রবন্ধ-সহ একটি উপন্যাসও আছে। প্রয়াত সুলেখা সান্যালের অগ্রন্থিত একটি ছোটগল্প 'নির্লজ্জ' প্রকাশ করে সম্পাদক যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। সুখেন সরকার রচিত উপন্যাস "খোলস ভাঙা শামুক বুড়ি" পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নিঃসন্দেহে।

'উত্তরা' পত্রিকাটি নিয়মিত হয়ে উঠুক, এই আমাদের আশা। এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক ও সহযোগী সকলে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে ওঠেন। যাঁরা "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন"-কে সাহিত্যের 'কুম্ভ স্পেশাল' বলে মনে করেন, ওই সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ শাখা-র পক্ষে প্রকাশিত 'উত্তরা' পত্রিকাটি দেখলে বা হাতে পেলে তাঁরা নিজেদের ধারণা সংশোধন করে নেবেন সন্দেহ নেই। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

উত্তরা। সম্পাদক : প্রবীর বসু। ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, ষষ্ঠ সং। লক্ষ্ণৌ। ৪০ টাকা।